ষাণ্মাসিক সূচী

শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৬৫—চৈত্র ১৩৬৫

সম্পাদক ঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস

হত্যা ও তাঁহার মৃত্যুতঙ্ক মুখে তাঁহারই প্রজার নিষ্ঠীবন প্রক্ষেপ—রাজ্যপরিচালনায় কাজে সাহিত্যকে বর্জন করারই উপদেশ দিতেছে। তথাপি বলিব, জওহরলালের সে ভয় নাই। তাঁহার মধ্যেকার শিশু তাঁহার কবিত্বকে বরাবর ব্যালান্স করিয়া চলিতেছে, যেহেতু হইবার আশঙ্কা তাঁহার নাই। তাঁহাকে এবার দেখিয়া এই বিশ্বাস হইল যে ভারতের দেবতাত্মা হিমালয় মাঝে মাঝে তাঁহাকে বুকে টানিয়া সকল অপ্রীতিকর পরিণাম হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।

গতবারে 'আরব্য উপন্যাসের দেশ'-সম্পর্কিত পত্রে আলিবাবা ও চল্লিশজন দস্যুর যে কাহিনী লিখিয়াছিলাম দেখিতেছি তাহা ক্রমশঃ বাস্তবে পরিণত হইতেছে। ম্যালেনকভ যদি সত্যসত্যই গিয়া থাকেন, এবার বুলগানিনের পালা। ভারতবর্ষের যে বিপুল জনতার কাছে মানিকজোড় ক্রুশেভ-বুলগানিনের কৃষ্ণ-বলরাম মূর্তি আজও বিস্ময়ের স্মৃতি হইয়া আছে তাহাদের সকলের কাছে বুলগানিন-সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা আর একবার মোহমুদ্গার আওড়াইয়া হাঁফ ছাড়িবার অবকাশ পাইবে এবং উর্ধ্বাকাশে প্রণতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে তিমির পিছনে তিমিঙ্গিলের মত ক্রুশেভের পিছনে মহাকালের হাঁ কবে কোন্ মূর্তিতে বা দেখা দেয়! যাহা হউক, গীতার বিশ্বরূপ-দর্শনই শেষ পর্যন্ত মানিয়া লইতে হইতেছে।

পনের বৎসর পূর্বে পথ-চলার একটা কবিতা ফাঁদিয়াছিলাম, সেইটিকেই এবারের বিজয়া সম্ভাষণরূপে বাংলা ভাষাভাষীদের দরবারে পাঠাইতেছি। ছাপিয়া দিলে খুশি হইব জানিবে। কবিতাটি এই :

দুর্গম জনপদে যত পথ চলছি যে মানুষের ভিড় তত কমছে,
অনেক অনেক লোক অনাবশ্যক হয়ে পথ-চলা সহনীয় করছে।
আঁধারে আলোর রেখা ধীরে ধীরে যায় দেখা
লোভ ও লালসা কমে অধিকার-বোধ ধীরে ভুলছি,
দদরে রুধিয়া দ্বার খিড়কির দরজা যে খুলছি।

পাই বা না পাই তাতে লাভ ক্ষতি পরিমাণ করি না,
যশ দেহ, জয় দেহ—এ ভেবে মধ্য রাতে চণ্ডী বা গীতা
আর পড়ি না।
যা পেয়েছি তাই ঢের, কখনো মেটে না জের
পুরাতন হিসাবের, খতিয়ান যত খুশি কষছি,
চব্বিশ পরগণা, তার মাঝে কাঠা কয় জমি খালি
ফিরে ফিরে চষছি।

যেটুকু হাতের কাছে যতটা মুঠোর মাঝে তাই দিয়ে
আকাশের রা
সীমাহীন নিঃসীম ; তা দিয়ে ঘোড়ার ডিম ফোটানো
অলৌকিক ঘট
ঘটে না যে ইহলোকে, কেবল তাহার শোকে
বিবাগী হয়ে কে ছোটে কাছাখোলা-বাবাজীর আখড়া
প্রেমের পাথুরে স্মৃতি তাও ফেটে চৌচির আগরায়।

নয়নের জলে আমি বিশ্বাস করি আজো, হাতে হাত
রেখে হই শা
বেকুবেরা চোখ বুজে ফেরে সান্ত্বনা খুঁজে আউড়িয়ে
বেসুরে বেদা
বেদনার গাই গান ফাটে বুক ফাটে প্রাণ
বক্ষে ধরিতে চাই ওষ্ঠ রাখিয়া ভিজা ওষ্ঠে,
আকাশের জ্যোৎস্নাও হার মানে প্রদীপে প্রকোষ্ঠে।

এলোমেলো আঁকাবাঁকা পথ হল ফাঁকা ফাঁকা পথ
হল সুগম প্রশ
জীবনের জয়গান করি আজ ভরি প্রাণ, যে প্রাণ বি
নেবে ত্র
বেঁচে আছি সেই সুখে যারে পাই লই বুকে
তাহারি হিসাব চুকে সেধে সেধে বুকে যারে প
কোনও কাজ কাজ নয়, নেই যাতে সামান্য মাই

অনেক হয়েছে জ্ঞান ঠেকে ঠেকে আরও জ্ঞান হচ্ছে
তারাই ফুরিয়ে গেল পথে যেতে যারা পড়ে মরছে
আমরা চলছি পথ ছুটুক না মনোরথ
লক্ষ্যটা বড় নয় পথের কাদা ও ধুলো সত্যি,
কাটাতু জ্বরের ঘোরে ক'দিন উপোস ক'রে দোহা
আমারে দাও

বুঝিতেছি, গোপালদা ৺বিজয়ার সম্ভাষণ-ছ ফিরিয়া আসিবার সাফাই দিতেছেন। তাই ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরিয়া আসুন।

—

বর্তমান বর্ষের নবেম্বর মাস অর্থাৎ এই মাস বাংলাদেশের দুই কৃতী সন্তানের শতবার্ষিক জন্মোৎসবে মুখর ও আনন্দোচ্ছল হইবার কথা। রাজনীতি-সমাজ-ও-সাহিত্য-চিন্তার অন্যতম অধিনায়ক বাগ্মী ও সাহিত্যিক বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৫৮ সনের ৬ই নবেম্বর (মতান্তরে ৭ই) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এই সংখ্যার অন্যত্র তাঁহার বিরাট জীবনালেখ্যের সামান্য অংশ চিত্রিত করিয়াছি। প্রাচীন ভারত-সংস্কৃতির দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া তিনি স্বদেশকে মুসলমান ও ইংরেজ আমলের পরাধীনতা-প্রসূত জঞ্জালমুক্ত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের মূল মন্ত্র ছিল স্বাধীনতার ভিত্তিতে স্বদেশকল্যাণ। রক্তাক্ত বিপ্লবের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না বটে তবে পরস্বাপহারীর সহিত আপোষও বরদাস্ত করিতেন না। যে রাজনৈতিক ধূম্রজালের মধ্যে বাঁচিয়া থাকিতে তিনি আপতিত হইয়াছিলেন আজ তাঁহার জন্মের একশত বৎসর পরে তাহা অপসারিত হইয়া যে মানুষটিকে আমাদের অনাবিল দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে দেখিতেছি সে মানুষটি ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ সমন্বয়কামী শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রশিষ্য, সমন্বয়ধর্মী। তাই তিনি ব্রাহ্ম হইয়াও বৈষ্ণব, রাজনীতিক হইয়াও সাহিত্যিক, বাগ্মী হইয়াও চিন্তা-নায়ক। তাঁহার একটি অপূর্ব স্বীকারোক্তি 'জেলের খাতা'র "জীবনের হিসাব নিকাশ" অধ্যায় হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :

> আমি কোন গভীর চিন্তাই মনে মনে করিতে পারি না। প্রকাশের প্রয়াসেই আমার চিন্তা পরিস্ফুট হয়, অভিব্যক্তির চেষ্টাতেই আমার অন্তরের ভাব বিকশিত হইয়া উঠে। আপনার মনোভাবকে যখন আপনি দেখিতে চাই, তখনই তাহাকে ভাষায় প্রকাশিত করিতে হয়। এই জন্যই লেখা ও বলা আমার প্রকৃতিগত হইয়া আছে। এই জন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবধি যখনই যাহা লিখিয়াছি, বা যখনই যাহা বলিয়াছি, তার প্রথম পাঠক ও প্রথম শ্রোতা ত আমি নিজেই হইয়াছি। আমি সততই নিজের জ্ঞানলাভের জন্য, নিজের উদ্দীপনার জন্য, নিজের শিক্ষার জন্য, নিজের উন্নতির ও নিজের তৃপ্তির জন্য, লিখিয়াছি ও বলিয়াছি।...
>
> আমার লেখাতে ও বলাতে সর্ব্বদাই আমি নিজেকে শিষ্যরূপে দেখিয়াছি। গুরু' যে কে তাহা ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। তবে ইহা অসংখ্য-বার উপলব্ধি করিয়াছি যে কে যেন অন্তরঙ্গ হইতে, আমার লেখনী বা রসনাকে অবলম্বন করিয়া আমাকে অনেক অদ্ভুত সত্য শিক্ষা দিতেছেন। এজন্য লোকে যাহাকে আমার রচনা বা আমার উক্তি বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ও শুনিয়া আমি নিজেই চমকিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি এবং নিজের লেখা পড়িতে পড়িতে নিজেই কত সময় বিস্ময়ে, আনন্দে ভগবৎ-কৃপা ও ভগবৎ-প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিয়া অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছি।
>
> মনোমধ্যে মনোভাব স্বপ্নের মত, বায়ুর মত, আকাশে তাড়িত বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ড সকলের মত অস্পষ্ট, অস্পৃশ্য ও অগ্রাহ্য ও চঞ্চল হইয়া বিচরণ করে। এই মনোভাবকে যখন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি, তখন তাহা স্থির হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিতে থাকে। ভাষার আবরণে আবৃত হইতে যাইয়া যাহা অসম্বদ্ধ ছিল, তাহা সুসম্বদ্ধ ও ঘননিবিষ্ট হয়, যাহা একাকী ছিল, তাহা অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া, আপনার যথাযথ ওজন বুঝিয়া সংযত হয়; যাহা অসত্য তাহা পরিহৃত, যাহা সত্য তাহা যুক্তিপ্রতিষ্ঠ, ও যাহা সত্যাভাষ মাত্র ছিল, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ভাষার মুকুরেই সত্যের আত্ম-স্বরূপ ও চিন্তার নিজমূর্ত্তি পরিষ্কাররূপে প্রতিবিম্বিত হয়। মনোগত চিন্তা ও ভাব যখন ভাষাতে অভিব্যক্ত হয়, তখনই আমরা তাহার স্বরূপ সাক্ষাৎকার লাভ করি। এই জন্য নিজ জীবনের স্বরূপ যদি দেখিতে হয়, তাহাকে ভাষায় অভিব্যক্ত করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

এই আত্মস্বরূপ উপলব্ধিই বিপিনচন্দ্রকে বক্তা ও লেখক করিয়াছে এবং এই কাজে তিনি কখনও সত্যপথ ভ্রষ্ট হন নাই। তাই নিছক রাজনীতিকের মত বিপিনচন্দ্রকে আমরা কখনই বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে পারিব না, জীবন-দার্শনিকরূপে তিনি চিরকাল আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকিবেন।

—

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ১৮৫৮ সনের ৩০শে নবেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে কত বড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন বিগত আশি বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা নানা ভাবে তাহা বলিয়াছেন, তাঁহার নানা আবিষ্কার জড় ও জীব বিজ্ঞানে কতভাবে যুগান্তর আনিয়াছে বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তাহার চরম ও পরম স্বীকৃতি তিনি পাইয়াছেন। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মহিমা আমাদের সম্যক্ উপলব্ধিবহির্ভূত হইলেও তাঁহার সাহিত্যিক সত্তা যেভাবে 'অব্যক্তে' ব্যক্ত হইয়াছে এবং অধুনা তাঁহার চিঠিপত্রে ব্যক্ত হইতেছে তাহা আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করিতেছে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র একাদশ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশিত "রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী" প্রবন্ধে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তৃতীয় বা সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীতে জগদীশচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :

"তৃতীয় ভাগ, যাঁহারা সমগ্র বিজ্ঞান-বৃক্ষের যাবতীয় শাখা অবলোকন করিয়া এক সূত্র অন্বেষণ করেন, অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখাইয়া দেন। ইঁহারাই প্রকৃত দার্শনিক। ইঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প। ডারবিনের 'পরিণাম-বাদে' আমাদের চিন্তাধারায় এক শৃঙ্খলা আনিয়া দিয়াছে। আমরা সদ্‌বস্তুর পরিণামী উৎপত্তিক্রম স্বীকার করিতেছি। নিউটনের আবিষ্কৃত 'মাধ্যাকর্ষণ' এক্ষণে আরও প্রসারিত হইতেছে বটে, কিন্তু, মূল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে জীব ও অ-জীবের একটা পার্থক্য লক্ষণ ক্ষীণ হইয়াছে; মনে হয় যেন অ-জীবেরও সাড়া দিবার শক্তি আছে। এ বিষয়ে তিনি আমাদের পুরাতন শাস্ত্রকারগণের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন।"

...শুধু "সমর্থন" নয় "প্রমাণ করিয়াছেন" লেখাই সঙ্গত ছিল।

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম চিরস্মরণীয়। এ বিষয়ে ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সহায়ক ছিলেন। বিজ্ঞান চিন্তা ছাড়াও তিনি কি ভাবে স্বদেশের হিত চিন্তা করিতেন 'অব্যক্তে'র "নবীন ও প্রবীণ" নিবন্ধ হইতে দলাদলি-বিষয়ক তাঁহার চিন্তাধারা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

> জীবনের বহু বাধাবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া ও নানা দেশ পরিভ্রমণের ফলে জানিতে পারিয়াছি, সফলতা কোথা হইতে আসে এবং বিফলতা কেনই বা হয়। আমি দেখিয়াছি, যে অনুষ্ঠানে কর্তৃত্ব শুধু ব্যক্তিবিশেষের উপর ন্যস্ত হয়, যেখানে অপর সকলে নিজেদের দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া দর্শকরূপে, হয় শুধু করতালি দেন, না হয় কেবল নিন্দাবাদ করেন, সেখানে কর্ম শুধু কর্তার ইচ্ছাতেই চলিতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্ম যে শক্তি সাধারণে তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছিল, এমন এক দিন আসে, যখন সেই শক্তি সাধারণকে দলন করিবার জন্ম ব্যবহৃত হয়। দেশ বহু দূরে সরিয়া যায় এবং ব্যক্তিগত উদ্দামভাবে চলিতে থাকে। ইহাতে দলাদলি ভীষণ বহ্নি উদ্ভূত হয় তাহা অনুষ্ঠানটিকে পর্যাব করিতে আসে। দলপতি যদি তাঁহার সহকারী কেবল যন্ত্রের অংশ মনে না করিয়া প্র অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে জাগরূক করিয়া তুলিতে করেন তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়।

আজিকার রাজনীতিকেরা জগদীশচন্দ্রের এই যদি পালন করিতে পারিতেন অনেক অবাঞ্ছিত হইতে দেশ রক্ষা পাইত।

শ্রীমান সনৎ গুপ্ত বাঙালী জগদীশচন্দ্রের স্বদেশ পরিচায়ক একটি পুরাতন দলিল আমাদের আনিয়াছেন। গয়ার বিষ্ণুমন্দির আদিতে বৌদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধেরা দাবি জানান। স্বত্ব-নির্ধারণের ১৯০৭ সনের জুন মাসে সিস্টার নিবেদিতা, জগদী বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হন। যতদূর স্মরণ হয় কাউণ্ট ওকা এই দলে ছিলেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি মাননীয় অতিথিদের দেশপ্রেমমূলক স্বরচিত সঙ্গীত গাহিয়া ও নাটকের বিশেষ পড়িয়া শোনান। জগদীশচন্দ্র "দ্বিজেন্দ্র অসাধারণ ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত" হইয়া উঠেন। সনের ২৫শে জুন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বন্ধু ও জীব দেবকুমার রায় চৌধুরীকে এক পত্রে লেখেন, "গত স্বদেশপ্রাণ মনীষী জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে একটা বিবেচ্য পরামর্শ গেলেন।" পরামর্শটি জগদীশচন্দ্রের ভাষায় এই :—

"আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতির চরিতগাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন জন নহেন। এখন এমন আদর্শ বাঙ্গালীকে দে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আ হইয়া আত্মোন্নতির জন্ম আগ্রহান্বিত হয়। আ এই বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অ করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারে একবার সেই আদর্শ এ বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া তাহাদিগকে জীয়াইয়া দাঁড়াইয়া তুলুন।"

ইহারই ফলে কিছুদিনের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল বিখ্যাত "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, দেশ" গানটি রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্রের উপদেশ পরিণত করিতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে

দ্বিজেন্দ্রলাল-সম্পর্কিত স্মৃতিকথায় জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে আমাদের মাতৃভাষার কি যে ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরবনিনাদে ধ্বনিত হইবে।

"ধরণী এক্ষণে দুর্বলের ভার বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার-মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে ?

"ধর্ম্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"

এই প্রসঙ্গে স্মরণ হইতেছে, ১৩৪০ বঙ্গাব্দের (১৯৩৩ খ্রীঃ) শারদীয় সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশের জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রকে আমরা প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছিলাম, বাল্যকালে কোন্ পুস্তকের প্রভাব তাঁহাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি এই লিখিত জবাব আমাদের পাঠাইয়াছিলেন :

"বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্তমান কালেও জীবন্ত ভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন-উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র স্বয়ং বার বার পরাজিত হইয়াও পরাঙ্মুখ হন নাই, কাজেই বিজয়ী হইয়াছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

[৩০ নবেম্বর, ১৯৫৮]

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সে কথা ভুলি নি কেহ অব্যক্তেরে করেছ প্রকাশ ;
উপনিষদের ঋষি ঘোষিল যা বসি ধ্যানাসনে
"চিন্ময় এ বিশ্বসৃষ্টি, জড়ে জীবে একই প্রাণাভাস,"
সে সত্য পড়িল ধরা জ্ঞানী, তব বিজ্ঞান-বীক্ষণে।

কুমুদিনী নিশি জাগে, লজ্জাবতী স্পর্শে পায় ত্রাস,
ক্লান্ত হয় অয়স্কান্ত—হেরিলাম তোমার "নয়নে" ;
আলো-শব্দে তরঙ্গিত সীমাহীন এই মহাকাশ
কী বিচিত্র, কী বিরাট, বুঝাইলে তাড়িৎ স্পন্দনে।

মোদের সীমিত দৃষ্টি অবারিত তোমার কল্যাণে,
তোমার রচিত যন্ত্র প্রসারিল শ্রবণের সীমা,
করেছ রহস্যভেদ ; ঋষি, তব ধ্যানলব্ধ জ্ঞানে
নিখিলের বার্তাবাহী হল শূন্য নিথর-নীলিমা।
তোমারে করিয়া নতি, নব নব জ্ঞানের সন্ধানে
চলে যদি এ ভারত, পূর্ণ হবে তোমার মহিমা॥

জড়ে ও উদ্ভিদে জীবে বহে এক জীবন-প্রবাহ,
বিষে আনে অবসাদ, মাদকে জাগায় উত্তেজনা,
মৃত্যু আনে চিরশান্তি জুড়াইয়া স্নায়ু-চিত্তদাহ—
বিশ্বব্যাপী সমন্বয় হে বিজ্ঞানী, তোমারই ব্যঞ্জনা।

হুজুর হাজির নিজে, তাঁরই লীলা যে দিকেতে চাহ,
আপনি প্রত্যক্ষ করি বিশ্বে তুমি করিলে রটনা ;
যিনি এক অদ্বিতীয় তুমি পেলে তাঁহারই উৎসাহ—
সে কথা ভুলি নি কেহ, হে মনীষী, কভু ভুলিব না।

অব্যক্তে জোগালে ভাষা, অদৃশ্যে করিলে দৃশ্যমান,
দেখালে এ সৃষ্টিমাঝে মানবের সমান ভূমিকা ;
অরণ্যে পর্বতে শূন্যে জলে স্থলে প্রকাশ যে প্রাণ
সর্বত্র হেরিলে তুমি সম স্পন্দমান তার শিখা।
ধরার তমিস্রা মাঝে যে এনেছে আলোর সন্ধান
ললাটে অক্ষয় তার "বিজ্ঞান-লক্ষ্মী"র জয়টীকা॥

—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

* * *

জগদীশ ভট্টাচার্য

॥ দশম অধ্যায় ॥

॥ কবিজায়া মৃণালিনী দেবী ॥

৬

মহাশিল্পী রবীন্দ্রনাথের অচিরস্থায়ী দাম্পত্যজীবন ছিল রসমাধুর্যের দিক দিয়ে 'নব রে নব, নিতুই নব।' 'নৌ বো নৌ;' 'তাজা বো তাজা।' সংসার-জীবনে এই নিত্য-নবীনতার স্বাদবৈচিত্র্য রচনার মধ্যেই কবির শিল্পিসত্তার চরম পরিচয় পাওয়া যাবে। 'শেষের কবিতা'র অমিত বলেছিল, 'লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নতুন ক'রে সৃষ্টি করা চাই। * * অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেই জন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।' বলাই বাহুল্য, এই বর্বরোচিত অবহেলা রবীন্দ্র-জীবনে আশঙ্কনীয় নয়। কেন না তিনি জানতেন দাম্পত্যজীবনের ললিত-কলাবিধিকে কি করে প্রতিদিন নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। শুধু জানতেনই না, এ সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সচেতন এবং সক্রিয় ছিলেন।

অথচ দাম্পত্যপ্রেমৈকসর্বস্ব চেতনাসম্পন্ন মানুষ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। সংসার পাতবার জন্যেই যারা তৈরি হয় তাদের দলভুক্ত করে তাঁর বিধাতা তাঁকে গড়েন নি। এদিক দিয়ে অমিত রায়ের সঙ্গেই যেন ছিল তাঁর জীবনের মিল। এ কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কবি তাঁর নিজের জীবনের আদলেই অমিত রায়ের জীবন রচনা করেছিলেন। অমিতের জীবনে এসেছিল মুখ্যতঃ দুটি নারী—লাবণ্য আর কেতকী। একজন তার ওড়ার আকাশ, আর একজন তার বিশ্রামের নীড়। অমিত বলছে, একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ,—আজ আমি পেয়েছি আ
ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার অ
এই তত্ত্বকেই আর একটি রূপকের সাহায্যে
অমিত বলছে, 'কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ
কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতি
প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যের স
ভালবাসা সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার ন
তাতে সাঁতার দেবে।' যতিশংকর প্রশ্ন ক
আকাশ ও নীড়, এই ঘড়ায় তোলা ও
জল কি একত্রেই মিলতে পারে না?
অমিতের বক্তব্যটি কম তাৎপর্যবান নয়!
'জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কি
যে-মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা
মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভাল,—যে তা না প
তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব
দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড় কম সৌভ
ভাগ্যের সঙ্গে অমিতের এই বোঝাপড়া রসি
দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ যেন অ
কথাই অমিতকে দিয়ে বলিয়েছেন। এ অনুমান
নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'পত্রপুটে'র প
কবিতায়। সেখানে কবির আত্মকথা
আত্মবিশ্লেষণের সহোদর। আপনার স্থান
নিঃশেষে নির্ধারিত করে কবি বলছেন:

একদিন বসন্তে নারী এল সঙ্গীহারা আমার বনে
প্রিয়ার মধুর রূপে।
এল সুর দিতে আমার গানে,
নাচ দিতে আমার ছন্দে,
সুধা দিতে আমার স্বপ্নে।

* * *

ভালবেসেছি তাকে।
সেই ভালবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো।
অন্তরবেগের সেই প্রবাহ
বহে চলেছে প্রিয়ার সামান্য প্রতিদিনের
অতুচ্চ তটচ্ছায়ায়।
অনাবৃষ্টির কার্পণ্যে কখনো সে হয়েছে ক্ষীণ
আষাঢ়ের দাক্ষিণ্যে কখনো সে হয়েছে প্রগল্‌ভ।
তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল
অতি-সাধারণ স্ত্রী-স্বরূপকে
কখনো করেছে লালন, কখনো করেছে পরিহাস,
আঘাত করেছে কখনো বা।
আমার ভালবাসার আর একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহে মনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
জেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চির বিরহের প্রদীপশিখা।

রবীন্দ্রমানসে ভালবাসার এই দু ধারার কথা সর্বদা স্মরণ রেখেই তাঁর হৃদয়াবেগের বিশ্লেষণ করতে হবে। এ কবিতায় শুধু অনিবার্য নিয়তির সঙ্গে বোঝাপড়াই নয়, নিজের মানসপ্রকৃতির কথাও কবি অকপটে বলেছেন। নারী যখন তাঁর চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা জেলে রেখেছে তখনই সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে কবির সর্বদেহেমনে। অর্থাৎ রবীন্দ্র-জীবনে প্রেমের বীণায় যখন বিরহবিপ্রলম্ভের সুর বেজেছে তখনই ফুটে উঠেছে তার মধুরতম গভীরতম রূপ।

তা ছাড়া রোমান্টিক কবিমানসে শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্যের আকর্ষণও কম প্রবল নয়। সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালবাসা এবং সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা সেখানে আপন স্বাতন্ত্র্য নিয়েই পাশাপাশি বাস করে, অথচ তাদের মধ্যে কোন বিরোধও নেই। এ বিষয়ে কবিমানসকে বোঝবার পক্ষে তাঁর 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ডায়ারিটি লেখা হয় রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিলাত-যাত্রার সময়। বিবাহের আট বৎসর পরে, ১৮৯০ সনের আগস্ট মাসে মেজদার সঙ্গে কবি আড়াই মাসের জন্যে দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর পাবার মত কোনও উপাদান রবীন্দ্র-জীবনে রক্ষিত হয় নি। লণ্ডনে পৌঁছেই কবি সেখানে তাঁর 'সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে' গিয়ে আঘাত করেছিলেন সর্বপ্রথমে। বলাই বাহুল্য, সতেরো বৎসর বয়সে তাঁর প্রথম বিলাত-প্রবাসে যে-কিশোরী তাঁর প্রবাস-জীবনের দিনগুলিকে মধুময় করে রেখেছিলেন সেই স্কটদুহিতা মিস কে-র সন্ধানেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন সেই গৃহদ্বারে। কিন্তু জীবনে তিনি আর তার সাক্ষাৎ পান নি। ডায়ারিতে এই ঘটনার কথাও যেমন কবি কুণ্ঠাহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন তেমনিই আর একদিনের কড়চায় বলছেন, 'এখানে রাস্তায় বেরিয়ে সুখ আছে। সুন্দর মুখ চোখে পড়বেই। শ্রীযুক্ত দেশানুরাগ যদি পারেন তো আমাকে ক্ষমা করবেন। নবনীর মত সুকোমল শুভ্র রঙের উপরে একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোঁট, সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘপল্লববিশিষ্ট নির্মল নীলনেত্র দেখে প্রবাস-দুঃখ দূর হয়ে যায়। শুভানুধ্যায়ীরা শঙ্কিত এবং চিন্তিত হবেন, প্রিয় বয়স্যেরা পরিহাস করবেন কিন্তু এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে সুন্দর মুখ আমার সুন্দর লাগে। সুন্দর হওয়া এবং মিষ্ট করে হাসা মানুষের যেন একটি পরমাশ্চর্য ক্ষমতা।'[১] এরই দিন আস্টেক পরে কবি লাইসীয়ম নাট্যশালায় স্কটের উপন্যাস 'ব্রাইড অফ লামারমুর'-এর নাট্যরূপের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। তাঁদের সম্মুখবর্তী একটি বক্সে দুটি মেয়ে বসে ছিল। তাদের একটি ছিল নিখুঁত সুন্দর; রঙ্গভূমির সমস্ত দর্শকের চিত্ত এবং দূরবীন সে আকৃষ্ট করেছিল। কবি সেদিনকার ডায়ারিতে লিখছেন, 'অভিনয়ের সময় যখন সমস্ত আলো নিবিয়ে দিয়ে কেবল স্টেজের আলো জলছিল এবং সেই আলো স্টেজের অনতি-দূরবর্তী তার আধখানি মুখের উপর এসে পড়েছিল—তখন তার আলোকিত সুকুমার মুখের রেখা এবং সুভঙ্গিম গ্রীবা অন্ধকারের উপর চমৎকার চিত্র রচনা করেছিল।

হিতৈষীরা আমাকে পুনশ্চ মার্জনা করবেন—অভিনয়কালে সেদিকে আমার দৃষ্টি বদ্ধ হয়েছিল।'[২] কবির এই অকপট ও অসংকোচ বিবৃতির মধ্যেই এর শুচিতার নিঃসংশয় প্রমাণ রয়েছে। অপাপবিদ্ধ সৌন্দর্যচেতনা শুচিশীলিত কবিমানসের নিত্যসঙ্গী। এর সঙ্গে প্রেমচেতনার কোনও দ্বন্দ্ব নেই। প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্কও নেই। প্রেম-চেতনার ক্ষেত্রেও যে দু-ধারার কথা কবি নিজে পূর্বোদ্ধৃত কবিতায় বলেছেন সে দু-ধারার মধ্যেও তিনি একটি আশ্চর্য সঙ্গতি নিজের জীবনে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন—এখানেই তাঁর জীবনসাধনার অনন্যসাধারণত্ব। চেতনার নিভৃত গভীরে চিরবিরহের প্রদীপশিখা অনুক্ষণ জ্বালিয়ে রেখে তার আলোকেই তিনি তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণের পবিত্র তুলসীমঞ্চে মিলনের সন্ধ্যাদীপটিকে নিত্যপ্রোজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। তরতম-ভেদ অবশ্যই আছে। প্রতিদিনের তুচ্ছতার আবরণে অনুজ্জ্বল দাম্পত্যপ্রেমের ধারা মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিতবাহিনী না হতে পারে; কিন্তু রসিকচিত্তের কাছে গ্রামের চিরপরিচিত নদীটুকুর স্নিগ্ধ বেষ্টনে যে মায়া যে মমতা, তার মাধুর্যও কম আকর্ষণীয় নয়। রবীন্দ্র-জীবনে সীমা ও অসীম, নীড় ও আকাশ চিরদিনের রাখীবন্ধনে বাঁধা পড়েছে। তাঁর মহাজাগতিক চেতনা একদিকে সিন্ধু ও পর্বতমালায় যেমন জীবনের বিরাট স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনই 'একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'র সৌন্দর্যও তাঁকে কম আনন্দ দেয় নি। সেই আনন্দই উচ্ছলিত হয়েছে তাঁর দাম্পত্যজীবনের সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলনের মধ্যে।

আমরা 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'র কথা বলেছি। উদ্ধৃত অংশে তাঁর মনের একটা দিক ফুটে উঠেছে। আর একটা দিকের কথা পাওয়া যাবে সে সময়কার লেখা তাঁর একখানি চিঠিতে। যাবার পথে এডেনের কাছে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ কবিজায়াকে লিখছেন: 'এবারে সমুদ্রে আমার যে অসুখটা করেছিল সে আর কি বলব—তিন দিন ধরে যা-একটু কিছু মুখে দিয়েছি অমনই তখনি বমি করে ফেলেছি—মাথা ঘুরে গা ঘুরে অস্থির—বিছানা ছেড়ে উঠিনি—কি করে বেঁচেছিলুম তাই ভাবি। রবিবার দিন রাত্রে আমার ঠিক মনে হল আমার আত্মাটা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে জোড়াসাঁকোয় গেছে। একটা বড় তুমি শুয়ে রয়েছ আর তোমার পাশে বেলি আমি তোমাকে একটু একটু আদর করল ছোটবৌ মনে রেখো আজ রবিবার রাত্তিরে বেরিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে গেলুম—ফিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করব তুমি আ পেয়েছিলে কিনা। তারপর বেলি খোকা ফিরে চলে এলুম। যখন ব্যামো নিয়ে পড়ে আমাকে মনে করতে কি? তোমাদের ক জন্যে ভারি মন ছটফট করত। আজকাল হয় বাড়ির মত এমন জায়গা আর নেই—ফিরে গিয়ে আর কোথাও নড়ব না।'[৩]

শুধু এই চিঠিতেই নয়, কবির একাধিক যাচ্ছে সংসার থেকে দূরে গেলেই তিনি পত্নী স্বপ্নে দেখছেন; তাদের কাছে পাবার জন্যে বুকে ফিরে আসার জন্যে আকুল হয়েছেন। ' বেলিটাকে স্বপ্নে দেখেছিলুম—সে যেন ষ্টিমা তাকে এমনি চমৎকার ভাল দেখাচ্ছে সে আর 'কাল রাত্তিরে আমি খোকাকে স্বপ্ন দে যেন আমি কোলে নিয়ে চট্‌কাচ্চি, বেশ লা নিষ্প্রয়োজন, এ সব স্বপ্ন কবির গৃহপ্রত্যাবর্তনক পরিচায়ক। শুধু বিদেশে গিয়েই নয়, জমিদারি কবি ঘরে ফেরার ডাক মনের মধ্যে শুনতে ১৮৯১ সনে সাজাদপুর থেকে কবিজায়াকে 'আজ আমার প্রবাস ঠিক এক মাস হল। আ যদি কাজের ভীড় থাকে তাহলে আমি একমাস কাল বিদেশে কাটিয়ে দিতে পারি থেকে বাড়ির দিকে মন টানতে থাকে।'[৪] যেমন কবির কাছে চিরদিনই দুর্বিষহ মনে পত্নীর কাছ থেকে দূরে থাকলে দাম্পত্যজী দিন পর্যন্ত তিনি স্ত্রীর চিঠি পাবার জন্যে থাকতেন। 'মানসী' কাব্যে "পত্রের প্রত্যাশ কবি লিখেছিলেন:

দিবা যেন আলোহীনা এই দুটি
"তুমি ভালো আছ কি না" "আমি ভালো অ
স্নেহ যেন নাম ডেকে কাছে এসে
দুটি কথা দূর থেকে করে কাছাকাছি।

…জীর ডায়ারি'তে একটি বিশেষ পরিবেশে এই …ত্যাশা" কবির মনকে ভারি সুন্দর করে ফুটিয়ে …রোপ থেকে ফেরবার পথে ব্রিন্দিসিতে নেমে …স্থানের এক জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে একটা মাটির ঘরে নেমে দেখলেন, সেখানে সহস্র সহস্র মড়ার …াকারে সাজানো রয়েছে। তা দেখে কবির মনে …থিবীর কত যুগের কত দুশ্চিন্তা, দুরাশা, অনিদ্রা ও …া ওই মাথার খুলিগুলোর, ওই গোলাকার অস্থি …লোর মধ্যে থেকে অব্যাহতি পেয়েছে! এই …গ্য-সৃজনকারী মহামৃত্যুর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবির …গৃহাসক্তির চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল। কবি সেদিন …রিতে লিখছেন : 'যাই হ'ক আপাতত আমার নিজের …ালফলকটার ভিতরে বাড়ির চিঠির প্রত্যাশা সঞ্চরণ …ছে। যদি পাওয়া যায় তাহলে এই খুলিটার মধ্যে …নিকটা খুশির উদয় হবে, আর যদি না পাই তাহলে এই …স্থিকোটরের মধ্যে দুঃখ নামক একটা ব্যাপারের উদ্ভব …, ঠিক মনে হবে আমি কষ্ট পাচ্ছি।'[৫]

'বাড়ির চিঠি' পাওয়ার জন্যে কবিমানসের এই প্রত্যাশা কোনদিনই শিথিল হয় নি। বিবাহের এগার বৎসর পরে শিলাইদহ থেকে কবি স্ত্রীকে লিখছেন : 'তোমাদের মত এমন অকৃতজ্ঞ আমি দেখিনি। পাছে তোমাদের চিঠি পেতে একদিন দেরি হয় বলে কোথাও যাত্রা করবার সময় আমি একদিনে উপরি উপরি তিনটি চিঠি লিখেছি। * * তুমি যদি হপ্তায় নিয়মিত দুখানা করে চিঠিও লিখতে তাহলেও আমি যথেষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করতুম। এখন আমার ক্রমশঃ বিশ্বাস হয়ে আসচে তোমার কাছে আমার চিঠির কোন মূল্য নেই এবং তুমি আমাকে দু-ছত্র চিঠি লিখতে কিছুমাত্র কেয়ার কর না। আমি মূর্খ কেন যে মনে করি তোমাকে রোজ চিঠি লিখলে তুমি হয়তো একটুখানি খুসি হবে, এবং না লিখলে হয়তো চিন্তিত হতে পার, তাভগবান জানেন।' বিশ বৎসরব্যাপী দাম্পত্যজীবনের উপান্ত-বর্ষেও কবি একই সুরে লিখছেন, 'ভাই ছুটি, বড় হোক্ ছোট হোক্ ভাল হোক্ মন্দ হোক্ একটা করে চিঠি আমাকে রোজ লেখ না কেন? ডাকের সময় চিঠি না পেলে ভারি খালি ঠেকে।' এই পত্রখানি কবির দাম্পত্যজীবনের একটি সার্থক সংকেত রূপেই গ্রহণযোগ্য। বিবাহের কুড়ি বৎসর পরেও যে স্বামী তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে 'রোজ একটা করে চিঠি' পাবার জন্যে আকুল হয়ে থাকেন, স্ত্রীর প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ সম্পর্কে অন্য কোনও প্রমাণপঞ্জী খুঁজে দেখা নিতান্তই অনাবশ্যক। শুধু চিঠির প্রত্যাশাই নয়, চিঠি পেলে কবি যে কত খুশী হতেন তার পরিচয়ও পাওয়া যাবে আর একখানি চিঠিতে। কবি লিখছেন, 'ভাই ছুটি, আজ একদিনে তোমার দুখানা চিঠি পেয়ে খুব খুশী হলুম। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবার অবসর নেই …।' এই ফুটকি-চিহ্নিত অংশ চিঠি-পত্রের সম্পাদকের নীতিবোধের তাড়নায় অবলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই এখানে পরিতৃপ্ত কবিচিত্তের ভাবাবেগ বল্গাহীন আদরের ভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। দাম্পত্য-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই উচ্ছ্বাস কবিমানসের সৌকুমার্য ও অনিঃশেষ আসক্তিরই প্রতীক।

সার্থক দাম্পত্যজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি হল সন্তানবৎসলতায়। বাৎসল্য পুরুষের জীবনে সুস্থ পত্নী-প্রেমের মুখ্য সঞ্চারীভাব। সন্তানস্নেহের মধ্য দিয়ে তাই পুরুষের দাম্পত্যজীবনের নতুন পরিচয় পাওয়া যায়। তরুণ কবির জীবনে প্রথম সন্তানস্নেহের সঞ্চার কি ভাবে হয়েছিল তার কথা বলতে গিয়ে কবি তাঁর জ্যেষ্ঠাকন্যা বেলার [তাঁর আদরের বেলিবুড়ি, বেলুরাণু] বিবাহের পর মৃণালিনী দেবীকে লেখা এক চিঠিতে লিখছেন, 'কাল সমস্তক্ষণ বেলার শৈশবস্মৃতি আমার মনে পড়ছিল। তাকে কত যত্নে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছিলুম। তখন সে তাকিয়াগুলোর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে কি রকম দৌরাত্ম্য করত—সমবয়সী ছোট ছেলে পেলেই কি রকম হুঙ্কার দিয়ে তার উপর গিয়ে পড়ত—কি রকম লোভী অথচ ভালমানুষ ছিল, আমি ওকে নিজে পার্কস্ট্রীটের বাড়িতে স্নান করিয়ে দিতুম—দার্জিলিঙে রাত্রে উঠিয়ে উঠিয়ে দুধ গরম করে খাওয়াতুম—যে সময় ওর প্রতি সেই প্রথম স্নেহের সঞ্চার হয়েছিল সেই সব কথা বারবার মনে উদিত হয়।'[৬] 'ছিন্নপত্রের' একখানি চিঠিতেও শিশুর আদর-লোভী কবিপিতার সুকুমার হৃদয়াবেগ অতুলনীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কবি শিলাইদহ থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখছেন : 'এবারকার পত্রে অবগত হওয়া গেল যে, আমার ঘরের কুন্তলমাটি কুন্ত ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান

করতে শিখেছে। আমি সে চিত্র বেশ দেখতে পাচ্ছি। তার সেই নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্মে আমার মুখটা নাকটা তৃষার্ত হয়ে আছে। সে যেখানে-সেখানে আমাকে মুঠো করে ধরে টল্‌মলে মাথাটা নিয়ে হাম করে খেতে আসত এবং খুদে খুদে আঙুলগুলোর মধ্যে আমার চসমার হারটা জড়িয়ে নিতান্ত নির্বোধ নিশ্চিন্ত গম্ভীর ভাবে গাল ফুলিয়ে চেয়ে থাকত, সেই কথাটা মনে পড়ছে।'[৭]

শিশুকন্যার নরম নরম মুঠোর আঁচড়ের জন্মে কবি-পিতার মুখটা নাকটা তৃষার্ত হয়ে আছে—রবীন্দ্রনাথের সংসারজীবনের এই অন্তরঙ্গ ছবিটির দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় কি স্নিগ্ধ লাবণ্যে তাঁর ঘরোয়াজীবন ভরে উঠেছিল। গৃহস্থালী-রচনায় সংসারের খুঁটিনাটি প্রয়োজন এবং গৃহিণীর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও কোনদিনই কবির স্নেহদৃষ্টির অভাব হয় নি। নিজেদের ব্যবহারের জন্মে কবি একটি ঘোড়ার গাড়ি কিনেছিলেন। ওতে চড়ে কবিজায়া বিকেলে বিকেলে বায়ুসেবনে বেরোবেন তা ছিল কবির মনোগত অভিপ্রায়। ১৮৯০ সনে য়ুরোপপ্রবাস থেকে কবি লিখছেন, 'আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে যেন বেশ মোটাসোটা সুস্থ দেখতে পাই ছোটবউ। গাড়িটা তো এখন তোমারি হাতে পড়ে রয়েছে, রোজ নিয়মিত বেড়াতে যেয়ো, কেবলই পরকে ধার দিয়ো না।' কাজের তাড়ায়, বিশেষতঃ জমিদারি পরিদর্শনে বাংলার পল্লীতে পল্লীতে যখন ঘুরে বেড়াচ্ছেন তখনও কিন্তু সর্বদা তাঁর সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে কলিকাতায় পত্নীর স্বাস্থ্যের প্রতি। সাহাজাদপুর থেকে ১৮৯১ সনে লিখছেন, 'আজকাল তুমি দুবেলা খানিকটা করে ছাতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছ কি না আমাকে বল দেখি। এবং অন্যান্য সমস্ত নিয়ম পালন হচ্ছে কি না, তাও জানাবে। আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে তুমি সেই কেদারাটার উপর পা ছড়িয়ে বসে একটু একটু করে পা দোলাতে দোলাতে দিব্যি আরামে নভেল পড়চ।' পতির অনুশাসন বটে, কিন্তু বলাই বাহুল্য হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য দিয়েই গড়া। কখনও কখনও এই মাধুর্যের সঙ্গে মিশেছে কৌতুকের লাবণ্যচ্ছটা। সাহাজাদপুর থেকে আর একখানি চিঠিতে কবি লিখছেন, 'আচ্ছা, আমি যে তোমাকে এই সাহাজাদপুরের সমস্ত গোয়ালার ঘর মাখনমারা ঘেঁর্ত, সেবার জন্মে পাঠি[illegible] কোনরকম উল্লেখমাত্র যে করলে না তা[illegible] দেখি? আমি দেখছি অজস্র উপহার [illegible] কৃতজ্ঞতা-বৃত্তিটা ক্রমেই অসাড় হয়ে আ[illegible] নিয়মিত পনেরো সের করে ঘি পাওয়া[illegible] স্বাভাবিক মনে হয়ে গেছে যেন বিয়ের পূ[illegible] সঙ্গে আমার এই রকম কথা নির্দিষ্ট ছি[illegible] উপাদেয় সন্দেহ নেই; কিন্তু সমস্ত গোয়াল[illegible] উৎকৃষ্ট মাখনমারা ঘেঁর্ত পত্নীর 'সেবার জ[illegible] পাঠাচ্ছেন—এ দৃশ্যটি যেমন হৃদ্য তেমনই উ[illegible]

গৃহিণীর মনোরঞ্জনের জন্মে এইসব অ[illegible] মূলে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত প্রণয়াবেগ সম্পর্কে কা[illegible] ছিলেন তেমনই নিজের কবিস্বভাবের [illegible] কবিজায়ার নানাবিধ দুঃখ ও কষ্টের কারণ [illegible] কবি কখনও ভোলেন নি। একখানি [illegible] লিখছেন, 'একটু সুযোগ পেলেই পরের ক্র[illegible] করা আমার স্বভাব এবং তোমার অদৃ[illegible] চিরজীবন এটা সহ্য করতে হবে। ভর্ৎসনা[illegible] করি আর অনুতাপটা মনে মনে করি, বে[illegible] না।' এর ছ বছর পরে আর একখানি [illegible] 'আমি জানি তুমি আমার জন্মে অনেক [illegible] এও নিশ্চয় জানি যে আমারই জন্মে [illegible] হয়তো একদিন তার থেকে তুমি একটি[illegible] পাবে। ভালবাসার মার্জনা এবং দুঃখস্বী[illegible] ইচ্ছাপূরণ ও আত্মতৃপ্তিতে সে সুখ নেই।'

কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে কবি ইচ্ছে করে গৃ[illegible] করেছেন এমন কথা চিন্তা করলে কবির [illegible] করা হবে না। শত চেষ্টা সত্ত্বেও কবির[illegible] দিয়ে সুখের হতে পারে না, কোন-না-[illegible] তা অভিশপ্ত হবেই, এই যেন কবিজী[illegible] নিয়তি। স্ত্রীকে লেখা একখানি চিঠি[illegible] লিখছেন, 'এমনি এই সংসার! সমুদ্রতী[illegible] তরঙ্গের উপর যখন কবিতা লিখচি তখন জ[illegible] জ্ঞান থাকে না, তখন অনন্ত সমুদ্র অ[illegible] অক্ষরের মধ্যে। আর সেই সমুদ্রের ধা[illegible]

'বাঙলা' বানাতে যাও, তখন এঞ্জিনিয়ার কণ্ট্রাক্টর এষ্টিমেট চিন্তা পরামর্শ ধার এবং টোয়েলভ পার্সেণ্ট সুদ—তার উপরে আবার কবির স্ত্রীর পছন্দ হয় না, লোকসান বোধ হয়—স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কবিত্ব এবং সংসার এই দুটোর মধ্যে বনিবনাও আর কিছুতেই হয়ে উঠল না দেখচি। কবিত্বে এক পয়সা খরচ নেই (যদি না বই ছাপাতে যাই) আর সংসারটাতে পদে পদে ব্যয়বাহুল্য এবং তর্কবিতর্ক।' এই হল কবিজীবনের সাধারণ নিয়তি। স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর কবির স্ত্রীর সন্দেহ উপস্থিত হওয়া এবং তজ্জনিত তর্কবিতর্ক ও ভুলবোঝাবুঝি সংসার-জীবনে শিল্পগোত্র মানুষমাত্রেরই চিরদিনের পাওনা। তা ছাড়া হৃদয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি নিয়ে যার কারবার তার সব কথা সংসারী মানুষকে বুঝিয়ে বলাও সম্ভব নয়। জগতের বিচিত্র তরঙ্গ-আঘাত তার নিভৃত চিত্তমাঝে প্রতি নিমেষে বেজে চলেছে। একের মধ্যে তদ্গতচিত্ত হয়ে বিশ্বকে ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিশ্বভুবন থেকে অনুক্ষণ কত গন্ধ-গান-দৃশ্য তার চিত্তলোকে প্রবেশ করছে, কবি-শিল্পী 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে' গড়ে তুলছে তার মানসী প্রতিমা। বিচিত্রের দূত সে, বিচিত্রের উপাসক। তার চিত্তের অন্তহীন রহস্য তার নিজের কাছেই অপরিজ্ঞেয়। তাই অন্তরঙ্গ প্রিয়জন তার সবটুকু বুঝতে না পেরে তাকে চিরদিনই ভুল বুঝবে। রবীন্দ্রনাথও এ কথা মর্মে মর্মে জানতেন, কিন্তু এই ভাগ্যকে তিনি শুধু শান্ত চিত্তে গ্রহণই করেন নি, প্রিয়ার কাছে নিজেকে যতটুকু সম্ভব অনাবৃত করতেও সর্বদা চেষ্টা করেছেন। পুরীর বাঙলা বানাতে গিয়ে যখন মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর মতভেদ হচ্ছে এবং কবি রসিকতা করে লিখছেন স্বামীর মস্তিষ্কের অবস্থার উপর তাঁর সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, তখনকার একটি কবিতায় কবিচিত্তের ব্যাকুলতা ভাষা পেয়েছে। 'সোনার তরী'তে সংকলিত সেই "দুর্বোধ" কবিতায় কবিপ্রিয়াকে সম্বোধন করে কবি লিখছেন :

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে,
দুটি আঁখি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নতমুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে
তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।
দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না ?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

এ যে সখী সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্ হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী,
এ তবু তোমার রাজধানী।

কবিচিত্ত অন্তহীন রহস্যনিলয় সন্দেহ নেই, কিন্তু এ রাজ্যের আদি-অন্ত কবিজায়ার জানা থাক্ আর নাই থাক্, কবি বলেছেন, 'এ তবু তোমার রাজধানী।' কবিকণ্ঠের এই আবেগগর্ভ স্বীকৃতির মধ্যে কবিচিত্তে কবিজায়ার আধিপত্য ও অধিকারের জয়বার্তাই বিঘোষিত হয়েছে।

৭

কবিচিত্তের, রাজধানীতে কবিজায়া যে একদিন 'রানীর মতন রতন-আসনে' অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এর জন্যে মৃণালিনী দেবীর ভাগ্যকেই শুধু সাধুবাদ দিলে চলবে না, কবিগৃহিণী হিসাবে তাঁর গুণগরিমার কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে। ফুলতলি গ্রামের ফুলি [ওই ছিল তাঁর ছেলেবেলার ডাক-নাম] ঠাকুরপরিবারে এসে মৃণালিনীরূপে রবির আলোয় বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর পিতৃদত্ত ভবতারিণী নামের মধ্যেই যেন তাঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। ভবতারিণীর অন্নপূর্ণা-মূর্তিই তাঁর সত্যকার রূপ। পাতিব্রত্যে তিনি ছিলেন পার্বতী, ভোলানাথের মতই আত্মভোলা কবিস্বামীর সংসার তিনি আগ্‌লে রেখেছিলেন অন্নপূর্ণার মত। গঙ্গাজলের মত নির্মল ছিল তাঁর মন, যেমন সরল তেমনই উদার। সুখে-দুঃখে সম্পদে-বিপদে আত্মীয়পরিজন সবাইকে আপনার করাই ছিল তাঁর স্বভাবধর্ম, সবাইকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করে প্রসন্ন ও প্রশান্ত জীবনযাত্রার দিকেই ছিল তাঁর চিত্তের প্রবণতা। ভাসুরপুত্র বলেন্দ্রনাথ ও নীতীন্দ্রনাথকে তিনি পুত্রাধিক স্নেহেই লালন করেছেন। শ্বশুরকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করতেন। মহর্ষিদেবের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভক্তি ও বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে, শ্বশুরের দোহাই দিয়ে তিনি স্বামীর কাজকর্মে বাধা দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। ঊর্মিলা দেবী বলেছেন, কতবার যে তাঁর মুখে শুনেছি, 'বাবামশায়ের মত এটা নয়, আমি এ কাজ কখনো করব না।' ছোটবৌয়ের প্রতি মহর্ষিদেবেরও স্নেহের অন্ত ছিল না।

স্নেহপ্রবণ মধুর স্বভাবের জন্যে 'ছোটমা' ছিলেন পরিবার ও ভৃত্যবর্গেরও পরম স্নেহময়ী জননী। তাঁর মাতৃহৃদয়ের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন 'সেকালের রবীন্দ্র-তীর্থে'র লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী। 'দেবী মৃণালিনী' তখন থাকতেন শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে। সেখানকার দারোয়ান ও বরকন্দাজদের মধ্যে দুজন ছিল পাঞ্জাবী শিখ। তাদেরই এক আত্মীয় দারুণ অভাবের জ্বালায় দেশ ছেড়ে শিলাইদহে গিয়ে হাজির হয়। তার নাম ছিল মূলা সিং, দেখতে ভীমের মত, আহারেও সে ছিল বৃকোদরের সহোদর। তার দুর্দশার করুণ কাহিনী

'ছোট মাইজী'র কাছে যথাকালে নিবেদি
তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।
সেদিনই তাকে দারোয়ানের কাজে বহাল
মাইনে ধার্য হল পনেরো টাকা। মাই
এলে মাইনের বিষয় পুনর্বিবেচনা হবে। মূ
কূল পেয়ে মনের আনন্দেই কাজকর্ম কর
মাসের শেষে তার মুখখানা বড়ই মলিন হ
বিমর্ষ ভাব মাইজীর দৃষ্টি এড়াল না।
পারলেন মূলা সিংয়ের জঠরজ্বালা নেভাতে
করে আটা লাগে দু বেলায়। মাইনে যা
সব শেষ করে দেয়। বাড়িতে টাকা পাঠ
তখন মূলা সিংয়ের দু মাসও চাকরি হ
বাড়াবার মালিক তিনি নন। তাই
নিজের সংসার থেকে রোজ চার সের আট
জন্যে বরাদ্দ করে দিলেন। মাস তিন-চা
চেষ্টাতেই মূলা সিংয়ের মাইনে বেড়ে কু
কিন্তু তার জন্যে মাইজী তার বরাদ্দ চা
করে দিলেন না। মাতৃস্নেহ দিয়েই এই
খোরাক বরাবর যুগিয়ে যেতে লাগলেন।

শুধু মূলা সিং নয়, করুণাময়ী 'ছো
সবার প্রতিই সমভাবে বর্ষিত হত।
গ্রন্থে 'দেবী মৃণালিনী'র শিলাইদহ-বাস
কুঠিবাড়িতে কবিজায়া একটি সুন্দর শাক
করেছিলেন। তিনি নিজে ওই বাগা
দেখতেন। বাগানের শব্‌জী ও তরকা
উদ্যোগ করে কর্মচারীদের বাড়ি বাড়ি প
সে সময়ে যে সব আমলা সপরিবারে বা
পেতেন না, তাদের জন্যে একটা মেস খুলবা
মৃণালিনী দেবীই এই মেসের জন্যে এস্টেট
পাচকের ব্যবস্থা করে দিলেন। একজন
হল। শুধু তাই নয়, কুঠিবাড়ির বাগানে
সপ্তাহে দুদিন করে মেসে পাঠাবার ব্যবস্থ
দিলেন। বিদেশী আমলাদের প্রায়ই কুঠি
থাকত। 'ছোটমা' নিজে আয়োজন ক
পিঠে-পায়স তৈরি করে নিজের হাতে সবা
করতেন। স্বভাবতই মৃণালিনী দেবী

ছেড়ে আসেন তখন চাকর ও আয়ারা মাতৃহারা সন্তানের মতই অশ্রুপাত করেছে।৮

স্বামী সম্পর্কে কবিজায়ার মনোভাব আমাদের সনাতন পাতিব্রত্যের আদর্শকেই অনুসরণ করেছে। অন্য দেশের কথা জানি নে; আমাদের দেশে পতিসোহাগিনী নারীর দৃষ্টিতে তাঁর স্বামী আত্মভোলা সদাশিব। আমাদের দাম্পত্যজীবনের আদর্শ পার্বতীপরমেশ্বরের যে রূপান্তর আমাদের লোকসাহিত্যে শিব-উমার কাহিনীতে ঘটেছে তা থেকেই এ দেশের মনোভাবটি ধরতে পারা যায়। পাগলা ভোলানাথ সবদিকেই বেসামাল, মাতা অন্নপূর্ণা এই বেসামাল সংসারটিকেও দশ হাতে সামলাবার চেষ্টা করছেন। স্বামীটিকেও আগলাবার দায়িত্ব তাঁর। জানি না হয়তো সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্বের প্রভাবেও এমনটি ঘটে থাকতে পারে। কিন্তু কিছুটা অগোছালো এবং আত্মভোলা হওয়াটাই যেন পুরুষের পৌরুষের লক্ষণ। তা ছাড়া কবিরা শুধু ভোলানাথই নন, তাঁরা নীলকণ্ঠ। জীবনসিন্ধু মন্থন করে যে হলাহল ওঠে তাই নিজের কণ্ঠে ধারণ করে বিশ্বজনকে অমৃত বিতরণের ভার কবিদের উপর বিধাতা ন্যস্ত করেছেন।

মৃণালিনী দেবী তাঁর নীলকণ্ঠ কবিস্বামীকে যে বুঝতেন না তা নয়, কিন্তু পতিগতপ্রাণা নারীর অভিমান তাঁর মধ্যে অবশ্যই ছিল, এবং এ কথাও সত্য যে, অভিমান অনুরাগেরই দোসর। আর অভিমানেরই প্রাকৃত রূপ হল ভুল-বোঝাবুঝি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ভুল-বোঝাবুঝির আভাস পাওয়া যাবে ১৯০০ সনের ডিসেম্বরে লেখা কবির একখানি চিঠি থেকে। কবিজায়া তখন শিলাইদহে, কলিকাতা থেকে কবি লিখছেন, 'তোমার সন্ধ্যাবেলাকার মনের ভাবে আমার কি কোন অধিকার নেই? আমি কি কেবল দিনের বেলাকার? সূর্য অস্ত গেলেই তোমার মনের থেকে আমার দৃষ্টিও অস্ত যাবে? তোমার যা মনে এসেছিল আমাকে কেন লিখে পাঠালে না? তোমার শেষের দু-চার দিনের চিঠিতে আমার যেন কেমন একটা খটকা রয়ে গেছে। সেটা কি ঠিক analyze করতে পারি নে কিন্তু একটা কিসের আচ্ছাদন আছে।'

কিন্তু এ ধরনের অভিমান বা ভুল-বোঝাবুঝির চেয়ে এই অদ্ভুত ও অসামান্য মানুষটি সম্পর্কে কবিজায়ার মনে বিস্ময় ও মমত্তাবোধই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হত। দু-একটি ছোটখাটো ঘটনার উল্লেখ করলেই তাঁর মনোভাবটি স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সৃষ্টির অজস্রতার লগ্নে তিনি একই দিনে তিন-চারখানি গান রচনা করতেন। কথা ও সুরসৃষ্টি চলত একই সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে সে সুর কেউ শিখে না নিলে তিনি একটু পরেই তা ভুলে যেতেন। তাই আশেপাশে সুরের ভাণ্ডারী যাঁরা থাকতেন তাঁদের বলতেন, 'শিগ্‌গীর এসে শিখে নাও, এক্ষুণি ভুলে যাব কিন্তু।' রবীন্দ্রনাথের এই অদ্ভুত স্বভাবটি কবিপ্রিয়াকে বিস্মিত করত। একসময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভগিনী অমলা দেবী এই গানের সূত্রেই কবির পরিবারভুক্ত হয়ে ছিলেন। তাঁর কণ্ঠটি ছিল অসামান্য; কবির সে সময়কার বহু গান তিনিই প্রথম কণ্ঠে তুলে রেখেছিলেন। কবিপ্রিয়া হেসে বলতেন, 'এমন মানুষ আর কখনো দেখেছ, অমলা, নিজের দেওয়া সুর নিজে ভুলে যায়?' কবিও পরিহাসের ভঙ্গিতে বলতেন, 'অসাধারণ মানুষের সবই অসাধারণ হয়, ছোটবউ, চিনলে না তো!'

বোলপুরে আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে শান্তিনিকেতনের অতিথিশালায় কবি মাঝে মাঝে সপরিবারে গিয়ে থাকতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র, কবির চেয়ে বয়সে এক বছরের বড়, দ্বিপেন্দ্রনাথও কখনো সখনো সস্ত্রীক তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। সংসারের ভার ছিল কবিপত্নীর উপর, গৃহকর্মে তাঁর সাহায্য করতেন বৌমা হেমলতা দেবী, আর দ্বিপেন্দ্রনাথ সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করতেন। সংসার চলত সুশৃঙ্খল ভাবে, খাওয়া-দাওয়া হত চমৎকার। কবি তাঁর কাব্যরচনাতেই ডুবে থাকতেন। তারই ফাঁকে সংসার সম্পর্কে হঠাৎ সচেতন হয়ে কবিজায়াকে ডেকে বলতেন, 'লিখতে লিখতে রোজ শুনি চাই ঘি, চাই চিনি, চাই সুজি চিঁড়ে ময়দা, মিষ্টি তৈরি হবে; যত চাচ্ছ তত পাচ্ছ, মজা হয়েছে খুব! দ্বিপু তো কখনও না বলবে না; যত চাইবে ততই দেবে, তার মত কর্তা আর তোমার মত গিন্নী হলে, হয়েছে আর কি, দুদিনেই ফতুর।' কবিপত্নী পাকা গিন্নীর গাম্ভীর্য কণ্ঠে ফুটিয়ে বলতেন, 'দ্বিপু সংসার বোঝে, তার সঙ্গে কাজ করেও সুখ, তোমায় এতে মজর দেওয়া কেন?'

এক স্থানে একসঙ্গে দীর্ঘদিন বাস করা ছিল কবির স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু যেখানেই বাসবদল হোক না কেন, সংসার তো পাততে হবে! অথচ গৃহস্থালীর নিত্য-প্রয়োজনীয় কড়া-খুন্তি হাতা-বেড়ি ঘটি-বাটির বোঝা বয়ে বেড়ানোতে কবির বড় বিরক্তি ছিল চিরকাল। কিন্তু এ সব উপকরণ বিনা গৃহস্থের সংসার একেবারেই চলে না, এ কথা গৃহিণীমাত্রেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। তাই মৃণালিনী দেবী আক্ষেপের সুরে বলতেন, 'দেখ তো বাপু, এমন লোক নিয়ে কি ঘর করা যায়! ফেলে তো যাব সব, এদিকে গিয়েই কিন্তু অতিথি-সমাগমের ধুম পড়ে যাবে!' বন্ধুবান্ধবদের আমন্ত্রণ করে ভুরিভোজের সঙ্গে আপ্যায়ন করা ছিল কবির গৃহবিলাসের একটি বড় দিক। মাঝে মাঝে তাতে বিভ্রাটও ঘটত। একদিন কবি প্রিয়সুহৃৎ কবি প্রিয়নাথ সেনকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এসেছেন। অথচ বাড়িতে এসে পত্নীকে সে কথা বলতে গেছেন ভুলে। এমন কি নিজে যখন খাওয়া-দাওয়া করেছেন তখনও তাঁর সে কথা মনে হয় নি। যথাকালে পরিবারের সবার খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হয়েছে, এমন সময় প্রিয়নাথ এসে উপস্থিত! বিড়ম্বনার একশেষ! কিন্তু অন্নপূর্ণার সংসারে কোনদিনই কোন কিছুর ত্রুটি হবার যো ছিল না! তাঁর গৃহিণীপনার নৈপুণ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই ভোজনপাত্র সুস্বাদু খাবার ও সরস মিষ্টান্নে পূর্ণ হয়ে উঠল।

আহার্য নিয়ে কবির উদ্ভট পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত ছিল না। কখনও কখনও তিনি নিজে এত অল্প আহার করতেন যে তা কবিজায়ার উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠত। অথচ তিনি ভাল করেই জানতেন যত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাই হোক না, কবি তাঁর নিজের খেয়ালের বশেই চলবেন, বরং বারণ করলে তাঁর জেদ আরও বেড়ে যাবে। একটি ঘটনার কথা পাওয়া যাবে রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়। 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা সরলা দেবী কবিকে না জানিয়েই একবার কাগজে ঘোষণা করে দেন যে, পরের মাস থেকে রবীন্দ্রনাথের একটি হাসির নাটক 'ভারতী'তে প্রকাশিত হবে। কবি তখন শিলাইদহে। প্রথমে তো এর জন্যে ভাগিনেয়ীর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু পরদিনই কবিজায়াকে বললেন, তাঁকে যেন খাওয়াদাওয়ার জন্যে বিরক্ত করা না হয়, কেন না তিনি লেখায় ব্যস্ত থাকবেন। কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক গেলাস সরবৎ পাঠালেই চলবে। এই বলে কবি তাঁর রুদ্ধদ্বার গৃহে তিন দিন প্রায় অনশনের মধ্যেই কাটালেন। তৃতীয় দিনের শেষে 'চিরকুমার সভা' লেখা শেষ করে ডাকঘরের ভরসায় না থেকে নাটক নিয়ে ছুটলেন কলিকাতায়। নতুন লেখা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিজনদের পড়ে না শোনালে কিছুতেই কবির তৃপ্তি হত না। কিন্তু তিনদিন প্রায় কিছু না খেয়েই এই অমানুষিক পরিশ্রম করার ফলে কবি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, জোড়াসাঁকোর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। কবিজায়া এই সুযোগ ছাড়লেন না, কবিকে নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করলেন।[১০]

কবির খামখেয়ালী স্বভাবের বোধ করি চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া যাবে তাঁর দ্বিতীয় কন্যার বিবাহে। বড় মেয়ে বেলার বিয়ের অল্পদিন পরেই একদিন কবি এসে বললেন, 'ছোটবউ, রাণীর বিয়ে ঠিক করে এলুম, মাঝে মাত্র তিনটি দিন আছে, তার পরদিনই বিয়ে।' এ সম্পর্কে কবি তাঁর বন্ধু জগদীশচন্দ্রকেও সমসাময়িক এক পত্রে লিখেছেন, 'হঠাৎ আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে। একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম কর। যেদিন কথা তার তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল।' রাণীর বয়স তখন সবে এগারো। এই তাড়াহুড়োয় যে-কোন মানুষই অবাক হবে। কবিপ্রিয়া বললেন, 'তুমি বল কি গো? এরি মধ্যে মেয়ের বিয়ে দেবে? তাছাড়া মাত্র তিন দিনের মধ্যে সব যোগাড়ই বা হবে কি করে?' কবি খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে সুর নামিয়ে অসহায়ের ভঙ্গিতেই বললেন, 'হবে হবে, সব হবে, শুধু তুমি একটু প্রসন্ন মনে কাজে লেগে যাও তো ছোটবউ, সব ঠিক হয়ে যাবে।' বলাই বাহুল্য, এর পর আর কোন অনুযোগ করার উপায় থাকে না।

৮

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের এই অদ্ভুত দিকগুলি তাঁর মিতাচার ও সুচারু জীবনচর্যার ফলে কোনদিনই মাত্রাতিরেকী হয়ে উঠতে পারে নি। সাধনাধন্য তাঁর জীবনে প্রেয়োবোধের সঙ্গে চিরদিনই শ্রেয়োবোধের সুন্দর

[ম]িলন ঘটেছে। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের বিচার-[প্র]সঙ্গে দাম্পত্যপ্রেমের যে পূর্বমিলন ও উত্তরমিলনের [ক]থা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁর জীবনেও সেই পূর্ব-[মি]লন ও উত্তরমিলনের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হয়ে [উ]ঠেছিল। গাজিপুর-প্রবাসকালেই কবিমানসে শ্রেয়োবোধে [প্র]বুদ্ধ জীবনসাধনার স্বপ্ন কাব্যে রূপ গ্রহণ করতে দেখা [যা]য়। তখন থেকেই দেশের জন্য আত্মোৎসর্জনের আদর্শ তাঁর [চি]ন্তাকে আবিষ্ট করে রেখেছে। "গুরুগোবিন্দ" কবিতাটি (২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) তারই ইঙ্গিত। শিখজাতির জীবনে [য]খন সংকট-লগ্ন চলছে তখন গুরুগোবিন্দ নির্জন অরণ্য-[ব]াসে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিলেন। অনুচরবৃন্দ যখন [ত]াঁকে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানাল তখনও তিনি বলছেন—

চারিদিক হতে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে।

কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—
'পেয়েছি আমার শেষ।
তোমরা সকলে এস মোর পিছে,
গুরু তোমাদের সবারে ডাকিছে,
আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগো রে সকল দেশ।'

এই কবিতা লেখার পাঁচ বৎসর পরে ১৩০০ সালে লেখা 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধেও কবি বলেছেন, গুরু-গোবিন্দের মত 'আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে।' দেশের ডাকে কবি নিজেকেও এই আদর্শেই গড়ে তোলার সাধনা করছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে শিলাইদহ থেকে স্ত্রীকে লিখছেন, 'স্ত্রী-পুরুষের অল্প বয়সের প্রণয়মোহে একটা উচ্ছ্বসিত মত্ততা আছে, কিন্তু এ বোধ হয় তুমি তোমার নিজের জীবনের থেকেও অনুভব করতে পারচ—বেশি বয়সেই বিচিত্র বৃহৎ সংসারের তরঙ্গ-দোলার মধ্যেই স্ত্রীপুরুষের যথার্থ স্থায়ী গভীর সংযত নিঃশব্দ প্রীতির লীলা আরম্ভ হয়।' এই চিঠিতেই তিনি তাঁর দাম্পত্য জীবনাদর্শকে ভাষা দিয়ে বলছেন, 'আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ ও সরল হোক্, আমাদের চতুর্দিক প্রশান্ত ও প্রসন্ন হোক্, আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য ও কল্যাণপূর্ণ হোক্, আমাদের অভাব অল্প উদ্দেশ্য উচ্চ চেষ্টা নিঃস্বার্থ এবং দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্—এবং যদি বা ছেলেমেয়েরাও আমাদের এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে ক্রমশঃ দূরে চলে যায় আমরা দুজনে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মনুষ্যত্বের সহায় এবং সংসারক্লান্ত হৃদয়ের একান্ত নির্ভরস্থল হয়ে জীবনকে সুন্দরভাবে অবসান করতে পারি।'

'আমাদের সংসারযাত্রা আড়ম্বরশূন্য ও কল্যাণপূর্ণ হোক্,...দেশের কার্য আপনাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক্'—এই আদর্শে প্রবুদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মিলনকেই আমি উত্তরমিলন বলেছি। রবীন্দ্রনাথ শুধু অলস ভাববিলাসী কবিমাত্রই ছিলেন না, আদর্শকে বাস্তবীভূত করে তোলার সাধনায় তাঁর উদ্যম ছিল ক্লান্তিহীন। তিনি বুঝেছিলেন কলিকাতার নাগরিক জীবনের উন্মত্ততায় তাঁর সাধনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে না। নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাসের পক্ষে পল্লীর নির্জনতাই তাঁর কাছে চিরদিন শ্রেয় বলে মনে হয়েছে। স্ত্রীকে লিখছেন, 'কলকাতার ভিড়ে আমার জীবনটা নিষ্ফল হয়ে থাকে, * * * কোনকালেই আমি কলকাতায় নিজের সমস্ত শক্তিকে গোর দিয়ে থাকতে পারব না।' সংসার-রচনার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে কবি সর্বদা শহর থেকে দূরেই বাসস্থান নির্বাচন করেছেন। গাজিপুর, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন কবিজীবনে আকস্মিকভাবে আসে নি। পর্যায়ক্রমে এই তিনটি স্থান কবিমানসের বিবর্তনের তিনটি প্রতীক বলেই গৃহীত হতে পারে।

গাজিপুর থেকে ফিরে আসার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের মেজদা ও মেজবৌঠানের কাছেই বেশীর ভাগ সময় রাখা পছন্দ করতেন। কবিজীবনের এই পর্বেও সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনীর প্রভাব ফলপ্রসূ হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সোলাপুরে চাকরি করছেন। মৃণালিনী দেবী তাঁর শিশুদের নিয়ে প্রায়ই সেখানে থাকতেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে [বাংলা ১৩০৪ সাল] সত্যেন্দ্রনাথ সিভিল সার্বিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এদিকে ১৩০৩ সালে ঠাকুরবাড়ির জমিদারি পার্টিশন নিয়ে নানা সাংসারিক অশান্তি শুরু হয়। মহর্ষিদেব মৃত্যুর পূর্বে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের যথোচিত প্রাপ্য ন্যায্য ভাবে বণ্টন করে দেবার জন্যে উদগ্রীব হওয়ায় এজমালি জমিদারির ভাগ-বাঁটোয়ারা এই সময় সম্পন্ন হয়। সে সময় কবি ঘরে বাইরে নানা দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত। কবিজায়া সংসারের নানা উপদ্রবে অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কবি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখলেন, 'আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণমন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃত পল্লীগ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে এত উৎসুক হয়েছি।' ১৩০৫ সাল থেকে কবি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নিয়ে শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বসবাস শুরু করলেন। এর পূর্বেও কবিজায়া একাধিকবার এখানে এসেছেন, কিন্তু এখন থেকে বৎসর তিনেকের জন্যে শিলাইদহেই গড়ে উঠল তাঁদের স্থায়ী সংসার। সন্তানের শিক্ষার কথাও কবিকে বিশেষ ভাবে ভাবতে হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন, কলকাতায় 'রথীদের উপযুক্ত শিক্ষা কিছুতেই হয় না—সকলেই কি রকম উড়ুউড়ু করতে থাকে।' তাই শিলাইদহে গৃহবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে কবি সন্তানদের জন্যে গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করলেন।

শিলাইদহ কিন্তু কবিজায়ার ভাল লাগে নি। সে কথা জেনে কবি বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠায় মাস কয় আগেও তাঁকে লিখছেন, 'ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা চিন্তা করে তোমাদের এই নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। এর পরে যখন সামর্থ্য হবে তখন এর চেয়ে ভাল জায়গা বেছে নিতে হয়ত পারব।' শিলাইদহ-পর্ব অজস্র সৃষ্টির দিক দিয়ে কবিজীবনে অবিস্মরণীয়। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তার সঙ্গে সুখ এবং দুঃখ দুয়েরই স্মৃতি জড়িত। কবির দৃষ্টিতে তুলনায় দুঃখের চেয়ে সুখটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু কবিজায়ার পক্ষে শিলাইদহ ছিল সত্যসত্যই 'নির্বাসন।' কবিও সেকথা অনুভব করে একখানি চিঠিতে লিখছেন, 'কাল বসে বসে মনে পড়ছিল এই ছাদের উপর তোমার অনেক মর্মান্তিক দুঃখের সন্ধ্যা ও রাত্রি কেটেছে—আমারও অনেক বেদনার স্মৃতি এই ছাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।'

এই 'মর্মান্তিক দুঃখে'র 'নির্বাসন দণ্ড' থেকে কবি তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করলেন ১৩০৮ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ। শিলাইদহ ছেড়ে আসার পরে কবি স্ত্রীকে এক চিঠিতে লিখছেন, 'শিলাইদহ এখন তেমন ভাল অবস্থায় নেই। শিশিরে সমস্ত ভিজে রয়েছে; বেলা আটটা পর্যন্ত কুয়াশা, সন্ধ্যার পরে হিম—কুয়ো এবং পুকুর দুয়েরই জল যাচ্ছে-তাই—চারদিকেই ম্যালেরিয়ার ধুম—আমরা ঠিক [সময়েই] শিলাইদহ ত্যাগ করেছি—নইলে ছেলেদের নিয়ে ব্যামো হয়ে বিপদে পড়তুম। বোলপুর এর চেয়ে ঢের বেশী নির্মল ও স্বাস্থ্যকর। কিন্তু গোলাপ যে কত ফুটেছে তার সংখ্যা নেই। খুব বড় বড় ভাল ভাল গোলাপ। বাবলা ফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। পুরাতন বন্ধু শিলাইদহ এই চিঠির সঙ্গে তোমাকে তার কয়েকটা বাবলা পাঠাচ্ছে।'

বোলপুরে আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে [১৩০৮ ৭ই পৌষ] কবিজীবনে মহত্তম কর্মযজ্ঞের শুরু হল। আমরা অন্যত্র একে 'বিশ্বজিৎ যজ্ঞে'র সঙ্গে তুলনা করেছি। বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণা যজমানের সর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথকেও শান্তিনিকেতনে আয়োজিত বিশ্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ তাঁর সর্বস্বই দান করতে হল। বিশ্বজীবনে উত্তরণের এই যজ্ঞহোমানলে কবির প্রথম আহুতি হল তাঁর সংসার-জীবন। আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঠিক এগারো মাস পরে ১৩০৯ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হল।

স্বামীর এই মহত্তম জীবনযজ্ঞে সুদক্ষিণা ধর্মপত্নীর ব্রত গ্রহণ করলেন মৃণালিনী দেবী আশ্রম-বিদ্যালয়ের আশ্রম-জননীরূপে। প্রথমেই তিনি যথাসর্বস্ব তুলে দিলেন স্বামীর হাতে—তাঁর সমস্ত স্বর্ণালঙ্কার। কবির বহু সাধের সমুদ্র-নিবাস 'পুরীর বাংলা'র বিক্রয়লব্ধ অর্থের সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীর অলংকার-বিক্রয়-করা অর্থও যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রারম্ভিক তহবিল। আশ্রমের বিদ্যার্থি-সঙ্ঘের পুরোভাগে পাঠাতে হল জ্যেষ্ঠপুত্রকে। রবীন্দ্রনাথ সাজলেন নগ্নপদ গৈরিকধারী বালব্রহ্মচারী। আশ্রমপিতা নির্দেশ দিলেন পুত্রকেও গিয়ে থাকতে হবে আশ্রমের অন্যান্য বিদ্যার্থীর সঙ্গে। কৃচ্ছ্র সাধনায় একজোড়া কম্বল মাত্রই সম্বল করে পুত্র মাতৃক্রোড় ছেড়ে উঠলেন গিয়ে আশ্রমকুটীরে। মৃণালিনী দেবীর মাতৃহৃদয় সেদিন নিশ্চয়ই

(১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রসঙ্গ কথা

সাহিত্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

নারায়ণ চৌধুরী

আজ সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সাহিত্য এক মহা বিপদের সম্মুখীন। সে বিপদ হল সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধিকার ক্রমবিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা। শুধু আশঙ্কা বললে বোধ হয় বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে সবটুকু আভাস দেওয়া হয় না, একাধিক ক্ষেত্রে এ আশঙ্কা ইতোমধ্যেই বাস্তব ঘটনায় রূপান্তরিত হয়েছে। সাহিত্যের পক্ষে এ যে কত বড় দুর্দিনের সূচনা তা বলে বোঝানো যায় না।

সাহিত্যের উপর রাজনীতির প্রভাবের কথা আমরা জানি। গত তিন দশক সময়ের মধ্যে এদেশে এবং বিদেশে সাহিত্যের উপর রাজনীতির প্রভাব ক্রমবিস্তৃত হয়েছে। সমাজচৈতন্যের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের নামে কোন কোন গোষ্ঠী যেমন সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির এই সম্পর্ককে অভিনন্দন জানিয়েছে তেমনই আবার অনেক চিন্তাশীল মনীষী ও শিল্পনিষ্ঠ ব্যক্তি এই অবস্থায় শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। রাজনীতিকে 'রাহু' আখ্যা দিয়ে সাহিত্য থেকে তাকে একেবারে বেমালুম বর্জন করবার যুক্তি (যেমন কেউ কেউ আধুনিক বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে দিয়েছেন) অবশ্য সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু রাজনীতি বস্তুটি বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শের সচেতনতা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ না থেকে যদি উগ্র দলীয় মতের আকারে বহুপ্রচারিত 'সোস্যাল রিয়ালিজম'-এর রন্ধ্রপথে সাহিত্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে তা হলে তার ফল যে সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। এ কথার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য আমাদের বেশী দূরে যাবার প্রয়োজন নেই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গত পঁচিশ-তিরিশ বছরের কার্যকলাপের দিকে এক-নজর তাকালেই আমরা তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারব। 'শৌখীন আর নকল মজদুরির' চর্চায় সাম্প্রতিক সাহিত্যের যে ক্ষতি হয়েছে তার বুঝি তুলনা নেই।

কিন্তু এখন তো শুধু রাজনীতির বিপদই নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিপদ। রাজনীতির কলি এখন আরও সূক্ষ্মদেহী হয়ে রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণাধিকারের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। যা ছিল রাজনীতির থিয়োরী মাত্র, তা এখন রাষ্ট্রের আচরণে পর্যবসিত হয়েছে। সাহিত্যের উপর রাজনৈতিক অপপ্রভাবের এমনতর ঘনীভূত রূপের সঙ্গে আমরা পূর্বে পরিচিত ছিলাম না।

এই অবাঞ্ছিত অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে তখন থেকে, যখন থেকে কোন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাঠামো নির্মাণের আদর্শ কার্যতঃ রূপায়িত হতে শুরু হয়েছে। এখন আর সাহিত্যের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক শুধু বেসরকারী স্তরেই সীমাবদ্ধ নেই, তা কোন কোন দেশে সরকারী স্তরেও সম্প্রসারিত হয়েছে এবং তা বেশ জবরদস্ত ভাবেই হয়েছে। এর ফলে যে সাহিত্যে ঘোরতর দুর্দিনের সূচনা হয়েছে তার আভাস পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। অবশ্য রাষ্ট্রনৈতিক দর্শন বা ভাবাদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র নির্মাণের আদর্শ এই যে প্রথম পরিগৃহীত হল তা নয়; পশ্চিম ইউরোপে বা আমেরিকায় যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রচলিত তারও মূলে আছে একটি রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের প্রভাব—সে দর্শনের নাম বুর্জোয়া গণতন্ত্র। কিন্তু এ রাষ্ট্রিক সংগঠনের কাঠামো আঁটসাঁট নয়, অনেকটা ঢিলেঢালা শিথিল তার বিধিব্যবস্থার বিন্যাস। বিশেষতঃ শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ বিন্যাস আরও শিথিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শে গঠিত রাষ্ট্রগুলির আর যত দোষই থাক, তার সামাজিক-অর্থনৈতিক বিশেষ কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে সে সব দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক সম্প্রদায় যে এখনও যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে এ সত্য স্বীকার না করলে বাস্তবের অপলাপ করা হবে। কিন্তু সার্বিক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনের ছাঁচে গঠিত রাষ্ট্রগুলির বেলায়

তা নয়। সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব-ইউরোপের অন্যান্ত রাষ্ট্রগুলিতে ও তথাকথিত নয়া চীনে শিল্প-সাহিত্যের উপর রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের একাধিক সাম্প্রতিক নজীর ওই রাষ্ট্রগুলিতে শিল্পী শ্রেণীর মানুষের ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তাহীনতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রীক্রুশভের শাসন-আমলে শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ পূর্বের তুলনায় অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করছেন বলে বলা হলেও এবং নয়া চীনে 'শত-পুষ্পবৈচিত্র্য' ('Let hundred flowers bloom together, let hundred schools contend') ওই রাষ্ট্রের শিল্পনীতি হিসাবে প্রকীতিত হলেও কার্যতঃ সেখানে বিপরীত দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নেই। এ কথা যে কথার কথা নয় তার প্রমাণ চীনা লেখিকা তিংলিংয়ের প্রতি নয়া চীন সরকারের ও এ বৎসর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রুশ লেখক বরিস পাস্তারনাকের প্রতি সোভিয়েট সরকারের বিসদৃশ আচরণে হাতেনাতেই পাওয়া গেছে। ইতঃপূর্বেও একাধিক লেখক পূর্ব-ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে অনুরূপ কারণে নির্যাতিত হয়েছেন; আমরা এই ক্ষেত্রে সুপরিচিত উপন্যাস 'Not by Bread Alone'-এর রচয়িতা সোভিয়েট লেখক ডুনিন্‌ৎসিয়েভ ও যুগোশ্লাভ লেখক মিলোভান জিলাসের নামোল্লেখ করতে পারি। মার্ক্সীয় একনায়কত্বশাসিত রাষ্ট্রগুলিতে শিল্পী-সাহিত্যিকের স্বাধীনতা যে হারে অবদমিত ও ক্ষুণ্ণ হয়ে চলেছে তাতে ওই সকল রাষ্ট্রে শিল্পী-সাহিত্যিকদের হাল যে শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে তা ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

গত দুই-দুইটি মহাযুদ্ধে আমরা বিজ্ঞানীদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি, এখন রাষ্ট্রশাসনের চাপে লেখকশ্রেণীর নিরুপায়তার কাল। এই জুলুমের প্রক্রিয়া প্রতিরুদ্ধ না হয়ে কালে কালে আরও তীব্র হবে এবং শিল্প-সংস্কৃতির নূতন নূতন এলাকায় সম্প্রসারিত হবে এই লক্ষণ আজ স্পষ্ট। মোট কথা, সমগ্র বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরই আজ ঘোরতর দুর্দিন সমাগত। শুধু যে পূর্ব-ইউরোপের দেশ কিংবা নয়া চীনেই এই বিপদ সীমাবদ্ধ থাকবে এমন মনে করবার হেতু নেই, ধীরে ধীরে এই দৃষ্টান্ত অন্যত্রও প্রভাব বিস্তার করবে, কম্যুনিস্ট প্রভাব-পরিধির বাইরেকার কোন কোন দেশে ইতোমধ্যে করেছেও। কম্যুনিস্ট শাসিত দেশই হোক আর বুর্জোয়া গণতন্ত্র শাসিত দেশই হোক, কেন্দ্রিত শক্তির অত্যাচার-সম্ভাবনা যেখানেই আছে সেইখানেই শিল্পী-সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণের খড়্গ ঝুলছে বলা যেতে পারে। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির একতরফা সমালোচনায় কোন লাভ নেই—ওতে দুই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে একটির প্রতি পক্ষপাত আর অন্যটির প্রতি বিমুখতাই শুধু বোঝায় এবং তদ্দ্বারা রাজনৈতিক মতসংঘর্ষকেই আরও বেশী জোরালো করা হয়, এই পক্ষপাতী বা প্রতিকূল মনোভাবের উর্ধ্বে উঠে রাজনীতি-নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সমগ্র অবস্থাটিকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। রাজনীতির সচেতনতা থাকবে না তা নয়, কিন্তু রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বী দৃষ্টি থাকবে না। এমনতর মানসিক অবস্থায় পৌঁছুলে দেখা যাবে, শিল্পী-সাহিত্যিকের বিপদ আজ সব দেশে, কোথায়ও এই বিপদাশঙ্কা বেশী কোথায়ও কম। এটি এ যুগের একটি প্রধান সঙ্কট। এই সঙ্কট অতিক্রম করার কৌশল অধিগত না হলে ভবিষ্যতে শিল্প-সাহিত্য আর দশটা মামুলী জীবিকার মত নিছক বৈশ্য ব্যসনে পরিণত হবে, তার আর আত্মিক বা আধ্যাত্মিক জোর থাকবে না। বস্তুতঃ সাহিত্যে আত্মনিয়োগের মূল প্রেরণাটাই তখন অন্তর্হিত হবে—শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যস্পৃহার ভরাডুবি ঘটবে। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গোটা ইমারতটাই দাঁড়িয়ে আছে স্বাতন্ত্র্যের আর বৈচিত্র্যের বুনিয়াদের উপর। স্বাধীনতা এর ভিত্তিগাত্র। ওই ভিত্তিগাত্রে ফাটল ধরলে ইমারত ধ্বসে পড়তে বেশী সময় লাগবে না।

এত কথা হয়তো একসঙ্গে মনে জাগত না, যদি না সোভিয়েট রাষ্ট্রে বরিস পাস্তারনাকের সাম্প্রতিক লাঞ্ছনার ঘটনায় আমাদের মন সবেগে নাড়া খেত। অবশ্য এ-জাতীয় শঙ্কা আমাদের মনের পটভূমিতে পূর্বেও বিদ্যমান ছিল কিন্তু বর্তমানের ন্যায় তা বোধ হয় আর কখনও এতটা তীব্রতাপ্রাপ্ত হয় নি। প্রত্যুত, বরিস পাস্তারনাকের নিগ্রহের দৃষ্টান্তে পৃথিবীর দেশে দেশে শিল্পীসমাজ প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়েছে। ঘটনাটি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সৎ ও মহৎ

সাহিত্যের স্রষ্টা হয়েও শিল্পী আজ রাষ্ট্রের স্বেচ্ছাচারের পেষণে কী নির্মমভাবে পিষ্ট ও উপক্রুত। এখনও আমরা পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে সজাগ হয়ে উঠেছি কিনা সন্দেহ। সন্দেহ প্রকাশের কারণ আছে। কারণটা বলি।

কলকাতার একটি দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেশ থেকে নির্বাসিত হবার আশঙ্কায় (সেই সঙ্গে নিশ্চয় প্রাণভয়েও) শ্রীক্রুশভের নিকট পাস্তারনাকের মার্জনা-ভিক্ষার সংবাদে পাস্তারনাককে অতি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। পাস্তারনাক ভীরু কাপুরুষ ইত্যাকার নানা বিশেষণে বিশেষিত করে সাহিত্যের অজেয়তা অমরতা সম্পর্কে এক দীর্ঘ বক্তৃতা ফাঁদা হয়েছে ওই নিবন্ধে। কিন্তু বহু দূরবর্তী দৈনিক সংবাদপত্রের আপিসের নিরাপদ ব্যবধানে বসে সাহিত্যের অজেয়তা আর শিল্পীর ব্যক্তিস্বাধীনতার পবিত্রতা সম্পর্কে ফতোয়া জারি করা সহজ, কিন্তু পাস্তারনাককে আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সরকারী ও বেসরকারী দুই স্তরে যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তার স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা থাকলে সম্পাদকীয় লেখক পাস্তারনাককে ভর্ৎসনা করার আগে তিনবার চিন্তা করতেন। আমরা সমস্যার দুরূহতা সম্পর্কে সচেতন নই বলেই শিল্পীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কে এমনতর হালকা উক্তি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এ শুধু লেখনীর চুলবুলুনি মাত্র, প্রকৃত অবস্থার সজাগতার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

দেখা যাচ্ছে, সাম্যবাদী একনায়কত্ব শাসিত রাষ্ট্রগুলিতে যেখানেই রাষ্ট্রের অনুমোদিত মতের সঙ্গে সাহিত্যিকের মতের সংঘর্ষ ঘটছে সেখানেই শেষোক্ত জনকে কোন-না-কোন ভাবে হয়রান হতে হচ্ছে। এ নিগ্রহ কখনও লেখক-অধিকার কেড়ে নেবার আকারে আসে, কখনও আসে নির্বাসনদণ্ডের আকারে, কখনও এর চেয়েও সাংঘাতিক পরিণাম লেখকের জন্য অপেক্ষা করে থাকাটা আশ্চর্য কিছু নয়। এ ছাড়া নানাপ্রকার মনস্তাত্ত্বিক চাপ তো আছেই। এত বিভিন্ন রকমের চাপ সহ্য করে লেখকের পক্ষে লেখক-অস্তিত্ব বজায় রাখা অতি সুকঠিন ব্যাপার। লেখকের শিল্পীসত্তা যত অজেয়ই হোক তাঁর প্রতিরোধ-ক্ষমতা যত অনমনীয়ই হোক, যেখানে পরিস্থিতি সব দিক থেকে প্রতিকূল সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতার মুখে লেখক তাঁর আত্মার শক্তি নিয়েও কতটা কী করতে পারেন। এক পারেন বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করতে, নয়তো, রাস্তা খোলা থাকলে, অন্য দেশে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করতে। কিন্তু শেষোক্ত বিকল্প রাস্তাটিও যে বেশীদিন উন্মুক্ত থাকবে এমন সম্ভাবনা অল্প। তা ছাড়া বিপদ তো শুধু কম্যুনিস্ট দেশেই নয়, অন্যত্রও বিপদাশঙ্কা ঝুলছে। স্বীয় স্বাধীন মতের অনুবর্তী বিজ্ঞানী শিল্পী সাহিত্যিক ও মনীষীদের প্রতি পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন গভর্মেণ্টের আচরণও খুব প্রশংসার্হ নয়। সারা পৃথিবীটাই সত্যাশ্রয়ী লেখকদের পক্ষে কারাগার হয়ে উঠল বলে।

বলা হবে কোন গভর্মেণ্টই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিরোধী কার্যকলাপ বরদাস্ত করতে পারে না, তা সে কার্যকলাপ শিল্পীরই হোক আর বিজ্ঞানীরই হোক। কিন্তু কোন্‌টা রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ আর কোন্‌টা নয় তা স্থির করবে কে? কূটনৈতিক বুদ্ধি ও তথাকথিত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতাযুক্ত তৃতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্র-ধুরন্ধরের দল? প্রতিভায় ও বুদ্ধিতে বহুগুণে নিকৃষ্ট একজন রাষ্ট্রচালক একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পীকে বিচার করবার স্পর্ধা করে কোন্ শক্তির জোরে? শ্রীক্রুশভ শাসনতান্ত্রিক স্তরে পাস্তারনাকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারেন কিন্তু তিনি তাঁর শিল্পকর্মের বিচারক হতে পারেন না। সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টিকেও এ এক্তিয়ার কেউ দেয় নি। সাধারণতন্ত্রী চীনের অধিনায়ক শ্রীমাও-সে-তুং স্বয়ং সাংবাদিক ও লেখক বলে জানি, তাই বলে সকল চীনা লেখকের হয়ে তাঁদের সকলের পক্ষে প্রযোজ্য শিল্পনীতি নির্দেশের দায়িত্ব পালনের মত সব্যসাচিত্ব নিশ্চয় তিনি অর্জন করেন নি। এ শুধু শক্তির মত্ততার বশে অনধিকারে অধিকার প্রয়োগ বই নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে রাষ্ট্র-পরিচালনার ক্ষেত্রে আপাত-প্রতীয়মান দুর্বলদের ঘিরে প্রবলদের এই শক্তির আস্ফালন চলছে। শক্তির এই বাহ্বাস্ফোটকে ঠেকাবার উপায় এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি, আর তা হয় নি বলেই রাষ্ট্রনায়কদের হতে স্বাতন্ত্র্যপ্রয়াসী শিল্পী-সাহিত্যিকদের লাঞ্ছনা আজও অবধি অব্যাহতই থেকে যাচ্ছে। এ বর্তমান সঙ্কটের

এক তাজ্জব ব্যাপার যে, দেশে দেশে যাঁরা শাসনশীর্ষে অধিষ্ঠিত তাঁরা গুণে জ্ঞানে অনেকেই সাধারণ মাপের মানুষ, শুধু দলবদ্ধতা আর কূটনৈতিক কৌশলে ক্ষমতায় সমারূঢ় হয়ে রয়েছেন। লৌকিক অর্থে তাঁদের কর্মদক্ষতা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু প্রতিভাবান শিল্পীর কল্পনার দূরদৃষ্টি কিংবা চিন্তাশীল মনীষীর ভূয়োজ্ঞানের অধিকারী হবেন তাঁরা কোন্ জাদুদণ্ড প্রভাবে? রাষ্ট্র তো শুধু কাজেরই সমবায় নয়, সে কার্যের পশ্চাতে সুচিন্তিত নীতি আর পরিকল্পনারও আবশ্যক। সে নীতি নির্ধারণ করবে কে? কল্পনাকুশলতাহীন কূটবুদ্ধিসার রাষ্ট্রপরিচালক? এইজন্যেই তো রাষ্ট্রপরিচালনায় আজ এত গলদ, পরস্পরের মধ্যে এত হানাহানি সংঘর্ষ ও বিরোধ। রাষ্ট্রপরিচালকেরা যদি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্ততঃ মনীষী ও দার্শনিকদের কথায় কর্ণপাত করতেন তা হলে পৃথিবীর চেহারা আজ অন্যরকম হত। কিন্তু রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের মনে তেমন সুবুদ্ধি জাগ্রত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বরং হাওয়ার গতি বিপরীতমুখী বলেই মনে হয়। শিল্পী সাহিত্যিক মনীষী দার্শনিক ভাবুক শ্রেণীর মানুষেরা, জাতি ও রাষ্ট্রের ভাগ্যগঠনে এতাবৎ যে বিশিষ্ট ভূমিকা তাঁদের ছিল, তা থেকে ক্রমশঃই যেন দূরে সরে যাচ্ছেন। বিভিন্ন শিবিরের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে তাঁদের আজ কোণঠাসা অবস্থা। এই অসহনীয় স্থিতি থেকে তাঁরা কীভাবে উদ্ধার পেতে পারেন সেইটেই আজ শিল্পীসমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বরিস পাস্তারনাক তাঁর 'Doctor Zhivago' বইটির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এ বইটি এখনও আমাদের পড়বার সৌভাগ্য হয় নি, তবে তার যে চুম্বক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায়, এই বইটি বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী লেখকদের ধারায় রচিত এবং মানবতাবাদ এ বইয়ের প্রধান সম্পদ। বইটিতে মানবাত্মার সত্যজিজ্ঞাসার আকুতিকে সবচেয়ে বড় মূল্য দেওয়া হয়েছে। সত্যিকার মানবতার যিনি পূজারী তাঁর চোখে দেশ জাতি স্বরাষ্ট্র-গৌরবের চাইতেও অনেক, অনেক বড় সত্যসন্ধান, আর এই সত্যের জন্য তিনি কোন মূল্য দিতেই পিছপা হন না। সত্যের চলা সব সময়েই ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলা, সে পথ সংকীর্ণ জাতিপ্রেম স্বরাষ্ট্রপ্রেম ইত্যাদির অনেক ঊর্ধ্বে স্থাপিত। অনমনীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্গাতা ডক্টর জীভাগো নিজের জন্যে এই কঠোর পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং তার ফলে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সমাজ-জীবনে তাঁকে বহু বিসদৃশ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তিনি যদি স্বীয় চিন্তাস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়ে গোলে হরিবোল দিয়ে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন তা হলে তাঁর জীবনে এত পরীক্ষা ও সংকট দেখা দিত না। কিন্তু যেহেতু ডক্টর জীভাগো ন্যায়-অন্যায় বিচারপরায়ণ ও সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মানুষ, সেই কারণে সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার কঠোর বিধি-নিষেধের মধ্যে বাস করেও তিনি ওই ব্যবস্থার আঁটসাঁট কাঠামোয় নিজেকে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারেন নি, ফলে তাঁর জীবনে লাঞ্ছনা ও নিগ্রহ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। এ লাঞ্ছনা যূথ কর্তৃক একের লাঞ্ছনা; এ নিগ্রহ সমষ্টির দ্বারা ব্যক্তির নিগ্রহ। ডক্টর জীভাগো যেন পাস্তারনাকেরই শৈল্পিক প্রতিরূপ, অথবা পাস্তারনাকের জীবনে যা ঘটবে ডক্টর জীভাগোর কাহিনীতে তারই যেন পূর্ব-ছায়াপাত ঘটেছে। একজন লেখক (Max Hayward) জীভাগোর চরিত্র বর্ণনা করেছেন এইভাবে—

"As a brilliant doctor he could easily have assured himself a position in the new society, but rather than forgo his birthright as a free-thinking intellectual, he prefers to become a social outcast.

"His non-acceptance of the Revolution (after a brief initial enthusiasm for it) is not based on political hostility. It is not the political and social programme of the Bolsheviks that he rejects : it is rather their basic assumptions about man, life, and history....His objection to Marxism, or indeed to any doctrine claiming to provide a total explanation of the historical process and a programme for the transformation of society, is that life is far too complicated and mysterious to be embraced by any theory or system." (Soviet Survey, April-June 1958)

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, ডক্টর জীভাগো প্রকৃতই একজন স্বাধীন চিন্তানিষ্ঠ বিবেকী ব্যক্তি। তিনি নির্ভীকও বটেন। সকলের রায়ে রা না মিলিয়ে তিনি সোভিয়েট সমাজের অভ্যন্তরে বাস করেও একাচারী আর অসামাজিকের জীবন বরণ করে নিলেন তবু স্বীয় মতস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিলেন না। মার্ক্সীয় মতবাদ কিংবা তারই ছাঁচে গড়া সোভিয়েট রাষ্ট্র-

ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর আপত্তি রাজনীতিগত আপত্তি নয়। তিনি ওই আদর্শের একেবারে গোড়া ধরে টান দিয়েছেন। তাঁর মতে জীবন এতই জটিল আর রহস্যপূর্ণ যে কোন রকম মতাদর্শ বা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার গজকাঠি দিয়ে তাকে মাপবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এই বিশ্লেষণ থেকে আমরা বুঝতে পারি ডাক্তার জীভাগো মানবজীবনের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে গূঢ় মানবীয় সত্যটিকে বহিরালোকে টেনে বার করবার চেষ্টা করেছেন। তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বাইরেকার চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্যে বিভ্রান্ত হন নি, আমাদের ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথের মত বরিস পাস্তারনাকের মানস-দর্শনের মাধ্যমে ওই দানবীয় প্রাকারের তলস্থিত ভিত্তিগাত্রটিকে অনুভবের দ্বারা স্পর্শ করতে চেয়েছেন। ওই ভিত্তি তাঁর খুবই পলকা আর নড়বড়ে বলে মনে হয়েছে। আসুরিক শক্তিতে ওই প্রাকারের স্থিতি আর মানুষের ব্যক্তিত্বের খর্বতায় তার অভ্রলেহনের প্রয়াস। ডাক্তার জীভাগো একজন গোঁড়া বিপ্লবীকে বলছেন—

"When I hear people talking of re-shaping life it makes me lose all self-control and I fall into despair. Re-shaping life! People who can say that never understood the least thing about life. They have never felt its breath, its heart—however much they may have seen or done. They look on it as a lump of raw material which has to be processed by them and ennobled by their touch. But life is never just a substance, a material to be moulded. Life is the principle of self-renewal—it is constantly renewing and remaking and changing and transfiguring itself. It is infinitely beyond your or my dull-witted theories about it."

এর অর্থ অতি পরিষ্কার। লোকে যখন জীবন পুনর্গঠনের কথা বলে তখন ডাক্তার জীভাগোর ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়। যেন জীবন পুনর্গঠন মুখের কথা! যারা ওই রকম বলে তারা জীবনের মর্ম এতটুকুও উপলব্ধি করতে পারে নি। জীবন যেন একতাল কাদা, তাকে ইচ্ছেমত ছাঁচে গড়ে নিলেই হল! কিন্তু জীবন কাদার তাল নয়। জীবনকে বাইরে থেকে গড়েপিটে নেওয়া যায় না; জীবন নিজেই নিজেকে গড়ে তুলছে, বদলাচ্ছে, নিত্যনতুন করছে। কতকগুলি ধরতাই বুলির বেড়ের মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করা যায় না।

এ থেকে ডাক্তার জীভাগোর মানসিক গঠন আমরা বুঝতে পারি, সেই সঙ্গে বরিস পাস্তারনাকেরও। পাস্তারনাক কবি ভাবুক স্বপ্নদ্রষ্টা, সুতরাং স্বভাবতঃই উচ্চ পর্যায়ের শিল্পিসুলভ জীবনরহস্যের বোধের দ্বারা তাঁর কল্পনা অনুরঞ্জিত। জীবনকে বাইরে দেখে না দেখে তিনি তার মূলে প্রবেশ করেছেন, আর সেই-জন্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বিচিত্র জাতিগঠনমূলক প্রয়াসের একাধিক দিক্‌ আপাতমনোহর হয়েও তাঁর চোখে নিগূঢ় কারণে বিসদৃশ ঠেকেছে। জীবনের আধ্যাত্মিক নৈতিক প্রেরণাকে অস্বীকার করে পরমত-অসহিষ্ণুতা আর হিংসাচারের ভিত্তিতে সমাজ গড়ে তোলবার চেষ্টা করলে জীবনের একেবারে মর্মমূলে ঘা দেওয়া হয়। ডাক্তার জীভাগোর জীবনে এই উপলব্ধি এসেছে স্বীয় খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের খাত বেয়ে, অন্যান্য ধর্মবিশ্বাস তথা আনুষ্ঠানিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রগাঢ় মানবতাবাদী প্রত্যয় একই উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে এনে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়।

এইখানেই শেষ নয়। ডাক্তার জীভাগো পরোক্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদেরও এক হাত নিয়েছেন। সোভিয়েট ভূমির অভ্যন্তরে বসে সোভিয়েট নেতৃবর্গের কার্যের সমালোচনা করতে কতখানি বুকের পাটা দরকার তা আমাদের একবার ধীরচিত্তে অনুধাবন করা দরকার। দূর থেকে পাস্তারনাককে ভীরু বলে গাল দিয়ে নিজেরা বীর সেজে আত্মসন্তোষ হয়তো লাভ করা যায়, তাতে পাস্তারনাকের মহিমা খর্ব হয়ে যায় না। এমন নয় যে পাস্তারনাক সোভিয়েট রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সব-কিছুরই সমালোচক, তার সুস্পষ্ট কৃতিত্বের দিক্‌গুলি সম্পর্কে তিনি মোটেই অনবহিত থাকেন নি। 'রাশিয়ার চিঠিতে' যেমন রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েটের সাফল্যের দিকগুলির উচ্চ প্রশংসা করেছেন, পাস্তারনাকও তেমনই তাঁর 'ডক্টর জীভাগো' উপন্যাসে সোভিয়েট শ্রমিককল্যাণ আর মাতৃমঙ্গল প্রয়াসের অকুণ্ঠিত সাধুবাদ উচ্চারণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বেলায় যেমন, আঁদ্রে জিদ কোয়েসলার প্রমুখ মনীষীদের বেলায় যেমন, তেমনই পাস্তারনাকের বেলায়ও সোভিয়েট ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি ওই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত মৌলিক নীতির জন্য, তার ব্যবহারিক

কৃতিত্বের সঙ্গে তাঁদের সমালোচনার সম্পর্ক নেই। পাস্তারনাক বইয়ের এক জায়গায় লিখছেন—

"In everything to do with the care of the workers, the protection of the mother, our revolutionary era is a wonderful era of new, lasting, permanent achievements. But as to its interpretation of life, its philosophy of happiness, its propaganda is such a comic remnant of the past that it's almost impossible to believe that it's meant to be taken seriously. If it had the power to reverse history all this pompous nonsense about leaders and peoples would set us back thousands of years—we would have to live in a Biblical time of patriarchs and shepherd tribes. But fortunately this is impossible ......"

সোভিয়েট সর্বাধিনায়ক শ্রীক্রুশভ ও অন্যান্য কম্যুনিস্ট কর্তাদের আঁতে ঘা লাগবার মত কথা। উপন্যাসটি সম্বন্ধে সোভিয়েট রাশিয়ায় এত হৈহৈ রৈরৈ কেন হচ্ছে এবং সোভিয়েট কর্তাদের টনক কেন এত নড়েছে এর থেকে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রতি ক্ষেত্রেই পাস্তারনাক জীবনের মৌলিক মূল্যবোধের প্রশ্ন তুলেছেন, নেতারা ক্রিয়াত্মক সংগঠনের ক্ষেত্রে প্রভূত কর্মকুশল বলে প্রমাণিত হলেও তাঁদের মধ্যে জীবনের এই গূঢ় রহস্যের উপলব্ধি ঘটেছে তাঁদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ এই উপলব্ধি ব্যতিরেকে জাতিগঠন প্রয়াসের কোন মানে হয় না। এইখানেই কবি ভাবুক ও মনীষীর ভূমিকার গুরুত্ব। নিছক কাজের গাঁথুনির উপর কাজের গাঁথুনি গেঁথে প্রকাণ্ড ইমারত খাড়া করে তোলা যায় কিন্তু সে কাজের পিছনে যদি প্রজ্ঞার দ্যোতনা না থাকে তবে কী হবে আকাশস্পর্শী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সৌধকে শূন্য ফুঁড়ে দাঁড় করিয়ে? এদেশে বিদেশে সকল দেশে রাষ্ট্রনায়কেরা শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে মেতে আছেন, কাজের গুণাগুণ বিচারের জন্য যে ধৈর্য অবসর সহিষ্ণুতার আবশ্যক তা তাঁদের স্বভাবে নেই। ফলে কাজের নামে বিশ্বজোড়া অকাজই বেশী হচ্ছে, সমাজতন্ত্রী একনায়কত্ব শাসিত রাষ্ট্রগুলিতে সবচেয়ে বেশী। সর্বগ্রাসী কাজের এই জরদগব বিক্ষেপ আর উদ্দাম তাড়নাকে সংযত করতে পারে শুধু মনীষী ভাবুক কবি শ্রেণীর মানুষের ধীর চিন্তার পরামর্শ। কিন্তু সে পরামর্শ শোনবার মত শ্রদ্ধাবোধ বা মনের প্রস্তুতি রাষ্ট্রসঞ্চালকদের নেই, তাই চারিদিকে এত বিপত্তির সমারোহ। পৃথিবী আজ ধ্বংসের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে শুধু রাষ্ট্রপরিচালকদের কল্পনাহীনতা আর অযোগ্যতার কারণে। পারস্পরিক সন্দেহ আর অবিশ্বাস রাষ্ট্র ধুরন্ধরদেরই নীতির পারণামফল, এর সঙ্গে শিল্প-সংস্কৃতির জগতের কোন সম্পর্ক নেই। শিল্প-সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক, তাঁরা মানবপ্রেমের কথা বলেন, মানবধ্বংসের প্ররোচনা যোগান না।

এ কথা আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। আর তা বুঝতে পারলেই সাহিত্য-সংস্কৃতির এলাকা থেকে রাজনৈতিক কূটক্রিয়াকে দূরে রাখবার প্রয়োজনবোধ স্বতঃই আমাদের মনে উন্মেষিত হবে। সর্ববিধ রাজনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে সচেতনতা থাকা ভাল, তাতে আধুনিক কালে ঘটনার গতি বোঝার কাজ সহজতর হয়, তা বলে রাজনীতির দ্বারা সাহিত্য প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়। সাহিত্যকে রাজনীতির শিকারে পরিণত হতে দেওয়া চলে না। শিল্পীরা তাঁদের বৃত্তির বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের সাধক; রাজনীতির সমষ্টিবাদ শিল্পগত দায়িত্ব পালনের পথে অন্তরায়স্বরূপ। শিল্পীরা রাজনীতির মিছিল অবশ্য অবলোকন করবেন, তবে তাঁরা নিজেরা মিছিলের ভিড়ে মিশে যাবেন না, একটু গা বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে মিছিলকে এগিয়ে যেতে দেবেন। রাজনীতির মধ্যে মতসংঘর্ষ অতিশয় প্রবল বলেই সর্ব-প্রকার ক্রিয়াত্মক রাজনীতি থেকে লেখকদের দূরে সরে থাকা উচিত। শিল্পচর্চার পক্ষে অপরিহার্য মানসিক নিরাসক্তি (detachment) বজায় রাখার জন্যেই এটা দরকার। এক সময়ে ধর্মের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ নিগূঢ় ছিল। তার ফল সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে অবিমিশ্র শুভদায়ক হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মের স্থান রাজনীতি গ্রহণ করেছে। তাতে অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। রাজনৈতিক মতসংঘর্ষের বিষবাষ্পে আজ সংস্কৃতি-জগতের আবহাওয়া আবিল। শিল্পীরা তাঁদের নিজস্ব ব্যক্তি-সত্তার তাগিদ অনুযায়ী চললে তাঁদের উপর আর রাজনৈতিক সমষ্টিবাদের আধিপত্য থাকে না। শিল্পী-সাহিত্যিকেরা স্বধর্মে স্থিত থাকবেন কি পরের তল্পী ঘাড়ে বয়ে বেড়াবেন তার উপর তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আজই এ বিষয়ে একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছনো দরকার, কালহরণে আর সিদ্ধান্ত নেওয়ারও সময় থাকবে না।
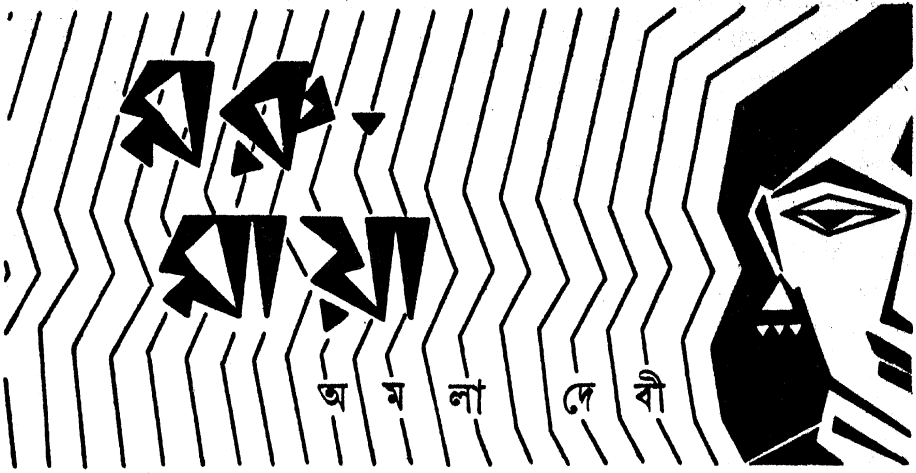
জৈ্যষ্ঠ মাস। বেলা প্রায় দশটা। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে মাঝারি গোছের একটি রেল-স্টেশনে একটি আপ-ট্রেনের আসার সময় আসন্ন-প্রায়। প্ল্যাটফর্মটি যাত্রীতে ভরে উঠেছে। যাত্রীদের সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে : যে রকম ভিড়, গাড়িতে উঠতে পারলে হয়। খালাসীরা হাত-গাড়িতে মাল-পত্র যথাস্থানে নিয়ে চলেছে। স্টেশনের আফিসের মধ্যে কর্মব্যস্ততা সুপরিস্ফুট। টকটক শব্দে স্টেশন থেকে স্টেশনান্তরে বার্তা আনাগোনা করছে, টেলিফোনে কথাবার্তা চলছে; বাইরের লোকজনদের উপরে হাঁক-ডাক ও হুকুম চলছে, স্টেশন-মাস্টার পোশাক ও টুপি পরে প্রস্তুত হয়ে ঘন ঘন ঘর-বার করছেন; টিকিট-জানলার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন যাত্রী টিকিট-বাবুকে টিকিটের জন্ম সানুনয় তাগিদ দিচ্ছে।

প্ল্যাটফর্মের এক পাশে একটা লিচু গাছের নীচে ভিড়টা একটু বেশী ঘন হয়ে উঠেছে। গাছের নীচে বসে একজন অন্ধ ভিক্ষুক একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। তার পাশে বসে, তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গাইছে একটি আট-ন বছর বয়সের ছেলে। ভিক্ষুকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেহ লম্বা, কাহিল। গায়ের রঙ আগে ফরসাই ছিল। দুঃখ-দুর্দশার আঁচে এখন মলিন হয়ে উঠেছে। মাথায় বড় বড় রুখু কাঁচা-পাকা এলোমেলো চুল। লম্বা ধরনের মুখ। গাল বসে গিয়ে গালের উপরের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। খাড়া নাক। সারা মুখ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়িতে ছেয়ে গেছে। চোখের তারা দুটি সাদা হয়ে উঠেছে। চোখে ছানি পড়েছে নিশ্চয়। পরিধানে খাটো ধুতি। জীর্ণ ও মলিন। ছেলেটিরও দেহ খুবই শীর্ণ। পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যায়। মুখখানি শুকিয়ে সরু হয়ে গেছে। বড় বড় চোখ দুটি থেকে বালক-সুলভ চাঞ্চল্য এর মধ্যেই যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ অনাদরে অযত্নে মলিন হয়ে উঠেছে। পরনে একটা জীর্ণ মলিন হাফপ্যান্ট। সম্ভবতঃ কারও বাড়িতে ভিক্ষে করে পেয়েছে।

ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। তার সঙ্গে বালকের কচি কণ্ঠের মিহি কোমল সুর মিশে মধুর সুর-সঙ্গতির সৃষ্টি করছে। সেই সুরমাধুরী শ্রোতাদের প্রত্যেকের মনকে যে স্পর্শ করছে, তা তাদের হাবে-ভাবে ও বদান্যতার বহরে বোঝা যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকেই দু-একটা করে পয়সা দান করছে। ভিক্ষুক তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটি মেলে, মাথাটি ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে গাইছে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।

অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

তাদের সামনে পাতা একটি মলিন গামছাতে কতকগুলি পয়সা জমে উঠেছে।

ঘণ্টা বাজল। গাড়ি আসতে আর দেরি নেই। সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিড়টি ভেঙে গিয়ে সারা প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ল।

ভিক্ষুক তখনও তেমনই ভাবে গান গেয়ে চলেছে। ছেলেটি বলল, বাবা, সব চলে গেছে। গাড়ি আসবে এখনই। বাইরে চল।

ভিক্ষুক গান বন্ধ করে বলল, এখনই চলে গেল? আর একটা ঘণ্টা বাজলে তো গাড়ি আসবে! চল্ তবে। কতগুলো পয়সা পড়ল?

ছেলেটি পয়সাগুলি গামছার খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলল, অনেকগুলো পড়েছে বাবা। আজ একটা রসগোল্লা খাব—

ভিক্ষুক সস্নেহে বলল, বেশ তো, খাবি। ভাল করে বেঁধেছিস তো? চল্ বাইরে যাই।

ছেলেটির হাত ধরে ভিক্ষুক ধীরে ধীরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে স্টেশনের সামনে রাস্তার এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরেই ট্রেন এসে পড়ল। বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না এখানে। যাত্রীরা তাড়াতাড়ি যে যার কামরায় উঠে পড়ল। ট্রেন থেকে নামলও কয়েকজন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামল—একজন যুবক ও একজন মহিলা। দুজনই বাঙালী। যুবকের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। দীর্ঘ, দোহারা গঠন, উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের রঙ। যুবকটির মুখে ওর হৃদয়ের ঔদার্যের ছাপ পড়েছে। চাল-চলনে ওর কর্ম-তৎপরতা ফুটে উঠেছে। সঙ্গের মহিলাটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কৃশাঙ্গী। গায়ের রঙ ফরসা। মুখখানি শুকিয়ে গেছে। ওর দুই চোখে গভীর ক্লান্তি ও নিঃসীম নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে। পরনে সাধারণ শাড়ি। সাধারণ ভাবেই পরা। গায়ে শেমিজ। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। পায়ে চটি। গাড়ি থামতেই যুবক তাড়াতাড়ি সঙ্গের জিনিস-পত্র নামিয়ে ফেলল। জিনিস-পত্র সামান্যই। একটা মাঝারিগোছের ট্রাঙ্ক, একটা বিছানার বাণ্ডিল। তরি-তরকারী ও টুকিটাকি জিনিসে ভরা একটা সাজি একটা মাঝারিগোছের স্যুটকেশ। একটা কুলি ডেকে যুবক নিজেই জিনিসগুলো তাদের মাথায় তুলে দিল মহিলা সাজিটা তুলে নেবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি সেটি নিজে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। মহিলা তা পিছু পিছু চলল।

স্টেশনের বাইরে এল তারা। কুলি দুজন ওদে আগেই এসে পড়েছিল। যুবক দুজন রিক্‌শওয়ালাকে ডাকল। অবিলম্বে এল তারা। কুলিটা একটা গাড়িতে মাল চাপাতে লাগল। কাছেই মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধ ভিক্ষুক ও তার ছেলেটি ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছিল। অবিলম্বে তার কাছে এসে হাজির হল। ভিখারীর বাঁ হাতে তার একতারাটি, ডান হাতটি প্রসারিত করে বলল, অন্ধকে দয়া কর বাবা। ছেলেটি রিনরিনে গলায় বলল, ভিখিরী অন্ধকে দয়া করুন মা। আমাদের কেউ নেই মা। সকাল থেকে কিছুই খাই নি মা। ভিখারী বলল, নিতাইচাঁদ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন মা!

মহিলাটি একটি ছোট মনিব্যাগ থেকে একটি আনি বার করে ভিখারীর হাতে দিতে গিয়ে ভিখারীর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন কোন মায়ামন্ত্র প্রভাবে প্রস্তর-প্রতিমার মত স্তব্ধ হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় দর্শন-লাভ-জনিত বিপুল বিস্ময় ফুটে উঠল ওর মুখে ও চোখে। কিছুক্ষণ ভিখারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? তুমি কি—

মহিলার কণ্ঠস্বর শোনামাত্র ভিখারীর মুখেও ফুটে উঠেছিল বিস্ময়। দৃষ্টিহীন চোখ দুটি প্রসারিত করে মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মহিলাটির কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠল, আমার নাম গৌরদাস, আমার বাড়ি হাওড়া জেলায়, সাঁকরেলের কাছে সিন্দুর-হাটী—জাতে বৈষ্ণব আমরা।

মহিলা জিজ্ঞাসা করল, এটি কি তোমার নিজের ছেলে?

হ্যাঁ মা।

এখানে কতদিন এসেছ?

মাস চার-পাঁচ আগে।

কোথায় থাক তোমরা ?

ছেলেটি হাত বাড়িয়ে বলল, ওই যে একটা গাঁ ছে—ওই গাঁয়ে একটা পোড়ো বাড়িতে।

যুবক ডাক দিল, দিদি, আসুন। মহিলা মুখ ফিরিয়ে , এই যে, যাচ্ছি ভাই। ভিক্ষুককে তাড়াতাড়ি জাসা করল, কখন বাড়ি ফিরবে তোমরা ?

ভিক্ষুক বলল, এখনই যাব মা। রান্না করে দু মুঠো তে হবে তো ? পথের ভিখিরীরও যে পোড়া পেট ছে মা ! দুটো না গিললে চলে না।

আবার ডাক পড়তেই মহিলাটি চলে গেল।

স্টেশন থেকে একটা লাল কাঁকরের রাস্তা সোজা দক্ষিণ কে কতকটা গিয়ে একটা ছোট পুলের উপর দিয়ে একটা ছোট নদী পার হয়ে, একটা চওড়া পিচের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। এই রাস্তাটা পূর্ব দিক থেকে এসে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। দু পাশেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ডান পাশে সারা মাঠ জুড়ে এখানে-সেখানে বিস্তর কলিয়ারী। চিমনিগুলোর উদ্‌গীর্ণ ধূমে সারা আকাশ ধূম-মলিন হয়ে উঠেছে। বাঁ পাশে ছোট নদীটা কতকটা দূর রাস্তাটির সঙ্গে সমান্তরালে গিয়েছে। তারপর দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে বন-নীল দিগন্ত পর্যন্ত গিয়ে হারিয়ে গেছে। দিগন্তের এক পাশে একটা পাহাড় গাঢ় নীল রঙের বিরাট জন্তুর মত শুয়ে রয়েছে। এখানে-সেখানে দু চারটে গ্রাম। নদীটার বাঁকের মুখেই একটা ছোট গ্রাম। মাঠের মাঝ দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ চলে গিয়েছে ওই গ্রাম পর্যন্ত। বড় রাস্তাটা ধরে আরও কতকটা গেলেই দু পাশে কয়েকটা কল। ডান পাশে একটা টালি-কল। বাঁ পাশে পর পর দুটো কল—একটা তেলের আর একটা ধানের। তারপর দু পাশেই টালি-ছাওয়া পর পর ছোট ছোট কয়েকটা একতলা বাড়ি। তারপর রাস্তার দু পাশে কয়েকটা দোকান—খাবারের দোকান, মনোহারী দোকান, কাপড়ের দোকান, দরজির দোকান, মসলাপাতির দোকান ইত্যাদি। তারপর ডান পাশে একটা কাঠের গোলা। আর এক পাশে একটা বস্তি—খোলা দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট কতকগুলো মাটির বাড়ি। কুলিরা থাকে এখানে। এরই কতকটা দূরে বাঁ পাশ থেকে একটা কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে অদূরবর্তী ছোট গ্রামটার পাশ দিয়ে, পিছনেই আর একটা গ্রামের পাশ দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। তারপর দু পাশে ফাঁকা মাঠ। কতকটা দূরে রাস্তার ডান পাশে একটা একতলা বাড়ি। বাড়িটি নেহাত ছোট। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আগে বোধ হয় এখানে বাগান ছিল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই। বাড়িটির সামনের দিকে টানা বারান্দা। টালি দিয়ে ছাওয়া।

এই বাড়িটার সামনেই দুটো রিক্‌শ এসে থামল। একটা থেকে নামল যুবক ও মহিলা। যুবক ডাক দিল, মদন ! মদন ! ডাক শুনেই একটি বার-তের বছরের ছেলে ছুটে এল। কাছে আসতে না আসতেই যুবক বলল, শিউশরণ কোথায় ?

ছেলেটা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঠাকুর ? রান্না ঘরে—

যুবক বলল, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

ছেলেটা পিছন ফিরে ছুটল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির সঙ্গে ঠাকুর এসে হাজির হল। বেহারী। লোকটির বয়স যাটের উপরে। এখনও বেশ শক্ত-পোক্ত। এখনও কাজ করবার যে ক্ষমতা আছে, তা ওর চাল-চলনে বেশ বোঝা যায়।

যুবক লোকটিকে বলল, জিনিসগুলো নামিয়ে বাড়িতে নিয়ে চল।

মহিলাকে বলল, আপনি যান। আমি এখন চলি, সন্ধ্যের পর আসব।

মহিলা বাড়ির দিকে চলল। জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যাবার পর যুবক একজন রিক্‌শওয়ালাকে বিদায় করে দিয়ে, আর একটা রিক্‌শয় চড়ে সামনের দিকে চলল।

এই রাস্তাটা ধরে কতকটা গেলেই বাঁ পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা কারখানা। তার পরেই বাঁ পাশে কয়েকটা ছোট ছোট বাড়ি টালি দিয়ে ছাওয়া। কারখানার ছোট ছোট চাকুরেরা থাকেন এখানে। ডান পাশে পর পর কয়েকটা বাংলো। এখানে থাকেন ম্যানেজার ও আর আর বড় চাকুরেরা। এর কতকটা পরে একটা লাল কাঁকরের রাস্তা বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। ওই রাস্তা দিয়ে ও-দিকের অনেকগুলো কলিয়ারীতে যাওয়া যায়।

যুবকটির রিক্‌শ এই রাস্তা ধরে চলে গেল।

॥ ২ ॥

বেলা প্রায় একটা। বাড়ির সামনের বারান্দায় মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। স্নান করেছে। ভিজে চুলগুলি পিঠে লুটিয়ে পড়েছে। মাথায় অবগুণ্ঠন নেই। পরেছে একটা সাধারণ শাড়ি ও শেমিজ। সামনে বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভ্রূ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত। দাঁত দিয়ে অধরের এক প্রান্ত চেপে ধরেছে। মুখে চিন্তার গাঢ় ছায়া।

মাথায় মৃদু ঝাঁকানি দিল মেয়েটি। জটিল চিন্তা-জালের একটা জট যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলল। চিত্রাপিতবৎ নিশ্চল মূর্তি মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল। ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বারান্দার কোলে লাল কাঁকরের রাস্তা দিয়ে বাড়ির পিছনের দিকে চলল।

একটু দূরেই রান্না-ঘর। রান্না-ঘরের সামনে কুয়ো। কুয়োর কাছে বসে মদন বাসন মাজছিল। মেয়েটি তার পিছনে গিয়ে ডাক দিল, মদন! মদন চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে মেয়েটিকে দেখেই তাড়াতাড়ি হাতটা ধুয়ে কাছে এসে বলল, কী বলছেন দিদি! মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, ঠাকুর কোথায়? মদন বলল, বাজারে ওদের দেশের লোক আছে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেছে। রোজই যায়, আমাকে একা ঘর আগলাতে হয়।

তোদের বাড়ি তো ওই গাঁয়ে, না?

হ্যাঁ দিদি।

তুই বাড়ি যাস না?

যাই মাঝে মাঝে। মাকে একবার দেখেই চলে আসি।

তোর মা কেমন আছে?

ভাল নাই দিদি। আর বেশীদিন নয়।—মুখখানি ম্লান করে তুলে একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি মায়ের জন্যে যে কাপড়টা কিনে দিয়ে গেছলেন, একেবারে ছিঁড়ে গেছে। একটা গামছা পরে থাকতে হচ্ছে মাকে। আর একখানা কাপড়—

মেয়েটি বলল, দেব একখানা কাপড় কিনে। কাল ডাক্তারবাবু এলে মনে করিয়ে দিস। একটা কাজ করতে পারিস?

মদন সাগ্রহে বলল, খুব পারব। কী করতে হবে বলুন?

মেয়েটি বলল, তোদের গাঁয়ে একটা পোড়ো বাড়ি আছে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চক্রবর্তীদের বাড়ি—গাঁয়ের এক ধারে। সব মরে গেছে ওদের। বাবুদের কাছে দেনা ছিল অনেক বাবুরা বাড়িটা নিয়ে নিয়েছে।—একটু চুপ করে বলল ভূতের-বাড়ি। চক্রবর্তীদের কে একজন নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সে ভূত হ'য়ে আছে বাড়িটাতে। অনেকে দেখেছে। সন্ধ্যের পর ও-বাড়ির পাশ দিয়ে কেউ যায় না।

মেয়েটি বলল, তোকে কিন্তু একবার যেতে হবে। এখনও অনেক বেলা রয়েছে। সন্ধ্যে হতে ঢের দেরি—

মদন বলল, আজ্ঞে না, এখন ভয় কিসের? এখন আমি খুব যেতে পারব। তবে, ওখানে কী জন্যে যেতে হবে?

মেয়েটি বলল, একজন কানা ভিখিরী আর তার ছেলে ওখানে থাকে, দেখেছিস?

মদন বলল, আমি দেখেছি ওদের। গান শুনেছি। খুব ভাল কীর্তন গায়। বাজারে একদিন গাইছিল। মাস চার-পাঁচ আগে বুড়ো কর্তাবাবু কোত্থেকে ওদের এনেছিলেন। খুব ভক্তলোক ছিলেন কিনা! কীর্তন শুনতে খুব ভালবাসতেন। এনে নিজের বাড়িতেই রেখেছিলেন। মাস তিন আগে কর্তা-গিন্নী দুজনেই মারা গেলেন। ছেলেরা বাড়িতে আর রাখতে চাইল না। তবে তাড়িয়ে দেয় নি একেবারে। পোড়ো বাড়িটাতে থাকতে দিয়েছে।

মেয়েটি বলল, ভূতের-বাড়ি বলছিস যে! ওদের ভয় করে না?

মদন বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলল, ওদের ভয়-ডর করলে চলবে কেন দিদি! পথের ভিখিরী। পথের ধারে পড়ে থাকার চেয়ে ঢের ভাল তো!

মেয়েটির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বলল, পথের ভিখিরী! তাই তো বটে। মুখে বলল, ঠিক বলেছিস তুই। একটু চুপ করে থেকে বলল, কাজ সারা হলে একবার ওখানে গিয়ে খবর নিবি, ওরা ওখানে সত্যি থাকে কিনা; আর কখন বাড়িতে থাকে।

মদন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কীর্তন শুনবেন? বলেন তো বলে আসব। বললেই আসে।

মেয়েটি বলল, তোকে কিছু বলতে হবে না। তুই

দেখে আসবি। আর কখন ওদের ওখানে দেখা পাওয়া যাবে, জেনে আসবি।

মেয়েটি ফিরে এল অবিলম্বে। বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ির ভিতর থেকে একটা ডেক-চেয়ার এনে বসে কি সব ভাবতে লাগল।

জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে পৃথিবী নিঃশব্দে পুড়ছে। আকাশে শান-দেওয়া ছুরির ফলার ঔজ্জ্বল্য। যেন পৃথিবীর যন্ত্রণা ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ধূলি-ধূসর দিগন্ত-রেখা। দূরে ছোট নদীটার বুকের উপরে উত্তপ্ত বালুস্পর্শে বাতাস কাঁপছে। মাঝে মাঝে মাঠের দিক থেকে গরম হাওয়ার হল্‌কা এসে মুখ-চোখ ঝলসে দিচ্ছে। বাড়ির সামনে একটা শিরীষ গাছে একদল ছাতারে পাখি মাঝে মাঝে কলরব করে উঠছে। সামনের বড় রাস্তায় লরি ও বাস গর্জন করতে করতে ছুটছে। দূরে তেল ও ধান-কল চলার শব্দ অস্পষ্ট ভাবে কানে আসছে। মেয়েটি প্রস্তর-মূর্তির মত স্থির ভাবে বসে আছে। দুটি প্রসারিত চোখের দৃষ্টি দূর দিগন্তের পানে নিবদ্ধ। কর্ম-চঞ্চল পৃথিবীর কোন ইঙ্গিত তার মনে পৌঁছচ্ছে না। মন তার এখানে নেই। চলে গেছে তার অতীত জীবনের মধ্যে। যে জীবন থেকে ভাগ্যদোষে ছিটকে পড়ে দুর্ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে অশেষ দুর্গতির মধ্যে এসে পড়েছে, যে জীবনকে সে আর কোনদিন কোনমতে ফিরে পাবে না, সেই জীবনের স্মৃতি অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে তার মানসচক্ষের সামনে ভাসছে। এই স্মৃতিকণাগুলি তার মনের এক অন্ধকারময় কোণে এতদিন জড়ো হয়ে ছিল। ক্রীতদাসী জীবনে মায়ামমতাহীন বিচার-বিবেচনাহীন প্রভুদের অশেষ দাবি মেটানোর স্বল্প অবসরে হয়তো মাঝে মাঝে তারা মনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আজ অন্ধ ভিক্ষুক ও তার ছেলেকে দেখার পর, তাদের পরিচয় পাবার পর, এক ঝলক আলো এসে পড়েছে মনের সেই কোণে। কর্মভার থেকেও কিছুদিনের জন্য দেহ ও মন দুই-ই মুক্তি পেয়েছে। তাই আজ মন সেই স্মৃতিকণাগুলিকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া বহুমূল্য রত্নকণার মত পরম আনন্দ ও কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে।

* * *

সব মনে পড়ছে আজ—

পশ্চিমবঙ্গের একটি মাঝারি গোছের শহর—নাম স্বপনপুর। সেই শহরের এক প্রান্তে একটা পাড়া। বেশী লোকের বাস ছিল না। কাছেই স্টেশন। স্টেশন থেকে যে বড় রাস্তাটি শহরের মাঝখান দিয়ে গেছে, তার থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। সেই রাস্তার ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা বড় দোতলা বাড়ি। বোসেদের বাড়ি। যিনি বাড়ির প্রথম মালিক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সারদাচরণ বোস। জেলা-শহর থেকে অনেক দূরে এক পাড়াগাঁয়ে বাড়ি ছিল। ওকালতি পাস করে, এখানে প্র্যাকৃটিশ করতে শুরু করেন। অচিরে শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল হয়ে উঠলেন। বিস্তর টাকা রোজগার করেছিলেন। শহরে ছোট বড় অনেকগুলো বাড়ি তৈরি করালেন। নিজের গ্রামেও বাড়ি তৈরি করালেন। জমিদারি কিনলেন। বর্তমান মালিক—তাঁর পৌত্রেরা। জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম—বরদাচরণ বোস। তিনিও উকিল—পিতৃ-পিতামহের পেশাটা ত্যাগ করা উচিত নয় বলেই। তবে ওকালতিতে আয় হত না বেশী। অন্যান্য ব্যবসা ছিল—কন্ট্রাক্টারী, বাস-সার্ভিস, প্রেস ইত্যাদি। তাঁর ছোট ভাইয়েরা এক-একজন এক-একটি ব্যবসার তদারক করতেন। জমিদারি ও বাড়িভাড়া থেকে আয়ও বেশ ছিল। তেজারতি কারবারও ছিল। শহরে বোসেদের মান-মর্যাদা বেশ ছিল। বোসেদের বাড়ির পাশে একটা একতলা বাড়ি। এ বাড়িটাও বোসেদের। ভাড়া নিয়ে বাস করতেন উকিল রামজীবনবাবু। জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। অন্য জেলায় বাড়ি ছিল। এই শহরে এক বন্ধু ও সহপাঠী ছিল তাঁর। তার পরামর্শে এখানে প্র্যাকৃটিশ শুরু করেন। আয় মন্দ ছিল না। এই বাড়ি থেকে কতকটা দূরে ছিল, একটা ছোট একতলা বাড়ি। এ বাড়িটাও বোসেদের ছিল। তার বাবা ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। থাকবার ঘর ছিল মাত্র দুটি। রান্নাঘরটা ছিল নেহাৎ ছোট। পাশেই ছিল ভাঁড়ার-ঘর। বাবা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। উঁচু ক্লাসগুলিতে অঙ্ক শেখাতেন। বাড়িতে অনেক ছেলে পড়তে আসত। বারান্দায় মাদুর পেতে বসে বাবা তাদের পড়াতেন। তাদের সংসারে

মাস্টার ছিল না বেশী। বাবা, বিধবা মাসীমা, সে আর দাদা। মা মারা গিয়েছিলেন অনেক দিন আগে। মাসীমাই মানুষ করেছিলেন তাদের। মাসীমাই সংসারের সব কাজ করতেন। সে যতটা পারত সাহায্য করত। চাকর ঝি তো ছিল না! রাখবার ক্ষমতা ছিল না। বাবা মাইনে পেতেন কম। ছেলেরা, যারা বাড়িতে পড়তে আসত, অনেকেই কিছু দিত না। দু-চার জন দিত, তাও খুব বেশী নয়। বাবার শিক্ষকতায় নাম ছিল। শিক্ষকতা তাঁর শুধু পেশা ছিল না, নেশা ছিল। অনেক ছেলে—অঙ্ক বিষয়টা যাদের কাছে বিভীষিকার বস্তু ছিল—তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে অঙ্ক শিখেছিল, অঙ্কে পাস করেছিল। তারা স্কুল থেকে পাস করে চলে যাবার পরেও তার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। ছুটি-ছাটাতে বাড়ি এলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসত।

তাদের পাড়া থেকে কতকটা দূরে একটা মধ্য-ইংরেজী স্কুল ছিল। সেখানে পড়া শেষ করেছিল সে। তারপরে আর স্কুলে যাওয়া হয় নি তার। শহরে অবশ্য একটি উচ্চ ইংরেজী স্কুল ছিল। শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে। স্কুলের বাস ছিল। বাড়িতে বাড়িতে মেয়ে তুলে স্কুলে নিয়ে যেত। স্কুলের বেতনের উপরেও প্রায় দু-তিন টাকা বেশী দিতে হত প্রত্যেক মেয়েকে। মেয়ের লেখাপড়ার জন্য মাসে মাসে এত খরচ করা বাবার আর্থিক অবস্থায় কুলোত না। কাজেই বাড়িতে পড়ত সে। বাবার সময় ছিল না পড়াবার। খেয়ালও ছিল না। সংসারের কোন কিছুরই তো খবর রাখতেন না! মাসে যা কিছু উপার্জন হত মাসীমার হাতে ফেলে দিয়েই সাংসারিক দায়িত্ব শেষ করতেন। সংসারের সব দায়িত্ব বহন করতেন মাসীমা। সংসারের সব কাজ নিজে করতেন। যা নিজে পারতেন না তা দাদাকে দিয়ে করাতেন, দাদা না করলে অন্যদের দিয়ে করাতেন। অন্যরা মানে—অচিন্ত্যদা, অপূর্বদা, অনাদিদা—জ্যাঠামশায়ের তিন ছেলে। জ্যাঠামশায় মানে—রামজীবনবাবু। বাবাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। অচিন্ত্যদা ছিলেন সবচেয়ে বড়। অপূর্বদা মেজো, অনাদিদাদা ছোট। সব বাবার ছাত্র। রোজ তাদের বাড়িতে আসত। অপূর্বদা ছিল তার দাদার পরম বন্ধু। স্কুলে-কলেজে একই ক্লাসে পড়ত। একসঙ্গে বেড়ানো, একসঙ্গে খেলাধুলো। অনাদিদা তার চেয়ে দু বছরের বড় ছিল। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছিল তারা। খুব ভালবাসত তাকে। মারধোরও করত মাঝে মাঝে। বড় হয়ে ওঠবার পরেও তার ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমে নি। স্কুল থেকে ফিরে খেলার মাঠে যাবার আগে একবার তাদের বাড়ি এসে মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে, তার সঙ্গে গল্প করতে, হাসি-ঠাট্টা করতে, কোন দিন ভুল হয় নি তার। মাসীমা ওকে দিয়েই প্রায় সব কাজ করাতেন। ও হাসিমুখেই করত। ওদের তিনজনই বাড়ির ছেলের মত ছিল, ছেলের মতই বাবাকে মাসীমাকে শ্রদ্ধা করত। তাকে নিজের দাদার মত, বোধ হয় তার চেয়ে বেশী স্নেহ করত। ওদের বোন ছিল না। তাকেই তারা সেই স্থানে বসিয়েছিল।

মাসীমা অচিন্ত্যদার উপর তাকে পড়ানোর ভার দিয়েছিলেন। অচিন্ত্যদা যতদিন বাড়িতে ছিলেন তাকে নিয়মমত পড়াতেন। কলেজ থেকে পাস করে কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে চলে গেলেন। দাদাকে মাসীমা বললেও পড়াত না। বাড়িতে থাকতই না। কলেজে না গেলেই নয়, তাই যেত। কলেজ থেকে ফিরে দুটো কিছু নাকে-মুখে দিতে না দিতেই অপূর্বদা এসে হাজির হত। তারপর দুজনে বেরিয়ে কোথায় যেত, কি করত, কেউ জানত না। ফিরত রোজ রাত করে। মাসীমা কিছু বললেই যা তা মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ত। মাসীমা বাবাকে কিছু বলতে গেলে কান দিতেন না। কান দিলে দাদাকে ডেকে একবার ধমকে দিয়ে কর্তব্য শেষ করতেন। অনাদিদা পড়াবে কি—নিজের পড়াশুনা নিয়েই অস্থির ছিল বেচারা! তা হলেও প্রত্যেক রবিবার এসে কিছুক্ষণ তাকে পড়াত। মোট কথা অচিন্ত্যদা যাবার পর তার পড়াশুনার প্রায় ইতি হল।

আর একজন প্রায়ই আসত তাদের বাড়ি—বীরেনদা। বোস জ্যেঠামশায়ের বড় ছেলে। স্কুলে পড়ত দাদার সঙ্গে। পড়াশুনা কিছু করত না। খেলায় মন ছিল বেশী। খুব ভাল ফুটবল খেলত। স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড় ছিল। স্কুলে খেলা-ধুলার প্রতিযোগিতায়

প্রত্যেক বছর পুরস্কার পেত। চেহারাটি ছিল চমৎকার। ধবধবে ফরসা রঙ। লম্বা দোহারা গঠন। পেশল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। চোখ দুটো ছিল চমৎকার। চুম্বকের মত আকর্ষণশক্তি ছিল চোখের। চোখে চোখ মিললে চোখ ফেরানো যেত না। বুকের ভেতরটা থরথর করে কাঁপত। বাবা ওকে বেশী পছন্দ করতেন না। স্কুলে দুষ্টু ছেলেদের সর্দার ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত। বাবার চোখে নাকি একবার পড়ে গিয়েছিল। বাবা অন্য ছেলেদের ওর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন। মাসীমা ওকে খুব স্নেহ করতেন। বাবার মনোভাব জেনেও তাই রোজ একবার করে মাসীমাকে দেখা দিয়ে যেত। ওর নিজের মা মারা গিয়েছিলেন ওর নেহাৎ ছেলেবেলায়। ওর বড় কাকীমা ওকে মানুষ করেছিলেন। তাঁর নিজের ছেলে-মেয়ে ছিল না। ওর বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। ওর বিমাতা ছিলেন ওর মায়ের দূর সম্পর্কের বোন। তিনি কিন্তু ওকে পছন্দ করতেন না। ওর বাবাও ওর উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ওর বৈমাত্রেয় ভাই ছিল একজন—ধীরেনদা। বোন ছিল একটি—মিনু। ধীরেনদা অনাদিদার সমবয়সী ছিল। ছেলেবেলাতে অনাদিদার সঙ্গে এসে খেলা করত তার সঙ্গে। অনাদিদার প্রাণের বন্ধু ছিল সে। মিনুর সঙ্গে তার নিজের ভাব ছিল খুব। ছোট স্কুলে একসঙ্গে পড়েছিল দুজনে। মিনু বড় স্কুলে পড়ত। সেখানে অনেক নতুন নতুন বন্ধু হয়েছিল তার। তার সঙ্গে ভাব কিন্তু বরাবর বজায় ছিল। মিনুর মা তাকে স্নেহ করতেন। ওদের বাড়ি গেলে খুব আদর করতেন। মিনুর বাবা—বোস জ্যেঠামশায়ও তাকে স্নেহ করতেন। ধীরেনদা খুব ভাল ছেলে ছিল। স্কুলে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হত। বাবা খুব ভালবাসতেন ওকে। বীরেনদা কিন্তু উঁচু ক্লাসে উঠেই ফেল করতে শুরু করল। দাদা স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে যাবার পরেও ও পড়ে রইল বছর কয়েক। শেষে ধীরেনদা ওকে ডিঙিয়ে যেতেই ও পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ওর বড় কাকার সঙ্গে কণ্ট্রাক্টারীর কাজ করতে লাগল।

তাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন অচিন্ত্যদা। এত স্নেহ সে জীবনে কারও কাছে পায় নি। তার সম্বন্ধে সব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি থাকত। হয়তো শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে, ও ভয়ে মাসীমাকে বা বাবাকে জানায় নি, দাদা দেখেও দেখে নি। অচিন্ত্যদার লক্ষ্য করতে ভুল হত না। মাসীমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, ছেঁড়া শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? মাসীমা শুনতে পেয়ে বলতেন, কে? রাধা? শাড়িটা ছিঁড়েছে? বলে নি তো! কি করব বাবা! ও মেয়ে মুখ ফুটে কিছু বলবে না। খিদে পেলে বলে না, অসুখ হলে বলে না। মুখ দেখে আমাকে বুঝে নিতে হয়। কী যে হবে ওই মেয়ের! কে যে নেবে ওকে জানি না। বক্তৃতা চলতে থাকত মাসীমার। অচিন্ত্যদাকে দিয়েই শাড়ি আনিয়ে দিতেন। হাতে মা থাকলে অচিন্ত্যদাই ব্যবস্থা করতেন। কত যত্ন করে যে পড়াতেন তাকে! তাকে বড় স্কুলে পাঠাবার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। কী করবেন! বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। নিজেই পড়াতে লাগলেন। মিনুর কাছে ওদের কি কি বই পড়ান হয়, জেনে নিয়ে সেই সব বই কিনে আনলেন নিজের টাকা দিয়ে। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। সে টাকা নিজের ইচ্ছামত খরচ করতেন, জ্যেঠামশায় কিছু বলতেন না। রোজ দু ঘণ্টা করে পড়াতেন তাকে। কলেজ থেকে ফিরে এসে খাবার খেয়েই চলে আসতেন। কোনদিন ব্যতিক্রম হত না। কোনদিন কোন অছিলায় সে পড়তে না চাইলে শুনতেন না। রাশভারী মানুষ তো! বেশী বলতে সাহস হত না। পড়তে বসতেই হত। পড়তে ভালও লাগত। পড়তে নয়, ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় ওঁর কথা শুনতে ভাল লাগত। বীরেনদার মত চমৎকার চেহারা ছিল না অচিন্ত্যদার। লম্বা, ছিপছিপে গঠন। রঙ খুব ফরসা ছিল না। কিন্তু মুখ চোখ নাক ছিল খুব ধারাল। প্রশস্ত কপাল। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগত তার। রাত্রে স্বপ্ন দেখত কতদিন। শুধু তখনই নয়। পরে দুর্গতি ও দুষ্কৃতির গভীর পঙ্কের মধ্যে ডুবে থেকেও অচিন্ত্যদার মুখের চেহারা নিদ্রায় জাগরণে মনের পরদায় কত বার ভেসে উঠেছে। ওঁর স্মৃতি তার মনের ফলকে যে এত গভীর ভাবে উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল তা সে তখন জানত না। মন যে তাঁকে এমন

করে চাইতে শুরু করেছিল, তা সে তখন বুঝতে পারে নি। দেখতে ভাল লাগে, কথা শুনতে ভাল লাগে, ভাল লাগে ওঁর স্পর্শ পেতে—এই পর্যন্ত। কলেজ থেকে পাস করে, ডাক্তারী পড়তে যখন কলকাতা চলে গেলেন, তখন খুব মন কেমন করত তার। বিকেলবেলায় যে সময়টিতে তিনি আসতেন, মন অভ্যাসবশে তাঁর জুতোর শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে ভারী গলায় 'মাসীমা' ডাক শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত। প্রতিদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাত পেয়েও মনের এই ভুল কাটে নি অনেকদিন। ভালবাসার লক্ষণ যে এইসব—চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের কিশোরী মেয়ে জানত না তখন। তারপর দুর্দিনের কালো অন্ধকারে যখন অচিন্ত্যদা চিরদিনের মত হারিয়ে গেল তার কাছ থেকে, তখন সে বুঝেছিল, তাকে ভালবেসেছিল সে।

অপূর্বদাকেও খুব ভাল লাগত তার। অপূর্বদার রঙ কালো ছিল। শক্তিমান দেহ ছিল তার। রোজ কুস্তি করত। শখানেক ডন টানত, শ দুই বৈঠক। মুখের গঠন ছিল সুন্দর। চোখ দুটি ভারী সুন্দর। টানা টানা চোখ। মনে হত যেন সর্বদা স্বপ্ন দেখছে। সুন্দর স্বপ্ন! তারই ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে ওঁর চোখের কালো তারায়।

স্বপ্নই দেখত সে! পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল-মুক্তির স্বপ্ন। গোপনে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল। কেউ জানত না। কে জানবে? ওদেরও তো মা ছিলেন না! এক বুড়ি পিসীমা ওদের সংসার দেখাশুনা করতেন। জ্যেঠামশায় তো নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অচিন্ত্যদা যতদিন বাড়িতে ছিলেন, যতটা সম্ভব অপূর্বদার ও দাদার খোঁজখবর রাখবার চেষ্টা করতেন। তিনি কলকাতা চলে যাবার পর ওরা দুজনে যা ইচ্ছে তাই করতে লাগল। অচিন্ত্যদা ওদের দুজনকে তাকে নিয়মিত ভাবে পড়াবার জন্য বার বার বলে গিয়েছিলেন। বাড়িতে থাকলে তো পড়াবে! অপূর্বদার পিসীমাকে যদি সে বলত, হ্যাঁ পিসীমা, ওরা দুজনে যে কি করছে, জ্যেঠা-মশায়কে একটু খবর নিতে বলুন না। বাবা তো কোন কথায় কান দিতে চান না। পিসীমা সঙ্কোচে বলতেন, তোমার জ্যেঠামশায়টিও তাই, মা। নিজের কাজ নিয়েই আছে। ছেলে যে বয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। আমি কী করব মা! যা আছে ওর অদেষ্টে হবে—

অপূর্বদা গান গাইত চমৎকার। উঁচু ভারী গলায় গান গাইত। নজরুলের গান—'শিকল পরা ছল আমাদের, শিকল পরা ছল, বল ভাই মাভৈ মাভৈ, নব যুগ ওই আসে ওই।' এমন দরদ দিয়ে গাইত, শুনতে শুনতে বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকত। মনে হত, ভারত-মাতার শৃঙ্খল-মুক্ত মূর্তিখানি ও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, নব-যুগের পদধ্বনি যেন ও কানে শুনতে পাচ্ছে। অপার্থিব আনন্দের প্রভায় ওর চোখ-মুখ জলজল করত।

অপূর্বদারা ওদের স্বজাতি ছিল। মাসীমা প্রায়ই বলতেন, অচিন্ত্যর হাতে তোকে যদি দিয়ে যেতে পারি! ওঁর পিসীমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ওঁরও অমত ছিল না। বলতেন, বেশ হবে। রাধা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। বড় কাজের মেয়ে। ওর হাতে সংসারের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। বাবা জ্যেঠামশায়কে ধরলে জ্যেঠামশায়ও না বলতে পারতেন না। এই সব শুনে শুনে তারও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল অচিন্ত্যদার সঙ্গে তার নিশ্চয় বিয়ে হবে। অচিন্ত্যদা কিছু জানতেন কিনা, তা সে জানতে পারে নি। জানলেও তাঁর মনের ভাব কী ছিল তাও সে জানতে পারে নি। তবে তার ভাবী জীবনের সব আশা সব সাধ অচিন্ত্যদাকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে উঠতে লাগল।

একটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ল রাধার। অচিন্ত্যদার পরীক্ষার খবর বেরল। প্রথম বিভাগে পাস করেছেন। দেশের সব ছেলেদের মধ্যে প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন, বৃত্তি পাবেন—খবরের কাগজে বেরল। বাবাকে, মাসীমাকে প্রণাম করতে এলেন। মাসীমা ওঁকে রান্নাঘরে বসিয়ে খাবার খেতে দিলেন। তাকে বললেন, বড় ঘামছে অচু! পাখা কর্ দেখি। সে পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করতে লাগল। আর ওঁকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল সেদিন, মাসীমার সাধ মিটবে কি! ওঁকে পাওয়ার সৌভাগ্য তার হবে কি?

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা, এর পর কী পড়বে?

অচিন্ত্যদা বললেন, ডাক্তারী পড়তে বলছেন বাবা।

ওকালতি পড়লেই তো ভাল হত! উকীলের ছেলে—

অচিন্ত্যদা বললেন, বাবার ইচ্ছে নেই। আমারও ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে। মানুষের সেবা করবার এমন সুযোগ আর কোন কাজেই পাওয়া যায় না।

মাসীমা বললেন, রাধার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে—

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বন্ধ হবে কেন? অজিত রয়েছে, অপূর্ব রয়েছে, ওদের কাছে পড়বে। আমি বলে দিয়ে যাব ওদের।—আমাকে বললেন, মন দিয়ে পড়বি, বুঝলি? আমি পুজোর সময়ে এসে পরীক্ষা করব। পাস করতে না পারলে কানমলা খাবি—

ওঁর ভারী গলার ধ্বনি তার সারা মনে কাঁপতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। বুকটাও কাঁপতে লাগল। এমনই হত তাঁর কথা শুনলেই, পড়বার সময়েও। উনি বোঝাতেন, সে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাকত; তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর চোখের দৃষ্টি তার সারা মনকে অবশ করে দিত; কথা কানে ঢুকলেও মনে ঢুকত না। বোঝাবার পরে যখন প্রশ্ন করতেন, কিছুই বলতে পারত না। অচিন্ত্যদা ধমক দিতেন: কিছু হবে না তোর। অত্যন্ত অন্যমনস্ক।—সে মাথা নীচু করে থাকত।

মাসীমা সক্ষোভে বললেন, খুব পড়াবে ওরা! বাড়িতে থাকলে তো! কোথায় কী করে দুজনে জানি না বাবা!

অচিন্ত্যদার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। উনিও সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন—ওরা দুজনে কোন একটা বিপজ্জনক পথে পা দিয়েছে।

বিদেশী শাসকের শাসন-পাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সারা দেশবাসীর মন তখন ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মহাত্মার অহিংস মুক্তি-আন্দোলনে সারা দেশের লোক দলে দলে যোগ দিয়েছিল। দেশবাসীর এই মুক্তি-পিপাসাকে পিষে মারবার জন্য বিদেশী শাসক চণ্ড-নীতি চালিয়েছিল সারা দেশের বুকে। বিদেশী শাসকদের অনুগ্রহজীবী এ দেশের একদল লোক তাদের সাহায্য করছিল। সেই সময়ে বাংলা দেশের এক প্রান্তে একদল তরুণ-তরুণী মুক্তিযজ্ঞ শুরু করল। যজ্ঞাগ্নিতে নিজেদের প্রাণ আহুতি দেবার জন্ম কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠল। দিলও অনেকে। তাদের জেলাতেও শুরু হল মুক্তিযজ্ঞ। যজ্ঞ-ধূম ছড়িয়ে পড়ল সারা জেলার আকাশে-বাতাসে, সারা জেলার লোকের মনে। প্রত্যেকটি মানুষের মনে সমর্থন ছিল এর পিছনে। তবে স্বাভাবিক স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে দূরে সরিয়ে রাখবার প্রয়াসও ছিল।

ওদের পাড়ার সামনে রাস্তাটার ওপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা মাঠ ছিল। ছোট ছোট কাঁটা-ঝোপে ভর্তি। হলদে রঙের ফুল ফুটত অজস্র। সারা মাঠটা রঙিন হয়ে উঠত। মাঠের মাঝ দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ সরাসরি চলে গিয়েছিল স্টেশনের কাছে রেল-লাইন পর্যন্ত। রেল-লাইন পার হলেই একটা বড় রাস্তা—রেল-স্টেশন থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছিল। এই রাস্তা ধরে মাইলখানেক গেলেই কতকটা দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপরে একটা ভাঙা বাড়ি ছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়ে ওটা নাকি একটা দুর্গ ছিল। পাহাড়ের উপরে জঙ্গল ছিল। গভীর গুহা ছিল অনেক। বাঘ-ভালুকের আড্ডা ছিল নাকি সেখানে। ভাঙা বাড়িটায় নাকি বড় বড় সাপ ছিল। তা ছাড়া লোকে বলত ভূতের আড্ডাও ছিল। দিনের বেলাতেও কেউ ও পাহাড়ের পাশ ঘেঁষত না। শহরের বিপ্লবী তরুণেরা ওইখানেই আড্ডা করেছিল। সেখানে পুলিস হামলা করল একদিন। ধরা পড়ল জনকয়েক।

একদিন দাদাকে আর অপূর্বদাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল। মেরেছিল খুব। ওরা একটা কথারও জবাব দেয় নি। বিচার হল। দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন বিচারক। হাসিমুখে ওরা কারাদণ্ড মাথা পেতে নিল। বাবা ও মাসীমার সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। মাসীমা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন ওদের দেখে। সেও কেঁদেছিল। বাবা গম্ভীর হয়ে ছিলেন। ওরা সান্ত্বনা দিল মাসীমাকে। বাবাকে ও মাসীমাকে প্রণাম করল। সে প্রণাম করল ওদের। ওরা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল তাকে। সুদীর্ঘকালের জন্য যে ওরা তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের মুখ দেখে তাদের ভাব-ভঙ্গী দেখে বিন্দুমাত্র বোঝা যায় নি। যেন দুদিন পরেই আবার ঘরে ফিরবে এমনই ভাব। বাবা বাড়ি ফেরবার সময়ে বললেন, খোকা যে আমার এতখানি শক্ত হয়ে উঠেছে জানতাম না। ইতিহাসে যে রাজপুত বীরদের বীরত্ব-কাহিনী পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই, তাদের চেয়ে এদের বীরত্ব বিন্দুমাত্র কম নয়।

দাদা জেলে যাবার পরেই বাবা দমে গেলেন খুব। মুখের হাসি নিবে গেল একেবারে। মাসীমাও কান্নাকাটি করতেন প্রায়ই। বীরেনদা প্রায়ই এসে মাসীমার কাছে বসে নানা কথায় ওঁকে ভুলিয়ে রাখত। অপূর্বদাদের বাড়িতেও ওই অবস্থা। পিসীমা ভেঙে পড়লেন একেবারে। জ্যেঠামশায় কিন্তু শক্ত রইলেন। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা গেল না। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। অনাদিদা তাদের বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করল। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ও আর বেরুত না। পিসীমার কাছে কাছে থাকত।

ছ মাস পরে দাদার ও অপূর্বদার মৃত্যুর খবর এল। জেলে খুবই অত্যাচার চলত ওদের ওপর। ওরা বিদ্রোহ করেছিল। কর্তাদের আদেশে জেলের প্রহরীরা গুলি চালিয়েছিল। কয়েকজন আহত হয়েছিল। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল—অপূর্বদা, দাদা আর একজন ছেলে।

একমাত্র পুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যুর আঘাত বাবা সহ্য করতে পারেন নি। বাবার রক্তের চাপ এমনই বেশী ছিল, হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন একদিন। সারা বাম অঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। স্কুলের চাকরী গেল, প্রভিডেণ্ড-ফণ্ডের কিছু টাকা পাওয়া গেল। চিকিৎসাতে তার অর্ধেক খরচ হয়ে গেল। বাকী টাকায় কিছুদিন চলল। বোস জ্যেঠামশায় সাহায্য না করলে তাদের অনাহারে মরতে হত। বাবার অসুখের সঙ্গে সঙ্গেই ভাড়া নেওয়া বন্ধ করেছিলেন। তা ছাড়া রোজ দু টাকা করে দিতেন। তাতেই মাসীমা কোনরকমে সব খরচ চালাতেন।

বাবা অসুখে পড়ার কিছুদিন পরেই সরকার থেকে রামজীবন জ্যেঠামশায়ের ওপর শহর থেকে চলে যাওয়ার আদেশ জারি হল। ওঁরা সবাই কলকাতা চলে গেলেন। জ্যেঠামশায় আলিপুরে প্র্যাক্‌টিশ করতে লাগলেন।

মাসীমা হঠাৎ অসুখে পড়লেন। দুটি রোগীর সেবা, সংসারের সব কাজ তার ঘাড়ে পড়ল। এ সময় বীরেনদা খুব সাহায্য করল। মাসীমার চিকিৎসা ও সেবার ভার সে সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে নিল। মাসীমাকে সে নিজের মায়ের মত ভালবাসত। সে সময় দিনরাত সে তাদের বাড়িতে মাসীমার বিছানার পাশটিতে বসে থাকত। সে মাসীমার কাছে গেলেই তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। সেই দৃষ্টি যেন প্রদীপশিখার মত সহস্রকর দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরত। তার দিকে না তাকিয়েও তার দৃষ্টির স্পর্শ সর্বাঙ্গে সে অনুভব করত। একবার চোখ তুললেই চোখে চোখ মিলত; সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠত, ভাবনা-চিন্তা গুলিয়ে যেত। ওর চোখের সম্মোহনী শক্তি তার চোখকে টেনে ধরে রাখত, চেষ্টা করেও সে চোখ ফেরাতে পারত না। তখনই সে বুঝতে পেরেছিল যে, সে তার ওই দুটি চোখের দৃষ্টি-রশ্মি দিয়ে তাকে যেখানে ইচ্ছে টেনে নিয়ে যেতে পারে—তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারে।

একদিনের কথা মনে পড়ল রাধার। রোজ সন্ধ্যের পর তাকে বোস জ্যেঠামশায়ের কাছে যেতে হত। উনি আদালত থেকে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা-খাবার খেয়ে বেড়াতে বেরতেন। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরতেন, তারপর বৈঠকখানায় বসতেন। সেই সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর সাহায্যের টাকা নিয়ে আসতে হত। একদিন জ্যেঠামশায় কি একটা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁর মুহুরী বলল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

ফিরে আসবার সময় বীরেনদার সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করল, বাবার সঙ্গে দেখা হল?

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

তবে? টাকা না নিয়েই ফিরে যাচ্ছ?

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বীরেনদা বলল, মায়ের কাছে যাও নি?

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

বীরেনদা বলল, আচ্ছা, এস আমার সঙ্গে, আমি দেব।

সে বলল, আমি এখন যাই। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।

বীরেনদা বলল, কেন? আমার টাকা নিতে দোষ আছে নাকি?

চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বীরেনদা ধারাল স্বরে বলল, আসবে না?

সে বলল, না, যাই। মাসীমা একা আছেন।

বীরেনদা শ্লেষাক্ত স্বরে বলল, আসতে ভয় হচ্ছে বুঝি?

মুখে এল ওর: ভয় কি অন্যায়? কিন্তু চেপে গেল।

[ক্রমশ]

চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র*

(১৮৫৮-১৯৩২)

শ্রীসজনীকান্ত দাস

[শতবার্ষিক জন্মদিবস স্মরণে, আকাশ-বাণী, ৭ই নবেম্বর, ১৯৫৮]

সূত্রধার। আজ থেকে ঠিক এক শো বছর আগে ১২৬৫ সালের ২২-এ কার্তিক, শনিবার, ১৮৫৮ ইংরেজী সনের ৬ই নবেম্বর, শ্রীহট্ট জেলার পৈল গ্রামে চিন্তানায়ক ও বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পালের জন্ম হয়। আজ সেই দেশবরেণ্য পুরুষের শতবার্ষিক আবির্ভাব-দিন। তিনি এক দিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্যে যেমন সংগ্রাম করেছিলেন, অন্য দিকে তেমনই আজীবন স্বভূমি বাংলা দেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের উন্নতি বিধানে প্রভূত চিন্তা করে শুধু বাক্যে তা প্রচার করেন নি, ভাবী কালের মানুষের জন্যে তা লিপিবদ্ধও করে গেছেন। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনার ফল আমরা ভোগ করছি, তাই কৃতজ্ঞ চিত্তে আজ তাঁকে স্মরণ করব। স্মরণ করব সত্তর বছরে, এই জন্মদিনটিতে, স্বদেশ ও স্বভূমি সম্বন্ধে যে অপরূপ স্বীকারোক্তি করেছিলেন তিনি :

বিপিনচন্দ্র। এ জগতে আসিয়া ভারতবর্ষে জন্মিয়াছি, ইহা সৌভাগ্যের কথা। আবার যদি এই সংসারে জন্মিতে হয় তাহা হইলে এই ভারতবর্ষেই জন্মিতে চাই, সুখ-সমৃদ্ধিশালী অন্য কোন দেশে জন্মিতে চাই না। এই ভারতবর্ষের মধ্যে এই বাংলা দেশে জন্মিয়াছি, ইহা আরও সৌভাগ্যের কথা। সর্বোপরি এ বাংলা দেশে এ যুগে জন্মিয়াছি, ইহা পরম সৌভাগ্যের কথা। মৃত জাতি কি করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হয়, এ যুগে, এই বাংলা দেশে জন্মিয়া তাহা স্বচক্ষে অনেকটা দেখিয়াছি। এ পরম সৌভাগ্য সকলের ঘটে না।

সূত্রধার। বিপিনচন্দ্র অনন্যচিত্ত হয়ে স্বদেশের কল্যাণ ও হিতসাধনের জন্যে তপস্যা করেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা যেমন গভীর ছিল, সমসাময়িক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির প্রতি তেমনই তিনি ছিলেন আবাল্য খড়্গ-হস্ত। শ্রীহট্টে শিক্ষাজীবনের প্রায় সূত্রপাত থেকে গোঁড়া আত্যভিমানী বাবার সঙ্গে তাঁর কম সংঘর্ষ হয় নি। বিদ্যালয়ের পুঁথিগত গতানুগতিক শিক্ষার প্রতি তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিল না। পাঠ্যবহির্ভূত ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের বই থেকে তিনি বরাবরই অন্তরের সম্পদ আহরণ করতেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠেছিল আরও উদার, আরও সংস্কারমুক্ত। পৈল গ্রামের তো বটেই, শহর শ্রীহট্টেরও সামাজিক পরিবেশ তখন এমন ছিল যে লেমনেড বরফ পাঁউরুটি বিস্কুট খাওয়া তো দূরের কথা, ছুঁলেও জাত যেত। তাঁর যুক্তিবাদী মন এতে কোন অন্যায় বা অপরাধ হয় তা স্বীকার করত না। বাবার হাতে কঠোর লাঞ্ছনা সত্ত্বেও নিজের বুদ্ধি-বিশ্বাস মত চলবার সাহস তিনি দেখাতেন। এই স্বাধীনচিত্ততা তাঁর বরাবর বজায় ছিল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের প্রভাব কলকাতা থেকে সুদূর শ্রীহট্ট পর্যন্ত তখনই পৌঁছেছিল এবং তাঁর দুই সতীর্থ সীতানাথ দত্ত (পরে তত্ত্বভূষণ) ও সুন্দরীমোহন দাস (পরে ডাক্তার) সেই প্রভাবে পড়ে ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অন্ধ গোঁড়ামি ও বিকৃত জাতি-সংস্কার থেকে মুক্তিপ্রয়াসী বিপিনচন্দ্রও এই রকম একটা আশ্রয়ের জন্যে উন্মুখ হলেও কেশবচন্দ্র প্রচারিত ধর্মে স্বদেশপ্রেমের কোনও স্ফুরণ না দেখে তা সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারেন নি। সিলেট থেকে এনট্রান্স পাস করে ১৮৭৪ সনের শেষে কলেজের শিক্ষা লাভের জন্যে ধর্মবিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে বিপিনচন্দ্র কলকাতায় এলেন এবং ১৮৭৫ সনের গোড়ায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন হেয়ার স্কুলের হেড-পণ্ডিত। ব্রাহ্মধর্মের একজন পুরোধা হলেও স্বদেশ-প্রেমকে বর্জন করে নীরস ধর্ম প্রচারে তাঁর মতি ছিল না। উচ্চ সাহিত্য-প্রতিভারও অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনিই বিপিনচন্দ্রের সংশয় মোচন করলেন। এ কাহিনী বিপিনচন্দ্র স্বয়ং এই ভাবে বলেছেন :

বিপিনচন্দ্র। তথাকথিত পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ব্রাহ্মমতবাদ গ্রহণ করি নাই। হিন্দু সমাজের প্রচলিত দেবোপাসনা বা প্রতিমা পূজাকে পাপ বলিয়া আমি কখনও ভাবিতে পারি নাই। আমার

* আকাশ-বাণীর সৌজন্যে মুদ্রিত

পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা, আমি যে কুলে জন্মিয়াছি সে কুলের পিতৃলোকেরা, পুরুষ-পরম্পরায় এই পাপাচরণ করিয়াছিলেন, এরূপ কল্পনা করিতেও আমার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহী হইয়া উঠিত, এখনও (১৯২৭) উঠে। এইজন্য হিন্দু সমাজের প্রচলিত পূজা-পার্বণাদি পাপকর্ম, এই জ্ঞান আমার কখনও জন্মে নাই। সুতরাং পাপবোধে আমি আমার কুলধর্ম পরিত্যাগ করি নাই। ১৮৭৬ ইংরাজীর শেষভাগে তখনকার ব্রিটিশ সিংহাসনের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী যুবরাজ এডওয়ার্ড ভারতবর্ষে আসেন। কলিকাতায় আসিলে শ্রীহট্টের পণ্ডিতেরা তাঁহার নিকটে একখানা সংস্কৃত অভিনন্দন প্রেরণ করেন। এই অভিনন্দনে আমাদের স্বাজাত্যাভিমানে আঘাত লাগিয়াছিল। আমরা তীব্র সমালোচনা করিয়া 'শ্রীহট্ট প্রকাশে' এক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। [সম্পাদক] মনোহরবাবু আমাদের সমালোচনার প্রতিবাদ করেন। সুতরাং আমরা ইহার গুণাগুণ বিচারে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকটেই উপস্থিত হইলাম। এই সূত্রে তাঁহার সঙ্গে আমার একটা গভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠে। তাঁহার চরিত্রের আকর্ষণে ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ করি। আমি ধর্ম সম্বন্ধীয় মতবাদের দিক দিয়া ব্রাহ্মসমাজে আসি নাই; আসিয়াছিলাম একটা উন্নত ও উদার স্বাধীনতার আদর্শের সন্ধানে। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত হইবার পূর্বেই কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথের ভেরী বাজিয়াছিল। বাংলার নূতন রঙ্গমঞ্চে দেশ-মাতৃকার পূজার উদ্বোধন আরম্ভ হইয়াছিল। 'জাতীয় সঙ্গীতে'র প্রচার হইয়াছিল—

কতকাল পরে বল ভারত রে
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে।

—এই সকল আমাদের সাধনার মূল মন্ত্র হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজে সেকালের উপাসনা ও উপদেশাদিতে এই স্বাধীনতার সুর বাজিয়া উঠে নাই। দেশের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার বেদনা, বিদেশীয় শাসনের বিরাট অন্যায় ও অবিচারের অনুভূতি, তাঁহাদের তখনও ভাল করিয়া লাগে নাই। [প্রথম] শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে তাঁহার ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা—এ সকলের একটা সত্য ও সঙ্গত সম্মিলন ও সমন্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার নিকট সর্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু ছিল স্বাধীনতা। তাঁহার নিকটে এই স্বাধীনতাই ধর্ম ছিল। তিনিই আমাদের প্রথম দীক্ষাগুরু।

সূত্রধার। ১৮৭৭ সনের মাঝামাঝি এই স্মরণীয় দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। দীক্ষাগুরু শিবনাথ স্বয়ং তখন হেয়ার স্কুলের পণ্ডিত হিসাবে বিদেশী সরকারের চাকর। কাজেই প্রথম দিন এই স্বাধীনতার দীক্ষায় দীক্ষিত হতে পারেন নি। ছমাসের মধ্যে এই দাসত্বপাশ ছিন্ন করে ১৮৭৮ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি দীক্ষা নেন। প্রথম দিন হেয়ার স্কুলের দোতলায় শিবনাথের শয়নকক্ষে শরৎকুমার রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কালীশঙ্কর সুকুল, তারাকিশোর চৌধুরী, সুন্দরীমোহন দাস ও দ্বিতীয় দিন সিন্দুরিয়া পটির মল্লিকদের বাগান-বাড়িতে গগনচন্দ্র হোম, উমাপদ রায় ও স্বয়ং শিবনাথ শাস্ত্রী মোট এই নয় জন এই কঠোর দীক্ষায় দীক্ষিত হন। এঁরা প্রত্যেকেই আজ দেশবিখ্যাত স্মরণীয় মানুষ। দু দিনের পদ্ধতি ছিল একই, কাজেই একই দৃশ্যে এর বর্ণনা দিচ্ছি। আসুন, আমরা বিপিনচন্দ্রের ভাষায় সেই পবিত্র "প্রাচীন হিন্দু যজ্ঞ"-স্থলে উপস্থিত হই।

প্রথম দৃশ্য

শিবনাথ। এস, এই শুভ প্রত্যূষে আমরা সর্বাগ্রে পরমব্রহ্মের নাম স্মরণ করি। তিনিই মূলাধার। তিনিই ধর্ম, তিনিই দেশ। বল, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

সকলে। ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

শিবনাথ। এই মৃৎপাত্রে পাবক অগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছেন। আমরা আজ আমাদের সকল পাপ, সকল অশুচি, সকল অশুভ, সকল গ্লানি এই অগ্নিতে আহুতি দেব। এই রয়েছে অশ্বত্থ পত্র, এই রয়েছে হবিঃ। এক একটি অশ্বত্থ পত্রে প্রত্যেকে লেখ এক একটি ত্যাজ্য বস্তুর নাম। লেখ—কাম, লেখ—ক্রোধ, লেখ—লোভ, লেখ—হিংসা, লেখ—পৌত্তলিকতা, লেখ—জাতিভেদ, লেখ—নারী-অবরোধ, লেখ—পরাধীনতা; পরাধীনতা লেখ পাঁচ বার। লিখেছ?

সকলে। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিবনাথ। এই পত্রগুলি ঘৃতে সিক্ত করে ওই

সর্বগ্রাসী বহ্নিতে আহুতি দাও। বল, আমরা যে আদর্শ সাধনের জন্যে এই ব্রত গ্রহণ করছি, তার পরিপন্থী যা কিছু—নিজের প্রবৃত্তি, নিজের পাপ-বাসনা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক যে সব কু-ব্যবস্থা এই ব্রতের অন্তরায়, সেগুলিকে এই অশ্বত্থ পত্রের সঙ্গে এই হুতাশনে সমর্পণ করলাম। আহুতি দিয়েছ সকলে ?

সকলে। দিয়েছি।

শিবনাথ। এইবার সকলে সারিবদ্ধ হয়ে এই যজ্ঞাগ্নিকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এই দীক্ষা উপলক্ষে রচিত আমার গানটি গাও—"ত্রাণ যদি পাবে, প্রাণ দিতে হবে।"

সকলে। (অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে গাহিতে লাগিলেন)

ত্রাণ যদি পাবে, প্রাণ দিতে হবে,
নতুবা এ জ্বালা যাবে না।
(শুধু কথায় কিছু হবে না রে)
ও ভাই প্রেমের অনলে নিজে না দহিলে
সে দ্বারে পশিতে পাবে না।
(আহুতি না দিলে রে)
তাই প্রেম-ডোরে বাঁধ পরস্পরে
(এক হৃদয় হয়ে রে)
বেঁধে কর রে সত্য সাধনা।
তোদের প্রাণে প্রাণে শক্তি জেগে উঠুক,
দূরে যাক সব পাপ-বাসনা।
ত্রাণ যদি পাবে, প্রাণ দিতে হবে
নতুবা এ জ্বালা যাবে না॥

শিবনাথ। এইবার সকলে অগ্নির চারদিকে নতজানু হয়ে বস। যে প্রতিজ্ঞাগুলি আমরা রচনা করেছি একে একে সকলে তা পাঠ করে প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর কর। শরৎকুমার, তুমি প্রথম প্রতিজ্ঞা ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণ করে পাঠ কর। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলে তা উচ্চারণ করবে।

শরৎকুমার। আমরা প্রতিমা পূজা করিব না, এবং প্রচলিত প্রতিমা পূজার সঙ্গে কোনও প্রকারে সংশ্লিষ্ট থাকিব না। (সকলের যোগদান)

শিবনাথ। কালীশঙ্কর, তুমি দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা পাঠ কর।

কালীশঙ্কর। আমরা বাক্যে বা কার্যে জাতিভেদ মানিব না, এবং যাহাতে এই কু-প্রথা দেশ হইতে সম্পূর্ণ উঠিয়া যায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব।

(সকলের যোগদান)

শিবনাথ। সুন্দরীমোহন, তুমি তৃতীয় প্রতিজ্ঞা পাঠ কর।

সুন্দরীমোহন। আমরা পরিবারে ও সমাজে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিব এবং এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন করিব। (সকলের যোগদান)

শিবনাথ। উমাপদ, তুমি চতুর্থ প্রতিজ্ঞা পাঠ কর।

উমাপদ। পুরুষের বয়স একুশ ও নারীর বয়স ষোল পূর্ণ না হইলে নিজেরা বিবাহ সম্পাদন করিব না, অথবা অপরের সেরূপ বিবাহ সমর্থন করিব না। (সকলের যোগদান)

শিবনাথ। তারাকিশোর, তুমি পঞ্চম প্রতিজ্ঞা পাঠ কর।

তারাকিশোর। আমরা নারী-শিক্ষা ও লোক-শিক্ষা বিস্তারে প্রাণ পণ করিব। (সকলের যোগদান)

শিবনাথ। গগনচন্দ্র, তুমি ষষ্ঠ প্রতিজ্ঞা পাঠ কর।

গগনচন্দ্র। আমরা নিজেদের এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও শৌর্যবৃদ্ধির জন্য ব্যায়ামচর্চার প্রচার করিব এবং নিজেরা অশ্বারোহণ ও বন্দুক চালনা অভ্যাস করিয়া অপরকে শিখাইব। (সকলের যোগদান)

শিবনাথ। আনন্দচন্দ্র, তুমি সপ্তম প্রতিজ্ঞা পাঠ কর।

আনন্দচন্দ্র। আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব না। সকলের অর্জিত অর্থ সাধারণ ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে এবং সেখান হইতে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ স্বদেশের হিতকর কাজে লাগাইব। (সকলের যোগদান)

শিবনাথ। বিপিনচন্দ্র, এইবার তুমি আমাদের অষ্টম বা শেষ প্রতিজ্ঞা পাঠ করে অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ কর।

বিপিনচন্দ্র। আমরা একমাত্র স্বায়ত্তশাসনকেই বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন-ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিব এবং দুঃখ দারিদ্র্য দুর্দশা দ্বারা নিপীড়িত হইলেও বিদেশী গবর্মেন্টের অধীনে কখনই দাসত্ব স্বীকার করিব না।

(সকলের যোগদান)

শিবনাথ। আজ আমাদের জীবনের, এবং আমরা প্রতিজ্ঞা পালনে দৃঢ় থাকলে আমাদের দেশেরও একটি স্মরণীয় দিন। যে মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়ে এই কঠোর ব্রতে আমরা ব্রতী হলাম, তা পালন করবার শক্তি তিনিই আমাদের দেবেন, যিনি সকল শক্তির উৎস। এস তাঁর স্তুতিগান করে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করি। গাও—(সকলে গাহিলেন)

নমস্তে সতেতে জগৎকারণায়;
নমস্তে চিতে সর্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যম ত্বমেকং বরেণ্যম,
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্তৃ-পার্তৃ-প্রহর্তৃ।
ত্বমেকং পরমনিশ্চলং নির্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকম্,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥

সূত্রধার। ইতিমধ্যে ১৮৭৫ সনের গ্রীষ্মকালে মায়ের মৃত্যু এবং এই-দীক্ষা বাবার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের প্রায় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিল। তিনি ১৮৭৮ সনে শেষ বারের জন্য যখন ফার্স্ট আর্টস বা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দেন তখন পৈতৃক সাহায্য বন্ধ হয়েছে। ফেল করলেন এবং পুনরায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারলেন না। নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে তাঁকে চেষ্টা করতে হল, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন শুরু হল তাঁর জীবনে। এই সময়ে বিপিনচন্দ্রের নিজের কথা এই :

বিপিনচন্দ্র। এই দীক্ষা লইয়াই আমার জীবনে একরূপ যুগান্তর উপস্থিত হইল। ইহার পূর্বে আমি হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে সকল সম্বন্ধ কাটিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হই নাই। ব্রাহ্মমন্দিরে যাইতাম বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতাঠাকুরাণীর শ্রাদ্ধাদিও করিতাম। কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে রাজী হইলাম না। ১৮৭৭-৭৮-র শীতের ছুটিতেও বাড়ি গেলাম না। ১৮৭৮-এর গ্রীষ্মের ছুটিও কলিকাতায় কাটাইলাম। বাবা তাহার পূর্ব হইতেই আমার কলিকাতার খরচের টাকা পাঠানো বন্ধ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে আমি সমাজে থাকিয়া তাঁর বংশধারা রক্ষা করিব এই আশা যখন আর রহিল না, তখন তিনি চৌষট্টি বৎসর বয়সে পিণ্ড লোপ পাইবার আশঙ্কায় তৃতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন।

সূত্রধার। কাজেই বিপিনচন্দ্রকে উপার্জনের পথ খুঁজতে হল। এফ.এ. ফেল করা ছেলেরও তখন চাকরীর বাজারে দাম ছিল। কলকাতায় কিন্তু চাকরী মিলল না। কটকে প্যারীমোহন আচার্য কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত এনট্রান্স স্কুল 'কটক একাডেমী'র হেডমাস্টারীর জন্য দরখাস্ত করলেন। দরখাস্তের চোস্ত ইংরেজীতে মুগ্ধ হয়ে প্যারীমোহন বিপিনচন্দ্রকেই নির্বাচিত করলেন। তাঁর বয়স তখন সবে কুড়ি, দেখতেও ছোটখাটো। এই চাকুরী-জীবনে স্বত্বাধিকারী প্যারীমোহনের সঙ্গে মিলন ও সংঘর্ষের দুটি দৃশ্যে বিপিনচন্দ্রের জ্ঞানানুশীলন ও স্বাধীনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কটক একাডেমীর রেক্টর প্যারীমোহনের কক্ষ]

প্যারীমোহন। যাক্‌, তুমি আমাকে খুব বাঁচিয়েছ বিপিনচন্দ্র। তোমার চেহারা দেখে আমি তো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ছাত্রেরা সবাই শুধু দেখতেই নয় বয়সেও তোমার চাইতে বড়। তুমি কি করে এদের শাসনে রাখবে, আমার ভাবনা হয়েছিল খুব। তুমি এখনও অজাতশ্মশ্রু, প্রায় বালকের মত, তোমার ছাত্রদের ইয়া ইয়া গোঁফদাড়ি—দেখেছ তো !

বিপিনচন্দ্র। আমি কিন্তু একটু ভয় পাই নি স্যার। আত্মবিশ্বাসে যে দৃঢ় কিছুতেই তার ভয় হয় না। আমি জানতাম কথায় আর ব্যবহারে এদের আমি বশ করব।

প্যারীমোহন। সে তুমি ওস্তাদের মত করেছ বাপু। আমি নিজের চোখে তোমার কৃতিত্ব দেখে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছি। প্রথম যেদিন তুমি প্রথম শ্রেণীর ছেলেদের ইংরেজীর ক্লাস নিলে, শুধু তোমাকে পরীক্ষা করবার জন্যেই নয়, একটু কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পাশের কামরার দরজা কিঞ্চিৎ ফাঁক করে অপেক্ষা করছিলাম। তোমাকে ছেলেমানুষ দেখে ধাড়ি ছেলেরা তো টেবিল চাপড়ে মেঝেতে জুতো ঘষে, শিস দিয়ে ক্লাসরুমে রীতিমত প্যাণ্ডিমনিয়াম সৃষ্টি করে তুললে। ভাবলাম, সামলাতে বুঝি বেত হাতে আমাকেই ছুটতে হয়। কিন্তু না, একটু মাথা নীচু করে চুপ করে থেকে, টেবিল থেকে লেথব্রিজের 'ইংলিশ সিলেকশন'খানা তুলে নিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে যখন তুমি কোলরীজের 'এনশিয়েণ্ট মেরিনার' পড়তে শুরু করলে তখন আমিই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলাম। ছেলেরাও প্রথমটা বিস্ময়ে চমকে উঠে একটু উস্‌খুস করে ধীরে ধীরে কেমন শান্ত হয়ে এল। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কি অপূর্ব তোমার কণ্ঠ, কি চমৎকার তোমার কাব্যবিশ্লেষণ।

বিপিনচন্দ্র। কি করে কি হল, আমি নিজেই বুঝতে পারি নি স্যার। সিলেটের স্কুলে এই বই-ই আমি পড়েছিলাম, কিন্তু তখন ঠিক মর্মগ্রহণ করতে পারি নি। এখানে ক্লাসের ছাত্রদের তুমুল হট্টগোলের মধ্যে সেই কবিতাই যখন পড়তে লাগলাম, অবাক হয়ে দেখলাম, কবিতার আসল তাৎপর্য আমার মনে আপনা থেকেই উদ্ভাসিত হতে লাগল। কোথা থেকে শক্তি পেলাম জানি না, আগে যা পড়ি নি, শিখি নি, যা ভাবি নি, সেই সব নিগূঢ় অর্থ কে যেন আমাকে জুগিয়ে দিলেন। নিজের ব্যাখ্যা নিজে শুনে আমি বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে উঠলাম।

প্যারীমোহন। বিপিনচন্দ্র, তুমি পারবে। আমার আর ভয় বা সন্দেহ নেই। এই অপূর্ব বাগ্মিতা তোমার ভগবদ্দত্ত শক্তির প্রকাশ। এর উপযুক্ত বিকাশ হলে তুমি অদ্বিতীয় বক্তা হয়ে পৃথিবী জয় করতে পারবে। আমি আশীর্বাদ করছি—

[এই দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটছে কয়েক মাস পরে]

বিপিনচন্দ্র। এইবার আশীর্বাদ করুন স্যার, যেন আমি আমার প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই। আমি আজ আপনার চাকরীতে ইস্তফা দিতে এসেছি।

প্যারীমোহন। পুজোর ছুটিতে দেশে গিয়ে এ আবার কি হল তোমার ?

বিপিনচন্দ্র। কি হয়েছে আপনি ভালই জানেন। আমি যে ছজন ক্যাণ্ডিডেটকে সেণ্ট-আপ করে ফর্ম সই করে রেখে গিয়েছিলাম, এসে দেখছি তার সঙ্গে এমন একজন যোগ হয়েছে যাকে আমি কিছুতেই ফাইনাল পরীক্ষায় পাঠাতে পারি না। দায়িত্ব যখন আপনি নিজেই নিচ্ছেন তখন আত্মসম্মান বজায় রেখে এখানে থাকা

আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি আমাকে ক্ষমা করে রেহাই দিন। আর এই আশীর্বাদই করুন যেন আমার প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাই।

সূত্রধার। নির্ভীক বিপিনচন্দ্র এই সামান্য অসম্মানও বরদাস্ত করলেন না। চাকরী ছেড়ে দিলেন। পরবর্তী কালে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন, "এই চাকুরী গ্রহণ ও বর্জন দুইই আমার জীবনের উন্নতির দুটি ধাপ।" কটকে থাকতে থাকতেই অনেক সভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। সেখানকার ব্রাহ্মসমাজেও তিনি অনেক উপাসনা উপদেশ পরিচালনা করেছিলেন, ফলে বক্তৃতা ব্যাপারে তাঁর এমন আত্মপ্রত্যয় জন্মাল যে, তিনি কলকাতায় ফিরে অকুতোভয়ে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন। ১৮৮০ সনে সিলেটে গিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় স্থাপন করলেন "সিলেট ন্যাশনাল স্কুল"। স্কুল পরিচালনার সঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচার তাঁর প্রধান কাজ হল। বাবা তখনও জীবিত, কাজেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। একঘরে হলেন বিপিনচন্দ্র। সামাজিক লাঞ্ছনায় দমবার পাত্র তিনি নন। সিলেটে একটি ছাপাখানা স্থাপন করে সাপ্তাহিক 'পরিদর্শক' পত্রিকা বের করে সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হলেন। 'পরিদর্শক' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। খ্যাতি ছড়াতে লাগল বিপিনচন্দ্রের। কিন্তু সিলেটের কর্মক্ষেত্র তাঁর মত বিপ্লবী বীরের পক্ষে সংকীর্ণ। তাঁকে আসতে হল রাজধানী কলকাতায়। তখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুখ্যাত। ১৮৯৮ সনে যখন ভারতবর্ষের একেশ্বরবাদীরা ইংলণ্ডে একজন প্রতিনিধি পাঠাতে মনস্থ করলেন তখন তাঁরা নির্বাচিত করলেন জ্ঞানে ও বাগ্মিতায় খ্যাতিমান বিপিনচন্দ্রকে। ১৮৯৮ সনের অক্টোবর মাসে তিনি পৌছলেন লণ্ডনে। শুরু হল তাঁর আন্তর্জাতিক জয়যাত্রা। এই সময়ে টেম্পারেন্স আন্দোলনের নেতা ডবলু. এস কেইনের সংস্পর্শে এসে ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে মাদকতা নিবারণী বক্তৃতা করে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে এমনই প্রসিদ্ধি লাভ করলেন যে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নিউইয়র্ক ন্যাশনাল টেম্পারেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সাদর আমন্ত্রণে এবং তাঁদেরই খরচে তাঁকে যেতে হল নিউইয়র্কে। তাঁর জীবনের আর একটি মোড় ফিরল সেখানেই। দুর্ভাগা দেশজননীর ক্রোড় ত্যাগ করে তিনি যখন ইউরোপ আমেরিকায় চোস্ত ইংরেজীতে একেশ্বরবাদ ও মাদকতা নিবারণ বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছেন তখন একটি ঘটনায় এমন মানসিক ধাক্কা খেলেন যে স্বদেশের জন্য তাঁর মন কেঁদে উঠল। ঘটনাটি এই :

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান নিউইয়র্ক, ন্যাশনাল টেম্পারেন্স সোসাইটির ফ্যামিলি হোটেল। হোটেলের ম্যানেজার, হোটেলের পুরাতন বাসিন্দা মিঃ ওয়াশিংটন ও বিপিনচন্দ্র]

ম্যানেজার। গুড আফটারনুন মিঃ পাল, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি সবেমাত্র ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে জাহাজ থেকে নেমেছেন ; অথচ আপনাকে স্নান আহার বিশ্রামের সুযোগ না দিয়ে বিরক্ত করতে এসেছি। আমাদের একজন পুরনো বোর্ডার আপনি ভারতবর্ষ থেকে আসছেন শুনে লাঞ্চ পর্যন্ত না খেয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে লাইব্রেরি ঘরে অপেক্ষা করছেন। অদ্ভুত খেয়ালী লোক, নাছোড়বান্দা। আমি বাধ্য হয়েই আপনাকে বিরক্ত করছি স্যার।

বিপিনচন্দ্র। ভদ্রলোক বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দের একজন ভক্ত। ভারতের মানুষের প্রতি তাই তাঁর এত টান।

ম্যানেজার। বলতে পারি না। তবে ইনি বিয়ে-থা করেন নি, সন্ন্যাসীর মতই থাকেন। করেন কোম্পানির কাগজের দালালি। খুব স্পষ্টবক্তা, ভালমানুষ। তাই তাঁকে নিরাশ করতে পারলুম না। আবার মাপ চাইছি স্যার।

বিপিনচন্দ্র। আপনি মিথ্যে এত লজ্জিত হচ্ছেন, যান এখুনি তাঁকে নিয়ে আসুন।

[ম্যানেজার চলে গেলেন এবং ভদ্রলোককে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলেন]

মিঃ ওয়াশিংটন। গুড আফটারনুন মিঃ পাল। আমার অদম্য কৌতূহল আমাকে অসভ্য করে তুলেছে। অপরাধ নেবেন না।

বিপিনচন্দ্র। অপরাধ নেব কি ? এ তো আমার সৌভাগ্য।

ওয়াশিংটন। You come from a great country Sir, you are a representative of a great nation, who are destined to be the teachers of the world. এক মহৎ দেশ থেকে আপনি এসেছেন স্যার। এক মহৎ জাতির প্রতিনিধি আপনি, বিধাতার নির্দেশে যে জাতি জগতের শিক্ষাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু—

বিপিনচন্দ্র। আপনি কি স্বামী বিবেকানন্দকে স্মরণ করে এ সব কথা বলছেন ? আপনি কি তাঁর শিষ্য ?

ওয়াশিংটন। আজ্ঞে না। আমি আমেরিকান প্রেসবিটিরিয়ান চার্চের একজন সভ্য মাত্র। বিবেকানন্দের শিষ্যও নই, হিন্দুধর্মেও দীক্ষা গ্রহণ করি নি। আমি সাদাসিধে সাধারণ একজন মানুষ। শুনলাম আপনি ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে এ দেশে এসেছেন। তাই মনে হল আমার কথাটা আপনাকে গোড়াতেই বলা

দরকার। মিঃ পাল, আপনার প্রচারের স্থান ইংলণ্ড বা আমেরিকা নয়। স্বদেশে ফিরে যান এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করুন। আধুনিক জগতের শিক্ষাগুরু আপনারা, কিন্তু আগে আপনাদের মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করে গুরুর যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। You cannot fulfil this destiny until you are able to 'look the world horizontally in the face. যতদিন না আপনারা অন্যান্য জাতির সঙ্গে এক আসনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের চোখে চোখে তাকাতে পারছেন অর্থাৎ তাদের সমকক্ষ না হচ্ছেন ততদিন আপনারা বিধাতা-নির্দিষ্ট সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারবেন না।

বিপিনচন্দ্র। মিঃ ওয়াশিংটন, আপনি আমাকে অভিভূত করে দিলেন। আপনার কথাগুলি আমার অন্তরাত্মাকে পর্যন্ত নাড়া দিয়েছে। আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। সত্যিই আমাদের অধিকার নাই। আমাকে দেশে ফিরে যেতেই হবে।

সূত্রধার। বিপিনচন্দ্র তাঁর ডাইরিতে সেদিনকার কথা এইভাবে লিখেছেন—

বিপিনচন্দ্র। আজ নিউইয়র্কের এই হোটেলে এই মার্কিন বন্ধুর অপ্রত্যাশিত সম্বর্ধনার মধ্যেই আমার অজ্ঞাতসারে আমার অন্তরে নূতন, সত্য স্বাদেশিকতার জন্ম হইল। আমি বুঝিলাম, কেবল নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনের দ্বারাই ভারতবর্ষ আধুনিক জগতে যে ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য বাঁচিয়া আছে, তাহা সফল হইবে না। যতদিন না ভারতের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ঘুচিতেছে এবং আমরা স্বাধীন ও সপ্রতিষ্ঠ জাতিসকলের মাঝখানে স্বাধীন ও সপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি ততদিন আমাদের যাহা দিবার আছে জগতের লোকে তাহা গ্রহণ করিবে না। ভারতবর্ষ যতদিন ইংরেজের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহার রত্নভাণ্ডার বিদেশীরাই লুটিয়া লইবার চেষ্টা করিবে, সে নিজের হাতে সে ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া বিশ্বমানবের জ্ঞানকোষের সমৃদ্ধি সাধন করিতে পারিবে না। এই কথাটা এমন সোজাসুজিভাবে আগে কেহ কহে নাই। আর আমিও আধুনিক ভারতের সকল সাধনের পূর্বকৃত্য সাধন যে স্বাধীনতা লাভ, এই কথাটা সমুদয় জ্ঞান ও সমুদয় ভাব দিয়া বুঝিতে পারি নাই। মার্কিন প্রবাসের এইটি হইল আমার সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ লাভের বিষয়।

সূত্রধার। নতুন উদ্দীপনা ও কর্মপ্রেরণা নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন বিপিনচন্দ্র। বের করলেন সাপ্তাহিক 'নিউ ইণ্ডিয়া', তাঁর অগ্নিদীপ্ত বাণীতে সচকিত হয়ে উঠল দেশ। হল বঙ্গভঙ্গ। হল স্বদেশী আন্দোলন। প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় মহাবিদ্যালয়, সেখানে অধ্যাপনা করতে এলেন বরদা থেকে অরবিন্দ ঘোষ। বিপিনচন্দ্র সপ্তাহে সপ্তাহে দেশের লোককে স্বাধীনতার কথা শুনিয়ে আর তৃপ্ত নন, তিনি বের করলেন ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরং'; অরবিন্দ এসে যোগ দিলেন তাতে। একদিকে মাতৃভাষায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' এবং বারীন্দ্র-ভূপেন্দ্র-উপেন্দ্র-দেবব্রতের 'যুগান্তর'—অন্যদিকে বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের ইংরেজী 'বন্দেমাতরং'—বাংলা দেশে যেন আগুনের হল্কা বইতে লাগল। ব্রিটিশের লৌহকঠিন শাসন-শৃঙ্খল ঝনঝন করে উঠল ভারতের অঙ্গে, আমলাতন্ত্রের স্টীল-ফ্রেমে কাঁপন ধরল। মুক্তি-যজ্ঞ আরম্ভ হল বাংলা দেশে। রাজার বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষ্যাপানোর অপরাধে শোষক-শাসক চাইলেন শায়েস্তা করতে 'বন্দেমাতরং'কে ; চাইলেন অরবিন্দ ঘোষকে শাসন করতে। একমাত্র বিপিনচন্দ্রের সাক্ষ্যে অরবিন্দের অপরাধের প্রমাণ হতে পারে। সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল তাঁকে। তিন দিন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংসফোর্ডের এবং একদিন ম্যাজিস্ট্রেট রামঅনুগ্রহনারায়ণ সিংহের এজলাসে সাক্ষ্য আদায়ের অভিনয় চলল, একটি দৃশ্যে এই চার দিনের ঘটনার নাটক হবে এই রকম।

চতুর্থ দৃশ্য

[মিঃ কিংসফোর্ডের এজলাস, ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস, মিঃ কিংসফোর্ড, সরকারী কাউনসেল মিঃ গ্রেগরি, এজলাসের কেরানী ও বিপিনচন্দ্র।]

কেরানী। আপনাকে শপথ নিতে হবে স্যার।

বিপিনচন্দ্র। আমি এই মামলায় কোনই সাক্ষ্য দেব না, কাজেই শপথও নেব না।

কিংসফোর্ড। আপনি সত্য বলবেন এইটুকু প্রতিশ্রুতি দিলেই চলবে, শপথের দরকার নেই।

বিপিনচন্দ্র। ক্ষমা করবেন, এই মামলায় কোন অংশ গ্রহণ করতে আমার বিবেকের বাধা আছে। আমি মনে করি—

কিংসফোর্ড। এই সুযোগে আদালতে বক্তৃতা করতেও আপনাকে দেব না, মিঃ পাল।

বিপিনচন্দ্র। বেশ, আমি চুপ করলাম।

কিংসফোর্ড। কিন্তু চুপ করে থাকবার জন্যে তো আপনাকে সাক্ষী মানা হয় নি।

বিপিনচন্দ্র। আমি সাক্ষ্য দেব না।

কিংসফোর্ড। মিঃ গ্রেগরি, এখন কি করা যায় বলুন।

গ্রেগরি। আদালত অবমাননার দায়ে সাক্ষীকে সোপর্দ্দ করতে পারেন।

কিংসফোর্ড। তা আমি করতে চাই না। মিঃ গ্রেগরি, আপনিই ওঁকে প্রশ্ন করুন না।

গ্রেগরি। মিঃ পাল, 'বন্দেমাতরং' নামের কোনও সংবাদপত্রের কথা আপনি জানেন ?

বিপিনচন্দ্র। আমি জবাব দেব না।

[আদালতে গুঞ্জন উঠিল]

কিংসফোর্ড। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝে নিতে চাই, সাক্ষী দিতে আপনার কোথায় আটকাচ্ছে।

বিপিনচন্দ্র। আপনি দয়া করে বলবেন কি, আমার কাজ ও সময় নষ্ট করে এভাবে আমাকে সাক্ষ্য দিতে ধরে আনার কি অধিকার আপনার!

কিংসফোর্ড। আইন আমাকে সে অধিকার দিয়েছে।

বিপিনচন্দ্র। আইন তো আকাশ থেকে নামে না, আইনের পেছনে আইনের কর্তা থাকে। সকল আইনের পেছনে নৈতিক সমর্থন থাকা চাই। এই সমর্থন থাকলে তবে আইনের সার্থকতা। প্রজার ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য যে শান্তি ও শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করে বিচারকের কাজ হচ্ছে সে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান। এ ক্ষেত্রে সমাজের প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য বিচারককে সাহায্য করা এবং তা করতে হলে কিছু ত্যাগ স্বীকারও যদি করতে হয় তাও করা।

কিংসফোর্ড। আপনি ঠিক বলেছেন, চমৎকার বলেছেন মিঃ পাল।

বিপিনচন্দ্র। কিন্তু যে মামলায় সমাজের মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষিত না হয়ে ব্যাহত হয়, শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, সে মামলায় সাহায্য না করাই সামাজিক কর্তব্য নয় কি?

কিংসফোর্ড। আমি তো সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ হচ্ছে, না রক্ষিত হচ্ছে, তাই দেখবার জন্যে আছি।

বিপিনচন্দ্র। চুরি ডাকাতি প্রভৃতি সাধারণ অপরাধের বেলায় আপনাকে সাহায্য করতে আমি বাধ্য। এমন কি আমার নিজের ছেলে যদি আসামী হত তা হলেও তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতাম, কিন্তু, বর্তমান মামলা সাধারণ মামলা নয়।

কিংসফোর্ড। কেন নয়?

বিপিনচন্দ্র। এ মামলা রুজু হয়েছে উপরওয়ালার হুকুমে, কোনও প্রত্যক্ষ আইন-বিরোধী কাজের জন্যে নয়। কোন্‌টা রাজদ্রোহ, কোন্‌টা রাজদ্রোহ নয়, এ বিচার তাঁরাই আগে থাকতে করে ধরপাকড় করে থাকেন, তাঁদের যদি ভুল হয়, আপনার বিচারেও ভুল হবে। আসামীকৃত কোন অপরাধের বিচার এখানে হচ্ছে না, বিচার হচ্ছে তার কার্যকলাপের দ্বারা ভবিষ্যতে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে কিনা তারই, কর্তৃপক্ষ সে বিচার আগেই সেরে রেখেছেন। কাজেই আপনার আদালতের বিচার নিরর্থক।

কিংসফোর্ড। দেখুন মিঃ পাল, আমি পৃথিবীর অন্য দেশের পলিটিশিয়ানদের খবর রাখি। কোথায়ও তাঁরা আদালতে সাক্ষী দিতে নারাজ এমন তো শুনি নি।

বিপিনচন্দ্র। আমি যদি ইংলণ্ডের লোক হতাম, সাক্ষ্য দিতে নারাজ হতাম না, শুধু এই ভরসায় যে আমার ভোটের দ্বারা আমি প্রয়োজন হলে আইনও পাল্টাতে পারি। কিন্তু এখানে সে অধিকার যখন আমার নেই, সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করেও আমার কর্তব্যপালন করতে পারি।

কিংসফোর্ড। এর শাস্তি কী আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

বিপিনচন্দ্র। আমার চাইতে শতগুণে মহত্তর মানুষ যখন নিজেদের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে গিয়ে এর চাইতে কঠিনতর শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছেন, ছমাস বিনাশ্রমে কারাবাস তো সে তুলনায় শাস্তিই নয়।

কিংসফোর্ড। সেই শাস্তিই আপনাকে দেওয়া হল।

বিপিনচন্দ্র। ধন্যবাদ।

সূত্রধার। ১৯০৭ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বিপিনচন্দ্র কলকাতার প্রেসিডেন্সী জেলের ভেতর প্রবেশ করলেন, সেখান থেকে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁকে সরানো হল বক্সার জেলে। সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে ট্রেনে করে হাওড়া স্টেশনে পৌছুলেন ১৯০৮ সনের ৯ই মার্চ সকালে। বিদেশী শাসনলাঞ্ছিত দেশপ্রাণ বীরের অসংখ্য ভক্ত হাওড়া পুলের মুখে অপেক্ষা করছিল, বিপিনচন্দ্রকে ফুলের মালায় সজ্জিত ও অভিষিক্ত করে এক রকম কাঁধে কাঁধেই বহন করে বিপুল জনতার শোভাযাত্রা কলকাতা মহানগরীকে মথিত-উদ্বেল করেছিল সেদিন। 'বন্দেমাতরম্' ও 'বীর বিপিনচন্দ্রে'র জয়ধ্বনিতে আলোড়িত হয়েছিল ভারতের তদানীন্তন রাজধানীর আকাশ। মনস্বী বিপিনচন্দ্র, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র দেশবরেণ্য নেতারূপে সকলের পূজ্য ও প্রিয় হয়ে উঠলেন। টনক নড়ল হীল-ক্রেমের। তাঁকে নির্বাসনে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল ক্রেমের মাথাদের মধ্যে। বিপিনচন্দ্র সেই লাঞ্ছনা ঘটবার পূর্বেই স্বেচ্ছানির্বাসিত করলেন নিজেকে একেবারে ইংলণ্ডে। সেখানে ১৯০৮ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত তিন বছর তিনি মাতৃভূমির হিতসাধনে নিযুক্ত রইলেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হল 'রিভিউ অব্‌ রিভিয়ুজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত উইলিয়ম টমাস স্টেডের সঙ্গে, বিপিনচন্দ্রকে যিনি সারা জগতের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন এই বলে:

উইলিয়ম স্টেড। Bipin Chandra Pal is a man with a right to be heard on the subject in which he writes. He is a Hindoo who believes in his religion. He is an Indian who believes in his country. He has assimilated our Western culture and he uses it to interpret to us the Eastern mind. He could not do us a better service. Mr. Pal, while never abating in the least the fervour of his Nationalist aspirations, has a width of outlook and a well-balanced impartial judgment which is rare in any man, let alone a Nationalist who has suffered imprisonment for his cause. বিপিনচন্দ্র পাল

যে বিষয়ে লেখেন সে বিষয়ে কথা শোনাবার তিনি অধিকারী। তিনি স্বধর্মে আস্থাবান হিন্দু, তিনি স্বদেশের প্রতি আস্থাশীল ভারতীয়। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীর কাছে প্রাচ্য সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করেন। এর চেয়ে বেশী উপকার অন্য কোনও ভাবে করতে পারতেন না আমাদের। স্বীয় জাতীয়তাবাদের উদ্দীপনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় সম্পূর্ণ অটল থেকেও মনের এমন উদারতা ও এমন নিরপেক্ষ বিচার-বিবেচনা তিনি দেখিয়ে থাকেন যা অন্যের মধ্যে কদাচিৎ দেখেছি, যে মানুষ তাঁর জাতীয়তার জন্যে কারাভোগ করেছেন তাঁর মধ্যে তো নয়ই।

সূত্রধার। এই মহামতি স্টেডের বৈঠকখানায় ১৯১১ সনের ২০এ সেপ্টেম্বর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার ঠিক আগে উইলিয়ম স্টেড ও বিপিনচন্দ্রের আলাপই আমাদের শেষ দৃশ্য।

পঞ্চম দৃশ্য

[উইলিয়ম স্টেড ও বিপিনচন্দ্র]

স্টেড। প্রায় তিন বছর স্বেচ্ছানির্বাসন ভোগ করে আপনি স্বদেশে ফিরছেন মিঃ পাল। এই দীর্ঘকাল ধরে আমাদের দেশকে আপনি ভাল করেই দেখলেন, অনেক কিছু শুনলেন, অনেক জানলেন। আমাদের দেশ সম্বন্ধে কী ধারণা নিয়ে যাচ্ছেন, সে প্রশ্ন আজ আপনাকে করব না। আপনি নিজে এই সময়ের মধ্যে নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে, নানা জনের সঙ্গে আলাপে এবং সাময়িক পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখে এ দেশের লোককে শিখিয়েও গেলেন অনেক কিছু। আপনাকে আজ আমার শুধু জিজ্ঞাস্য আপনার দেওয়া শিক্ষার মূল লক্ষ্য কী ছিল।

বিপিনচন্দ্র। মিঃ স্টেড, আপনার কাছে স্বীকার করতে বাধা নেই, ইংলণ্ডবাসীরা আমার ততটা লক্ষ্যের বিষয় ছিলেন না, যতটা ছিলেন এখানকার প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা। এখানে থেকে সেই সব তরুণ শিক্ষিত যুবককে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যেন তারা স্বদেশে ফিরে জননী জন্মভূমির সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে পারে।

স্টেড। সাধু, সাধু!

বিপিনচন্দ্র। I have also endeavoured always to teach both to the English and to the Hindu that India's future must be a matter of national development. We do not wish parliamentary or any other institutions to be imposed upon us from without; we wish to evolve our own institutions in harmony with our national history and national characteristics. আমি আরও চেয়েছিলাম এদেশীয় ও ভারতীয় দুই দলকেই বোঝাতে যে ভারতের ভবিষ্যৎ তার জাতীয় উন্নতির ওপরেই নির্ভর করছে। বাইরে থেকে আমাদের ঘাড়ে পার্লামেন্টারি অথবা অন্য কোনও শাসন-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হবে এ আমরা চাই না। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমরা নিজেরাই ধীরে ধীরে আমাদের শাসন-পদ্ধতি গড়ে তুলতে চাই।

স্টেড। এ আপনি খুব সমীচীন কথা বলছেন মিঃ পাল।

বিপিনচন্দ্র। আমি আপনাকে একান্ত আপনার জন মনে করে সরল ভাবে অন্তরের কথা নিবেদন করছি। কিছু মনে করবেন না আপনি।

স্টেড। সে কি কথা! আপনি বলুন, আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনছি।

বিপিনচন্দ্র। What I want in India is the growth of a great spiritual revival among the people. This has already begun. India's power lies in the realm of thought, rather than in the realm of matter. The more our people can be infused and enthused with the ideas of the great teachers who have moved the thought and life of successive generations of Indian people, the more potent will be their influence on outside nations. আমি চাই ভারতের জনসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক নবজাগরণ হোক ও ধীরে ধীরে তার প্রসার হোক। অবিশ্যি এই জাগরণের সূচনা হয়েছে। ভারতের শক্তি চিন্ময়, মৃণ্ময় নয়। যে মহান্ গুরু সম্প্রদায় বংশপরম্পরায় তাঁদের উপদেশের দ্বারা ভারতের জনসাধারণের চিন্তাধারা এবং জীবনধারা গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে গেছেন সেই সব মহাপুরুষদের সাধনালব্ধ বাণী ভারতবাসীদের যত উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করবে অন্য দেশের উপর তারা তত বেশী কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

স্টেড। আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করছি আপনার সেই মহৎ ভারতবর্ষের পুনরুত্থান হবে। আপনি দেশে ফিরে সেই উদ্দেশ্যকে সফল করার সাধনা করুন। ভারতবর্ষের জয় হোক।

বিপিনচন্দ্র। কল্যাণ হোক ইংলণ্ডের।

সূত্রধার। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন বিপিনচন্দ্র এবং ভারতবর্ষের ঋষি ও মহাপুরুষদের সাধনা-লব্ধ জ্ঞান প্রচারকে জীবনের ব্রত করলেন। ১৯১১ সন থেকে ১৯৩২ সনে তাঁর তিরোভাব পর্যন্ত একুশ বছর প্রধানতঃ সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কের ভূমিকা তাঁর। তার মর্মগ্রহণ গভীর অনুশীলনসাপেক্ষ।

একাধারে বিপ্লবী কর্মী ও সাহিত্যস্রষ্টা বিপিনচন্দ্রকে তাঁর এই শুভ শতবার্ষিক জন্মদিনে প্রণাম নিবেদন করে আজ আমরা কৃতার্থ।

১৯

দিনের আলো তখনও একেবারে নিবে যায় নি। নিমার তাঁবুর সামনে বসে পরিষ্কার ঝকঝকে বাটিতে করে স্তেজা খাচ্ছি। ছাংয়ে প্রবৃত্তি নেই, তাই স্তেজাই একটু বেশী খাই। বেশ লাগছিল খেতে। হঠাৎ মনে এল যে নিমার হাতের তৈরি স্তেজার বোধ হয় এইটিই শেষ বাটি।

লামাও হয়তো ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন, বললেন : কাল আমাদের ছাড়াছাড়ি।

একটু থেমে আবার বললেন : কালই তোমার যাওয়া ঠিক হয়ে গেল, তাই না ?

অন্যমনস্ক ভাবে সমর্থন জানালুম।

লামা বললেন : ভেবেছিলুম, তোমার কাছে আমার পরিচয় গোপন করেই রাখব, কিন্তু সে সংকল্প আমার ভেঙে যাচ্ছে। বোধ হয় মনে আছে, প্রথম আলাপের সময় তোমায় আমি চীনের লামা বলে পরিচয় দিয়েছিলুম। মিথ্যে বলি নি। আমার জন্ম চীন দেশেই। কিন্তু আমি চীনা নই। লাসায় আমার বাবা ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। একবার সাধারণ লোকের ভেতর শিক্ষার বিস্তারের জন্যে একটা খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে রাজদরবারে দাখিল করেছিলেন। এটা তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হল ও তাঁর শাস্তির বিধানের জন্য নেচুং মঠের লামাদের সংবাদ দেওয়া হল। মঠাধ্যক্ষদের ঘুষ দিয়ে হাত করবার চেষ্টা না করে বাবা তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় চীনে পালিয়ে গেলেন। সোজা পথে ধরা পড়বার সম্ভাবনা ছিল বলে, অনেক দুর্গম গিরিকন্দর পেরিয়ে তিনি চীনে প্রবেশ করেন। আমার মা সেই পথের কষ্ট সহ্য করতে পারলেন না, কোনও এক অজ্ঞাত অখ্যাত পাহাড়ে তাঁর সমাধি হল।

তখনও আমার জন্ম হয় নি। আমি আমার বাবার চীনা পত্নীর সন্তান। আমার শিক্ষা-দীক্ষা সবই হয়েছে চীন দেশে। তাই যখন আমি আমাকে চীনা লামা বলে পরিচয় দিই, তখন আমি মিথ্যা বলছি বলে আমার মনে হয় না। এখন আমি লাসায় থাকি, লাসার সেরা মঠে। লাসায় কেন ফিরে এলুম, তাও তোমাকে বলি। মারা যাবার আগে আমার বাবা আমাকে অনুরোধ করে গেছেন যে, প্রাণের ভয়ে যে কাজ তিনি শুরু করতে পারেন নি, সেই কাজই যেন আমার ব্রত হয়। তিব্বতকে তিনি ভালবাসতেন। কত বিনিদ্র রজনী তিনি তাঁর অক্ষমতার জন্যে চোখের জল ফেলে কাটিয়েছেন। আমি তার খানিকটা আমার মায়ের কাছে শুনেছি। আজ আমার মাও আর বেঁচে নেই, এই পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা।

আর এই জন্যেই আমি লামার পোশাক পরে নিজেকে লামা বলে প্রচার করি। তাতে অন্য লাভ না হোক, সহজে প্রাণটা দস্যুর হাতে দিতে হবে না।

আমার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্যও আজ তোমার কাছে গোপন রাখব না। লাসায় আজ আমি আমার বাবার মত একা নই। এখন আমার অনেক সঙ্গী। সবাই আজ তিব্বতের জন্যে ভাবছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। লিখে বক্তৃতা দিয়ে মত প্রকাশ করবার সাহস নেই কারও। তাই আমরা দিকে দিকে বেরিয়ে পড়ে গ্রামে গ্রামে পাহাড়ে ঘুরে নতুন জন্মের জন্যে ক্ষেত্র রচনা করছি। সশস্ত্র বিপ্লব দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করা যায়, কিন্তু সংস্কার-মুক্ত করা যায় না। তিব্বত আজ সংস্কারে অন্ধ হয়ে আছে। বুকের উত্তাপ দিয়ে তার চোখ ফোটাবার দায়িত্ব নিয়েছি আমরা।

লামা কথা কইলেন না অনেকক্ষণ। আমারও বলবার কিছু নেই। সাদা তাঁবুর ধূসর ছায়া দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে অন্ধকারে একাকার হয়ে গেছে। ওধারের একটা তাঁবু থেকে হাপরে আগুন ওসকাবার শব্দ আসছে।

একসময় আবার তিনি কথা কইলেন, বললেন: এদের সঙ্গে আমারও যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল।

ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলুম: আপনি কি লাসায় এখন ফিরবেন না?

সেই প্রশান্ত হাসিতে আবার উজ্জ্বল হল লামার মুখ। বললেন: ফিরব বলে তো বেরুই নি বন্ধু। নিজের কাজ সম্পূর্ণ করে যেতে পারলেই জীবন সার্থক হয়েছে মনে করব।

প্রশ্ন করলুম: কোথায় যাবেন এখান থেকে?

লামা বললেন: ত্রেতাপুরী, সেখান থেকে কৈলাস। তিব্বতের মানচিত্রে দেখেছি সো মা ভাং থেকে বেরিয়েছে চারটি প্রধান নদী। কর্ণালী, সাঙপো, শতদ্রু আর সিন্ধু। কর্ণালী নেপালের নদী, সাঙপো শিগাসের উত্তরে আর লাসার দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে ব্রহ্মপুত্র নামে। ত্রেতাপুরী থেকে শতদ্রুর উপত্যকা পাওয়া যায়। কিন্তু আমাকে সিন্ধুর পথ নিতে হবে। আমি পর্যটক হয়ে যদি পারি একবার হিমিশ গোম্ফা দেখে ফিরব। বোধ হয় জান, তের বৎসর বয়সে যীশুখ্রীষ্ট একদল বণিকের সঙ্গে ভারতে আসেন, ভারতে তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের কাছে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে হিমালয় পেরিয়ে পশ্চিমে ফিরে যান। বাইবেলে যীশুর জীবনের যে আঠার বছরের কাহিনী অজ্ঞাত অনেকে অনুমান করেন, যীশু এই কয় বৎসর ভারতের নানা স্থানে সকল ধর্মমতের সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করছিলেন। শুনলে আশ্চর্য হবে যে লাদাকের এই হিমিশ গোম্ফায় যীশুর অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস আবিষ্কার করেছেন ডক্টর নিকোলাস নটোভিচ নামে এক রুশ পর্যটক। মারবুর মঠে যে মূল গ্রন্থ পাওয়া গেছে, তা পালি ভাষায় লেখা। হিমিশ মঠে তিব্বতী অনুবাদ আছে বলে শুনেছি।

মনে পড়ল, স্বামী অভেদানন্দ হিমিশ গোম্ফা পরিদর্শনের সময় এই পুথির স্থানবিশেষ অনুবাদ করে এনেছিলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ পুথিখানির সংবাদ আমরা রাখি না। যীশুর এই অজ্ঞাত জীবনের ইতিহাস উদ্ধারের জন্য খ্রীষ্টানরা কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন বা করছেন, তাও আমার জানা নেই। মনে হল, লামা তাঁর এই হিমিশ অভিযানের বাসনা জানিয়ে সমস্ত ভারতবাসী ও খ্রীষ্টান জাতির লজ্জিত হবার কারণ ঘটালেন।

আমি কী বলব ভাবছিলুম। এমন সময় আড়ালে একটা সোরগোল উঠল। তার কারণ জানবার জন্যে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ছেরিং পেনছো ফিরে এসেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ওয়াং ডাকের ঘোড়া থেকে টুপ করে নেমে পড়ল। নিমা তার তাঁবুর ভেতর গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল, সোরগোল শুনে সেও বেরিয়ে এসেছিল। তার স্বামীকে হঠাৎ এমন অবস্থায় দেখবে আশা করে নি, দৃষ্টিতে তবু আনন্দের লালিমা ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে।

আমরা তার খবর শোনবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। সেও ব্যস্ত হবার মত খবর এনেছে দেখলুম। সব শুনে লামা আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন, বললেন, ছোকরা লামার হদিস পাওয়া গেল না। ত্রেতাপুরীর মঠে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কী একটা উৎসবে কয়েক শো লামা একত্র হয়েছিলেন। কিন্তু সে ছোকরা বাঁধা পথে না হেঁটে নিশ্চয় উল্টো দিকে গেছে। কৈলাসের দিকে গেছে কিনা তাও দেখে এসেছে। পরিক্রমার যাত্রার

সেখানে কোন মঠে তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেখান থেকে তার দাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। খাদ্যের ওপর গ্যাংটক গোম্ফায় জ্বরে বেহুঁশ হয়ে আছে। তাই দেখে সে ছুটে আসছে। আজ তাদের খুঁজে না পেলে কাল গ্যানিমার পথে রওনা দেবে।

লামা সব কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। ছেরিং ছেলেটা এখন খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করবে। যাত্রা শুরু রাত্রি এক প্রহর থাকতে। রেতাপুরীর পথে নয়, তারা মানসসরোবরের দিকে। পা চালিয়ে হাঁটলে বিকেলের দিকেই পৌঁছনো যাবে।

তার স্বামীর বিশ্রামের ব্যবস্থার জন্যে নিমা আবার ভেতরে গেল। লামা বললেন : তুমি আমাদের সঙ্গে থাকলে তোমাকে জুৎয়েন ফুক মঠে নিয়ে যেতুম। জুৎয়েন ফুক মানে অলৌকিক ঘটনার গুহা। বিখ্যাত মুনি কবি মিলার্পা এই মঠ স্থাপন করেন। শুধু তীর্থযাত্রীর কাছে নয়, সমস্ত শিক্ষিত তিব্বতীর কাছে মিলার্পা আজও বেঁচে আছেন, তাঁর অপূর্ব কাব্য তাঁকে যুগ যুগ বাঁচিয়ে রাখবে। তিব্বতী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি একক ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বিদেশী সাহিত্যে আমার অনুরাগের অন্ত নেই। কিন্তু মিলার্পার কবিখ্যাতি আমার অজ্ঞাত। কখনও কারও কাছে এঁর নাম শুনেছি বলেও মনে হল না।

আমার এই সন্দেহের কথা শুনে লামা বললেন : পৃথিবীর নানা ভাষায় না হোক, কয়েকটি ভাষায় যে এঁর কবিতার অনুবাদ হয়েছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। বইয়ের নাম আমি বলতে পারছি নে, কিন্তু দেশে ফিরে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলেই জানতে পাবে।

তোমাকে আরও একটি জিনিস দেখাতে পারতুম : লামা বললেন : সে তিব্বতী শিল্পপ্রীতি। এমন মঠ নেই যার ছাদ আর দেওয়ালে নেই অপূর্ব ফ্রেস্কো, প্রত্যেকটি পতাকা দেখবে বিচিত্র চিত্রশোভিত, এগুলিকে আমরা থাঙ্কা বলি। রূপো আর পেতলের সমস্ত বাসন দেখবে চিত্র-ক্ষোদিত। কিন্তু এই শিল্প একাগ্র ভাবে ধর্ম-প্রণোদিত। বুদ্ধ আর বৌদ্ধ মহিমা বাদ দিয়ে তাই তিব্বতের শিল্প হল না। শুনে আশ্চর্য হবে, এখানকার শিল্পীরা ছাগল বা বেড়ালের লোম থেকে নিজেরাই তাদের তুলি তৈরি করে, তেমনই পাথর মাটি আর গাছ-গাছড়া থেকে তৈরি করে নানান রকমের রঙ। ছবি আঁকার শিক্ষাও তারা পায়। বুদ্ধের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপের নক্সা দেওয়া থাকে ধর্মপুস্তকের ভেতর। লামা তাঁর শিল্পী ছাত্রকে দিয়ে এমন ভাবে নকশ করাবে সেই মাপগুলি যে সারাজীবনেও সে মাপ আর ভুল হবে না। অন্য ছবি আঁকবার কারও অধিকার নেই। গুরুর কাছে আর একটা জিনিস এরা শেখে, সেটা হচ্ছে অনুভূতি দিয়ে ছবি আঁকা। চোখ দুটো মনের জানলা হতে পারে, কিন্তু মনই হচ্ছে সত্যিকার শিল্পী। তিব্বতে ছবি আঁকে শিল্পীর শান্ত সমাহিত মন।

অন্ধকার তখন বেশ ঘনিয়ে এসেছে। দূরের মানুষ আর চেনা যাচ্ছে না। তাঁবুর ভেতর প্রদীপ জ্বেলেছে নিমা। সেই আলোর শিখা মনে হচ্ছে আজ থরথর করে কাঁপছে।

লামা বললেন : তুমি কি আজ রাতেই উমেদ সিংয়ের তাঁবুতে চলে যাবে ?

বললুম : না। কাল সকালে যাবার কথা বলে এসেছিলুম।

লামা বললেন : এখন তো এরাই দেখছি আগে যাত্রা করবে।

বললুম : সেই বা মন্দ কি ? কাল আপনাদের যাত্রা করিয়ে দিয়ে ফেরার কথা ভাবব।

লামা বললেন : ওয়াং ডাকেরা কাল যাত্রা করতে পারবে কিনা সে খবরটা নিয়ে আসা দরকার। তুমি একটু একা বসবে কি ?

হাঁটবার ইচ্ছে ছিল না, তাই সম্মতি জানিয়ে বসে রইলুম। লামা একবার তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে নিমাকে কী একটা বললেন, তারপর তাঁর লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে রওনা হলেন। বলে গেলেন, ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ওরা না গেলে ঘোড়াটা তো ফেরত দিতে হবে।

ঘোড়া ওয়াং ডাকের, কিন্তু ক্লান্ত ছেরিং পেনছোর সে কথা মনে নেই। লামার মনে আছে। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সংসারী। হাওয়ায় হিম ঘনিয়ে উঠছে।

থেকে থেকে কেঁপে উঠছি, তাঁবুর ভেতর যেতে তবু ইচ্ছে হল না। এক সময় একটা ছায়া দুলে উঠল। পাশ ফিরে চেয়ে দেখলুম, নিমা বেরিয়ে এসেছে। কোন কথা না বলে আমার পাশে এসে বসে পড়ল।

উপরে নির্মেঘ নীল আকাশ নির্বিকার চেয়ে আছে। চাঁদ বুঝি ওঠে নি এখনও, কিংবা ডুবে গেছে। তারায় আজ জ্যোতি নেই, শূন্য ফ্যাকাশে দৃষ্টি মেলে শুধু প্রহর গণনা করছে।

নিমা কথা কইল না। কইবেই বা কী! আর বললেও বোঝবার লোক এখানে কোথায়? আমি তার মুখের দিকে চেয়ে ওই থমথমে আকাশটারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলুম। অমনই ফ্যাকাশে স্থির দৃষ্টি, জ্যোতিহীন, তবু সুন্দর। আন্তরিক সেবায় আর যত্নে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে আমায় ফিরিয়ে এনেছে যে স্নেহময়ী নারী, আজ রাত্রিশেষে তাকে বিদায় দিতে হবে। বেদনার্ত বিদায়। জীবনে আর কখনও দেখা হবে না, কোনও খবর নেওয়া যাবে না, দেওয়াও যাবে না। এমনই কঠিন বিদায়—মৃত্যুর মত নিষ্ঠুর। মনে হবে, অন্য কোনও গ্রহে আমাদের দেখা হয়েছিল। অন্য কোনও আকাশের তলায়। সে গ্রহ হারিয়ে গেছে অন্ধকারে, সে আকাশ মিলিয়ে গেছে স্বপ্নের মতন। ধোঁয়ার মত ধূসর মেঘ ভেসে যাচ্ছে তাঁবুগুলোর পিছন দিয়ে, মনে হল অমনই ধোঁয়া বুঝি বুকের ভেতর ঠেলে উঠছে গলা পর্যন্ত। নিমা স্থির হয়ে বসে রইল। তার দেহে যেন প্রাণ নেই। লামার মুখে তাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি। শুধু কৃতজ্ঞতা। যা পেয়েছি তার একটা ভদ্র দাম। আজ এই অন্ধকারের ভেতর পাশাপাশি বসে মনে হল, ওই কৃতজ্ঞতাটুকু না জানালেই ভাল হত। দাম দেওয়ার নাম করে অপমান করার দায় থেকে মুক্তি তা হলে পেতুম।

এ কি, তার গালের উপর ও কী চকচক করছে? চোখের জল, না, আমি আমার মনের ছায়া দেখছি তার মুখের উপর? হঠাৎ বুঝি অবশ হয়ে এল সারা শরীর। মনে হল, দেহটা যেন আর আমার নিজের বশে নয়।

জানি না কতক্ষণ এমনই করে বসেছিলুম। চমক ভাঙল লামার কণ্ঠস্বরে। বললেন: কী আশ্চর্য! এই কনকনে ঠাণ্ডার ভেতর তোমরা এখনও বাইরে বসে আছ?

সত্যিই তো! শীতে হিম হয়ে গেছে দেহটা।

কোনও কথা না বলে নিমা তাঁবুর ভেতর উঠে গেল। আমি অপ্রতিভ ভাবটা কাটিয়ে বললুম: আপনারই অপেক্ষা করছিলুম।

লামা বললেন: আমার যাওয়া তো হল না ভাই। ওয়াং ডাকের আবার জ্বর এসেছে। আমাকে এখন ওর সঙ্গেই থাকতে হবে। কিছুতেই ওরা ছাড়তে চাইল না।

নিমাকে চেঁচিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বুঝিয়ে বললেন ঘটনাটা।

একটা চাকরকে নিমা কী নির্দেশ দিল। সে লোকটা ওয়াং ডাকের ঘোড়াটা ধরে আনল। তাঁবুর ভেতর থেকে লামাও তাঁর ঝোলাঝুলি সংগ্রহ করে আনলেন। বললেন: কাল যাবার আগে দেখা করে যেয়ো। আমি তোমার অপেক্ষা করব।

নিঃশব্দে সেই প্রতিশ্রুতি দিলুম।

নিমা ঝুপ করে লামার পায়ের উপর বসে পড়ল। হাত দুটো দেখলুম তার কানের উপরে চেপে ধরেছে। লামা গভীরভাবে তাঁর দুটো হাত মেয়েটার মাথার উপর রাখলেন। তারপর তাকে টেনে তুললেন। কী আশীর্বাদ করলেন বুঝতে পারলুম না। চাকরটাকে এগিয়ে চলার নির্দেশ দিয়ে বলে গেলেন: বুদ্ধ তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

নিজে কোনও আশীর্বাদ করলেন না।

কেন জানি না, আমার মনে পড়ল সেই গানের কলিটি:

গাজে লা ছিব গিউ নাকো
টাশী ডিলে কুন সুম ছোগ্।

হে বুদ্ধদেব, অপার তোমার মহিমা, আবার তুমি আমাদের ভিতর ফিরে এস। তিনি কি আসেন নি?

২০

হংসয়োর্দম্পতি পূর্বং মানসাখ্যে সরোবরে।
স্থিতৌ পরস্পরং প্রেম্ণা বিহরন্তৌ নিরন্তরম্॥

কুবেরস্তত্র বৈ নিত্যং বিহর্তুং যাতি সাবলঃ।
চিরং বিহৃত্য সংস্নায় বটমূলে সমাশ্রয়েৎ।

কুবের কোন কালে ভারতের আরাধ্য দেবতা ছিলেন না। যুগযুগান্ত ধরে ত্যাগের শিক্ষা পেয়েছে যে দেশ, ঐশ্বর্যে বিরাগ তার রক্তে ও মজ্জায়। কুবের তাই ভারতের সীমানা পাহাড় ডিঙিয়ে এই মানসের তীরে তাঁর পুরী নির্মাণ করেছিলেন। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পুরললনারা স্নান ও প্রসাধনের জন্যে নেমে আসতেন এই সরোবর তটে। তাঁদের চঞ্চল চরণে স্বর্ণ-নূপুরের নিক্কণ উঠত মন্দিরার মত। পরিধেয় পট্টবস্ত্রের বর্ণাঢ্য রামধনুর ছায়া পড়ত মানসের নীল জলে, আর তাঁদের হীরকাভরণ থেকে বিচ্ছুরিত হত মধ্যাহ্ন-সূর্যের বিচিত্র দ্যুতি।

আবেগোচ্ছল হংসমিথুন কেলি করত সেই শান্ত সুনীল জলরাশির উপর, তাদের পক্ষপুটে বিক্ষুব্ধ সলিল তরঙ্গ বিক্ষেপ করত বলয়ের মত, সেই তরঙ্গ মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে স্নানার্থিনীদের নিরাবরণ বক্ষে এসে আঘাত করত। কঙ্কণ-বলয়-শিঞ্জিত লীলায়িত বাহুর তাড়নায় তরঙ্গের নৃত্য উঠত তটপ্রান্তে।

সেখানে স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করে আছে বৃদ্ধ বট, নির্বাক প্রহরীর মত তার দিবারাত্রির সতর্ক প্রহরা। স্নান সমাপনান্তে কুবের কন্যারা এসে প্রসাধন করত এই বটের ছায়ায়। যেখানে সূর্যকিরণ এসে মৃত্তিকা স্পর্শ করে, সেই উত্তাপে ঘনকৃষ্ণ কেশদাম মেলে দিত কেশবতী কন্যা, আর যৌবনভারগর্বিতা নারী তার বেশবিন্যাস করত ঝুরির আড়ালে দাঁড়িয়ে।

আজ আর মানসতটে সে বটগাছ নেই। সে ললনাদের কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে না তার তীরভূমি। হংসমিথুনও হারিয়ে গেছে, তাদের কলকাকলিতে মানসের বাতাস আর উচ্চকিত হয়ে ওঠে না। কুবের আজ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন। তাঁর নতুন পুরী রচনা করেছেন দেশান্তরে। যে ভারত একদিন তাঁকে চায় নি তাঁর আদর্শে, সে ভারতকে তিনি চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করে গেছেন। ভুখা ভারত আজ ক্ষুধায় কাঁদে।

কিন্তু ভারতের আদর্শ আজও মরে নি। সেই সর্বত্যাগী ভোলা মহেশ্বর আজও তপস্যারত তাঁর তুষারমণ্ডিত শৈলশিখরে। কৈলাস আজও জেগে আছে।

গত্বা চোর্ধ্বং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃখং
রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ।

কুবেরবিজয়ী রাবণ একদিন বাধা পেয়েছিলেন এই কৈলাস পর্বতে। পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ করে ক্রোধান্ধ রাক্ষস সেদিন তার বিশ হাতে এই পর্বতকে পৃথিবী থেকে উৎপাটিত করতে চাইলেন। কিন্তু লীলাময় মহাদেবের পায়ের চাপে নিপীড়িত হয়ে তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। তারপর এই মানসের তটে সহস্র বর্ষ তপস্যা করেছিলেন সেই উদ্ধত রাক্ষস। তাঁর দেহের ঘর্মে কিংবা তাঁর অশ্রুধারায় সৃষ্টি হয়েছিল রাবণ হ্রদ।

ভারত থেকে তীর্থযাত্রীর দল এই দুই হ্রদের মাঝখান দিয়ে চলেছে কৈলাস দর্শনে। যুগযুগান্ত ধরে চলেছে এই যাত্রীদল। শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, নেই আদর্শের পরিবর্তন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর টানে চলেছে পুণ্যাতুর মানব-শিশু।

আর আমি—

কিছুতেই আজ ঘুম আসছে না। গ্যাকার্কোর বাজারে কি আজ হিমের কণা ফুরিয়ে গেছে! না, নিমার টুকটুক থানাতেই আজ আগুন লেগেছে অতর্কিতে!

কবি কালিদাসের স্বপ্নের দেশ আর মাত্র একটি দিনের পথ। সে পথ আমার অতিক্রম করা হল না। প্রাণের ভয়ে আমি আমার দেশে ফিরে চলেছি। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে বড় গলায় বলব, আমি বেঁচে আছি। সিঁড়িটা হারিয়ে যাবে ভয়ে স্বর্গের সিংহদ্বার ছুঁয়েই নেমে এসেছি।

ও কাকে দেখতে পাচ্ছি? উজ্জ্বল আলোর নীচে বসে একটা চেনা মেয়ে যেন কী একটা বই পড়ছে। ওটা প্রথম ভাগ নয়? কী পড়ছে মেয়েটা?

পাখার বাতাসে তার শাড়ির আঁচল দুলছে। আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে তার কানের ফুল থেকে। পাশ থেকে তাকে ঠিক চিনতে পাচ্ছি না। মুখটা কেয়ালেই চিনতে

পারব। ও কি। তার গালের উপর মুক্তোর মত কী যেন চকচক করছে। চোখের জল নাকি! আলোটাকে মিথিয়ে দিল? তার গভীর নিঃশ্বাস যে এখন আমার গায়ে লাগছে। সন্ধ্যেবেলায় গায়ের কাছে বসে এমনই করেই নিঃশ্বাস ফেলছিল সেই তিব্বতী মেয়েটা।

স্বপ্ন আর স্বপ্ন! জেগে জেগে এত স্বপ্ন আর দেখতে পারি নে।

রাত কত হল? এখনও কি এক প্রহরের বেশী বাকি আছে? এত ঘুমোয় কী করে মানুষগুলো!

গায়ের টুকটুকখানা ফেলে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলুম। গভীর ঘুমে সমস্ত মণ্ডিটা তখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আকাশে চাঁদের আলোর বান ডেকেছে, কুয়াশায় লেগেছে মদের নেশা।

অন্ধকারে নিমাকে দেখলুম ছায়ামূর্তির মত বসে আছে। তার চোখেও আজ ঘুম নেই। ঘুমোবেই বা কী করে! যার অসুস্থ স্বামী একটা অজ্ঞাত জায়গায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে, তার স্ত্রীর চোখে যে ঘুম নামবে না, সেই তো স্বাভাবিক। কথা না বলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। নিমা আপত্তি করল না।

ধোঁয়ার ভিতর দিয়েও আকাশের আলো এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। নিমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম। কী অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে তার বাইরেটায়। নতুন পোশাকটা তার গা থেকে খুলে ফেলে নি, তার পরিষ্কার সবুজ ছায়া পড়েছে তার নির্মল মুখে। ঘাড়ের কাছে ময়লা আর থিকথিক করছে না, মুখের সেই রক্ত-নির্যাসও ঘষে ঘষে ধুয়ে ফেলেছে। মাথার চুলেও বুঝি তেল-জল পড়েছে। লম্বা বেণী পরিপাটি করে বাঁধা, তার উপর শামুক আর কড়ির মালা। মাঝখানে গোটা কয়েক বড় পাথর সামান্য আলোতেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এগুলো আগেও ছিল, কিন্তু ঠিক এমনটি ছিল না। রুক্ষ ধূসর চুলের রাশির ভিতর লুকিয়ে ছিল। ভাবলুম, পরিবর্তনটা শুধু কি তার বাইরেই এসেছে! মনে কি তার আঁচড় লাগে নি এতটুকু!

কাল লামা বলছিলেন, নিমা তাঁকে হিন্দুস্থানের কথা জিজ্ঞেস করছিল, কেমন দেশ হিন্দুস্থান, কেমন সেখানকার মানুষগুলো? সবাই কি আমার মত? কী উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, আমাকে তা জানান নি। জানাবার প্রয়োজন হয়তো মনে করেন নি।

অদ্ভুত এই মেয়েটা! কথা বলতে পারে না বলে কি কথা বোঝাতেও পারে না! আমাদের দেশের সব মেয়েই কি সব সময় সব কথা বলতে পারে! জগতের প্রথম নারীও কি প্রথম থেকেই কথা বলতে পারত! ভাব বিনিময় তো কারও ঠেকে থাকে নি। ঠেকে থাকেও না। মুখোমুখী দুটো যন্ত্রের একটা যখন বাজে, তখন সেই সুরে বাঁধা অন্যটার তারেও কি ঝঙ্কার ওঠে না! আত্মার সঙ্গে মিলন হয় না আত্মার! জগতের এই কি নিয়ম নয়!

নিমা তবু চুপ করেই রইল।

অন্ধকারের আয়ুক্ষয় হচ্ছে।

একে একে চাকরেরা উঠল জেগে। কেউ গলা খেঁকরে খানিকক্ষণ কাশল। কেউ বিড়িতে আগুন দিয়ে গভীর ভাবে টানতে লাগল। একসময় নিমা তাঁবুর ভিতর তার স্বামীদের জাগাতে গেল।

কনকনে হিমেল হাওয়া আসছে দক্ষিণ থেকে। বুকের পাঁজরাগুলোও থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। দাঁতে দাঁত যাচ্ছে লেগে।

এবারে ছেরিং পেনছো এল তাঁবুর বাইরে। বেরিয়েই হাঁক ডাক শুরু করল। চাকরেরা বিড়ি ফেলে আর কাশি থামিয়ে তটস্থ হয়ে উঠল। অন্ধকারেই তাঁবুর দড়াদড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে দিল। দু-একজন ছুটল তাদের ছাগল গাধা আর ইয়াকগুলোকে ধরে আনবার জন্যে। সারাদিন এগুলো বোঝা নিয়ে পথ চলে, আর সারারাত এরা চরে খায়। ঘুমোয় কখন্ আর কখন্ বিশ্রাম করে, তা শুধু ওরাই জানে। অনেক সময় হারিয়েও যায় এক-আধটা জানোয়ার। চরতে চরতে এগিয়ে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলে। সেগুলো ফেলে রেখে এরা যায় না, ফেলে গেলে একটা একটা করে কমে একদিন শেষই হয়ে যেত এদের ভারবাহী জন্তুগুলো। যাত্রার সময় পেছিয়ে দিয়ে এরা খোঁজে, খুঁজে পেয়ে তবে যাত্রা শুরু করে। এমনই করে একদিন তাদের জানোয়ার খুঁজতে গিয়ে আমায় খুঁজে পেয়েছিল। আজ কিন্তু আমাকে ফেলে রেখে এরা দেশে ফিরে যাচ্ছে। আমি এদের ভার না হয়ে ভারবাহী হলে আমায় ফেলে এরা কিছুতেই যেত না।

খানিকক্ষণ পরেই জানোয়ারগুলোকে তাড়িয়ে চাকররা ফিরে এল। সব কটাই পাওয়া গেছে। মালপত্র তৈরি করে এরা বসেছিল। ওরা ফিরতেই বাঁধা-ছাঁদা শুরু হয়ে গেল। আজ তাদের আঙুলগুলো যেন কেটে যাচ্ছে, ভারি ভারি বোঝা তুলেও তাদের ঠাণ্ডা দেহ আজ গরম হচ্ছে না। কে একটা রসিক লোক সুর করে গেয়ে উঠল :

গ্য লাম ভুল পে তা না
ছো লুই এতী মা তোলা
ছো লা ভা রে তা না
ঠাগ লা লুঙ্ পো দিন ডে
ইয়া ইয়া গ্যু গ্যু জের।

সমস্বরে আর কয়েকজন গেয়ে উঠল :

ইয়া ইয়া গ্যু গ্যু জের।

তাদেরও প্রাণ আছে।

একগাছা লাঠি আমি সংগ্রহ করেছিলুম উমেদ সিংয়ের কাছে। সেই লাঠিগাছাটা ধরে আমি এদের যাত্রার উদ্যোগ দেখতে লাগলুম।

আজ এরা রাক্ষসতালের ধার দিয়ে গিয়ে গ্যান-টক গোম্ফায় রাত কাটাবে। নিমার স্বামী হয়তো ভালই আছে। এখানে সকলেই ভাল হয়ে যায়। অসুখ হয়, আবার ওষুধ না খেয়েই সে অসুখ সেরে যায়। তা না হলে এ দেশে কেউ বাঁচত না। জানি না এরা কৈলাস পরিক্রমা করবে কিনা। না করলেও কৈলাসের চিরতুষারাচ্ছন্ন শৈল-শিখরের দিকে চেয়ে দু চোখ জুড়িয়ে নেবে। তারপর মানস-সরোবরকে দক্ষিণে রেখে থারচেন টোকচেন হয়ে দেশে ফিরবে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল, সেই সুইস পরিব্রাজক সিউয়েন হেডিনের কথা। যিনি মানসের জলে ক্যাম্বিসের নৌকা ভাসিয়ে মাসাধিক কাল তার সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন মুগ্ধ কবির মত। পশ্চিমে দেখেছেন শতদ্রু সিন্ধুর উৎপত্তি স্থল, দক্ষিণে ও পূর্বে কর্নালী আর ব্রহ্মপুত্রের। মানসকে এমন হৃদয় দিয়ে দেখা বোধ হয় আর কেউ দেখেন নি কোন কালে।

হেডিন হিন্দু ছিলেন না, বৌদ্ধও নন। ধর্মের ডাক ছিল না তাঁর নাড়িতে। তবু সেই পরিব্রাজক যে কোনও হিন্দু আর বৌদ্ধের চেয়ে বেশী ভালবেসেছিলেন এই মানস আর কৈলাসকে। শুধু ভালবেসেই তৃপ্ত হন নি। সমস্ত জগৎকে এই মহান আকর্ষণের গল্প শুনিয়েছেন। জগতে এমন স্থান নাকি আর দ্বিতীয় নেই।

এই গ্যান-টক গোম্ফার নীচে দিয়ে গেছে তীর্থযাত্রায় পথ। সেই পথে ভারতের যাত্রীরা কৈলাস থেকে নেমে আসে মানসের তটে। আমি দেখলুম, ঝব্বুর পিঠে বসে অশক্ত স্ত্রী-পুরুষ আগে আগে নেমে আসছে। তার পিছনে সমস্ত পুরুষ চলেছে লাঠি ঠুকে ঠুকে, আর সকলের পিছনে আসছে ঝব্বু আর গাধার দল, পিঠে বোঝা নিয়ে নিরাসক্ত নির্বিকার পদে।

মনে পড়ল উমেদ সিংয়ের কথা। গ্যানিমার মণ্ডি হয়ে সে পুরাং যাবে, সেখান থেকে আসকোট। কৈলাস থেকে যে যাত্রীরা ফিরছে, তারাও আসবে পুরাং। সেখান থেকে আসকোটের পথে আলমোড়া কিংবা টনকপুর। শুধু পথের একটু হের-ফের। ভাবলুম, এইটুকু পথ ঘুরে গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

আজ লামা আমার পাশে নেই। থাকলে এই প্রশ্নটা তাঁকে করতুম। মনে হল, এই প্রশ্নের উত্তর দেবার ভয়েই বুঝি কাল রাতে তিনি পালিয়ে গেলেন। কিন্তু পালিয়ে যাবেন কোথায়! যে পথে এরা যাবে, তারই পাশে পড়েছে ওয়াং ডাকের তাঁবু। সামনে দিয়ে যাবার সময় ঘুম ভাঙিয়ে এই প্রশ্নটা জানালে উত্তর তাঁকে দিতেই হবে।

আর অপেক্ষা না করে আমি একাই এগিয়ে গেলুম। উমেদ সিংয়ের তাঁবু অন্য ধারে। ছেরিং পেনছোর ছোট ভাইটা একটা বোঁচকার উপর বসে ঘুমে ঢুলছিল। হঠাৎ জেগে উঠে অবাক হয়ে আমাকে দেখতে লাগল। কী একটা বলে বোধ হয় নিমার দৃষ্টিও আকর্ষণ করল। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলুম, সবাই আমার আকস্মিক আচরণে আশ্চর্য হয়েছে। হাতের কাজ ফেলে তাকিয়ে আছে আমার পায়ের দিকে।

লামাকে আমি ডেকে তুললুম। উত্তেজিতভাবে আমার বলার কথা সরলভাবেই জানিয়ে দিলুম। যাবার আগে দেখা করে যাব, কথা দিয়েছিলুম। সেই কথা রাখতে এসেছি। গ্যানিমা হয়ে আসকোট যাচ্ছি না,

দূর মাঠের ঘাস

কুমুদ ভট্টাচার্য

বাসনা আকাশমুখ : আকাশ উদাস,
বিমুখ ঔদাস্তে নেই আকাশের জোড়া ;
বাতাসে ছুটেছে কবে পক্ষিরাজ ঘোড়া
আজও তার চোখে নেই ঘাসের অভাস !

আরও যদি পৃথিবীর থাকে অবকাশ,
আরও এই সূর্যের চারদিকে ঘোরা
চলে যদি ; (চলতে না দিতে পারে ওরা,
গুঁড়ো করে দিতে পারে গোটা ইতিহাস !)
তা হলেই হবে বা কী ? অশ্বমুখে তৃণ
আসে নি যা আজও, আসবে কি কোন দিনও ?

তবু দেখ চেয়ে ওই ঘোড়া ছুটছেই—
আকাশের থেকে মুখ ফেরাতে না জানে ;
এ-মাটির ঘাসে কেন সুখ ওর নেই,
দূর মাঠ কোন্ জাদু দিয়ে ওকে টানে ?

মনোময়ী

সুশীলকুমার গুপ্ত

সে আছে গভীর মনে, বাইরে বেরতে তার ভয় ।
পৃথিবীর নিষ্করুণ মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের আঘাত
সয় না, সয় না তার ; সুদুর্লভ রূপের সঞ্চয়
প্রখর রাত্রিতে চুপে লুঠ করে নক্ষত্রের হাত ।

প্রত্যহের বাসনার দাহে তার মোমের শরীর
পুড়ে যায়, রূঢ় রৌদ্রে গাঢ় স্বপ্ন মোহের কুয়াশা
গলে গলে ঝরে, ক্রুদ্ধ বাস্তবের বিষ-মাখা তীর
কল্পনাপাখিকে বেঁধে, কোলাহল মোছে তার ভাষা ।

হৃদয়ের ক্ষতগুলি তার উষ্ণ হাতের সেবায়
ক্রমেই আরোগ্য হয়, বাসনার তীব্র বহ্নি-জ্বালা
নেভে স্নিগ্ধ আঁখিলোরে, তার স্বপ্ন নীলিমাকাজল
দগ্ধ চোখে আগামীর উজ্জ্বল দিগন্ত এঁকে যায় ;
স্মৃতির গোধূলি জ্যোৎস্নাপুষ্পে রচে সে কবিতামালা,
সে আছে—তাই তো ভাঙি সময়ের কঠিন শৃঙ্খল ।

যাচ্ছি মানস সরোবর আর কৈলাস ঘুরে। আসকোটে উমেদ সিংয়ের সঙ্গে দেখা করব।

লামা তাঁর দু হাতের মুঠো দিয়ে দু চোখ একবার রগড়ে নিলেন। ছোট ছোট চোখ দুটিতে ঘুমের নেশা তখনও খানিকটা লেগে ছিল। চিন্তিতভাবে বললেন : ভাল কথা, কিন্তু গ্যান-টক থেকে পুবে আর এগিয়ো না।

বললেন : সো-মা-বাঙের তীরে দাঁড়িয়ে প্রণাম কোর খাংরিম পোছের দেবতাকে, সেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে। প্রাণ ভরে তাঁর আশীর্বাদ চেয়ো। বলো, প্রেম যেন তোমাকে পথভ্রষ্ট না করে। মৃত্যুর চেয়ে ভয়ের হবে সেই পরাজয়।

নিমারা তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। একে একে সবাই তাঁকে প্রণাম করে গেল। লামা নিমাকে কাছে ডেকে নিয়ে কী সব নির্দেশ দিলেন। অন্ধকারেও আমি স্পষ্ট দেখলুম, নিমার চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার হঠাৎ নিবে গেল। মাথা নেড়ে কী প্রতিশ্রুতি লামাকে দিয়ে গেল, তা সেই জানে। আমি শুধু বেদনার ছায়া দেখলুম তার চোখের ভাষায়।

লামা বললেন : যাও, নিমা তোমাকে রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। তার কথার অবাধ্য কোনদিন হয়ো না।

রক্ষার কথা কেন ভাবছেন : আমি জিজ্ঞাসা করলুম প্রাণ হারানোর কি কোনও আশঙ্কা আছে ?

উত্তরে লামা শুধু হাসলেন।

আমি আর কোন প্রশ্ন করলুম না। নীচু হয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলুম।

লামা তাঁর হাতখানা আমার মাথার উপর রেখে আস্তে আস্তে বললেন : বুদ্ধ তোমাদের আশীর্বাদ করুন।

নিজে কোনও আশীর্বাদ করলেন না।

[আগামীবারে সমাপ্য]

বীরবলী প্রবন্ধ-রীতি

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

'সবুজপত্রে'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। তিনি কেবল 'সবুজপত্র' সম্পাদনা করেন নি, সবুজপত্রীদের একটি গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছিলেন। এই গোষ্ঠীর লেখকদের লেখায় একটি নতুন যুগের আভাস পাওয়া গেল। চিন্তায়, বাচনে, প্রকাশভঙ্গিতে, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় একটি নতুন মনের পরিচয় প্রকাশ পেল। কী উদ্দেশ্য নিয়ে 'সবুজপত্রে'র প্রতিষ্ঠা, তা প্রমথ চৌধুরী একাধিকবার আলোচনা করেছেন। আমাদের সমাজে ও সংসারে যে জাড্য, স্থবিরতা ও অকালবৃদ্ধতা পাকাপোক্ত আসন নিয়ে বসেছে, তার বিরুদ্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, আমাদের সমাজে মানসিক যৌবনের প্রতিষ্ঠা। আর এ যৌবন আসলে ইউরোপের বেগবান প্রাণচঞ্চল যুযুধান মনের যৌবন। সত্যেন্দ্রনাথের "যৌবনে দাও রাজটীকা" কবিতাটিকে প্রমথ চৌধুরী এ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। নির্বিশেষ সংস্কৃতি সাধনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তমান বিশ্বের বিশ্বপ্রবাহে অবগাহন না করলে মনের মুক্তি ঘটে না এবং মানসিক জাড্য ও তামসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না, এ কথা প্রমথ চৌধুরী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন যৌবন মানবধর্ম, তাকে অস্বীকার করার মত মূঢ়তা আর কিছু হতে পারে না। মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি যৌবন আর জীবনে তার প্রয়োগ ঘটেছে ইউরোপে; এটি প্রমথ চৌধুরীর বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাসের আলোয় তিনি বাঙালী-মনকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সমগ্র সাহিত্য-সাধনাকে এই আখ্যায় ভূষিত করলে অন্যায় হবে না যে, তা মানসিক যৌবনের সমর্থনে রচিত। খুব স্পষ্ট করেই তিনি বলেছেন, "প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড় জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক,' এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস। এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য।" (যৌবনে দাও রাজটীকা—সবুজপত্র, ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ)।

তাই এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে, প্রমথ চৌধুরী পুরনোর বিপক্ষে ও নতুনের পক্ষে, মানসিক বার্ধক্যের বিপক্ষে ও যৌবনের পক্ষে ছিলেন। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে মনোভঙ্গীর দিক থেকে তিনি সর্বাংশে স্বতন্ত্র ছিলেন তা মেনে নিতে আপত্তি নেই। প্রমথনাথ এই নতুন চিন্তার বাহন যে গদ্যকে করেছিলেন, তাও নতুন, যা 'বীরবলী গদ্য' আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। কথ্যভাষাশ্রয়ী বীরবলী গদ্যের যে কটি প্রধান লক্ষণ, তা এই মানস-প্রসূত: যুক্তিশৃঙ্খলা-প্রবণতা, বাক্সংযম, দীর্ঘ বাক্যের অনুপস্থিতি, হ্রস্ব বাক্যের প্রাধান্য, ক্রিয়াপদের লঘুতা, প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, যথাযথতা, ব্যঙ্গপ্রবণতা এবং তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্যের বহুলপ্রয়োগ। জাড্যলেশহীন তারুণ্যের সাধনাতেই বাংলা সাহিত্যের মুক্তি, এই বিশ্বাসেই তিনি বলেছিলেন, "এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে দিতে পারি, তবেই তা সাহিত্য-দর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম।"

প্রমথ চৌধুরীর এই আশা ব্যর্থ হয় নি, বর্তমান বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যই তার প্রমাণ।

২

বাংলা প্রবন্ধ-রীতি প্রমথ চৌধুরীতে এসে নতুন পথে যাত্রা করল, এ কথা স্বীকার্য। প্রাক্-বীরবলী ও বীরবলোত্তর বাংলা প্রবন্ধ-রীতিতে একটি স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাক্-বীরবলী যুগের বাংলা প্রবন্ধে wisdom-এরই প্রাধান্য, বীরবল-যুগে wisdom in a smiling mood-এরই সমাদর। প্রাক্-বীরবলী যুগের প্রবন্ধ-রীতিকে যদি কোন নাম দিতে হয়, তা হলে বলি, তা বঙ্কিমী-প্রবন্ধরীতি। এই রীতির পিছনে যে মানসিকতা ক্রিয়াশীল, তার মূল লক্ষণ হল: সমষ্টিচেতনা, কল্যাণমুখিতা, আদর্শবাদিতা এবং অনিবার্যভাবেই ভাবোচ্ছ্বাস। আর বীরবল প্রবন্ধ-রীতির পিছনে যে মানসিকতা বর্তমান, তার মূল লক্ষণগুলি এর বিপরীত: ব্যক্তিচেতনা, বিশ্বমানবিকতা, দৃঢ় প্রকৃতিস্থতা বা স্যানিটি এবং ভাবালুতামুক্তি। এর সঙ্গে এসেছে রসিকতা ও ব্যঙ্গপ্রবণতা, পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও মননশীলতা, নিবিড় ঐহিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এক কথায়, তা শিক্ষিত মানসের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিযজ্ঞে নিয়োজিত। বঙ্কিমী প্রবন্ধ-রীতিতে প্রবন্ধকারের ব্যক্তিমানসটিই প্রাধান্য লাভ করে নি, সেখানে প্রাধান্য লাভ করেছে সমাজ ও স্বদেশ-কল্যাণে অনুপ্রাণিত মনোভঙ্গী। আর বীরবলী প্রবন্ধ-রীতিতে ও পরবর্তী কালের প্রবন্ধ-রীতিতে প্রাধান্য পেয়েছে ব্যক্তিমানস, এখানে আর সবই গৌণ। বঙ্কিম, ভূদেব, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, শিবনাথ, হরপ্রসাদ পর্যন্ত উনিশ শতকী প্রবন্ধকারবৃন্দ এবং বর্তমান শতকের গোড়ায় রামেন্দ্রসুন্দর, ঠাকুরদাস, পাঁচকড়ি, ক্ষেত্রমোহন, বিপিনচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, রাখালদাস, সুরেশচন্দ্র, রজনীকান্ত, যোগেশচন্দ্র, গিরিজাশঙ্কর প্রমুখ প্রাবন্ধিকদের মানসে কল্যাণচিন্তা সক্রিয়ভাবে বর্তমান এবং তা-ই তাঁদের প্রবন্ধরচনায় অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে এঁদের প্রবন্ধ-রীতিতে যুক্তির সঙ্গে নিষ্ঠার, চিন্তার সঙ্গে সংস্কারের, সাহিত্যচেতনার সঙ্গে সমাজচেতনার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। নির্বিশেষ সংস্কৃতিসাধনা, যা দেশ-কাল-পাত্রের গণ্ডীকে ছাড়িয়ে যায়—তা এঁদের আকৃষ্ট করে নি। মূলতঃ ভারতমুখী চেতনার দ্বারা এঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন, ফলে এঁদের লেখায় ধর্ম, ভারত-সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতি আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। এঁদের প্রবন্ধ সেইজন্য বিষয়নির্ভর বা গ্রন্থনির্ভর, তা কেবল প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিমানসটিকে পরিস্ফুট করার কাজে নিযুক্ত হয় নি।

প্রমথ চৌধুরীতে প্রবন্ধ-রীতির পরিবর্তন সাধিত হল মনোভাবের পরিবর্তনের ফলে। নবীন উৎসাহ ও অপরিসীম কৌতূহল নিয়ে সমগ্র বিশ্বসংস্কৃতিক্ষেত্রে পরিভ্রমণের ক্লান্তিহীন আনন্দে তা উজ্জীবিত। বিশ্ববীক্ষায় তৎপর বিদগ্ধ মার্জিত পরিশীলিত রসিক মনের হাসির আলোকে উজ্জ্বল একটি প্রবন্ধলোকে আমরা উত্তীর্ণ হই প্রমথ-প্রবন্ধাবলীতে। বিষয়বস্তু এখানে প্রধান নয়, প্রধান বিষয়বস্তুর ভাষ্যকার-মানসটি। প্রমথ-পর্বের বাংলা প্রবন্ধকে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যসৃষ্টি বলেই আমরা গ্রহণ করতে পারি। এখন আর প্রবন্ধ বলতে 'চিন্তাগর্ভ অনতিদীর্ঘ গদ্যরচনা'কে বোঝায় না, বা 'তথ্য, যুক্তি ও সিদ্ধান্তের পরস্পর অন্বয়ের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বদ্ধ গদ্যাংশ'কে বোঝায় না। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের দুয়ার আজ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেছে, চিন্তার ক্ষেত্রে কোনপ্রকার গণ্ডীকেই আমরা এখন আর স্বীকার করি না। আর তা হয়েছে 'সবুজপত্রে'র কল্যাণে।

বাংলা গদ্য তার জন্ম থেকে সংবাদপত্রের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধ-রীতিতেও সংবাদপত্রের প্রভাব পড়েছে। বীরবলী প্রবন্ধ-রীতির সঙ্গে বঙ্কিমী রীতির বড় পার্থক্য এখানে যে, বীরবলী-রীতি সংবাদপত্রের রীতিকে অতিক্রম করে গেছে। তার আগে বাংলা প্রবন্ধ-রীতি ছিল বিষয়বস্তুনির্ভর। বঙ্কিমী প্রবন্ধ-রীতি বিষয়গত আলোচনায় সীমাবদ্ধ, ফলে সেখানে প্রবন্ধের গদ্য সংবাদপত্রের মন্থরগতি গদ্যের অনুসারী। সেকালের সংবাদপত্রের উপজীব্য সমসাময়িক বাঙালী-সমাজ; বঙ্কিমী প্রবন্ধের উপজীব্যও একই। ফলে গত শতকে এই দুটি প্রবন্ধ-রীতি ও গদ্য-রীতি ভিন্নতর চেহারায় স্বপ্রতিষ্ঠ হয় নি। সংবাদপত্রের গদ্যে ব্যক্তিচেতনা অনুপস্থিত, সমষ্টিচেতনা

প্রবল। বঙ্কিম-অনুসারী প্রবন্ধেও তাই হয়েছে। ফলে সেখানে প্রবন্ধ-রীতি ধূসর অনাত্মিকতায় আচ্ছন্ন, ব্যক্তিচেতনা সেখানে অবলুপ্ত।

এই অবস্থায় প্রমথ চৌধুরী এলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত প্রবন্ধ-রীতি নিয়ে—যা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, স্বাতন্ত্র্যে প্রখর, বৈশিষ্ট্যে দীপ্ত। একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃজন করে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের কৌশল বাংলা প্রবন্ধে এই প্রথম দেখা গেল। কথ্যভাষাশ্রয়ী গদ্য-রীতির ধাবৎশক্তি, সাবলীলতা ও আলাপধর্মিতাগুণে সমন্বিত হল এই অন্তরঙ্গ বাতাবরণ। ফলে প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিমানসের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হল। একটি নতুন প্রবন্ধ-রীতি প্রতিষ্ঠিত হল। এই প্রবন্ধ-রীতি যদি এ দেশে কারুর কাছে ঋণী থাকে, তা হল রবীন্দ্র-প্রবন্ধসাহিত্য। তবে এ দুয়ের চরিত্রগত সাদৃশ্য অল্পই, বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সামান্য মিল আছে।

৩

এখন বিচার্য—প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধ-রীতির আদর্শ কী? প্রমথ চৌধুরী একাধিকবার এ বিষয়ে তাঁর আদর্শরূপে স্বীকার করেছেন মঁতেনের প্রবন্ধাবলী। বস্তুতঃ 'প্রবন্ধ' যে স্বতন্ত্র সাহিত্যকর্ম, তা মঁতেনই প্রথম দেখিয়েছেন। মাইকেল দ্য মঁতেন (১৫৩৩-১৫৯২) সম্ভ্রান্ত নোব্‌ল্ বংশের সন্তান। গ্রীক ও লাতিন ভাষায় তিনি প্রথম যৌবনেই দক্ষতা লাভ করেছিলেন, এ ছাড়া মাতৃভাষা ফরাসিতে তাঁর অধিকার সর্বস্বীকৃতি লাভ করেছিল। বোর্দোর আইনসভায় তিনি উপদেষ্টা নির্বাচিত হন এবং ফ্রান্সের সম্রাট দ্বিতীয় হেনরীর অনুগ্রহ লাভ করেন; মধ্যবয়সে তিনি মঁতেনের দুর্গ, জমিজমা ও দুটি গ্রামসমেত এক বিশাল সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন ও লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন। বাকী জীবনটা তিনি লেখাপড়াতেই কাটিয়েছেন। প্যারী-নগরীর ভক্ত মঁতেনের রাজসভায় প্রবেশের অবাধ ছাড়পত্র ছিল এবং তিনি দ্বিতীয় ও চতুর্থ হেনরীর বন্ধুত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে যে দলাদলি প্যারীর রাজনৈতিক আবহাওয়াকে দূষিত করে তুলেছিল, তার থেকে তিনি দূরে সরে যান ও নিজ দুর্গপ্রাসাদে লেখাপড়ায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়টি তাঁর জীবনে মূল্যবান। তিনি নিজেই বলেছেন:

"When I lately retired myself to my own house with a resolution, as much as possibly I could, to avoid all manner of concern in affairs, and to spend in privacy and repose the little remainder of time I have to live, I fancied I could not more oblige my mind than to suffer it at full leisure to entertain and divert itself,...but I find that, quite the contrary, it is like a horse that has broken from his rider, who voluntarily runs into a much wilder career than any horseman would put him to, and creates me so many chimaeras and fantastic monsters, one upon another, without order or design, that, the better at leisure to contemplate their strangeness and absurdity, I have begun to commit them to writing, hoping in time to make them ashamed of themselves."

এইভাবে অশান্ত-চিত্ত অশ্বের উদ্দামতাকে বিক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মুক্তি দিতে গিয়ে মঁতেন 'Essay'-র সৃষ্টি করেন। ১৫৮০-তে মঁতেনের "Essaies" প্রকাশিত হল; সাহিত্যক্ষেত্রে একটি নতুন পথের সন্ধান মিলল। ফরাসিতে 'Essay' কথার অর্থই হল কোনও নতুন প্রয়াস—যা অস্থায়ী বা অসম্পূর্ণ। এই অসম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত-প্রয়াসই গাঢ়বন্ধ সৃষ্টিকর্ম 'রচনা'য় (Essay) পরিণত হল। এই "Essaies" রচনাসংগ্রহে মঁতেন প্রচলিত সাহিত্য-রীতি ও সংস্কারকে অস্বীকার করলেন। যুক্তিতথ্যসমন্বিত বিষয়নির্ভর গাঢ়বন্ধ সংহত আলোচনার (Treatise, Discourse, Dissertation) ধারাটিকে মঁতেন সবলে অস্বীকার করে বললেন, এই নতুন সাহিত্যপ্রয়াসের (Essay) জন্য তিনি কোনও কৈফিয়ত দিতে রাজি নন। এগুলিকে তিনি বলেন, "These are fancies of my own", পাঠক যেন কোনও প্রত্যাশা না রাখেন,

"Let nobody insist upon the matter I write, but my method in writing it: let them observe in what I borrow, if I have known how to choose what is proper to raise or help the invention, which is always my own; for I make others say for me what, either for want of language or want of sense, I cannot so well myself express."

বিষয়বস্তুর ওপর মঁতেন জোর দেন নি, তিনি পাঠকের মনোযোগ দাবি করেছেন বলার ভঙ্গীর প্রতি। কী বলা হল, তার চেয়ে মূল্যবান কেমন করে বলা হল। 'প্রবন্ধাবলী' দু খণ্ড প্রকাশ করে মঁতেন ইতালি ভ্রমণে যান (১৫৮০) সতেরো মাসের জন্য। এই ভ্রমণের ওপর

তিনি যে দিনলিপি লেখেন, তা উচ্চাঙ্গের ভ্রমণ-সাহিত্য। গৃহে ফিরে অগ্নিদাহে, দুর্ঘটনায়, রোগে দুঃখে, মানসিক অশান্তিতে তিনি জীবনের বাকী কটা দিন কাটান। শেষ খণ্ড—তৃতীয় খণ্ড 'প্রবন্ধাবলী' মঁতেন দুঃখ ও রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেই প্রকাশ করেন এবং ষাট বছর বয়সে এই সংসার থেকে চিরবিদায় নেন।

'প্রবন্ধাবলী' (তিন খণ্ড) ও ইতালি-ভ্রমণ-ডায়েরি : মঁতেনের সাহিত্যকীর্তি এইমাত্র। কিন্তু 'প্রবন্ধাবলী'তে তিনি যে সাহিত্যসৃষ্টির পথ উন্মুক্ত করে দিলেন, তা তাঁকে অবিনাশী গৌরবের অধিকারী করেছে। অধুনা সাহিত্যিক-মূল্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ বা রচনা বলতে আমরা যা বুঝি তার পথিকৃৎ মঁতেন। 'বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার,' 'কৃষ্ণচরিত্র'—আলোচনা-জাতীয় গ্রন্থ (Treatise, Dissertation)। আর প্রমথ-প্রবন্ধাবলী 'রচনা' (Essay)। এই পার্থক্যের মূলে আছেন মঁতেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্যগুরু ম্যঁতেনের প্রবন্ধাবলী মূল ফরাসিতে পড়েছিলেন এবং তার এবংই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এ কথা অনস্বীকার্য।

[illegible] আধুনিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের জন্মদাতা। তাঁর [illegible] ইংরেজী প্রবন্ধ ও পরের ইংরেজী প্রবন্ধে যে চারিত্রিক পার্থক্য ঘটেছে, তার মূলে আছেন তিনিই। মঁতেনের প্রবন্ধাবলীর প্রথম ইংরেজী অনুবাদ হয় ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে। অনুবাদক জন ফ্লোরিও। তারপর চার্লস কটন অনুবাদ করেন ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কটনের অনুবাদের মার্জিত সংস্করণ বেরোয়। হ্যালিফাক্স কটন-সংস্করণে মঁতেন সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা করেন। মঁতেন সম্পর্কে ইংরেজীতে এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। তারপর স্টুয়ার্ট, হ্যালাম, হ্যাজলিট প্রভৃতি সমালোচক ও 'রেট্রোসপেক্‌টিভ রিভিউ', 'ওয়েস্টমিনস্টার রিভিউ' প্রভৃতি পত্রিকা মঁতেন সম্পর্কে গত শতকে আলোচনা করেন। এই সকল অনুবাদ ও আলোচনা প্রমাণ করে ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্যে মঁতেনের প্রভাব কত গুরুতর। সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকের ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্য ষোড়শ শতকের ইংরেজী প্রবন্ধ থেকে ভিন্নতর, তা মনোযোগী পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। প্রবন্ধ যে স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম, প্রবন্ধ-রীতি যে নৈর্ব্যক্তিক নয়, তা যে ব্যক্তিচেতনায় উদ্ভাসিত হতে পারে, তার প্রমাণ প্রথম পাওয়া গেল মঁতেনে এবং তদনুসরণে ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্যে; বেকন, ল্যাম, বীরবুম, হাডসন, স্টের্ন লী, কনরাড, লেস্‌লি ষ্টিফেন, হ্যাজলিট্‌, চেস্টারটন, উলফ, বাটলার তার প্রমাণ।

মঁতেনের কাছে প্রবন্ধশিল্পীরা কয়েকটি বিষয়ে ঋণী। প্রবন্ধ যে ব্যক্তিচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত হবে, তা যে পাঠকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সুহৃৎসম্মিত সম্পর্ক স্থাপন করবে, তা যে বিষয়নির্ভর না হয়ে ভাবনিষ্ঠ হবে, বক্তব্যকে ছাড়িয়ে উঠবে প্রকাশরীতি এবং সর্বোপরি প্রবন্ধ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টিতে পরিণত হবে, এই চেতনার মূলে আছেন মঁতেন। বাংলা প্রবন্ধ-রীতিতে যিনি পরিবর্তন ঘটালেন, সেই প্রমথ চৌধুরী এই মঁতেনেরই ভাবশিষ্য। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

মঁতেনের তিনখণ্ড প্রবন্ধাবলীতে এক সংসার-অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, মানবচরিত্র নির্ণয়ে সিদ্ধহস্ত, পরিহাস-রসিক, ঈষৎ ব্যঙ্গপ্রবণ বিদগ্ধ উদার পরিশীলিত রুচিবান ভদ্রজনের সাক্ষাৎ মেলে। কত বিচিত্র বিষয়ে তিনি লেখনী চালনা করেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। নির্বিশেষ জ্ঞান-সাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তা পূর্বধৃত সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখিয়েছি। প্রাচীন সংস্কৃতি ও বর্তমান জ্ঞানের রাজ্যে তাঁর অবাধ পরিভ্রমণ। কত বিষয়েই না তিনি লিখেছেন। দুঃখ, অনিদ্রা, সাধুতা, অনৃতভাষণ, আলস্য, পাণ্ডিত্য, বন্ধুত্ব, নির্জনতা, বার্ধক্য, মত্তাবস্থা, গন্ধ, গৌরব, ক্রোধ, সংসার-অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা, গ্রন্থ চর্চা, নামকরণ, প্রাচীন আদবকায়দা, বর্তমান ঠাট-ঠমক, কল্পনা, দর্শন-চর্চা, বাক্যালাপ-শিল্প, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, ভাল-মন্দ, নারী ও পুরুষ, রন্ধনবিদ্যা, ছলাকলা, ভীরুতা : হরেকরকম বিষয় নিয়ে মঁতেন লিখেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনটিকে প্রকাশ করেছেন।

প্রবন্ধাবলীর মুখবন্ধে (১২ই জুন, ১৫৮০) সেনর মঁতেন বলেছেন :

"This, reader, is a book without guile. It tells thee, at the very outset, that I had no other end in putting it together but what was domestic and private. I had no regard therein either to thy service or my glory; my powers are equal to no such design. It was intended for the particular use of my relations and friends, in order

that, when they have lost me, which they must soon do, they may here find some traces of my quality and humour, and may thereby nourish a more entire and lovely recollection of me. Had I proposed to court the favour of the world, I had set myself out in borrowed beauties ; but 'twas my wish to be seen in my simple, natural and ordinary garb, without study or artifice, for 'twas myself I had to paint. My defects will appear to the light, in all their native form, as far as consists with respect to the public. Had I been born among those nations, who 'tis said, still live in the pleasant liberty of the law of nature, I assure thee I should readily have depicted myself at full length and quite naked. Thus, reader, thou perceivest I am myself the subject of my book ; 'tis not worth thy while to take up thy time longer with such a frivolous matter ; so fare thee well."

এই মুখবন্ধটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, এর মধ্য দিয়ে মঁতেনের চরিত্র ও মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই। 'আমিই আমার গ্রন্থের বিষয়বস্তু'—দম্ভভরে এ কথা পাঠককে মঁতেন-ই প্রথম বলেছেন। আত্মীয় বন্ধুজনের প্রীত্যর্থে রচিত প্রবন্ধাবলীতে মঁতেন নিজস্ব অকৃত্রিম স্বভাবটিকে দেখাতে চেয়েছেন। জগদ্ধিতায় লোকহিতার্থে সাহিত্যচর্চার বাসনা তাঁর একেবারেই নেই।

একান্ত ব্যক্তিগত সুরের প্রাধান্য এই প্রবন্ধাবলীতে লক্ষ্য করি। ইংরেজী প্রবন্ধ-সাহিত্যে এর অনুসৃতি দেখা যায় চার্লস ল্যাম্বের প্রবন্ধে। অধুনা ব্যক্তিক নিবন্ধ বা 'পার্সোনাল এসে' বলতে আমরা যে সাহিত্যকৃতিকে বুঝি, তার মূল উৎস এখানেই। চেস্টারটন, লীকক, লিণ্ড, উলফ, বীরবুম, লেসলি ষ্টিফেন প্রমুখ ব্যক্তিক নিবন্ধকার মঁতেনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর বাংলা রম্য-রচনা তার সাম্প্রতিক অতি-তারল্য ও অগভীরতা সত্ত্বেও ল্যাম, লিণ্ড, চেস্টারটন এবং প্রমথ চৌধুরীর দ্বারা প্রভাবিত, তা অবশ্যস্বীকার্য। সস্মিত প্রজ্ঞাদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন মঁতেন, তাই লিণ্ড-কথিত দৃষ্টিভঙ্গী বা মানসিকতা (a lucky dip into experience or into fantasy—often into both), তাঁর যথার্থ বিবরণ, এ কথাও স্বীকার্য। মঁতেনের 'প্রবন্ধাবলী'তে খেয়ালী কল্পনার উচ্ছ্বাস ও অভিজ্ঞতার নির্যাস নিশ্চিতরূপে বর্তমান, এ বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

৪

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে অন্তরঙ্গ সুহৃৎসম্মিত পরিবেশে ব্যক্তিগত আলাপনের সুরটি প্রাধান্য লাভ করেছে, এ সত্য মনোযোগী পাঠকের অজানা নয়। জগদ্ধিতায় লোক-কল্যাণে সাহিত্যচর্চায় মঁতেনের মত শিল্প প্রমথনাথেরও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। সাহিত্যকে কিণ্ডারগার্টেনে পরিণত করার তীব্র প্রতিবাদ তিনি করেছেন। আবার সামাজিক রীতিনীতিকে গুরুর অনুসরণে ব্যঙ্গের চাবুক মেরে সংশোধিত করতে চেয়েছেন। সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে মঁতেন তাঁর তিন খণ্ড 'প্রবন্ধাবলী'তে বিক্ষিপ্তভাবে যে-সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, প্রমথ-প্রবন্ধে তার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'প্রবন্ধাবলী'র প্রথম খণ্ডের ২৫ সংখ্যক প্রবন্ধে শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে মঁতেন যে মত ব্যক্ত করেছেন, প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে অনুরূপ কথাই বলেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ১০ সংখ্যক প্রবন্ধে মঁতেন বইপড়া সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, বীরবল 'বইপড়া' (আমাদের শিক্ষা) প্রবন্ধে সে কথাই বলেছেন। 'প্রবন্ধাবলী'র পূর্বধৃত মুখবন্ধে মঁতেন যা বলেছেন, 'খেয়ালখাতা' (বীরবলের হালখাতা) প্রবন্ধে প্রমথনাথ তারই প্রতিধ্বনি করেছেন। বীরবল বলেছেন, "আমাদের কাজের কথায় যখন কোন ফল ধরে না তখন বাজে-কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি। যখন আমাদের ক্ষুধা-নিবৃত্তি করবার কোন উপায় করতে পারছি নে, তখন দিন থাকতে শখ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক।...খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব।...আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী—যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমি।" এই কথারই অনুসৃতি লক্ষ্য করি 'চুটকি' প্রবন্ধে (বীরবলের হালখাতা)। আসলে মঁতেনের মত প্রমথ চৌধুরীও খেয়ালী লঘু কল্পনা এবং সামাজিক অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তার কারবারী ছিলেন। সেজন্যই প্রবন্ধ-সংগ্রহে যে প্রমথ চৌধুরীর দেখা পাই,

হাতছানি

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

দূরে ওই দিক্-রেখা নীলিমার কোলে
আশেপাশে গাছপালা দেখে মন দোলে,
উড়ে উড়ে ডাকে পাখি,
কোথা যায় জানি তা কি ?
হাতছানি দেয় বুঝি কোন্ সুদূরে,
মন যেন ভরে ওঠে অজানা সুরে !

আকাশের চাঁদ যেন সোনার থালা,
একে একে জেগে ওঠে তারার মালা
ক্ষীণ জ্যোতি বিকিরণে
কথা কয় মনে মনে ;
আমাদেরও ক্ষীণপ্রাণ মনে পড়ে যায়,
চাঁদের কিরণ যেন ডাকে আয় আয় !

নিদ-পরী নেমে আসে চোখের 'পরে,
তাদের নয়নে যেন করুণা ঝরে।
স্বপনেতে কত কী যে
দেখি যা তা দেখি নি যে,
অবচেতনায় বুঝি তাদের বাসা,
গভীর ঘুমের মাঝে যাওয়া ও আসা।

প্রভাতে উঠিয়া দেখি রবির নয়ন
জবাকুসুমের মত লোহিত বরণ।
বৃথা বুঝি দিন যায়
উঠে বসি বিছানায়,
নতশির হয়ে করি সবারে প্রণাম,
জেগে ওঠে মনে কত নব নব নাম !

তারপরে কত কাজ সারাদিন ভোর,
কাজের নেশায় লাগে দু নয়নে ঘোর ;
কাজের তো শেষ নাই,
অবসর কম তাই ;
ধীরে ধীরে হয় বেলা অবসান প্রায়,
সুদূর আকাশ ডাকে আয় আয় আয় !

তিনি মঁতেনের মতই একজন বহুদর্শী অভিজ্ঞ পরিহাস-রসিক বিদগ্ধ রুচিবান ব্যঙ্গপ্রবণ উদারহৃদয় সামাজিক।

মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এই সাযুজ্য মঁতেনের ভাবশিষ্যরূপে প্রমথ চৌধুরীকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং একটি নবতর প্রবন্ধ-রীতি প্রবর্তনে সহায়তা করেছে। 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ' ও 'তরজমা' (বীরবলের হালখাতা), 'সবুজপত্রের মুখপত্র', 'নূতন ও পুরাতন', 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' ও 'ফরাসি সা'হত্যের বর্ণপরিচয়' (নানাকথা) প্রবন্ধগুলি, বিশেষতঃ শেষোক্তটি প্রমথ চৌধুরীর মানস-প্রবণতা কোন্দিকে, তার সাক্ষ্য দেয়। মঁতেনের জীবনদর্শন ও প্রবন্ধ-রীতি—উভয়ই প্রমথ চৌধুরী আত্মসাৎ করে বাংলা সাহিত্যে তাঁর খেরোলখাতা খুলেছিলেন, এ কথা অবশ্যস্বীকার্য। প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধরাজ্যে প্রথম, যিনি বলেছেন, 'I am myself the subject of my book।' সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের ব্যক্তি-চেতনায় উদ্ভাসিত মননশীল যুক্তিশৃঙ্খলাযুক্ত পরিচ্ছন্ন রূপের আদি কাঠামো প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ। ফরাসীরা বলেন, 'যে বস্তু স্বচ্ছ (ক্ল্যার) নয় তা ফরাসী নয়।' প্রমথ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধ-রীতির মধ্য দিয়ে এই কথাই প্রচার করেছেন। সারল্য, স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা, আলো : প্রমথ চৌধুরীর আরাধ্য বস্তু এবং প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধ-সংগ্রহে' তার অভাব নেই।

জনৈক ইউরোপীয় সাহিত্যিক বলেছেন, "তুহম্ আ ত্যে পাত্রি—লা সিয়েন, এ পুট লা ফ্রাঁস।" অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই দুটি মাতৃভূমি ; একটি তার নিজস্ব, অপরটি ফ্রান্স। এই কথা বাংলা সাহিত্যে যদি কেউ আপন সাহিত্যসাধনায় দেখিয়ে থাকেন, সে ব্যক্তি বীরবল ওরফে প্রমথ চৌধুরী। বীরবলী প্রবন্ধরীতি তাঁর অন্যতম পরিচয়স্থল।

ঘুম আয়

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের চেতনা হতে স্বর্গের বেদনা যদি পাই
ঘুম আয়, যাই,
ঘুম আয়॥

নির্ঘুমের অন্ধকারে সুড়ঙ্গে উলঙ্গ মৃত্যু
জীবনের শান্তি শুষি যায়,
ক্ষোভে, রোষে, অসন্তোষে মারমুখী মন
মার খায়,
সংগ্রামের স্বপ্ন দিতে সোনাঘুম, আয়,
ঘুম আয়॥

প্রাচীনা রাত্রির নভে অমা অধিষ্ঠাত্রী দেবী,
যাত্রিদল তারই পদচ্ছায়
জবানেত্র ঊর্ধ্বে মেলি স্বর্গের নিন্দায়
গান গায়,
ঘুম আয়, সোনা ঘুম, আয়,
আরবার অঙ্গ মেলি মন মেলি
বহ্নি-প্রেরণায়
ঘুমের সুন্দর স্বর্গে
অভিস্নাত আকাশের ছায়
এ জীবন মহানন্দে মগ্ন হতে চায়
প্রার্থনায়,
ঘুম আয়॥

আজ মোর এই গান :
যে ঘুম, সোনার ঘুম, আয়।
স্বপ্নের চেতনা হতে স্বর্গের বেদনা চিত্ত চায়॥

ঘুমের অসীমে স্বপ্ন : নভোলোকে এক লহমায়
কে আমায় যায়, নিয়ে যায়?
উধাও উত্তরপথ দিক্ হতে দিগন্তে মিলায়,
পাখমন যত ধায়
দূরলোকে সূর্য-তারা যেন তুচ্ছ ধূলি-কণা
পায়ে পায়ে যায়, লেপে যায়,
সারা গায়ে যায় ব্যেপে যায়,—

তারপর প্রাণ মম
জ্যোতির্গর্ভ মহাশূন্যতায়
আশ্চর্য আনন্দ-ধ্যানে আকাশবীণায় গান গায়।
গান গায়, যত গান গায়
দূর তত সুর হয়ে যায়।
সুর হয় সুর হয়
দূর আর দূর নয়
সবই অন্তঃপুর হয়
মধুর মধুর হয়
সবই সুরচ্ছায়
নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্ত সুখে ঘুমায়, ঘুমায়,
ঘুম আয়,
আয় আয়, ঘুম আয়,
সেই ঘুম, সোনাঘুম, আয়॥

এখানে শকুনি ওড়ে আকাশের নীলিমায়, জান?
এখানে বাতাসে শুদ্ধ
মরণের নিঃশ্বাস জড়ানো?
এখানে আসে না ঘুম, এখানের সত্য জেগে-থাকা।
এখানে ঘুম তো মৃত্যু :
নানা কাজে তাই লেগে থাকা।
পাছে ঘুম আসে, তাই সাড়া পেতে
অহরহ তাড়া—
কান ধরে কাড়া ও নাকাড়া,
আরও যে রগড় কত ভীমবেগে কত মত
দামামা দগড়,
উদ্ধত মারণ-মন্ত্রে কত না প্রলয়,
কত ঝড়।...

সহে নাক আর, আজ আমার অন্তর চায়
মৃত্যু হতে অমৃতে বিদায়,
রাত্রির আকাশ জুড়ে জাগে ভীমরুক্ষ মৃত্যু
নিঃস্বপ্ন অমায়,
ঘুম আয়॥

কাঠ ও কবিতা

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

নিলামে এনেছি কিনে কিছুমিছু পুরানো কাঠ—
ঘুণ-ধরা আর উই-ধরা দোর-জানালা-খাট।
নক্‌শা পালিশ জলুস কিছুটা রয়েছে তার,
নূতনে কিরূপ ছিল তার রূপ বুঝানো ভার।
কাজে লাগিবে না হবে না গড়ন সেই কাঠের
লেগেছে মজুর জ্বালানি করিতে সেই খাটের।

ভাবি মনে মনে কবে সে কাহার ভবনে হায়!
গড়েছিল কোন্ ছুতারে কত না যতনে তায়।
বয়স তাহার কত ছিল তার মজুরি কত,
ঘর-সংসার ছিল কি তাহার মোদেরই মত?
ব্যয়ের বহরে আয়ের অঙ্কে কুলাত কি তা
ভাত-কাপড়ের খরচ বৌয়ের আলতা-ফিতা?

ছুতারের কথা ছেড়ে দি বাড়ির মালিক যিনি
রুজি-রোজগারে কত কিছু করেছিলেন তিনি।
কিন্তু কেমনে গেল খাট গেল জানালা-দোর,
পড়িল ছিঁড়িয়া বাড়ির স্নেহের নাড়ীর ডোর।
ফুল-তোলা খাটে কারুকার্যের কত না রূপ
কত না দিনের চিন্তা হেথায় হইত চুপ।

এসেছে বধূটি হয়তো পারায়ে গৃহের দ্বার
পেতেছে প্রথম মিলন-শয্যা হেথাই তার।
এই খাটে শুয়ে কত না রজনী হয়েছে ভোর,
অশিথিল বাহুবন্ধে বেঁধেছে প্রেমের ডোর।
ঘুণ-ধরা কাঠে হাড়ের ভিতরে লেগেছে দাগ
তরুণ-তরুণী-বক্ষ রাঙালো যে-অনুরাগ।

আজি তারা নাই কেটে পলায়েছে মায়ার জাল,
কি ছিল কাহিনী কবি জানে নাকো বকেয়া হাল।
ওয়াদা ফুরাল ফুরাল স্বপন ধরিত্রীর,
নিভে গেল শিখা মাটির দেহের প্রদীপটির।
কিন্তু কখন সে-স্বপন হল কেমনে শেষ
কেমনে নীরব হল সে-গানের সুরের রেশ?

অসুখে মৃত্যু, কিংবা বিসুখে দেনার দায়?
বিকালো নিলামে শয্যা ও সাজসজ্জা হায়!
রূপসী তরুণী হল তোবড়ানো জরতী বুড়ি,
হাঁটি হাঁটি করে লাঠি ধরে হাঁটে সে থুৎথুড়ি!
তেমনই হইবে সেগুনের গুণ আগুনে ছাই
জলে পুড়ে যাবে কার সারকুঁড়ে কে জানে ভাই!

সহসা নিরখি, নিঃশ্বাস ফেলে, লিখেছি যত
কাব্য কবিতা সবই তারা এই কাঠেরই মত।
খাতা হতে বই ছাপা হয়তো বা ছিঁড়িয়া পরে
কাহার ঘরণী পোড়াবে সে-পাতা এমনি করে!
তাহার ছেলের দুধ গরমের জ্বালানি হবে
তাহা দেখিবারে কবি কি তখনো বাঁচিয়া রবে?

খাট-চৌকাঠ কেটে কুটে হয় শতেক খান,
দৈববিগুণে সকলেরই গুণ হারায় মান।
কবি-কল্পনা ঝরনা কলমে কাটিল দাগ,
বাসন্তী রঙ গুলিয়া গুলালে খেলিল ফাগ।
সে-রঙ সে-ফাগ দুদিনের দাগ দুদিন পরে
পোড়া কাঠ আর মরা পাতা সব যাবে সে ঝরে।

পূর্ণাহুতি

শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তী

শহরের উত্তর প্রান্তে একটি অপ্রশস্ত গলি, গাদাগাদি ঠাসাঠাসি বাড়িগুলির মাঝে চুনবালি-খসা জীর্ণ একটি তিনতলা বাড়ির একতলায় একটি ঘর। প্রখর দিবালোকেও ঘরখানির ভিতর আবছা আলো, আশেপাশের উঁচু বাড়িগুলির ব্যূহ ভেদ করে আলো-বাতাসের প্রবেশ সে ঘরে প্রায় দুঃসাধ্য। ঘরখানির মালিক যে একজন শিল্পী এবং শিল্পসাধনা অদ্যাপি যে তাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠা প্রদান করে নি তা ঘরখানির আভ্যন্তরীণ চেহারাতেই প্রতীয়মান। অতি সঙ্কীর্ণ একটি তক্তপোশের একধারে বিছানাটা জড়ো করে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তক্তপোশের উপর একরাশ ছেঁড়া বই, ম্যাগাজিন, ছোট-বড় কতকগুলি পেন্সিল, সরু মোটা চ্যাপ্টা নানা আকারের ডজন খানেক তুলি, প্যালেট, এক গাদা রংয়ের টিউব। তক্তপোশের সন্নিকটে জানলার ধার ঘেঁষে ইজেল, তার বুকে আবদ্ধ রয়েছে প্রায় সম্পূর্ণ একখানা ছবি। ঘরের অপর দিকে একটি কোণে স্টোভ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত আবশ্যকীয় সামান্য কিছু তৈজসপত্র, তারই পাশে সস্তা কাঠের নড়বড়ে একটি টেবিলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। অন্য কোণে চওড়া ফিতের ফাঁসে বাঁধা একরাশ ছবি, অর্থাভাবে সম্ভবতঃ ফ্রেমবদ্ধ করার সুযোগ ঘটে নি। শ্রীহীন ঘরখানির একমাত্র আভরণ দেয়ালে টাঙান দুখানি ছবি, হালকা ফ্রেমে বাঁধা, শিল্পী চিত্র দুটিতে তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলেছে প্রকৃতির দুই বিভিন্ন রূপ। একখানিতে রূপায়িত হয়েছে প্রকৃতির রুদ্রসুন্দর মূর্তি, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের তুলিলিপির মাধ্যমে; অপরখানিতে চিত্রিত হয়েছে টিলা পাহাড়ের তলায় পাহাড়ী গ্রাম, বয়ে যাচ্ছে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী সবুজ খেত-খামারের কোল ঘেঁষে, প্রকৃতির স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী।

ইজেলের সামনে বসেছিল অতনু নিস্পৃহ ভাবে, রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি দু চোখে নিয়ে। আশা করেছিল ছবিটি কাল রাত্রেই শেষ করতে পারবে, খেটেছিল অধিক রাত পর্যন্ত, কিন্তু এখনও আরও কয়েকটি তুলির আঁচড় দেওয়া বাকী। ফরমায়েশী ছবি, বহু আয়াসে একটি শাঁসাল খদ্দের যোগাড় করতে পেরেছে অতনু, ছবিটি তাঁর মনে ধরলে মোটামুটি কিঞ্চিৎ লাভ হবে কিন্তু ডেলিভারি দিতে হবে আজই সন্ধ্যার ভিতর। অতৃপ্ত নিদ্রার আমেজে শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে, কড়া এক কাপ চা খেলে হয়তো একটু চাঙ্গা লাগত। সতৃষ্ণ নেত্রে তাকাল অতনু একবার নড়বড়ে টেবিলটার দিকে, এই মুহূর্তে যদি দেখতে পেত ওখানে এক কাপ ধূমায়িত চা! অথচ উঠে গিয়ে স্টোভ জ্বেলে কেটলি বসানোর মত উৎসাহটুকুও যেন খুঁজে পাচ্ছিল না সে। রাস্তার ওপাশে চায়ের দোকানের ছোকরাটাকে ডাকবে কি না এক কাপ চা দিতে এইটাই আনমনে ভাবছিল অতনু, এমন সময় সজোরে দরজাটা খুলে গেল। চমকে তাকাল অতনু। দরজাটা ভেজিয়ে, হাতল ভাঙা চেয়ারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল যে মূর্তি, তার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে ওর মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেল, সারা দেহে খেলে গেল বরফ-গলা শিহরণ।

খুব চমকে গেছ, মনে হচ্ছে?

প্রত্যুত্তরে অতনুর গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বার হল: তু—তু—তুমি!

চিনতে খুব অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

চিনেছে অতনু, চিনেছে মর্মান্তিক ভাবেই, কিন্তু না-চেনার মতই চেহারা হয়েছে তপতীর। পাঁচ মাসের ব্যবধানে অতি শ্রীময়ী একটি চেহারা যে এত শ্রীহীন হয়ে যেতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। দুধে-আলতা গায়ের রঙ পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, চোখ ঢুকে গেছে গর্তে, চোয়ালের হাড় বিসদৃশভাবে উঁচু হয়ে উঠেছে, শীর্ণ হাতে জেগে উঠেছে নীল নীল শিরা।

এতদিন বাদে হঠাৎ!—স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল অতনুর, ওর গলাটা কেউ যেন টিপে ধরেছে।

এটুকু দেরি হবে না? শেষ করে আসতে হল তো!—নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর তপতীর।

হতভম্বের মত ওর মুখপানে তাকাল অতনু, উৎকণ্ঠায় বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা লাফালাফি শুরু করেছে। কী বলতে চায় তপতী?

ফ্যালফেলিয়ে চেয়ে আছ যে, বোধগম্য হচ্ছে না বুঝি?—চিবিয়ে চিবিয়ে বলল তপতী, যে দুর্বুদ্ধি মাথায় ঢুকিয়েছিলে, তাকে কাজে পরিণত করতে সে সময়টা ঠিক উপযুক্ত ছিল না তো, তাই এই পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হল।

দুর্বুদ্ধি? আমি—তোমাকে!—থতিয়ে থতিয়ে কী বলতে যাচ্ছিল অতনু, ওকে থামিয়ে দিল তপতী।

চুপ কর, যথেষ্ট হয়েছে। বোকা সাজার চেষ্টা কোর না।—তির্যক্ হাসিতে ঠোঁটের কোণ ঈষৎ বিস্ফারিত হল তপতীর: তোমার ধারণা ছিল অতখানি কালিতে ডুবিয়ে

অলকার স্বপ্ন
ক্লাস বসবার আগেই সেদিন ক্লাস সেভেনের মেয়েদের মধ্যে হাসির রোল উঠল। অলকা নাকি স্বপ্ন দেখেছে ইন্দুলেখার সঙ্গে সেলিমের বিয়ে হয়ে গেল। সেলিম অর্থাৎ ইতিহাসের পাতায় সন্ত পড়া জাহাঙ্গীর বাদশাহ। ইন্দু অসম্ভব চটে গেল। স্বপ্ন দেখার জন্যে নয়, ক্লাসে কথাটা রটনা করার জন্যে।
অবশ্য ইন্দুর বিষয়ে এ স্বপ্ন খুব বিচিত্র নয়। ও হোল ছোটবেলা থেকেই গিন্নী জাতের মেয়ে। রান্নার ক্লাসে ওর উৎসাহের অন্ত থাকেনা। সবাই তাই ওকে 'গিন্নী' বলেই ডাকতো আর আড়ালে হাসতো।
DL. 453A-X52 BG

এই স্কুল কলেজের আনন্দময় দিনগুলি ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবাই ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইন্দুকে নিয়েই কথা—ইন্দুর জীবনে কিন্তু ইতিহাসের একটা স্থান রয়ে গেছে। ওর স্বামী বাংলার বাইরে কোন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।

দূর প্রবাসে কত সন্ধ্যায় বসে গত জীবনের স্মৃতি ওর সামনে ভেসে যায়—অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। আর ওর মেয়ে উর্ম্মী যখন ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের পাতা খুলে পড়ে, তখন হঠাৎ ও হেসে ফেলে।

সেদিনের সেই গিন্নী ইন্দুলেখার সংসারে আজ তার কত কল্পনা সার্থক হয়েছে। সেদিনের খেলাঘরের গৃহিনী ইন্দুলেখার সংসার আজ আনন্দময়—কারণ তার সদাজাগ্রত কল্যানদৃষ্টি সংসারে সর্বদিকে প্রসারিত। পরিচ্ছন্ন ভাঁড়ার ঘরে মশলাধার আর টিনে রঙীন অক্ষরে লেখা বিভিন্ন ডাল আর মশলার নাম। ধোঁয়া ধুলো নেই রান্নাঘরে—বিভিন্ন দেশের সুন্দর গঠনের বাসনপত্রের সংগ্রহ। রান্নাঘরের পরিবেশে মন খুশী হয়ে উঠে—এখানেই তার কাজ আর অবসর।

ইন্দুর সংসার ছোট—স্বামী আর একমাত্র কন্যা উর্ম্মী। উর্ম্মীর জীবন গান বাজনা, লেখাপড়ায় পূর্ণ। তার কোন কৌতুহল নেই রান্নাবান্না সম্বন্ধে। মা কিন্তু এ নিয়ে ক্ষুন্ন হ'ন। তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কন্যার এ বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি।

তারপর আরো দিন কেটেছে। উর্ম্মী কলেজের পড়া সব শেষ করেছে—পড়াশুনায় তার অনুরাগ, গান বাজনায় তার আগ্রহ অপরিসীম। আর মা দুঃখ পান যে সাংসারিক বিষয়ে সে রয়ে গেছে তেমনি উদাসীন।

এমন মেয়েকেও সংসারের ডাকে সাড়া দিতে হয়—সানাইতে পুরবীর সুর বাজে, বর আসে। বাংলার এক সমৃদ্ধ পরিবারের সুসন্তান।

যে সংসার তাকে বরণ করল সেখানে সে দেখল দেশী ও বিদেশী জীবনধারার ইঙ্গিত। আহারের বিষয়ে ও দেশীবিদেশী নানাপ্রকম রান্নায় তাদের পরিতৃপ্তি। এক আনন্দমুখর সুন্দর সংসার।

উর্ম্মী বুদ্ধিমতী মেয়ে। উপলব্ধি করল পরিজনদের সুখী করতে হলে যেমন গানবাজনা পড়াশুনোর জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান আছে তেমনি সংসারকে উপেক্ষা করা চলেনা, জীবনের সে দিকটা তার অপরিচিতই রয়ে গেছে।

বুদ্ধিমতী মেয়ের মনে পড়ল তার সুগৃহিনী মায়ের কথা। কৌশলে সে একমাসের জন্যে ফিরে এলো তার মায়ের কাছে। ঘোরাঘুরি করতে লাগল ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরের আঙিনায়। মা বুঝলেন এ অহেতুক নয়।

মা'র কাছে সে প্রকাশ করলনা সত্য কথাটি। তারপর সে দেখলো নতুন দৃষ্টি দিয়ে ম'ার সাজানো সংসারটি। ভাঁড়ার ঘরে দেখলো, সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিনে সাজানো রান্নার বিভিন্ন উপকরণ।

মার কাছে সে জানলো যে 'ডালডার' উপাদানে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' আর 'ডি' আর সবচেয়ে ওর মজা লাগলো যে মিষ্টি, লুচী থেকে সুরু করে ভাজা, তরকারী, মাছের ঝাল, ঝোল, মাংসের বিভিন্ন প্রণালী সবই 'ডালডায়' রান্না করা যায়—শুধু তাই নয়, খেতেও মুখরোচক হয়। এ হিসাবে দামেও সস্তা আর পুষ্টির দিক দিয়েও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। 'ডালডা' সহজে, সর্বদেশে পাওয়া যায় শুধু ওই খেজুর গাছ মার্কা হলদে টিন দেখে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

উর্ম্মী মা'র কাছে 'ডালডার' মাধ্যমে কত রান্না করল—ওর কাছে তা নিত্য নতুন আবিষ্কারের মত। তার রস বৈচিত্র্যে সে নিজেই মুগ্ধ হোল।

শ্বশুরালয়ে যখন সে ফিরে গেল তার বিদ্যাবুদ্ধি আর বিশেষভাবে রান্নার সুখ্যাতি সবাই করতে লাগলেন।

যে মেয়েকে এই ঘর থেকে পাঁচ মাস পূর্বে বিদেয় করে দিয়েছিলে, সে কালামুখী কি আর লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারবে? কলঙ্ক মোচন করতে গতি হবে তার গঙ্গার কোলে আশ্রয় নেওয়া, রেহাই পাবে নিজে, রেহাই দিয়ে যাবে তোমাকে, নয় কি? কিন্তু তুমি আমাকে কত কম চিনেছিলে অতনু, চিনতে অবশ্য তোমাকে আমিও পারি নি। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যদিও আমরা এসেছিলাম, পরস্পরের পরিচয় আমাদের কাছে গোপনই থেকে গিয়েছিল।

দম নেবার জন্য একটু থামল তপতী: প্রথমটা ওই ধরনের একটা ইচ্ছা আমারও মনে জেগেছিল কিন্তু তখনই ভাবলাম, কেন? একটি সরল অনভিজ্ঞ মেয়ে মনে প্রাণে একটি ছেলেকে বিশ্বাস করে সম্পূর্ণরূপে তার কাছে আত্মনিবেদন করেছিল। এই তার প্রতিদান! বিশ্বাসহন্তা সেই ছেলেটি দিব্যি সরে দাঁড়াবে, এতটুকু আঁচ তার গায়ে লাগবে না, যেহেতু সে পুরুষ আর তার সাময়িক প্রমোদের জন্যে জ্বলে পুড়ে মরবে মেয়েটি? অসম্ভব। এর জবাব চাই। তাই আমি মরতে গিয়েও ফিরে এলাম অতনু।

স্তিমিত দৃষ্টিতে ওর পানে তাকাল অতনু, অমানুষিক জিঘাংসায় তপতীর চোখ জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে।

অর্ধেক কাজ শেষ করে এসেছি।—দাঁতে দাঁত চেপে বলল তপতী, বাকীটুকু শেষ করার প্রতীক্ষা। কালির পাথারে নাকানিচোবানি খেয়ে, লজ্জা ভয় সংকোচ সব আমার ঘুচে গেছে। বিবেকের আমি টুঁটি টিপে মেরেছি। কৃতকর্মে তোমার অংশের ভাগ দিতেই আজ আমার আসা। তুমিই বা বঞ্চিত হবে কেন অতনু, তুমিও সমভাগী। বরঞ্চ অংশ বিচার করতে গেলে পাল্লাটা তোমার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়বে, কারণ ফূর্তির নেশায় মেতেছিলে তো তুমি।

আশঙ্কায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল অতনুর, থেমে থেমে কোনমতে বলল, খুলে বল তপতী, তোমার হেঁয়ালী ভাষা আমি বুঝতে পারছি না।

একটু ধৈর্য ধর। মনে হচ্ছে, তোমার এক কাপ চায়ের বিশেষ দরকার। মুখখানার যা চেহারা হয়েছে তোমার, তেষ্টায় গলা বোধ হয় শুকিয়ে গেছে, নয় কি?—নিষ্ঠুর এক টুকরো হাসি তপতীর ঠোঁটের কোণে, পরিস্থিতিটা যেমনই অপ্রত্যাশিত, তেমনই অপ্রীতিকর, গলা শুকিয়ে যাওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়।

এতক্ষণে কিছুটা যেন ধাতস্থ হয়েছে অতনু। তপতী স্টোভ জ্বালতে উদ্যত হতেই, বাধা দিয়ে সে বলল, চায়ের কোন দরকার নেই। যা বলতে এসেছ, শেষ কর তপতী।

নিরস্ত না হয়ে উত্তর দিল তপতী, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমিও সকাল থেকে চা খাবার অবকাশ পাই নি, তোমার তৃষ্ণা নিবারণ প্রয়োজন। চা না খেয়ে নিলে ঠিক জুতসই লাগবে না, কি বল?

তা হলে চায়ের দোকানের ছোকরাটাকে বরং ডাকি। —চটিতে পা গলাবার চেষ্টা করল অতনু।

চা কি আজ প্রথমই করছি যে এত কুণ্ঠা বোধ করছ?—শুষ্ক হেসে জবাব দিল তপতী, এই স্টোভে কেবল চা নয়, তার সঙ্গে মুখরোচক আনুষঙ্গিক তৈরি করে একাধিক বার তোমাকে খাইয়েছি। তোমার এই ভ্যাপসা ঘরে একদিন সংসার রচনা করবার স্বপ্ন দেখেছি। আজ না হয় শেষ বারের মত তোমাকে শুধু এক কাপ চাই তৈরি করে দিই। এ ঘরে আজই তো আমার শেষ অভিসার। আর তো ইহজগতে আমাদের সাক্ষাৎ হবে না।

কেটলিটা স্টোভে চাপিয়ে, চায়ের সরঞ্জাম গোছাতে গোছাতে তপতী বলল, চা খেয়ে একটু সতেজ হয়ে ফিরে যাওয়া যাবে পাঁচ মাস আগে—কি বল? সেখান থেকেই তো আজকের কাহিনীর শুরু।

আতঙ্কিত বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল অতনু।

* * *

বছর দেড়েক পূর্বে ওদের প্রথম পরিচয়, পরিচয় হয়েছিল এই ঘরটিতেই।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে; গুটনো বিছানাটাতে হেলে আধ-শোওয়া অবস্থায় অতনু একখানা ম্যাগাজিন পড়ছিল। ঘরে প্রবেশ করল রূপেশ, তার পিছনে মৃদু পদক্ষেপে একটি তন্বী তরুণী। চমকে তাকাল অতনু, উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল: কী সৌভাগ্য আমার, এমন আকস্মিক দর্শন লাভ!

ওর ছাত্রজীবনের সতীর্থ রূপেশ, বর্তমানে বড় চাকরি করে।

আক্ষেপসূচক ভঙ্গী করে জবাব দিল রূপেশ, দায়ে ঠেকে বন্ধুদের একটি চিঠি মারফতও যে স্মরণ করা দরকার বোধ করে না, এমন ধারা অভদ্র ব্যক্তিকে দর্শনদানের আকিঞ্চন আমার অন্তত: বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু গ্রহ বিরূপ। এস আগে পরিচয় করিয়ে দিই, এটি আমার মাসতুত বোন তপতী, থার্ড ইয়ারে পড়ে, একটু-আধটু আঁকার চর্চা করে এবং শিল্পীদের প্রতি পোষণ করে মারাত্মক শ্রদ্ধা। একটা আর্ট-গ্যালারিতে তোমার পেন্টিং দেখে, তোমার প্রতিভার প্রতি অপরিসীম ভক্তিমতী হয়ে পড়েছে। কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলেছিলাম সেদিন যে তুমি আমার বন্ধু। আর যায় কোথা, সঙ্গে সঙ্গে ধরে বসেছে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কাল ফিরে যাচ্ছি কর্মস্থানে, আজকের সন্ধ্যেটিই অবকাশ, অগত্যা ওকে নিয়ে আসতে হল।

বহু ধন্যবাদ। বস এখানে।—তক্তপোশের উপরকার জিনিসগুলি সরিয়ে রূপেশের বসবার জায়গা করে দিল

র। স্মিতমুখে তপতীকে বলল, আপনি এই চেয়ারটাতে
ন।

ততক্ষণে সঙ্কীর্ণ তক্তপোশের উপর জাঁকিয়ে বসেছে
শ : মাথা নীচু করে বসে রইলি কেন তপু, ভাল করে
 ভাখ্। শিল্পীদের তো তুই অভিমানবের পর্যায়ে
লস, আমাদের এই শিল্পীটির চেহারায় সেরকম
ন নিদর্শন আছে কিনা দেখে নে।

দাদার উপর বিলক্ষণ চটেছিল তপতী, একটি
রিচিত মানুষের সামনে এ ভাবে তাকে অপ্রতিভ
র দরুন। রূপেশের দিকে একবার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে
, নতমুখে রুমালটা আঙুলে জড়াতে লাগল সে।

তপতীকে দেখে অতনুর শিল্পীচোখ মুগ্ধ হয়ে গেল।
ানিতে অপূর্ব লাবণ্য, সর্বোপরি মেয়েটির অনুপম
সৌষ্ঠব, ছিপছিপে সুঠাম তনুদেহ, এ রকম একটি
কে বোধ হয় কবিরা তুলনা দিয়েছেন বল্লরীর সঙ্গে।
ত্র আকর্ষণ বোধ করল অতনু।

রূপেশের দিলখোলা মধ্যবর্তিতায় তপতীর সঙ্কোচ
টে গেল ক্রমশঃ, হাসি গল্পে সন্ধ্যাটা সেদিন চমৎকার
টে ছিল।

তারপর যথাসময়ে চলে গেল রূপেশ কর্মস্থলে, কিন্তু
 যেতে পারল না তপতী অতনুর ফাঁদ এড়িয়ে।

সৌন্দর্যের উপাসনা শিল্পীর ধর্ম, তা ছাড়া অতনুর ছিল
র এক নেশা, কমনীয় নারীদেহের প্রতি ওর ছিল দুর্দম
াভ। নিত্য নূতন রূপসী মেয়ের সাহচর্য লাভের জন্য
তনুর প্রচেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাতে ছিল ওর প্রচুর
বিধা, বিনা খরচায় ওর শিল্পসাধনার সহায়তা লাভ হত,
ার সেই সঙ্গে মিলত অবসর বিনোদনের সরস উপাদান।
মেয়েদের আকৃষ্ট করতে ওর ঈশ্বরদত্ত চেহারাটা যথেষ্ট
াহায়ক হয়েছিল আর চেষ্টা করে আয়ত্ত করেছিল অতনু
নিপুণ বাকচাতুর্য। ফলে ওর সান্নিধ্যে এলে মেয়েরা এমনই
একটা মাদকতাময়ী অনুভূতি বোধ করত যে নিতান্ত
ঠিনচিত্ত মেয়ে ছাড়া ওর নিক্ষিপ্ত শর বড় একটা ব্যর্থ
ত না। অবশ্য মধ্যে মধ্যে ওকে অসুবিধায়ও যে না
াড়তে হত তা নয়, রঙিন সাহচর্যের ভিতর যখনই একটু
প্রগাঢ়তা আসার লক্ষণ প্রকাশ পেত, জাল কেটে বেরিয়ে
াড়তে সচেষ্ট হত অতনু, অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হত
 কারণে, অর্থদণ্ডও দিতে হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে।
তবু বড় মর্মান্তিক নেশা।

অতনুর চরিত্রের এই বিশেষত্বটি সম্ভবতঃ রূপেশের
অগোচর ছিল, নচেৎ সম্ভাব্য পরিণামটা বিবেচনা করে ওর
াঙ্গে সুশ্রী বোনটির পরিচয় করিয়ে দিতে হয়তো দ্বিধা
করত।

অতনুর মত সুদক্ষ শিকারীর পক্ষে তপতীকে লক্ষ্যবিদ্ধ
করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ছিল না। বয়স অনুপাতে মেয়েটি
অত্যন্ত সরল এবং অনভিজ্ঞ, তা ছাড়া বাড়িতেও দূর দিকে
নজর রাখার মত তেমন কেউ ছিলেন না। শৈশবে
মাতৃহীন তপতী, পিতা আলাভোলা ধরনের মানুষ,
কাজকর্মের অবসরে অধ্যয়নে ব্যাপৃত থাকেন। অতএব
অতনুর পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। অসতর্ক মক্ষিকা যেভাবে
ঊর্ণনাভের জালে আবদ্ধ হয় সেইভাবে ধরা পড়ল তপতী।
দিশাহারা হয়ে পড়ল বেচারী, তার মত সাধারণ একটি
মেয়ের প্রতি অসাধারণ শিল্পীর স্তুতিগীতিতে। অনাস্বাদিত
এক বিচিত্র নেশায় আত্মহারা হল তপতী। আসতে লাগল,
অতনুর আহ্বানে, অতনুর সান্নিধ্যে প্রায় প্রতিদিন, কলেজ
পালিয়ে অথবা কলেজের শেষে। বাড়ি ফিরে রাত্রে গা
এলিয়ে দিত যখন বিছানায়, ঘুম আসত না চোখে,
অতনুর সাহচর্যে কেটে-যাওয়া মুহূর্তগুলি ভেসে উঠত
ছায়াছবির মত মানসপটে। ওর স্বপ্নলোকের রাজপুত্র
অতনু, রাজপুত্রের স্পর্শে ওর অষ্টাদশ বর্ষের যৌবন জেগে
উঠেছে অকস্মাৎ, সারা দেহে ছড়িয়ে দিয়েছে যেন আগুনের
জ্বালা।

অতনুর ঘরে যেদিনই ওরা মিলিত হত, বিদায়ের
পূর্বে প্রায়ই তপতী ওর রাত্রের খাবারটা তৈরি করে
রেখে যেত, কখনও বা চায়ের সঙ্গে অতনুর সামনে সাজিয়ে
দিত সুস্বাদু আহার্য। হেসে মন্তব্য করত অতনু, এভাবে
রসনাকে প্রশ্রয় দিয়ে স্বভাবটা আমার খারাপ করে দিচ্ছ
কিন্তু তপতী।

জবাব দিতে গিয়ে থেমে যেত তপতী, পুলকে
রোমাঞ্চিত হত কল্পনা করে, এ কাজটি কি ওর নিত্যকর্ম
হয়ে উঠবে না অচির-ভবিষ্যতে!

সেদিনও খাবার তৈরি করছিল তপতী আর অতনু
নিবিষ্ট ছিল বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে ক্যানভাসের ওপর
একটি অভিনব রঙ সৃষ্টি করতে। তপ্ত ঘিয়ে লুচিগুলি
ভেজে থালায় রাখতে রাখতে একটা প্রশ্ন করে বসল তপতী,
আচ্ছা অতনু, তোমার বহু বান্ধবীর গল্প শুনেছি তোমার
মুখে, তাদের মুখের ছাপও ধরা আছে তোমার আঁকা
ছবিতে। এদের মধ্যে একজনও কি তোমার বিশৃঙ্খল
জীবনটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে চেষ্টা করে নি?

টিউব থেকে খানিকটা রঙ প্যালেটে নিয়ে অন্যমনস্ক
অতনু জবাব দিল, নিশ্চয়ই করেছে, এটা যে মেয়েদের
সহজাত প্রবৃত্তি। আবদ্ধ হতে এবং করতে ওদের
সীমাহীন আগ্রহ, কিন্তু করবে কাকে বল? বন্ধনের ভিতর
পা দিতে যার বিন্দুমাত্র অভিরুচি নেই, তাকে শৃঙ্খলিত
করা কি সহজ কথা?

ও!—অস্ফুট শব্দ নির্গত হল তপতীর ঠোঁটের ফাঁকে।
হঠাৎ যেন ছন্দপতন হল, কেটে গেল সুর।

অধর দংশন করল অতনু, রঙের কারুকার্যে একাগ্র
থাকায় অসতর্ক মুহূর্তে অবাঞ্ছিত একটি সত্য অভিব্যক্ত

নিঃসৃত হয়েছে তার মুখ থেকে। যা বলে ফেলেছে তা ফেরান যায় না, পালিশ দেওয়া চলে। তপতীর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে উচ্চাঙ্গের একটু কড়া হাসি হাসল অতনু: সাধারণ মেয়েরা বুঝবে না তপতী কিন্তু তুমি বুঝবে। তোমার ভিতর রয়েছে একটি শিল্পীমন, তাই তুমি শিল্পসাধনার এত মর্যাদা দাও। মুক্ত বিহঙ্গের মত শিল্পীর জীবন, আহরণ করে সে বিশ্বের রূপ রস গন্ধ। দুর্বার তার গতি, দুঃসাহসিক তার মন, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বিসর্জন দিয়ে করে যায় নিভৃতে সাধনা, রেখে যায় সৃষ্টির কীর্তি। বন্ধন নিয়ে আসে রূঢ় বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের কদর্য হট্টগোল। বন্ধনে ধরা পড়ে যে শিল্পী, তার প্রতিভার হয় অপমৃত্যু।

তপতী তখন একটা পাত্রে ক্ষিপ্রহস্তে ভাজা লুচিগুলি গুছিয়ে রাখছে। অতনুর এই দার্শনিক উক্তির জবাবে সে কেবল বলল, দুখানা গরম লুচি খাবে?

এখন আর খাব না, এইমাত্র তো চায়ের সঙ্গে ফ্রেঞ্চ টোস্ট খাওয়ালে।—তপতীর আনত মুখখানা দেখতে চেষ্টা করল অতনু, তার বাক্যবিন্যাস কি মাঠেই মারা গেল!

হাতটা ধুয়ে, রুমালে মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়াল তপতী। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সংক্ষেপে বলল, চলি।

এখনি যাবে?—ব্যগ্র কণ্ঠ অতনুর।

শুষ্ক হেসে জবাব দিল তপতী, তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার, বাড়িতে কাজ আছে।

তপতী চলে গেলে, একটা সিগারেট ধরিয়ে তক্তপোশের উপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল অতনু। মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলে একটা বেকায়দার কাণ্ড ঘটিয়ে বসল সে। জোরে জোরে টান দিয়ে, শেষ করে, সিগারেটের নিঃশেষিত টুকরোটা জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। অসহ্য! মেয়েগুলোকে কী উপাদানে সৃষ্টি করেছেন ভগবান, জীবনটাকে এতটুকু স্পোর্টিংলি নিতে শিখল না এরা! লেখাপড়াই শিখুক আর স্বাধীন হয়ে একা একা ঘুরেই বেড়াক, আসলে সব এক। মান্ধাতা আমলের বস্তাপচা মনোবৃত্তি আঁকড়ে বসে আছে। আর একটা নতুন প্যাঁচ কষতে হবে। ফের একটা সিগারেট ধরাল অতনু, তপতীর প্রয়োজন এখনও মেটে নি, এখনই ওকে সে বিদায় দিতে পারবে না।

দশ দিন কেটে গেল, তপতী আর এল না। অবশেষে তপতীর কাছে একটি ক্ষুদ্র লিপি পাঠাল অতনু—সবিনতি আহ্বান জানিয়ে, অনুরাগের রঙে প্রতিটি অক্ষর রঞ্জিত করে।

চিঠিখানি হাতে নিয়ে চিন্তায় পড়ল তপতী, কী করবে সে? বুকের ভিতর থেকে কে যেন বারংবার নিষেধ করল পুনরায় ফাঁদে পা দিতে কিন্তু সর্বনাশা মোহ তখনও যে কাটে নি; মনকে চোখ ঠারল তপতী, দেখাই যাক না একবার গিয়ে, আচ্ছা গোটাকতক কড়া কথা শুনিয়ে চলে আসবে সে। ভেবেছে কি অতনু, মেয়েরা ওর খেলার পুতুল, শখ মিটলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে!

তপতীকে যে আসতেই হবে, নারীচরিত্রবিশারদ অতনু সেটা ধরেই নিয়েছিল একপ্রকার। ঈষৎ রুক্ষ চুল অবিন্যস্ত করে, মুখে একটা সকরুণ ভাব ফুটিয়ে অপেক্ষা করে রইল সে। যথাসময়ে তপতী এল, ওর হাতখানি ধরে তক্তপোশের উপর সাদরে বসিয়ে দিয়ে ছোট টুলটি টেনে ওর ধার ঘেঁষে বসল অতনু। অতনুর ম্লান মুখখানি দেখে মায়া বোধ করল তপতী কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করল না, মনটাকে শানিয়ে নিয়ে এসেছিল সে। নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, ব্যাপার কি, ডেকেছ কেন?

পালটা প্রশ্ন করল অতনু, এতদিন আস নি কেন? পরিচয় হয়ে পর্যন্ত একটি দিনও কি আমাদের অদর্শনে কেটেছে?

নিরুত্তরে তপতী নিজের হাতখানি নিরীক্ষণ করতে লাগল।

বল তপতী, কী হয়েছিল। আমি কি তোমার বিরাগভাজন হয়েছি?—ব্যাকুল কণ্ঠ অতনুর।

আনতমুখে জবাব দিল তপতী, আমাকে আর তুমি ডেক না অতনু। আমাদের মেলামেশাতে এখানেই ছেদ টানা ভাল।

সে কি! কী বলছ তুমি?—ওর হাত দুখানি নিজের হাতে টেনে নিল অতনু।

নিজের হাত দুখানি অতনুর হাতের বন্ধন থেকে মুক্ত করে নিল তপতী: ঠিকই বলছি। আমাদের মত এবং পথ পৃথক্। এক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ মেলামেশাটা কি বাঞ্ছনীয়?

এভাবে আমাকে ভুল বুঝবার কী হেতু আমি ঘটালাম তপতী?—প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠস্বর অতনুর।

তপতী স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল অতনুর দিকে: তুমি শিল্পী, মুক্ত বিহঙ্গের মত তোমার জীবন, নয় কি? আমি অতি সাধারণ একটি মেয়ে, ধূলোবালির পৃথিবীর জীব। আমার সমাজ আছে, আত্মীয়-পরিজন আছে, তোমার সঙ্গে এভাবে মেলামেশা করলে আমার পক্ষে তার পরিণামটা একবার ভেবে দেখেছ অতনু?

ও!—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অতনু: এতক্ষণে তোমার দ্বিধার কারণ বুঝলাম। আমার সেদিনের কথাটার নিগূঢ় অর্থ যে তোমার কাছে অস্পষ্ট থাকবে, এ তো আমার মাথায় আসে নি।

তুমি কী বলতে চাও অতনু?—রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল তপতী।

সেদিন যা বলেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই।—চেয়ারটা টেনে তপতীর মুখোমুখি বসল অতনু: বন্ধনে

আবদ্ধ হতে চায় না শিল্পী, বন্ধনকে সে ভয় পায়, কিন্তু সে কোন্ বন্ধন? যে বন্ধন লৌহশৃঙ্খল হয়ে তার অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে, সেই বন্ধন থেকে দূরে থাকে শিল্পী। ফুলের মালার বন্ধনও তো বন্ধন তপতী, সে বন্ধনে শিল্পী বেছে ধরা দেয়।

তোমার ও কাব্যময় ভাষা আমি বুঝতে পারছি না অতনু। স্পষ্ট করে বল কী তোমার বক্তব্য।

শোন তপতী।—অতনুর কণ্ঠস্বরে আবেগ ঝরে পড়ল: তুমি আমার জীবনে সেই মেয়ে যার কল্যাণস্পর্শে আমার শিল্পপ্রতিভা বিকশিত হবার অপেক্ষায় ছিল। তোমাকে প্রথম দেখার ক্ষণটিতে এই অনুভূতিটিই আমার মনে জেগেছিল। কত মেয়ে ইতিপূর্বে আমার জীবনে এসেছে, এতটুকু রেখাপাতও কেউ করতে পারে নি। তুমি আমার প্রেরণা, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন লক্ষ্যহীন।

তপতীর বুকের ভিতর তোলপাড় করতে লাগল, অন্তর দিয়ে এমন অনুরাগের কথা এর আগে আর কোন দিন বলে নি অতনু। উত্তেজনায় ওর মুখ রক্তিম হয়ে উঠল। ওর ভাবান্তর দেখে উল্লসিত হল অতনু, রুমাল দিয়ে মুখ মুছবার ছলে মনে মনে হেসে নিল একবার। সার্থক তার অভিনয়দক্ষতা!

তোমার উক্তির যথার্থতা তুমিই জান অতনু।—সজল কণ্ঠে বলল তপতী, আমি কিন্তু সত্যিই চেয়েছিলাম তোমার শিল্পসাধনার সহায় হতে, তা তো সম্ভব নয়।

কেন?—ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল অতনু।

তুমি আমাকে কামনা কর প্রেরণা রূপে, সমাজ তা স্বীকার করবে কেন?—বেদনার্ত স্বর তপতীর।

তপতীর পাশে বসে, হাত দিয়ে ওর পিঠ বেষ্টন করে স্নেহঘন কণ্ঠে জবাব দিল অতনু, সমাজের স্বীকৃতি ছাড়া তোমাকে আমি পেতে চাই, এ ধারণা তোমার কেন হল তপতী? আমি কি পাগল না অমানুষ!

আনন্দের আবেগে চোখ ছাপিয়ে গালের উপর অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল তপতীর, হাতের ভিতর ও মুখ লুকল। ওকে আরও নিকটে আকর্ষণ করে, কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল অতনু, তুমি আমার কল্যাণলক্ষ্মী, আমার সহচারিণী হয়ে নিয়ত আমার পাশটিতে থাকবে, এই আমি চাই তপতী।—একটু থেমে ফের বলল অতনু, শিল্পীর ঘরণী হবার দুঃখ অনেক, সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন তার নয়। তোমার সে ত্যাগস্বীকারের ক্ষমতা আছে এই আমার ভরসা। তবু একবার ভেবে দেখ তপতী, পারবে এই ছন্নছাড়ার জীবন ছন্দময় করতে?

আর্দ্র চোখ দুটি তুলে ধরল তপতী: আমার মন কি তোমার অজানা? কিন্তু এই যদি তোমার মনের কথা, কেন এত ব্যথা দিলে আমায়? আমি কী কষ্ট পেয়েছি এই কদিন?

ততোধিক কষ্ট আমি পেয়েছি তপতী, চেয়ে দেখ আমার দিকে, আমার চেহারাই সে সাক্ষ্য দেবে।

প্রত্যুত্তরে ওর বুকে মাথা রেখে এলিয়ে পড়ল তপতী।

অতনুর সুচতুর আচরণে তপতীর মনের দ্বিধা সংকোচ কেটে গেল ক্রমশঃ, সম্পূর্ণরূপে ও অতনুর কাছে আত্মনিবেদন করল। দিনে দিনে ওদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হল। শহরের উপকণ্ঠে সেদিন তপতীকে নিয়ে কতকগুলি দৃশ্য স্কেচ করতে অতনু গিয়েছিল। কাজ শেষ হলে, নিরালা একটা জায়গা বেছে, গাছের ছায়ায় সতরঞ্চি বিছিয়ে ওরা বসল। টিফিন-বাস্কেটে আনা আহার্যের সদ্ব্যবহার করে, তপতীর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল অতনু। ওর চুলের ভিতর অঙ্গুলি চালনা করতে করতে তপতী বলল, একটা কথা ছিল।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল অতনু।

ঈষৎ রক্তিমাভা তপতীর ফরসা গালে: আর দেরি করবার কী দরকার অতনু? তা ছাড়া: আনত মুখে বলল তপতী, বাবা আমার বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন, বলছিলেন পরীক্ষা হয়ে গেলেই ব্যবস্থা করবেন।

তপতীর হাতখানা বুকের উপর টেনে এনে অতনু বলল, কোন অজুহাতে আর কিছুদিন তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না তপতী? আর্থিক সচ্ছলতা এখনও আমি অর্জন করতে পারি নি, এই পরিবেশে মন কি চায় লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করতে?

অর্থসম্পদের মোহে কি আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম?—আহত কণ্ঠে জবাব দিল তপতী, তোমার ওই ঘরটিতেই আমি স্বর্গ রচনা করব। অভাব-অভিযোগের পীড়নে তোমার সাধনা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেব না কথা দিচ্ছি তোমায়।

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিল অতনু, তা আমি জানি তপতী। তবু আমি পুরুষ, নিশ্চিত দারিদ্র্যের ভিতর আদরের সামগ্রীকে আনতে মন কি চায়? তুমি আমায় ভুল বুঝ না লক্ষ্মীটি।

কিন্তু অতনু:—দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে বলতে গিয়ে থেমে গেল তপতী।

কী তপতী?

আমাদের এই নির্বাধ মেলামেশার ফলে যদি কোন অঘটন ঘটে?—পাংশু দেখাল তপতীর মুখখানি।

উঠে বসল অতনু: আমি কি একটা কাণ্ডজ্ঞানরহিত ছেলেমানুষ যে তোমার এই অকারণ ভয়?—তপতীর মুখখানা দু হাতের মধ্যে নিয়ে প্রগাঢ় কণ্ঠে বলল অতনু, তোমার লজ্জা ঢেকে দেবার দায়িত্ব আমার, এ বিশ্বাস আমার উপর রেখ।

যে আশঙ্কা সেদিন জেগেছিল তপতীর মনে তাই বুঝি অবশেষে সত্যি হল। প্রথমটা খেয়াল করে নি তপতী,

চমকে তাকাল তপতী : ও! ভুলেই গিয়েছিলাম।—এক চুমুকে কাপটা নিঃশেষ করে টেবিলের উপর রেখে দিল তপতী।

কী এত ভাবছ তপতী?—মনের অস্বস্তি দমন করে সহজ সুরে জিজ্ঞাসা করতে চেষ্টা করল অতনু।

অতনুর মুখের দিকে তাকাল তপতী, ওর শীর্ণ মুখের উপর ম্লান হাসির আভাসে পলকে ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল : কত কথা ভাবি। আচ্ছা বল তো অতনু, প্রতি মুহূর্তে কত জন্ম হচ্ছে পৃথিবীতে, কেউ কি বলতে পারে কোন্ জীবনটির কী ভাবে পরিণতি ঘটবে?

অব্যক্ত উৎকণ্ঠায় চেয়ে রইল অতনু।

বলে চলল তপতী, আমার কথাই ধর না কেন। আমার জন্মক্ষণে কেউ কি ভেবেছিল এই মেয়েটি প্রত্যক্ষে পরোক্ষে একাধিক লোকের মৃত্যুর কারণ হবে?

বক্ষ-স্পন্দন দ্রুততর হল অতনুর, কী বলতে চলেছে তপতী?

তোমার এখান থেকে যেদিন লাঞ্ছিত করে, বিদেয় করে দিলে, মনে আছে তো সেদিনটির কথা? থাকবে না কেন, এই তো মোটে পাঁচ মাস আগেকার ঘটনা, এই রকমই একটি সকাল, নয় কি? ফিরে গেলাম বাড়িতে কিন্তু থাকতে পারলাম না। বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারতাম না, মাথা হেঁট হয়ে পড়ত, অনুশোচনায় বুকের ভিতরটা জ্বলে যেত। আমার অমন সদাশয় স্নেহশীল বাবা, তাঁর একমাত্র সন্তান আমি, আমার দ্বারা তাঁর অকলঙ্ক বংশ কলঙ্কিত হল। মনের জ্বালায় ছটফট করতে করতে অবশেষে একদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করলাম। বহু অনুসন্ধান করেও যখন বাবা আমার খোঁজ পেলেন না, গভীর মনস্তাপে হাটফেল করে তাঁর মৃত্যু ঘটল—হার্ট তাঁর কিছুদিন যাবৎ দুর্বল ছিল। তাঁর মৃত্যুর কারণ হলাম আমি, কী চমৎকার ভাবে পিতৃঋণ শোধ করলাম বল তো। তারপর : উদ্গত নিঃশ্বাস রোধ করে বলল তপতী, আর একজনকে স্বহস্তে জীবনান্ত করলাম।

আতঙ্কে অতনুর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল, বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল কেবল।

হাতের সরু সরু আঙুলগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে তপতী, সহসা ওর হাত দুটি নিজের গলার কাছে উঠে এল, আপন মনেই যেন বলল, এই এমনই করে শেষ করে দিলাম। কঠিন চাপ, ক্ষীণপ্রাণ শিশু, একটি বারও চেয়ে দেখি নি মুখখানি—যদি সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটে। অসৎ চরিত্র জন্মদাতার দূষিত রক্তে যার জন্ম, সে হতভাগ্যের বেঁচে থাকার তাৎপর্য কী বল?

আপাদমস্তক শিহরিত হল অতনুর, ওর ত্রাসরুদ্ধ কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল, কী বীভৎস! নিজের হাতে তুমি হত্যা করলে তপতী?

খিলখিল করে হেসে উঠল তপতী : ভয়ানক ঘাবড়ে গেছ মনে হচ্ছে। আমি তো ভেবেছিলাম তোমার নিজের কৃতিত্বে তুমি উল্লসিত হবে।

তার মানে?—শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল অতনু।

চেয়ারের ভাঙা হাতলের কোণে তপতীর শাড়ির আঁচলটা বেধে গিয়েছিল, উঠে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে ও টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়াল, অতনুর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, চোখের প্রান্ত ওর কুঞ্চিত হয়ে এল : বুঝতে পারছ না আমার কথার মানে অতনু?

বোকার মত অতনু মাথা নাড়ল।

তপতী নামে একটি মেয়েকে তুমি চিনতে? মনে পড়ে তার কথা? সেই অতি ভাল, অতি নিরীহ মেয়েটির সঙ্গে আজকের এই তপতীর আকৃতি-প্রকৃতিতে এতটুকু মিল আছে? চেয়ে দেখ ভাল করে।—অতনুর দিকে এগিয়ে গেল তপতী : এই যে অপূর্ব পরিবর্তন এ কার কীর্তি, ভেবে দেখেছ একবার? তুমি কীর্তিমান পুরুষ অতনু, রাশি রাশি তোমার কীর্তি অথচ কী আশ্চর্য তোমার স্থৈর্য। আমার ইচ্ছে করছে কি জান, গলা ছেড়ে তোমাকে বাহবা জানাই।

পূর্ণ দৃষ্টিতে ফের তাকাল তপতী অতনুর দিকে, ওর দৃষ্টির সামনে কেমন একটা চঞ্চলতা বোধ করল অতনু, একবার নড়ে চড়ে বসল।

অতনুর প্রায় সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তপতী : সত্যি করে বল তো অতনু, রাত্রের অন্ধকারে, নিদ্রার অবকাশে তোমার কীর্তিরাশি দুঃস্বপ্ন হয়ে তোমাকে দেখা দেয় না?

কী একটা জবাব দিতে চেষ্টা করল অতনু, ততক্ষণে ইজেলে আবদ্ধ ছবিখানার দিকে তপতীর নজর পড়েছে, অতনুর কথা ওর কানে গেল না। অধীর আগ্রহে ছবিখানি নিরীক্ষণ করতে করতে হঠাৎ বলে উঠল, বাঃ কী সুন্দর ছবিটি এঁকেছ আমার!

চমকে উঠল অতনু, অবচেতন মনের প্রতিক্রিয়া করেছে সে কী? অন্ধ কি হয়েছিল এতদিন যে এ মুহূর্ত পর্যন্ত এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য খেয়ালে আসে নি তার?

চোখ দুটি জ্বলে উঠল তপতীর, শানিত কণ্ঠে বলল, চমৎকার, একেই বলে আর্ট! অতনু লাহিড়ী এঁকেছে তপতীর মাতৃমূর্তি—মাতৃমূর্তি!—হেসে উঠল তপতী, হাসির ভিতর দিয়ে ওর চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ল : দশ মাস দশদিন নিজের শরীর নিংড়ে যার পুষ্টিসাধন করেছিলাম, সেই নিষ্পাপ অসহায় কোমল প্রাণীটিকে নিজের হাতে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছি। মাতৃত্বের ইতিহাসে অপূর্ব কীর্তি!—স্ফুরিত হল তপতীর নাসারন্ধ্র : হৃদয়হীন পশু, তোমার লজ্জা করে নি এই ছবি আঁকতে? কিন্তু তুমি পশু নও, তোমাকে পশু বললে, পশু জাতিকে অমর্যাদা করা হয়। তুমি একটা শয়তান।

চোখের সামনে ছবিটা যেন উপহাস করতে লাগল তীকে, ওর মাথার ভিতর আগুন জলে উঠল, এই ওটাকে বিনষ্ট করতে না পারলে ও বোধ হয় তিস্থতা হারিয়ে ফেলবে। ইতস্তত ওর দৃষ্টি সঞ্চারিত শানিত কিছুর সন্ধানে যা দিয়ে কার্যসাধন করা যায়। তপতীর মনে হল ওর কাছেই তো আছে সে বস্তু, হয়েই তো এসেছিল ও। ব্লাউজের ভিতর থেকে বার করল একটা খাপবদ্ধ ছুরি, খাপটা খুলে ছুঁড়ে দিল একদিকে—ওই প্রায়ান্ধকার ঘরেও ছুরিটির ত ইস্পাত ঝকঝক করে উঠল। দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরিটি এগিয়ে গেল তপতী ইজেলের কাছে।

হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল অতনু, হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে। ছবিটাকে নষ্ট করতে চলেছে তপতী; ওর রার ধন, ওর বহু রাত্রি জাগরণের কাঙ্খিত ফল, ওরই য়ে আজ সন্ধ্যাবেলা স্থূল পরিমাণ অর্থলাভের বনা, ও ছবি অতনু নষ্ট হতে দিতে পারে না।

কী করছ তপতী? থাম, থাম।—দুই হাত প্রসারিত, লাফ দিয়ে ইজেলের সামনে গিয়ে পড়ল অতনু।

অকস্মাৎ বাধা পেয়ে একটু থমকে গেল তপতী, ক্ষণেই ওর চোখ দিয়ে আগুন ঝরে পড়ল, মুখখানা বিকৃত হল পৈশাচিক হাসিতে, দন্তনিষ্পেষণ করে বলল, তবে মর, এখনি মর। মরতে অবশ্য তোমাকে আজ হতই, একটু আগে আর পরে।—আমূল ছুরিখানা বিদ্ধ হয়ে গেল অতনুর কণ্ঠনালীতে, ছুরিটাকে সজোরে টেনে বার করে নিল তপতী, টপ টপ করে তাজা রক্ত ঝরছে ছুরি থেকে। নির্মম আক্রোশে সেটা ইজেলের দিকে নিক্ষেপ করল ও, ক্যানভাসটা বিঁধে দিয়ে, সংলগ্ন হয়ে রইল ছুরিখানা ছবির বুকে, লাল হয়ে গেল জায়গাটা।

সমস্ত ঘটনাটা ঘটে গেল চোখের নিমেষে। ভয়চকিত অতনুর গলা দিয়ে এতটুকু আর্তনাদ বার হবারও অবকাশ হল না, গল গল করে ক্ষত মুখ থেকে ঝরে পড়ল তপ্ত রক্ত, ওর প্রাণহীন দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। খানিকটা রক্ত ছিটকে তপতীর শাড়ির প্রান্তে লাগল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। নত হয়ে বসে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ অতনুর মুখের দিকে, ত্রাসবিস্ফারিত নিষ্পলক চোখ দুটি নিমীলিত হবার পূর্বেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। তাকাতে তাকাতে অদম্য হাসির বেগে ফেটে পড়ল তপতী, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, বিস্রস্ত বেশবাস, উঠে দাঁড়াল ও। হাসি তপতীর তখনও থামে নি, উচ্চকণ্ঠে হাসতে হাসতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। খোলা পড়ে রইল দরজা।

সুন্দরী মা

মানবেন্দ্র পাল
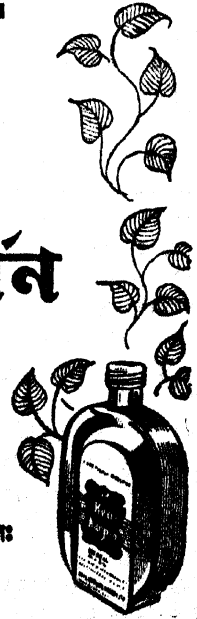
অনন্ত পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠিটা নিভিয়ে কোথায় ফেলবে ভাবছে, মেনকা তাড়াতাড়ি একটা অ্যাস্-ট্রে এগিয়ে দিল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরখানি। একটা কুটো পর্যন্ত পড়ে নেই। জানলায় দরজায় পরদা। ডবল বেডের একখানি খাট। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে নিঃশব্দে। দেওয়ালে ডবল ব্র্যাকেটে দুটি বালব্। বেশীর ভাগ সময়েই সাদা আলো জ্বলে। সময় বিশেষে সবুজ আলো।

ঘরের এক কোণে একটি ছোট জলচৌকি। তার ওপর লক্ষ্মীর পট। সামনে পুজোর সরঞ্জাম। দেওয়ালে কালীঘাটের কালীর ছবি—পরমহংসদেবের মূর্তি।

অনন্ত দেখতে লাগল।

ও কী রকম করে বসেছ? পা-টা না হয় তুলেই ফেল।—মেনকা হেসে বলল।

অনন্ত পা তুলে বসল বিছানায়। স্টীমে-কাচা ধুতি পাঞ্জাবি উজ্জ্বল বাতিতে চক্চক্ করছিল।

তুমি কী করছ মাটিতে বসে?

মেনকা আবার হাসল। বলল, দেখছ না কেমন আলতা পরছি।—এই বলে দুই মোহময় চোখের দৃষ্টি তুলে ধরল অনন্তর পানে: মেয়েদের আলতা পরা তুমি ভালবাস না?

অনন্ত মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, বাসি।—তারপর একটু থেমে বলল, কিন্তু আজ এত দেরিতে প্রসাধন?

মেনকা কটাক্ষে হেসে বলল, যদি বলি তোমার জন্যে?

অনন্ত মাথা নাড়ল। বলল, বিশ্বাস করব না।

কথাটা যেন বিঁধল মেনকাকে। লজ্জা পেল। মুখটা ম্লান হয়ে গেল। তবু হাসবার ছলে বলল, না গো, আজ ইচ্ছে করেই দেরি করেছি। বৃহস্পতিবার। লক্ষ্মীপুজো না করে—

অনন্ত একটু খোঁচা দিয়ে বলল, তুমি দেখছি গেরস্থ মার্কা।

মেনকা ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, গেরস্থ ঘরের মেয়েই তো ছিলাম। পেট থেকে পড়েই কি কেউ এই লাইনে আসে, না, কোনদিন শখ করে আসতে চায়? তোমাদের শরৎ চাটুজ্জের বইগুলো যখন পড়ি তখন আমি ঘরের বউ ছিলাম। বেশ্যাদের কথা শুনতে আগে ঘেন্না করত। বইগুলো পড়ার পর দয়া হত।

এই পর্যন্ত বলে একটু থেমেই মেনকা হেসে বলল, তারপর এখন আবার এই জীবন, অন্যের দয়া ভিক্ষে করে চলছে।

অনন্ত সোজা হয়ে বসে দুই কৌতূহলী চোখ মেনকার ওপর নিবদ্ধ করে বলল, তুমি ঘরের বউ ছিলে! সে কত দিন আগে?

মেনকা হেসে বলল, এই আরম্ভ হল। এবার নিশ্চয়ই আমার জীবন-কথা মুখস্থ বলে যেতে আদেশ করবে। কিন্তু তা জিজ্ঞেস কোর না ঠকবে। পতিতার অতীত জীবন বলে কিছু নেই। বর্তমানটাই সব। জোর করে জানতে চাইলে মিথ্যে গল্প শুনবে।

অনন্ত কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাইরে হালকা চটির শব্দ হল। মেনকা তাড়াতাড়ি সরে বসে ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে চুপ করতে ইশারা করল।

অনন্তর কেমন ভয় হল। ফিসফিস করে বলল কে আসছে?

সে কথার জবাব না দিয়ে মেনকা মিষ্টি স্বরে ডাকল ভেতরে এস।

অনাগত মানুষটিকে ডেকেই মেনকা অর্ধেক আলতা পরা পা দুখানা তাড়াতাড়ি খাটের নীচে ঢুকিয়ে দিল—যেন আগন্তুকের চোখে না পড়ে। ক্ষিপ্র হস্তে সরিয়ে ফেলল আলতার শিশি-তুলি।

অনন্তর বুক দুরু দুরু করে উঠল। দু চোখে ঘনিয়ে উঠল ভয়ার্ত বিস্ময়।

ওই যে দরজার পরদা দুলছে। ওই আসছে আগন্তুক।

প্রবেশ করল একটি ছেলে। বছর এগারো বারো বয়েস। একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল, জটপাকানো একরাশ কালো তুলোর মত। নাকটা তীক্ষ্ণ, মুখের আদল মায়ের মত—থুতনির কাছটা বিশেষ করে।

ছেলেটির মুখ আশ্চর্য গম্ভীর। আগ্রহ নেই, কৌতূহল নেই, চাঞ্চল্য নেই। হাফপ্যান্টের ওপর শার্ট ঝুলছে বোতামগুলো অযত্নে খোলা। হাতে খানকতক খাতা।

কোনও দিকে তাকাল না—অনন্তকে গ্রাহ্যও করল না, সোজা এগিয়ে গেল মেনকার কাছে। যেন এ রকম নতুন নতুন মানুষ এ ঘরে কতই না দেখা।

মেনকা খাটের নীচে পা ঢুকিয়ে রেখে স্নেহের সুরে বলল, খাতা কেনা হল বাবা?

ছেলেটি কথা বলল না। শুধু মাথা নাড়ল। তারপর পকেট থেকে খুচরো কিছু পয়সা তার হাতে ফেরত দিয়েই উঠে পড়ল। কী যেন ভাবল মুহূর্তকাল। তারপর এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। ওখানে একটা দেওয়াল-আলমারি। সেটা খুলে একটা বই টেনে নিল।

মেনকা বলল, কী বই প্রসাদ?

অঙ্কের।

ছেলেটি চলে যাচ্ছিল। মেনকা তাড়াতাড়ি ডাকল, এই শোন। বাবাঃ, কেবল পালাই পালাই—যেন এক দণ্ড বসতে নেই।

এই বলে কৃত্রিম অভিমানে মেনকা তাকাল ছেলেটির

দিকে। প্রসাদ তবু হাসল না। গম্ভীর মুখে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। মেনকা বলল, এদিকে এগিয়ে আয়।

মাথা নীচু করে প্রসাদ দু পা এগিয়ে এল।

এই দেখ, এই আমার আর এক দাদা। প্রণাম কর্।

অনন্ত তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না না, থাক্ থাক্।

ছেলেটির মুখ যেন আরও কঠোর হয়ে উঠছিল। পা চঞ্চল হচ্ছিল। যাবার জন্তে পা বাড়াতেই মেনকা আবার ডাকল, লক্ষীর প্রসাদ একটু খেয়ে যা।

ছেলেটি নত মুখে এগিয়ে আসছিল, মেনকা তাড়াতাড়ি বলল, পায়ে বড় ঝিঁঝি ধরেছে মানিক, উঠতে পারছি না। ওইখানে ঢাকা আছে, খেয়ে নাও।

সুবোধ ছেলের মত প্রসাদ আদেশ পালন করল।

মুখ ধুয়ে গামছায় মুছে বইখানি নিয়ে প্রসাদ যখন চলে যাচ্ছে তখন অকস্মাৎ যেন মেনকার মুখ ম্লান হয়ে গেল। ভারী গলায় বলল, সাবধানে যেয়ো বাবা। আর সকাল হলেই চলে এস।

প্রসাদ উত্তর দিল না, ফিরেও তাকাল না। দ্রুত পায়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ ধরে অটুট স্তব্ধতা। কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। অনন্ত লক্ষ্য করল, এই কয়েক মুহূর্ত হল মেনকার মনটা যেন কেমন থিতিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বেশীক্ষণ সময় নিল না মেনকা সামলে নিতে। এতক্ষণে খাটের নীচ থেকে অর্ধেক আলতা-পরা পা দুখানি বের করল, উদ্ধার করল আলতার শিশি আর তুলি। তাড়াতাড়ি আলতা পরে নিল। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে একটা ভাল কাপড় বের করল। ভাল কাপড় ওই একখানিই। তাও রিপু আর সেলাইয়ে জর্জর। সেইখানাই ঘুরিয়ে কায়দা করে পরতে হবে।

অন্তদিন ছেলেটা স্কুল থেকে এসে জল খেয়েই ওর মাসির বাড়ি চলে যায়। আজ আবার খাতা কিনতে এসেই দেরি করে দিল।

এই পর্যন্ত বলে মেনকা একটু থামল। তারপর বলল, ওর সামনে আমি কিছুতেই সাজতে পারি না। একদিন এমন অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম—দাঁড়াও, কাপড়টা বদলে নিয়ে আগে বসি তোমার কাছে—

অনন্ত বলল, পরেই তো রয়েছ, কাপড় বদলাবার দরকার কি?

মেনকার দুই ঘনপক্ষ চোখে কৌতুক নৃত্য করে উঠল। বলল, তোমরা তো মানুষ দেখ না, চটক দেখ। এতক্ষণ হঠাৎ অসময়ে এসে আমার আসল রূপটা দেখছিলে, মনে মনে বড় অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলাম, তোমার কাছে আমার আর ভবিষ্যৎ বলে কিছু রইল না। তাই ভুলটা শুধরে নিতে চাচ্ছি। লক্ষীটি, বাধা দিয়ো না।

বেশী দেরি হল না। খুব তাড়াতাড়িই কাপড়টা বদলে নিল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিরুনী দিয়ে আলগোছা আঁচড়ে নিল চুল। মুখে স্নো মাখল, গলায় বুকে পাউডার দিল। চোখে দিল কাজল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক লাস্যময়ী যুবতী এগিয়ে এল অনন্তর কাছে। একটা হাত দিয়ে স্পর্শ করল অনন্তকে। হেসে বলল, বসি একটু তোমার পাশে?

অনন্ত জায়গা ছেড়ে দিয়ে বলল, কিন্তু, তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে না?

মেনকা নাক কুঁচকে একটু হাসল মাত্র। তারপর অনন্তর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলল, একদিন ওর কাছে বসে অপ্রস্তুতে পড়েছিলাম। সেই কথাটাই বলি।

মেনকা ধীরে ধীরে ঘটনার সঙ্গে রস, রসের সঙ্গে রহস্য মিশিয়ে অনন্তর কাছে একদিনের এক আপাতসামান্য অভিজ্ঞতার কাহিনী অকপটে বলে গেল।

হ্যাঁ, সেদিন মেনকা সত্যিই বড় অপ্রস্তুতে পড়েছিল। নিতান্ত পেটের দায়েই যে আজ তাকে এ পথে নামতে হয়েছে এবং একমাত্র পেটের দায়েই যে এই নরককুণ্ডে ছেলেকে নিয়ে বাস করতে হচ্ছে এ কথা অনন্তকে বেশী বোঝাবার দরকার নেই জেনেও মেনকা বারে বারে সেই কথাতেই জোর দিচ্ছিল: এই পোড়া কপাল, আর এই পোড়া পেট ভাই। নইলে কী না ছিল আমার! স্বামী সংসার সব। ওই ছেলেটা কী কম কষ্টে পাওয়া! বহু চেষ্টার পর শেষে বাবা মহাদেবের দোর ধরে তবে পাই প্রসাদকে। ছেলে হল আট মাসে। ঠিক যেন পাখিটি তুলোয় করে রাখতাম। বাঁচবার আশা ছিল না। তবু বাঁচল। আমি বললাম, ছেলের নাম ঠাকুরের নামে দেব। উনি নাম দিলেন শিবপ্রসাদ। সে দিনের সেই ছেলে আজ ওই তো দেখলে।—বলতে বলতে মেনকার দুটি চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল: কিন্তু—

এর পর মেনকা কিন্তু বলে একটু থেমেছিল। স্বরটা ভারী হয়ে এসেছিল।

কিন্তু সেই ছেলেকে বুকে করে আজ সে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে!

এ পথে আসবে বলে সে বেরোয় নি। বেরিয়েছিল প্রাণের দায়ে। দেশ ছেড়ে শ্মশান-পল্লীর বুকের ওপর পা দিয়ে একদিন নির্মম পরিহাসে তাদের চলে আসতে হয়েছিল।

স্বামী মারা গেল ওই শেয়ালদা স্টেশনে, কলকাতা নগরী সুন্দরী নগরী, রাজধানী। এখানে কত অট্টালিকা, কত হাসপাতাল কত মঠ-মন্দির গির্জে-মসজিদ। এই

রাজধানীর কত মানুষ কত পণ্ডিত জ্ঞানী গুণী, এখানে কত প্রগতি কত রাজনৈতিক দল। কত আলো, কত আশ্বাস-বাণী!

তবু তার স্বামীর দিকে কেউ ফিরে তাকায় নি, কেউ না। মানুষটা তিলে তিলে মরে গেল, এক ফোঁটা ওষুধও পেটে পড়ল না, একটা ফলও না। পাথরের মূর্তির মত সে মৃত্যুও দেখল মেনকা—না মেনকা নয় তখন বেলা—বেলারাণী ঘোষ। কোলে এই ছেলেটাও ধুঁকছে তখন।

কিন্তু শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে কাঁদবার উপায় নেই। ওখানে কান্নার সমব্যথী নেই। কান্না চাপা পড়ে যায় ইঞ্জিনের গর্জনে, যাত্রীর উল্লাসে। ওখানে ঝড়ের মত এগিয়ে চলছে জীবনের গতিবেগ। যে পড়ে গেল, সে পড়ে রইল। তার জন্যে ফিরে তাকাবার অবকাশ নেই।

কারা যেন সরিয়ে নিয়ে গেল তার স্বামীর শবদেহ। স্বামীকে একবার শেষ প্রণাম করতে গেল, কিন্তু পারল না। চোখে জল এল।

না না, মায়াকান্না নয় ভাই, অন্য ব্যাপার। মনে পড়ল একদিন ছলনা করেছিলুম। অবাক হচ্ছ? কিসের ছলনা?

মেনকা একটু হেসেছিল।

হ্যাঁ, সামান্য একটু দাগ ছিল কুমারী জীবনে। সেই কথাটাই হঠাৎ আবার সেদিন নতুন করে মনে পড়ল। তাই দুঃখ পেলাম। এতদিন অমন মানুষটাকে কী ছলনাই করে এসেছি। আজ তো সে চলে গেল সব সম্বন্ধের পারে।

মেনকা একটু থেমেছিল। তারপর বলেছিল অবশ্য ওই দাগটুকু ছিল বলেই এত সহজে এ পথে নামতে পারলুম। নইলে কী হত বলতে পারি না। হয়তো ছেলেটাকেও বাঁচাতে পারতাম না।

এই বলে মেনকা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আবার বলে গেল তার কাহিনী।

প্রথম প্রথম বড় ভেঙে পড়েছিল মেনকা। এ বাড়ির ভাড়াটে অন্য মেয়েরা বড় ঠাট্টা করেছিল। বলেছিল, এত বড় ছেলে নিয়ে তুই ব্যবসা করবি মেনকা! হাসাহাসি।

কিন্তু মেনকা দমল না। ছেলেকে ভর্তি করে দিল কাছের একটি স্কুলে। খরচ যাই হোক—ছেলেটাকে মানুষ করে যাবেই। মোটা টাকা দিয়ে মাস্টার রাখল। আর সেই সঙ্গে তার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে পাঠিয়ে দিল ছেলেকে। সেখানেই রাতে থাবে থাকবে পড়াশোনা করবে। পই পই করে বলে দিল, সন্ধ্যের পর যেন বাড়ি থেকে এক পা না বেরোয়।

যদিও দূরসম্পর্কের দিদি—তবু তার বাসা দূরে নয়। চিৎপুরের রাস্তাটা পার হয়েই শোভাবাজারের মোড়ে। মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিল মেনকা—যাক দরকার হলেই গিয়ে ছেলেকে দেখে আসতে পারবে। ছেলেমানুষ, রাত-বিরেতে যদি ভয় পায় তা হলে—

তা হলেও তাকে এ বাড়ি আনা যাবে না, বরঞ্চ সে-ই গিয়ে একটা রাত কাটিয়ে আসতে পারবে।

দূরসম্পর্কের এই দিদিটিকে নিয়ে তার একটু অসুবিধেও ছিল। বড় শুচিবাই। একটু কিছু হলেই কাপড়-কাচা আর স্নান করা চাই। তাতে ছেলেমানুষ বলেও নিষ্কৃতি নেই। প্রসাদের মন বসত না সেখানে। কিন্তু উপায় নেই।

দিদিকে দে দিতে হত মোটা টাকা। তার ওপর পড়ার বই, স্কুলের মাইনে, জলখাবার, শার্ট-প্যাণ্ট কিছুরই যাতে অভাব না থাকে সেদিকে মেনকার তীক্ষ্ণদৃষ্টি। যেন ছেলে এতটুকু আঁচ না পায়। এই ছেলে একদিন বড় হবে—লেখাপড়া শিখবে—ধুতি-পাঞ্জাবি পরবে—বউ আনবে। তখন? তখন তার এই মাকে কী চোখে দেখবে? কী পরিচয় দেবে সমাজে?

ভাবতে ভাবতে কত রাত্রি মেনকার ঘুম হয় নি। এদিকে এই চিন্তা—তার ওপর টাকার অভাব। এ ছাড়া রোগের আশঙ্কা আছে। কত রকমের মানুষই তো আছে। কাউকে কি ফেরানো যায়? পাঁচটা টাকা কি কম? তবু ফিরিয়ে দেয়।

এর ওপর আবার নিত্য অশান্তি আছে ঘরে ঘরে। এত অসভ্য মেয়েগুলো—এত অশ্লীল যে এদের সঙ্গে কথা বলা যায় না।

দিনকতক তারা তো ছেলেমানুষ প্রসাদকে পেয়ে মজা মারতে শুরু করেছিল। মেনকা শুনে যেত, বিরক্ত হত, কিন্তু অশান্তির ভয়ে মুখে কিছু বলতে পারত না।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ সামলাতে পারল না। তখনও, যদিও ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে প্রসাদ তবু দিদির বাড়ি স্থায়ীভাবে থাকার ব্যবস্থা হয় নি।

মেনকা বিকেলে গা ধুয়ে বেরুচ্ছে হঠাৎ কানে এল দোতলার বারান্দায় কয়েকটা মেয়ে প্রসাদকে ধরে অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচ শেখাচ্ছে। আর বলছে, নাও, তাড়াতাড়ি বড় হও। এ বাড়ি তো আসতে হবেই।

থমকে দাঁড়াল মেনকা। দেখল প্রসাদ প্রাণপণে তাদের হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আর ওরা ততই হিহি করে হেসে তাকে ধরে টানছে।

মেনকা তীক্ষ্ণস্বরে বলল, কী হচ্ছে তোমাদের? ও যে তোমাদের ছেলের মত। লাজ-লজ্জায় মাথা খেয়েছ বলে কি এমনই করে সব জলাঞ্জলি দিতে হয়?

এই বলে তখনই ছুটে গিয়ে প্রসাদের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনল।
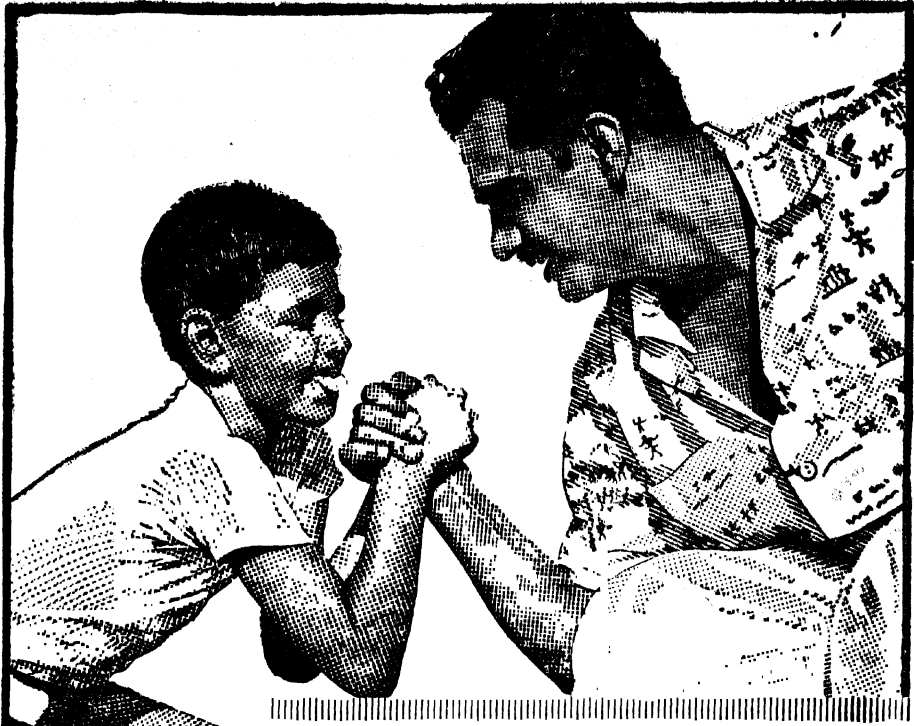
মেনকার সবচেয়ে ভয় ছিল সন্ধ্যেবেলাটা। এ সময়ে মেয়েগুলো সেজেগুজে যে নির্লজ্জতা করে তা যদি প্রসাদের চোখে পড়ে কোনদিন! চোখে যে পড়ে নি তা নয়। কিন্তু প্রসাদের বোঝবার বয়েস হয় নি। তবু মেনকা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখেছে ছেলের ওপর। সন্ধ্যের পর আর নীচের সদর দরজায় যেতেই দিত না। চুপচাপ মায়ের বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে থাকত। আর মাঝে মাঝে উঁকি মেরে অবাক চোখে দেখত তার মায়ের সাবান-ধোওয়া স্নো-মাখা মুখটা। ঘুমিয়ে পড়লে মেনকা পাঁজাকোলা করে শুইয়ে দিত পাশের ঘরে। এর জন্যেও আবার ঝিকে কিছু দিতে হত।

ছেলের লুকিয়ে-দেখা সেই চোরা দৃষ্টি মেনকার মন থেকে সরত না। কী দেখে অমন করে? মিল খোঁজে নাকি অন্যদের সঙ্গে? মেনকা লক্ষ্য করল, দিনে দিনে প্রসাদের যেন কি রকম পরিবর্তন হচ্ছে। মুখের সে শিশু-সুলভ হাসি নেই, গান নেই, উচ্ছ্বাস নেই, অবসর সময়ে মায়ের কোলে বসে তেমন গল্প করা নেই। দিনে দিনে যেন কেমন গম্ভীর হতে লাগল এই বয়েস থেকেই। কাছে যায় না, কথা বলে না।

মেনকা মনে মনে উৎকণ্ঠিত হত। কী হল ছেলেটার? কোনও ভারি অসুখ করবে না তো?

একদিন বড় লজ্জা পেল মেনকা। বুঝল, এবার থেকে তার এই ক্ষুদে শত্রুটাকে সামলে চলতে হবে।

সেদিন প্রসাদ তার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লে মেনকা আস্তে আস্তে পাঁজাকোলা করে পাশের ঘরে গিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর চুলটা ঠিক করে, কাপড় ব্লাউজ পালটে, চোখে কাজল টেনে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। শিকার জুটে গেল।

তারপর তাকে সবে ওপরে নিজের ঘরে অভ্যর্থনা করে এনেছে অমনই দরজায় শব্দ খুট-খুট-খুট।

কে?—ভেতর থেকে মেনকা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

উত্তর পায় নি। কড়া নাড়াটা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়, আবার একটু পরে শব্দ হয় খুট-খুট-খুট।

তাড়াতাড়ি উঠে মেনকা দরজা খুলে দেয়। দিয়েই যেন চমকে ওঠে। এ কী! যাও যাও শোও গে।

ছেলে কিন্তু ততক্ষণে ঘুম-জড়ানো চোখে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিছুতেই ছাড়বে না মাকে।

মা যত ছাড়াতে চায়, ছেলে তত ঠোঁট ফুলিয়ে, মাকে সজোরে চেপে ধরে।

অতিথি অবস্থা সুবিধের নয় দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়ল অন্য ঘরে। মেনকা মনে মনে গর্জে উঠল: লক্ষীছাড়া ছেলে। কাল শত্তুর!

পরের দিন সকালে উঠে আর ছেলের সামনে মুখই দেখাতে পারে না। ছেলে যতবার তাকায় মা মুখ ফিরিয়ে নেয়। এর পরেই মেনকা ছেলেকে দিদির বাড়িতে রাখবার ব্যবস্থা করল। ওখানেই দু বেলা খাবে থাকবে, ওখানেই মাস্টার আসবে, পড়াবে—ওখান থেকেই স্কুলে যাবে। শুধু স্কুল থেকে ফিরে একবার আসতে পারে মায়ের কাছে। আর আসতে পারে সকালে।

আদেশ করল মেনকা। সে আদেশ মোটেই মনঃপূত হল না প্রসাদের। গুম হয়ে রইল কয়েকদিন, ভাল করে খেলেও না।

কিন্তু মেনকা নিরুপায়। সে কঠোরভাবে ছেলেকে বিসর্জন দিল। সেদিন—আজ মনে পড়ে, সারা দুপুর অত বড় বিছানায় ছেলের শূন্য জায়গাটার ওপরে মুখ গুঁজে পড়ে পড়ে কাঁদল মেনকা। যেন কারা তার দুধের ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার কাছ থেকে। আজ ওর বাবা থাকলে ছাড়ত এমন করে?

রাত হয়ে গেছে বেশ। সন্ধ্যের মুখে কোনও ঘরেই এতক্ষণ খিল দেওয়া থাকে না। সারা রাতের মত যে অতিথি আসে না তা নয়, তারা আসে আরও রাতে। তাদের চেহারাই আলাদা। ভারিক্কে বয়েস, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, কোঁচা লুটোচ্ছে মাটিতে, দু চোখে লাল নেশা, গায়ে উগ্র মিষ্টি গন্ধ। বাঁ হাতের কব্জিতে বেলফুলের মালা জড়ানো। এরা রাতের অতিথি।

কিন্তু—

কৌতূহল বেড়ে ওঠে অন্য মেয়েদের। তারা উঁকিঝুঁকি মারে।

এমনই সময় খিল খুলে বেরিয়ে আসে মেনকা, সাজসজ্জা এতটুকু মলিন হয় নি, কপালের কুমকুম বিন্দুটি নিটোল। বড় সুন্দরী মেনকা। ঈর্ষায় জরজর করে অন্যের বুক। এত বয়েসেও এমন রূপের এক কণাও যদি তারা পেত তা হলে কলকাতায় প্রাসাদ গড়তে পারত।

এগিয়ে চলল মেনকা। পিছনে অনন্ত। নিতান্তই সাদামাটা মানুষ। নিতান্তই ফূর্তি করতে আসবে বলেই ধোপ-ভাঙা জামাকাপড় পরা। দেখলেই বোঝা যায়।

নীচে নামছে মেনকা, মেয়েরা আপনা থেকেই পথ ছেড়ে দিচ্ছে। ভয়—ঈর্ষা—সম্ভ্রম! তারা মানে মেনকা উঁচু মহলের।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে। মেনকা ধরল অনন্তর হাত। একটু হেসে নীচু গলায় বলল, আবার এস।

আচ্ছা।—অনন্ত চলে গেল।

বাইরে রাস্তার মোড়ে গলির মুখে হল্লা চলেছে। পান-বিড়ির দোকানগুলোয় ভিড়। সোডা-লেমনেডের বোতল কিনে নিয়ে যাচ্ছে ঝি, কেউ কিনছে মিঠা পান—সিগারেটের প্যাকেট। দোকানী গোঁফ চুমরে চোরা

াহনিতে রসিকতা করছে ঝিয়েদের সঙ্গে। লাল-পাগড়ি পুলিস মস্ত লাঠি হাতে টহল দিচ্ছে। যেন এসব লোভ-নাংরামির কত উর্ধ্বে তারা। ও-পাশের বাড়ির নীচে চুটি রূপসী তরুণী ফুলওলার ঝাঁপি থেকে ফুল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়ে আর একজন সখীকে দেখাচ্ছে রঙের বাহার। তাই দেখে পাশের গলির দুই মেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে। দ্রুত পায়ে এক যুবক পরিচিত বাড়ি ছেড়ে আর এক দোরে গিয়ে দাঁড়ায়।

হ্যাঁ, গণিকাপল্লীর এখন যেন যুবতী বয়েস!

দিন কাটে মেনকার।

কিন্তু দিন যত যায় তত যে মন কেন ভারী হয়ে ওঠে বুঝতে পারে না। শুধু টাকার অভাবেই নয়, সুখ নেই, কিছুতেই সুখ নেই। শুধু আছে ভয়। দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে কী এক অনির্দেশ্য ভয় যেন তার বুকের ওপর থাবা বসিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, প্রসাদ বড় হচ্ছে।

প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা, কোন্ দিন বা ধরা পড়ে যায় ছেলের কাছে। ধরা পড়বেই একদিন। সেদিন কী করে এ পোড়ামুখ দেখাবে ছেলেকে? কী কৈফিয়ত দেবে?

আবার মনে মনে সান্ত্বনা খোঁজে মেনকা। বোধ য় এখনও ও বুঝতে শেখে নি। এই তো এগারো ছর। কিন্তু—

চিরদিন তো এই এগারো বছর বয়েস থাকবে না! তার আগে কি অন্য ব্যবস্থা করা যায় না?

মেনকা খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দেয়। অসীম ন্ত নীলাকাশ পুঞ্জীভূত নৈরাশ্যের মত যেন হা-হা করে াঁদছে।

বিকেল পাঁচটার মধ্যে প্রসাদ এসে জল খেয়ে ও-বাড়ি লে যায়। তারপর শুরু হয় মেনকার সাজ-সজ্জা। রজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কাউকে ইঙ্গিতে ডাকতে ারে না—ঝুঁকে পড়তে পারে না রাস্তার লোকের পর। নিজেকে লুকিয়ে রাখে যতটা সম্ভব। তাতেই ারা আসে—তারা আসে।

এরপর একটা গুরুতর বিপর্যয় ঘটল মেনকার মনে। তদিন পর্যন্ত যে আর্থিক উপায় সীমাবদ্ধ রেখেছিল চ্ছে করে, এখন আর সে অল্প উপায়ে পেরে উঠছে না। ছেলের জন্তেই যা খরচ তা অন্য মেয়েরা কল্পনা করতে ারে না, তার ওপর অন্য সবার চেয়ে একটু বেশী পরিচ্ছন্ন নকাকে থাকতে হয়। সে মাপকাঠিও বোধ হয় আর া করা চলে না।

মনে মনে মেনকা তাই স্থির করল, আর অমন লজ্জা-কোচ রুচি-বিচার করে চলবে না। অন্য মেয়েরা পুরুষ ধরবার জন্যে যেসব হীন ছলাকলা করে, সেগুলো তাকেও আয়ত্ত করতে হবে।

তা না করলে তো মানুষ আসবে না। তারা তো ওইটুকুর লোভেই আসে।

মেনকা নিজেও একদিন সুন্দরী লজ্জালতা গৃহবধূ ছিল, স্বামীকে সেও চিনত। শুধু স্বামী নয়, স্বামীর মধ্যে দিয়ে সব পুরুষকে সে এক নজরে দেখে নিয়েছে।

আজ তাই মেনকার আর কোন দ্বিধা নেই। তেমন কোনও ঘৃণা নেই অন্য মেয়েদের ওপর। বাঁচতে গেলে ওই ভাবে চলতে হবে—নির্লজ্জ হতে হবে। সেটুকু আর পারবে না—অন্ততঃ যখন এ পথে নেমেছে!

এই নির্জন দ্বিপ্রহরে মেনকা স্থির করল আজ সন্ধ্যা থেকেই সে বদলে ফেলবে নিজেকে।

কিন্তু—

কিন্তু সেদিন বিকেলেই কোথা থেকে একটা অস্পষ্ট বাধা হঠাৎ যেন মাথা তুলে দাঁড়াল।

প্রসাদ অন্যদিন স্কুল থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে জল খেয়েই চলে যায় তার মাসির বাড়ি। বড় একটা কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে শুধু উত্তর দিয়ে যায়।

কিন্তু একদিন স্কুল থেকে বাড়ি এসেই হঠাৎ বিছানায় শুয়ে পড়ল।

মেনকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হল, হাত মুখ ধুবি নে?

প্রসাদ উত্তর দিল না। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল।

মেনকা আবার জিজ্ঞেস করল, শরীর খারাপ নাকি?

উত্তর দিল না প্রসাদ। মেনকা গায়ে হাত দিলে: কই গরম তো নয়। ছাই শরীর খারাপ। ওঠ্ শিগ্গির।

বাধ্য হয়েই যেন প্রসাদকে উঠতে হল। হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসল। কিন্তু ভাল করে খেতে পারল না।

মেনকা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি, খাচ্ছিস না যে?

প্রসাদ মুখ নীচু করে যেন জোর করে খেয়ে নিল।

খেয়েই অন্য দিনের মত চলে গেল না। ঘরে একটু ঘুরঘুর করে আবার বিছানায় গিয়ে শুল।

মেনকা বিস্মিত হয়ে বলল, কি হল?

এবারও উত্তর দিল না।

তখন বেলা পড়ে এসেছে। এর মধ্যেই ঘরে ঘরে সাজসজ্জার ধুম পড়ে গেছে। কেউ চুল বাঁধছে, কেউ কলতলায় চুল বাঁচিয়ে মুখে সাবান ঘষছে। ঝিয়েরা ঘন ঘন ঘর-বার করছে। কখনও আনছে পান, কখনও সিগারেট। সবাই প্রস্তুত হচ্ছে। কেবল মেনকারই কিছু হয় নি এখনও। এমন করলে ব্যবসা চলবে কী করে?

মেনকা বিরক্ত হয়ে বলল, তা হচ্ছে কী প্রসাদ? বিকেলবেলা ঘর-কুনোর মত শুয়ে থাকা। ওঠ্ শিগ্গির।—

নগেন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, টাকীর যতীন মুন্সি, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি মহারথীদের পাঠিয়ে দিলেন লালগোলায়। ঠাকুরদার কাছ থেকে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি যা তিনি কিনে নিয়েছিলেন, সেটা সাহিত্য-পরিষদে দান-স্বরূপ গ্রহণ উপলক্ষে তাঁরা সকলে উপস্থিত হয়েছেন।

এর অন্তরালে একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। বিদ্যাসাগর লাইব্রেরি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল, তাই রামেন্দ্রসুন্দর সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হয়েই বললেন, আপনি যদি লালগোলার রাজাবাহাদুরকে বিদ্যাসাগর লাইব্রেরিটি কিনতে অনুরোধ করেন, তবে বড় ভাল হয়। আমাকেই তাঁর কাছে এটা ওটা সেটা নিয়ে বারম্বার পরিষদের জন্যে সাহায্য চাইতে হয়, এবার আপনিই যদি দয়া করে এগিয়ে আসেন—। রাজা বাহাদুর কালই এসেছেন, আবার পরশুই চলে যাবেন।

সার্ গুরুদাস অভয় দিয়ে বললেন, বেশ, তাই যাব। যোগীনকে বুঝিয়ে বললে, আশা করি সে রাজী হবে।

নানার গোপন ব্যবস্থানুযায়ী গুরুদাসবাবু পরদিন প্রাতেই ঠাকুরদার কাছে উপস্থিত। দাদু তাঁর পায়ের ধুলো নিতেই গুরুদাসবাবু বললেন, ছাখ, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরিটা দশ হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন গ্রন্থ আছে। আমার ইচ্ছে ওটা তুমিই কিনে নাও। নামের খাতিরে হয়তো ওটা আর কেউ কিনে রাখবে, কিন্তু তাতে একমাত্র পোকা ছাড়া আর কারও উপকারে আসবে না।

সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে যোগীন্দ্রনারায়ণ বললেন, যে আজ্ঞে, তাই হবে।

ঠাকুরদা চলে গেলেন। তাঁর আদেশানুযায়ী যথাসময়ে লাইব্রেরি কেনাও হল, আলমারি বোঝাই বইগুলো লালগোলায় চালান হয়ে আমাদের বাড়িতেও পৌঁছল।

রামেন্দ্রসুন্দরের অভিপ্রায় ছিল অন্যরূপ। তিনি ভেবেছিলেন, ঠাকুরদাকে দিয়ে লাইব্রেরিটি কিনিয়ে সাহিত্য-পরিষদের সম্পত্তিভুক্ত করে নেবেন। সেই আশা ফলবতী না হওয়ায়, তিনি আবার ছুটে গেলেন সার্ গুরুদাসের কাছে। হতাশ কণ্ঠে বললেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরি কিনেও যে সব পণ্ড হয়ে গেল।

সার্ গুরুদাস জিজ্ঞেস করলেন, কেন? এতে আবার পণ্ড হবার কী আছে?

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, গোটা লাইব্রেরিটাই যে লালগোলায় চলে গেল।

যোগীন নিজের জিনিস নিজের জায়গায় নিয়ে গিয়েছে, এতে পণ্ড হবার কী আছে?

অপ্রতিভ হাস্যে রামেন্দ্রসুন্দর থেমে থেমে বলতে লাগলেন, ওটা কিন্তু আমি লালগোলার জন্যে বলি নি, আপনার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্যেই লাইব্রেরিটি রাজাবাহাদুরকে দিয়ে কেনাতে চেয়েছিলাম।

সে কথা আগে বললেই ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে যেত। তা হলে আর নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসার হাঙ্গামা হত না। বেশ, আমি যোগীনকে আবার একটা চিঠি দিচ্ছি, সাহিত্য-পরিষদের তরফ থেকে কয়েকজনকে তার কাছে পাঠিয়ে দিন।

তাই সার্ গুরুদাসের পত্র নিয়ে এঁরা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। ঠাকুরদার সদাশয়তায় নানার ঐকান্তিক ইচ্ছা অপূর্ণ রইল না।

এই সুযোগে লালগোলার অধিবাসীরা তাঁদের ধরে বসলেন, তাঁরা অনুরোধ করলে মহারাজা হয়তো অভিনন্দন-সভায় যোগদান করতে রাজী হবেন।

শাস্ত্রী মশায়ের কথা ঠাকুরদা ঠেলতে পারলেন না, বাধ্য হয়ে কিছুক্ষণ সভায় এসে বসলেন। এঁরা সবাই বক্তৃতা দিলেন—শাস্ত্রীমশাই সভাপতি। লালগোলাবাসীও তাদের অন্তরের ভাষা নিবেদন করবার সুযোগ পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠল।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের কথাও মনে পড়ে। খেতাবের মোহ আমারও কোনকালে নেই; তাই যখন সেটা পাবার কথা নয়, অর্থাৎ মহারাজার জীবিতকালেই আমার রাজা উপাধি পাওয়াটা সম্পূর্ণ অভাবনীয় এবং উপাধি পাওয়ার ইতিহাসে ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম হলেও ঘরে বসে আমাকেও এই রকম খ্যাতির বিড়ম্বনা সইতে হয়েছে। কিন্তু এই খ্যাতি আমার আদর্শ ও নীতির একান্ত বিরোধী। প্রত্যক্ষভাবে দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ ও সুবিধা না থাকলেও আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ আইন ভঙ্গ করা, গোপনে রাজনৈতিক

কর্মীদের অর্থ সাহায্য, এই সব কাজের মাধ্যমে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে আমার কিছুটা যোগাযোগ ছিলই—যার ফলে আমার শিকারী জীবনের পরম প্রিয় বস্তু বন্দুকটা পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হওয়ার উপক্রম! তবু যখন সেই আমাকেই এই রকম একটা উপাধি দেওয়া হল, মহারাজাকে আমার সুস্পষ্ট মত জানিয়েছিলাম।

ওসব খেতাব-টেতাব আমার ধাতে সইবে না—এটা ফেরত দিয়ে দিই, কী বল?

তিনি বাধা দিয়ে বললেন, আমি জানি, ওসব পেয়ে কোনও লাভ নেই, তবু তোমার শিকারের খ্যাতি, তোমার সাহিত্যসেবা, তোমারও দানধ্যানের কথা রাজ-পুরুষদের নজরে আছে বলেই—তার একটা পুরস্কার দেবার চেষ্টা করেছেন। তুমি না চাইলেও ওটা ফেরত দেওয়া চলে না, ওতে অসৌজন্য দেখান হয়।

সেই যোগীন্দ্রনারায়ণের অহংশূন্যতার কথাই বলছিলাম। আর এইজন্যেই বুঝি নিরহঙ্কার রামেন্দ্র-সুন্দরের সঙ্গে অহঙ্কারবর্জিত যোগীন্দ্রনারায়ণের আত্মিক যোগাযোগ এমন অচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছিল। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, নিজের বিজ্ঞাপনের জন্যে মানুষ কী না করে থাকে! নিজের নিজের দল গঠিত হয়, অহেতুক প্রতিযোগিতায় ঈর্ষা দ্বেষের বিষ-বাষ্প হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে, আত্মপ্রচার ও আত্মতুষ্টির পিচ্ছিল অন্ধকার অন্তরের সহজাত ব্যাপ্তিকে সঙ্কীর্ণতম করে তোলে। মানুষের অপরিসীম দাম্ভিকতাই এই তামসিক সাধনার শোচনীয় পরিণাম। এই আত্মাভিমান ও আত্মপ্রতারণার জটিল ব্যাধির কবল-মুক্ত ছিলেন আমার পিতামহ যোগীন্দ্রনারায়ণ, আমার মাতামহ রামেন্দ্রসুন্দর। এই পীড়িত, বিকৃত, এই আত্মঘাতী মনোভাব একদিনের জন্যেও তাঁদের চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে নি আর সেই যুগ্ম আলোকস্তম্ভের উজ্জ্বল আদর্শ আমার চোখের সামনে আছে বলেই, যেখানে বিন্দুমাত্র দম্ভের প্রকাশ দেখতে পাই, আমার মন সেখানেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সেদিকে ফিরেও চাই না।

সেই যোগীন্দ্রনারায়ণও একদিন ধরা পড়ে গেলেন। ঠাকুরদা কলকাতায় এসেছেন একবার আমাকে দেখতে; হপ্তাখানেক থেকেই চলে যাবেন।

এই সুবর্ণ সুযোগ। একদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় এসে উপস্থিত। দাদা তাঁর ছাত্র, বহরমপুরে প্রথম জীবনে তাঁর কাছে প্রাইভেটে আইন পড়েছিলেন। গুরু আসতেই দাদা পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হল, তা হলে বাবার বাবা তস্য বাবাও আছেন।
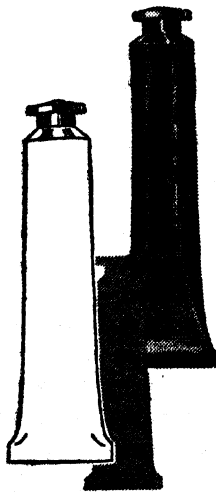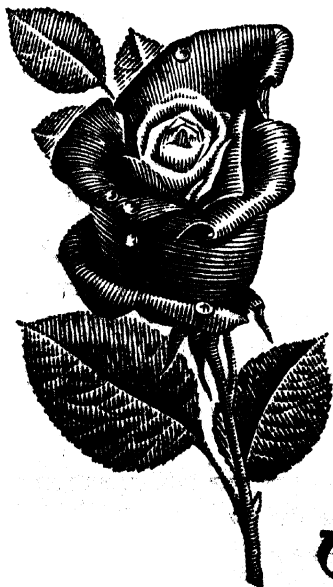
স্যর্ গুরুদাস বললেন, যোগীন, তোমাকে একটা কথা বলব, না বলতে পাবে না।

আদেশ করুন।

সাহিত্য-পরিষদের সবাই তোমাকে একবার দেখতে চায়—তোমাকে যেতেই হবে। দিনও আমরা ধার্য করে ফেলেছি। তোমার কোনও অসুবিধে হবে না, রামবাবুর কাছে তোমার লালগোলায় ফিরে যাবার তারিখ আগেই জেনে নিয়েছি।

দাদু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন।

আপনি আদেশ করেছেন, না বলবার উপায় নেই, কিন্তু এসব বিষয়ে আমাকে না টানলেই ভাল হত।

স্যর্ গুরুদাসের কণ্ঠে কিছুটা আদেশ কিছুটা অনুরোধ : না না, ও-কথা শুনব না, তোমাকে যেতেই হবে। আমার কথায় তোমার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা একদিন না হয় মুলতুবীই রাখলে।

বেশ, যখন বলছেন, যাব।

রামেন্দ্রসুন্দর পাশেই দাঁড়িয়ে, তাঁর আনন্দোদ্ভাসিত-চোখে ভেসে উঠল বিজয়ীর দৃপ্তভঙ্গী। মুখে কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না।

স্যর্ গুরুদাস চলে গেলেন। যোগীন্দ্রনারায়ণ রামেন্দ্রসুন্দরকে অনুযোগ করেন : এর মধ্যে আপনার হাত আছে নিশ্চয়, রামবাবু?

কুণ্ঠিত উত্তর এল : সাহিত্য-পরিষৎকে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁদের ইচ্ছাকে সার্থক করে তোলাই আমার কাজ।

দিন যতই এগিয়ে আসে, দাদুর গাম্ভীর্য যেন ততই গুরুতর হয়ে ওঠে। মাঝে আর দুটি দিন বাকী। এই স্বভাববিরুদ্ধ আবহাওয়ায় তিনি যেন বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। যিনি চিরদিন অলক্ষ্যে থেকেই কাজ করে যান, তাঁকে এই প্রথম তাঁরই প্রশংসামুখর সভায় উপস্থিত হতে হবে—এ কী নিদারুণ বিধিলিপি!

ওদিকে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর যথোচিত আদর সম্বর্ধনার আয়োজনে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যখনই ঠাকুরদার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের সাক্ষাৎ হয়, তাঁর চোখে ফুটে ওঠে একটা দুরন্ত অভিযোগ : তার অর্থ—আপনি আমায় বধ করলেন। রামেন্দ্রসুন্দরও তাঁর চিরন্তন মৃদুহাস্যে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

সুযোগ বুঝে দাদাকে বলে বসলাম, অ্যাদ্দিন ডুমুরের ফুল হয়ে কাটিয়ে দিলে, আজ তো দশজনের সামনে আসতেই হবে, কী পোশাকে যাবে?

কেন, যা পরে আছি—এই ধুতি-পাঞ্জাবি।

ওখানে কিছু বলবে?

পারতপক্ষে নয়।

ওঁরা কি তোমায় কিছু না বলিয়ে ছেড়ে দেবেন?

সে দেখা যাবে।

ছোট ছোট কথায় উত্তর দিয়ে আমার কাছেও তিনি অব্যাহতি পেতে চান। আবার তাঁকে বলি, তুমি যদি বল, আমি একটা ভাষণ লিখে দিতে পারি।

কী লিখবে?

কী ভাষায় বলেছিলাম, এখন মনে থাকবার কথা নয়, তবে তার ভাবার্থ এই—

সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের জাতীয় জীবনের সম্পদ, প্রত্যেক বাঙালীর গর্ব—আমাদের জন্মগত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বাংলার আদর্শে মনীষীদের তপস্যায় এর ভিত্তি গড়ে উঠেছে, তাঁদের সবাইকে এখানে একসঙ্গে দেখে আজ আমি ধন্য। যে কদিন বাঁচব, সাধ্যমত আপনাদের সেবায় জীবন যদি কাটিয়ে দিতে পারি, তবেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

"ভৃঙ্গার" কথাটি আমার ভারী মিষ্টি লাগত, সেটাও লাগিয়ে দিলাম : এই পরিষদের তীর্থসলিলে অবগাহন করে প্রাণের ভৃঙ্গার ভরে নিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন।

আরও বলবে : আপনাদের পরিচর্যায় পরিষৎ যেন দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাকে।

নাঃ, সেটা বলে কাজ নেই, দীর্ঘজীবনেরও তো একটা সীমা আছে, বরং এই কথাই বোল—

আপনাদের কৃপায়, আপনাদের শুভেচ্ছায় পরিষৎ যেন শত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে অক্ষয় অমর হয়ে বেঁচে থাকে, এই কামনা করি। আরও যদি ইচ্ছে হয় তো বলতে পার—

আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্য-পরিষৎ—চোখের সামনে আছে অতীতের মহা আদর্শ, প্রতীক্ষা করছে উজ্জ্বলতম সোনার ভবিষ্যৎ—আর আছে সামনে—

সামনেই দেখলাম রামেন্দ্রসুন্দর—আর বলা হল না। হয়তো তিনি নেপথ্যে দাঁড়িয়ে আমার এই আবেগভরা বক্তৃতার মহড়া শুনছিলেন, ঘরে প্রবেশ করেই উক্তি : বাঃ, বেশ চালিয়ে যাচ্ছ, মন্দ নয়।

ওদিকে বালকের মুখে বড় বড় কথা শুনে পুলকিত গর্বে যোগীন্দ্রনারায়ণ বললেন, আপনার কাছে থেকে বাংলা ভাষায় বেশ দখল হয়েছে খোকার। রামেন্দ্রসুন্দর অপাঙ্গে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ঠাকুরদার মন্তব্যের কোনও উত্তর না দিয়ে তাগিদ দিলেন, আর বেশী সময় নেই, এবার যেতে হয়।

চলুন।

একটি চাদর কাঁধে ফেলে তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে ল্যাণ্ডো গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। আমি সঙ্গে আছি, এ কথা না বললেও চলে।

[ক্রমশ]

চীনের শত দর্শন

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

নবম খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পর থেকে যে ক্রমবর্ধমান অরাজকতার মেঘজাল দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, চৌ-যুগের শেষার্ধে সেই অন্তর্বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছিল নানা দর্শন-তত্ত্ব, সেই সঙ্গে অসংখ্য দর্শন-চক্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতির চিন্তা-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য। ওই সব দর্শন-চক্রের সমষ্টিগত নাম 'শত দর্শন শিক্ষায়তন' (The Hundred Schools of Philosophy)। এখানে বলা প্রয়োজন, আমাদের ষড় দর্শনের মত 'শত দর্শন' বাক্যটি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার দ্যোতক নয়, বহু সংখ্যক দর্শন এই অর্থে ব্যবহৃত। গুরু ও তাঁর শিষ্যরা একটি চক্র-বৈঠকে মিলিত হতেন, তাঁদের আলাপ-আলোচনা যথাকালে লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থের আকার ধারণ করত। এমনই ভাবে এই আপদকালীন দুরবস্থার মধ্যেই 'তাও দর্শন' ও কনফুসীয় নীতি-ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। মহাস্থবির লাওৎসি ও তাঁর সুযোগ্য ভাষ্যকার চুয়াংৎকির 'তাও তত্ত্ব' বিষয়ে পূর্বের প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমরা কনফুসীয় নীতিবাদ এবং পরে আরও কয়েকটি দর্শন-তত্ত্বের কথা বলে আরব্ধ আলোচনার বৃত্তটিকে পূর্ণ করবার চেষ্টা করব।

কনফুসিয়াসের জীবনকাহিনী

কবি সত্যেন দত্ত 'কনফুসিয়াসের সন্ন্যাস-গ্রহণ' শীর্ষক পদ্য রচনায় লিখেছেন :

মসৃণ দেহ উচ্চ পৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে
কেহ নহে আগুয়ান।
সে করিল এক ধেনুর কামনা
অমনি শৃঙ্গাঘাত।
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র—
সংসারে প্রণিপাত

আত্ম-সম্মান বোধের কীর্তিস্তম্ভ, নিষ্ঠাবান, সংসার ও সমাজ-সেবী কনফুসিয়াসের ভিক্ষা-ব্রত গ্রহণ স্বপ্নাতীত সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যেমন হোক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়, কবির প্রাণবন্ত কল্পনা ককুদ্মান বৃষটির তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বর্ণনায় এই যে অতুলনীয় রসের সৃষ্টি করেছে তারই মধ্যে মনীষী কনফুসিয়াসের দেহাকৃতির একটি সত্যকার ছবি ফুটে উঠেছে। চীন লেখকেরা কনফুসিয়াসের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপ: 'ড্রাগনের স্কন্ধ, বৃষের ওষ্ঠ, সমুদ্রের মত মুখ-বিবর বিশিষ্ট মানুষ।' চিত্রশিল্পীরা তাঁর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেছেন, যদিও তাঁকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য তাঁদের ঘটে নি। চিত্রগুলিতে তাঁর মুখের রেখায় অসহ্য গাম্ভীর্য এমনই ভাবে ফুটে বেরিয়েছে যে কুৎসিত কদাকার পুরুষটিকে দেখা যায় বিকটদর্শন। কথিকায় বলা হয়েছে, ভ্রমণ কালে একদা এই মহাপুরুষ শিষ্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। শিষ্যরা সন্ধানে বেরিয়েছে, এমন সময় এক পথিক এসে সংবাদ দিল, 'ছন্ন-ছাড়া চেহারা হচ্ছে কুকুরের মত' একটা লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। মহাপ্রভুর রূপের এমন অদ্ভুত বর্ণনায় শিষ্যদল অবশ্য হকচকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু চেহারায় কোমলতা না থাকলেও কনফুসিয়াস রস-বর্জিত ছিলেন না। কথাটা কানে উঠতেই তিনি সকৌতুকে বলে উঠলেন, 'বাঃ! অতি চমৎকার বর্ণনা তো!'

কনফুসিয়াস ল্যাটিন নাম, চীনা নাম 'কুয়াং ফু জি,' অর্থ 'মহাপ্রভু কুং'। আসল নাম কুং চিউ, কিন্তু শিষ্যরা মহাপ্রভুকে কুয়াং ফু জি বলেই সম্বোধন করত। ৫৫১ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে তৎকালীন লু (বর্তমান সানটাং) রাজ্যের চু ফু নগরে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম, স্যাং রাজ-বংশের অবতংস তিনি, বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর। তাঁর পিতা সু লিয়াং ছিলেন

একজন প্রভূত শক্তিসম্পন্ন সাহসী বীরপুরুষ। সত্তর বছর বয়সে তিনি যখন নয়টি কন্যার জনক তখন বিবাহ করেন এক নারীকে, তারই গর্ভে কনফুসিয়াসের জন্ম। সব দেশের মহৎপুরুষদের বেলায় যেমন ঘটে থাকে এ-ক্ষেত্রেও হল তেমনই, কনফুসিয়াসের জন্ম-বৃত্তান্তে বিস্তর অলৌকিক সৃষ্টি-কল্পনা জড়িয়ে পড়ল। যেমন, নিভৃত পর্বতকন্দরে তাঁর জন্ম, প্রসূতিকে রক্ষা করেছিল ড্রাগনেরা, আর মন্থর বায়ুকে সুরভিত করেছিল অপ্সরাগণ। শৈশবে পিতৃ-বিয়োগের পর সাত বছর বয়স পর্যন্ত মাতা তাঁকে লালন-পালন করেন। এই অল্প বয়সেই তাঁর গাম্ভীর্য ও নিয়ম-নিষ্ঠা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথিত আছে, 'পুণ্য-শ্লোক সম্রাটদে'র (sage emperors) ভূমিকায় অভিনয়, শালীনতার নিয়মানুষ্ঠান, পূজার আয়োজন ও ব্রত পালন, বাল্যকালে এই সব বিষয় নিয়ে তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করতেন। স্কুলের পাঠ অভ্যাসের পর নিয়মিত কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা মাতার ভরণপোষণ করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধনুর্বিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু তিন বছর পর বিবাহ বিচ্ছেদ করে সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর দ্বন্দ্বের মত দর্শনের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের চিরন্তন বিরোধই যেন সপ্রমাণ করলেন। আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নি। তাঁর একমাত্র পুত্রের এগার হাজার বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান। কিছুদিন পূর্বেও এই বংশের একজন ন্যানকিং গবর্মেণ্টের অর্থ-সচিবের পদ অলংকৃত করেছেন।

বিবাহের পূর্বে কনফুসিয়াস শস্য-গোলা পরিদর্শকের সহকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাইশ বছর বয়সে সেই পদ ছেড়ে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করলেন। শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজের গৃহে, শিক্ষার দ্বার মুক্ত ছিল সকলের জন্য। চিরকালের প্রথামত গুরু-দক্ষিণা দেওয়া হত সামান্য কয়েক টুকরো শুটকি মাংস। জনসাধারণের ধারণা ছিল এই যে, তিনি একজন কঠোর গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক, প্রশংসা-কাতর এবং পরিশ্রমী, যিনি মূঢ়তা ও আলস্য কখনও বরদাস্ত করেন না। কিন্তু শিষ্যদের শ্রদ্ধানম্র চোখে 'প্রভুর প্রকৃতি আড়ম্বরশূন্য মৃদু সৌজন্যপূর্ণ' বলেই দেখা দিয়েছে। আহারাদি ব্যাপারে কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদে যত্ন নিতে তিনি বিশেষভাবে নিষেধ করতেন। বলতেন, 'যে সত্য-সন্ধানী শিক্ষার্থী মলিন বসন পরিধান করতে কিংবা মন্দ খাদ্য আহার করতে লজ্জা বোধ করে তার সঙ্গে বাক্যালাপ অবিধেয়।' শিক্ষা দান বিষয়ে আর একটি কথা বলেছেন তিনি, 'সত্যের সন্ধানে যার আগ্রহ নেই, সত্যের কপাট তাঁর কাছে আমি মুক্ত করব না। কোন সমস্যার একটা দিক বুঝিয়ে দেওয়া মাত্র যে অন্য তিনটি দিক অনুমান করে নিতে পারে না, এমন মেধাহীন ছাত্রকে আমি শিক্ষা দিতে নারাজ।'

কনফুসিয়াসের শিক্ষায়তনে শিক্ষার তিনটি প্রধান বিষয় ছিল, ইতিহাস, পদ্য ও ব্যবহারিক সৌজন্য বা শালীনতার নিয়মাবলী। কুনফুসিয়াস বলেন, 'মানুষের চরিত্র গঠন করে পদ্য, শালীনতা ও নৈতিক অনুষ্ঠান চরিত্রকে দৃঢ় করে, আর সেই চরিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে সঙ্গীতের ঝঙ্কার-মূর্ছনায়।' ইতিহাসের গবেষণা ছিল তাঁর পরম সাধনা, পুণ্যশ্লোক রাজা ইয়াও ও সুনের গুণকীর্তনে তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সক্রেটিস কিংবা ভারতীয় ঋষিগণের মত শিষ্যদের সঙ্গে সংলাপছলে বাণী প্রচার। শিষ্যের সংখ্যা প্রথমে ছিল অল্প, খ্যাতির প্রসারের সঙ্গে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে তিন সহস্র হয়েছিল। তাঁর বাহ্য ব্যবহার ছিল রুক্ষ-কঠিন, কিন্তু অন্তর যে কত কোমল তার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি প্রিয় শিষ্য লুই-র মৃত্যু সংবাদ শুনে দরবিগলিতধারায় অশ্রুবর্ষণ করে। মর্মবেদনায় কাতর হয়ে বলেছিলেন তিনি, 'শিক্ষায় প্রতি লুই-র ছিল যেমন অনুরাগ, এমনটি আমি আর কারু মধ্যে দেখি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে অল্পায়ু, তার মৃত্যু ঘটেছে। তার মত শিষ্য আমার আর একটিও নেই।' আলস্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না, এবং প্রয়োজন হলে ছাত্রের পিঠে দু-এক ঘা বেতও কষিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'সেই ব্যক্তি একটি আপদ বিশেষ বাল্যে ও কৈশোরে যে বিনয়ী ছিল না আর উত্তর-পুরুষকে দিয়ে যাবার মত কোন কর্ম করে নি।' ন্যায়-দর্শনের তত্ত্ব-বিচার তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল না। তিনি শুধু শিক্ষার্থীর যুক্তির ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়ে বিচার-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণধার করতেন মাত্র। পরনিন্দা বর্জন আর তর্ক দ্বারা যুক্তি খণ্ডনের বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ—এই ছিল দার্শনিকদের প্রতি তাঁর অমূল্য উপদেশ।

ইতিহাসের ভিত্তির ওপর সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নীতিধর্ম গড়ে তুলেছিলেন কনফুসিয়াস, এক কথায় সেই নীতিধর্মের নাম 'লি' (li)। শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত: পূজা-পার্বণ, সদাচার, আদর্শ সমাজের বিধি-ব্যবস্থা, ধর্মবুদ্ধি সবকিছু বোঝায়। এই 'লি'-ধর্মের প্রধান অঙ্গ সৌজন্য বা শালীনতার নিয়মকানুন, সামাজিক ব্যবহারে সৌষ্ঠবই ছিল তাঁর শিক্ষার প্রধান বিষয়। নৈতিক আচার-নিয়ম চীনদেশে অতি প্রাচীনকাল থেকেই চলে এসেছিল, কনফুসিয়াস শুধু সেই পুরনো তত্ত্বগুলি মার্জিত করে পুনঃপ্রবর্তিত করেছিলেন। তিনি কোন নূতন তত্ত্ব প্রচারের দাবি করেন নি, বলেছেন, 'আমি (নূতন তত্ত্ব) সৃষ্টি করি নি, (প্রাচীন জ্ঞানকে) প্রসারিত করেছি মাত্র (I transmit and do not create)।' চীনাদের সমাজ-চিন্তায় পাঁচটি সম্বন্ধের স্থান অত্যন্ত উচ্চে, এই সেই 'পঞ্চ সম্বন্ধ': (১) রাজা-প্রজা সম্বন্ধ (২) পিতা-পুত্র সম্বন্ধ (৩) স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ (৪) অগ্রজ-অনুজ সম্বন্ধ (৫) বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্বন্ধ। এই 'সম্বন্ধ-পঞ্চকে'র আদর্শকে সংযম ও সদাচারের নৈতিক বিধান দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কনফুসিয়াস। আমাদের এই আধুনিক জগতের পরিবর্তিত অবস্থায় 'পঞ্চ সম্বন্ধে'র আদর্শকে পূর্বের মত নির্বিচারে স্বীকার করে নেবার পক্ষে হয়তো বা অনেক বাধা-অন্তরায় আছে, কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাই কনফুসিয়াসের একমাত্র কৃতিত্ব নয়। আমরা তাঁর শিক্ষার মধ্যে অনেক সারগর্ভ ভাবধারার নৈতিক গুণধর্মের সাক্ষাৎ পাই, যেমন 'চুং' (বিশ্বস্ত চিত্তবৃত্তি, অর্থাৎ নিজের কাছে ও পরের কাছে বিশ্বাসের পাত্র হওয়া), 'সু' (পরার্থপরতা) 'জেন' (মানবিকতা-বোধ), 'ই' (সত্যনিষ্ঠা), 'লি' (শালীনতা), 'চি' (প্রজ্ঞা), 'সিন' (আন্তরিকতা)। এই সব মৌলিক গুণের অনুশীলন দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠনের পথ-নির্দেশই ছিল কনফুসীয় নীতিধর্মের মহাশিক্ষা—যে শিক্ষা শ্রেণীনির্বিশেষে সকল চীনবাসীর চিত্ত অধিকার করে শিক্ষাগুরুকে সার্থক অমরতা দান করেছিল।

এই অমর শিক্ষাগুরুকেও প্রকৃতি তার পরিহাসের পাত্র করে তুলতে ত্রুটি করেন নি, আর সেই ব্যঙ্গই বোধ করি ফুটে বেরিয়েছে চীনা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও সমালোচক হার্বার্ট গাইলসের বর্ণনায়। কনফুসিয়াসের রুক্ষকর্কশ আচরণ প্রসঙ্গে তিনি তাঁকে একজন বেত্রধারী ইংরেজ স্কুল-মাস্টারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এরূপ বর্ণনা শুনলে কনফুসিয়াস নিশ্চয়ই দুঃখিত হতেন না, কারণ নিজের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন বিভ্রম ছিল না। এক বন্ধুকে বলেছিলেন তিনি, 'কোন বিষয়ে উৎসাহ জাগলে আমি আহার ভুলে যাই, সুখ বোধ করলে দুঃখ গ্লানি ভুলে যাই, বার্ধক্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমি তা জানতেও পারি না।...পনর বছর বয়সে আমার বিদ্যানুরাগ জন্মে। ত্রিশ বছরে চরিত্র গঠিত হয়। চল্লিশ বছরে সকল ভ্রান্তি দূর হয়। পঞ্চাশ বছরে 'স্বর্গের ইচ্ছা' জানতে পারি। ষাট বছরে কোনরূপ বাহ্য অবস্থা আমার প্রশান্ত চিত্তকে বিচলিত করতে পারে নি। সত্তর বছর বয়সে কোন নৈতিক বিধান লঙ্ঘন না করে আমার চিন্তা যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে।' জীবনের সাধ কী এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'বৃদ্ধ ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে, বন্ধুবর্গ সৌহার্দপূর্ণ হয় এবং যুবকেরা বর্ষীয়ানদের শ্রদ্ধা করে, এই আমার জীবনের সাধ।'

কনফুসিয়াসের বচনগুলিতে আত্মপ্রশস্তির অভাব নেই। তিনি বলেন, 'যে গ্রামে দশটি পরিবার বসবাস করে, সেখানে হয়তো এমন একজন ব্যক্তি দেখা যায় যে আমারই মত নিষ্ঠাবান ও সম্মানিত, কিন্তু সেও আমার মত বিদ্যানুরাগী নয়।' কিন্তু এই আত্মপ্রশস্তি একটা অসংযত লঘু ভাষণ নয়। তিনি বলেন, 'বিদ্যাচর্চায় আমি যদি বা অন্যান্য ব্যক্তির সমান, কিন্তু প্রকৃত মহৎ চরিত্রের মানুষের লক্ষণ এই যে তিনি যে-সব উপদেশ দান করেন, কার্যক্ষেত্রে তার নিজের ব্যবহার তদনুরূপ। আমি এখনও সেই পর্যায়ে উঠতে পারি নি।' তিনি আরও বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে আমি প্রাজ্ঞ হয়ে ভূমিষ্ঠ হই নি। আমি শুধু প্রাচীন বিদ্যা ভালবাসি, আর সেই বিদ্যা আয়ত্ত করতে প্রাণপণ পরিশ্রম করি।' বিনয় বেশ সহজভাবেই তাঁর এই কথাগুলিতে ফুটে উঠেছে। শিষ্যরা বলতেন, 'মহাপ্রভু চারটি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন সিদ্ধান্তই তিনি খেয়াল খুশী মত আগেভাগে স্থির করে রাখতেন না, আর তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচার একগুঁয়েমি আত্মাভিমান বর্জিত।'

শ ও মর্যাদা আকাঙ্ক্ষা করতেন বটে, কিন্তু সেজন্য এমন কোন কর্ম করতেন না যাতে তাঁর সম্ভ্রমের হানি ঘটতে পারে। তিনি বলতেন, 'মানুষের বলা উচিত এই কথা, আমার কোন মর্যাদা নেই বলে উদ্বিগ্ন নই, আমি চিন্তা করি কিরূপে মর্যাদালাভের উপযুক্ত হতে পারব। আমি খ্যাতিমান নই বলে উদ্বিগ্ন নই, আমার চিন্তা কিরূপে খ্যাতিলাভের যোগ্য হতে পারব।'

কনফুসিয়াসের সশিষ্য ভ্রমণকালে সুধী ও শাসকবৃন্দের সঙ্গে তাঁর নানাবিধ সংলাপের বিবরণ আছে। লাওৎসির সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার কথা পূর্বে একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। সি'র ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রশাসন বিষয়ক একটি প্রশ্নের জবাবে কনফুসিয়াস বলেছিলেন, 'উত্তম প্রশাসন সম্ভব যখন রাজা হন রাজা আর মন্ত্রী হন মন্ত্রী, যখন পিতা হন পিতা আর পুত্র হন পুত্র।' কথাটির তাৎপর্য এই যে, সমাজে সকলেই যখন নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেন, সুষ্ঠু প্রশাসন তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে। এই কথায় প্রসন্ন হয়ে ডিউক তাঁকে একটি নগরের রাজস্ব দান করতে চাইলেন, কিন্তু সে দান তিনি গ্রহণ করলেন না। এমন কী কাজ করেছেন তিনি যার জন্য এই পুরস্কার? ডিউক আবার যেমন অনুরোধ করতে যাবেন, মন্ত্রী অমনই তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এই সব পণ্ডিত ব্যক্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন, উদ্ধত। কুং প্রভুর ওঠা-বসার কেতাকানুন শিখতেই কয়েক পুরুষ কেটে যায়।' সেখান থেকে এসে পনর বছর ছাত্রদের শিক্ষাদান করেছিলেন কনফুসিয়াস, তারপর সরকারী কার্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে লু-রাজ্যে আসেন।

কিছুকালের জন্য কনফুসিয়াস স্বদেশের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে কয়েকটি শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন তিনি, আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়-বহুল জীবনযাপন অপরাধ বলে গণ্য করা হত। কথিত আছে, তাঁর শাসনাধীনে লোক-চরিত্র এমন উন্নত হয়েছিল যে পথে যদি কোন অলঙ্কারও পড়ে থাকত কেউ তা স্পর্শ করত না, অথবা মালিকের সন্ধান করে প্রাপক সেটি তাকে প্রত্যর্পণ করত। লোকেরা সব সাধু-সজ্জন, নারীরা সব সতী-সাধ্বী হয়ে উঠেছিল। চারিত্রিক উৎকর্ষ ঘটেছিল নাগরিকদের, কিন্তু রাজার ছিল নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা। পরিশেষে একদিন নীতিধর্মকে প্রকাশ্যে দলিত করে কোন প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত একদল গীতবাদ্য-কুশলা গণিকাকে তিনি সম্বর্ধনা করলেন। কনফুসিয়াস তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করলেন। বললেন, 'সদাচারকে পিছনে ঠেলে কুৎসিত কদাচার ফলাও করে দেখান হয়েছে।' তিনি স্থির করলেন, নীতিধর্মের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা অথবা শিক্ষাদান ব্রতের মধ্যে আপন কর্মকে সীমাবদ্ধ করে রাখাই এখন তাঁর কর্তব্য। দেশ ত্যাগ করে তের বছর তিনি শিষ্যবৃন্দসহ নানা স্থান ভ্রমণ করলেন, কোথায়ও পেলেন সমাদর, কোথায়ও অনাদর। বিপদ ও দৈন্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে, দু বার দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছিল, একবার অনশনে কাল কেটেছিল। দুর্গতির অন্ত নেই, তবু তিনি ওয়েই'র সামন্তরাজের কর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ সেই রাজা ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। পরিব্রাজক অথচ সন্ন্যাসী নয়, তার এই কিম্ভূতকিমাকার অবস্থাটির প্রতি কটাক্ষ করে একজন সংসার-ত্যাগী পুরুষ তাঁকে বলেছিলেন, 'এ-কথা সত্য, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা রাজ্যময় ছড়িয়ে রয়েছে বন্যার মত। কিন্তু এমন লোক কি আছে কেউ যে এই দুরবস্থার কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারে? ভবঘুরের অনর্থক জীবন যাপনের চেয়ে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করাই ভাল নয় কি?' কনফুসিয়াস কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না, তাঁর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে পর্যটন কালে এমন কোন রাজ্যে এসে উপনীত হবেন যেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে জন-কল্যাণের অনুষ্ঠান সম্ভব। পলাতক মনোবৃত্তির দরুন যারা কৈবল্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই সব সংসার-বিবাগীদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে একদা তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাদের থেকে পৃথক। আমি সাময়িক অবস্থা বিবেচনা করে মন স্থির করি, এবং সেই অনুসারে কর্ম করি।'

উনষাট বছর বয়সে নূতন রাজার কাছ থেকে তিনি প্রচুর উপঢৌকনসহ স্বদেশে প্রত্যাগমনের নিমন্ত্রণ পেলেন। এইবার তাঁর যাযাবর জীবন সাঙ্গ হল। দেশে ফিরে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতির সংস্পর্শে না এলেও তিনি শাসন বিষয়ে নানা উপদেশ দান

করেছিলেন, আর সেই সূত্রে অশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচীন গ্রন্থ সংকলন ও ইতিহাস রচনার কাজে মন দিয়েছিলেন। অবসর বিনোদন করতেন তিনি কবিতা পাঠ ও দর্শন আলোচনা করে। তাঁর সমগ্র সাধনা ও দর্শন-চিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজ্ঞার সঙ্গে স্বভাববৃত্তিগুলির সমন্বয়। তিনি যে নীতিবাদ প্রচার করেছিলেন আর 'হিরণ্য মধ্য-পন্থা'র (the Golden Mean) নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে-সব ওই সমন্বয়-প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

বাহাত্তর বছর বয়সে কনফুসিয়াসের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি প্রিয় শিষ্য জি কুংকে বলেছিলেন, 'প্রাজ্ঞ ধীমান নৃপতি আদৌ দেখা যায় না। সাম্রাজ্যে এমন একজনও নেই যে আমাকে তার প্রভু রূপে বরণ করে নেবে। আমার এখন মরবার সময় এসেছে।' মৃত্যুর পর শোকার্ত শিষ্যগণ তাঁর সমাধি দান করেছিলেন বিলক্ষণ অনুষ্ঠান সহকারে, এবং সেই সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁরা তিন বৎসর কাল বাস করে স্বর্গত গুরুদেবের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে একদিন প্রভাতে কনফুসিয়াসকে এই করুণ সঙ্গীতটি গাইতে শোনা গিয়েছিল :

কালে পাহাড়ের চূড়া ধ্বসে পড়ে,
কড়িকাঠ ভেঙে খান খান হয়,
পর্ণহীন মহাক্রম শুকিয়ে যায়,
হায় রে! সুধীজনের অন্তিমও তেমনি…

কনফুসিয়াসের সংকলন-গ্রন্থ : নীতিবাদ

আদি কারণ বা মূল সত্যের সন্ধান, যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার পীঠস্থান ভারতবর্ষ ও গ্রীস, বৌদ্ধধর্ম আগমনের পূর্বে চীন দেশে সেই মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সবকিছু আলোচনা তাও-দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কনফুসীয় দর্শন পরমার্থচিন্তা বা মূল তত্ত্বের (metaphysic) গবেষণা নয়, জীবনদর্শন মাত্র। চীনাদের ব্যবহারিক আদর্শের আশ্রয় নিয়ে সুষ্ঠু জীবন যাপনের পথ নির্দেশ করেছিলেন কনফুসিয়াস, সংসার-যাত্রায় পথ চলার নিয়মই এই জীবন-দর্শন। আমরা যে পঞ্চ সম্বন্ধে-র কথা পূর্বে বলেছি, সেই রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধই রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ, এই ভিত্তিমূল দৃঢ় করবার জন্ত প্রয়োজন নীতির অনুশাসন দ্বারা সম্বন্ধ-পঞ্চকের নিয়ন্ত্রণ। কনফুসীয় নীতিবাদে বলা হয়েছে রাজার ন্যায়নিষ্ঠা মমতা ও সহানুভূতির কথা, প্রজার রাজভক্তি ও আনুগত্যের কথা, পিতার কর্তৃত্বাধিকার ও পুত্রের পিতৃভক্তি ও আদেশ পালনের কথা। তা ছাড়া 'লি' নামে যে গুণ-ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে, সেই 'লি' নীতিবাদের একটি প্রধান অঙ্গ। সদাচার বিনয় শ্রদ্ধা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলীকে কনফুসিয়াস 'লি' নামে অভিহিত করেছেন।

প্রাচীন ঐতিহ্যকে কনফুসিয়াস তাঁর নীতিবাদের মূল মন্ত্র করেছিলেন। সতর শো বছর পূর্বেকার রাজা ইয়াও ও সুন-এর স্বর্ণযুগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি, সেই যুগের স্মৃতি তাঁকে প্রাচীন সমাজ-নীতি বা 'লি'-ধর্মের প্রবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। উত্তরাধিকারী নির্বাচন কালে রাজা ইয়াও তাঁর কলহ-পরায়ণ অস্থিরমতি পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে নিম্নশ্রেণীর একজন অন্ধ ব্যক্তির নীতিপরায়ণ সুযোগ্য পুত্র সুন-কে সন্ধান করে এনে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এই ছিল সে-যুগ, যখন রাজা-প্রজা, উচ্চ-নীচ সকলেরই আচরণ ছিল শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শের বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন, তখন মাৎসন্যায় ছিল না, অনাচার ছিল না। রাষ্ট্র সমাজ পরিবার, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা-অশান্তির অবসান অবশ্যম্ভাবী, যদি প্রাচীন আচার-পদ্ধতি ও চিন্তাধারাকে আবার ফিরিয়ে আনা যায়, এই বিশ্বাসের বলে কনফুসিয়াস প্রাচীন বিদ্যার (classics) উদ্ধারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইতিহাস মন্থন করে তিনি 'গ্রন্থ পঞ্চক' (Five Chings) সংকলন করেছিলেন, সেই সংকলন গ্রন্থগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়া হল :

(১) লি চি বা অনুষ্ঠানপঞ্জী (Record of Rites) : এই গ্রন্থে আছে লি-ধর্মের ব্যাখ্যা, শালীনতা সৌজন্য সদাচারের নিয়মাবলী। বর্ণনার উদ্দেশ্য, চরিত্র-গঠন ও চারিত্রিক মাধুর্যের বিকাশ, নৈতিক মানের উন্নয়ন। লোকায়ত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন সামাজিক ভোজন বা ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনী সভায় কিরূপ আচরণ সঙ্গত ও সুশোভন, আর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকর্ম পিতৃতর্পণের পদ্ধতি, এই সব বিষয়ে নানা বিধান গ্রন্থটির মধ্যে স্থান পেয়েছে।

(২) ই-কিং বা পরিবর্তন-গ্রন্থ (Book of

Changes): একটি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। শুধু ভাষ্য ও পরিশিষ্ট রচনা করেছিলেন কনফুসিয়াস। চীনের নানা শাস্ত্র, বিশেষতঃ ফলিত জ্যোতিষ, 'পা-কুয়ো' বা পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের 'ট্রাইগ্রাম' ও 'হেক্সাগ্রামে'র রহস্য বর্ণনায় পরিপূর্ণ। পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের রহস্যাত্মক ট্রাইগ্রামের সংখ্যা ছিল ৮টি, পরে ৬৪ হেক্সাগ্রামের কল্পনা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি ট্রাইগ্রাম বা হেক্সাগ্রাম ছিল কোন না কোন প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতীক-চিহ্ন, যেমন স্বর্গের চিহ্ন তিনটি পূর্ণ লাইন ☰, পর্বতের চিহ্ন একটি পূর্ণ ও দুটি ভগ্ন লাইন ☶ ইত্যাদি। প্রাচীন শাস্ত্রে 'কুয়ো'র এই বিবরণ ছাড়াও ইয়াং ও ইন নামে দুটি গুণের উল্লেখ আছে। ইন স্থূল প্রকৃতি, স্ত্রীধর্মী গুণ। ইয়াং সূক্ষ্ম বা অন্তর্নিহিত শক্তি, পুংধর্মী গুণ। ইয়াং গতিশীল কর্মশক্তির মূল, আর ইন বিশ্বের স্থাবর জড় বা স্থিতিশীল অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। ইয়াং ও ইনের সংমিশ্রণে কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞানসমেত জগতের যাবতীয় বস্তুর সম্ভব হয়েছে, আর ওই গুণ দুটি কিরূপে পা-কুয়োর সঙ্গে রহস্য সম্বন্ধে জড়িত, অর্থাৎ গুণদ্বয় কিরূপে পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের ট্রাইগ্রাম-হেক্সাগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, এই সব দুর্বোধ্য দুষ্পাচ্য কষ্ট-কল্পনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন কনফুসিয়াস তাঁর ই-কিং বা পরিবর্তন-গ্রন্থে। স্বভাবতঃ তিনি সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত বা রহস্যাত্মক বিষয়ের আলোচনা থেকে বিরত থাকতেন, কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষ্য রচনায় সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। কিংবদন্তী এই যে, তত্ত্বটির আদি সৃষ্টিকর্তা পৌরাণিক রাজা ফু সি।

(৩) সি কিং বা কাব্যগ্রন্থ (Book of Odes): মানুষের জীবন ও নীতি বিষয়ে নানা প্রাচীন কবিতার সঙ্কলন।

(৪) চুন-চিউ বা বাসন্তী ও শারদীয় বিবরণ (Spring and Autumn Annals): এখানা লু-রাজ্যের ইতিহাস। কনফুসিয়াসের মাতৃভূমি লু ছিল একটি সামন্ত-রাজ্য। সাম্রাজ্যের পরিণত রূপ চৌ-যুগে ফুটে ওঠে নি, সেজন্য কনফুসিয়াসের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা সামন্ত-রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

[illegible] (Book of History):

চীনের আদিকালের আখ্যায়িকা ও ইতিবৃত্ত। পুণ্যশ্লোক রাজা ইয়াও ও সুনের রাজত্বকালের বিবরণ আমরা এই গ্রন্থেই পেয়েছি। কনফুসিয়াসের রচনাবলী ভস্মীভূত করেছিলেন তৃতীয় খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের চীনবংশী সম্রাট সি হুয়াং তি, সেই সঙ্গে 'সু কিং' গ্রন্থটিও ধ্বংস পেয়েছিল। হান বংশীয়দের শাসনকালে কনফুসিয়াসের গ্রন্থসমূহ যখন পুনরুদ্ধার করা হল, তখন তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বন করে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জুমা চিয়েন তাঁর অপূর্ব ইতিকথা 'সি চি' প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি নিয়ে 'সু কিং' রচনা করেন নি কনফুসিয়াস, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সমাজ ও রাজন্যবর্গের আদর্শ জনগণের সামনে ধরে শিক্ষা দ্বারা যুবকদের চারিত্রিক উন্নতিসাধন। সেজন্য তিনি যে শুধু প্রাচীন ইতিহাস থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা নয়, অনেক কাহিনী ও রাজাদের মুখনিঃসৃত উপদেশবাণী তাঁর স্বকপোলকল্পিত, সুতরাং ইতিহাসের চোখে অপ্রকৃত।

এই কিং গ্রন্থপঞ্চক ছাড়া আরও চারটি সু বা গ্রন্থ মোট নয়টি গ্রন্থের সমষ্টি এখন কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। 'প্রাজ্ঞ বচন' বা 'অ্যানালেকট' (Analect) তার একটি, গুরুদেবের মৃত্যুর পর শিষ্যগণ তাঁর কথামৃত স্মরণ করে এই গ্রন্থ রচনা করেন। অন্য তিনটি সু: (১) টা-সুয়ে বা মহাবিদ্যা (The Great Learning); (২) চুং ইয়াং বা মধ্যপন্থা (Doctrine of the Mean); (৩) মেনসিয়াসের গ্রন্থ (Book of Mencius)। সক্রেটিসের ভাষ্যকার যেমন ছিলেন প্লেটো, মেনসিয়াসও তেমনই কনফুসিয়াসের ভাষ্যকার, তাঁর সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। কনফুসীয় 'লি' বা নীতিধর্মের সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে এই নয়টি গ্রন্থে, সেজন্য দুই সহস্র বৎসরেরও অধিককাল গ্রন্থগুলি চীনা-সমাজে পরম সমাদর লাভ করে এসেছে। কিন্তু সেকালে এই নীতিবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা যে হয় নি তা নয়। প্রাচীন ঐতিহ্য ও পৌরাণিক রাজাদের অন্ধ নির্বিচার প্রশস্তির জন্য কনফুসিয়াস প্রসিদ্ধ তাও-দার্শনিক চুয়াংৎসির বিশেষ নিন্দাভাজন হয়েছিলেন।

কনফুসিয়াসের প্রাজ্ঞ-বচন বা কথামৃতের অনুবাদ

করেছেন জেমস লেগ (James Leyge), ওই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম Analect। বচনগুলির মধ্যে কনফুসীয় নীতিসার নিহিত থাকলেও সেখানে না আছে ন্যায়ের কূট তর্ক, না আছে যুক্তির জাল বয়ন। জটিলতা বিবর্জিত পরিচ্ছন্ন সাধুচিন্তা এবং সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গীই কথামৃতের দার্শনিক বিশেষত্ব। সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যক্তিজীবনের আদর্শ নিয়ে তিনি কোন দুর্বোধ্য তত্ত্বকথার অবতারণা করেন নি, তিনি শুধু দিয়েছেন সহজ সরল কর্তব্যপথের নির্দেশ। জ্ঞানের বোঝার মাপে জ্ঞানী ব্যক্তিকে ওজন করেন নি, কেমন করে একজন সাধারণ ব্যক্তিও জ্ঞানী হতে পারে, সেই তথ্য প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানীর সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এইরূপ : 'সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী যে জানে কী সে জানে, আবার এ-ও জানে কী সে জানে না।' কোন মহাত্মা বা পরম পুরুষ দর্শনের জন্য কনফুসিয়াসের আগ্রহ নেই, একজন প্রকৃত ভদ্রলোক দেখলেই তিনি সন্তুষ্ট। এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, 'সদাচারী ব্যক্তির পক্ষে গ্রামশুদ্ধ লোকের প্রশংসাভাজন হওয়া সমীচীন নয়, আবার গ্রামশুদ্ধ লোকের বিরাগভাজন হওয়াও অসঙ্গত। যখন গ্রামের সৎ প্রকৃতির লোকেরা তার প্রশংসা আর অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিরা তার নিন্দা করে তখনই সদাচারকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়।'

প্রকৃত পণ্ডিত কে, এই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস কোন দর্শন-তত্ত্বে পারদর্শী দিক্‌পাল সদৃশ ব্যক্তির কথা বলেন নি। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত আচরণে যাঁর আছে আত্ম-সম্মান বোধ এবং পররাজ্যে যিনি মর্যাদা রক্ষা করে যোগ্যতার সহিত দৌত্য কার্য সম্পন্ন করতে পারেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।' প্রশ্ন হল, তার পরের স্থানটি কার? কনফুসিয়াস বললেন, 'যিনি পরিবারের সুসন্তান, বিনয় ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য গ্রামে যাঁর খ্যাতি আছে।' তার পরের স্থান? 'আচরণে ও বাক্যে আছে যাঁর সংযম, আর যে কখন কথার অপলাপ করে না।' শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে আর ইতরই বা কে? এই প্রসঙ্গে কনফুসিয়াস বলেন, 'শ্রেষ্ঠ মানব ঋত-সত্যের (right) সন্ধান জানে, আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি জানে বাজারে বিকায় কোন্ জিনিসটি। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তার আত্মাকে ভালবাসে আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভালবাসে তার বিত্ত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে দোষ দেয়, নিকৃষ্ট ব্যক্তি সকল দোষ চাপায় পরের ওপর।' শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ গুণ সক্রেটিসের মতে জ্ঞান, নিট্‌শের (Nietzsche) মতে সাহস, কিন্তু যিশুখ্রীষ্ট প্রেম বা সদিচ্ছাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। এই তিনটি গুণেরই সমান অধিকারী কনফুসীয় শ্রেষ্ঠ মানব, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ঘটেছে জ্ঞান সাহস ও সদিচ্ছার সমন্বয়। শ্রেষ্ঠ মানব শুধু বুদ্ধিমান নন, জ্ঞানী বা পণ্ডিতও নন, তিনি চরিত্রবান। চরিত্রের মূল বাক্ মন ও কর্মে সততা। 'শ্রেষ্ঠ মানব কথা বলবার পূর্বে কাজ করেন, এবং কাজ যেমন করেন কথা বলেন সেই কাজের অনুরূপ।' শ্রেষ্ঠত্বকে ধনুর্বিদ্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন কনফুসিয়াস। 'তীর যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বিচক্ষণ তীরন্দাজ তখন ভ্রম-ত্রুটির সন্ধান করে নিজের মধ্যে, ইতর ব্যক্তির মত অন্যের উপর দোষারোপ করে না। শুধু বাক্যে ও কর্মে সঙ্গতি নয়, সংযমও শ্রেষ্ঠত্বের একটি বিশেষ লক্ষণ। সংযত আচরণ সম্ভব হয় মানুষ যখন মধ্য-পন্থা (the path of the mean) নির্দিষ্ট বিধানগুলি মেনে চলে। অসংযত প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্মে প্রবৃত্ত হলে কর্ম হয় তখন উদ্দাম প্রবৃত্তির মতই উচ্ছৃঙ্খল, কর্মের এই উচ্ছৃঙ্খল পরিণতি নিবারণের জন্যই মধ্য-পন্থা নিরূপিত সংযমের ব্যবস্থা। কনফুসিয়াস বলেন, 'শ্রেষ্ঠ মানব এমন ভাবে চলেন যে তাঁর চলার পথটি হয়ে ওঠে সর্বকালের একটি সার্বজনীন পথ universal path), তার সুষম লৌকিক ব্যবহারকে সর্বকালের একটি সার্বজনীন বিধি (universal law) রূপে দেখা যায়, এবং বাক্যালাপ করেন তিনি এমন সংযত ভাবে যে তাঁর কথাগুলি হয় সর্বকালের সার্বজনীন আদর্শ বচন (universal norm).' যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পাঁচ শো বছর পূর্বে কনফুসিয়াসের বচনে সুবিখ্যাত একটি খ্রীষ্টীয় নীতির রকমফের দেখা যায়। ধর্মাচরণ কী ওই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, 'অন্যের নিকট থেকে যেরূপ ব্যবহার তুমি নিজে ইচ্ছা কর না, সেরূপ ব্যহার অন্য কারু সঙ্গে করো না।' এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে প্রবচনটি নেতিবাচক, অর্থাৎ কিরূপ আচরণ নিষিদ্ধ সেই কথাই বলা হয়েছে। অন্যের অশিষ্ট রূঢ়তা বা অনিষ্টের প্রতিদান স্বরূপ শিষ্ট কোমল আচরণ, এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দেওয়ার মত উদার ব্যবস্থা যা খ্রীষ্টীয় নীতিধর্মের সারমর্ম, তেমন কোন ক্ষমা-সুন্দর মহত্ত্বের আদর্শকে গ্রহণ করেন নি কনফুসিয়াস। মন্দের পরিবর্তে ভাল, এই আদর্শবাদ প্রচার করেছিলেন লাওৎসি, তাঁর এই আদর্শ সম্বন্ধে জনৈক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেছিলেন, 'অশিষ্ট মন্দ আচরণকে যদি দয়া দিয়ে পুরস্কৃত করতে হয় তবে দয়াকে পুরস্কৃত করবে তুমি কি দিয়ে? দয়াকেই দয়া দিয়ে পুরস্কৃত করা বিধেয়, অনিষ্টের প্রতিদান ন্যায়-বিচার।'

সত্যকে মানুষের উর্ধ্বে এক মহান জ্যোতির্মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করে কনফুসিয়াস কোন বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন নি। সত্য মানুষের সহচর, কথা-প্রসঙ্গে কনফুসিয়াস বলেন, 'মানুষই সত্যকে মহান করে তোলে, সত্য মানুষকে মহান করে না। যে তথাকথিত সত্য মনুষ্য-স্বভাবকে বর্জন করে প্রকৃতপক্ষে তা সত্যই নয়।' মানব-চরিত্রের মান নির্ধারণ করে মানুষ, মানুষই মানুষের পরিমাপ।

সত্যসন্ধ মানব সত্যকার মনুষ্যত্বের আদর্শ বিধানগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবনযাপন করেন কোন লাভের প্রত্যাশায় নয়, আর সেই আদর্শ-বিরোধী কার্য ঘৃণা করেন কোন দণ্ডের ভয়ে নয়। নৈতিক আদর্শ অনুসারে নিখুঁত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেন না মানুষ দুর্বল এবং ভ্রম প্রমাদ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। সত্যসন্ধ মানব তিনিই যাঁর চরিত্র আদর্শ লোকের কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। অন্যের আচরণ বিচার করতে হয় ঋত-সত্যের নিরালম্ব মানদণ্ড (absolute standard of righteousness) দিয়ে নয়, প্রমাদযুক্ত অথচ সাধু আচরণের যে দৃষ্টান্ত সে নিজে দেখিয়েছে, সেই পরিমাপেই অন্যের কার্য বিচার্য। শ্রেষ্ঠ মানব পরনিন্দা থেকে বিরত থাকে, তার কারণ এই যে সে অনুভব করে তার নিজের কাজ নির্ভুল অনিন্দনীয় বা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, আর যে নিজে ভ্রমশূন্য নয় সে অপরের নিন্দা করবে কোন মুখে? নিন্দা বর্জন যেমন একটি বিধান তেমনই আবার অকারণ কারও প্রশস্তি-কীর্তনও অবিধেয়, মধ্য-পন্থার এই নিয়ম। মধ্য-পন্থার সদাচারী অভিযাত্রী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সংযতবাক্ অকপট ঈর্ষা-দ্বেষহীন, কিন্তু সে কামনা-বর্জিত নয়। তার কামনা উচ্চপদ বা প্রসিদ্ধি লাভ নয়, গুণী ব্যক্তির গুণগ্রাম অর্জন এবং আত্মসন্ধান দ্বারা চরিত্রগত দোষ নির্ণয় করে সেগুলির পরিহারই তার কামনা। শ্রেষ্ঠ মানবের আচরণে যে সব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে, সেগুলি 'সুবর্ণ বিধি' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় কনফুসিয়াস শ্রেষ্ঠ মানবের নয়টি লক্ষণের বর্ণনা করেন: 'চক্ষের ব্যবহার করেন তিনি (শ্রেষ্ঠ মানব) সুস্পষ্ট দৃষ্টিপাতের জন্য। মুখমণ্ডলে উদার মহানুভবতা প্রকাশ করতে আগ্রহশীল তিনি। আচরণে বিনয়ী ও বাক্যে সত্যনিষ্ঠ। তাঁর কাজ-কর্মে বিচক্ষণ সতর্কতা সুপরিস্ফুট। যে-বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে, সেই বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি অন্যের মতামত নির্ধারণে যত্নবান। তিনি যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন ক্রোধ তাঁকে কোন্ বিপর্যয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে, সে-বিষয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিশেষ করে ভেবে দেখেন। লাভজনক কার্যে সাধুতার কথা চিন্তা করেন।'

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল তাঁর নীতি-দর্শনে 'মহামতি মানব' (Megalo Psychos or Great-Minded Man)-এর বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে কনফুসীয় 'শ্রেষ্ঠ মানবে'র বিশেষ সাদৃশ্য আছে মনে হয়। তা ছাড়া আরিস্টটল যে 'সুবর্ণ মধ্য-পন্থা'র বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তারই পুরোধারূপে দেখা যায় কনফুসিয়াসের 'মধ্যপন্থা বিধান' (Doctrine of the Mean)। এই

একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই গ্রন্থে কনফুসীয় প্রবচনের সঙ্গে অনেক টিকাটিপ্পনি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানে আমরা কুনফুসিয়াসের বাণী বলে কথিত এই কথাগুলি শুনতে পাই: 'হর্ষ-প্রীতি-দুঃখ ক্রোধের উচ্ছ্বসিত আবেগ যখন হৃদয়ে অনুভব করা যায় না, মন তখন সাম্যের অবস্থা (state of equilibrium) প্রাপ্ত হয়। আর আবেগ উচ্ছ্বাস যখন প্রকৃতই অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে নয়, প্রত্যেকটি আবেগ-স্পন্দন যখন ঠিক সময়টিতে আত্মপ্রকাশ করে, চিত্তে তখন সুষম অবস্থার (state of harmony) আবির্ভাব হয়। সাম্যাবস্থা বিশ্বপ্রকৃতির ভিত্তিমূল, আর তার সার্বজনীন পথের নির্দেশ দেয় সুষম অবস্থা। সাম্য ও সুষম অবস্থা লাভের ফলে স্বর্গ ও পৃথিবী স্বস্থানে বিরাজ করে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পুষ্টিলাভ করে।'

চিত্তবৃত্তির সাম্য ও সুষম অবস্থার সন্ধান মধ্য-পন্থা অভিযাত্রীর প্রধান কার্য, কিন্তু এই কার্যে শিক্ষালাভের উপযোগী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক নয়। কনফুসিয়াস বলেন, 'সুবর্ণ মধ্য-পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। তাই শিক্ষাদানের জন্য আমাকে কাজ করতে হয় দুই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, এক শ্রেণীর মানুষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিন্তু হঠকারী, অপর শ্রেণীর মানুষ স্থূলবুদ্ধি কিন্তু সতর্ক স্বভাব। তীক্ষ্ণবুদ্ধি হঠকারী মানুষ চঞ্চল-মতি, সর্বদাই প্রস্তুত এগিয়ে চলবার জন্য, আর স্থূলবুদ্ধি সতর্ক মানুষ একটি স্থাণুবিশেষ, সব সময়ে পিছনে পড়ে থাকাই তার স্বভাব।' এই দুই প্রকৃতির মানুষের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, এই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, 'শুধু বিদ্যার্জনই যথেষ্ট নয়, পণ্ডিত হবেন ভদ্র-পণ্ডিত। আচরণের সৌষ্ঠব অপেক্ষা যার গুণের ওজন বেশী, তাকে অমার্জিত বলেই মনে হয়, আবার গুণধর্ম অপেক্ষা যার বাহ্য চটক বেশী তাকে মনে হয় চটুল প্রকৃতির হালকা মানুষ বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে গুণীর গুণ আর মার্জিত রুচির সৌষ্ঠব সমভাবে মিশ্রিত তিনিই প্রকৃত ভদ্রলোক।' চীনা সমাজে তখন 'চুন জু' বা ভদ্রলোক এবং 'সিয়াও-জেন' বা ছোটলোক, এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিল, অভিজাতবর্গ ছিলেন ভদ্রলোক আর সাধারণ ব্যক্তিরা ছিল ছোটলোক। চুন-জুদের পরম শ্রদ্ধা করতেন কনফুসিয়াস, আর সিয়াও-জেনদের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। তিনি বলতেন, 'চুন জু-দের মন ধর্মভাবে পূর্ণ থাকে আর সিয়াও-জেনরা শুধু লাভের কথা ভাবে।' সম্রাট সামন্তবর্গ ভদ্রলোক কৃষক ও শ্রমিকেরা সকলেই স্ব স্ব কর্মে রত থাকবে, একে অন্যের স্থান অধিকার করবে না, অন্যথায় সামাজিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা। কনফুসিয়াসের এই নির্দেশটির মধ্যে বর্ণাশ্রম কল্পনার অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু এ কথা

অনস্বীকার্য যে চীনদেশে জাতি-ভেদ প্রথা কোনকালেই দানা বেঁধে ওঠে নি। চুন-জু ও শাসক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য 'জেন' বা প্রেম-ধর্ম, কনফুসীয় দর্শন ভদ্রলোককে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে। ভদ্র ব্যক্তির নীতিবাদ অর্থে কনফুসীয় দর্শনকে 'জু' (Ju) দর্শন বলা হয়।

'মহাবিদ্যা' ('The Great Learning') গ্রন্থটি অ্যানালেক্টের মতই মহাপ্রভুর আর একটি প্রবচন সংগ্রহ। কনফুসিয়াসের পৌত্র জু-স্যু-কে এই গ্রন্থেরও রচয়িতা বলা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। গ্রন্থে ন্যায়-শাস্ত্রের যুক্তির বাঁধন দেখে পরবর্তী কালের রচনা বলেই অনেকের অনুমান। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন, সে-যুগের তাবৎ বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে নৈতিক বিপর্যয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি জনগণের অশ্রদ্ধা, ভাল-মন্দের বিচারে অক্ষমতা। এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে প্রয়োজন, জ্ঞানের সন্ধান-প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, পারিবারিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চরিত্র গঠন। মহাবিদ্যা প্রস্তাবে মানুষ কিরূপে মহৎ গুণ অর্জন করে পরম শ্রেয়ের অধিকারী হতে পারে, সেই বিষয়টি বোঝাবার জন্য কনফুসিয়াস ধাপে ধাপে যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রাচীনকালে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন মহৎ গুণের বিশ্বময় প্রসার কামনা করতেন, তাঁরা তখন নিজেদের রাষ্ট্রের সুষ্ঠু প্রশাসন-কার্যে মন দিতেন। রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা-কল্পে, পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা হত তাঁদের প্রথম উদ্যোগ। পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে তাঁরা আত্মচর্চা করতেন। আত্মচর্চাকল্পে তাঁরা চিত্তশুদ্ধি করতেন। চিত্তশুদ্ধিকল্পে তারা চিন্তায় সততা অভ্যাস করতেন। চিন্তায় সততা অভ্যাসকল্পে তাঁরা জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করতেন, বস্তু-সন্ধান দ্বারা।' এই কার্যক্রমের ক্রিয়া ঘুরে গিয়ে আবার রাষ্ট্রের সুশাসনে পর্যবসিত হয় এইরূপে: বস্তু-সন্ধান থেকে জন্মে পূর্ণতর জ্ঞান, সেই জ্ঞান থেকে চিন্তার সততা, সেই সততা থেকে চিত্তশুদ্ধি, সেই শুদ্ধি থেকে আত্মচর্চা, সেই চর্চা থেকে পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ, সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে রাষ্ট্রের সুশাসন। রাষ্ট্রসমূহ সুশাসিত হলে সারা জগতে শান্তি বিরাজ করে।

নীতিধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংমিশ্রণ জু বা কনফুসীয় দর্শনের পরম সার্থকতা। পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র, তিন রকমের তিনটি সমষ্টিজীবন, কিন্তু সকলেই এক সূত্রে বাঁধা, একটি অন্যটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। কনফুসিয়াস বলেন, 'বিজ্ঞতার সূত্রপাত আপন গৃহে। সুশৃঙ্খল পরিবারমধ্যে নিয়মানুগ ব্যক্তির ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত।' সন্তান পিতা মাতার ও স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগত না হয় তবে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য। এই আনুগত্যই পরম ধর্ম, কিন্তু নৈতিক বিধানের নির্দেশ পালন আনুগত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। নীতি সম্বন্ধে পুত্র পিতাকে বিনীত ভাবে উপদেশ দেবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পিতা যদি নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করতে উদ্যত হয় তবে পুত্র তাঁকে অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পিতার কর্মের প্রতিবাদ করবে। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে রাজা ও মন্ত্রীর সম্বন্ধের বেলায়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য। দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারী রাজা যদি মন্ত্রীর সুপরামর্শ গ্রহণ না করে তবে মন্ত্রী পদত্যাগ করবে। বলা বাহুল্য, কনফুসিয়াস একজন উগ্র রকমের রক্ষণপন্থী, প্রাচীন ঐতিহ্যের উপাসক, বিপ্লবকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে, রাষ্ট্রশক্তির মূলাধার প্রজাসাধারণ, তাই শাসকের ওপর প্রজার আস্থা না থাকলে রাজ্যের পতন নিশ্চিত বলেই ধরা যেতে পারে। কনফুসিয়াসের ওই মত অবলম্বন করে তার শিষ্য মেনসিয়াস প্রচার করেছিলেন যে, বিপ্লব প্রজাদের একটি দেব-দত্ত পবিত্র অধিকার।

কনফুসিয়াস বলেন, 'যদি প্রশাসন ব্যবস্থা দ্বারা জনগণকে পরিচালিত এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রিত করা হয় তা হলে তারা কারাগারের বাইরে থাকবার চেষ্টা করবে বটে কিন্তু তাদের কোন সম্মান বা লজ্জা বোধ থাকবে না। আর যদি তাদের ধর্মনিষ্ঠ শিক্ষা দ্বারা 'লি' অর্থাৎ নীতির আদর্শ পথে পরিচালিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত করা হয় তবে তারা কখনও আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে না।' শাসকের চারিত্রিক সততা থাকলে তবেই সুশাসন সম্ভব, সাধু আচরণের দৃষ্টান্ত প্রশাসন সৌকর্যের প্রকৃষ্ট উপায়। কনফুসিয়াস বলেন, 'যে ধর্মনিষ্ঠ রাজা নীতি-সম্মত বিধান মত শাসনকার্য পরিচালনা করেন, ধ্রুবতারার মত তিনি অবিচলিত ভাবে স্বস্থানে বিরাজ করেন, অন্যান্য নক্ষত্ররাজি তাঁর চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে।'

কনফুসীয় দর্শন ধর্ম-তত্ত্বের আলোচনা থেকে বিরত ছিল বটে, কিন্তু কনফুসিয়াস আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মকে বর্জন করেন নি। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে পর্বতচূড়ায় উঠে রাজা নির্জনে পরমপুরুষ (Supreme Being) স্যাং-তির আরাধনা করবেন, স্যাং পূজার অধিকারী একমাত্র 'স্বর্গপুত্র' অর্থাৎ নৃপতি। সর্বসাধারণের জন্য মন্দির সমূহে পিতৃপূজার (ancestor-worship) চিরন্তন ব্যবস্থা। কনফুসিয়াস ওই সব প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান পুরোপুরি বজায় রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন কালের মহাপুরুষেরা যে-সব ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানাদি করে গেছেন, সেগুলি সকলেরই করণীয়, তাঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে চলা সকলেরই কর্তব্য, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। পরমার্থ বিষয়ে যেমন তেমনই নীতিবাদ বা রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি কোন সুসম্বদ্ধ দার্শনিকতার অবতারণা করেন নি। আলাপ-আলোচনায় শিষ্যদের চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করবার জন্য তিনি ন্যায়শাস্ত্রের জটিল তর্কজাল বয়ন করেন নি, তিনি দিয়েছেন এই শিক্ষা যে সাধু চিন্তার সরল প্রকাশই যুক্তির পরম

সহায়। 'ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আগ্রহের একান্ত অভাব দেখে অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন, কনফুসিয়াস ছিলেন agnostic বা অজ্ঞেয়বাদী। প্রজ্ঞা কী, ফা চের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে আত্মনিয়োগ এবং আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে থাকাই প্রজ্ঞা।' কিন্তু এই মতবাদ সত্ত্বেও জগৎ মধ্যে তিনি একত্ব ও সুষম সমন্বয়ের সন্ধান, জগত-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির সমন্বয়ের সন্ধান করেছেন, বলেছেন, 'আমি সর্বাত্মক একত্বের সন্ধান করি।' এই একত্বের সন্ধানী হিসাবে তিনি একজন প্রকৃত দার্শনিক।

পরিশেষে কনফুসীয় নীতিবাদের প্রভাব ও ফলাফলের মূল্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে হয়। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এক বিষম সংকটকালে, জাতির নৈতিক অবনতির প্রতিবাদ রূপেই কনফুসিয়াস তাঁর শিক্ষা প্রচার করেছিলেন। যে-যুগে পিতার প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা, এমন কি পিতৃ-হত্যার দৃষ্টান্তেরও অভাব ছিল না, কনফুসিয়াস তখন পিতৃভক্তির আদর্শকে মর্যাদা দান করেছিলেন। যে-যুগে রাজার অত্যাচার, প্রজার অনাচার দেশময় অরাজকতার তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল, যখন রাজা আর প্রজা-দরদী নয় প্রজা আর রাজভক্ত নয়, তিনি তখন প্রচার করেছেন রাজ-ধর্ম প্রজা-ধর্ম। যে-যুগে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান লোপ পেয়েছিল, ব্যভিচার কদাচারে জাতীয় জীবন কলুষিত হয়ে উঠেছিল, তিনি তখন অতীত 'স্বর্ণযুগে'র আদর্শে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন। তাঁর এই সাধু উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল তাঁর জীবন কালে নয়, মৃত্যুর পর। প্রভুর মৃত্যুর পর তাঁর নীতিবাদের অক্লান্ত প্রচার করেছিল শিষ্যরা দীর্ঘকাল ধরে, দেশের নানা স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল, সেগুলি সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। নানা ভাষ্যকারের আবির্ভাব হয়েছিল, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ছিলেন মেং কো বা মেনসিয়াস, তাঁর বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। কনফুসীয় নীতি-শাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতেরা ছিলেন সমাজপতি, রাষ্ট্রের শাসক ; জাতির জীবনকে তাঁরা এমন একটি ছাঁচে-গড়া আকারে পরিপাটি রূপসজ্জায় ভূষিত করতে পেরেছিলেন যে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন কত রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিরাগত সূত্র-ধারাটির ছেদ কখনও ঘটে নি। চীনা জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল এই রক্ষণধর্মী নীতি-দর্শন, জাতিকে দিয়েছিল মর্যাদা, ব্যক্তিকে গাম্ভীর্য, সমাজকে শৃঙ্খলা। জ্ঞানের চর্চা, বিদ্যার প্রতি পরম অনুরাগ চীনের সভ্যতাকে এমন একটি জ্যোতির্ময় গৌরব-মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার সামনে দুর্ধর্ষ বিজেতার মাথাও শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ত, তারা তখন নিজেদের অমার্জিত অভ্যাস রুচি পরিত্যাগ করে চীনা সংস্কৃতিকে সাদরে বরণ করে নিত।

কিন্তু 'জু' দর্শনের উপরোক্ত গুণ বর্ণনা কনফুসীয় চিন্তার একটি বর্ণোজ্জ্বল সোনালী দিক, তার একটি মসীকৃষ্ণ দিকও যে না আছে তা নয়। অরাজক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে নীতিধর্মের জন্ম, সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা স্থাপন যে-নীতির উদ্দেশ্য, সেই অবস্থা মত ব্যবস্থাকে একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন রূপে না দেখে শাশ্বত বস্তু বলে গ্রহণ করলে নানা জটিলতার উদ্ভব হয়, এমন কি জাতির প্রগতির পথও সেই সনাতন বিধানের চাপে রুদ্ধ হয়ে যায়। পরিণামে চীনের অদৃষ্টেও সেই অবস্থাই ঘটেছিল। সমাজ ও ব্যক্তিকে আচার-অনুষ্ঠানের কৃত্রিম বাঁধনে বেঁধে দিয়ে এমন একটি নৈতিক যান্ত্রিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে তার সংকীর্ণ পরিসর-মধ্যে মানবীয় কোমল বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক স্ফুরণের অবসর ছিল না। নারীকে এই নীতি সমাজে তার যোগ্য স্থান দেয় নি, সারাটা কাল ধরে চীনদেশে স্ত্রীজাতি ছিল অবনমিতা। ভদ্রলোকদের কায়িক পরিশ্রম নিষিদ্ধ করে ভদ্র শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে তোলা হয়েছিল, এরূপ উচ্চ-নীচের ব্যবধান সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী। প্রাচীনের প্রতি আসক্তি শুধু নয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীন কর্মপদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ নবযুগের পরিবর্তিত অবস্থায় নূতন পথে অভিযানের আগ্রহকে সমূলে বিনষ্ট করেছিল। জাতির চেতনাকে এমন একটি জড়পিণ্ড করে তুলেছিল এই স্থবির নীতি-দর্শন যে চীনের বুকের ওপর বসে পাশ্চাত্ত্য জাতিপুঞ্জ যখন নানা উপদ্রব জুড়ে দিয়েছে, পাশ্চাত্ত্যের সংঘাতে প্রতিবেশী জাপান যখন নূতন জীবন লাভ করেছে, পদে পদে চীন অপদস্থ, সে সব দেখেও চীন তার আদর্শ-লোকের হস্তিদন্তের প্রাসাদচূড়া ছেড়ে বাস্তবক্ষেত্রে অবতরণ করে নি, নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দ্বারা প্রাচীন সংস্কার বা চিরকালের অভ্যাসের পরিবর্তন করে নি। বিংশ শতাব্দীর চীনা বিপ্লব, যার চূড়ান্ত পরিণতি কমিউনিস্ট শাসন রূপেই এখন দেখা দিয়েছে, দীর্ঘকালের অবসানে বিপ্লবের স্থূল হস্ত প্রতিক্রিয়ার প্রাচীন জড়ভরতকে ভূমিসাত করে দিয়েছে, তার সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখন আর কনফুসিয়াসের ছায়াটিকেও খুঁজে পাবার জো নেই। কিন্তু কি আন্তর্জাতিক ডামাডোল কি চীনের ধূলি-আবরণ, এই সব বিস্ময়কর নূতন অবস্থার মধ্যেও এ কথাটি ভুলে যাওয়া সঙ্গত হবে না যে, এই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত এমন বাণী আছে প্রচুর, আধুনিক জ্ঞানের আলোকে যার মূল্য অসামান্য, এবং যা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলে মানুষের নৈতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

কবিমানসী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু আশ্রমজননী-রূপে অপত্য-নির্বিশেষে সব ছেলের মা হবার মহৎ সাধনায় চোখের জলের মধ্য দিয়েই তাঁর দীক্ষা পূর্ণ হল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর মাতৃস্নেহ দিয়ে তিনি বোলপুরের রুক্ষ পরিবেশকে সুধাশ্যামল করে রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কবি এদিক দিয়েও তাঁর অভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে বলতেন, 'আমি ছেলেদের সব দিতে পারি, মাতৃস্নেহ তো দিতে পারি না। রথীর মা সে-বিষয়ে আমাকে অসহায় করে রেখে গেছেন।'

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষাতেই মৃণালিনী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি প্রথম প্রথম নিজেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু যখন তাঁর অবস্থা ক্রমশই মন্দের দিকে যেতে লাগল তখন তাঁকে কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হল। সেখানে কবিপ্রিয়া প্রায় দু মাস শেষশয্যায় ছিলেন। কবি তাঁর দাম্পত্যজীবনকে শরৎ ঋতুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তাঁর সংসার-জীবনের শেষ শরৎ কাটল শারদলক্ষ্মীর অন্তিম সেবায়। এ সম্পর্কে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পবিত্রসুন্দর বর্ণনাটি অনবদ্য। তিনি লিখছেন, 'রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া কবি এই দীর্ঘকাল পীড়িত পত্নীর যেরূপে সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যবতী আয়ুষ্মতীর ভাগ্যে সম্ভব হয়। অর্থ বিনিময় সেবাকারিণীর অসদ্ভাব তখন না হইলেও তাদৃশ অবস্থায় পাছে কোন ত্রুটিতে রোগিণীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পায় এই সন্দেহেই জীবনান্ত পর্যন্ত কবি পত্নীর সেবাশুশ্রূষা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈদ্যুতিক পাখা তখন ছিল না, হাতপাখার বাতাসে দিনের পর দিন কবি রোগিণীর রোগজ্বালা প্রশমিত করিয়াছিলেন। পতি পত্নীর প্রণয়বন্ধনের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত জীবনান্ত পর্যন্ত কবির এই অক্লান্ত সেবা।'[১১]

পরমশান্ত মহাযোগীর মতই কবি তাঁর জীবনসঙ্গিনীর শেষকৃত্য করলেন। রথীন্দ্রনাথ লিখছেন, শেষবার যখন মায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি কথাবলতে পারছিলেন না, শুধু তাঁর দু চোখ বেয়ে চোখের জলের ধারা নেমেছিল।

৯

রবীন্দ্র-জীবনে মৃণালিনী দেবীর যথাযোগ্য মূল্যনিরূপণ সহজসাধ্য নয়। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বাস-হীনতার ফলে এ বিষয়ে ভুলভ্রান্তি হওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু কবিমানসের একটি সংকটলগ্নে তাঁর জীবনে এসেছিলেন এই কল্যাণী নারীলক্ষ্মী। বিবাহের মাস চার পরেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুতে কবিজীবনের ভারসাম্য কিভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল সেকথা 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক কবিকণ্ঠেই শুনেছেন। মৃত্যুর অন্ধকার-রাজ্যে ঐকান্তিক আবেগবিহ্বলতায় সেদিন কবির পক্ষে উৎকেন্দ্রিক হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। সেই মহাসংকটে মৃণালিনী দেবী জায়ারূপে তাঁর নারীচিত্তের লাবণ্য ও সঙ্গসুধা দিয়ে কবিজীবনের ভারসাম্যকে অবিচলিত ও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর সর্বংসহা ক্ষমা ও তিতিক্ষা, তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম ও সেবা দিয়ে তিনি কবির চিত্তকে জয় করেছিলেন। কবিমানসের রাজধানীতে রানীর আসন পেয়েছিলেন তিনি। 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থে কবি লিখেছেন, 'মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবন-বৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর, মহৎ-নারীর ইতিহাস···তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইয়া থাকে, এবং সে-লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না।' কবির এই উক্তির আলোকেই তাঁর জীবনে মৃণালিনী দেবীর স্থান নির্ণয় করা সমীচীন। কবিজায়া শুধু মিলনের সুধা দিয়েই তাঁর জীবনের পাত্র পূর্ণ করে যান নি; তিনিই হাত ধরে তাঁকে সংসার-জীবনের সংকীর্ণ সীমানা থেকে বিশ্বজীবনের উন্মুক্ত মহাকাশের অসীমতায় পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

পত্নীর মৃত্যুর পরে কবি তাঁর অনুচ্ছ্বসিত ভাষায় এখানে-সেখানে যে দু-একটি কথা বলেছেন তাতে জীবন-সঙ্গিনী সম্পর্কে তাঁর প্রেমপূর্ণ অন্তরের স্নিগ্ধ লাবণ্যই বিচ্ছুরিত হয়েছে। 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি শেষ করে কবি বলেছেন, 'এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়। শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনাপূর্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম।' মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা আর একখানি চিঠিতে কবি লিখেছেন, [শিশু-কাব্যে বর্ণিত] 'খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষমাধুরী—তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্তী সম্রাট ছিল সেইজন্যে লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মত নানা রঙে রাঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে—তাকে নিবারণ করতে পারি নে।'

গৃহস্মৃতির অস্তমিত মাধুরীর কিরণ ও বর্ণ আকর্ষণ করে কবির অশ্রুবাষ্প মুক্তোর মত দানা বেঁধে উঠেছে 'স্মরণে'র কবিতায়। কিন্তু মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কবি "মুক্ত পাখির প্রতি" শীর্ষক যে কবিতাটি লিখেছিলেন সেটিই প্রিয়ার দেহপিঞ্জরমুক্ত আত্মার উদ্দেশে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যতর্পণ। ১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কাব্যাংশে কবিতাটি অনবদ্য। কবিতা যদি কবিচিত্তের দর্পণ হয় তা হলে এই কবিতাটি পত্নীবিয়োগব্যথাতুর

কবিচিত্তের মর্মান্তিক বেদনার প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে চিরন্তন হয়ে থাকবে :—

আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে, ওগো,
দিক্-দিগন্ত ঢাকি।—
আজিকে আমরা কাঁদিয়া শুধাই সঘনে ওগো,
আমরা খাঁচার পাখি,—
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি কি আসিল প্রলয় রাত্রি ঘোর ?
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া ?
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে
কোথা কিছু নাহি বাকি ?—
তোমা পানে চাই, কাঁদিয়া শুধাই
আমরা খাঁচার পাখি।

ফাল্গুন এলে সহসা দখিন পবন হতে
মাঝে মাঝে রহি রহি
আসিত সুবাস সুদূর কুঞ্জভবন হতে
অপূর্ব আশা বহি।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
মাঝে মাঝে যবে রজনী হইত ভোর,
কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুখ নাশিয়া
খাঁচার কোণেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসি-আঁকা লোহার শলাকা
সোনার সুধায় মাখি।
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে
আমরা খাঁচার পাখি।

আজি দেখো ওই পূর্ব-অচলে চাহিয়া, হোথা
কিছুই না যায় দেখা,—
আজি কোনো দিকে তিমিরপ্রান্ত দাহিয়া, হোথা
পড়েনি সোনার রেখা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
আজি শৃঙ্খল বাজে অতি সুকঠোর।
আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে
কার সন্ধান করি অন্তরে-বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি
আমরা খাঁচার পাখি।

ওগো আমাদের এই ভয়াতুর বেদনা যেন
তোমারে না দেয় ব্যথা।
পিঞ্জরদ্বারে বসিয়া তুমিও কেঁদো না যেন
লয়ে বৃথা আকুলতা।
হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর,
তোমার চরণে নাহিতো লৌহডোর
সকল মেঘের ঊর্ধ্বে যাও গো উড়িয়া,
সেথা ঢালো তান বিমল শূন্য জুড়িয়া,—
"নেবেনি, নেবেনি প্রভাতের রবি"
কহ আমাদের ডাকি,
মুদিয়া নয়ান শুনি সেই গান
আমরা খাঁচার পাখি।[১২]

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ. ৬০৪।
২ তদেব, পৃ. ৬০৬।
৩ চিঠিপত্র-১, পৃ. ৪-৫।
৪ তদেব, পৃ. ১৯।
৫ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১, পৃ. ৬১৮।
৬ চিঠিপত্র-১, পৃ. ৯১।
৭ ছিন্নপত্র, পৃ. ২১২।
৮ দ্রষ্টব্য, সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ, শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী, পৃ. ২৭-২৮।
৯ দ্রষ্টব্য, কবির কথা, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৫-১৬।
১০ দ্রষ্টব্য, On the Edges of Time, পৃ. ৩২।
১১ কবির কথা, পৃ. ২২-২৩।
১২ মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থাবলীতে এই কবিতাটি 'রূপক' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর প্রেরণার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। মোহিতলাল তাঁর কাব্যমঞ্জুষায় এর উৎসমূলে পরাধীনতার বন্ধনজ্বালার কল্পনা করেছেন। আমরাও অন্যত্র এর উৎস সম্পর্কে অন্য মত প্রকাশ করেছি। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমতই এ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী—২, পৃ. ৪৪-৪৫।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩১শ বর্ষ
২য় সংখ্যা

পরিষদের চিঠি

অগ্রহায়ণ
১৩৬৫

সংবাদ-সাহিত্য

আধুনিক জড়বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের শীতাতপ-পীড়িত বায়ুমণ্ডল এবং তদূর্ধ্ব শীতাতপনিরপেক্ষ স্ট্রাটোস্ফিয়ার ভেদ করিয়া পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ-উপগ্রহকে যতই ছুঁই-ছুঁই করুক, বৈজ্ঞানিকদের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরতম যে বস্তুটি মানুষ নামে অভিহিত তাহার সকল রহস্য তাঁহারা এখনও উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে মানুষের রহস্য ততই ঘনীভূত হইয়া চলিয়াছে। নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯১২) বিখ্যাত ফরাসী অস্ত্রচিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী অ্যালেক্সিস ক্যারেল (১৮৭৩-১৯৪৪) তাঁহার 'ম্যান দি আননোন' গ্রন্থে (১৯৩৫) স্পষ্টতঃই স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা মানুষের অস্থি মজ্জা শিরা উপশিরা রক্তমাংস প্রাণকোষ প্রভৃতির সংখ্যা সংস্থান ও পরিমাণ নিঃসংশয়রূপে অবগত হইয়াছি কিন্তু মানুষের আসল সত্তা কী ও কোথায় তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। তিনি স্বয়ং মানুষের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রক্তস্থলী পর্যন্ত 'আলিবাবা'র বাবা মুস্তাফার মত সেলাইয়ের দ্বারা মেরামত করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছিলেন; মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, এক দেহ হইতে অন্য দেহে স্থানান্তরিত করিয়া কলমের গাছের মত জোড়া দিতে পারিতেন; জীবের হৃদ্‌পিণ্ডকোষ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও লালন করিয়া বহু বৎসর জীবিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার বিজ্ঞান-বীক্ষণে 'ম্যান' অজ্ঞাতই (unknown) রহিয়া গিয়াছে। পৃথিবীখ্যাত চিকিৎসক কেনেথ ওয়াকারও যে চরম বিশ্লেষণের দ্বারা মানুষকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাঁহার 'ডায়াগনোসিস অব ম্যান' গ্রন্থে তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকান মনোবৈজ্ঞানিক জোসেফ ব্যাঙ্কস্ রাইন (১৮৯৫—) তাই পরলোকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিয়া মানুষের রহস্য সন্ধানে তৎপর হইয়াছেন।

এ সকলই হইল আমাদের এই কালের কথা। ইংলণ্ডীয় পদার্থবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী সার্ জেম্‌স হপউড জীন্‌সকেও এ যুগের লোক বলিতে পারি। ১৮৭৭ সনে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি সুদূর এবং অনন্ত নভোমণ্ডলের বিচিত্র সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের কালের মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও মানুষ-সম্পর্কিত চিরন্তন প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়া পান নাই; ইংলণ্ডীয় পদার্থবিদ ও রাসায়নিক সার্ উইলিয়ম ক্রুক্‌স (১৮৩২-১৯১৯), পদার্থবিদ্ সার্ অলিভার লজ (১৮৫১-১৯৪০) এবং জ্যোতিষী সার্ আর্থার স্ট্যান্‌লি এডিংটনের (১৮৮২-১৯৪৪) মত পরলোক-তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া সকল জিজ্ঞাসার বিলোপসাধন করিতে চাহিয়াছেন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকায় পরাজিত বৈজ্ঞানিকদের যে মানসিক পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে, রাশিয়াতে তাহা ঘটিতে দেওয়া হয় নাই। বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হইতে রাশিয়া দেবাদিদেব কার্ল মার্ক্সকে চালচিত্রের মাথায় তুলিয়া রাখিয়া দ্বান্দ্বিক জড়বাদের শাণিত তরবারি-খেলা দেখাইয়া চলিয়াছে। তাই একদিকে যেমন প্রাক্-বিপ্লব-যুগের শেষ সাহিত্যনায়ক অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পায়াসকফ(ম্যাক্সিম গর্কি)-কে স্বভাবতঃ শান্তিবাদী

হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার গৃহীত নামের তীব্রতা-তিক্ততা (গকি শব্দের অর্থ তিক্ত, তীব্র) বিপ্লবের সমর্থনেই বজায় রাখিতে হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনই উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ আইভান পেট্রোভিচ পাভলফকেও (নোবেল-পুরস্কার ১৯০৪) হৃৎপিণ্ড-বিশ্লেষণ ও গ্রন্থিক্ষরণ (secretion of the glands) সংক্রান্ত গবেষণা লইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হইয়াছে, কুকুরের 'কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্স'-এর সঙ্গেই তাঁহার নামের মহিমা চিরতরে যুক্ত থাকিয়া গিয়াছে। মানব-জীবন-রহস্য বিষয়ে গভীরতর চিন্তা তাঁহাকে করিতে দেওয়া হয় নাই। গকির জন্ম ১৮৬৮ সনে, পাভলফের ১৮৪০ সনে। তাঁহারা উভয়েই টলস্টয়-টুর্গেনিভ ডস্টয়ভস্কি-শেখভের যুগের মানুষ, আত্মদর্শন ও আত্মচিন্তা এই যুগের বৈশিষ্ট্য। অথচ দুজনেই যুগধর্মকে বিসর্জন দিয়া পরবর্তীকালের রাষ্ট্রচিন্তাকেই আশ্রয় করিয়া জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন। স্টালিনকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চরমতম গৌরবে অধিষ্ঠিত দেখার পর ১৯৩৬ সনেই উভয়ের দেহান্ত ঘটিয়াছিল।

কাজেই পরবর্তী কবি-ঔপন্যাসিক বোরিস পাস্তের-নাকের সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো' যদি স্বদেশে নিন্দিত হইয়া থাকে, তাহা এমন কিছু অন্যায় হয় নাই। রাশিয়া যাহা চেষ্টা করিয়া বর্জন করিতে চাহিতেছে—আধ্যাত্মিকতা ও ধর্ম—বইখানিতে তাহা ওতপ্রোত হইয়া আছে। লেখকের মতে আমাদের প্রত্যক্ষ ইহজগৎ মানুষের পক্ষে সর্বস্ব নয়, অপ্রত্যক্ষ আরও কিছু তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন। নায়ক ডক্টর জিভাগোর মনে এই অপ্রত্যক্ষের আগ্রহ জাগাইয়াছেন তাহার বাইবেলে-বিশ্বাসী মামা, এবং টলস্টয়পন্থী মাতুলবন্ধু। নায়কের কবি-মন এই চিন্তাকে লালন করিয়াছে। প্রসূতি-আগারের একটি দৃশ্য-বর্ণনায় এই কবি-মনের পরিচয় আমরা পাইতেছি :

ডাক্তার-পত্নী প্রসূতি-হাসপাতালে প্রথম সন্তান প্রসব করিয়াছে। স্বয়ং ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ জিভাগো স্ত্রী-সন্তানকে দেখিবার জন্য আগ্রহে অধীর। প্রসূতি-হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ হঠাৎ বিপদাশঙ্কায় তাহাকে কঠোর ভাবে নিবারণ করিয়াছেন। দরজার অন্তরাল হইতে জিভাগো শায়িত পত্নীকে দেখিতেছে। হাঁটু দুটি উঁচু করিয়া ধরা, গলা পর্যন্ত একটা চাদর দিয়া ঢাকা। জিভাগোর মনে হইল—যেন একটি ক্ষুদ্র অর্ণবপোত; অজ্ঞাতলোক হইতে মাল বহন করিয়া আনিয়া তাহা খালাস করিয়া বন্দরে বিশ্রাম করিতেছে। আবার তাহাকে যাইতে হইবে। আবার জীবন-সম্ভার বহন করিয়া অজ্ঞাতলোক হইতে জানা-বন্দরে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু আপাততঃ সে অজ্ঞাতলোকের কথা যেন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে।

এই বর্ণনা আমাদের কাছে যতই মনোরম, যতই অপূর্ব ঠেকুক, কঠোর জড়বাদী ইহাতে ভুলিবে না। যাহারা স্পুটনিক-রকেটের সাহায্যে চন্দ্র-মঙ্গলের শান্তি বিঘ্নিত করিতে চলিয়াছে তাহারা অজ্ঞাত-অজানার ধার ধারিবে কেন? যাহা একান্ত জৈব নিয়মাধীন তাহাকে লইয়া এত কাব্য বরদাস্ত করিবে কেন? 'কণ্ডিশন্‌ড্‌ রিফ্লেক্সে' যে চিরন্তন ক্ষুধা লালায়িত হয় তাহার মধ্যে দুজ্ঞেয়ের মহিমা কোথায়!

শুধু এই ধরনের অতি-ভাবণই নয়, বোরিস পাস্তেরনাক প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ১৯১৭-র বিপ্লবকে সমুহ মর্যাদা দেন নাই। এই অপরাধ শুধু তাঁহার একার নয়। জেনারেল পি. এন. ক্রাসনফ তাঁহার 'দি আনফরগিভ্‌ন্‌' উপন্যাসে (১৯২৮), ফিয়ডর ভ্যাসিলিভিচ গ্লাডকভ তাঁহার 'সিমেণ্ট' উপন্যাসে (১৯২৯), জোসেফ ক্যাল্লিনিকভ তাঁহার 'উইমেন আণ্ড মংক্স' উপন্যাসে (১৯৩১) সতেরোর বিপ্লবকে স্ফীতগৌরবে দেখান নাই। অন্যে পরে কা কথা, 'ডক্টর জিভাগো' গ্রন্থের সর্বাধিক নিন্দাকারী মিখাইল শোলোকভকেও তাঁহার 'দি কোয়ায়েট ডনে'র বিপ্লব-অমর্যাদার প্রায়শ্চিত্ত 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড' লিখিয়া করিতে হইয়াছে। ওয়াকিবহাল ব্যক্তিরা ফেডর প্যানফেরভের ১৯৩০ সনে প্রকাশিত 'ব্রাসকি' উপন্যাসের ১৯৩৪ সনে যে দুর্গতি ঘটিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহা অবগত আছেন।

সুতরাং রাশিয়ার বাহিরে বসিয়া পাস্তেরনাকের প্রতি সহানুভূতিতে বন্যজোয়ার ছোটাইয়া কোনই ফায়দা নাই, আমরা শুধু তাঁহার পক্ষে সুদিনের প্রতীক্ষা মাত্র করিতে পারি। কামনা করিতে পারি, স্পুটনিক-রকেট অজ্ঞাত শূন্যে বারংবার প্রতিহত হইয়া ভূতলে জন্মমাত্রে

পর্যবসিত হইতেছে এবং পাভলফীয় 'কণ্ডিশনড্ রিফ্লেক্স' মানবজীবনের রহস্য আবিষ্কারে বার বার ব্যর্থ ও পরাজিত হইয়া রুশ দার্শনিকদের আবার অজ্ঞাতের দ্বারে ধরনা দিতে প্ররোচিত করিতেছে। 'ডক্টর জিভাগো' হয়তো তখন মর্যাদালাভ করিবে।

—

গত ১১ই ডিসেম্বরের 'যুগান্তর' দৈনিকের "গ্রন্থবার্তা" বিভাগে ঐতিহাসিক আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবীর সদ্য-প্রকাশিত ভ্রমণ-গ্রন্থ 'ইস্ট টু ওয়েস্টে'র "বিশের প্রতিনিধি লিখিত" আলোচনা হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"টয়েনবী ভারত বিভাগকে অযৌক্তিক বলে মনে করেন। স্বাধীনতা পেয়ে ভারত দেশীয় রাজ্যের দ্বীপগুলি দূর করে যে ভাবে দেশের সংহতি বৃদ্ধি করেছে তা প্রশংসার যোগ্য। ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও এর বিপদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকা উচিত। হিন্দী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি ভাষা কেন্দ্র করে যদি নতুন সত্তা জেগে ওঠে তা হলে ভারতীয় হিসাবে বৃহত্তর সত্তা ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা আছে। পূর্ব-য়ুরোপের শোচনীয় পরিণতির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

স্বাধীনতালাভের পর থেকে ক্ষমতালাভের লড়াই শুরু হয়েছে। এ সংগ্রামে বাঙালীর কলম বা মারাঠীর শৌর্য জয়লাভ করতে পারবে না। মুসলমান সাম্রাজ্য অবসানের পর বাঙালী তার কলমের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু 'The twentieth-century winner is the Gujerati with his business sense. The Gujerati industrialist is, in fact, the British sahib's principal heir ; and Bengal, with her wings broken by partition, may resign herself to being eclipsed.' "

ইংরেজী অংশের অনুবাদ এই :—"বিংশ শতাব্দীতে গুজরাটীরা তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধিগুণে বিজয়ী হইয়াছে। গুজরাটের শিল্পপতিরাই প্রকৃতপক্ষে এখন ব্রিটিশ সাহেবদের আসল উত্তরাধিকারী; এবং দেশবিভাগের ফলে ভগ্নপক্ষ বাংলাদেশকে রাহুগ্রস্ত হইবার অপেক্ষায় বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইবে।"

যে 'যুগান্তরে' বাঙালীকে সজাগ ও সচেতন করিবার জন্য "বাঙালী কোথায় ?" আওয়াজ থাকিয়া থাকিয়া তোলা হইতেছে এবং সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি, স্বদেশ-প্রেমের এবং সর্বশেষ চারুশিল্পের দোহাই দিয়া বাঙালী-প্রধানেরা যে পত্রিকায় বাঙালীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন, সেখানেই এই ভয়াবহ 'বার্তা' প্রকাশিত হওয়া মর্মান্তিক সন্দেহ নাই। টয়েনবী শুধু ঐতিহাসিক নন, গিলবার্ট মারের জামাতা এই সপ্ততিপর মনীষী বাইজানটাইন ও আধুনিক গ্রীক ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পারঙ্গম ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চৌকশ ব্যক্তি। তাঁহার মতামত উপেক্ষণীয় নয়।

সুখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা গঠনমূলক কাজের মধ্যে বিশেষ করিয়া উদ্বাস্তু পুনর্বাসন-ব্যবস্থায় বাঙালীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ব্রতী করিবার ব্যাপক চেষ্টা দেখিতে পাইতেছি। বৃহৎ যৌথ শিল্পব্যবসায়ে বাঙালীর ব্যর্থতা বারম্বার প্রমাণিত হইয়াছে। শুধু মূলধনের অভাব নয়, সততা এবং পরস্পর বিশ্বাসের অভাব এবং সর্বাধিক কায়িক পরিশ্রমবিমুখতা ব্যবসায়ে বাঙালীর ব্যর্থতার কারণ। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী বাঙালী নানা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কারণে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছে। গোড়া বাঁধিয়া তাহার চরিত্র পুনর্গঠিত না হইলে গুজরাটী, মারোয়াড়ী, ভাটিয়ার সহিত সে ব্যবসায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারিবে না। ইহার জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থারও আমূল সংস্কার প্রয়োজন। এই কাজ প্রধানতঃ রাষ্ট্রের, কিন্তু সাফল্যের জন্য প্রত্যেক চিন্তাশীল বাঙালীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় আত্মস্তুতি হাস্যকর ঠেকিবে তবুও টয়েনবী সাহেবকে একটি কথা বলিব, বলিব তিনি গ্রীক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ছাত্র বলিয়া। গ্রীস ব্যবসায়ে দক্ষতা অর্জন করে নাই কিন্তু আজ ইউরোপে, শুধু ইউরোপে কেন, সারা পৃথিবীতে শিল্পে সঙ্গীতে নাটকে সাহিত্যে—মহাকাব্যে, গীতিকাব্যে, বিয়োগগাথায়, ইতিহাসে, জীবনীসাহিত্যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে, প্রবন্ধে, বাগ্মিতায় যেখানে যাহা কিছু অনুশীলিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা সকলই সেই ক্ষুদ্র গ্রীসের কল্যাণে। গ্রীক-সংস্কৃতিবিশারদ আর. ডব্লু. লিভিংস্টোন বলিয়াছেন :

'When the curtain rose on Homer, European literature did not exist; long before it falls on the late Byzantines, the lines were laid on which it has moved up to our own day. This is the entire work of a single people, politically weak, numerically small, materially poor—according to the economy of nature which in things of the mind and the spirit gives a germinating power to few.'

[অর্থাৎ, রঙ্গমঞ্চে যবনিকা উঠিলে যখন হোমারকে দেখা গেল তখন ইউরোপে সাহিত্য বলিয়া কিছু ছিল না এবং শেষ বাইজানটাইনদের উপর যখন যবনিকাপাত হইল তখনই, যে পথে আমরা আজও পর্যন্ত চলিতেছি সে পথ পাকাপাকি রকমে নির্মিত হইয়াছে। এই কাজ সম্পূর্ণ একক একটি জাতির, যে জাতি রাজনীতিতে দুর্বল, সংখ্যায় লঘু, ঐশ্বর্যে দরিদ্র। প্রকৃতির বণ্টননীতির সুব্যবস্থাবশতঃই এইরূপ ঘটিয়াছে—মানসিক ও আত্মিক ব্যাপারে সৃষ্টি-ক্ষমতা প্রকৃতি হিসাব করিয়া 'অল্পে'র উপরেই অর্পণ করে।]

এই 'অল্প' হইবার সৌভাগ্য আধুনিক ভারতবর্ষে বাঙালীই অর্জন করিয়াছে। সুতরাং বর্তমান তাহার যতই অন্ধকারাচ্ছন্ন হউক, গ্রীসের মত তাহার ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হইবার নহে। কিন্তু এই আত্মপ্রসাদ লইয়া যেন আমরা নিষ্ক্রিয় না হইয়া পড়ি।

এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বাঙালী প্রতিষ্ঠান—'ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া'র শোচনীয় অকালমৃত্যু বেদনার সহিত মনে পড়িতেছে। সকল বাঙালীর সমবেত চেষ্টায় এই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটি কি পুনর্জীবিত হয় না?

—

১৯৪৯ সনের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ যখন আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়কে অষ্ট-সপ্ততিতম বর্ষ পরিপূর্তি উপলক্ষে সম্বর্ধিত করেন তখন আচার্য-শিষ্য স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যদুনাথের ইংরেজী বাংলা পুস্তক এবং সাময়িকপত্রে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের একটি তালিকা সঙ্কলিত ও বিতরিত হয়। তাঁহার প্রথম বাংলা রচনার গৌরব দেওয়া হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা 'সুহৃদ' নামক একটি অজ্ঞাত-অখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত "হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা ৮১ বৎসর পূর্বে" প্রবন্ধটিকে। ইহা প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বের কথা। সম্প্রতি যদুনাথের অনুজ শ্রীবিজয়নাথ সরকার মহাশয়ের সংগ্রহ হইতে শ্রীমান সনৎকুমার গুপ্ত 'সুহৃদ' পত্রিকার এই সংখ্যাটি আমাদিগকে দিয়াছেন। পত্রিকাটি প্রেসিডেন্সী কলেজের ইডেন হিন্দু হস্টেলের ছাত্রদের মুখপত্র ছিল। ১৮৯৫ সনের এপ্রিল-মে মাসে 'সুহৃদে'র এই "দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম সংখ্যা"টি বাহির হয়। যদুনাথ ১৮৯২ সনের ডিসেম্বর মাসে এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা প্রেসিডেন্সী কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়াছেন ও ১৮৯৩ সনের জুন মাসে রিপন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। কাজেই তিনি তখন ইডেন হিন্দু হস্টেলের প্রাক্তন ছাত্র। প্রবন্ধটি নামহীন। কিন্তু ইহা যে তাঁহার রচনা তিনিই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন এবং মুদ্রিত প্রবন্ধটি স্বহস্তে সংশোধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের মাতৃভাষায় প্রথম রচনা হিসাবে প্রবন্ধটি আমরা যদুনাথের সংশোধনসহ সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

"হরিদ্বার ও কুম্ভমেলা
(একাশি বৎসর পূর্ব্বে)

ইং ১৮১৬ সালে লণ্ডনে "স্কেচেজ্ অব্ ইণ্ডিয়া ইন্ ১৮১১—১৪" এই নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়, গ্রন্থলেখকের নাম উল্লেখ নাই। কিন্তু আমার নিকটস্থ পুস্তকখানিতে লুপ্তপ্রায় বিবর্ণ কালীর হস্তাঙ্কিত অক্ষরে লেখা আছে "উইলিয়াম্ হাগিন্স্ রচিত"। তাঁহাকেই গ্রন্থকার বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

তখন রেলও ছিল না ষ্টিমারও ছিল না; সাহেবদিগকে জল-পথে বজ্‌রা ও স্থল-পথে পাল্কীতে যাতায়াত করিতে হইত। এই সময় কোম্পানীর রাজ্য অধিক দূর বিস্তৃত ছিল না; পশ্চিমে মিরাট ও সাহারাণপুর তাঁহাদের শেষ সীমা ছিল। নাগপুর-কর ভোঁসলে, সিন্দে ও হোলকার দক্ষিণ পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পশ্চিমে লাহোর মিছলের সর্দ্দার রণজিৎ সিংহ কেবল মাত্র তাঁহার রাজ্য সংস্থাপন আরম্ভ করিয়াছেন। নেপাল যুদ্ধ তখনও আরম্ভ হয় নাই, সুতরাং হরিদ্বারের এক ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত গুর্খা রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কাজেকাজেই হাগিন্স্ সাহেবের ভ্রমণ, বাঙ্গালা, বিহার, আর্য্যাবর্ত্ত, রোহিলখণ্ড, এবং (প্রচ্ছন্ন ভাবে) নেপালের কিয়ৎদূরের অধিক হয় নাই।

আমাদের ভ্রমণকারী এখনকার এংলো-ইণ্ডিয়ান্দের ন্যায় উদ্ধত-প্রকৃতি ও কালা আদ্মির প্রতি বীতরাগ ছিলেন না। দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার জন্য বিশেষ আগ্রহ, এবং উচ্চ বংশসম্ভূতা হিন্দু মহিলাবর্গের রূপ-গুণের

চুর প্রশংসা, তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থলে দেখিতে াওয়া যায়। বিশেষতঃ, তিনি প্রত্যেক স্থানেই অনেক দিন বাস করিতেন, সুতরাং তাঁহার বর্ণনাগুলি আজ-কালকার রেলপথ যাত্রীর দু' মিনিটের অভিজ্ঞতার মত সার নহে।

আমরা তাঁহার হরিদ্বার ও কুম্ভমেলার বর্ণনা অনুবাদ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। আবশ্যক বোধে কোন স্থানে কিছু পরিত্যক্ত কোথাও বা সংক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ভাষা অনেক স্থলেই অপরিবর্তিত রাখা হইয়াছে। তাঁহার ফুট-নোটগুলি বর্ণনার মধ্যে বন্ধনীর ভিতর প্রকাশ করা গেল।

পাঠক সেই সময়ের ভারতবর্ষ ও ইংরাজ ভ্রমণকারীর আলো ও ছায়াময় হৃদয় একই চিত্রে চিত্রিত দেখিতে পাইবেন।

প্রথম দর্শন :—২রা মে ১৮১৩ খৃঃ অঃ ;—সাহারনপুর হইতে রওনা হইয়া ৫ই মে হরিদ্বারে পৌছিলাম। এইখানে গঙ্গা পার্শ্বস্থ সমুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীদ্বয়ের মধ্য দিয়া উন্মত্তবেগে অগ্রসর হইতেছে, এবং পর্ব্বতশ্রেণীর পাদোদকে সমতল ভূমি নিষিক্ত করিতেছে। এখানে নদী-দেহ অত্যন্ত সংকীর্ণ ; কিন্তু গঙ্গাসাগরের প্রান্তবর্তী চারি ক্রোশ প্রশস্ত নদীমুখ দেখিয়া কে বিশ্বাস করিবে যে এ সেই নদী !

মহানিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ন্যায় ভক্তি-সহকারে আমি এই পবিত্র নদীতে অবগাহন করিলাম। এই গ্রীষ্মের দিন, শীতল জলে স্নান করিয়া, পরম আরাম বোধ করিলাম। ভাগীরথীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া তাঁহার মহাভক্ত উপাসকবৃন্দ আমার অপেক্ষা অধিক আরাম পায় কিনা সন্দেহ।

পরদিন (৬ই মে) প্রত্যুষে, চাঁদপাহাড়ে উঠিলাম। এটি মহাদেবের পর্ব্বত, উপরে তাঁহার মূর্ত্তি ও ত্রিশূল স্থাপিত। পাহাড়টি সমভূমি হইতে কেবলমাত্র একচতুর্থাংশ মাইল উচ্চ। স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকারের ভক্তগণ মহা উৎসাহে পর্ব্বতশিখর পর্য্যন্ত আরোহণ করে ; একটি বৃদ্ধা তাহাদিগের পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে ; এবং আরোহীগণ-প্রদত্ত কড়িটা পয়সাটায় সেই বৃদ্ধার সচ্ছন্দে দিনপাত হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের আর কোন স্থানেই এত বিবিধ ও এত বিস্তৃত দৃশ্য নয়নগোচর হয় না। শিব-মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু জুড়ায় তবুও দৃশ্য ফুরায় না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের উপাসকগণ যাহা যাহা চাহেন তাহা সমস্তই এখানে একত্র করা হইয়াছে।

নীচে সমতল-ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কখন এদিকে কখন ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বহিয়া যাইতেছে ; কখন বা দ্বীপ কখন বা উপদ্বীপ রচনা করিতেছে ; কোথায় বা স্বচ্ছ-সলিলে প্রবাহিত হইয়া, রজত বক্ষে প্রত্যেক বস্তুরই প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে ; আবার কোথাও ক্রুদ্ধ-হুঙ্কারে উপল-খণ্ডের উপর বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে ; সেই উন্মত্ত তরঙ্গের প্রতিকূলে শীলা-খণ্ডের প্রতিবন্ধকতা বৃথা হইতেছে।

আমাদের ঠিক সম্মুখে, নীচে নদী-তটে কন্খল নামক সুন্দর নগরটি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সমুদয় বাড়ীগুলিই প্রায় প্রস্তর-নির্ম্মিত ও শুভ্র ; এই গৃহগুলির নির্ম্মাণ-কার্য্যে এমন একটি শৃঙ্খলা ও সুন্দর নিয়ম অনুবর্তিত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোন নগরেই দেখিতে পাওয়া যায় না। যতই দেখি ততই আনন্দবেগ প্রবল হয়, অবশেষে ভ্রান্তি এতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, ঐ সকল কৃষ্ণচর্ম্ম মনুষ্যগুলিকে শ্বেতদ্বীপবাসী বলিয়া মনে হয় ;—নিম্নে ঐ সকল কাপুরুষ ফকিরগণকে দেখিয়া, ইংলণ্ডবাসী স্বাধীনচেতা জোৎদার বলিয়া মনে হয়। কেবল পরপারবর্ত্তী, হরিদ্বারের পৃষ্ঠদেশ হইতে উত্থিত দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গের রৌদ্রদগ্ধ ধূসর বর্ণ, আমার এই ভ্রম দূর করিয়া দেয়। হরিদ্বার সহরটি ক্ষুদ্র ; সম্মুখে গঙ্গা, পশ্চাতে পর্ব্বত। ইহার উন্নত দেব-মন্দির-চূড়াশ্রেণী অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত হইয়া ভাগীরথী তীর হইতে সরল ভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এই চূড়াগুলি থাকাতে দৃশ্যপট সমধিক বিচিত্র ও মনোরম দেখায় ; এবং দর্শকের দৃষ্টি এইগুলিকে অবলম্বন করিয়া একটু উজানে পবিত্র ঘাটদ্বয়ের উপর নিপতিত হয়। এই ঘাটদ্বয়ের নাম জয়ঘাট ও হরকিপাড়ী-ঘাট। এইখানে যখন শত শত অজ্ঞানান্ধ হতভাগ্য ব্যক্তি (!!!) স্রোতস্বিনীকে পূজা করে তখনকার দৃশ্যটি চিরকালের জন্য হৃদয়পটে অঙ্কিত হইয়া যায়।

স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ ও যুবক, ব্রহ্মার পুরোহিতগণ (!) এবং তাহাদের অন্ধবিশ্বাসী ভক্তগণ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। তাহাদের সেই সম্মিলিত কণ্ঠের কল্লোলধ্বনি এত গম্ভীর যে দূরে পরপারে সমুচ্চ চাঁদ-পাহাড়ে চিন্তামগ্ন বিদেশীর চিন্তা অবরুদ্ধ করিয়া দেয়। [পনের বৎসর পরে একবার করিয়া এইখানে কুম্ভ নামে এক প্রকাণ্ড মেলা হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এত অধিক লোক, এই মেলায় সমবেত হয় যে, আমার এক বন্ধু এই সকল যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে সকল মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে অনেক ডকেট, রুবল্ ও পিয়াস্তার মুদ্রা ছিল।]

হরিদ্বারে দ্বিতীয় বার :—গ্রীষ্মের ভয়ে রাত্রি একটার সময় রওনা হই এবং সকালে আসিয়া তাঁবুতে বিশ্রাম করি, দিবসে আর পথ চলি না। এইবার হরিদ্বারে যে মেলা হইবে তাহা এই মহাদ্বীপের সকল মেলার মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত ও বড় রকমের।

২৮শে মার্চ্চ, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সাহারাণপুর হইতে রওনা হইয়া ৩১শে প্রত্যুষে হরিদ্বার পৌছিলাম। কয়েক দিবস পরে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা বর্ণনাতীত

অভিনব ও বিস্ময়জনক। মেলায় ষাট হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। মেলার ক্ষেত্রটি, এক মাইল দীর্ঘ ও তাহার এক তৃতীয়াংশ প্রশস্ত। একত্র তুর্কী, মোগল, শিখ এবং ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী জাঠ, রোহিলা, ঘাক্কর ও অন্যান্য জাতির সমাবেশে এমনি এক অভিনব দৃশ্য হইয়াছিল যে অত্যন্ত চঞ্চল কল্পনাও তাহার সত্যের একাংশ অঙ্কণ করিতে পারগ হয় না।

এত ভিন্ন ভিন্ন চক্ষু, চেহারা, পরিচ্ছদ, ভাষা ও আচার ব্যবহার একত্র সমবেত যে, দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়; এখানে এক বর্ব্বর চোয়াড় তুর্কী, ওখানে এক গম্ভীর মূর্ত্তি কমনীয়শ্রী শিখ, এই একজন লম্বা চওড়া মোগল, আর তাহারি পার্শ্বে স্ত্রীসুলভ-কোমল-দর্শন হিন্দু। এখানে সমবেত লোকগুলির মধ্যে বর্ণ বিভিন্ন ও বিচিত্র এবং দৃষ্টি-আকর্ষক, অথচ এত অল্পে অল্পে মধ্যবর্ত্তী বর্ণের ভিতর দিয়া অন্য বর্ণে পড়িয়াছে যে, এসিয়ার লোকগণ ও আচার সমূহের জীবন্ত ছবি দেখিতে হইলে, আমোদের জন্যই হউক অথবা শিক্ষার জন্যই হউক, হরিদ্বারের মেলার ন্যায় আর দ্বিতীয় সুবিধা কুত্রাপি নাই।

বলা বাহুল্য গঙ্গাস্নানের দিকেই সকলের প্রধান ঝোঁক। পাপের ভারে ঘাড় তুলিতে পারে না এরূপ হতভাগ্যেরা, কুসংস্কার ও পৌরোহিত্যের ভণ্ডামীর (!!!) অতুলনীয় আশ্রয় এই স্থানে আসিয়া সমবেত হয়। এখানে ব্রাহ্মণগণকে কিছু টাকা দিলেই তাহারা পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দেয় এবং পাতকীগণ আত্মাকে এই স্রোতস্বিনীর ন্যায় শুভ্র ও নির্ম্মল মনে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে।

ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদের মধ্যে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ ক্ষমতাই আত্মসাৎ করিয়াছে, সুতরাং তাহারা ভক্তগণের অন্ধবিশ্বাস আশ্রয় করিয়া সসার খাদ্যে উদর পুষ্টি করে। ইউরোপে অন্ধযুগের ন্যায় এখানে ধর্ম্ম মনুষ্যের পরম অনিষ্টকর অভিসম্পাতের আকার ধারণ করিয়াছে··· এখানে ধর্ম্মযাজকগণ ইহজীবনের সমস্ত সুখ ও বিলাস-দ্রব্য মহাসুখে ভোগ করে।

গরিব অন্ধবিশ্বাসী ভক্তবেচারাগণ যখন, অশ্রুসিক্ত-নয়নে, বহু-পরিশ্রম-লব্ধ গলদ্ঘর্ম্মার্জ্জিত যথাসর্ব্বস্ব দু'এক পয়সা প্রণামী স্বরূপ প্রদান করিতে যায় তখন পাণ্ডাগণ অনন্ত আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে এবং পরকালের কথা তুলিয়া ভীতি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলে যে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর দানের জন্য অনন্ত নরক ভোগ করিতে হইবে। [এটি কোন কল্পনা-প্রসূত চিত্র নহে; আমি অনেকবার এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি]

১৮১৪ খৃষ্টাব্দের মেলায় পাণ্ডারা একুনে প্রায় আড়াই লক্ষের অধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিল। যাত্রীগণের মেলা হইতে ফিরিবার সময় চতুর্দ্দিকে এত দারিদ্র্যের দৃশ্য উদ্ঘাটিত হয়, এত লোক অর্দ্ধ-অনশনে ও বস্ত্রহীন-ভাবে গৃহে প্রত্যাগমন করে যে, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় পাণ্ডাগণের অর্থপিপাসা ও অর্থসংগ্রহে-নির্ম্মম-কঠোরতা উভয়ই অতুল্য।

মেলা প্রায় তিন সপ্তাহ ছিল। বেগম সমরুর কর্ম্মচারী চেম্বারলেন নামক একজন অনাবাপটিষ্ট মিসনারী এখানে প্রায় প্রথম হইতেই উপস্থিত ছিলেন, এবং বাইবেলের এক হিন্দী অনুবাদ হইতে প্রত্যহ কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। এই ভাষায় তাঁহার ভারতবাসী পণ্ডিতের ন্যায় দক্ষতা; বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী এবং ব্যবহার নম্রতা ও মাধুর্য্যব্যঞ্জক। তিনি কখন হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা বা কোন কুৎসা করিতেন না। কারণ তিনি জানিতেন ইহাতে তাঁহার পবিত্র কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবে। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় ব্যাখ্যানের পর একটি সংক্ষিপ্ত স্তব হইত, তাহার পর সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রচারকার্য্য শেষ করিতেন। প্রথমে শ্রোতার সংখ্যা অতি অল্প ছিল, প্রথম পাঁচ দিন প্রায় চারি শতের অধিক শ্রোতা আসিত না; দশম দিবসে লোক সংখ্যা পাঁচ হাজার হইয়াছিল, এই দিবসের পর হইতে কোন দিবসই শ্রোতৃসংখ্যা আট হাজারের কম হয় নাই। আমি প্রত্যহ সেখানে উপস্থিত থাকিতাম। শ্রোতৃবর্গ চারিদিকে মাটিতে বসিয়া এমন মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিত যে খৃষ্ট-শিষ্যগণের পক্ষেও সেরূপ মনোযোগ প্রশংসার বিষয়। যখন সভা ভঙ্গ করিয়া পাদ্‌রী সাহেব চলিয়া আসিতেন তখন সকলে চিৎকার করিয়া বলিত "জিতা রহো পাদ্‌রী সাহেব জিতা রহো।"

এই সময় হরিদ্বারে পাঁচলক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণগণ পর্য্যন্ত পাদ্‌রী সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে যাইত এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিত, বুঝিতে না পারিলে জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। তাহারা যথানিয়মে আসিত, এবং যাহারা প্রথম আসিয়া বসিত, তাহাদের মুখ পর্য্যন্ত কিছু দিবসের মধ্যে পরিচিত হইয়া যাইত। এইরূপে চেম্বার্লেন সাহেব অত্যন্ত নিপুণতা ও নম্রতার সহিত প্রচারকার্য্য সমাধা করিলেন। যেরূপ গোলযোগের আশা করা গিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না বরং যাত্রীগণ নির্ব্বিবাদে ও শান্তভাবে তাঁহার বক্তৃতায় মনোযোগ দিল।"

—

বাংলা ভাষায় ইদানীং গল্প-উপন্যাস-নাটক-রম্যরচনা ও কবিতার বিপুল প্রাচুর্য দেখিয়া অনেকে আতঙ্কিত হইয়া মনস্বী বেকনের "পুস্তক সম্পর্কীয় জল্পনা"র অংশবিশেষ স্মরণ করিতেছেন। কিন্তু তথাকথিত "সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যে"র এই বন্যা যে সুফলপ্রসূ পলি-মাটিও বঙ্গসাহিত্য

প্রবাহিনীর দুই তটে বিছাইয়া যাইতেছে ইহা যাঁহারা লক্ষ্য করিবেন তাঁহারা আতঙ্কিত হইবেন না। বাংলা ভাষায় দর্শন ও বিজ্ঞানগ্রন্থের আশাপ্রদ প্রকাশ আমরা ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছি। আমাদের প্রাচীন ষড়্-দর্শন সম্পর্কে এতাবৎকাল মূল সংস্কৃতে টীকায় ও অনুবাদে (ইংরেজী বাংলা) ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহন সূত্রপাত করিয়াছেন, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মাতৃভাষায় ষড়্দর্শন অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার পর ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত, যোগ প্রভৃতি ভেদে প্রচুর আলোচনা বাংলা ভাষাতেই হইয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় দর্শনের একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারাবাহিক ইতিহাস বাংলা ভাষায় রচিত হয় নাই। ডাঃ শশধর দত্ত পাশ্চাত্ত্য দর্শন বিষয়ে কলেজ-পাঠ্য বই লিখিয়াছেন, মনোরঞ্জন রায় দুই খণ্ডে যে 'দর্শনের ইতিবৃত্ত' এবং কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে 'লোকায়ত দর্শন' লিখিয়াছেন তাহা নিরপেক্ষ দর্শন নহে, স্ব স্ব মতবাদের মাধুরীতে রঙীন দর্শন। বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত দর্শন রচনার গৌরব শ্রীতারকচন্দ্র রায়ের প্রাপ্য। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সনে তিনি তিন খণ্ডে 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস' সম্পূর্ণ করেন। আমরা তখনই এই মহামূল্যবান গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলাম। এখন তিনি ভারতীয় দর্শনে হাত দিয়াছেন এবং তাঁহার 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স) প্রকাশিত হইয়াছে। তিন অধ্যায়ে লেখক বৈভাষিক দর্শন ও শূন্যবাদ পর্যন্ত বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গোড়ায় ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, "ভারতীয় দর্শনের আরম্ভ বেদে"। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৈদিক দর্শন এবং তৃতীয় অধ্যায়ে মহাকাব্যের যুগ আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার অশীতিপর বৃদ্ধ। তিনি যদিও সাময়িকপত্রে তাঁহার গ্রন্থের পরবর্তী অধ্যায়গুলি মাঝে মাঝে প্রকাশ করিতেছেন তবুও আমরা দ্রুত এই যুগান্তকারী পুস্তকের সমাপ্তি কামনা করিতেছি। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারেও চিরন্তন সম্পদ হইয়া থাকিবে।

* * *

ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তীর 'দর্শনের ভূমিকা' (এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং) বাংলা ভাষায় দর্শন সম্পর্কে আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহাতে বাঙালী পাঠককে দর্শন অনুশীলনের চাবিকাঠির সন্ধান দেওয়া হইয়াছে। সহজ বাংলা ভাষায় যে দর্শনের কঠিন সংজ্ঞাগুলি সাধারণ পাঠককে বুঝান যায়, নীরদবাবু তাহাই প্রমাণ করিয়া মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই পুস্তকে পাশ্চাত্ত্য দর্শন যে পরিমাণে আলোচিত হইয়াছে, আশা করি, প্রাচ্য দর্শন সম্পর্কে অনুরূপ আলোচনা সম্বলিত 'দর্শনের ভূমিকা'র দ্বিতীয় খণ্ড তিনি শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন। গ্রন্থকার স্বয়ং দর্শনের অধ্যাপক। দর্শনের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা মাতৃ-ভাষাতেই যাহাতে পরীক্ষা দিতে পারে, একদিকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া তিনি যেমন ছাত্রসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবেন, অন্যদিকে যাঁহারা ছাত্রাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যাঁহাদের ছাত্রাবস্থায় মাতৃভাষায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন আলোচনার সুযোগই ছিল না, তাঁহারাও এই পুস্তকের সাহায্যে দর্শন বুঝিবার সুযোগ পাইয়া কৃতজ্ঞ হইবেন।

* * *

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনের 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' বাংলা ভাষায় একটি অপূর্ব কীর্তি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটিও প্রথম খণ্ডের অনুরূপ যত্ন ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থটি শুধু বাংলা ভাষাতেই অপূর্ব নয়, ইংরেজীতেও বিজ্ঞানের ইতিহাস এমন সুন্দর ভাবে লিখিত হয় নাই। কাজেই নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ও আণবিক বিস্ফোরণ পর্যন্ত এই ইতিহাসের জের না টানিলে একটি মহৎ কার্য খণ্ডিত থাকিয়া যাইবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভিত্তির উপরেই আধুনিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, কাজেই বৈজ্ঞানিকদের এই যুগের কীর্তির ইতিহাস রচিত না হইলে প্রথম এই দুই খণ্ড বিজ্ঞানের জাতকের গল্পমাত্র হইবে, living বিজ্ঞান-কাহিনী হইবে না।

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

॥ আত্মবিসর্জন ॥

আমরা বলেছি রবীন্দ্র-জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত লগ্নে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে বার বার। বার বার মৃত্যুর হাত থেকেই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে অমৃতের পাত্র। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালিদাসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা ছিল : 'নিদ্রাহীন রাত্রি কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি?' কবির নিজের জীবনের দিক দিয়ে এই জিজ্ঞাসার একটি গূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। তাঁর দাম্পত্যজীবন শুরু থেকেই মৃত্যুর আবির্ভাবে অভিশপ্ত। সেদিন মহাকাল-নিক্ষিপ্ত সেই মৃত্যুশেল কবির মর্মস্থলে আমূল বিদ্ধ হয়েছিল। শেলবিদ্ধ বক্ষের রক্তক্ষরা বেদনা নিয়ে এসেছে কবিজীবনে নিদ্রাহীন রাত। সদ্যোবিবাহিত তরুণ কবি জীবনের কাছে চেয়েছিলেন অমৃতের অধিকার, কিন্তু মৃত্যু তাঁর হাতে তুলে দিলে বিষের পাত্র। নীলকণ্ঠ কবি সেই বিষই শোধন করে অমৃতে রূপান্তরিত করলেন।[১]

রবীন্দ্রনাথের যেদিন বিবাহ সেদিনই মৃত্যু হল তাঁর বড়-ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদের। আর পাঁচ মাস পূর্ণ না হতেই মাস দেড়েকের ব্যবধানে লোকান্তরিত হলেন প্রথমে কাদম্বরী দেবী, তারপর কবির সেজদা হেমেন্দ্রনাথ। সারদাপ্রসাদ মহর্ষি-পরিবারেই থাকতেন, পুত্র সত্যপ্রসাদের প্রায় সমবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল সুগভীর, তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। মহর্ষি-পরিবারে হেমেন্দ্রনাথের উপর ছিল শিশুদের পড়াশুনা দেখার ভার। যখন চারদিকে ইংরেজী পড়াবার ধুম পড়ে গিয়েছে তখন হেমেন্দ্রনাথই সাহসের সঙ্গে বাংলা শেখাবার দিকে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেকথা রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। স্বভাবতঃই তাঁদের দুজনের বিয়োগবেদনা কবির অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু নোতুন বৌঠানের মৃত্যুই তাঁর চেতনার মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত করে তাঁর সমগ্র সত্তাকে আলোড়িত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে সেই অভিঘাতের কথা বলেছেন; এবং সেই ঘটনার তেত্রিশ বছর পরে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নিচে থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার আকাশ থেকে আলো নিভে গেল। আমার জগৎ শূন্য হল, আমার জীবনের সাধ চলে গেল। সেই শূন্যতার কুহক কোনোদিন ঘুচবে, এমন কথা আমি মনে করতে পারি নি।'[২]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুদিন ১২৯১ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ। তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। যে চিঠির কথা উল্লেখ করলাম সেই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'এক সময়ে যখন আমার বয়স তোমারই মতো ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম সে ঠিক তোমারই মতো। আমার যে-পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন শিশুকাল থেকে আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি।' এখানে আত্মহত্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু নাম নেই; তবে কে সেই পরমাত্মীয় তা কবির জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে সহজেই অনুমান করে নিতে পারা যায়। 'জীবনস্মৃতি'

রচনার সময় কবি কিন্তু আত্মহত্যার উল্লেখ করেন নি, এমন কি সেখানে 'চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়ে'র কথাই শুধু বলা হয়েছে, কার মৃত্যু কিভাবে মৃত্যু তার আভাস পর্যন্তও কবি দেন নি।

কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার কথা একেবারে স্পষ্ট ভাষায় প্রথম পাওয়া যায় 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থে। ওই গ্রন্থের ব্রাহ্মণ কাণ্ড তৃতীয় ভাগে পিরালী ব্রাহ্মণ বিবরণের ৩৬০ পৃষ্ঠায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তাঁর স্ত্রী 'কাদম্বিনী [কাদম্বরী হবে] দেবী অকালে আত্মহত্যা করেন।' 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র আলোচ্য খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩০১ বঙ্গাব্দে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেছেন, এর পাণ্ডুলিপি সতেরো বৎসর আগে প্রস্তুত হয়েছিল এবং গ্রন্থের ১৬১ থেকে ৩৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখেছিলেন।

কাদম্বরী দেবী কেন আত্মহত্যা করলেন, এ জিজ্ঞাসা রবীন্দ্র-জীবন-জিজ্ঞাসায় অনিবার্যভাবেই আসে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের বিবাহের মাস চার পরেই কাদম্বরী দেবী আত্মহত্যা করেছিলেন, কাজেই সাধারণ মানুষের মনে এ চিন্তা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথের বিবাহই কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যার কারণ। যেখানে প্রণয়াসক্তি জৈব-এরসের প্রেরণায় উজ্জীবিত সেখানে সামান্য নারীর পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্রে আত্মহত্যা করা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেবীর প্রেরণা প্লেটোবর্ণিত দিব্য-এরসের মহত্তর ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত। পরিণত জীবনে কবি সেই প্রেরণার কথা স্মরণ করে লিখেছেন :

কোন্ জ্যোতির্ময়ী হোথা অমরাবতীর বাতায়নে
রচিতেছে গান
আলোকের বর্ণে বর্ণে ; নির্নিমেষ উদ্দীপ্ত নয়নে
করিছে আহ্বান।
তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে ;
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে॥

*　　*　　*

তুমি সে আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক, হে কল্যাণী,
দেবতার দূতী।
মর্ত্যের গৃহের প্রান্তে বহিয়া এনেছে তব বাণী
স্বর্গের আকূতি।
ভঙ্গুর মাটির ভাণ্ডে গুপ্ত আছে যে অমৃতবারি
মৃত্যুর আড়ালে,
দেবতার হয়ে হেথা তাহারি সন্ধানে তুমি, নারী,
দু-বাহু বাড়ালে॥[৩]

রবীন্দ্রজীবনে কাদম্বরী দেবী অমরাবতীর বাতায়নবর্তিনী জ্যোতির্ময়ী মূর্তিরই আকাশভ্রষ্ট প্রবাসী আলোক। মর্তের গৃহের প্রান্তে তিনি স্বর্গের আকূতি বহন করে এনেছিলেন। তাঁরই দিব্য প্রেরণায় কবিকিশোর 'নামহীন দীপ্তিহীন তৃপ্তিহীন আত্মবিস্মৃতি'র তমসা থেকে অলৌকিক প্রতিভার জ্যোতির্ময়তায় সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন। এই দিব্য-প্রেরণাকে জৈবস্তরে অবনমিত করে আনুষঙ্গিক পরিণতির কথা চিন্তা করার মত বিভ্রান্তি আর কিছু হতে পারে না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহকে কাদম্বরী-দেবীর আত্মহত্যার সমনন্তর-প্রত্যয়ী অর্থাৎ মূলীভূত হেতুরূপে চিন্তা করা দূরে থাক্, নিমিত্ত-হেতু রূপে অনুমান করারও কোন সঙ্গত কারণ নেই। আমরা পূর্বেই দেখেছি, অক্ষয় চৌধুরী "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" কবিতায় এবং বিহারীলাল তাঁর 'সাধের আসনে'র "আসনদাত্রী দেবী" ও "পতিব্রতা" শীর্ষক নবম ও দশম সর্গে কাদম্বরী দেবীর অভিমান ও তজ্জনিত আত্মবিসর্জনের জন্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই দায়ী করেছেন। 'সাধের আসন' কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর চার বৎসর পরে লেখা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনাদর ও অবহেলার জন্যেই কাদম্বরী দেবী মৃত্যু বরণ করেছেন এই প্রত্যয়ে বিহারীলাল এত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, কাব্যের আবেশে জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের প্রতি তাঁর ভর্ৎসনা সংযমের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। যে জগতে 'কিম্ভূতমতি পুরুষ' 'পশুর মতন নিতুই নূতন চায়' সেখানে পতিব্রতার স্থান নয়, এই খেদোক্তি করে কবি বলছেন :

সরল হৃদয় লুটি
এ ফুলে ও ফুলে ছুটি
ভ্রমর কলঙ্ককালো উড়িয়া বেড়ায়,
গুন্ গুন্ রবে ওর
বিষাক্ত মদের ঘোর,
ও নহে কাহারো পতি ;
কেন গো দাঁড়ায়ে সতি !

'যাও মা অমরাবতী, এস না ধরায়!—
আর এস না ধরায়! ১০।১১॥

আত্মভোলা বিহারীলালের এই মাত্রাতিরেকী ভৎর্সনা-বাণী শোকবিহ্বল কবিকণ্ঠেরও অযোগ্য। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁকে কতটা বিচলিত করেছিল এ থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তা ছাড়া পত্নীর মৃত্যু সম্পর্কে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই যে দায়ী করেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর হেতু-নির্দেশে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক রচনাবলীর সাক্ষ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১২৯১ সালের বৈশাখে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল। ১২৯১ সালে 'ভারতী' ছাড়া 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'নবজীবন' ও 'প্রচারে' রবীন্দ্রনাথের লেখা মুদ্রিত হয়েছে। জ্যৈষ্ঠে কোথাও কোন লেখা নেই। আষাঢ়ে সৌন্দর্য ও প্রেম (প্রবন্ধ—'ভারতী'), শ্রাবণে 'ভারতী'তে কথাবার্তা (সংলাপ-নিবন্ধ), সরোজিনী প্রয়াণ (শ্রাবণ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ তিন কিস্তিতে), বিদেশী ফুলের গুচ্ছ (অনুবাদ কবিতা), এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় আত্মা (প্রবন্ধ); ভাদ্রের 'ভারতী'তে হায়! (গান), আশ্বিনে হাতে কলমে (প্রবন্ধ); কার্তিকে ঘাটের কথা (গল্প), যোগিয়া (কবিতা), এবং 'নবজীবনে' বৈষ্ণব কবির গান (প্রবন্ধ); অগ্রহায়ণে 'একটি পুরাতন কথা' (প্রবন্ধ—'ভারতী'), রাজপথের কথা (গল্প—'নবজীবন'), পৌষে কৈফিয়ৎ (একটি পুরাতন কথার পরিশিষ্ট—'ভারতী'), কোথায় (কবিতা—'ভারতী'); মাঘে রামমোহন রায় (প্রবন্ধ—'ভারতী'), ফাল্গুনে উপকথা (কবিতা), সমস্যা (প্রবন্ধ); চৈত্রে বিদায় (কবিতা); ১২৯২ সালের বৈশাখে পুষ্পাঞ্জলি (প্রবন্ধ)। এই রচনাবলীর মধ্যে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে বিদেশী ফুলের গুচ্ছ, আত্মা, হায়!, যোগিয়া, কোথায়, বিদায় এবং পুষ্পাঞ্জলি—এই সাতটি রচনায়। এই রচনা-সপ্তকের আদিতে আছে বিদেশী ফুলের গুচ্ছ আর অন্তে পুষ্পাঞ্জলি। নোতুন বৌঠানের মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশে তরুণ কবি যে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন, বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তার প্রথম অর্ঘ্য তিনি আহরণ করেছেন বিদেশী কবিদের কাব্যমালঞ্চ থেকে। শেলি, ব্রাউনিং-জায়া, আর্নেস্ট মায়ার্স, ওব্রে ডি ভিয়র, অগস্টা ওয়েবস্টার, মার্সস্টন, ও ভিক্টর হ্যুগোর মোট আটটি বিষাদসংগীত 'সিন্ধুতীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' এই শিরোনামায় শ্রাবণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। সেদিন কবির হৃদ্‌গত শোকোচ্ছ্বাস তাঁর প্রিয় কবিদের রচনা থেকেই প্রতিধ্বনি আহরণ করেছে। প্রথম কবিতাটি শেলির 'Stanzas written in Dejection near Naples'—এই কবিতার প্রথম চার স্তবকের অনুবাদ। তারই অনুসরণে কবি এই কাব্যগুচ্ছকে 'সিন্ধুতীরে বিষণ্ণ হৃদয়ের গান' বলে গ্রথিত করেছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে' এই কবিতাগুলির সঙ্গে ম্যুর, ব্রাউনিং-জায়া, ক্রিষ্টিনা রসেটি, সুইন্‌বর্ণ, হুড ও একটি জাপানী কবিতার অনুবাদ যুক্ত হয়ে এই পুষ্পগুচ্ছ সম্পূর্ণ হয়েছে। কবিতাগুলি প্রিয়বিয়োগবেদনায় শোকবিহ্বল কবিচিত্তের অনবদ্য বিষাদসংগীত। সেদিন কবির মানসসিন্ধুতে শোকের উর্মিমালা কিভাবে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছিল এই কবিতাগুলির নির্বাচন থেকেই তার আভাস পাওয়া যাবে।

কিন্তু কবির নিজের কণ্ঠে সেই আবেগ প্রথম ভাষা পেল ভাদ্রের 'ভারতী'তে প্রকাশিত একটি গানে। গানটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য:

হায়!

রাগিণী ললিত।

তোরা বসে গাঁথিস মালা,
তারা গলায় পরে।
কখন্ যে শুকায়ে যায়
ফেলে দেয় রে অনাদরে!
তোরা সুধা করিস্ দান,
তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে
ফিরেও যে নাহি চায়;
হৃদয়ের পাত্রখানি
ভেঙে দিয়ে চলে যায়।
তোরা শুধু হাসি দিবি,
তারা কেবল বসে আছে,

চোখের জল দেখিলে তারা
আর ত রবে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে,
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙে মধু দিবি,
অশ্রু-ছাঁকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না কয়ে
শুকায়ে পড়িবি শেষে।[৪]

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন যে অনিঃশেষ বিরহের গান গেয়েছেন এই গানটি তারই 'আদিসৃষ্টি' বলে এর মূল্য অপরিসীম। কিন্তু এর ভাববস্তু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথেরও অনুযোগ জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরই বিরুদ্ধে। 'তোরা' এবং 'তারা'র বহুবচনের দ্বারা সাধারণীকৃতির চেষ্টা সত্ত্বেও তরুণ কবির ক্ষোভ "কেন" ও "কোথায়" তা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়।

এই গানে কবিমানসের যে হাহাকার ফুটে উঠেছে তার সুর আরও ঋজু আরও স্পষ্টোচ্চারিত ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে প্রকাশিত "কোথায়" কবিতায়। গানের শিরোনামা ছিল "হায়!", কবিতাটির প্রথম পংক্তি হল 'হায়, কোথা যাবে!'—

হায়, কোথা যাবে!
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি,
পথ কোথা পাবে!
হায়, কোথা যাবে!

কঠিন বিপুল এ জগৎ,
খুঁজে নেয় যে যাহার পথ।
স্নেহের পুতলি তুমি সহসা অসীমে গিয়ে
কার মুখে চাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা কেহ সাথে রহিব না,
মোরা কেহ কথা কহিব না।
নিমেষ যেমনি যাবে, আমাদের ভালোবাসা
আর নাহি পাবে।
হায়, কোথা যাবে!

মোরা বসে কাঁদিব হেথায়,
শূন্যে চেয়ে ডাকিব তোমায়;
মহা সে বিজন মাঝে হয়ত বিলাপধ্বনি
মাঝে মাঝে শুনিবারে পাবে,
হায়, কোথা যাবে!

*   *   *

হায়, কোথা যাবে!
যাবে যদি, যাও যাও, অশ্রু তবে মুছে যাও,
এইখানে দুঃখ রেখে যাও।
যে বিশ্রাম চেয়েছিলে, তাই যেন সেথা মিলে,
আরামে ঘুমাও।
যাবে যদি, যাও।[৫]

বিলাপচারী এই কবিতায় উচ্চারিত স্বচ্ছন্দ আবেগের মর্মকথাটি লক্ষণীয়। নোতুন বৌঠানের মৃত্যুর জন্যে কবি যদি নিজেকে সামান্যতমও দায়ী মনে করতেন তা হলে এ ভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারতেন না।

শুধু তাই নয়, পাঠকগণ দেখে বিস্মিত হবেন যে, রবীন্দ্রনাথ নোতুন বৌঠানের আত্মহত্যাকে নৈতিক দিক দিয়ে সমর্থনই করেছেন। আত্মহনন সাধারণতঃ নিন্দনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্য-কারণ-প্রসঙ্গ-নির্বিশেষে সব আত্মহত্যাকে একই মাপকাঠিতে মাপা কিছুতেই চলে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে সত্যাগ্রহী যখন অনশনব্রত অবলম্বন করে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেন তখন তাঁর কর্মও কি আত্মহত্যা নয়? নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্যে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে রাজপুত বীরাঙ্গনারা যে জহরব্রত করতেন তাকেও আত্মহত্যা ছাড়া আর কী বলা যাবে? আসলে প্রেয়োবোধের প্ররোচনা এবং শ্রেয়োবোধের প্রেরণাভেদে আত্মহত্যার স্বরূপও ভিন্ন হতে বাধ্য। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছায় প্রবৃত্তির তাড়নাবশে বাসনার জটিল গ্রন্থিজালে নিজেকে জড়িয়ে যখন দশদিক অন্ধকার বলে মনে হয়, যখন মুক্তির কোথাও কোন পথ মানুষ খুঁজে পায় না তখন নিজেরই কোনও কৃতকর্মের অনুশোচনায় চরম আত্মধিক্কারবশে সে আত্মহত্যা করে। আত্মবিশ্বাসহীন দুর্বলের সেই নিষ্করুণ নিয়তি অনুশোচনীয় বটে, কিন্তু কিছুতেই সমর্থনীয় নয়। পক্ষান্তরে অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ, কিংবা প্রতি-

বিধানের চরম অস্ত্র হিসাবে আত্মহননকে আত্মবিসর্জন হিসাবেই গণনা করা উচিত। সে আত্মহনন শ্রেয়োবোধের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। আকস্মিক কোনও অপ্রত্যাশিত আঘাতের আত্যন্তিক বিমূঢ়তায়ও মানুষ আত্মহত্যা করে, কিন্তু যেখানে শ্রেয়োবোধের প্রেরণা ক্রিয়াশীল সেখানে আকস্মিক বিমূঢ়তা নয়, একটি অবিচলিত সঙ্কল্পই অমোঘ নিষ্ঠুর বলে চরম মুহূর্তকে অনিবার্য করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ এ জাতীয় আত্মহননকে বলেছেন আত্ম-বিসর্জন। নোতুন বৌঠানের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ১৮০৬ শকের (অর্থাৎ ১২৯১ বঙ্গাব্দের) শ্রাবণ সংখ্যায় "আত্মা" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি পরে তাঁর 'আলোচনা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র উপযুক্ত তাত্ত্বিক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশভঙ্গি সত্ত্বেও এ সম্পর্কে কোনও সংশয় থাকে না যে, প্রবন্ধটি নোতুন বৌঠানের আত্ম-হত্যাকে উপলক্ষ্য করেই রচিত। এই প্রবন্ধে এক স্থানে কবি বলছেন, 'আমরা মুহূর্তে মুহূর্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য-কারকের মুহূর্তে মুহূর্তে এক-একটা নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তিবিশেষত্ব ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম-খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ, যে, উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক, বুঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও সেই নামের কৃত্রিম খোলসটার মধ্যেই সে ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়।'[৬]

এখানে 'খুনী' শব্দের বদলে 'আত্মহত্যাকারী' বসালেই আমাদের প্রাসঙ্গিক যুক্তি ও বক্তব্যের যাথার্থ্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'আত্মবিসর্জন' প্রসঙ্গে কবি লিখছেন, 'আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে-আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে। * * আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না, সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জন করিবে! পরের জন্য নিজেকে কেনই বা কষ্ট দিবে! ইহার কি যুক্তি আছে? যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্ব্য আর কিছুর জন্যই আমার মাথাব্যথা নাই, এইত ইহসংসারের শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে, সুতরাং স্বার্থপরতার একটা যুক্তি-সঙ্গত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। * * আমরা আপনার সুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের ক্ষুধায় কাতর, সংগ্রাম-পরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার নিয়ম। সুতরাং এইখানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারিদিকে এই যে বস্তু-জগতের ঘোর কারাগার-ভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবর-ভূমি নহে। অতএব যখনই আমরা আত্মবিসর্জন করিতে শিখিলাম, তখনই আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল। পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখা দুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবলমাত্র তাহার শোভা নহে, উহার কার্য আছে।'

প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে কবি লিখছেন, 'যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দু-দিনের সুখ দুঃখ, দু-দিনের কাজকর্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর একরূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এইখানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাই ফেলিয়া চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, তখন এগুলিও

দগ্ধ করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসা যাক্। তাহার সেই মৃত অনিত্যগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করুক্।'

এই প্রবন্ধটির সঙ্গে 'চিত্রা' কাব্যের "মৃত্যুর পরে" [আজিকে হয়েছে শান্তি জীবনের ভুলভ্রান্তি সব গেছে চুকে] কবিতাটির ভাবসাদৃশ্য লক্ষণীয়। "মৃত্যুর পরে" কবিতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর দিন দশেক পরে লেখা, কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুই [২৬শে চৈত্র ১৩০০ সাল] কবিতাটি রচনার সাক্ষাৎ উপলক্ষ্য বলে কেউ কেউ মনে করেন। কিন্তু উপলক্ষ্যকে আশ্রয় করেই এর সঙ্গে মিশেছে কবির নিজের অন্তরঙ্গ হৃদয়-বেদনা। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি লিখেছেন, 'আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদ-শোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে।' দেখা যাচ্ছে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর আট-দশ বৎসর কবি বৈশাখের এই দিনগুলিতে বার বার তাঁকে স্মরণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে কাব্যপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ৮ই বৈশাখ নোতুন বৌঠানের মৃত্যু-দিবস। ১৩০১ সালে ৫ই বৈশাখ কবি দুটি কবিতা লেখেন, "দুঃসময়" [বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার], এবং "মৃত্যুর পরে"। "দুঃসময়ে"র প্রত্যক্ষ আলম্বন কাদম্বরী দেবী। "মৃত্যুর পরে" কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশোক নোতুন বৌঠানের বিচ্ছেদ-শোকেরই সঙ্গে মিলিত হয়ে অশ্রুর মালা দীর্ঘ করে গেঁথে দিয়েছে। বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, "আত্মা" প্রবন্ধে গ্রথিত রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে "মৃত্যুর পরে" কবিতার ভাবানুষঙ্গ একই। "আত্মা" প্রবন্ধে কবি মানুষের বিচারে সামগ্রিক দৃষ্টির দাবি জানিয়ে বলেছেন, 'আমরা তাহার কতকগুলা কাজের টুকরা এখান-ওখান হইতে কুড়াইয়া জোড়া দিয়া একটা জীবনচরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটি ত দেখিতে পাই না।' "মৃত্যুর পরে"ও কবির অনুনয়:

ব্যাপিয়া সমস্ত বিশ্বে দেখো তারে সর্বদৃষ্টে
বৃহৎ করিয়া;
জীবনের ধূলি ধুয়ে দেখো তারে দূরে থুয়ে
সম্মুখে ধরিয়া।
পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে ভাগ করি খণ্ডে খণ্ডে
মাপিয়ো না তারে।
থাক্ তব ক্ষুদ্র মাপ ক্ষুদ্র পুণ্য, ক্ষুদ্র পাপ—
সংসারের পারে।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে আত্মীয়-পরিজন-সমাজেও তাঁর কম নির্মম বিরুদ্ধ সমালোচনা হয় নি। "আত্মা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দাবি ছিল, 'তাহার সেই মৃত অনিত্যগুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি?' "মৃত্যুর পরে" কবিতায় তাঁর একই অনুনয়, একই প্রার্থনা:

আজ বাদে কাল যারে ভুলে যাবে একেবারে
পরের মতন
তারে লয়ে আজি কেন বিচার বিরোধ হেন—
এত আলাপন।

* *

সব তর্ক হোক্ শেষ— সব রাগ, সব দ্বেষ,
সকল বালাই।
বলো শান্তি, বলো শান্তি, দেহ-সাথে সব ক্লান্তি—
পুড়ে হোক্ ছাই॥

কিন্তু দেহ ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কাদম্বরী দেবী তাদের দলভুক্ত ছিলেন না। বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি অমরত্ব লাভ করেছেন। এবং ফল দেখে যদি কর্মের বিচার করতে হয় তা হলে কাদম্বরী দেবীর আত্মবিসর্জন চরম সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। আমরা পূর্বে বলেছি, মানুষের সংসারে মূর্তিমতী প্রেরণা-স্বরূপিনী এই শ্রীময়ী প্রাণময়ী ও কল্যাণময়ী নারী তাঁর প্রাণের অনিঃশেষ ঐশ্বর্য ছড়িয়ে তাঁর পরিমণ্ডলকে মধুময় করে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর হৃদয়-মন্দাকিনীধারা মর্ত্যলীলায় মুখ্যতঃ মুক্ত-ত্রিবেণীতেই নিত্যপ্রবাহিত হত। কাদম্বরী দেবীর সেই প্রাণ-প্রবাহিনী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ধারায় বিহারীলাল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের অভিমুখে ভক্তি প্রেম ও প্রীতির অমৃত নির্ঝরিণীরূপে উৎসারিত হয়েছিল। 'প্রীতি' শব্দটি আমরা 'অসম্প্রযোগ-বিষয়ারতি'র ঘনীভূত নির্যাস অর্থেই ব্যবহার করেছি। বিহারীলাল তাঁর অনুরাগময়ী ভক্ত-পাঠিকার মৃত্যুর পর শুধু 'সাধের আসন' কাব্যই লিখলেন না, তাঁর কবিকল্পনায়

এই নারীলক্ষ্মী "ব্রহ্মার মানস-সরে প্রফুল্ল নলিনী" রূপেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোন তীব্র মন্তব্য করা সমীচীন হবে না। তাঁর দাম্পত্য-জীবনের প্রারম্ভে আমরা দেখেছি তাঁর মত শিল্পীর পরিমার্জনের ফলেই কাদম্বরী দেবীর অসামান্য ধাতুপ্রকৃতি দিব্যকান্তি লাভ করেছিল। 'নন্দনকাননে' তিনি যে দাম্পত্যস্বর্গ রচনা করেছিলেন, শিল্পগোত্র মানুষের সাময়িক বিভ্রান্তির ফলে তিনি সেই স্বর্গ থেকে যে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন সে বিচারে প্রবৃত্ত না হয়েও বলা যায়, হয়তো তাঁকে ভুল বুঝে তাঁর উপর অভিমান করে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের প্ররোচনা তিনি স্ত্রীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাময়িক মোহ ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যে শেষজীবনে মোরাবাদী পাহাড়ের চূড়ায় মহত্তর আত্মোপলব্ধির আনন্দে নিমগ্ন হয়েছিলেন, তার মূলে কাদম্বরী দেবীর আত্মবিসর্জন কম প্রভাব বিস্তার করে নি। তাঁর চক্ষুরুন্মীলনে মানময়ী প্রাণবধূর মর্মান্তিক চরম আঘাত অত্যাবশ্যক ছিল বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রমানসে মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তিনি দেবীর আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইলেন। বেঁচে থাকলে যে সব জটিলতা অনিবার্য হয়ে উঠতে পারত, মৃত্যুবরণ করে সে সব জটিলতা থেকে কবি-মানসকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি দিয়ে গেলেন তিনি। কাজেই ফলাফলের বিচারে এমন সার্থক মৃত্যু আর কী হতে পারে! 'শেষের কবিতা'য় একদিন লাবণ্য অমিতকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না, যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল, সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সবচেয়ে বড়ো প্রেমের দান।"

লাবণ্যর এই চিন্তা রবীন্দ্রমানসেই অধিবাসিত হয়েছে। মমতাজের প্রেমের সবচেয়ে বড় দান তাঁর মৃত্যু। তবু তিনি স্বেচ্ছায় সে মৃত্যু বরণ করেন নি। কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁর স্বেচ্ছাবৃত বলে তার লজ্জা ও গৌরব, দায়িত্ব ও কৃতিত্ব—সবটুকুই তাঁর একার পাওনা।

২

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা এই প্রসঙ্গে সতর্ক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। জ্যোতিরিন্দ্র-জীবননাট্যের মুখ্য-বিমর্ষসন্ধিতে দাঁড়িয়ে চরম সংকটলগ্নের এই দৃশ্যটি আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্তিকর বলেই মনে হয়। চরম সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে ট্রাজেডি-নাট্যের নায়ক হয় 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলে ভেউ ভেউ কান্নায় ভেঙে পড়ে, নয় 'It is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing' বলে আকাশ-ফাটা অট্টহাসির তলায় নিজের বুকভরা কান্নাকে চাপা দেবার জন্যে সচেষ্ট হয়। "সরোজিনী প্রয়াণ" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনে অমনই এক নভোবিদারণকারী অট্টহাসি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে "বঙ্কিমচন্দ্র" অধ্যায়ের পরেই "জাহাজের খোল" ও "মৃত্যুশোক" এই দুটি অধ্যায়কে পর পর বিন্যস্ত করেছেন। "জাহাজের খোল" প্রসঙ্গে জানা যাচ্ছে 'এক্‌সচেঞ্জ গেজেটে' বিজ্ঞাপন দেখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন সাত হাজার টাকা দিয়ে একটা জাহাজের খোল কিনলেন। তার উপরে এঞ্জিন জুড়ে কামরা তৈরি করে একটা পুরো জাহাজ নির্মাণ করে স্বদেশী চেষ্টায় জাহাজ চালাবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। তাঁর এই সংকল্পের প্রথম সৃষ্টি হল 'সরোজিনী'। পরে 'ভারত', 'লর্ড রিপন' 'বঙ্গলক্ষ্মী' ও 'স্বদেশী' নামে পর পর কয়েকটি জাহাজ খুলনা-বরিশাল পথে তিনি চালিয়েছিলেন। স্বাদেশিকতার উদ্দীপনায় বিলাতি কোম্পানির সঙ্গে এইভাবে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদিন সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, শূন্য খোল একদা ভরতি হয়ে উঠল, শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নয়—'ঋণে এবং সর্বনাশে'।

শেষ তিনটি পদে রবীন্দ্রনাথের ভাষাপ্রয়োগ লক্ষণীয়। সংযোজক অব্যয়টি 'ঋণ' ও 'সর্বনাশে'র মাঝখানে বসে সর্বনাশকে ঋণ থেকে শুধু আলাদাই করে নি, সর্বনাশের তুলনায় ঋণকে অনেক লঘুও করে দিয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-পরিচালিত নৌবিভাগের প্রথম যাত্রীবাহী স্টীমারের নাম হল 'সরোজিনী'। ৮ই বৈশাখ কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু হল, ১১ই জ্যৈষ্ঠ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সরোজিনী'তে চড়ে বরিশাল যাত্রা করলেন। রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রায় জ্যোতিদাদার সঙ্গী ছিলেন। 'ভারতী'তে

১২৯১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "সরোজিনী প্রয়াণ" শিরোনামায় কবি পরিহাসলঘু ভঙ্গিতে এই নদীভ্রমণের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এই যাত্রায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীও জ্যোতিরিন্দ্রনাথদের সঙ্গ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কথা ছিল আমরা তিনজনে যাইব—তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি, পরম পরিহসনীয়া শ্রীমতী ভ্রাতৃজায়া ঠাকুরাণীর নিকট ম্লানমুখে বিদায় লইবার জন্য সমস্ত উদ্‌যোগ করিতেছি এমন সময় শুনা গেল তিনি তাঁহার দুইটি পুণ্যফল তাঁহার শ্রীমতী যথা ও শ্রীমান্ সর্বস্বটিকে লইয়া আমাদের অনুবর্তিনী হইবেন।' ['ভারতী' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৫৬]

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তখন পুত্রকন্যা ইন্দিরা ও সুরেন্দ্রনাথকে নিয়ে সার্কুলার রোডের ভাড়াটে বাড়িতে থাকতেন। সত্যেন্দ্রনাথ সে সময় সোলাপুরে জজিয়তি করছেন, কিন্তু ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্যে জ্ঞানদানন্দিনী থাকতেন কলকাতায়। জাহাজে করে নদীপথে বরিশাল ভ্রমণে একলা নারীর পক্ষে 'তিনটি বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষমানুষে'র অনুবর্তিনী হওয়া—বিশেষতঃ পরিবারের সেই শোকাবহ দুর্বিপাকের পটভূমিতে—একটু দৃষ্টিকটু মনে হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ছিলেন অসামান্যা রমণী। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে একাধিকবার যে দুঃসাহসিক পরীক্ষা করেছেন তার কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.-এর সহধর্মিণী হিসাবে তাঁকে যে-সমাজে মিশতে হত সে-সমাজের অভিজাত আদবকায়দা ও চলনধরনে অভ্যস্ত হয়ে তাঁর জীবনচর্যা যে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য পেয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। চিন্তায় ও আচরণে তিনি ছিলেন বাংলার নারীপ্রগতির অগ্রদূতী। তা ছাড়া দেবর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সমবয়স্ক। শৈশবে শ্বশুরগৃহে এসে খেলাধুলায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই তিনি প্রিয়সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলেন। 'স্মৃতিকথা'য় তিনি লিখেছেন কিশোরী-বয়সেও কিশোর দেবরের সঙ্গে দৌড়-ঝাঁপ করে তিনি 'লাইন পিন্‌স্' খেলা খেলতেন। কাজেই জ্ঞানদানন্দিনী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু দেবর-ভ্রাতৃবধূই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন একে অন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সেই মানসিক অবস্থায় তাঁকে সঙ্গদান করা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী নিশ্চয়ই তাঁর কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "সরোজিনী প্রয়াণে" সেই নদীভ্রমণের যে হাস্যোচ্ছল বর্ণনা দিয়েছেন তাতে এই জলযাত্রার চিত্রটি নানাদিক দিয়েই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। হাস্যপরিহাসে রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষাও তাঁর সে-সময়কার হৃদয়ানুভূতির পক্ষে বিষম ও বিসদৃশ। বিশেষতঃ সংক্ষিপ্ত আকারে সংকলিত হয়ে "সরোজিনী প্রয়াণ" 'বিচিত্র প্রবন্ধে' যে ভাবে গ্রথিত হয়েছে তাতে তাঁর এই আপাত-লঘুচিত্ততা তাঁর মানসবিচারের দিক দিয়ে বিভ্রান্তি-সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে। সাধারণ পাঠকের কথা দূরে থাক্, এমন কি রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার পর্যন্ত "সরোজিনী প্রয়াণে"র লেখককে মারাত্মকভাবে ভুল বুঝেছেন। তিনি লিখেছেন, 'কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর এক মাস পরে 'সরোজিনী প্রয়াণ' রচিত, এই রচনার মধ্যে যে লঘুভাব, যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, যে হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত সেই যুগের 'কোথায়', 'পুরাতন', 'নূতন' প্রভৃতি কবিতার সুর বা জীবনস্মৃতিতে বর্ণিত মনোভাবের বা পুষ্পাঞ্জলির উচ্ছ্বাসের সম্বন্ধ আবিষ্কার করা কঠিন।' এবং এই 'সম্বন্ধ আবিষ্কারে' অসমর্থ হয়ে প্রভাতকুমার রবীন্দ্র-মানসের বিচারে সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলছেন, 'আসল কথা, তাঁহার শোক বা সুখ কোনোটিই মনে স্থায়ী রেখাপাত করিত না—তাঁহার ভাবাবেগের পূর্ণ প্রকাশের জন্য—তাহা শোকই হউক বা সুখই হউক, তাহাকে উদ্‌বোধিত করিবার জন্য যতটুকু আঘাত (stimuli) প্রয়োজন হইত, ততটুকুমাত্র তিনি সহ্য করিতেন—তদতিরিক্তকে আমল দিতেন না। এই নিরাসক্তি তাঁহার চরিত্রে যে নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিয়াছিল, তাহার জন্য তিনি অন্যকে দুঃখ দিয়াছেন। তাঁহার দুঃখ intellectualised emotion-এর একটি রূপ মাত্র, তাঁহার কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুমাত্র; তারপর সৃষ্টিসুখ সম্ভোগ হইয়া গেলে বিস্মৃতির চিরপাথারে স্মৃতি ডুবিয়া যাইত।''

প্রভাতকুমারের মত জীবনীকারের পক্ষে এই বিভ্রান্তি বিস্ময়কর। যে বিরহের বহ্নিশিখাকে রবীন্দ্রনাথ

অগ্নিহোত্রীর মত অন্তরের নিভৃত কক্ষে সারাজীবন প্রোজ্জ্বল করে রেখেছেন সে সম্পর্কে এই মন্তব্য শুধু অশ্রদ্ধেয়ই নয়, পরম বেদনাদায়কও বটে। অথচ যে "সরোজিনী প্রয়াণে"র উপর নির্ভর করে প্রভাতকুমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় সেই প্রবন্ধটি ভাল করে পড়লে তিনি তাঁর এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে অনায়াসেই মুক্ত হতে পারতেন। আমরা পূর্বেই বলেছি 'বিচিত্র প্রবন্ধে' রচনাটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছে। 'ভারতী'তে পরিত্যক্ত অংশগুলিতেই রবীন্দ্রনাথের সে সময়কার মনোভাব গুপ্ত হয়ে আছে। প্রথম কিস্তিতেই তিনি লিখেছেন, 'হাসি-তামাসা অনেক সময়ে পর্দার কাজ করে, হৃদয়ের বে-আব্রুতা দূর করে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে সকলই শোভা পায়, কিন্তু নগ্ন প্রাণ লইয়া কিছু বাহিরে বেরোন যায় না—সে সময়ে প্রাণের উপর আবরণ দিবার জন্য গোটাকতক হাল্কা কথা গাঁথিয়া ঢিলেঢালা একপ্রকার সাদা আলখাল্লা বানাইতে হয়, সেটার রঙ কতকটা হাসির মত দেখায় বটে। কিন্তু সকল সময়ে এ রকম কাপড়ও জোটে না। সে অবস্থায় অসভ্যদের মত গায়ে রঙ করিয়া, উল্কি পরিয়া, এক ছটাক শুষ্ক দন্তচ্ছটা আধ সের জলে গুলিয়া সর্বাঙ্গে তাহারি ছাপ মারিয়া সমাজে বাহির হইতে হয়—কিন্তু সে হইলে কেমন সংয়ের মত দেখিতে হয়, এবং দেখিতে দেখিতে রংচং শুকাইয়া উঠে ও শরীর চচ্চড় করিতে থাকে। লেখাই লোকে দেখে, লেখকের কথা কি আর কেউ ভাবে।' ['ভারতী,' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ. ১৫৪]

আর একটু এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ লিখছেন, 'মরণের বাড়া আর ত তামাসা নাই।...কাঁদিলেই ত আমাদের হার হইল, এত বড় একটা ঠাট্টা যখন ধরা পড়িল, তখন ত আমাদেরই জিত। জীবনের সিংহাসনের উপর জরীজড়ানো মছলন্দ পাতিয়া আমাদিগকে পুতুলটির মত সমস্ত দিন কে বসাইয়া রাখিয়াছে, অবশেষে সন্ধ্যাবেলাটিতে মছলন্দখানি তুলিয়া দেয়, দেখা যায় খানকতক চিতার কাষ্ঠ—এই ত পরিহাস; এইজন্যই ত এত বিরাট অট্টহাস্য! আমরাও হাসিতেছি—হাঃ হাঃ হাঃ!' [পৃ. ১৫৬]

ভাদ্রের 'ভারতী'তে "সরোজিনী প্রয়াণে"র দ্বিতীয় কিস্তির শুরুতেই আবার কবি লিখছেন, 'আবার কেমন হৃদয়ের মধ্যে মেঘ করিয়া আসে—লেখার উপরে গম্ভীর ছায়া পড়ে,—মনের কথাগুলি শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রুর আকারে ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে চায়। কিন্তু এ লেখার বাদ্‌লা কাহারো ত ভাল লাগিবে না। আমার মনের মধ্যে যাহাই হউক, আমি নিজের মেঘে পাঠকের সূর্যকিরণ রোধ করিয়া রাখিতে চাই না—সুতরাং নিশ্বাস ফেলিয়া আমি সরিয়া পড়িলাম, আর সমস্ত প্রকাশ হউক।'

লেখক 'নিজের মেঘে পাঠকের সূর্যকিরণ রোধ' করতে চান নি, তাই প্রবন্ধ রচনার সময় স্বগতোক্তির মত অভিব্যক্ত এই অংশগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে তিনি বর্জন করেছেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় "সরোজিনী প্রয়াণ"কে ভাল করে তলিয়ে পড়েন নি বলেই প্রভাতকুমার রবীন্দ্র-মানসবিচারে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন।

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ দ্রষ্টব্য: 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ,' পৃ. ২৩২-২৩৩।

২ শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ১৩২৪ সালের ৮ আষাঢ়। দ্রষ্টব্য: 'কবিতা'—১৩৪৮ কার্তিক।

৩ আহ্বান, পূরবী।

৪ দ্রষ্টব্য, 'রবিচ্ছায়া', গীতবিতান পৃ. ৮৬২-৮৬৩।

৫ দ্রষ্টব্য, 'কড়ি ও কোমল', রবীন্দ্ররচনাবলী—২, পৃ. ৬৬-৪৭।

৬ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩।

৭ রবীন্দ্রজীবনী—১, পৃ. ১৫৫।

প্রসঙ্গ কথা

আধুনিক কবিতার ভাষা

নারায়ণ চৌধুরী

আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সে ভাষার উপর দুটি প্রান্তীয় প্রয়োগ-ীতির প্রভাব অতি-প্রবল। হয় সে ভাষা অতিরিক্ত ংস্কৃতগন্ধী, নয় তো একেবারে সাদামাঠা নরম কোমল াটপৌরে শব্দের সমাহারে তারল্যধর্মী। সংস্কৃত শব্দ-ংস্কার অবলম্বন করে যাঁরা বাংলা কবিতা রচনার প্রয়াস রেছেন (যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত) তাঁদের যুক্তি এই যে, ই বিশেষ ধ্বনির আদর্শ অনুসরণের ফলে বাংলা কবিতায় জঃগুণ ও দার্ঢ্যের সমাবেশ ঘটছে, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যে য দুটি বৈশিষ্ট্যের একান্ত অসদ্ভাব। দীর্ঘকাল যাবৎ বাংলা বিতা বৈষ্ণব ভাবরস দ্বারা অভিসিঞ্চিত হওয়ার ফলে বং প্রধানতঃ গীতি-কবিতার আদর্শ বাংলা কাব্য-সংসারে মধিক আদৃত হওয়ায় এ কাব্যের ভাষায় বড্ড বেশী লানো-হেলানো ললিত-লুলিত লবঙ্গলতার ভাবটি প্রবেশ রেছে। ভাষার এই অতি-কমনীয়তা ও লালিত্যকে পহত করবার জন্য বিধিবদ্ধভাবে সংস্কৃত পদসুলভ ক্তাক্ষর শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ দ্বারা ধ্বনির গাম্ভীর্য সৃষ্টি রা প্রয়োজন আর তা করতে হলেই সংস্কৃত কাব্যের ীতিতে ঠাসবুনন আঁটসাঁট বাক্যবিন্যাসপদ্ধতির অনুশীলন কান্ত করণীয়। মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' ও 'তিলোত্তমাসম্ভব' াব্যে এবং হেম ও নবীনচন্দ্র তাঁদের কাব্যরচনায় মধুসূদনের ই ধারা অনুসরণ করে বাংলা কাব্যে শব্দব্যবহারের যে কটি অতিপিনদ্ধ সুসংহত ধীরোদাত্ত ভঙ্গীর প্রবর্তন রেছিলেন, সে আদর্শ পরবর্তীকালে তেমন ভাবে অনুসৃত য় নি। বিহারীলালের সময় থেকে আবার শব্দ াবহারের ললিত-লুলিত কমনীয় ভাবটি বাংলা কাব্যে মশঃ প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে এবং এক সময়ে তা য সব প্রভাব হটিয়ে দিয়ে স্বয়ং একচ্ছত্র হয়ে ওঠে। সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখ আধুনিক কবিরা ললিতাদর্শের এই একচ্ছত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী মনোভঙ্গীর বশে মধুসূদনের কাব্যাদর্শকে বাংলায় পুনরায় ফিরিয়ে আনতে চাইছেন আর তারই ফলে তাঁদের রচনায় সংস্কৃত কাব্যসুলভ ধ্বনিবহুলতার এই সর্বাতিশায়ী অস্তিত্ব।

অপরপক্ষে, জীবনানন্দ দাশ, সমর সেন প্রমুখ কবিরা যেন সংস্কৃত ধ্বনি-সংস্কারের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব বশতঃই ভাষার ভিতর একটা আটপৌরে সহজ কথ্যভঙ্গীর অবতারণা করেছেন এবং এতদ্দ্বারা বাংলা কাব্যের সনাতন ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। জীবনানন্দ প্রমুখ কবিরা তাঁদের কাব্যে যে ভাষা-রীতির প্রয়োগ করেছেন তার যে একটা নিজস্ব স্বাদগন্ধ নিজস্ব আকর্ষণ নেই তা নয়, তবে সে ভাষার সঙ্গে বাংলা কাব্যের চিরাগত ধারার যোগসূত্র অতিশয় ক্ষীণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্বন্ধে এই নিবন্ধেরই পরের দিকে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবার অবকাশ হবে। আপাততঃ এই বক্তব্য যে, আধুনিক বাংলা কবিতার ভাষা-রীতি অনেক দিন বাংলা কাব্যভাষার মধ্যগ পথ বর্জন করে ঘড়ির দোলকের মত হয় ভাষার এ-প্রান্তে নয় ও-প্রান্তে দোল খেয়ে ফিরছে। সে ভাষার ভারসাম্য স্থির নেই, কেন্দ্রবিচ্যুত হয়ে তা দুই চূড়ান্ত বিপরীত অভ্যাসের অভিমুখী হয়েছে। আজকের কবিতায় হয় আমরা প্রায়শঃ দুর্বোধ সংস্কৃত শব্দের ঠাসবুননে তৈরী ততোধিক দুর্বোধ কবিতা নামধারী এক একটি প্রহেলিকার সম্মুখীন হচ্ছি, নয় তো সর্বপ্রকার প্রসাধনপারিপাট্যবর্জিত, ওজঃগুণ গাম্ভীর্য ও শ্রীরহিত আটপৌরে মামুলী শব্দের অন্তহীন পংক্তি-মিছিল চোখের উপর শোভমান (?) দেখতে পাচ্ছি। দুই-ই চিরাগত বাংলা কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য সুতরাং উৎকেন্দ্রিক, নবীনত্বপ্রয়াসী কিন্তু উদ্ভট।

আধুনিক বাংলা কবিতার এই উৎকেন্দ্রিকতা ও উদ্ভটত্ব সম্পর্কে আরও একটু সবিস্তারে আলোচনা করা যেতে পারে।

সুধীন্দ্রনাথদের প্রবর্তিত নূতন কাব্যরীতি সম্পর্কে বলা যায়, এই রীতির কবিতায় গাম্ভীর্য ও ওজঃগুণের একটা আপাত-প্রতীয়মানতা লক্ষ্য করা যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু যেহেতু তা প্রসাদগুণবর্জিত সেই কারণে ওই গাম্ভীর্য ও ওজঃগুণকে কতকটা সংশয়াপন্ন দৃষ্টিতে দেখাই আমাদের উচিত। শব্দের ওজঃগুণ শব্দের প্রসাদগুণকে বাদ দিয়ে নয়। শব্দের ঘনঘটা আছে অথচ সব জড়িয়ে শব্দের মধ্যে প্রাঞ্জলতার অভাব এমনতর শব্দ সমাবেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা একটু শক্ত। সুধীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—

তিলভাণ্ড সর্বনাশ ; অতিদৈব বিশ্বের দেউল :
প্রার্থনা বা অভিযোগ বৃথা :
প্রতিজ্ঞাবিস্মৃত কল্কি ; কিংবদন্তী শিবের ত্রিশূল ;
শূন্যকুম্ভ পুরাণ, সংহিতা।
অন্যোন্যসম্বল আজ ত্রিভুবনে আমরা দুজনে ;
আমাদের পটভূমি নিরপেক্ষ, নিষ্ফল নৈমিষ।
অতীতের পক্ষাঘাত, ভবিষ্যের বাচাল কুলিশ
অনাথ দুর্গের ধ্বংস রটাবে না কপোতকূজনে ;
অক্ষমের আবাশ্যক ক্ষমা
এখানে কীর্তিত নয়, বন্ধুত্বের বিড়ম্বনা নেই,
রাবণের দূতী-রূপে পতিসেবা করে না সরমা,
স্বাবলম্বী—মরে সে প্রাণেই ॥

("উপসংহার," 'সংবর্ত')

কিংবা,

উপরন্তু দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কলহকলাপে
আমার অদ্বৈতসিদ্ধি পণ্ড হয়ে থাক বা না থাক,
অকাল জরায় আমি অবরুদ্ধ নই শক্রশাপে ;
অজাত পুরুর সঙ্গে ব্যতিহার্য নয় দুর্বিপাক।
অর্থাৎ প্রকট বলে সম্ভোগের অনন্ত বঞ্চনা,
পঞ্চাশে পা না দিতেই, অন্তর্যামী নৈমিষে নির্বাক :
এবং রটায় বটে মাঝে মাঝে আজও উদ্ভাবনা
পরিপূর্ণ মহাশূন্য ভস্মীভূত জ্যোতিষ্কের প্রেতে,
প্রাক্তন অভ্যাসদোষে ভুলে যায় মৌনের মন্ত্রণা
উন্নীত অমর কাব্যে কাগজের সুকুমার খেতে ;
কিন্তু চিত্তবিক্ষেপেও অভিব্যাপ্ত বর্তুল সংসার
যেখানে আসক্তি, ঘৃণা ভিন্ন শুধু প্রাগ্‌বর্তী সংকেতে,
এবং চক্রাক্রান্তভুক্ত পূর্বাপর নিপাত, উদ্ধার
যেহেতু, আমাকে তাই অনুযোগ, শোচনা, ঈর্ষাদি
ক্ষেপাতে পারে না আর।

("যযাতি", 'সংবর্ত')

তখন আলঙ্কারিক-কথিত ব্যঙ্গার্থ তো বহু পরের কথা, বাচ্যার্থও তা থেকে কিছু নিষ্কাষণ করা যায় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করব, যে-কোন বক্তব্য—তা সে গদ্যেরই হোক আর কবিতারই হোক—প্রসঙ্গ থেকে বিশ্লিষ্ট করে উপস্থাপিত করলে তার অর্থবোধে কিছু অসুবিধা ঘটে। কিন্তু প্রসঙ্গ বিচ্ছেদের কারণে কবির যেটুকু প্রশ্রয় প্রাপ্য, সেই প্রশ্রয় স্বীকার করেও কি উৎকলিত কবিতাংশ দুটির অর্থোদ্ধার করা যায়? মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতায় আমরা সংস্কৃত ধ্বনিবহুল শব্দের যে ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ্য করি তার বিন্যাস দৃঢ়পিনদ্ধ হলেও তা প্রাঞ্জলতাগুণরহিত নয়। তার ভিতর শব্দের আড়ম্বর আছে ঠিকই, সেই সঙ্গে সুস্পষ্ট অর্থের দ্যোতনাও আছে। ধ্বনিতে এবং অর্থে মিলে সেখানে কাব্য—কাব্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে বাক্ ও অর্থের আদৌ কোন সম্পৃক্তি ঘটে নি, ফলে দুইয়ের মিলন-সম্ভাবনায় খিটিমিটিরই শুধু উদয় হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ এ-জাতীয় রচনাদর্শ বাংলা কাব্যপাঠকের সমক্ষে উপস্থাপিত যে ঠিক কী উদ্দেশ্যে করেছেন বোঝা বাস্তবিকই একটু শক্ত।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্যরীতির পক্ষাবলম্বী কেউ কেউ বলে থাকেন, তাঁর কবিতার বহিরঙ্গটাই শুধু যা একটু আড়ম্বর-পূর্ণ ও ভীষণদর্শন, অবধান-পূর্বক কোনপ্রকারে একবার তাঁর যত্নসজ্জিত আপাতদুর্ভেদ্য শব্দব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, সেই যত্নকৃত শব্দসজ্জার অন্তরালবর্তী অর্থ খুব বেশী জটিল নয়, বরং প্রচলিত অনেক আধুনিক কবিতার তুলনায় সরল। এর উত্তরে বক্তব্য এই যে, তা-ই যদি হবে তবে এত ঠাটেরই বা কী দরকার। সহজ কথা সহজ সুরে বললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। কবি বা মনীষীরা জটিল ভাব-কল্পনা জটিল চিন্তাকে প্রকাশ করবার জন্যই সাধারণতঃ জটিল বাগ্‌ভঙ্গীর আশ্রয় নিয়ে

থাকেন। আশ্রয় নিয়ে থাকেন, কারণ ও ভিন্ন ভিন্নতর উপায় তাঁদের জানা নেই। দুরূহ ভাবকে সহজ ভাষায় প্রকাশ করার কৌশল জানা থাকলে নিশ্চয় তাঁরা সে কৌশলের ব্যবহার করতেন। সহজ প্রকাশরীতির অভাবেই তাঁরা সাধারণতঃ জটিল প্রকাশরীতির আশ্রয়ী হন। কিন্তু এ তো তা নয়, এ একেবারে উল্টো প্রক্রিয়া। সহজ সরল, ক্ষেত্রবিশেষে মামুলী, ভাবকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য কঠিনের ধূম্রজাল সৃষ্টি। কেন এই কঠিনের বাতাবরণ বোঝা সহজসাধ্য নয়। চমকসৃষ্টিই কি এর উদ্দেশ্য! কিংবা স্বীয় কাব্যদৈন্যকে আড়াল করবার এ একটা চতুর প্রক্রিয়া? 'চতুর' বলছি এ কারণে যে, অনেক বুদ্ধিমান তথাকথিত মননজীবী সমালোচক বিদগ্ধজনকেও এই প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভ্রান্ত হতে দেখেছি। যার দরুন এই বিভ্রান্তির কুহক, তাকে চতুর বলা ছাড়া উপায় কী।

জীবনানন্দ দাশের কবিতায়ও যথেষ্ট দুর্বোধ্যতা আছে, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে সে দুর্বোধ্যতার পার্থক্য এইখানে যে, জীবনানন্দের কবিতার ভাষাভঙ্গী যাই হোক তাঁর রচনায় কবিত্বশক্তির স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। জীবনানন্দ একজন খাঁটি কবি। তাঁর ভিতর কবিপ্রতিভা সহজাত। কাব্যের পরিমণ্ডলের মধ্যেই তাঁর সতত বিচরণ ছিল। তাঁর কবিতায় যে দুর্বোধ্যতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা সমর্থনযোগ্য না হলেও তার একটা যৌক্তিকতা বোঝা যায়। সে দুর্বোধ্যতা এসেছে ওই বিশেষ কবি-প্রকৃতির আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে, তার ঐকান্তিক মনোজীবিতা থেকে। শেষের দিকে জীবনানন্দ রূপরসগন্ধশব্দস্পৃষ্ট বহির্জগৎ থেকে দৃষ্টি প্রত্যাহরণ করে তাকে এত বেশী অন্তর্মুখী ও মনোনিবদ্ধ করে তুলেছিলেন যে দুর্বোধ্যতার অভিশাপ এড়াবার আর তাঁর জো ছিল না। বহির্মুখী রূপতান্ত্রিক কবির মনোজীবী কবিতে পরিণতির বেলায় এইপ্রকার বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। খাঁটি একজন কবির ক্ষেত্রে এই দুর্বোধ্যতাকে তাঁর ভাবগাঢ় জটিল কবিমানসের ব্যঞ্জনাঘন প্রকাশপ্রয়াসের অনিবার্য পরিণামফল ভেবে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের বেলায় সেরকম কোন স্বীকৃতির অবকাশ নেই। তাঁর কবিতা ব্যঞ্জনারহিত। তাঁর কবিতার বক্তব্যের মধ্যে তাত্ত্বিক সমৃদ্ধি থাকতে পারে, দার্শনিকতার অভ্রংলেহী বিস্তার থাকাও অসম্ভব নয়, কিন্তু সে কবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য নেই। কবিকল্পনার সোনার লেখার সামান্য আঁচড়ও তাঁর রচনার উপর পড়ে নি। যেখানে কল্পনা নেই, কল্পনার ব্যঞ্জনান্বিত প্রকাশচেষ্টা নেই, সেখানে দুর্বোধ্যতারও কোন অবকাশ নেই। সুধীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্যতা লোক-দেখানো, বিভ্রমসৃষ্টিকারী। একান্তভাবে শব্দসজ্জাকে অবলম্বন করে এ দুর্বোধ্যতার ঠাট গড়ে উঠেছে। তাঁর কবিতায় কল্পনাদৈন্যকে ঢাকবার জন্য তাঁকে শব্দের রুক্ষ পরুষ অসি-ঝঞ্ঝনা সৃষ্টি করতে হয়েছে। এ শব্দের মোহে বিমুগ্ধ হন শুধু তাঁরাই যাঁদের সংস্কৃত বাংলা কোন ভাষারীতির সঙ্গেই সম্যক্ পরিচয় নেই। সুধীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ এই শ্রেণীর পাঠকদের জন্যই লেখেন। অভিধান তাঁর কবিতা রচনার এক প্রধান অবলম্বন। অভিধান শব্দের রক্ষণক্ষেত্র মাত্র, প্রয়োগক্ষেত্র নয়। আভিধানিক শব্দসম্ভার ইতস্ততঃ সংযোজনার দ্বারা ভাষার প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায় না এ কথা আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা দরকার।

অন্যপক্ষে জীবনানন্দের কবিতায় আছে সহজ সরল আটপৌরে শব্দের একটানা একঘেয়ে একটা মন্থর প্রবাহ। এ ভাষায় অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা অনস্বীকার্য। এর কবিত্ব মনকে স্পর্শ করে, কিন্তু, যে কথা পূর্বে বলেছি, এই ভাষা বাংলা কাব্যের পূর্বঐতিহ্যবিমুক্ত। জীবনানন্দের কবিতা থেকে ইতস্ততঃ দুই-একটি অংশ উদ্ধার করা যাক—

> জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
> সন্তানের মতো হ'য়ে—
> সন্তানের জন্ম দিতে-দিতে
> যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়
> কিংবা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
> যাহাদের; কিংবা যাহারা পৃথিবীর বীজ খেতে
> আসিতেছে চ'লে
>
> জন্ম দেবে—জন্ম দেবে ব'লে;
> তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
> আমার হৃদয় নাকি? তাহাদের মন
> আমার মনের মতো নাকি?
> —তবু কেন এমন একাকী?
> তবু আমি এমন একাকী।

("বোধ", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

কিংবা,

> ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন—খেতে
> মাঠে পড়ে আছে খড়
> পাতা-কুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।
> এই সব উৎরায়ে ওইখানে মাঠের ভিতর
> ঘুমাতেছে কয়েকটি পরিচিত লোক আজ—
> কেমন নিবিড়।
> ওইখানে একজন শুয়ে আছে—দিনরাত দেখা হ'তো
> কতো কতো দিন,
> হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে
> কতো অপরাধ;
> শান্তি তবু: গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
> আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার
> অন্ধকার স্বাদ।
> ("ধান কাটা হয়ে গেছে", 'বনলতা সেন')

এরকম যে-কোন কবিতা বা কবিতাংশ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তার ভিতর একটা শহুরে কথ্যরীতির সহজ আমেজের একটানা প্রবাহ বয়ে চলেছে। এই রীতির সঙ্গে বাংলা কাব্যের পুরাতন ঐতিহ্যের যোগ তো কোন্ ছার, রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের সঙ্গেও তার বিশেষ কোন পরিচয়-সম্পর্ক নেই। এ-ভাষার আদল একান্তভাবেই ইংরেজী শিক্ষাভিমানী নাগরিক মধ্যবিত্তের সংস্কারকে মনে করিয়ে দেয়। এমন এক সংস্কার যার সঙ্গে গ্রামজীবনেরও কোন যোগ নেই, শহরের বিশাল-বিচিত্র শ্রমশীল জনজীবনেরও আত্মীয়তা অনুপস্থিত। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শের প্রভাবে গত শতাব্দীতে বাংলা দেশে একটা বলিষ্ঠ কর্মনিষ্ঠ সংস্কারকামী শিক্ষিত শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল, যে শ্রেণীর স্বীকৃত প্রতিনিধিগণ বাংলার সংস্কৃতি ও শিক্ষাজীবনকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন। বাংলা দেশে সেই শ্রেণীর মানুষের ছিটেফোঁটা নমুনা মাত্র আজ অবশিষ্ট আছে। শ্রেণীটির বিলোপ ঘটেছে। আজ অনেকেই শিক্ষিত—ইংরেজী শিক্ষিত—, পূর্বের তুলনায় তাঁদের রুচিও হয়তো সুমার্জিত। কিন্তু তাঁদের চরিত্রে জোর নেই। এঁরা শহরে গাদাগাদি করে বাস করেন আর বুদ্ধিবাদের মন্থর আলস্যে আত্মকেন্দ্রিকতার বিজৃম্ভন করেন। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষাভিমানী শ্রেণীর প্রাণের এতটুকু নৈকট্য নেই। সমাজসেবার আদর্শ থেকে এঁরা বহু দূরে। এঁরা কিছুই করেন না—সাহিত্যসেবা করেন না, সমাজসেবা করেন না, ব্যবসায় করেন না, শিল্পোদ্যোগে নিরত নন, শুধু চুটিয়ে—চাকরি করেন। আরামের পান থেকে চুনটি খসলে এঁদের চলে না। এই শ্রেণীর মানুষ যে ভাষায় মনন করেন ভাবনা করেন কথাবার্তা বলেন জীবনানন্দের কবিতায় তারই একটি সূক্ষ্ম কাব্যরূপের প্রতিভাস খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনানন্দ স্বয়ং এই শ্রেণীর একজন প্রতিনিধি। এই শ্রেণীর মানুষের লক্ষণই হল শহরের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবনযাত্রায় এতটুকু ব্যত্যয় না ঘটিয়ে পশ্চাদ্‌স্মৃতিচারণের দ্বারা স্বপ্নকল্পনায় পল্লীর ধ্যানসুন্দর রূপ প্রত্যক্ষ করা। জীবনানন্দ পল্লীকে দেখেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে শহুরে চোখে। তাঁর শহুরেপনার মধ্যে বিজাতীয় কাব্যাদর্শ একটা মস্ত জায়গা জুড়ে আছে। আমি ইউরোপীয় কাব্যাদর্শে সুকর্ষণার পক্ষপাতী, কিন্তু তার মানে এ নয় যে স্বজাতির কাব্য-ঐতিহ্যকে বরবাদ করে পাশ্চাত্ত্য কাব্যকলার উপর নির্ভরশীল হতে হবে। এরকম বিপরীত প্রক্রিয়ার অনুশীলনে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সামান্যই হয়। এর বিপদসম্ভাবনাও অনেক। জীবনানন্দীয় কাব্যকলার সংস্কার যদি তরুণ মনের উপর ক্রমাগতই প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং সে প্রভাব প্রায়-একচ্ছত্র হয় তা হলে শুধু যে আমরা বাংলা কাব্যের প্রবহমান ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ব তা-ই নয়, আমাদের ব্যক্তিত্বের শক্তিও অনেক কমে যাবে। জীবনানন্দের কবিতায় যেটুকু মনন আছে সুস্থ আদর্শের ঘোষণা আছে বর্তমানকালীন অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে সেটুকুই ভরসা, নয়তো তাঁর ধাঁচে ও ধরনে বাংলা কবিতায় নিরবচ্ছিন্ন রোমান্টিকতারই যদি কেবল অনুশীলন হতে থাকে তা হলে আমাদের তরুণ সমাজের ভবিষ্যৎ ভেবে আশঙ্কিত হতে হয় বইকি। জীবনানন্দ শেষের দিকে বড্ড অন্তর্মুখী হয়ে পড়েছিলেন ('মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাবলী দ্রষ্টব্য)। এত বেশী অন্তর্মুখীনতা ভাল নয়। প্রজ্ঞার দ্বারা সংযত না হলে ওটি বহুবিধ মনোরোগের কারক হয়ে থাকে। তার চেয়ে জীবনানন্দের গোড়ার দিককার রূপতাত্ত্বিক কীর্তনীয়

দৃষ্টিই ভাল ছিল। ওই বহির্মুখী দৃষ্টির মধ্যে বেশ একটা সতেজ প্রাণের বল নিহিত আছে।

যাই হোক, জীবনানন্দের কবিতা এই মুহূর্তে আমার আলোচ্য নয়, এখানে আধুনিক কবিদের ভাষাপ্রসঙ্গই প্রধান বিচার্য বিষয়। শেষোক্ত মানদণ্ডের বিশ্লেষণে জীবনানন্দের কাব্যরীতিকে আমার ঐতিহ্যহীন বিজাতীয় বলিষ্ঠতাবর্জিত এক অনাত্মীয় কাব্যরীতি বলে মনে হয় সে কথা অকপটে স্বীকার করব।

অন্যদিকে সমর সেনের কবিতায়ও আছে বাস্তবতার নামে বিজাতীয়তারই আর এক পোঁচ ঘনতর কালো কলঙ্ক। এ একেবারেই বিদেশী কবিতার অনুবাদ। একটি পুরো কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি—

সাজানো বাগানে শবাহারী শৃগাল,
খাপছাড়া ঘুমে দূরে শুনি জোয়ারের জল,
কিসের কল্লোল!
বাঁধ ভেঙে বন্যার জল।

শূন্য মাঠে কোটরহীন চোখের মতো গ্যাসের
আলো ঝোলে।
কার্নিভ্যাল শুরু হল, রেসখেলা শেষ,
কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখ ছেয়েছে নগর।
এখনো আলোছায়া কাঁপে কারো কারো চোখে,
নির্জন দ্বীপ শ্যামল শরীরে মেলে,
শীতের দিনে অনেক দূরের পাহাড় যেন কাছে
সরে আসে।

("ক্রিসমাস", 'সমর সেনের কবিতা')

এটি একটি বিচ্ছিন্ন নমুনা নয়, সব কবিতারই ধরন-ধারণ প্রায় এক। উৎকলিত অংশটিকে গদ্য ছাড়া আর কী বলা যায়। আর পূর্বাপরসম্পর্করহিত অসমাপ্ত-ভাব ওই গদ্যেরই বা কী সার্থকতা! খাঁটি গদ্যে ইনি কি কখনও পূর্ণবক্তব্যসমন্বিত দুই লাইনও বাংলা লিখেছেন?

সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে সমর সেন এই কবিত্রয়ের কবিতার ভাষা অনুধাবন করে একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়, তা হচ্ছে এই যে, এঁরা বাংলা গদ্যে হাত পাকাবার পূর্বেই বাংলা কবিতায় হস্তনিয়োগ করেছেন। তাইতে তাঁদের বাক্যরচনায় এত অসঙ্গতি বৈসাদৃশ্য আর আড়ষ্ট বাক্যাংশের প্রাদুর্ভাব। কবিতার ভাষা আর গদ্যের ভাষা এক নয় মানি, তাদের গঠনধর্মের মধ্যে পার্থক্য স্বতঃসিদ্ধ; তা বলে কবিতার আত্মা কবিতার বহিরঙ্গ বাদ দিয়ে এমন তো নয়। কবিতার এই বহিরঙ্গ অনুশীলনে গদ্যভঙ্গীর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় অপরিহার্য। এঁরা সেই আবশ্যিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন বলে মনে হয় না। ভাষার দেহ জয় না করেই এঁরা ভাষার আত্মা জয়ে বহির্গত হয়েছেন। ভাষার বাচ্যার্থের বোধ নেই, ভাষার নিহিতার্থ নিয়ে অনুশীলন-পরিশীলনে রত। এ রকম অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবার চেষ্টায় বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী আর তা এঁদের কাব্যসাধনার বেলায় ঘটেছেও। এঁদের সম্ভবতঃ এই ধারণা যে, মুখের কথা থেকেই সরাসরি কবিতার পাতায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, গদ্যসাধনার মধ্যবর্তী স্তরটিতে কিছুকাল সংলগ্ন হয়ে থাকবার আবশ্যকতা নেই। যেমন অনেকের ধারণা যে মুখের কথায় চোস্ত হলে লেখায়ও অনুরূপ চোস্ত হওয়া যায়, এ-ও বোধ হয় অনেকটা সেই জাতীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের ব্যাপার। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দ্বারা চালিত হওয়ার ফলে কাব্যচর্চায় কী সাংঘাতিক বিভ্রাট ঘটে তার নজির তো আধুনিক বাংলা কবিতায় অহরহই প্রত্যক্ষ করছি। সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে সমর সেন ওই বিভ্রাট সৃষ্টির পুরোধা।

জানি এঁরা পুরাতন বাংলা কবিতার নজির উত্থাপন করবেন। সে যুগে বাংলা গদ্যের জন্ম হয় নি, তৎসত্ত্বেও এমন চমৎকার বাংলা কবিতা লেখা হল কী করে। এর উত্তরে বলব, সে যুগে কবিদের কল্পনা মনন ধ্যান এতটা জটিলতাপ্রাপ্ত হয় নি, যেমন এ যুগে হয়েছে। এ যুগের দুরূহ ভাবনা কল্পনাকে কাব্যে ফলপ্রদভাবে প্রকাশ করতে হলে তার আগে কিছুকাল অন্ততঃ গদ্যে হাত মকশ করা দরকার। নয়তো কল্পনার জট খোলা সম্ভব নয়। কলমের আড়মোড় ভাঙাতেই অনেক দিন চলে যায়, সার্থকভাবে কল্পনার প্রকাশ তো দূরের কথা। আধুনিক কবিতায় এত যে দুর্বোধ্যতা, অস্পষ্টতার কুয়াসা, তা এই জন্যই নয় কিনা কে বলবে? আধুনিক কাব্যোৎসাহী সমালোচকেরা সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের রচনার ধোঁয়াটে কুয়াশার মধ্যে পদে পদে ব্যঞ্জনা-গুণ

আবিষ্কার করে রোমাঞ্চ-শিহরণ অনুভব করেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন, এই অস্পষ্টতা কতটা ব্যঞ্জনাগুণজাত আর কতটা ভাষাগত অনভ্যাসজাত? ভাষার আড়ষ্টতা আর পঙ্গুতার মধ্যে কেউ যদি ব্যঞ্জনাগুণ আবিষ্কারে অসমর্থই হন, সে কার দোষ? তাঁর চোখের দোষেই এটা ঘটে, না, কবিতাকারের হাতের দোষ এইজন্য দায়ী? বিবর্ণ তামার পাতের উপর অস্পষ্ট কিছু আঁকিবুঁকি দেখলেই যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মূল্যবান সংকেত পাওয়া গেছে বলে 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে ওঠেন, তাঁদের মনোভাবের সঙ্গে আধুনিক কাব্যের এই কথায় কথায় ব্যঞ্জনাসন্ধানী সমালোচকদের মনোভাবের তফাত কোথায়?

বিষ্ণু দের কবিতা আমার আরও উদ্ভট মনে হয়। গ্রীক পুরাণের ধূসর সেব্যের সঙ্গে লাটিন ভাষার অনুপান মিশিয়ে তার উপর বাইরে থেকে রামায়ণ-মহাভারতের কিছু ইতস্ততঃ উল্লেখ ছিটিয়ে দিয়ে (তিনি যে ভারতীয় তা প্রমাণ হওয়া চাই তো) যে বিচিত্র পথ্য বিষ্ণু দে তৈরি করেন স্বাদে গন্ধে তা অনবদ্য। এ কবিতা না বুঝলেও ক্ষতি নেই, পাঠকের সকল সমালোচনা নিরস্ত করবার জন্য রয়েছে কবির গালভরা পাণ্ডিত্য, সে পাণ্ডিত্যে কাবু হবেন না এমন কাব্যপাঠক বাংলা দেশে দেখি না। তদুপরি বিষ্ণু দের রয়েছে একটি অতিরিক্ত গুণ—তিনি গণপ্রেমিক কবি। শোষিত-দুর্গতের দুঃখে তাঁর অন্তঃকরণ অনুক্ষণ বেদনানীল। তিনি মননশীল কবি, তা বলে মননশীল লেখকদের সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা, তাঁর কাব্য সে ধারণার মূর্তিমান প্রতিবাদ। তিনি মননশীল হয়েও আত্মকেন্দ্রিক নন, গণ-দরদী। এমন সমন্বয় আধুনিক কবিকুলের মধ্যেও দুর্লভ। সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহী মন অবিরত ফুঁসছে, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জেহাদের আওয়াজ তোলার কবিতা রচনায় তিনি অগ্রণী, অথচ নিজে সরকারের একটি বাঁধা মাইনের স্থায়ী আরামপ্রদ চাকুরিতে নিয়োজিত থেকে পরম সুখে কাব্যচর্চায় কাল অতিবাহনে তাঁর বিবেকবোধ পীড়িত হয় না। যিনি শৌখীন সমাজের একজন ফ্যাশান-দুরস্ত প্রতিনিধি, তিনিই আবার জনতার প্রেমে বিগলিত। ইনটেলেক্টের ভাষায় তিনি জনজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যাখ্যা করেন। এমনতর অসম্ভব হাস্যকর অবিশ্বাস্য ব্যাপার বোধ হয় একমাত্র আমাদের সাহিত্যের পরিস্থিতিতেই সম্ভব। জনসাধারণের সুখদুঃখের অংশভাক্ না হয়েও যে জনসাধারণের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা যায় সেই মহৎ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে বিষ্ণু দে আমাদের কাব্যে অনন্য গৌরবের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর লেখনী অক্ষয় হোক।

'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' কাব্যগ্রন্থে "আমি তো গাঁয়ের লোক" কবিতায় বিষ্ণু দে লিখছেন—

> লালদীঘির পাপ ধুয়ে আমরা পৌঁছাই
> প্রতিবাদ,মুঠিতে মুঠিতে গঙ্গার ধারের পরিষদে
> পোড়ো দেশ শূন্যচর বাঙলার প্রাসাদে প্রাসাদে
> আমরা শহর চাই গাঁয়ে গাঁয়ে আরেক শহর
> আমরা সবাই আমরা গাঁয়ের লোক শহরের লোক
> আর এক কলকাতাই ॥

এত সহজে গাঁয়ের লোক হওয়া যায় না। সত্যিকারের শ্রদ্ধাপ্রেম নিয়ে গ্রামজীবনের স্তরে নেমে এসে গ্রামের সেবায় আত্মসমর্পণ করতে পারলে তবে ব্যক্তিত্বের ওই-প্রকার রূপান্তর সম্ভব।

বৈষ্ণবীয় ধাঁধার আরও দু-একটি নমুনা—

> প্রকৃতিতে মিলে থাকে আলো অন্ধকার
> চক্রে এক অনাদ্যন্ত, বোধ্যদুর্বোধ্যের অতীত
> স্ত্রীপুরুষ থাকে যথা, উভয়ত সম্বন্ধে একক
> জৈববিশ্বে অপঘাত ও স্বভাবে নিয়ত, আদি অন্তহীন,
> সমষ্টি ব্যষ্টির শত শত আপতিক জৈব সমাধানে।
>
> ("বহুধড়বা")

কেমন যেন সুধীন্দ্রনাথীয় গন্ধ ছড়াচ্ছে। অথবা,

> দিব্যমূর্তি বসেছিল, জায়েয়ারে চিত্র এক আঁকা:
> তৎসৎ: চৈতন্যের শূন্যে দ্বীপ! নিরালম্ব নীলে
> জীব বস্তু বীজ দ্রব্যে প্রজননে স্বেদাক্ত নিখিলে
> মৃত্তিকার প্রাণময় ভিড়ে একা, অমাবস্যা রাকা!
> উদাম গলায় বলে যারে কে ও? চাই না আকাশ,
> সোঽহম্ জানি আমি, আমি ছাড়া সবই নঙর্থক,
> আমিই বস্তুর বিশ্বে বস্তুবাদী আমি ভুঞ্জক, ইত্যাদি
>
> ("একজন দুঃস্বপ্ন")

এ রকম দুঃস্বপ্ন 'একজন' নয় 'বহুজন' ছড়িয়ে আছে বিষ্ণু দের কবিতাবলীর মধ্যে।

অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার একটি অংশ তুলে দিচ্ছি—

পাপোষে জুতো না ঘষে তোমরা যাত্রী সোজা এসো—
দরজা খোলা,
(পরিচ্ছন্ন বন আর কার্পেটের রুক্ষ রোজই ছোঁয়)
ঘরে শুধু নরমি আমেজ,
চারটে বড়ো বড়ো কাঁচ—সবই জানলা—ধারে
দাঁড়ালে ভাববে ফ্রেম, ছবি কৈ ?—দেখো ;
ঠিকরোনা রাঙা বন্যা পশ্চিমের পটে—
লাল মনসা, লাল মনসা
প্রত্যস্ত মানসী আগুন
লাল গালি দেয় তীব্র তামাটে পাহাড় দুটোকে,
কোণা-ওঠা পাঁজরা-কাটা যথার্থ সন্ন্যাসী পাহাড়—
আরিজোনা—
ধেয়ায় রঙের ধূম্রে উদাসীন।

("লাল মনসা," 'পারাপার')

এ রকম কিম্ভূত গদ্যগন্ধী শব্দ-সমাহারের দৃষ্টান্তই বেশী, তবে কিছু-কিছু বোধ্য কবিতাও আছে। ধ্বনিসম্পদরিক্ত মামুলী কথা সাজানোই যদি কবিতা হয় তা হলে অমিয় চক্রবর্তী রাশ রাশ কবিতা লিখেছেন অস্বীকার করা যায় না। তিনি আধুনিক ইংরেজী কাব্যকলায় ডক্টরেট ডিগ্রীধারী পণ্ডিত, বোধ হয় সেই সুবাদেই তিনি কাব্যচর্চার অধিকারী হয়েছেন এবং অচেতন তরুণমন তাঁকে কবি বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে অমিয় চক্রবর্তীর ভারতীয়তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। 'পারাপার' কবিতার বইয়ের "ভারতী" পর্বে তাঁর এই ভারতীয় মানসিকতার একাধিক প্রমাণ-স্বাক্ষর মুদ্রিত রয়েছে। আলোচিত কবিপঞ্চকের মধ্যে একমাত্র অমিয় চক্রবর্তীর কবিতার মধ্যেই যা সত্যিকার জাতীয়তার সংস্কার ও দেশাত্মবোধ কিছু লক্ষ্য করা যায়। কবির এই বৈশিষ্ট্যের মূলে তাঁর গান্ধীবাদের প্রতি শ্রদ্ধা অনেকখানি সক্রিয় রয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

বিদেশী আধুনিক কাব্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ কিংবা জীবনানন্দ কিংবা বিষ্ণু দে কিংবা সমর সেনের ঘনিষ্ঠ পরিচিতি আছে এবং তজ্জন্য তাঁদের কবিতায় এক ধরনের মানসিক বৈদগ্ধ্য বিদ্যমান সে কথা অস্বীকার করব না। কিন্তু এই মানসিক বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে স্বদেশীয় সংস্কার যুক্ত না হওয়ার দুর্বলতা ভয়াবহ। জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ না রেখে কেবলমাত্র বিদেশীয় কাব্য-সংস্কারের উপর নির্ভর করে যাঁরা মাতৃভাষা বাংলায় কাব্যচর্চা করেন তাঁরা প্রকারান্তরে আত্মখণ্ডন করেন। এ আত্মখণ্ডন তাঁদের কাব্যচর্চার স্বরূপ থেকেও কতকটা অনুধাবন করা যায়। স্বদেশীয় সংস্কারের স্থিরভূমির উপর দাঁড়িয়ে যদি এঁরা কাব্যচর্চা করতেন তা হলে এঁদের রচনার পরিমাণ এবং প্রকাশ এমন আকস্মিক, বিরতিচ্ছেদযুক্ত ও দুর্বলতার চিহ্নবাহী হত না। সে ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথের কবিতা প্রাচুর্যলক্ষণমণ্ডিত হত, সমর সেন থেমে যেতেন না, জীবনানন্দের কবিতার প্রভাব শুধুমাত্র অপরিণত তরুণ মনের উপর সীমাবদ্ধ থাকত না, বিষ্ণু দের কবিতার আবেদন নাগরিক ইনটেলেক্টবিলাসীদের গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ত, অমিয় চক্রবর্তী বিদেশকেই কাব্যচর্চার উপযুক্ত পরিমণ্ডল বলে মনে করতেন না। এঁদের সকলেরই কাব্যসাধনায় কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক আছে। তাই দেখা যায় বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের কোনরকম আত্মিক যোগ স্থাপিত হয় নি। এঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করেও বাঙালী সমাজের কেউ নন। আজ জীবনানন্দ গত হয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিপ্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক, সেটা শোভনও নয়; কিন্তু বাকী চারজন বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন, কতটুকু তাঁরা বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন এক শ্রেণীর কফিহাউসবিলাসী তরুণ কাব্যামোদীর উপর মোহ বিস্তার করা ছাড়া ?

বলা হবে তা হলে এ প্রবন্ধের অবতারণা কেন। এ প্রবন্ধের অবতারণা এই জন্য যে, আমরা কিছুকাল যাবৎ সন্ত্রস্ত হয়ে লক্ষ্য করছি বাংলা কাব্যের আর সব আদর্শ ও প্রকাশরীতিকে একপাশে সরিয়ে রেখে মোহগ্রস্ত তরুণমন এঁদেরকেই বাংলা কাব্যের একমাত্র সার্থক অভিব্যক্তিকার বলে ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। এটি অতীব দুর্লক্ষণ। এই ধারায় বাংলা কাব্যচর্চা অগ্রসর হলে বাংলা কাব্যসাহিত্যের ভরাডুবি সুনিশ্চিত। তাতে জাতীয় চরিত্রেরও অধোগতি অবধারিত। এখনও আমাদের মধ্যে কুমুদরঞ্জন কালিদাস

রায় সজনীকান্ত সাবিত্রীপ্রসন্নরা বেঁচে আছেন, আছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র বুদ্ধদেব বসু অজিত দত্ত বিমল ঘোষ দিনেশ দাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম প্রবীণ খাঁটি কবির দল; এঁরা কেউ নন, কবি হলেন শুধু এই দুর্বোধ কবিপঙ্কক? এ যে কী উদ্ভট হাওয়া কিছুদিন যাবৎ বাংলা কাব্য-সাহিত্যের উপর দিয়ে বইছে ভেবে ওঠা দায়। সম্প্রতি দেখছি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই চলতি হাওয়ার পন্থীদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছেন। আমাদের তাজ্জব বনে যাবার মত দুখ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের কর্তৃপক্ষের হঠাৎ এই চৈতন্যোদয় হয়েছে যে তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণে নবীন নন, প্রগতিশীল নন; তাই ভোল পালটে খোল-নলচে আর কলকে বদল করে রাতারাতি তরুণদের ক্যাম্পে এসে আসর জমিয়েছেন। এরই নাম শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে এসে মেশা। মনসামঙ্গল আর গাজীর গানের পরিশীলন থেকে একেবারে দীপ্তি ত্রিপাঠীর কাব্যপাঠে বৈশিষ্ট্য ও প্রদীপ্তি আবিষ্কার করা। আরও যেটা বিস্ময়কর, এঁর আধুনিক কবিপঙ্ককের উপর আলোচনার থীসিস পরীক্ষকদের মধ্যে ছিলেন আলোচিত কবিপঙ্ককদেরই নাকি একজন। এরকম থীসিসের সম্ভাবিত সৌভাগ্য পূর্বাহ্লেই অনুমান করা চলে। থীসিসের আলোচনায় কবিপঙ্কক ঠিকই আছেন, তফাতের মধ্যে, সমর সেনের জায়গায় বুদ্ধদেব বসুকে গ্রহণ করা হয়েছে। খুব সম্ভব বয়সের প্রতি সম্মানবশতঃই এটি করা হয়েছে, নতুবা সমর সেন হলেই থীসিসের spirit ঠিক রক্ষিত হত।

যাই হোক, এ সব লক্ষণদৃষ্টে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, আধুনিক বাংলা কবিতায় এক প্রচণ্ড সংকটের সূচনাকাল সমুপস্থিত। আদশবাদী বলে কথিত প্রবীণেরাও সস্তা জনপ্রিয়তার লোভে আর স্বীয় পদরক্ষার তাগিদে তরুণদের খাতায় এসে নাম লেখাচ্ছেন। এটি নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার। আদর্শবাদের এই বিচ্যুতিতে মনে বেদনার অনুভূতির সঙ্গে কেমন যেন একটা নৈরাশ্যের বোধও জাগে। তা হলে বোধ হয় সুস্থ কাব্যাদর্শের মর্যাদার স্বীকৃতি এ যুগে কিছুকালের জন্য অন্ততঃ বিলম্বিত হয়ে রইল। সত্যের পূর্ণসূর্য সাময়িকভাবে মিথ্যার রাহুর দ্বারা কবলিত হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই যখন এই দশা তখন অন্যান্যদের কথা আর কী বলব।

সম্প্রতি বিশিষ্ট কবি-সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন হয়েও পত্রান্তরে দুর্বোধ্য আধুনিক কবিতার তীব্র সমালোচনা করে এক নাটিকা প্রকাশ করেছেন ("ব্রহ্মদৈত্য," শারদীয়া যুগান্তর ১৩৬৫)। নাটিকাটিতে দেখানো হয়েছে, আধুনিক কবিরা এমন হেঁয়ালির ভাষায় আর উদ্ভট ছন্দে কবিতা রচনা করেন যাতে সেই কবিতার আবৃত্তি শুনে ব্রহ্মদৈত্যও দীর্ঘকালের বাসস্থল বেলগাছ ছেড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। লেখকের মতে ভূত তাড়াবার এমন মন্ত্র আর আবিষ্কৃত হয় নি। বিশী মহাশয়ের এই উপভোগ্য রচনাটির বিরুদ্ধে কোন কোন মহল থেকে বলা হয়েছে যে, এতে আধুনিক কবিদের বড্ড বেশী মসীবর্ণে চিত্রিত করা হয়েছে। আমি তা মনে করি না। হয়তো বর্ণনায় কিছু আতিশয্য আছে, কিন্তু সেটি এ জাতীয় রচনায় দোষাবহ নয়। আতিশয্যাত্মক সমালোচনা প্রহসনের একটি স্বীকৃত রীতি। সমাজে ফাঁকী এবং মেকী যখন ক্রমাগত প্রশ্রয় পায়, তখন ঘা দিয়েই জনচিত্তকে জাগাতে হয়। সকল সময় মিহি মোলায়েম সুরে কথা বলার অভ্যাস ভালও নয় উচিতও নয়। ক্ষেত্রবিশেষে কণ্ঠস্বর চড়াতে হয়। সমাজকল্যাণের প্রতি যাঁর লক্ষ্য আছে তাঁকে প্রয়োজনে নিষ্করুণ হতে হয়। কশাঘাতেও যেখানে সম্বিৎ আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পায় না সেখানে কি ক্ষীণ প্রতিবাদের মৃদু প্রলেপে কাজ হওয়া সম্ভব?

আধুনিক চিন্তার অগ্রদূত রামমোহন

বিনয় ঘোষ

আজ আমরা এক দুরন্তগতি সামাজিক রূপান্তরের যুগে বাস করছি। কিন্তু আজও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সেরকম বিকাশ হয়েছে কিনা সন্দেহ, যা দিয়ে আমরা রামমোহন রায়ের জীবনদর্শন উপলব্ধি করতে পারি এবং সমাজদর্শন বিচার করতে পারি। উপলব্ধি করে ও বিচার করে যদি আত্মস্থ করার বা গ্রহণ করার প্রশ্ন ওঠে, তা হলে প্রকৃত রামমোহনপন্থী আজকের প্রগতি-নিনাদিত সমাজে ক'জন খুঁজে পাওয়া যাবে, তা নিয়ে যথেষ্ট ভাববার কারণ আছে। ১৮১৬ সনে লণ্ডনের Missionary Register রামমোহনের আদর্শানুরাগীর সংখ্যা ৫০০ বলে উল্লেখ করেছিলেন। প্রায় ১৫০ বছর পরে, আজকের বিশগুণ বর্ধিত জনসমাজে, রামমোহনের আদর্শপন্থীর সংখ্যা পাঁচ শতের বিশগুণ তো হয়ই নি, পাঁচ শতই ঠিক আছে কিনা সন্দেহ। রামমোহনের পূজারীদের কথা বলছি না, কারণ বহু দেবদেবীর মত আজও আমরা বহু মানব-অবতারের পূজারী—এবং রামমোহন সারাজীবন এই বহু-দেবতা ও মানব-দেবতার পূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। তাতে যে সেদিন কেবল সাধারণ হিন্দুসমাজই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তা নয়, মুসলমানসমাজ ও খ্রীষ্টানসমাজও যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। ধর্মসংস্কারক হিসেবে তাঁকে কেবল হিন্দুধর্মের সংস্কারক বলা নিশ্চয়ই ভুল, মানবধর্মের সংস্কারক বলাই সমীচীন। কেন সমীচীন সে কথা পরে বলব। তার আগে, অত্যন্ত সংক্ষেপে হলেও, যে ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিবেশের মধ্যে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং মানুষ হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলা দরকার। এই সামাজিক পশ্চাদ্ভূমির সমস্ত ছোট-বড় দিকগুলি সম্বন্ধে অবহিত না থাকলে, তাঁর কাজকর্মের তো বটেই, তাঁর চিন্তাধারারও সম্যক্ বিচার করা সম্ভব হবে না।

সত্যকার যুগসন্ধিক্ষণ বলতে যা বোঝায়, আমাদের দেশের ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে রামমোহন রায় জন্মেছিলেন। ১৭৭২ কি ১৭৭৪ সনে তাই নিয়ে তারিখবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। আমাদের কাছে অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক এবং চতুর্থপাদ, অর্থাৎ ১৭৭৫ থেকে ১৮০০ সন পর্যন্ত তাঁর জন্ম, বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনের বিকাশকাল হিসাবে বিচার্য। পুরাতন সমাজব্যবস্থার দ্রুত ভাঙন এই সময়েই আরম্ভ হয়। নতুনের গোড়াপত্তনেরও সূচনা হয় সেই সঙ্গে। হাণ্টার বলেছেন, 'Before the commencement of 1771 (অর্থাৎ রামমোহনের জন্মকালে), one-third of a generation of peasants had been swept from the face of the earth, and a whole generation of once rich families had been reduced to indigence.' পুরাতন সমাজের স্তরবিন্যাসের একটা বিরাট ওলট-পালট হয়ে গেছে, তার আগের প্রায় একশো বছরের রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘোর দুর্যোগের মধ্যে। আভিজাত্যের স্তর ভেঙে পড়েছে, সাধারণ জন-স্তর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এদিকে তখন ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজত্বকাল। ১৭৭৩-এর রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে তিনিই প্রথম বাংলার গবর্নর-জেনারেল হয়েছেন এবং কলকাতা মহানগরে প্রধান বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তখনও মুর্শিদকুলিখাঁর আমলের রাজধানী মুর্শিদাবাদের নবাবী প্রতিপত্তির রেশ কেটে যায় নি। সরকার, আদালত, খালসা সবই মুর্শিদাবাদে, কলকাতা কেবল ক্রমবর্ধিষ্ণু একটা বাণিজ্যের বন্দর মাত্র। মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজস্ববিভাগ, খালসা ও বিচারবিভাগ স্থানান্তরিত করে, হেষ্টিংস এই সময় কলকাতা শহরকে নতুন যুগের রাজধানীতে রূপ দিলেন। স্থানান্তরের কারণ দেখিয়ে হেষ্টিংস কোর্ট অফ ডাইরেক্টার্সের কাছে যে চিঠি লেখেন তা এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লেখেন: "Another good consequence will be the great increase of

inhabitants and of wealth in Calcutta, which will not only add to the consumption of our most valuable manufactures imported from home, but will be the means of conveying to the natives a more intimate knowledge of our customs and manners." প্রধান বাণিজ্য-বন্দর হিসেবে কলকাতাই প্রধান কর্মক্ষেত্র। কলকাতায় সরকারী সমস্ত বিভাগ স্থানান্তরিত করলে যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকবে, হেষ্টিংসের চিঠিতে তারই ইঙ্গিত আছে। নবযুগের বাংলার প্রধান কর্মকেন্দ্র ও জীবনকেন্দ্র হয়ে ওঠে কলকাতা শহর অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থপাদ থেকে, অর্থাৎ ঠিক রামমোহনের জন্মকাল থেকে। হুগলী জেলার খানাকুল-কৃষ্ণনগর অঞ্চলে যেখানে রামমোহন জন্মেছিলেন, তাও কলকাতা থেকে বেশী দূরে ছিল না।

কলকাতা শহর যখন প্রধান শাসনকেন্দ্র হয়ে উঠল, তখন ঐতিহাসিক নিয়মেই নবযুগের নতুন সংস্কৃতিকেন্দ্র হতেও তার বাধা রইল না। ১৭৭৪ সনে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্টের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইংরেজী ভাষার সমাদর বাড়ল। রামকমল সেন, ১৮৩৪ সনে প্রকাশিত তাঁর ইংরেজী-বাংলা অভিধানের 'ভূমিকা'য় লিখেছেন: "In 1774, the Supreme Court was established here, and from this period a knowledge of the English language appeared to be desirable and necessary." তখন সুপ্রীম কোর্টের সাহেব অ্যাটর্নি-অ্যাডভোকেটদের বাঙালী ক্লার্করাই ছিলেন ইংরেজী ভাষার দিগগজ পণ্ডিত। তাঁরা ইংরেজীতে আরজি-পত্রাদি লিখতে পারতেন, আইনকানুনের জটিলতা জানতেন এবং মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য ইংরেজী শব্দের স্টকিস্ট ছিলেন। একটি খাতার মধ্যে তাঁদের ইংরেজী শব্দের স্টক মজুত থাকত। যাঁর যত বেশী শব্দের স্টক থাকত খাতায়, তিনি তত বড় ইংরেজীর পণ্ডিত বলে গণ্য হতেন। এঁরা স্কুল করে ইংরেজী শেখাতেন এবং ছাত্রদের কাছ থেকে তার জন্য বেতন নিতেন ৪৲ টাকা থেকে ১৬৲ টাকা পর্যন্ত। তখনকার দিনে ভাবা যায় না। বোঝা যায়, ইংরেজী স্বল্পবিদ্যার মূলধন খাটিয়েও তখন কয়েকজন ভাগ্যবান বেশ বিত্তবান হয়েছেন এবং তাঁদে কাছে ইংরেজীশিক্ষার আদিযুগে যাঁরা রাজভাষা শিক্ষ করেছেন, তাঁরা সেকালের বাঙালী বেনিয়ান-মুৎসদ্দি দেওয়ান-মুনশী ও ব্যবসায়ীদের বংশধর।

লক্ষণীয় হল, রামমোহন রায় যখন জন্মালেন ঠিক তখন থেকেই এই ইংরেজী শিক্ষার সূচনা হল। তখনও মুসলমান আমলের ফার্সী শিক্ষার প্রথা, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার উচ্চসমাজ থেকে লোপ পায় নি রামমোহন যে পরিবারে জন্মেছিলেন, তা তখনকার দিনের নবাবী সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভিজাত পরিবার বলে গণ্য ছিল এবং বাল্যকালে তাঁদের মুনশীর কাছে ফার্সী শিখতে হত। কারণ তা না হলে রাজসরকারে চাকরি পাওয়া যেত না। কলকাতায় ইংরেজী ভাষার প্রাধান্যের সূচনা হল যখন, ফার্সীর প্রভাব তখন থেকে স্বভাবতঃই কমতে লাগল। তা হলেও একেবারে লোপ পেল না। এই সাংস্কৃতিক সন্ধিক্ষণের সূচনাতে রামমোহন জন্মালেন। কলকাতায় যখন রামনারায়ণ মিশ্র, আনন্দীরাম বসু, ভবানী দত্ত, শিবু দত্ত, আরাতুন পিক্রস ইংরেজী স্কুল খুলে নতুন রাজভাষা শিক্ষা দিচ্ছেন, তখন ১৭৮১ সনে 'ক্যালকাটা মাদ্রাসা'ও প্রতিষ্ঠিত হল। রামমোহনের বয়স তখন সাত-আট বছর। রামমোহনের নিজের জেলা হুগলীতে প্রথম বাংলা ছাপার অক্ষরে বই মুদ্রিত হল, ১৭৭৮ সনে হলহেডের ইংরেজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ। রামমোহন তখন চার-পাঁচ বছরের শিশু। চার্লস উইলকিন্স ছেনিকাটা বাংলা অক্ষর তৈরি করে দিলেন তার জন্যে এবং তাঁর সুযোগ্য সহকারী পঞ্চানন কর্মকারও আলাদা এক সেট বাংলা ছাপার অক্ষর তৈরি করে ফেললেন। পঞ্চাননের অক্ষরে বাংলা ছাপা হল ১৭৯৩ সনে, রামমোহনের বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। এ যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী সামাজিক সংগ্রামের হাতিয়ার হল 'ছাপাখানা'। এই ছাপাখানা এবং 'ছাপা বই পত্র-পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠা হল, তার প্রস্তুতির পর্ব শেষ হল, রামমোহনের নিজের জীবনের প্রস্তুতির পর্বের মধ্যে। ১৭৮৪ সনে কলকাতায় "Asiatick Society" প্রতিষ্ঠিত হল—"for enquiry into the history and antiquities, arts, sciences and literature of

Asia." উইলিয়ম জোন্স এই আদর্শ ব্যাখ্যা করে সোসাইটির প্রতিষ্ঠাদিবসে বললেন: "You will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature; will correct the geography of Asia by new observations and discoveries; will trace the annals and even traditions of those nations who, from time to time, have peopled or desolated it; and will bring to light their various forms of Government, with their institutions, civil and religious; you will examine their improvements and methods in arithmetic and geometry—in trigonometry, mensuration, mechanics, optics, astronomy and general physics; their systems of morality, grammar, rhetoric and dialectic; their skill in chirurgery and medicine, and their advancement, whatever it may be, in anatomy and chemistry. To this you will add researches into their agriculture, manufacture and trade; and whilst you enquire into their music, architecture, painting and poetry, will not neglect those inferior arts, by which comforts, and even elegances of social life, are supplied or improved."

ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের মূল প্রেরণার উৎস ছিল এই জ্ঞানানুসন্ধান এবং অতীতের জ্ঞানরাজ্যে মুক্তবুদ্ধির অভিযান। এসিয়াটিক সোসাইটি সেই রেনেসাঁসের প্রথম মন্দিররূপে প্রতিষ্ঠিত হল এদেশে। মনে রাখা দরকার, এসিয়া মহাদেশের জ্ঞানবিদ্যা ও অতীত ইতিহাস অনুশীলনের প্রথম প্রতিষ্ঠান হল কলকাতার Asiatick Society, কেবল এসিয়ার প্রথম নয়, পৃথিবীর মধ্যে প্রথম। বিখ্যাত ইয়োরোপীয় বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতেরা উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠার দিনে, প্রায় ত্রিশজন, তাঁদের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের চীফজাস্টিস রবার্ট চেম্বার্স, জাস্টিস হাইড, উইলিয়ম জোন্স, বিখ্যাত ফার্সী-সংস্কৃতের পণ্ডিত ফ্রান্সিস গ্লাডউইন, চার্লস উইলকিন্স ও জোনাথান ডানকান অন্যতম। যখন Asiatick Society-র প্রতিষ্ঠা হয় তখন রামমোহনের বয়স দশ-বারো বছর।

বাংলাদেশে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা অনেক আগে থেকেই যাতায়াত করছিলেন, কিন্তু ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের বাংলায় আগমন একটা ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথম ব্যাপটিস্ট মিশনারী জন টমাস আসেন ১৭৮৩ সনে, দ্বিতীয়বার আসেন ১৭৮৬ সনে, তৃতীয়বার আসেন বিখ্যাত উইলিয়াম কেরীকে সঙ্গে করে ১৭৯৩ সনে। তখন রামমোহন সতের-আঠার বছরের যুবক। মিশনারীদের প্রচারকার্য তখন পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে। ১৮০০ সনে তাঁরা শ্রীরামপুরে মিশনের প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং কলকাতাতে ওয়েলেসলির উদ্যোগে "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুই দেশের পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের ভিতর দিয়ে প্রকৃত সাংস্কৃতিক লেনদেনের সূচনা হল এই সময় থেকে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও ব্যাপটিস্ট মিশনের সংস্পর্শে এলেন বাঙালী পণ্ডিতেরা, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ও চিন্তাভাবনার বিনিময় হতে থাকল এবং তার ফলাফল ক্রমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উভয়ক্ষেত্রেই যুগান্তকারী হল। রামমোহনের তখন পূর্ণ যৌবনকাল, নতুন ভাবধারা ও পুরাতন ঐতিহ্য, দুই-ই বিচার-বিশ্লেষণ করার মত তাঁর বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতির পর্বও তখন অনেকটা শেষ হবার কথা। তাঁর জীবনের আদর্শ-সংগ্রামের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হয়েছে বাংলাদেশে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে, পুরাতন সমাজের ভাঙন এবং নতুন সমাজ-জীবনের সূচনা বা গড়ন কিভাবে শুরু হয়েছিল তার আভাস মোটামুটি দেওয়া হল। রামমোহন রায় শৈশব থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছেন, সমাজের এই প্রথম ভাঙাগড়ার ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে। পুরাতন ভাঙছে, নতুন গড়ছে। কী ভাঙছে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, এবং যা গড়ছে তাও তাঁর উদীয়মান জ্ঞানচক্ষুর সামনে গড়ছে। দুয়েরই ভালমন্দ বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন ও সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সবচেয়ে বড় 'সমস্যা' সেদিন তিনি কি দেখতে পেলেন তাঁর চোখের সামনে? ঠিক তাঁর যৌবনকালে? একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, তখনকার সমাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, খ্রীষ্টান পাদ্রিদের, বিশেষ করে ব্যাপটিস্ট মিশনারীদের ধর্ম-প্রচারের অভিযান এবং তার জন্য বিপুল উদ্যোগ-

করতে পারেন নি, সময় ও সুযোগ পান নি বলে। কিন্তু প্রত্যেকটি সমস্যা ও সামাজিক কুসংস্কারকে তিনি লোকচক্ষুর সামনে আত্মীয় সভার আলোচনার ভিতর দিয়ে তুলে ধরেছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করেছিলেন সতীদাহ-সহমরণের বিরুদ্ধে। ১৮১৮ সনে তিনি সহমরণ বিষয়ে প্রথম পুস্তিকা রচনা করে প্রচার করেন এবং পরে ১৮১৯ ও ১৮২৯ সনে আরও দুখানি পুস্তিকা লেখেন। প্রাচীন শাস্ত্রীয় মত পুনরুদ্ধার করে রামমোহন প্রতিপাদন করেন যে সহমরণ শাস্ত্রসম্মত নয়। সমাজ তখন শাস্ত্রমুখাপেক্ষী, সুতরাং তাঁকে শাস্ত্রের অস্ত্র দিয়েই সংগ্রাম করতে হয়েছিল। ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সংস্কারক ও যুক্তিবাদীরা তাঁদের হিউম্যানিজম্ বা মানব-মুখিনতার জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠার জন্যে ঠিক তাই করেছিলেন। রামমোহন সেই যুক্তিবাদ ও হিউম্যানিস্ট সমাজদর্শনের প্রথম ও প্রধান হোতা ছিলেন আমাদের দেশে। তাঁর আদর্শ ও পন্থা, দুয়েরই একনিষ্ঠ অনুগামী এই পথে যদি কেউ পরবর্তীকালে আমাদের দেশে হয়ে থাকেন, তা হলে কেবল একজনই তা হয়েছেন—একেবারে একজনই, দুজন নয়—তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এ ছাড়া সাহিত্যচিন্তা ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃত রামমোহনপন্থী বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে।

সহমরণের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ তর্ক-বিতর্ক আগে থেকেই হয়ে আসছিল। মোগল বাদশাহ আকবরও একবার এই প্রথা রহিত করার চেষ্টা করেছিলেন। পরে খ্রীষ্টান মিশনারীরা এই প্রথার বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলন করেন, এ দেশের ব্রিটিশ শাসকরাও কেউ কেউ তাতে যোগ দেন। কিন্তু রামমোহন শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ আন্দোলন করার আগে কোন আন্দোলন জোরদার হয় নি। কোর্ট অফ ডাইরেক্টার্সকে লিখিত গবর্নর জেনারেলের ১৮২০ সনের একটি সতীদাহ-বিষয়ের চিঠিতে দেখা যায়, ফোর্ট উইলিয়মের অধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে, ১৮১৫ সনে সহমরণের সংখ্যা হয় ৩৭৮, ১৮১৬ সনে ৪৪২, ১৮১৭ সনে ৭০৭, ১৮১৮ সনে ৮৩৯। অর্থাৎ ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ সনের মধ্যে, মাত্র চার বছরে সহমরণের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। ২৪-পরগনা জেলার District Records-এ কলকাতার শহরতলী অঞ্চলের সতীদাহের কয়েকটি মূল্যবান রিপোর্ট আছে। ১৮১৯ সনের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, কলকাতার শহরতলী অঞ্চলেই (তখন বর্তমান কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের অনেকটা অংশই 'শহরতলী' বলে গণ্য হত) এক বছরের মধ্যে ৫২টি সতীদাহ হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় তিনভাগের একভাগ ব্রাহ্মণ, বাকি সব বিভিন্ন জাতির ও বর্ণের। এটা লক্ষ্য করবার মত বিষয়, কারণ সতীদাহ উচ্চবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না দেখা যায়, সকল বর্ণের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মত ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ক্রমেই যেন বেশী করে পড়ছিল। উক্ত রিপোর্টে মধ্যবয়স্কা সতীর সংখ্যা (৫০ বছরের উপর) বেশী হলেও, ষোল-সতের-আঠার বছরের নিঃসন্তান বা দু'একটি শিশুসন্তানের জননী, এ রকম সতীর সংখ্যাও নেই যে তা নয়। ১৮১৮-১৯ সনে যখন সতীদাহ ক্রমেই চরমে পৌঁছল এবং কলকাতার চারিদিকে পর্যন্ত তার চিতার আগুন জ্বলে উঠল, তখন রামমোহন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। ঠিক এই সময় তিনি সহমরণ বিষয়ে বই লিখে, প্রাচীন শাস্ত্রের অস্ত্র ধারণ করে, কূপমণ্ডূক কাণ্ডজ্ঞানহীন শাস্ত্রকারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ইংরেজরা অনেক টালবাহানা করে, একবার এগিয়ে দুবার পিছিয়ে, শেষ পর্যন্ত বেন্টিঙ্কের আগ্রহে ১৮২৯ সনের ডিসেম্বরে সতীদাহ আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। যে বছরে সতীদাহ বেআইনী ঘোষণা করা হল, সে বছরেরও ২৪-পরগনা জেলার Records-এ দেখা যায়, কেবল কলকাতার আশেপাশেই ১৯টি সতীদাহ হয়েছিল। বড় বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেদিন রামমোহন ও তাঁর সমর্থকদের কি ভাবে বাণবিদ্ধ করেছিলেন, সেই কাহিনী মর্মান্তিক ভাষায় সমসাময়িক পত্রিকায় বর্ণনা করা আছে। হিন্দুসমাজের রক্ষাকর্তারা 'ধর্মসভা' স্থাপন করে তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, এমন কি ইংরেজদের মধ্যে একদল এই রক্ষণশীলদের সঙ্গে যোগও দিয়েছিলেন। রক্ষণশীল সমাজের যুগসঞ্চিত ধর্মান্ধতার প্রচণ্ড দংশন তাঁকে সেদিন সহ্য করতে হয়েছিল প্রায় একাই বলা চলে। একাই প্রায় এইজন্য বলছি যে রামমোহনের অনুগামীদের মধ্যে তরুণ যুবকদের সংখ্যা তখন বিশেষ ছিলই না বলা চলে। সদ্যোপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজের দু-চারজন ছাত্র হয়তো সোৎসাহে তাঁর সমাজ-

ংস্কার সমর্থন করেছিল, কিন্তু সবেমাত্র তখন তারা তাদের রুণ শিক্ষক ডিরোজিওর কাছে নবযুগের নতুন মন্ত্রে ীক্ষা নিচ্ছে। রামমোহনের নিজের দলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অধিকাংশই ধনিক ও প্রবীণ ব্যক্তি। রামমোহনের তামতের চেয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ ছিল বেশী। ডিরোজিওর নিজের ভাষায় বলা যায়, তার শিষ্যরা নীড়ে বসে মুক্ত আকাশের দিকে চেয়ে তখন ডানা ঝাপটাচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে তার দিগন্ত পর্যন্ত নাগাল পেতে পারে সেই আকাঙ্ক্ষায়। তখনও তারা অর্থাৎ ডিরোজিয়ানরা, সামাজিক শক্তি হিসেবে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে নি। ১৮৩০-এর পর থেকে ডিরোজিয়ানদের শক্তির প্রকাশ হতে থাকল বাইরে, রামমোহন রায় যখন বিলেতে চলে গেলেন। আর তিনি দেশে ফিরে আসেন নি, ১৮৩৩ সনে সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

রামমোহনের সমাজসংস্কারের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আগে দিয়েছি, তা থেকে তাঁর নতুন জীবনদর্শনের যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা এই :

মানুষের সমাজে মানুষই সকলের শ্রেষ্ঠ বিষয় ও শ্রেষ্ঠ সমস্যা, তার চেয়ে বড় চিন্তার বিষয় ও সমস্যা আর কিছু নেই। ঈশ্বর মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়, শাস্ত্র মানুষের কল্যাণের জন্যে। ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে যোগ রক্ষার জন্যে মানুষের বিবেক ও বিচারবুদ্ধিই যথেষ্ট, শাস্ত্র বা শাস্ত্রকার, যাজক পুরোহিত মোল্লা কারও মধ্যস্থতার কোন প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের কোন অবতার থাকতে পারে না, ওটা স্বার্থপ্রণোদিত প্রচারকদের লোক-ঠকানোর কৌশলমাত্র। মানুষ তার মুক্ত বিচারবুদ্ধি, যুক্তি ও চিন্তা দিয়ে যাচাই করে যা গ্রহণ করবে তাই সত্য, তার চেয়ে বড় সত্য কোন শাস্ত্রে নেই। মূল শাস্ত্রে সর্বত্র তাই একই সত্য লুকানো রয়েছে দেখা যায়,—খ্রীষ্টান, হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ, কোন শাস্ত্রের মূল সত্যে কোন তফাত নেই। তফাত যা কিছু তা ওই মধ্যস্থ ব্যক্তিরা করেছেন, নরাকার অবতাররা, তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। সব ধর্মেরই লোকাচরিত রূপে তাই আগাছা অনেক জমেছে, আগাছার মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু সেটা আগাছা বলতেই হবে। তাই খ্রীষ্টান মিশনারীরা যখন হিন্দুদের অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন, তখন তিনি তাঁদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে তাঁদের ত্রীশ্বরাত্মক খ্রীষ্টধর্মও (Trinitarian Christianity) অবতারবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুদের অবতারবাদ ও পৌত্তলিকতা যেমন পরিত্যাজ্য, এবং তাঁদের যেমন অদ্বৈত ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত, খ্রীষ্টানদেরও তেমনই উচিত 'Father, Son, the Holy Ghost'-এর বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ত্রীশ্বরাত্মক ধর্ম ত্যাগ করে Unitarian ধর্ম পালন করা। গোঁড়া হিন্দুসমাজের মত গোঁড়া খ্রীষ্টান-সমাজও তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং 'তুহ্‌ফাত্‌' প্রকাশিত হবার পর শোনা যায় মুসলমানসমাজেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই রেনেসাঁস যুগের উদার হিউম্যানিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি বলা যায়। মধ্যযুগের চিন্তার বনিয়াদকে সমাজবিজ্ঞানীরা 'theo-centric' চিন্তা বলেছেন—মানবচিন্তা বা মানবকল্যাণের কথা তখন যথেষ্ট থাকলেও, মূলতঃ তা ঈশ্বরকেন্দ্রিক বা ধর্মকেন্দ্রিক, মানুষের কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা বা সমাজ-সত্তার উপর সে-চিন্তা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। 'মানুষ' সে চিন্তার centre বা কেন্দ্র নয়, তাই 'medieval thought is theo-centric thought'। আধুনিক যুগের চিন্তার বনিয়াদ হল 'মানুষ', কেন্দ্র 'মানুষ',—'ঈশ্বর' সেখানে আছেন, কিন্তু মানুষের জন্যে ঈশ্বর, ঈশ্বরের জন্যে মানুষ নয়। সমাজও সেখানে আছে, কিন্তু 'tribe' বা 'collec-tive'-এর মত ব্যক্তিগ্রাসী রূপে নয়। সমাজও আছে মানুষের জন্যে, অর্থাৎ ব্যক্তির জন্যে সমাজ—ব্যক্তি নগণ্য, সমাজ গণ্যমান্য নয়। এই চিন্তার আবির্ভাব থেকেই ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা। এই চিন্তাকে সমাজ-বিজ্ঞানীরা তাই 'homo-centric' বা 'anthropo-centric' চিন্তা বলেছেন। এরই নাম 'হিউম্যানিজম্‌'। রামমোহন রায় এই অর্থে হিউম্যানিস্ট চিন্তাধারার ও জীবনদর্শনের পথপ্রদর্শক ছিলেন আমাদের দেশে। তাঁকে "Father of Modern India" বলা হয়। কথাটাকে আরও পরিষ্কার করে বলা উচিত—রামমোহন হলেন "Father of Modern Thought in India"।

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ফুলুরি

ফুটপাথের একপাশে বসে ভাজছে প্যাজ-ফুলুরি
ফুলুরিওয়ালা।
ওপরে অনন্ত নীল আকাশ;
নীচের রাস্তায় মরচে-ধরা ট্রাম-লাইন
মরছে ট্রামের জন্যে হাপিত্যেস করে,
সর্পিল, সমান্তরাল।
ছোট্ট, হাল্‌কা উনুন, গন্‌গনে বৈশ্বানর।
ওপাশে রেস্তোরাঁয় খদ্দেরের ভিড়।
অদূরে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নোংরা উদ্বাস্তু।
ট্যাক্সী, বাস, রিক্শা, ঘোড়ার গাড়ি,
সাইকেল, প্রাইভেট-কার, মোটর-কার।
ভিখারী, জোচ্চোর, ফেরিওয়ালা, দালাল,
পকেটমার, আরও অনেকে।
পকেট থেকে চট্ করে বেরুলো ছুরি
(ময়লা ছেঁড়া ফতুয়ার)
ট্রাম-লাইনের মতই মরচে-ধরা।
নিজের চারপাশে একবার তাকিয়ে নিলে ফুলুরিওয়ালা,
এক ফাঁকে আত্মঘাতক হবে বোধ হয়
আপন বক্ষে আপন ছুরি আমূল বিদ্ধ করে।
কিন্তু তার জন্যে ছুরি কেন, ফুলুরিওয়ালা?
তোমার ওই গোটা দুই ফুলুরি খেলেই তো হয়।

আপন বুকে বেঁধালে না, ছুরি বেঁধালে পেঁয়াজের বুকে
ফুলুরিওয়ালা।
এখন আর খোসা ছাড়ায় না পেঁয়াজের।
ছাড়াতে গিয়েছিল একবার,
শেষকালে দেখলে পেঁয়াজ আর নেই!
সেই থেকে নিজের মন-পিঁয়াজের খোসাও
আর ছাড়াতে যায় নি ফুলুরিওয়ালা।

এলেন অধ্যাপক, চিনেবাদাম খেতে খেতে।
সন্দেশ খেতে আপত্তি নেই,
কিন্তু আপন অর্থে চিনেবাদামই ভাল,
নইলে মাসের দ্বিতীয় ভাগে বড্ড ইয়ে হয়।
তাকালেন ফুলুরি ভাজন-রত ফুলুরিওয়ালার দিকে।

"পচা তেল, পচা বাসী বেসমের গোলা,
পচা পিঁয়াজ......উঃ !!!!
ওলাই-চণ্ডীর প্রত্যক্ষ আমন্ত্রণ !!!!"

ভাবলেন চিনেবাদাম ভক্ষণ-রত অধ্যাপক।
আর শিউরে উঠে ভাবলেন
"হায় পুলিস! হায় কর্পোরেশন!"
চিনেবাদাম খেতে খেতে
চলে গেলেন অধ্যাপক।
যেতে যেতে হঠাৎ কি মনে হল তাঁর
অনেক বক্‌বকানির ফুলুরি ভেজে বিলিয়েছেন তিনি
মহাবিদ্যায়তনের ছাত্রারণ্যে,
অনেক পচা, অনেক বাসী, অনেক ভেজাল,
বছরের পর বছর !!!

নতুন গাড়ি থামল এসে
ফুলুরিওয়ালার এক লাফ দূরে,
সে গাড়ির নতুন মালিক
এ যুগের হুহু-বিক্রির কথাশিল্পী।
সদ্য আর একবার দেখে এসেছেন
ইষ্টিশান প্ল্যাটফর্মের বাস্তুহারাদের।
ছেলে, মেয়ে, কচি, ঝুনো।
বাস্তবগন্ধী উপন্যাস লিখবেন আর একখানা।
দেখাবেন আরও নোংরামি, পচামি, নষ্টামি;
যা দেখে হাওড়া লিখতে তিনি জুড়িহীন।
এক চামচ দেখা নোংরামিকে রবি ঠাকুরী ভাষায়
'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' এক চৌবাচ্চা বানান
অনায়াসে—এমনি শক্তিমান লেখক !!
পারেন আশ্চর্য রকম গা ঘিন্ ঘিন্ করাতে,
এমনি পেঁয়াজী কলম! প্ল্যাটফর্মের মেয়েটাকে
নতুন পনেরো ফর্মার উপন্যাসে
নানা কায়দায় নানা বার বে-আব্রু করাবেন,
এমন 'ন্যাচার‍্যাল' নোংরামি আঁকবেন
যে সত্যিসত্যিও অত ন্যাচার‍্যাল হয় না;
তিন মাসের ভেতর নতুন এডিশন চাই।

নতুন চাকর এক বাক্স দামী মিষ্টি কিনে নিয়ে এল গাড়িতে। বললেন কথাশিল্পী গাড়িতে স্টার্ট দিতে বলে নাক সিঁটকে:

"পাবলিক এনিমি নাম্বার ওয়ান,
সমাজের শত্রু ওই ফুলুরিওয়ালা,
বিষ ছড়াচ্ছে দু হাতে।
লোকটাকে পুলিসে 'হ্যাণ্ডোভার' করে দিলেই
ভাল হয়।"

[পূর্বানুবৃত্তি]

একটি দিনের ঘটনার কথা রাধার মনে পড়ল।

দীপালির রাত্রি। মিনুদের ছাতে আলো সাজাচ্ছে ধীরেনদা আর মিনু। সেও আছে সঙ্গে। বীরেনদা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ওর ভাই-বোন পাত্তা দিচ্ছে না। দু-একবার চেষ্টা করেছিল; মিনু ঝাঁজিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে: বড়দা, তুমি আর হাত চালিয়ো না দেখি। কিছু পার না। উল্টে আমাদের সাজানো নষ্ট করে দিচ্ছ। বীরেনদা মুখ কাঁচুমাচু করে সরে দাঁড়াল। এক পাশে সরে গিয়ে দূরে আলোকমালায় সজ্জিত একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

মা নেই বেচারার! কেউ ভালবাসে না ওকে! তার ভারী মায়া হল ওর ওপরে। সত্যি, ভারী দুষ্টু হয়ে উঠেছিল সে! কিছু কিছু রোজগার করতে শুরু করেছিল। জ্যেঠামশায়কে এক পয়সা দিত না। নানা বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিত। নানা দোষেও ধরেছিল নাকি এর মধ্যে—মিনু বলত। মিনুর সঙ্গে বা জ্যেঠাইমার সঙ্গে দেখা হলেই বীরেনদার নানা কুকর্ম সম্বন্ধে এক প্রস্থ গৌরচন্দ্রিকা শেষ হবার পর, তবে আসল কথাবার্তা আরম্ভ হত। তবু মনে হল, ও যত মন্দই হোক, ওর মা থাকলে কি এমন করে দূরে সরিয়ে দিতে পারতেন!

সুপ্রশস্ত ছাদ। ধীরেনদা আর মিনু এক দিকে সরে গিয়েছিল। সেও নিজের মনে সাজাচ্ছিল। খেয়াল ছিল না কিছুই। হঠাৎ বীরেনদার ডাক শুনতে পেল: রাধা! চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, বীরেনদা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে উঠল তার। গলা শুকিয়ে গেল। কোন মতে বলল, কেন?

হঠাৎ একেবারে কাছে এসে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল বীরেনদা। তার পরই দ্রুতপদে ছাত থেকে নীচে নেমে গেল।

সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তার ব্যবহারে। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। সারা দেহ থরথর করে কাঁপছিল। বসে পড়ে দু হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল অনেকক্ষণ। মিনু কাছে এসে সোদ্বেগে বলে উঠল, কী হল রে তোর?

সে বলল, মাথাটা ঘুরছে ভাই। আজ উপোস করে আছি কিনা!

বড়দা কোথায় গেল?

চলে গেছেন।

মিনু পরদিন তাদের বাড়ি এসেছিল। এমনিতেই খুব কম আসত। জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁরে, দাদা কাল তোর সঙ্গে কি কিছু খারাপ ব্যবহার করেছিল?—সে বিস্ময়ের ভান করে বলল, না তো!—মিনু যে তার কথা বিশ্বাস করল না মোটেই, ওর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল। বলল, ওর কাছে বেশী ঘাস নে। ও বয়ে যাচ্ছে দিন-দিন।

* * *

বীরেনদা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল

কতক্ষণ। বলল, এইখানেই দাঁড়াও। আমি টাকা আনছি।—বলে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সে ওর জন্য অপেক্ষা করে নি। বাড়ি চলে এসেছিল। একটু পরেই বীরেনদা টাকা এনে পৌঁছে দিল মাসীমার হাতে। তাকে বলল, টাকাটা নিয়ে এলে না?

সে মুখ নামিয়ে সরে এসেছিল।

আরও বৎসর খানেক ভুগে বাবা মারা গেলেন। বোস জ্যাঠামশায় সব ব্যবস্থা করলেন। তিনি যা করেছিলেন তাদের জন্য, নিজের পরম আত্মীয়রাও তা করে না।

জ্যেঠামশায় ওঁদের এক সরকারকে দিয়ে তাদের তার মামারবাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

ওখান থেকে চলে আসবার আগের দিন ওরা জ্যেঠামশায়দের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল। জ্যেঠাইমার ঘরে গিয়ে বসল তারা। জ্যেঠাইমা মাদুর পেতে বসালেন তাদের। তার কাছে বসে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। দুজনই কাঁদছিলেন। এই শেষ দেখা। অনেক করেছেন ওঁরা। কে আর এমন করে করবে! কে দেখবে মেয়েটাকে! কী হবে ওর! মামারবাড়িতে মামা নেই। মারা গেছেন অনেকদিন আগে! বুড়ো দাদামশায় আছেন, কদিনই বা বাঁচবেন আর! কী করে বিয়ে হবে ওই মেয়ের! কে দেখে-শুনে বিয়ে দেবে!—এই সব বলে মাসীমা একটু চুপ করে থেকে বললেন, যা সাধ ছিল মনে মিটল কই!

জ্যেঠাইমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন মাসীমার দিকে। মাসীমা বললেন, অচিন্ত্যর সঙ্গে বিয়ে দেব ভেবেছিলাম। হয়েও যেত। ভগবান সব দিক দিয়েই মারলেন যে! ওরা দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেল—

জ্যেঠাইমা বললেন, ভগবানের ওপর নির্ভর করুন দিদি। তিনিই ব্যবস্থা করবেন। যাদের কেউ দেখবার নেই, তিনিই দেখেন তাদের।

মিনু ডাকল তাকে, ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর তার কাছ ঘেঁষে বসে বলল, হ্যাঁরে, ভুলে যাবি না তো?—সে বলল, দুঃখের দিনে সুখের দিনের কথা কেউ ভোলে কি? দুঃখের দিনে সুখের দিনের স্মৃতিই তো একমাত্র আশ্রয়। আগুনের আঁচে ঝলসানো মন এক-একবার সুখ-স্মৃতির আড়ালে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়। তুই-ই ভুলে যাবি তাই! ভগবানের কৃপায় আরও সুখের দিন আসবে তোর জীবনে। তখন এই হতভাগী মেয়েটার কথা তোর মনে পড়বে না। দৈবাৎ যদি কখনও দেখা হয়ে যায়, চিনতে পারবি না—

* * *

মেয়েটির মুখে একটি ক্ষীণ হাসি একবার ফুটে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল তার জীবনে। মিনুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার। মিনু চিনতে পারে নি।

* * *

মিনু তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কখনও ভুলব না তোকে। তুই চিঠি দিবি। আমিও দেব। তা হলেই আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক টিকে থাকবে দেখবি।

দিনকতক চিঠি চলাচল হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তারপর কখন বন্ধ হয়ে গেল।

মামারবাড়িতে এল তারা। মামা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। ছিলেন মামীমা, মামাতো বোন চন্দ্রা আর দাদু। দাদু এ তল্লাটের বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের একজন ছিলেন। নাম প্রেমদাস বাবাজী। চমৎকার কীর্তন গাইতে পারতেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম, কাঁচামাটি। কয়েক ঘর বৈষ্ণবের বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ এবং অন্যান্য জাতিরও বাস আছে কয়েক ঘর করে। মাইল দুই-তিন দূরে রেল-স্টেশন। স্টেশনটার অপর দিকে একটা বাজার। সেখানে বড় বড় দোকান আছে। ধান-চালের আড়ত আছে। তার পরেই একটা বড় গ্রাম—নাম বলরামপুর। অনেক অবস্থাপন্ন লোকের বাস। ওই গ্রামের নামেই স্টেশনের নাম।

কান্নাকাটির পালা শেষ হল। নতুন জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা শুরু হল তারপর। দাদু বললেন, লেখাপড়া করে কাজ নেই। সংসারের কাজকর্ম কর, গৌরাঙ্গদেবের সেবা-আয়োজন করতে শেখ, কীর্তন গাইতে শেখ, বৈষ্ণব মেয়েদের যা সব কাজ—

মামারবাড়ির সামনেই গৌরাঙ্গদেবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে পাথরের তৈরি সিংহাসনে শ্বেত পাথরের

রি শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি। দাদুই পুজো করতেন রোজ দু লা। চন্দ্রাই পুজোর সব আয়োজন করত। চন্দ্রার ছে সে সব শিখে নিতে লাগল।

রোজ সন্ধ্যের পর কীর্তন হত। পাড়ার প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, -বৃদ্ধারা নিত্যনিয়মিত ভাবে আসত। দু-একজন কও আসত।

প্রায়ই যে আসত তার নাম রতন। ওর ওখানে বাড়ি ছিল না। পিসীমার বাড়িতে থাকত। কিছুটা দূরেই বাড়ি ছিল। ওর মা ছিলেন মামীমার সই। মামীমা খুব স্নেহ করতেন ওকে। চন্দ্রার সঙ্গে ওর বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির ভিতরে ওর অবাধ যাওয়া-আসা ছিল। ভাবী জামাই—খাতিরও ছিল খুব। এলেই মামীমা সাদরে বসাতেন, চা-খাবার খাওয়াতেন। প্রথম দিন দেখা হতেই তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল; বলল, আপনি ইংরেজী পড়া মেয়ে—মেম সাহেব! পাড়াগাঁ কি আপনার ভাল লাগবে?—সে জবাব দেয় নি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাকে।

কালো, মোটাসোটা, চাকার মত গোল মুখ। দাড়িগোঁফ কামানো। মাথায় লম্বা চুলে বাহারে টেড়ি। পরনে ধুতি শার্ট। ধুতি বেশ কায়দা করে পরা, শার্টটাও যথাসম্ভব শহুরে যুবকদের ধাঁচে পরা। স্টেশনের বাজারে চালের আড়তে কাজ করত। রতন বলল, কী দেখছেন? চাষাভুষো অসভ্য লোক, জাতবৈষ্ণব, ভিখিরী।—সে বলেছিল, দেখে তো মনে হচ্ছে না।—রতন হেসে বলল, মনে হচ্ছে না! কী মনে হচ্ছে?

সে বলল, শহুরে শহুরে—

রতন পরম আত্মপ্রসাদে মুখ-চোখ ঘুরিয়ে বলল, তা তো হবেই। শহরের লোকের সঙ্গে হরদম ওঠা-বসা তো! আমাদের আড়তদার খাস শহরের লোক—

আর একজন আসত। গৌরদাস। পাতলা ছিপছিপে, লম্বা, ফরসা রঙ। মুখের চেহারা মন্দ নয়। গোঁফদাড়ি ওঠে নি বেশী। মুখের ভাব মেয়েছেলে ধরনের। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে চাদর। দাদুর বন্ধুর ছেলে। দাদুর বাড়িতে থেকে গাঁয়ের বামুনপাড়ার টোলে সংস্কৃত পড়ত। আর দাদুর কাছে বৈষ্ণব-গ্রন্থ পাঠ করত, কীর্তন শিখত। ওর বাবা মারা যাবার পর ওকে বাড়িতে গিয়ে খাবার সব কাজের ভার নিতে হল। ওর গলা ছিল চমৎকার। কীর্তন গাইত খুব ভাল।

এক-একদিন গৌরদাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চন্দ্রাও কীর্তন গাইত। সুর-সঙ্গতি ঘটত চমৎকার। মনে হত ওদের দুটি জীবনের সুর যদি মেলে, এমনই মাধুর্যের সৃষ্টি হবে।

মামীমাকে তার মাসীমা বলেছিলেন একদিন, ওদের দুজনের যখন এত মিল, বিয়ে দিচ্ছ না কেন ওর সঙ্গে?

মামীমা বললেন, কী যে বল ঠাকুরঝি! কিছু নেই ওদের। গাঁয়ের জমিদারের দেওয়া বিঘে কয়েক দেবোত্তর জমি সম্বল। ঘর-দোর বলতে তেমন কিছু নেই। রতন লেখাপড়া যদিও কিছু জানে না, কিন্তু অবস্থা ভাল। বাজারে চাকরি করে বেশ দু পয়সা রোজগার করে।

মাসীমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, রাধাকে যে কার হাতে দিই—

মামীমা বললেন, কার সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল শুনেছিলাম যে—

মাসীমা বললেন, সে সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে ভাই! তাদেরও আমাদের মত বিপদ। বাড়ির এক ছেলে জেলে মারা গেছে। শহর থেকে সরকার তাড়িয়ে দিয়েছে, কলকাতায় আছে। এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে তাদের খবর পাবই বা কী করে, তাদের খবর দেবই বা কী করে?

সে বছর রাস-পূর্ণিমার দিন গৌরদাস এল। কীর্তন গাইল সারারাত্রি ধরে। সারা পাড়ার লোক কীর্তন শুনতে এসেছিল। গৌরাঙ্গদেবের পুজো ও ভোগ হল। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করল রতন—এর মধ্যেই পাড়ার একজন মাতব্বর হয়ে উঠেছিল সে। পাড়ার অন্য সবাই সামান্য চাষ-বাস করে, কেউ বা ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করত। পাড়ার মধ্যে সে-ই শুধু নগদ টাকা রোজগার করে ঘরে আনত। সেই কারণে রতনের পিসীরও মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু হয়ে উঠেছিল। কীর্তনের সময়ে মেয়েদের সর্বাগ্রে স্থান হয়েছিল তার।

সকলেই কীর্তন শুনে ধন্য-ধন্য করতে লাগল। বয়স্ক লোকেরা বলতে লাগল, হবে না কেন? কার নাতি! হরিদাস বাবাজী ছিলেন নাম-করা কীর্তনীয়া। এ দেশে

বাড়ি নয়। কোন্ এক কীর্তনের দলের সঙ্গে গাঁয়ের জমিদারের বাড়িতে এসেছিলেন। ভক্ত লোক ছিলেন জমিদারবাবু, কীর্তন শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওঁকে আর ছাড়তে চাইলেন না। রাধা-মাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে, দেবোত্তর দিয়ে, ওঁর ওপর পুজোর ভার দিয়ে, ওঁকে ধরে রাখলেন।

দাদুর মাঝে মাঝে ভাবাবেশ হতে লাগল। অনেকের চোখ থেকেই জল পড়তে লাগল। সত্যি চমৎকার গাইছিল। যেমন মধুর কণ্ঠস্বর, তেমনই দরদ। চোখ দুটি বুজে দুলে দুলে গান গাইছিল—

এ সখি আমার দুখের নাহি ওর,
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর—

একটি অপার্থিব আলোয় মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দেখতে ভাল লাগছিল তার। শুনতেও ভাল লাগছিল। সকলের সঙ্গে সেও সারারাত্রি ধরে কীর্তন শুনেছিল।

পরদিনও গৌরদাস রইল। দাদু মাসীমার কাছে কথাটা পাড়লেন: বৃন্দে! গৌরের হাতেই রাধাকে দে। যার হাতে দিবি ভেবেছিলি সে তো নাগালের বাইরে। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা না করাই ভাল। মেয়েটার বয়স বাড়ছে দিনদিন। আর কতদিন বসিয়ে রাখবি। আমার বয়স হয়েছে, শরীরও ভাল নেই। এখানের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। যাবার আগে রাধা আর চন্দ্রার বিয়ে দেখে যেতে চাই।

মাসীমা বললেন, ওর এখন থাক্ বাবা। চন্দ্রার বিয়ে তুমি দাও।

দাদু বললেন, তা কি হয়! বড় থাকতে ছোটর বিয়ে হলে লোকে নিন্দে করবে। গৌর গরিব বলে ভাবছিস! ওর ধন-দৌলত নেই, কিন্তু অন্তরে যে রত্ন আছে, রাজার রাজত্ব দিলেও তা মিলবে না। দে তুই রাধাকে ওর হাতে। ওকে জানি ছেলেবেলা থেকে। আমাদের সমাজের রত্ন ও। রাধার সঙ্গে মানাবেও। মনেরও মিল হবে। সুখী হবে ওরা।

মাসীমা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। গৌরদাসকে তার ভাল লেগেছিল। নিরীহ গোবেচারী মানুষ, সাধু প্রকৃতি। কোনদিন কোন অন্যায় করবে না, অনাচার অত্যাচার করবে না। যে সাধ তার মনে জেগেছিল একদিন, তা বামনের চাঁদ ধরার সাধ! যে স্বপ্ন সে দেখেছিল একদিন, তা পঙ্কের তিলক হবার স্বপ্ন! এ সাধ এ জীবনে মিটবে না কোনদিনই, এ স্বপ্ন সফল হবে না কোনদিনই। পিতৃমাতৃহীনা মেয়ে সে, মাসীমা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নেই। মাসীমা যাবার পরে পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। দেখবার শোনবার কেউ থাকবে না। বেশী আশা করা তার মত মেয়ের শোভা পায় না। দু বেলা দু মুঠো ভাত, মাথার ওপরে যেমন-তেমন হোক একটা আশ্রয়, গায়ে যা-তা হোক একটা আচ্ছাদন—এই তো তার পক্ষে যথেষ্ট গৌরদাসের সঙ্গে বিয়ে হলে তা বোধ হয় তার জুটবে।

সে বিয়েতে মত দিয়েছিল।

বিয়ের কথাবার্তা স্থির হল অগ্রহায়ণ মাসে। বিয়ে হল মাঘ মাসে। শ্বশুরবাড়ি এল—মামারবাড়ি থেকে মাইল ছয় দূরে। গৌরদাসের মা ছিল না। সংসারে অন্য কোন মেয়েছেলে ছিল না। এসেই সংসার ঘাড়ে পড়ল। মাসীমার জন্য মন কেমন করত, সংসারের কাজে মনটা ডুবিয়ে দিয়ে ভোলবার চেষ্টা করত।

বৈশাখ মাসে চন্দ্রার বিয়ে হল। গৌরদাসের সঙ্গে সে বিয়েতে যোগ দিয়েছিল। বিয়েতে বর-কনে দুজনের মুখেই হাসি দেখে নি কেউ।

* * *

মদন ফিরে এল। ডাক দিল, দিদি!

চিন্তাজাল-বয়নে ছেদ পড়ল।

রাধা বলল, ফিরে এলি? দেখা পেয়েছিস?

মদন বলল, হ্যাঁ দিদি।

কী করছে?

রান্না করছে।

ছেলেটিকে দেখলি?—জিজ্ঞেস করল রাধা। মদন বলল, ওকে দেখলাম না। কোথাও গেছে হয়তো।—একটু চুপ করে থেকে বলল, সন্ধ্যের পর রোজই বাড়িতে থাকে।

মদন চলে গেল বাড়ির ভিতরে।

আবার জাল বোনা শুরু করল মন।

তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামটিও খুব বড় নয়। নাম—

...দুরহাট। এক পাশে একটা বড় নদী। আর ...পাশে মাঠের পর মাঠ। ব্রাহ্মণপাড়া ছিল একটা। ...শ-ত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। গ্রামের জমিদার ...লেন ব্রাহ্মণ। গ্রামের একপ্রান্তে ছিল চাষী-কৈবর্তদের ...ড়া। তারই এক পাশে বৈষ্ণবপাড়া। মাত্র কয়েক ঘর ...ষ্ণব ছিল পাড়াটায়। গৌরদাসের ঠাকুরদার এখানে ...ড়ি ছিল না। গ্রামের জমিদার তাঁকে রাধা-মাধবের ...যাইত করে গ্রামে বসিয়েছিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ...পত্তি জানিয়েছিল। তিনি কারও কথায় কান দেন নি।

মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। ...মনে আটচালা। পূব দিক ঘেঁষে রাধা-মাধবের মন্দির। ...শ্চিমদিক ঘেঁষে দুটি খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। ...ক পাশে ছোট মাটির রান্নাঘর, তারই পাশে ...কটা চালায় গোয়ালঘর। সামনের কতকটা জায়গা, ...শের বেড়া দিয়ে ঘেরা—তরিতরকারির বাগান। ...য় লাউ কুমড়ো ঝিঙে শশার গাছ লতিয়ে লতিয়ে ...রা জায়গাটা ছেয়ে ফেলত। অপরাহ্ণে ঝিঙে ...ছগুলোতে অজস্র হলুদ রঙের ফুল ফুটে বাগানটা ঝলমল ...রত। চাঁপা করবী জুঁই টগর বেলা শিউলী সন্ধ্যামণি ...ত্যাদি নানা ফুলের গাছও ছিল। চাঁপা ও করবী ফুটত ...ন্তে। গ্রীষ্মে ফুটত অজস্র বেলা ও জুঁই ফুল। বর্ষায় ...পাটি ও সন্ধ্যামণির গাছগুলো ফুলে লাল হয়ে উঠত। ...রতে টগর ও শিউলী গাছগুলো রাশি রাশি ফুলে দুধের ...ত সাদা হয়ে উঠত। ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী ...য় উঠত।

শীতে ফুটত গাঁদা গাছগুলোয় অজস্র গাঁদা ফুল। বাড়ির পিছনে খিড়কির সামনেই একটা বাগান ছিল—জমিদারদের। আম জাম নারকেল গাছ ছিল অনেক। বাগানের মাঝখানে একটা পুকুর ছিল। শালুক আর পদ্মপাতায় ঢাকা ছিল জলের উপরটা। পুকুরে পাড়ার মেয়েরা স্নান করত। খিড়কির দরজা দিয়ে গিয়ে সেও সেখানে স্নান করে আসত।

রাধা-মাধবের নামে কয়েক বিঘা জমি ছিল। ভাগে চাষ হত। চাষী-কৈবর্তদের একজন চাষ করত। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক স্বামীর ঘরে উঠত। তাতেই সারা বছর দেব-সেবা চলে যেত। স্বামী-স্ত্রী দুজনের দু বেলা খাওয়া চলত। সংসারে তো আরও অনেক খরচ ছিল। বিশেষ করে ধুতি-শাড়ি কেনা। স্বামীর বছরে একজোড়া ধুতি আর একখানা চাদর হলেই চলে যেত। কিন্তু তার তো তাতে চলত না। স্বামীকে একটা পাঠশালা খোলবার পরামর্শ দিল। চাষী-কৈবর্তদের পাড়ার মোড়লদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা রাজী হল। পাঠশালা খোলা হল একদিন শুভদিন দেখে। দশ-বারটি মাত্র ছেলে হল। আটচালায় পড়ানোর ব্যবস্থা। সকালে ও বিকেলে পাঠশালা বসত। রাধা-মাধবের পূজা-অর্চনা সেরে এবং বিকেলে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে স্বামী পড়াতে বসত। ছেলেরা কেউ দু আনা কেউ চার আনা মাইনে দিত। যা হোক এতেই কিছু আয় বাড়ল। স্বামী তার বুদ্ধির প্রশংসা করল: খুব বুদ্ধি তোমার! শহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে তো! আমার মাথায় এ বুদ্ধিটা আসে নি।—সে ঠাট্টা করে বলেছিল, মাথা তোমার নিজের থাকলে তো বুদ্ধি আসবে! রাধা-মাধবের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছ যে!—অপরূপ হাসি ফুটে উঠল স্বামীর মুখে: ঠিক বলেছ। তাঁর পায়েই মাথা দিয়ে দিয়েছি। তাঁর পায়েই মাথা রেখে যেন যেতে পারি।

কোন কোন দিন সংসারের কাজ-কর্ম শেষ করে সেও স্বামীর সহকারিণীর কাজ করত। ছেলেরা তাদের নিরীহ শিক্ষকটিকে তত আমল দিত না। কিন্তু তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করত। স্বামীর হাঁক-ডাকে যা-না কাজ হত, তার সামান্য ভ্রূভঙ্গে তার চেয়ে বেশী কাজ হত।

দিনগুলি আনন্দেই কাটত। স্বামী খুব ভোরে উঠত। মন্দির-মার্জনা করত নিজের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে মধুর কণ্ঠে প্রভাতী কীর্তন গাইত—"রাই জাগো, রাই জাগো সারি শুক বলে, কত নিদ্রা যাও কাল মানিকের কোলে" —ভোরের আধো নিদ্রা আধো জাগরণের মধ্যে সেই গান শুনতে ভারি ভাল লাগত। মন্দির-মার্জনা শেষ করে স্বামী নদীতে স্নান করতে যেত। যাবার আগে তাকে বলত, রাধে! ওঠ, আমি চললাম। মাইল খানেক দূরে নদী। স্নান সেরে ফিরতে বেলা হয়ে যেত। সে ইতিমধ্যে ঘরের কাজ শেষ করত। মঙ্গলী গাইকে গোয়াল থেকে বার করে গোয়াল পরিষ্কার করত।

তারপর বাগানের পুকুরে স্নান করে এসে সাজি ভরে ফুল তুলে আনত, মালা গেঁথে রাখত। পাঠশালার ছেলেরা এসে পড়ত এর মধ্যেই। সে তাদের পড়াশুনা আরম্ভ করিয়ে দিত। স্বামী স্নান সেরে স্তব আবৃত্তি করতে করতে বাড়ি ফিরত। স্বামীর কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য সে সমস্ত কাজের মধ্যেও কান পেতে রাখত। শুনবামাত্র স্বামীর তসরের ধুতি ও চাদর মন্দিরের সামনে বাঁধানো তুলসী-মঞ্চের উপর নামিয়ে রাখত। স্বামী এসে মন্দির প্রদক্ষিণ ও রাধা-মাধবকে প্রণাম সেরে তুলসীমূলে প্রণাম করত। তারপর কাপড় ও চাদর পরে পুজোর জন্য প্রস্তুত হত। পুজোর সময়েও রাধা পাশেই থাকত। পূজা-উপচারগুলি স্বামীর হাতের কাছে এগিয়ে দিত আর মাঝে মাঝে এসে পাঠশালার ছেলেদের তদারক করত। পুজো শেষ হবার মুখেই ঘরে গিয়ে স্বামীর জন্য জলখাবার সাজিয়ে রাখত। গরীবের অতি সামান্য খাবার—এক মুঠো মুড়ি বা মুড়াক। তার সঙ্গে থাকত প্রসাদী একটু কিছু। তাই স্বামী পরম আনন্দে খেত। তারপর এক কুচি সুপুরি চিবোতে চিবোতে পাঠশালায় গিয়ে বসত।

পাঠশালার কাজ শেষ করে স্বামী যখন ঘরে ফিরত, তখন তার রান্না প্রায় শেষ হয়ে আসত। স্বামী দূর থেকেই ডাক দিত—রাধে! সে সাড়া দিত না। উনুনের সামনে চুপ করে বসে থেকে মৃদু মৃদু হাসত। ডাকের পর ডাক পড়ত। খাঁটি ভালবাসার সুর বাজত সেই ডাকে। শুনতে ভারী ভাল লাগত। বারবার শুনতে ইচ্ছে করত। তাই সাড়া দিত না।

রান্নাঘরের সামনে এসে স্বামী বলত, রাধে, রান্না হল? উনুনের আঁচটা থেকে সরে বস, মুখখানা লাল হয়ে গেল যে!

রাধা মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা; বালকের মত সরল, সুন্দর মুখ, পরনে তারই হাতে ক্ষারে-কাচা ধবধবে পরিষ্কার কাপড়, গায়ে চাদর। পাতলা চাদরের ভিতর দিয়ে গায়ের রঙ ফেটে পড়ত। হঠাৎ অচিন্ত্যদার চেহারা ভেসে উঠত চোখের সামনে।

সরস্বতী পুজো হত তাদের বাড়িতে। অচিন্ত্যদা, অপূর্বদা অনাদিদা আর দাদা এই চারজনে চাঁদা দিয়ে পু[জো] করত। পুজোর দিন সবাই উপোস করে থাকত। সক[াল] সকাল স্নান করে সবাই পুজো-মণ্ডপে জড়ো হ[ত]। অচিন্ত্যদা আসত সাদা গরদের ধুতি চাদর পরে। পুজোপকরণ সাজাতে সাজাতে সবার অলক্ষ্যে এক এক ব[ার] তাকিয়ে দেখত—এমনই দেখাত তাঁকে। মনে [হত] কোন দেবতা মানবরূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিয়েছেন!

স্বামীকে আড়াল করে, এই চেহারাটাই ভেসে উঠ[ত] প্রতিদিন। দেখতে না দেখতে আবার মিলিয়ে যে[ত]। একদিন স্বামী হেসে জিজ্ঞাসা করল, কী এত দেখ এ[মন] করে?—সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সবলে দীর্ঘনিঃশ্বাস চে[পে] কোন মতে বলে ফেলল, কিছু না।—একটু স্থির হয়ে ব[লল], যাও, চাদরটা ছেড়ে এসে খেতে বস। আমার র[ান্না] হয়ে গেছে।

অনতিবিলম্বে স্বামী ফিরে এসে একটা আসন টে[নে] নিয়ে বসল। তাকে খেতে দিয়ে পাখার বাতাস কর[তে] করতে সে বলল, রোজ এমন করে কী দেখি, তুমি জিজ্ঞে[স] করছিলে তখন?

স্বামী মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, করছিলাম তে[া]। প্রত্যেকদিন প্রশ্নটা মনে আসে, আজ বলে ফেললাম।

সে মুখ টিপে হেসে বলল, তোমাকে রোজ দেখি অ[ার] ভাবি, কার জিনিস কে ভোগ করছে! চন্দ্রার জিনি[স] আমি ভোগ করছি—বেচারার মুখের হাসি চিরদি[নের] মত মিলিয়ে গেছে।

স্বামী মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বলল, ওদের বাড়ি[তে] অনেকদিন ছিলাম। ছেলেবেলা থেকে দেখেছে আমাকে[,] নিজের বোনের মত ভালবাসে—

সে বলল, আমার তা মনে হয় না। তোমাকেই ভালবাসে। তোমাকেই মন প্রাণ দিয়ে চেয়েছিল[।] রতনকে চায় নি। রতনকে ও ভালবাসে না। দেখে[ছি] তো নিজের চোখে, তুমি যখন ওখানে যেতে, ওর আ[র] যেন মনে ধরত না, উপচে উপচে পড়ত। সব স[ময়] তোমাকে চোখে চোখে রাখত যেন কোন অসুবি[ধে] না হয় তোমার। যতক্ষণ থাকতে ওখানে, তোমার ক[াছ] ছাড়া হতে চাইত না। অথচ রতন বাড়িতে এলে ও সেদিকে ঘেঁষত না। মামীমা অনুযোগ করতেন, দু দিন পরে যার

লায় মালা দিবি, তাকে ভাল করে দেখিস না, কেমন রা ব্যবহার তোর ?

স্বামী বলল, না না, তা নয়। তুমি ভুল বুঝেছ। মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে চন্দ্রা, সকলকেই ও ভালবাসে। তন যেন একটু কী রকম ধরনের! বৈষ্ণবের মত আচার-চরণ তো নয়! প্রেমদাস বাবাজীর মত পরম বৈষ্ণবের ছে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে যে মেয়ে মানুষ হয়েছে, রতনের লোককে তার ভাল লাগবার কথা নয়। তবু ওর ভাবিক স্নেহপ্রবণতার জন্যই ও রতনকে একদিন লবাসবেই।

দুপুরে খাওয়ার পর গৌরদাস তার বাবার আমলের র্ম-গ্রন্থগুলি পাঠ করত। কোনদিন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, কানদিন গোবিন্দদাসের কড়চা, কোনদিন বা পদকর্তাদের দাবলী। সে পাশে বসে শুনত, সঙ্গে সঙ্গে হাতের াজ চলতে থাকত। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করত; কিংবা াড়ের রঙিন সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই করত। তারপর ছলেরা এসে পড়ত। গৌরদাস গ্রন্থগুলো তুলে রেখে পাঠশালায় যেত।

সন্ধ্যায় পূজারতির পর আটচালায় কীর্তন হত রোজ। পাড়ার জনকয়েক নিয়মিতভাবে যোগ দিত। গৌরদাস কীর্তন গাইত। পাড়ার দুজন খোল-করতালের সঙ্গত করত। বাকী লোকগুলি দোহারী করত। রান্নাঘরে সে রান্না করতে করতে সে গান শুনত। রান্নাঘরের কাজ শেষ করে সে মন্দিরের চাতালের এক পাশে বসে গান শুনত। সে যাবার পর গৌরদাস আরও মেতে উঠত; আখরের পর আখর দিয়ে পদের প্রত্যেকটি চরণ নিংড়ে নিংড়ে রসের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত বার করত।

রাত্রি গভীর হয়ে উঠত। পাড়ার প্রাণ-স্পন্দন স্তিমিত হয়ে আসত। যে তারা সন্ধ্যায় দিগন্ত-লগ্ন ছিল, তাই মধ্যাকাশে এসে জলজল করত। কীর্তন শেষ হত। পাড়ার লোকেরা রাধা-মাধবকে প্রণাম করে বিদায় নিত। গৌরদাস মন্দিরে উঠে এসে রাধা-মাধবকে প্রণাম করত। তারপর মন্দির-দ্বার বন্ধ করে বাড়ি ফিরত। সে তার আগেই রাধা-মাধবকে প্রণাম করে, বাড়ি এসে গৌরদাসের জন্যে খাবার সাজিয়ে রাখত।

এমনই ভাবে বছর কয়েক কাটল। সংসারে প্রাচুর্য ছিল না—অভাবও ছিল না। দু বেলা দু মুঠো ভাত, চারখানা শাড়ি, গৌরদাসের সামান্য আয়েও জুটে যেত। এর বেশী আর কিছু প্রয়োজন ছিল না তার। বাবার কাছে যখন থাকত তখনও তো এর বেশী কোনদিন জোটে নি। পল্লীগ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ সরল জীবনের মধ্যে তার মন তৃপ্তি পেয়েছিল। হয়তো কোন কোন দিন হাতে যখন কাজ থাকত না, গৌরদাস পাঠশালায় থাকত, সে একা বসে থাকত—তখন অতীত জীবনের রঙিন স্বপ্ন-মাখানো ছবি রামধনুর মত বর্ণ-সম্ভার বিস্তার করে মনের আকাশে ভেসে উঠত। মন মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। কিন্তু তা যে ছায়া মাত্র, কায়া ধরে তা কখনও যে ধরা দেবে না—মন এতদিনে বুঝতে পেরেছিল। তাই না-পাওয়ার বেদনা আর অনুভব করত না।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাধল। সংসারের সব জিনিস দুর্মূল্য হয়ে উঠল। অতি কষ্টে সংসার চলতে লাগল। কিন্তু গৌরদাসের স্নেহ ও ভালবাসায় কোন কষ্টই মনে দাগ বসাতে পারত না। দিনের পর দিন শুধু নুন-ভাত খেয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে কোন মতে গা ঢেকে, গৌরদাস হাসি মুখে দিন কাটিয়ে দিত। সেই হাসির আলো তারও মুখ থেকে অসন্তোষ ও অতৃপ্তির আঁধার দূর করে দিত।

দাদু—প্রেমদাস বাবাজীর অসুখ হয়েছে, বাঁচবার আশা নেই, তাদের দুজনকে দেখতে চেয়েছেন—খবর নিয়ে লোক এল। রাধা-মাধবের পুজোর ব্যবস্থা করে, একজন বৈষ্ণবের উপর ভার দিয়ে, গৌরদাস তাকে নিয়ে কাঁচামাটি গেল।

যুদ্ধ বাধবার কিছু পরেই রতন চালের আড়তে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সেখানেই সে থাকত এখন। তাদের গ্রামের কাছে একটা সৈন্যদের ছাউনি ও একটা এরোড্রোম তৈরি হচ্ছিল; সেখানে একজন বাঙালী কণ্ট্রাক্টারের অধীনে সরকারের চাকরি করত। চন্দ্রাকেও নিয়ে গিয়েছিল। প্রেমদাসের অসুখের খবর পেয়ে তারাও দেখতে এসেছিল। অনেকদিন পরে দেখা হল ওদের সঙ্গে। চন্দ্রা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কতদিন দেখি নি তোকে! কেমন আছিস?—সে শুধু একটু হেসে বলল, দেখতেই তো পাচ্ছিস।

চন্দ্রা আগের চেয়ে মোটাসোটা হয়েছিল। পরনে দামী মিহি শাড়ি, গায়ে গয়না। রতনের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ দামী। চাকরিতে নাকি রতনের খুব রোজগার হচ্ছিল। ওর মনিবের আয় নাকি মাসে দশ হাজার টাকা। মনিবের যদি মাসে দশ হাজার—চাকরের কোন্ না দু শো টাকা হবে!—বলে পরম আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল রতন। গম্ভীর হয়ে উঠে ভারিক্কী সুরে বলল, তা গৌরদার চলছে কেমন? ওর জমি-জমা যা আছে—তাতে আজকালকার দিনে চলা তো উচিত নয়।

সে বলল, পাঠশালা থেকে কিছু আয় হয়।

মাথা দুলিয়ে রতন বলল, পাঠশালা খুলেছে বুঝি! তা ভাল।

সে বলল, সহজে কি খুলেছে? অনেক বলে-কয়ে খোলাতে হয়েছে।

রতন বলল, ওই তো গৌরদার দোষ, নতুন কিছুই করতে চায় না। বাপ-পিতামহ যে পথ ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—সে পথ থেকে এক ইঞ্চি নড়বে না। তাতে কি দিন চলবে আজকাল। না হলে কাজের অভাব কি!

আনাচে-কানাচে কাজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে—গিয়ে নিলেই হল।

সে বলল, একটা জুটিয়ে দাও না।

রতন চোখ নাচিয়ে বলল, ওই তো হাতের কাছেই কাজ রয়েছে একটা। যে কাজটা আমি করতাম, সেইটার জন্যেই লোক চাইছিল আড়তদার। একটি বিশ্বাসী লোক চাই। আমি একবার বলে দিলেই গৌরদাকে কাজটা দেবে নিশ্চয়।

রতন তার সামনে গৌরদাসের কাছে কথাটা পাড়ল। গৌরদাস মৃদু হেসে বলল, তা কী করে হবে? রাধা-মাধবের সেবা—

সে বলেছিল, পাড়ার কোন লোককে দিয়ে ব্যবস্থা করলেই হবে।

গৌরদাস বলল, দু-একদিন চলে। কিন্তু বেশীদিনের জন্যে সম্ভব নয়।

গৌরদাস দুদিন থেকে চলে গেল। সে থেকে গেল। গৌরদাস যতক্ষণ ছিল, চন্দ্রা ওর পাশ থেকে নড়ে নি। ওকে একান্তে নিয়ে গিয়ে কীর্তন গাওয়াল, নিজেও গাইল তার সঙ্গে। গৌরদাস ও চন্দ্রা দাদুকে কীর্তন শোনাল একদিন। দাদু আশীর্বাদ করলেন ওদের। চন্দ্রা একদিন নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াল গৌরদাসকে। সব খরচ দিল রতন। গৌরদাস চন্দ্রার রান্নার খুব প্রশংসা করল। চরিতার্থতার আনন্দে চন্দ্রার মুখ-চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।

রতন গেল দিন কয়েক পরে। ও যাবার আগের দিন রতন এক কাণ্ড করল। একজোড়া দামী শাড়ি বাজার থেকে কিনে আনল। সন্ধ্যেবেলায় দাদুর ঘরে মামীমা, মাসীমা আর সে বসেছিল। এমন সময়ে চন্দ্রা শাড়ি-জোড়াটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। মামীমা জিজ্ঞেস করলেন, ওই শাড়ি রতন তোর জন্যে কিনে আনল বুঝি?—চন্দ্রা বলল, আমার জন্যে নয়, দিদির জন্যে।

সে আপত্তি জানিয়ে বলল, আমার তো শাড়ি রয়েছে, আর আমার দরকার হবে না।

মাসীমা বললেন, ছোট ভগ্নীপতি মান্যি করে দিচ্ছে, নিবি না কেন?

মামীমা বললেন, যা পরছিস ওই তো, না, আর কিছু আছে! ওই যদি হয় তো ও বেশীদিন নয়। নিয়ে নে যা পাচ্ছিস। আজকাল সাধারণ একখানা শাড়ির যা দাম হয়েছে, তাই লোকে কিনতে পারছে না। ও-রকম শাড়ি কেনা যার-তার সাধ্য নয়। রতনের অঢেল পয়সা, তাই চন্দ্রাকে ও-রকম শাড়ি ছাড়া কিছু পরায় না।

রতন পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তুলতেই চোখাচোখি হল। রতন বলল, ছোট ভাইয়ের কাছে নিতে দোষ কি দিদি!—রতনের চোখ থেকে মিনতি যেন গড়িয়ে পড়ছিল।

বাধ্য হয়ে নিতে হল তাকে। তবু দয়ার দান ভেবে মন সারাক্ষণ খুঁতখুঁত করতে লাগল।

চন্দ্রা কিন্তু সত্যিই খুশী হয়েছিল। যে কদিন তারা একসঙ্গে ছিল, তার মধ্যে সে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল তাকে। গৌরদাস যা বলছিল তা খুবই সত্যি। চন্দ্রার স্বভাবই ছিল মিষ্টি। সকলের সঙ্গেই সে ভাল ব্যবহার করত। মন যতই বিরূপ হোক, কারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

দাদু—প্রেমদাসবাবাজী সপ্তাহ দুই পরে দেহরক্ষা করলেন। রতনকে খবর পাঠান হয়েছিল। সে যথাসময়ে এসে পড়ল। দাদুর শেষ-কাজ যথাযোগ্য সমারোহের সঙ্গে করল। এ তল্লাটের সমস্ত বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করা হল। তাঁরা দলে দলে এসে হাজির হলেন। ত্রুটিহীন সেবায় পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন। দুটি নাম-করা কীর্তনের দল এসেছিল। দুদিন ধরে দিবারাত্র নাম-সঙ্কীর্তন হল। রতনের বিস্তর খরচ হল দাদুর কাজে। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মানুষের মত মানুষ! গৌরদাসও এসেছিল। এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল শুনল। তাকে কেউ পাত্তা দিল না।

সব কাজ শেষ হবার পর তারা বিদায় নিল। মাসীমা কাঁদতে লাগলেন। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কবে আসবি আবার?—গৌরদাসকে বার বার বলতে লাগলেন, বাবা, মাঝে মাঝে এক-একবার দেখা দিয়ে যেয়ো। আর কদিন বাঁচব!

একবার ইচ্ছে হল মাসীমাকে বলতে—মাসীমা, তুমিই এস না আমাদের কাছে দু-চার দিনের জন্যে—কিন্তু স্বামীর সাংসারিক অবস্থার কথা ভেবে নিরস্ত হল।

ফিরে এসেই আবার দৈনন্দিন জীবনের জোয়াল কাঁধে চড়ল। ভগ্নচক্র জীর্ণ রথটিকে অমসৃণ পথে টানতে টানতে কাঁচামাটির স্মৃতি ধীরে ধীরে অন্তরের সদরমহল থেকে সরে গিয়ে কখন অন্দরমহলে আত্মগোপন করল।

[ক্রমশ]

নিঃসঙ্গ ব্যক্তি

পবিত্রকুমার ঘোষ

রেনেসাঁস ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তির বিদ্রোহের পরিণাম। অচলায়তন সমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তি আত্মবিকাশের সুযোগ লাভের আশায় বিদ্রোহ ঘোষণা না করে পারে নি। অবশ্যই ইতালির রেনেসাঁসের মূলে শ্রেণী-সংঘাত আবিষ্কার করা অসম্ভব নয় এবং বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ভন মার্টিন তৎকালীন শ্রেণী-সংঘাতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেনও।[১] কিন্তু রেনেসাঁসের জন্য দায়ী বোধ করি শ্রেণী-সংঘাত ততটা নয়, মানবকেন্দ্রিক চিন্তাধারা ও আদর্শের প্রসার যতখানি। মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখেছেন: রেনেসাঁস ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব একই সময়ে ঘটেছিল—এই তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত করা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তিবাদ ও মানবতাবাদ বুর্জোয়া আদর্শেরই নীতি। ইতিহাসের দিক থেকে তা কিন্তু সত্য নয়। রেনেসাঁস ছিল মানবতাবাদের পুনরুজ্জীবন; প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনবাদী সংস্কৃতির মানবতাবাদী ঐতিহ্যকে তা আহ্বান করেছিল। ব্যক্তিবাদও উদারতন্ত্রী চিন্তাধারার এক সুপ্রাচীন নীতি। রেনেসাঁস ব্যক্তির মর্যাদা ও অনন্যপরতন্ত্রতা ঘোষণা করেছিল সোফিস্ট, এপিকিউরীয়, স্টোইক এবং প্রথম যুগের খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তির উপর। মধ্যযুগের আদিপর্বের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভব ও রেনেসাঁসের মধ্যে কোন কার্যকারণগত সম্পর্ক ছিল না; সে মানবতন্ত্রী ব্যক্তিবাদ শুধুমাত্র কোন বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন বা যুক্তি ছিল না।[২]

রেনেসাঁসের আন্দোলন জয়যুক্ত হয় এবং আধুনিক সভ্যতার প্রারম্ভও তারই পরিণামে ঘটে। আধুনিক সভ্যতার জীবৎকালে আরও বহু বিপ্লব ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, প্রতিবারই বলা হয়েছে যে প্রগতির জন্যই সে বিপ্লব ও বিদ্রোহ প্রয়োজন। অতএব আশা করা যায় যে, যে-আধুনিক সভ্যতার সূত্রপাতে ব্যক্তির মুক্তিলাভের প্রয়াস দেখতে পাই আজ সেই সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ যখন ঘটেছে তখন ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠালাভের সংগ্রাম সফল হয়েছে—নতুবা প্রগতির কোন অর্থ থাকে না।

কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাসে এই আশা হয়তো বা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়েছে। সমাজের অতিরিক্ত কর্তৃত্বের চাপ থেকে মানুষ অব্যাহতি পেয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বাধীনতার আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। যে মুক্তির সাহায্যে ব্যক্তি নিজেকে সম্প্রসারিত করতে পারে মানব-সমাজে, ব্যক্তিত্বের উপাদান সব বিশ্লিষ্ট হয়ে নিজেকে নষ্ট করে ফেলা থেকে উদ্ধার পেতে পারে, সে মুক্তি ব্যক্তি লাভ করে নি। ইতিহাসের আধুনিক পর্বের সূচনায় যে দুর্জয় প্রত্যয়ে মানুষ নিয়তির পেষণ অস্বীকার করেছিল, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই নিয়তিই আর এক রূপে এসে তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। আপাততঃ মানুষ পরাভূত হয়েছে।

২

আধুনিক যুগের মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সে পর-চালিত। তার সর্ববিধ আচার-আচরণের, এমন কি চিন্তা-কল্পনার নির্দেশ আসে বাইরে থেকে, বাইরের চাহিদা অনুযায়ী বাঁচার চেষ্টা করে সে, নিজেকে কেটেছেঁটে, বাহির তার উপর যে প্রত্যাশা রাখে ঠিক তদনুযায়ী নিজেকে বানিয়ে তুলতে চায়।

একটি পরিবারের দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, পরিবারের কাঠামো, তার চরিত্র, পারিবারিক সমস্ত কিছুতেই ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আমাদের দেশে অবশ্য কোন উদাহরণই নিরঙ্কুশ নয়, একই সঙ্গে এখানে আধুনিকতম বৈশিষ্ট্য ও মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য সমন্বিত পরিবার দেখা যাবে। দেখা যাবে যে এখনও কোন কোন পরিবারে মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুর মতই পরিবারে পিতার ব্যবহার, আবার

---

১ Von Martin : Sociology of the Renaissance

২ M. N. Roy : Reason, Romanticism and Revolution (Vol. I)

দেখা যাবে, পুত্রের অধিকার রক্ষার্থে পিতার সঙ্গে কলহ করতে এগিয়ে এসেছে পুত্রের সমবয়সী বন্ধুরা। সর্বাধুনিক ও বহুপ্রাচীন, উভয় রকম সামাজিক প্রবণতাই আমাদের সমাজে পাশাপাশি দেখা যায়, তার কারণ ঔপনিবেশিক সমাজের বিকাশধারা বহু বিপত্তিতে আটকে আটকে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করে এবং ঔপনিবেশিক সমাজে একই সঙ্গে বহু যুগ পাশাপাশি বাস করবার ছাড়পত্র পায়, শাসকরা তাতে উৎসাহই দেন। আমাদের সমাজ এমনই অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে বলে এখানে দৃষ্টান্ত উদ্ধার করার বেলায় সতর্ক হতে হয়। ইচ্ছে করলে উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, বিধবারা সহজেই দাম্পত্যজীবন পুনরায় বরণ করে নিচ্ছেন; আবার উদাহরণের সাহায্যেই এও প্রমাণ করা যায় যে, বিধবারা কঠোর ব্রহ্মচর্য ও একনিষ্ঠ পাতিব্রত্য চিরজীবন পালন করে যাচ্ছেন। তাই এমন উদাহরণ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে হবে যার মধ্যে আধুনিক সমাজের প্রবণতা পরিস্ফুট। ভবিষ্যতের ছায়া যে ঘটনার মধ্যে এসে পড়েছে, বর্তমান যুগের স্বরূপ, বর্তমান যুগের অন্তর্বেদনা যার মধ্যে ধরা দিয়েছে, তেমন ঘটনাই আমাদের বেছে নিতে হবে।

উপরোক্ত অর্থে একটি আধুনিক পরিবার যদি বেছে নিই তবে দেখব যে, ওই পরিবারে প্রত্যেকটি লোকের ভূমিকাতেই পরিবর্তন এসেছে। পিতামাতার জীবন পরিবারকেন্দ্রিক নয়, পরিবারের সীমায় সীমিত নয়। জীবিকা অর্জনের জন্যই যে তাঁরা বাইরে সময় কাটান তা নয়। জীবিকা ছাড়াও জীবনের আরও বহুবিধ তাগিদ যে আজ তাঁরা অনুভব করেন, তার ফলে পরিবার তাঁদের বাসস্থান হলেও কর্ম ও ভোগস্থান বিশেষভাবে আজ বাহির। এক্ষেত্রে শিশুর দায়িত্ব নেবে পরিচারিকা কিংবা নার্সারি, বালকের ভার নেবে স্কুল ও স্কুলের বন্ধুরা। বালক approbation চায় আজ পিতামাতার কাছ থেকে নয়,—কেন না বালকের মনোজগতের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের সঙ্কুচিত—চায় তার বন্ধুদের কাছ থেকে। তা পেতে হলে কী করতে হবে? বন্ধুদের প্রত্যাশা মত নিজের ব্যবহারকে গড়তে হবে। যা হলে বন্ধুদের কাছে সম্মান পাওয়া যায় তাই হতে হবে। আধুনিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শিক্ষকরা ছাত্রদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করবেন না, তাদের পীড়ন করবেন না, অত্যন্ত মিষ্ট ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ হবে তাঁদের। পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার ধারাও এমন হবে না যাতে ছাত্রদের মনে হতে পারে যে তারা উৎপীড়িত হচ্ছে। বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়ভাবে সহজভাবে তাদের নিকট উপস্থাপিত করাই হচ্ছে শিক্ষাপ্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য। তার ফলে শিক্ষাব্যাপারে ছাত্ররা আর ভয়ঙ্কর একটা কিছুর সন্নিধানে আসতে হচ্ছে বলে মনে করে না, বেশ সাহসের সঙ্গে প্রফুল্ল মনে বিদ্যালয়ে আসে তারা। শিক্ষক এবং শিক্ষাধারাকে ফাঁকি তারা অবশ্যই দেয়, কিন্তু দেয় হাসতে হাসতে। কোন শিক্ষককে পছন্দ না হলে তাঁকে নিয়ে তারা ঠাট্টা করে। শিক্ষক এবং শিক্ষাধারার বিরুদ্ধে অন্তরে তাদের কোন বিদ্রোহ জাগবার অবকাশই নেই, কী করে অত্যাচার এড়িয়ে যেতে হবে তার উপায় উদ্ভাবনের কোন প্রয়োজনই নেই—সমস্ত ব্যাপারটাই বেশ আরামপ্রদ এবং উপভোগ্য হয়ে এসেছে।

ছেলেবয়সেই ছেলেমেয়েরা তাই প্রতিরোধ প্রতিবাদ বিদ্রোহ বা অন্তরে গুমরে মরার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে সবার সঙ্গে মানিয়ে নেবার, সবার প্রত্যাশা অনুযায়ী নিজেকে সাজিয়ে তোলার, যে আচার-আচরণ কল্পনা ভাবধারা এমন কি সাজপোশাক সকলের অনুমোদন লাভ করে সে সব নিজের অঙ্গ করে নেবার বেশ সুযোগ পায়। তাদের কী করা উচিত বা উচিত নয় এ নিয়ে খুব গভীর ভাবে ভাবার প্রয়োজন হয় না, অন্যরা কী করতে বলছে বা কী করলে অন্যদের চোখে ভাল হওয়া যায় বা অন্ততঃ সহনীয় হওয়া যায় এ বোধটুকু থাকলেই যথেষ্ট।

বালক যখন কিশোর হয়, কিশোর থেকে যুবক এবং যুবক থেকে প্রবীণ হয় তখন জীবনটাকে ভাল ভাবে চালিয়ে নেবার পক্ষে বাল্যার্জিত অভ্যাসটি বিশেষ কাজে দেয়। আধুনিক সমাজে সবচেয়ে বেশী কদর যার সে শুধু মানুষ নয়—সামাজিক মানুষ। আধুনিক সমাজে সবচেয়ে যে বেশী অভিনন্দিত সে নায়ক নয়—নট। বহুজনের পছন্দ অনুযায়ী নিজেদের সাজিয়ে তুলতে পারাই হচ্ছে এদের সফলতার চাবি।

আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। বর্তমান যুগে চাকরিতে লোক নিয়োগ করার আগে

প্রার্থীদের ইণ্টারভিউ দিতে ডাকা চলতি রেওয়াজ। উদ্দেশ্য, ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা। ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার আসল তাৎপর্য পরীক্ষকদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যে ধারণা আছে প্রার্থী তদনুযায়ী কিনা তা দেখা। কোন প্রার্থী সফল হয়? যে ব্যাপারটি জানে এবং সেইমত নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে। চাকুরিজীবনে প্রতিদিন প্রতি ধাপে এই একই প্রস্তুতির জের টেনে চলা ছাড়া উপায় নেই।

শুধু চাকুরির ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রে আধুনিক মানুষের সাফল্যলাভের কৌশল হল অন্যের চাহিদা অনুযায়ী পছন্দ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলা। তাই বলা যায় আধুনিক মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় বাইরের নির্দেশে—পরের প্রত্যাশা দ্বারা। এজন্য তার চরিত্র পর-চালিত, একান্তভাবে পর-নির্দেশ-নির্ভর।

৩

পর-চালিত চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির সুবিধা এই যে সমাজের সঙ্গে বেশ একটা মোলায়েম সম্পর্ক রেখে সে চলতে পারে, সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষ বাধে কম। সমাজ বলতে এখানে বিরাট সমাজ-দেহকে বোঝানো হচ্ছে না, ব্যক্তির নিজস্ব যে জগৎ, তার যে পারিপার্শ্ব, যে গণ্ডীর মধ্যে সে বাস করে জীবন কাটায় তারই কথা বলছি। শ্রেণী, গোষ্ঠী, অঞ্চল, প্রদেশ এ সবই হচ্ছে ব্যক্তির কাছে তার নিজস্ব সমাজ। এই সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ মসৃণ হয়ে উঠতে পারে।

আধুনিক যুগে জাতীয় সমাজের মধ্যে কিন্তু সংঘর্ষ বেড়েই গিয়েছে। কিন্তু সে হচ্ছে গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর, শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর, অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের সংঘর্ষ। সংঘর্ষ আজ সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির, সংঘর্ষের রূপ তাই সমষ্টিগত। সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তি নিজেকে বেশ মানিয়ে নিয়েছে।

এর একটা অসুবিধাও আছে। ব্যক্তির অন্তর্জীবন ফাঁপা হয়ে উঠেছে। সমষ্টির সঙ্গে মিশ খেয়ে চললেই অন্তর্জীবন ফাঁপা হয়ে উঠত না, আধুনিক যুগ বলেই তা হয়েছে। বললে অদ্ভুত শোনাবে, তবু—এ সেই রেনেসাঁসের সাধনার ফল।

রেনেসাঁস ছিল ব্যক্তির জাগরণের গৌরবে দীপ্ত, সমাজের অতি নিবিড় বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াসে উজ্জ্বল। প্রয়াস সফল হতে অনেক শতাব্দী লেগেছিল এবং আধুনিক যুগেই তা পরিপূর্ণ সফল হয়েছে বলা যায়।

এর আগে ব্যক্তি ছিল সমাজের একটি উপাদান মাত্র, তার বেশী মর্যাদা তার ছিল না। ইতিহাসে আগে কখনও যে ব্যক্তি স্বীয় মর্যাদা পায় নি, তা নয়—কিন্তু সে অনেককাল আগে। তারপর সুদীর্ঘ মধ্যযুগ কেটে গেছে। মধ্যযুগে সমাজ ব্যক্তিকে সহস্র বাহু দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। ব্যক্তিও ছিল পরম নিশ্চিন্ত, সমাজের থেকে নিজেকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করত সে। ঠিক যেমন মায়ের গর্ভে এবং তারপর ভূমিষ্ঠ হবার পরও অনেকদিন শিশু মায়ের সঙ্গে হাজার গ্রন্থিতে বদ্ধ থাকে। মায়ের থেকে সে যেন আলাদা নয়, মায়ের ব্যক্তিত্ব থেকে আলাদা কোন ব্যক্তিত্ব তার নেই। তারপর এক সময় তারও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, এবং প্রকৃতপক্ষে তখনই মায়ের কাছ থেকে সকল umbilical cords তার ছিঁড়ে যায়। তখনই সে হয় স্বাধীন, মুক্ত।

রেনেসাঁসের সাধনার ফলে সমাজের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে ব্যক্তির মুক্তি ঘটল। মানুষ যে শুধু মানুষ নয়—ব্যক্তি, সামাজিক সত্তা ছাড়াও যে তার একটি ব্যক্তি-সত্তা আছে, আমাদের মজ্জায় মজ্জায় এ বোধ মিশে গেছে রেনেসাঁসের ভাবধারার উত্তরোত্তর প্রসারের ফলেই। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির umbilical cords সত্যই ছিন্ন হয়েছে।

ওই শিশুর দৃষ্টান্ত আর একটু অনুসরণ করলে দেখব, মায়ের সঙ্গে প্রায়-জৈবিক তার যে সম্পর্ক তা ছিন্ন হতে হতে সে নিজস্ব একটি মানবিক জগৎ গড়ে নিতে থাকে। তার গঠমান ব্যক্তিত্বই পরিপার্শ্বের সঙ্গে এক জটিল আদান-প্রদানের সম্পর্কে আবদ্ধ হতে থাকে, এই সম্পর্কের জাল নিজেকে কেন্দ্র করেই শিশু রচনা করে, অর্থাৎ এসবের কেন্দ্রপুরুষ, তার কাছে, সে নিজেই। ওরকমভাবে মানবিক জগৎ রচনা করে না নিতে পারলে, পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রাণদসম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে তার ব্যক্তিত্ব পুষ্টিলাভ করে না, তার ভিতরে যে ব্যক্তি তার মুক্তিলাভ হয় না। কারণ মুক্তি হচ্ছে বিকাশে, শুধু বন্ধন ছিন্ন করাতেই নয়।

আধুনিক যুগের মানুষ বঞ্চিত হয়েছে এখানেই। সমাজের সঙ্গে একান্ত জৈবিক বন্ধন ছিন্ন করেছে সে, ততটুকু মুক্তিই তার ঘটেছে। কিন্তু সমাজের সঙ্গে মানবিক সম্পর্কের জাল সে রচনা করতে পারে নি, কাজ চালানোর পক্ষে নিম্নতম প্রয়োজন যে যান্ত্রিক সম্পর্ক, তার বেশী কিছু গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। আধুনিক যুগে মানুষের ব্যক্তিত্ব তাই পুষ্টিলাভ করে নি, ব্যক্তির ঈপ্সিত বিকাশ অসম্ভব হয়েছে। তাই সমাজে যাদের দেখতে পাই তারা হচ্ছে দলবদ্ধ মানুষ, সুস্পষ্ট ব্যক্তিসত্তার অধিকারী অনন্য, অ-পূর্ব নয়। সমাজের সঙ্গে নাড়ির বন্ধন ছিন্ন করে যান্ত্রিক বন্ধন মানুষ এমন ভাবে মেনে নিয়েছে যে, ব্যক্তি যদিও নিজেকে ব্যক্তি বলেই ঘোষণা করে, আসলে সে হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক ব্যক্তি, নতুন করে আবার সামাজিক সত্তা ব্যক্তি-সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

"The 'self' in the interest of which modern man acts is the *social* self, a self, which is essentially constituted by the role the individual is supposed to play and which in reality is merely the subjective disguise for the objective social function of man in society. Modern selfishness is the greed that is rooted in the frustration of the real self and whose object is the social self. While modern man seems to be characterized by utmost assertion of the self, actually his self has been weakened and reduced to a segment of the total self—intellect and will power—to the exclusion of all other parts of the total personality."*

রেনেসাঁসের সাধনা তাই আপাততঃ ব্যর্থ হয়েছে বলতে হবে।

৪

চলতি সামাজিক প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলতে চলতে যে একবার থমকে দাঁড়ায় এবং নিজের সম্পর্কে হিসা[illegible] নিকাশ করতে চায়, অর্থাৎ তার ব্যক্তিস্বরূপকে অনু[illegible] করতে চায়, চরম শক্তিহীনতা ও নিঃসঙ্গতাবো[illegible] এড়িয়ে যাবার উপায় তার নেই। সমষ্টিস্রোতে ভা[illegible] আধুনিক যুগে বেঁচে থাকবার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এই স্রোত থেকে আলাদা করে কেউ যখন নিজের দি[illegible] তাকায়, দেখতে চায় তার নিজের অন্তরকে, চায় সমাজে[illegible] সঙ্গে তার সম্পর্কের রূপ বুঝতে তখন দেখতে পা[illegible] সমাজের প্রাধান্যের মূল কারণও বটে, তার পরিণামও ব[illegible] তার অন্তর্জীবন অগঠিত এবং অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। বাইরে[illegible] জীবনে তাই তার প্রকৃত শক্তিও কিছু নেই। এ[illegible] সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এমন যান্ত্রিকীকরণ ঘটেছে—প[illegible] উৎপাদন ও পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই নয়, মানুষের নিবিড়ত[illegible] সম্পর্কেও যন্ত্রের প্রবেশ আজ অব্যাহত—যে, ব্যক্তি হিসা[illegible] সে এই যন্ত্রেরই একটি উপাদানে পরিণত হয়েছে[illegible] সবচেয়ে অবাক হবে সে ভেবে, আধুনিক যু[illegible] অধিকাংশ মানুষ অন্ততঃ বহিরঙ্গ জীবনে যান্ত্রিকীক[illegible] এমনভাবে মেনে নিয়েছে যে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তা[illegible] কল্পনাও করতে পারে না। আধুনিক জীবনের সবচে[illegible] তাৎপর্যহীন প্রকরণ হচ্ছে ব্যক্তি। এই তাৎপর্যহীন নিজের কাছে নিজে পরিষ্কার ভাবে স্বীকার করে নি[illegible] মানুষ ভয় পায়, তার অহংচেতনা তাতে আহত হ[illegible] তাই এই তথ্য সে অস্বীকার করতে চায়, অন্ততঃ পার[illegible] পক্ষে ভুলে থাকতে চায়। সুখ ও শান্তি যখন সমষ্টিস্রো[illegible] ভেসে চলায়, তখন তা না চাইবে কে। তবু জীবনে এ[illegible] মুহূর্ত আসে যখন আত্ম সম্পর্কে চেতন না হয়ে উ[illegible] থাকে না। তখন এবং যাদের জীবনে এই মুহূর্ত[illegible] দীর্ঘস্থায়ী হয় বিশেষতঃ তাদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অনুভূ[illegible] এই যে এই বৃহৎ সমাজে তারা নিঃসঙ্গ। ব্যক্তির নিজেকে উপলব্ধি করতে চায় যে, আধুনিক যুগে নিঃসঙ্গত[illegible] উপলব্ধি এড়িয়ে যাবার উপায় তার নেই।

* Erich Fromm : The Fear of Freedom, p. 101.

সংঘাত

শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়

সাদার্ন অ্যাভিনিউর কোন একটা বাড়ি থেকে টং-টং করে বারোটা বাজল। রিফিউজি-ক্যাম্পের দিক থেকে একসঙ্গে দু-তিনটে কুকুর ডেকে উঠল। রাত বারোটার ঘুমন্ত লেকপল্লী। সাদার্ন অ্যাভিনিউ ছেড়ে লেকের পূর্ব-সীমান্ত ঘেঁষে ব্রেক কষল মোটরটা।

বজবজ লাইনের ধারে ছোট একতলা বাড়ি। মোটর থামল। মেদবহুল দেহের নিম্নাংশটা ফোলা বেলুনের মত অগ্রবর্তী করে প্রথমে নামলেন প্রিয়তোষ।

অ্যাশ-কলারের নিভাঁজ ট্রাউজারের সঙ্গে রঙ মেলানো শার্ট আর টাই আঁটা, চটপটে চেহারা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম গড়ন, ডাক্তার সরকার গাড়ি থেকে নেমেই সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

কালো ভেলভেট পাড় শাড়ি-পরা, সেপটিপিন-আঁটা আঁচল, ঝুলে-পড়া খোঁপার কোল-ঘেঁষা সরু চিকচিকে হার গলায়, দু গাছা করে সোনার চুড়ি হাতে হেমাঙ্গিনী সোমের শেষ নামবার পালা। সাজসরঞ্জাম সবই তার জিম্মায়। সেহেতু ত্রিশ-বত্রিশ বছরের তনুদেহেও কিছু শ্লথগতি।

তখনও রিফিউজি ক্যাম্পের কুকুরগুলো থেকে থেকে ডাকছে।

বাড়িখানার দিকে চেয়ে একটু থতমত খেলেন ডাক্তার। অন্ধকারেই এগিয়ে চললেন প্রিয়তোষ। না একটা আলো কোন ঘরে, না নিজের হাতে একটা টর্চলাইট। আশপাশের বাড়িগুলো ছাড়া-ছাড়া, অসংলগ্ন।

চলে আসুন আপনারা।—প্রিয়তোষ বললেন।

দু হাতে টাই কষলেন ডাক্তার সরকার।

আলো-টালো নেই, কোথায় যাব?

সতের বছর হাসপাতাল ঘাঁটা আই. এম. এস. বিলিতী ডিগ্রী আর বত্রিশ টাকা ফীর হকদার হলেও ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব করেই বললেন শেষ পর্যন্ত।

না। ভয়ের কিছু নেই। প্রিয়তোষ বললেন।

বাড়িতে ঢুকতেই ডান দিকের ঘরখানার দরজাও খুলল, আলোও জ্বলল। অন্ধকারে যেন প্রতীক্ষার একটা তপস্যা চলছিল ভেতরে। ঘরের এক পাশে তক্তপোশের ওপর একটি বছর ষোল-সতেরর তরুণী আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন একজন প্রৌঢ়া—সম্ভবতঃ মেয়েটির মা।

রূপবান মানুষের জরাগ্রস্ত চেহারার মত ঘরখানার অবস্থা। সবই ছিল এবং সবই যেতে বসেছে। পঙ্খের কাজচটা দেওয়াল। মাঝে মাঝে পান খেয়ে চুন মোছার দাগ। শুভকর্মের চিহ্নবহা বসুধারা আঁকা।

এই মেয়ে? চেয়ার টেনে মেয়েটির বিছানা বরাবর বসলেন ডাক্তার সরকার।

স্ত্রীলোক তাঁর কাছে গাইনোকলজি মিডওয়াইফারির প্লেট ছাড়া আর কিছুই নয়। দু হাতের দুটো তর্জনী 'ফরসেপ,' 'ফিলার' সবই।

তবুও চোখ দুটোকে তীক্ষ্ণ করলেন ডাক্তার। নিভাঁজ কপালের মাঝামাঝি ঠেলে উঠল ভুরু দুটো।

দিনরাত বমি করছে ডাক্তারবাবু।—প্রিয়তোষ বললেন।

কিন্তু ডাক্তার তখন হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে আছেন। লেক অঞ্চলের কোথা থেকে পুলিসের হুইসিল বেজে উঠল। একবার মেয়েটির মুখ আর একবার হাত-ঘড়িটায় চোখ দুটো ঘোরাফেরা করতে লাগল ডাক্তার সরকারের।

কী বলছিলেন? বমি?—অন্ততঃপক্ষে কুড়ি মিনিট পরে প্রিয়তোষের বর্ণনাটা ওজন করতে লাগলেন ডাক্তার।

হ্যাঁ, বমি।—প্রিয়তোষ বললেন।

বাট দিস ইজ নট এ কেস অফ পারনিসাস ভমিটিং—

কিন্তু ডাক্তার সরকার—ছিঁড়ে যাওয়া মন্তব্যটার সূত্র জুড়তে গেলেন প্রিয়তোষ।

ইউ আর টেরিব্লি আপসেট। বাট দেয়ার ইজ নো ডেঞ্জার।—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সরকার।

আমার সাধনাকে বাঁচাতেই হবে ডাক্তারবাবু।—কথা বললেন সাধনার মা।

নাম শুনে মেয়েটির দিকে আর একবার চাইলেন ডাক্তার সরকার। মিডওয়াইফারি আর জুরিসপ্রুডেন্সের

মাথা নীচু করে বসে রইলেন প্রিয়তোষ।

পরিমল বলল, সব জিনিস সে আগে খুলে বললেই পারত। সে আমাকে বিশ্বাস করতে পারে নি।

তুমি তাকে ক্ষমা করতে পারতে পরিমল?

পরিমল হাসল। বলল, চেষ্টা করতাম।

প্রিয়তোষ দেখলেন, এই ঘরেই কাল ডাক্তার সরকারের মুখে যে সব রেখা পড়েছিল, পরিমলের মুখে তার কোন চিহ্নই নেই। মানুষের এ সর্বংসহ মূর্তি তিনি কোনদিন এত গভীরভাবে চোখে দেখেন নি।

আস্তে আস্তে খাটে গিয়ে বসলেন প্রিয়তোষ: এতদূর আমি ভাবতে পারি নি পরিমল। বিজ্ঞানীর মন নিয়ে আমি মানুষকে দেখে এসেছি এতকাল। এখন দেখছি সে দেখা আমার ঠিক দেখা নয়।

পরিমল যেমন বসেছিল সেই রকমই বসে রইল।

শুধু ঠিক নয় কেন বলি, এ দেখা আমার ফাঁকিতে ভরতি। এ ফাঁকি যে কত সাংঘাতিক, কতদূর পর্যন্ত মানুষকে নিঃস্ব করতে পারে, বুঝিয়ে না বললে তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি ভাবছ একমাত্র মেয়ের দুঃখে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছি। তা নয়। দুঃখ যত বড়ই হোক বৈজ্ঞানিক নিয়মে সে আপনিই শান্ত হয়। কাজেই সাধনার শোক আমার নিত্যকালের জিনিস নয়। এ আমি বুঝি।

চেয়ারের হাতল ধরে প্রিয়তোষের মুখের দিকে চেয়ে বসে রইল পরিমল।

পাপ পুণ্য উড়িয়ে দিয়েছে বিজ্ঞান, এই ছিল আমার বিশ্বাস। শুধু বিশ্বাস কেন অভিমানও বলতে পার। কিন্তু তার বাইরেও যে একটা জগৎ আছে—কৃপার জগৎ, দয়ার জগৎ, ক্ষমার জগৎ, প্রেমের জগৎ, যে রাজ্যের সবই অনিয়ম, সবই খামখেয়ালি, যেখানে অনিয়মের নিয়মে মহাপাপী ক্ষমা পায়, পাষাণী অহল্যা মানবী হতে পারে, সে রাজ্যের একটু আভাস পাচ্ছি তোমার ভেতর দিয়ে। কিন্তু তুমি আমার নাগালের বাইরে পরিমল। কিসের জোরে আর তোমাকে আমি ধরে রাখব?

বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন প্রিয়তোষ। তবুও পরিমল কোন কথা খুঁজে পেল না।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে নিয়ে আবার বললেন প্রিয়তোষ, এ যদি ভুল ধরার ব্যাপার হত, সে দুঃখ আপনিই সয়ে যেত। এ তো ভুল ধরা নয়, যাচাই করতে করতে ফাঁকি ধরা পড়া। দুঃখ দুর্ভোগ ছেঁকে ফেলে জীবনের সারটুকু ভোগ করা এই না হল বিজ্ঞানের সাধনা— বিজ্ঞানের বিদ্রোহ। তা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানই বল আর জড়-বিজ্ঞানই বল, সকলেরই মূল লক্ষ্য এ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই প্রথম জীবনে একটি মেয়েকে ভালবেসে যখন তাকে পেলাম না, সাধনার মাকে বিয়ে করলাম। সাধনার জন্ম হল ও সেই সূত্রে তোমার শাশুড়ী বছর দুই ভুগে একটু সুস্থ হলেন। হাসপাতাল, গাইনোকলজিক্যাল সার্জেন অনেকের চেহারাই তখন চেনা হয়ে গেছে। চোখে আঙুল দিয়ে অনেক পথ দেখিয়ে দিচ্ছে বিজ্ঞান। কত নতুন উদ্ভাবন। প্রকৃতিকে ফাঁকি দেবার কত বিভিন্ন প্রণালী। ভাগ্য-কর্মফলকে কোণঠাসা করবার কত না তোড়জোড়। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর দুর্বল স্বাস্থ্যের অজুহাত দেখিয়ে নিজের ওপর অস্ত্রোপচার করালাম। এর পরের কথা এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীর মন নিয়েই বিচার করে এসেছি। পাপ পুণ্যের সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচার নিয়ে নিজেকে কোনদিন সংস্কারের খুঁটিতে বেঁধে রাখি নি। যা ভাল লেগেছে করেছি, ভাল ভেবে করি নি।

প্রিয়তোষ থামলেন। মনে হল, পরিমল লজ্জা পাচ্ছে।

তুমি লজ্জা পেয়ো না পরিমল। আমার কথা শেষ হয়ে গেছে। কাল পর্যন্ত বিশ্বাস করেছি স্থূল পরিণামটা রুখতে পারলে সূক্ষ্ম পাপবোধ আপনিই সহজ হয়ে যায়। পাপপুণ্যের যা কিছু বোধ, যা কিছু পরিণতি, সবই প্রাকৃতিক নিয়মের মোটামুটি ফলগুলোর ওপর নির্ভর করে। তাই কাল যখন ডাক্তার সরকার ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল, হাতে উপায় থাকতেও প্রয়োগ করতে সাহস করল না, ভাবলাম বিজ্ঞান এগোলেও মানুষ এখনও তার সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। প্রকৃতিকে জয় করবার সহস্র উপায় তার হাতে এসে গেলেও অপরাধবোধের ভূত তাকে আজও অসহায় শিশু করে রেখেছে। কিন্তু আজ আর সে বিশ্বাস ধরে রাখতে পারছি না পরিমল। তুমি আমার সব ওলট-পালট করে দিলে। আজ বুঝছি বিজ্ঞান যত বড়ই হোক, মানুষ তার চেয়ে অনেক বড়।

এইবার আমি উঠি। কাল সকালেই আবার আসব।

কাল আবার আসবে?

নিশ্চয়ই আসব।

পরিমল উঠে দাঁড়াল। হাতের নরম নরম ছোঁয়া লাগল প্রিয়তোষের দুখানা পায়ের ওপর।

চলে গেল পরিমল। একটু পরে আবার দোর খুলল। এবারেও সেই ছায়া। মানুষ আর তার ছায়া। সবই যাচ্ছে। কিন্তু এ ছায়া আজও তাঁকে ছাড়ে নি।

শুনছ। পরিমল আবার কাল সকালে আসবে।— প্রিয়তোষ বললেন।

হ্যাঁ, আমাকেও তাই বলে গেল।—প্রতিভা বললেন।

আমাদের যদি আর একটা মেয়ে থাকত ওর সঙ্গে বিয়ে দিতাম। কি বল?

বাংলা অমিত্রযতি পয়ার ছন্দ

নীলরতন সেন

আলোচ্য ছন্দকে মধুসূদন অমিত্রাক্ষর পয়ার নাম দিয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত বাংলা ছন্দে অক্ষর কথাটি 'কলা' (mora), দল (syllable) এবং বর্ণ (letter) তিন অর্থেই ব্যবহৃত হত। আর এই তিনের সঠিক বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য তখনও সুনির্দিষ্ট হয় নি। মনে হয়, মধুসূদন অক্ষর কথাটি দ্বারা বর্ণ বা letter-কে বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁর বোধ হয় ধারণা ছিল, চোদ্দ অক্ষর (বা বর্ণ) নিয়ে এক একটি পংক্তি (line) গড়ে ওঠে। তিনি 'অমিত্র-অক্ষর' বলতে পংক্তিশেষের বর্ণ-অনুপ্রাস-মিল তুলে দেবার কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পয়ারের চিরাচরিত ধারা বদলাতে গিয়ে, তার 'Jingling monotony' ভাঙতে গিয়ে তিনি এ ছন্দের প্রকৃতিগত যে বিপুল পরিবর্তন আনলেন,—সে তুলনায় এই পংক্তি-শেষের বর্ণানুপ্রাস তুলে দেবার নির্দেশটুকু নিতান্তই গৌণ বলে বিবেচিত হবে। পরবর্তী কবিদের হাতে (গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি) এ ছন্দের নতুন বৈচিত্র্য ফুটে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা উপলব্ধি করলাম, মধুসূদন-প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর পয়ার' ছন্দের মূল রচনাকৌশল পংক্তি-প্রান্তিক বর্ণানুপ্রাস মিল তুলে দেবার মধ্যে নেই, রয়েছে, ভাব যতি (sense pause) এবং ছন্দ যতির (rhythmic pause) এতকালের মিত্রতা ভেঙে দেবার মধ্যে।

মধুসূদনের পয়ার ভারতচন্দ্রীয় পয়ারকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। ভারতচন্দ্র প্রাক্-মধুসূদন বাংলা কাব্যে যে সুনির্দিষ্ট পয়ার রীতি গড়ে তুললেন, তাতে প্রত্যেক পংক্তি আট এবং ছয় মাত্রা ভাগে দুটি পদ (caesuric-pause) সহযোগে গড়ে উঠত। যেমন—

> সেই ঘাটে খেয়া দেয় | ঈশ্বরী পাটনী। I
> ত্বরায় আনিল নৌকা | বামাস্বর শুনি॥ I[1]

এ কবিতার প্রত্যেক পংক্তি আট এবং ছয় মাত্রা ভাগের দুটি পদ সহযোগে—চোদ্দ মাত্রায় (৮+৬) গড়ে উঠেছে। এখানে প্রত্যেক পংক্তিতে আট মাত্রার পদের পর ছন্দের খাতিরে এবং পংক্তিশেষে চোদ্দমাত্রার পর ভাব এবং ছন্দ উভয়ের খাতিরে একই সঙ্গে থামতে হচ্ছে। ছন্দের প্রকৃতিবিচারে এ কবিতাটিকে কলা-দল-মাত্রিক (mora-syllabic) বলতে হয়। বাংলা ছন্দের মূল তিনটি প্রকৃতি গড়ে উঠেছে তাদের রুদ্ধদল (closed-syllable) গুলির মাত্রা গণনা পদ্ধতির বৈচিত্র্যের ওপর। একবারের প্রচেষ্টায় যেটুকু উচ্চারণ হয় তার নাম দল বা syllable। অনেকে দলকেই 'অক্ষর' বলে থাকেন। দল মুক্ত (open) বা রুদ্ধ (closed) দু রকমের হতে পারে। যেমন কা, প্র, ও প্রভৃতি মুক্তদল। আবার আম্, মন্, প্রাণ্, ঔ, এই প্রভৃতি রুদ্ধদল। সাধারণতঃ, স্বরান্ত দলগুলি মুক্তদল, হলন্ত দলগুলি রুদ্ধদল। একটি মুক্তদলের স্বাভাবিক উচ্চারণ কালের এককের (unit) নাম কলা। মূল তিনটি ছন্দ-প্রকৃতি হল, (১) কলামাত্রিক (moric), (২) দলমাত্রিক (syllabic) এবং (৩) কলা-দলমাত্রিক (mora-syllabic)। কলামাত্রিক ছন্দকে অনেকে 'মাত্রাবৃত্ত' বলেছেন; দলমাত্রিক ছন্দকে স্বরবৃত্ত, বলবৃত্ত, লৌকিক বা ছড়ার-ছন্দ ইত্যাদি বলেছেন; কলা-দলমাত্রিক ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত, পদভাগের ছন্দ বা বিশিষ্ট কলামাত্রিক ছন্দ বলেছেন। কলামাত্রিক ছন্দে প্রত্যেক মুক্তদল একমাত্রা সময়ে এবং প্রত্যেক রুদ্ধদল দুমাত্রা সময়ে উচ্চারণ করতে হয়। মাত্রার উচ্চারণ সময়-একক (time-unit) সেখানে কলা বা mora। দলমাত্রিক ছন্দে সাধারণভাবে সব দলকেই রুদ্ধ বা মুক্ত নির্বিশেষে একমাত্রা করে ধরতে হয়।[2] মাত্রার একক সেখানে দল বা syllable। কলা-দলমাত্রিক ছন্দে মুক্তদলগুলি একমাত্রা ধরে নিয়ে, শব্দের মাঝের রুদ্ধদলকে একমাত্রা এবং শব্দের শেষের রুদ্ধদলকে দুমাত্রা সময়ে উচ্চারণ করতে হয়। এখানে কলা এবং দল উভয়কেই স্থানবিশেষে উচ্চারণ সময়ের

১ শব্দের পাশে '।'—চিহ্ন দিয়ে পদশেষের ছন্দযতি (caesuric-pause) এবং পংক্তিশেষে 'I'—চিহ্ন দিয়ে পংক্তিশেষের ভাবযতি এবং ছন্দযতি বোঝানো হয়েছে।

২ এ সম্পর্কে বিভিন্ন ছান্দসিকের মতভেদ রয়েছে।

বা মাত্রার একক ধরা হয়েছে। কলাদল ছন্দটি সে হিসাবে মিশ্রিত ছন্দ—এতেই বাঙালীর স্বাভাবিক উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। মোটামুটি এই হল মূল ছন্দ-প্রকৃতির পরিচয়। ভারতচন্দ্রের হাতে কলা-দলমাত্রিক পয়ারের বিশিষ্ট রীতিটি পূর্ণতা লাভ করেছিল।

ভারতচন্দ্রীয় পয়ারকে সে যুগে 'মিত্রাক্ষর পয়ার' বলা হত। আর সেই কারণেই এ ছন্দ থেকে তাঁর নিজস্ব ছন্দের পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে মধুসূদন তাঁর ছন্দকে 'অমিত্রাক্ষর পয়ার' বলেছিলেন। 'অক্ষর' কথাটি এখন দল বা syllable-এর প্রতিশব্দ হিসেবে অনেকে ব্যবহার করছেন। সেক্ষেত্রে মধুসূদনের ছন্দকে অমিত্রাক্ষর পয়ার বললে ভুল বোঝবার আশঙ্কা থাকে। 'অমিত্রাক্ষর' কথাটিকে ভাঙলে দাঁড়ায়, অক্ষরের (বা দলের) অমিত্রতা। অক্ষর বা দলের অমিত্রতা প্রতি পংক্তিতে, প্রতি পদে বা প্রতি পর্বে হতে পারে। মধুসূদন যদি 'অমিত্রাক্ষর' বলতে পংক্তিশেষের দলের অনুপ্রাস-অমিত্রতা বা অমিল বোঝাতে চান, তার জবাবে বলা যেতে পারে, পংক্তি-প্রান্তের মিল রক্ষা করেও মধুসূদনের পয়ারের রীতিগত গুণটুকু রক্ষা করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু কবিতাতেই এই রীতি পংক্তিশেষের অনুপ্রাস মিল রেখে আমদানি করেছেন। একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—

> অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে
> অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য; আসিয়াছে ফিরে
> নিস্তব্ধ আশ্রম মাঝে ঋষিপুত্রগণ
> মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
> বনান্তর হতে।

মধুসূদনের পয়ারের গুণ এ কবিতায় ঠিক ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পংক্তিশেষে অনুপ্রাসমিত্রতা রেখেছেন কবি। একে মিত্রাক্ষর বলব, না, অমিত্রাক্ষর বলব? আবার 'অমিত্রাক্ষর' বলতে যদি কেউ পংক্তি পদ বা পর্বের দলসংখ্যার অমিত্রতা বোঝাতে চান সেখানেও ঠকতে হবে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
ব র ষার | নি র্ঝ রে I অ স্থি ত | কায়।॥
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
দু ই তী রে | গি রি মা লা I ক ত দূর | যায়॥॥[১]

এ কবিতা নিশ্চয়ই অমিত্রাক্ষর, কারণ প্রথম পংক্তিতে যেখানে অক্ষর বা দলসংখ্যা দশ, দ্বিতীয় পংক্তিতে সেখানে দলসংখ্যা বারো। রুদ্ধদল, মুক্তদলের সংখ্যাতেও দুই পংক্তিতে মিল নেই। পদ বা পর্বের দলসংখ্যাও সর্বত্র সমান নয়। প্রথম পংক্তির প্রথম পদে ছয়টি দল, দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পদে আটটি দল। প্রথম পংক্তির প্রথম পর্বে তিনটি দল, দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম পর্বে চারটি দল। তা হলে দলবিচারে দেখা যাচ্ছে এ কবিতা খাঁটি অমিত্রাক্ষর। তবু কোনও ছান্দসিকই এই 'মিত্রাক্ষর' কলামাত্রিক কবিতাটিকে মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর পয়ারে'র সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত করতে রাজী হবেন না। সুতরাং যখন থেকে 'অক্ষর' কথাটির দল বা syllable অর্থে ব্যবহার শুরু হয়েছে তখন থেকে 'অমিত্রাক্ষর পয়ার' নামে মধুসূদন-প্রবর্তিত পয়ারকে আর বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না।

এই ত্রুটি লক্ষ্য করেই বিভিন্ন ছান্দসিক 'অমিত্রাক্ষর পয়ার'কে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিভাষা হল, (১) অমিতাক্ষর পয়ার (২) মিতাক্ষর পয়ার (৩) অমিত্র পয়ার এবং (৪) প্রবহমান পয়ার। আমরা সর্বপ্রথম এই পরিভাষাগুলির উপযুক্ততা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করব।

(১) অমিতাক্ষর পয়ার:—ছান্দসিক এ নামকরণের কারণ দেখিয়ে বলেছেন, এ ছন্দে কত অক্ষরের পর ভাবযতি পড়বে তা কিছু নির্দিষ্ট নেই—সুতরাং অ-মিত। ছান্দসিক নিজেই অনেক ক্ষেত্রে 'অক্ষর' কথাটি syllable অর্থে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং মধুসূদনের পয়ার ছাড়া অন্য মিত্রাক্ষর পয়ারকেও 'অ-মিত অক্ষর' বলতে কিছু বাধা দেখি না। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১
এ দু র্ভা গ্য দেশ হতে হে ম ঙ্গ ল ময়,
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
দূর ক রে দা ও তু মি স র্ব তু চ্ছ ভ য়।[১]

কবিতাটির প্রথম পংক্তি আর দ্বিতীয় পংক্তির অক্ষর-সংখ্যা যথাক্রমে এগারো এবং বারো। কিন্তু এটি বিশুদ্ধ 'মিত্রাক্ষর' পয়ারের উদাহরণ। মধুসূদনের পয়ারের

---

১ প্রত্যেকটি দলের ওপর ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে বা ১, ২, ৩, ইত্যাদি রেখ-সংখ্যা দিয়ে যথাক্রমে মুক্তদল এবং রুদ্ধদলের সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। শব্দের পর '।' চিহ্ন দিয়ে, 'I'—চিহ্ন দিয়ে, '॥' চিহ্ন দিয়ে যথাক্রমে পর্বযতি, পদযতি এবং পংক্তিযতি বোঝানো হয়েছে।

১ চিহ্ন-সংকেত পূর্ববৎ।

প্রকৃতিগুণ এখানে খোঁজ করলে বিফল হতে হবে ; কিন্তু এটি অমিতাক্ষর পয়ার ঠিকই হয়েছে। এ উদাহরণ তুলেছি কলা-দল-মাত্রিক প্রকৃতির কবিতা থেকে। বিশুদ্ধ কলা-মাত্রিক প্রকৃতির কবিতায়ও অনুরূপ উদাহরণ আগে তুলেছি (বরষার নির্ঝরে···)। সেটিও খাঁটি অমিতাক্ষর কবিতা ; কিন্তু দুটিই মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' থেকে স্বতন্ত্র। তা হলে দেখা যাচ্ছে, 'অমিতাক্ষর' নামটি এ ছন্দের ব্যঞ্জনা-সৌরভ ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছে না। 'অমিতাক্ষর' নাম দিয়ে অন্য কবিতা থেকে মধুসূদনের পয়ারকে পৃথক করে বোঝানো সম্ভবপর হচ্ছে না।

(২) 'অমিতাক্ষর' নামটির ত্রুটি দেখেই 'মিতাক্ষর' নামটি বোধ হয় ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু এ নামটিও সমদোষে দুষ্ট। 'মিতাক্ষর' নাম দিয়ে ছান্দসিক প্রতি পংক্তির পদের বা পর্বের অক্ষরসংখ্যা (দলসংখ্যা) পরিমিত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট হবে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কলামাত্রিক বা কলা-দলমাত্রিক প্রকৃতির ছন্দে প্রত্যেক পংক্তির অক্ষরসংখ্যা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। কলা-দলমাত্রিক ছন্দে লেখা মধুসূদন-পয়ারও এর কিছু ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং তাকে 'মিতাক্ষর' বললে সত্যের অপলাপ হবে। যেমন—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
দাঁ ড়া ও প থিক বর জ ন্ম য দি ত ব
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩
ব ঙ্গে ! তি ষ্ঠ ক্ষ ণ কাল ! এ স মা ধি স্থ লে
(জ ন নীর কো লে শি শু ল ভ য়ে যে ম তি
বি রা ম) ম হী র প দে ম হা নি দ্রা বৃ ত
দ ত্ত কু লো দ্ভ ব ক বি শ্রী ম ধু সূ দ ন।[১]

এখানে প্রত্যেক পংক্তির অক্ষর-(দল) সংখ্যা পরিমিত নয়। অথচ, এটি খাঁটি মধুসূদন-পয়ার। বরং এ কবিতাকে মিতমাত্রিক বললে সত্য বলা হত। কিন্তু সেখানেও সমস্যা হল, এ ছন্দের বাইরেও অধিকাংশ কাব্যছন্দই মিতমাত্রিক। তাদের থেকে মধুসূদন-পয়ারকে পৃথক করে বোঝাবার উদ্দেশ্যে 'মিতমাত্রিক' পরিভাষা ব্যবহার সম্ভব নয়।

(৩) অমিত্র পয়ার নামটিও অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট। 'অমিত্র' বললেই এই অমিত্রতাবোধ কিসের—সে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। ছান্দসিক যদি মধুসূদনের মত পংক্তিশেষের অনুপ্রাস-অমিত্রতার কথাই বোঝাতে চান তবে তো ঈশ্বর গুপ্তের সেই ব্যঙ্গাত্মক 'অমিত্রাক্ষর' কবিতাটিও 'অমিত্র' কবিতা। যেমন—

কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি,
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।

এখানে পংক্তিশেষে অনুপ্রাসের মিত্রতা ভেঙে দেওয়া হলেও ছান্দসিক নিশ্চয়ই একে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর (তাঁর ভাষায় 'অমিত্র পয়ার') বলতে কুণ্ঠিত হবেন। আর 'অমিত্র পয়ার' নামে তিনি যদি ভাব-যতি এবং ছন্দ-যতির অমিত্রতার কথা বোঝাতে চান তা হলে এ পরিভাষা অপূর্ণতার দোষে দুষ্ট হয়েছে স্বীকার করতে হয়।

(৪) উপরোক্ত পরিভাষাগুলির অপূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ ছন্দকে কোনও ছান্দসিক 'প্রবহমান পয়ার' বলেছেন। একাধিক পংক্তি ডিঙিয়ে এ কবিতার ভাবপ্রবাহ এগিয়ে চলে এটা লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ একে 'পংক্তি ডিঙানো ছন্দ' বলেছিলেন। ঠিক সেই কারণেই একে ছান্দসিকরা প্রবহমান পয়ার বলতে চেয়েছেন। এ কথা ঠিক, প্রবহমান পয়ার বললে ছন্দটির আন্তর গুণ অনেকখানি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তবু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায়, ছান্দসিক যে ভাবের প্রবাহের কথাই বলছেন, অর্থের প্রবাহের কথা বলছেন না—সে কথা বোঝবার অবকাশ কোথায় ? তা ছাড়া ভাবের প্রবাহ যে একাধিক পংক্তি ডিঙিয়ে চললেও ছন্দ-যতি তাকে কিছুটা ধরে রাখছে, এই ভাবের প্রবাহ-গতি এবং ছন্দের যতি-বন্ধন যে বিচিত্র দোলা সৃষ্টি করছে, শুধু 'প্রবহমান পয়ার' নামে তা যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। অন্য পরিভাষাগুলির তুলনায় অনেকটা স্পষ্টতর হলেও 'প্রবহমান পয়ার' নামেও এ ছন্দের সবটুকু পরিচয় মিলছে না।

২

তা হলে সুষ্ঠুতর কোনও পরিভাষায় মধুসূদনের ছন্দকে পরিচিত করা চলে কিনা দেখতে হবে। আগেই বলেছি, এ ছন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, ছন্দ-যতির বন্ধন এবং ভাব-যতির মুক্তি। যতি সংস্থাপনায় বৈচিত্র্য-

১ চিহ্ন-সংকেত পূর্ববৎ।

সাধনই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রাক্-মধুসূদন যুগের কবিরা 'মিত্রাক্ষর-পয়ারে' ছন্দ-যতির এবং ভাব-যতির পার্থক্য বুঝতেন না। তার ফলে এতকাল তাঁরা পংক্তি-শেষে ভাব-যতিকে ছন্দ-যতির সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছিলেন। পয়ারের এই কোমল একঘেয়ে সুরের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ করলেন মধুসূদন—ভাব-যতির এবং অর্থ-যতির এতকালের এই বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলিত মিত্রতা ভেঙে দিলেন তিনি। চোদ্দমাত্রার পয়ার পংক্তিতে আট এবং ছয় মাত্রার দুটি পদভাগে (পয়ারের অপর নাম দ্বিপদী) ছন্দ-যতি অক্ষুণ্ণ রেখে ভাব-যতিকে অনেকটা স্বাধীনভাবে একাধিক পংক্তি ডিঙিয়ে চলবার স্বচ্ছন্দগতি এনে দিলেন। ভাবের একটি পূর্ণপ্রবাহ যেখানে শেষ হবে—তা সে পংক্তির মাঝে বা শেষে যেখানেই হোক—সেখানেই ভাব-যতি স্থাপন করলেন। আমরা ভাব-যতিকে 'অনেকটা স্বাধীন' বলছি, কারণ মধুসূদনের হাতে ভাব-যতি পূর্ণস্বাধীনতা পায় নি, ছন্দ-যতিকে ভাব-যতি পুরোপুরি অস্বীকার করে চলতে পারে নি। সেটা সম্ভব হয়েছে আরও পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার ছন্দে। অনেকে আবার মুক্তবন্ধ ছন্দকেই মধুসূদন-পয়ারের পরিণত রূপ মনে করেছেন। সেখানে তাঁরাও এ দুটি ছন্দের প্রতি সুবিচার করেন নি মনে হয়। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। আমরা যে কথা বলছিলাম, ভাব-যতি কিছুটা স্বাধীন হলেও আংশিকভাবে ছন্দ-যতির অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে। ভাবপ্রবাহ পংক্তিকে ডিঙিয়ে চললেও পদের শেষে, পর্বের শেষে অথবা উপপর্বের শেষে তাকে থামতে হয়। মধুসূদন কলা-দল মাত্রিক প্রকৃতির ছন্দে পয়ার লিখেছেন। কলা-দল-মাত্রিক ছন্দে কোথায়ও বিজোড় সংখ্যক মাত্রার পর কোনও যতি স্বীকৃত হয় না। তাতে ছন্দের ধ্বনি-সৌষম বোধ ক্ষুণ্ণ হয়। ভাব-যতিকে স্বাধীনতা দিতে গিয়েও ছন্দ যতির এটুকু অধীনতা মধুসূদনকে স্বীকার করতে হয়েছে। প্রায় সর্বত্রই এই নিয়ম তিনি মেনে চলেছেন, কদাচিৎ যেখানেই মানেন নি সেখানেই ছন্দ-পতন ঘটেছে। যেমন—

নিশার স্বপনসম | তোর এ বারতা |
রে দূত! * অমরবৃন্দ | যার ভুজবলে |
কাতর, * সে ধনুর্ধরে | রাঘব ভিখারী।
বধিল সম্মুখ রণে? * | [১]

এখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পংক্তিতে তিন মাত্রার শব্দের পর ('রে দূত' এবং 'কাতর') ভাব-যতি দেবার ফলে কবিতার ধ্বনিসুষমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু একটু সামান্য পরিবর্তন করে কবি যদি লিখতেন—

নিশার স্বপনসম | এ বারতা তব |
দূতবর! * দেববৃন্দ | যার ভুজবলে |
হীনপ্রভ, * সেই বীরে | রাঘব ভিখারী |
বধিল সম্মুখ রণে? * | [২]

তা হলে ছন্দ-বোধ এতটুকু ক্ষুণ্ণ হত না। মধুসূদনের প্রথম দিকের রচনায় এ-জাতীয় কিছু কিছু ছন্দপতনের দৃষ্টান্ত থাকলেও 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, এ ছন্দে পদ এবং পংক্তিশেষের ছন্দ-যতি এবং ভাবের পূর্ণ প্রবাহ শেষের ভাব-যতি উভয়ের মর্যাদা স্বীকৃতি পেয়েছে। এতদিন ভাব-যতিকে ছন্দ-যতির সঙ্গে যে শৃঙ্খলিত মিত্রতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হত, মধুসূদন সেই মিত্রতার বাঁধন ঘুচিয়ে দিলেন, ভাবের প্রবাহকে স্বচ্ছন্দভাবে চলবার সুযোগ দিলেন। এ ছন্দ 'অমিত্র' হতে পারে—কিন্তু 'অমিত্র অক্ষর' নয়—অমিত্র-যতি। আমরা এ ছন্দকে 'ভাবপ্রবহমান অমিত্র-যতি পয়ার' বা সংক্ষেপে 'অমিত্র-যতি' ছন্দ বলতে চাই। একদিকে ভাবের মুক্ত স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, অপর দিকে চোদ্দ মাত্রার পংক্তিতে আট এবং ছয় মাত্রার পদবন্ধন—এই মুক্তি-বন্ধনের দোলা এ ছন্দের প্রাণসৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। নিছক ভাবের প্রবহমানতায় (যেমন গদ্য-কবিতার ছন্দে) ঠিক সে সৌন্দর্য ফুটবে না, নিছক মিত বা অমিত দল বা কলা-ব্যবহারেও এ ছন্দের প্রাণস্পন্দন জাগবে না। যতির বৈচিত্র্যসাধনে—ভাব-যতি এবং ছন্দ-যতির মুক্তি-বন্ধনের বিচিত্র লীলায় তার প্রাণছন্দ জাগিয়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং 'ভাবপ্রবহমান অমিত্রযতি পয়ার' বা সংক্ষেপে 'অমিত্রযতি পয়ার' নাম দিলেই যেন এ ছন্দের নামকরণে সুবিচার হতে পারে।

১-২ শব্দের পাশে '|' চিহ্ন দিয়ে ছন্দ (পংক্তি, পদ)-যতি এবং '*' চিহ্ন দিয়ে ভাব-যতি বোঝানো হল।

৩

মধুসূদন কেবলমাত্র কলা-দল-মাত্রিক প্রকৃতির ছন্দে তাঁর অমিত্রযতি পয়ারের পরীক্ষা করেছিলেন। সেখানে তিনি ভাব-যতি এবং ছন্দ-যতির মিত্রতা ভাঙতে গিয়ে সেই সঙ্গে পংক্তিশেষের অনুপ্রাস-মিলও তুলে দিয়েছিলেন। গতানুগতিক মিত্র-যতি (মিত্রাক্ষর) পয়ারের অনুবর্তনকে সব দিক থেকেই ভাঙবার প্রয়াস ছিল তাঁর ছন্দোবিদ্রোহে। তাঁর কাব্যের ভাবগত চেতনা এবং ছন্দধ্বনি—উভয়ক্ষেত্রেই এই সার্বিক বিদ্রোহ সে যুগের পাঠক কতটা গ্রহণ করতে পেরেছিল সন্দেহ রয়েছে। পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে পংক্তিপ্রান্তিক অনুপ্রাস-মিল রেখেও যে অমিত্রযতি পয়ার রচনা সম্ভব তা দেখিয়েছেন। তার পর থেকে বহু কবির কবিতায় কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক প্রকৃতির অমিত্রযতি পয়ারেরও নিদর্শন মিলেছে। সে কবিতায় পংক্তিশেষে অনুপ্রাস-মিল রেখে বা না রেখে, উভয়ভাবেই কবিরা এ ছন্দের ব্যবহার করেছেন।

পয়ারে যেমন আমরা দেখেছি, প্রত্যেক পংক্তি আট এবং ছয় মাত্রার দুটি পদসমন্বয়ে চোদ্দমাত্রায় গড়ে ওঠে, তেমনই পংক্তির মাত্রাসংখ্যা ঠিক চোদ্দ না হয়ে বারো, ষোল, আঠারো, কুড়ি, বাইশ ইত্যাদি হতে পারে। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে প্রতি পংক্তি দ্বিপদী না হয়ে ত্রিপদী বা চতুষ্পদীও হতে পারে। এ কবিতাকে আমরা পয়ারাঙ্গ অর্থাৎ পয়ার জাতীয় কবিতা বলতে চাই। পয়ারের মত পয়ারাঙ্গ কবিতাও অমিত্রযতি রীতিতে, পংক্তিপ্রান্তে মিল রেখে এবং মিল না রেখে কবিরা লিখছেন। সেদিক থেকে অমিত্রযতি ছন্দকে একটি ছকের সাহায্যে আমরা দেখাতে পারি :

পয়ারাঙ্গ অমিত্রযতিকে আরও ভেঙে একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ইত্যাদি বা এগুলির সংমিশ্রণজাত বিবিধ বিচিত্র পংক্তির ছন্দ গড়ে উঠতে পারে। তার বিস্তৃত আলোচনা পরে কোন সময় করবার আশা রাখি। বস্তুতঃ, বাংলা ছন্দে পয়ার রীতির প্রভাব, ছন্দ আলোচনায় একটি লক্ষণীয় দিগ্‌ভঙ্গির আলোচনায় সূত্রপাত করতে পারে। প্রাসঙ্গিক দু-একটি ছন্দ উদাহরণ দিয়ে আমরা এ আলোচনা শেষ করছি।[১]

(১) প্রথম অমিত্রযতি অমিল কলামাত্রিক পয়ারের উদাহরণ—

সারাদিন সারারাত | একটানা ঝরে |
বারিধারা। * পাখিগুলি | শাখে বসে ভিজে |
ডানা ঝেড়ে, * অতন্দ্র | সারারাত কাঁদে। | *
কাঁদে আর ভাবে বুঝি | শেষ কোথা এর ! | *

(২) দ্বিতীয় উদাহরণে এ কবিতাকেই সমিল কলামাত্রিক পয়াররূপে একটু পরিবর্তন করে লেখা চলে—

সারাদিন সারারাত | একটানা ঝরে |
বারিধারা। * পাখিগুলি | শাখের উপরে |
ভিজে ডানা ঝাপটায়, | * কাঁদে রাতদিন ; | *
অনিদ্রা অনাহারে | আয়ু হয় ক্ষীণ। | *

(৩) তৃতীয় অমিত্রযতি অমিল দলমাত্রিক পয়ার—

বছর বিশেক বয়েস হবে | থার্ড ইয়ারে পড়ে |
মোদের মাধু। * মাধাই মিটার | ইংরেজি বোল মুখে |
ফটফটিয়ে বোলেই চলে ; | * ভাবে বুঝি তাতে |
কদরটা তার বুঝবে সবাই। | * এতদিনেও তবু |
পশার ভালো জমলো নাকো, | *—দুঃখ সেখানেই। | *

১ উদাহরণগুলিতে '|' চিহ্ন ছন্দ-যতিতে এবং '*' চিহ্ন ভাব-যতিতে ব্যবহৃত হল।

রক্ষা

রজত সেন
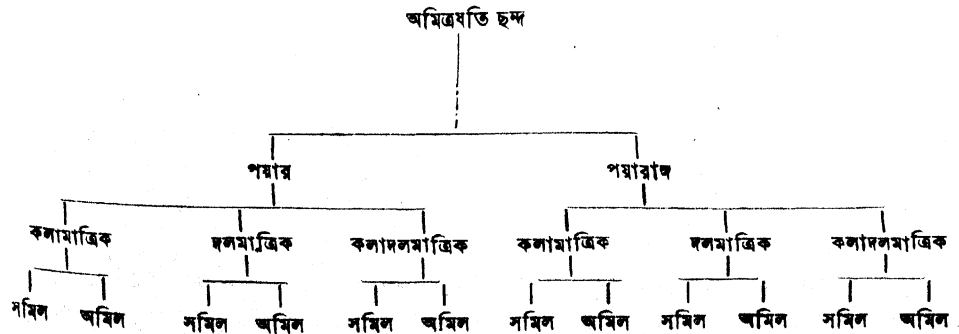
অন্যমনস্কভাবে পানের দোকানটার সামনে এসে পড়েছিল সে, যখন বুঝতে পারল, তখন এগিয়ে সামনে দাঁড়ানো ছাড়া আর উপায় ছিল না।

কী ভোগীরথবাবু! আজকাল যে এ ফুটপাত দিয়ে চোলেন না দেখি! অনেকদিন হয়ে গেল, হামার পয়সাটাও পাওয়া গেল না।

কথাগুলো খুব একটা আপত্তিকর শোনাল না, শুধু ভোগীরথ শব্দটা ছাড়া। ভগীরথ নামের জন্য সে তার বাবা-মাকে আজ পর্যন্ত ক্ষমা করতে পারে নি; যাদের চিন্তা-শক্তির দৌড় এমন, তাদের ছেলের কিই বা এমন হবে—কিই বা হতে পারে!

কিসিনলাল পান সাজছিল। আরও দুটি লোক সিগারেট কিনতে এল। ভগীরথের, কেন জানি না, ওর মোটা গোঁফের নীচে হাসিটা সব সময়েই ভাল লেগেছে, কেমন যেন মধুর অথচ রহস্যময়—তাই দশ টাকার ওপরে ধার জমা হওয়া সত্ত্বেও কখনও না কখনও সে দিয়ে দিয়েছে; কিসিনলালের বেলায়ই এই ব্যতিক্রম। কিন্তু এবারের টাকাটা অনেকদিন হয়ে গেছে। কী করবে সে। দিনকাল খারাপ, তার দোষ কী?

আরও একজন লোক এল পান কিনতে, রাত দশটা পর্যন্ত এমন ভিড় কিসিনলালের দোকানে; তার দোকান থেকে অনেক বিয়ে-বাড়ির পান যায়। না, সরে পড়ল না সে, বরং প্যাণ্টের খালি পকেট দুটোয় হাত ঢুকিয়ে দিয়ে গলা কাত করে আয়নায় মুখ দেখল, নিজের চেহারাটার একটু তারিফ না করে পারল না: না, সিনেমাওয়ালাদের সঙ্গেই কিছুদিন ঘোরাঘুরি করতে হবে, বরাত ফিরতে একটা কুমার হয়ে পড়তে কতক্ষণ!

একটা পান নিবেন নাকি? ও ভোগীরথবাবু?

দেবে? পয়সা কিন্তু।—ছোট ঘড়িটার দিকে তাকাল সে, সাতটা বাজে। কিসিনলাল তার দোকানে ফ্লুরোসেণ্ট আলো লাগিয়েছে।

একটা স্পেশাল পান মুখে পুরে যাবার আগে কিসিন-লালের দিকে আর একবার তাকাল সে, ওর হাসিটা যে কেন তার ভাল লাগে আজ পর্যন্ত বুঝতে পারল না।

---

(৪) চতুর্থ অমিত্রযতি সমিল দলমাত্রিক পয়ার—

।মিদারের মায়ের শ্রাদ্ধ | বেগার খাটার ডাক— | *
াই ডোমনির ছেলে বললে, | * কাজের যে নেই ফাঁক, | *
ারব না আজ যেতে। * শুনে | কোতলপুরের রাজা
ললে, * ওকে যে করেই হোক | দিতেই হবে সাজা। | *

লাদলমাত্রিক সমিল এবং অমিল অমিত্রযতি পয়ারের াদাহরণ এ আলোচনায় আগেই তুলেছি। বাহুল্য াধে আর এখানে দিলাম না। পয়ারাজে কলাদল-াত্রিকের সমিল এবং অমিল দুটি অমিত্রযতি উদাহরণ িচ্ছি—

(৫) অমিত্রযতি অমিল কলাদলমাত্রিক পয়ারাজ আঠারো মাত্রা)—

াম জানো, * সুচরিতা, | * হঠাৎ কি করে সে সময় |
তোমার আবছা মুখ | ফিরে এলো আঘাতের মতো। | *
কুয়াশার ভিড় ঠেলে | তবু সেই পরিচিত মুখ |
সুচরিতা, * ক্ষমা করো, | * মনে আনা গেল না কিছুতে।*

(৬) অমিত্রযতি সমিল কলাদলমাত্রিক পয়ারাজ (আঠারো মাত্রা)—

যাবার সময় হোলো | বিহঙ্গের। * এখনি কুলায় |
রিক্ত হবে। * স্তব্ধগীতি | ভ্রষ্টনীড় পড়িবে ধুলায় |
প্রশাখার আন্দোলনে। | * শুষ্কপত্র জীর্ণপুষ্প সাথে |
পথচিহ্নহীন শূন্যে | উড়ে যাব রজনীপ্রভাতে |
অস্তসিন্ধু পারে।*

এই ভাবে পয়ারাজ থেকে সমিল এবং অমিল কলামাত্রিক এবং দলমাত্রিক অমিত্রযতি কবিতারও উদাহরণ তোলা যায়, কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।[১]

১ আলোচ্য প্রবন্ধের ছন্দ-পরিভাষা ব্যবহারে প্রধানতঃ, ছান্দসিক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনকে অনুসরণ করা হয়েছে।—লেখক।

একটুখানি হেঁটে ট্রাম-রাস্তায় এল সে—অন্তহীন লোকের ভিড়। একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে জনতার ...ছিল দেখতে লাগল। একটি মেয়েকে চোখে পড়ল, ...খে মনে হয় চাকুরে মেয়ে, চটপটে ভাব, ...ধে ঝুলনো ব্যাগ, হাতে একখানি ভাঁজ-করা খবরের ...াগজ, বুকটা উঁচিয়ে চলছে, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ...্যানেজারের স্টেনো হবে হয়তো! হয়তো দুপুরে ...্যানেজারের সঙ্গে লাঞ্চ খায়; কিন্তু—ভাবল ভগীরথ, অত ...ক ফুলিয়ে হাঁটবার কী আছে? দুষ্টু হাসি হাসল সে। ...য়েটি চলে গেল।

জুতো পালিশ করার একটি ছোকরা তার বাক্সে চাঁটি ...রে বলল, আসুন বাবু, চার পয়সায় পালিশ করে ...দেব।

ভগীরথ তাকাল, তার কাবুলী চপ্পল জোড়াটায় অনেক দিন কালি পড়ে নি।

কি রে, কেমন আছিস?—একটা পা বাক্সের উপর তুলে দিয়ে ভগীরথ জিজ্ঞেস করল।

পনের-ষোল বছরের ছেলেটি সাদা দাঁত বার করে ...াসল: আপনাদের কৃপায় চলে যাচ্ছে একরকম। রঙ-...ালিশ—

না, শুকনো—কত কামালি আজ? কেমন হয় তাদের?

এই পাঁচ সিকে দেড় টাকা।—ব্রাশ করবার পর জুতোয় ...ালি লাগাচ্ছিল সে।

বলিস কিরে! তা হলে তো ভালই আছিস বলতে ...বে।

ছেলেটি হাসল, মনোযোগ দিয়ে কালি লাগিয়ে জুতোর ...গাড়ায় একটা টোকা মারল। বাঁ পাটা নামিয়ে ডান পাটা তুলে দিল ভগীরথ। জিজ্ঞেস করল, থাকিস কোথায়?

ল্যান্সডাউন বাজারে, ওখানে আমার দাদার আলুর দোকান আছে, রাত্রে শোবার জন্যে দাদাকে চার আনা করে পয়সা দিতে হয় রোজ।

সে কি রে! শোবার জন্যে চার আনা! কেমন দাদা তোর?

মায় পেটের ভাই।

চাকুরে মেয়েটির পিছন দিকটা আবার মনে পড়ল তার, ব্যাগে মাল ছিল কিছু? না, মাস তো কাবার হয়ে এল, এখন আর কী থাকবে! পয়লা দোসরা হলে—

জুতোর গোড়ালিতে আবার টোকা লাগল।

কালি লাগানো হয়ে গেছে, এবারে বুরুশ, তারপর একটুকরো ভেলভেট অথবা সিল্কের কাপড় দিয়ে মাথা দুলিয়ে জুতো রগড়ানো।

চাকরি করবি আমার অফিসে?

বুরুশ থামিয়ে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছেলেটি।

হ্যাঁ রে, আমার অফিসে একটা বেয়ারার চাকরি খালি হবে—শিগগিরই, বলিস তো চেষ্টা করে ঢুকিয়ে দিতে পারি। আপাততঃ আশি পাবি, পরে আরও বাড়বে।

দিন না বাবু ঢুকিয়ে, দয়া কি হবে গরিবের ওপর?

কেন হবে না—লোক তো একজন নিতেই হবে অফিসে।

পরম উৎসাহে ঝাঁকড়া চুল নাচিয়ে জুতোয় কাপড় ঘষতে লাগল ছেলেটি; তারপর আর একটি টোকা, পা নামিয়ে নিল ভগীরথ।

এখানেই পাওয়া যাবে তো তোকে?—প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল সে।

হ্যাঁ বাবু, এখানেই পাওয়া যাবে, আমি আর কোথাও যাই না।

দু টাকার নোট আছে দেখছি—ভাঙানি হবে?

রেখে দিন বাবু, দেবেন অন্য সময়।

ভগীরথ জুতোর দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে কয়েকবার তাকিয়ে এগোতে লাগল। সামনেই চুল-ছাঁটা সেলুন, ধারে চুল ছেঁটেছিল, আট আনা পয়সা এখনও বাকি আছে। ফুটপাত থেকে লম্বা পা ফেলে সে একেবারে রাস্তায় নেমে এল।

খানিকটা এগিয়ে এসে আবার ফুটপাতে উঠল সে, সমস্ত কলকাতা শহরের ওপর বিরক্তি জন্মে গেল তার। নিশ্চিন্তে রাস্তা দিয়ে হাঁটবার উপায় নেই; সামনের দরজির দোকানটাও এড়িয়ে যেতে হবে—দুটো প্যান্ট করতে দিয়েছে। সাত মাস হয়ে গেল, ওরা বাড়িতে চিঠি লিখেছে নিশ্চয়। একটু অবাক হল সে, চিঠিগুলি ডেড-লেটার অফিস থেকে এখনও ফেরত যায় নি ওদের কাছে!

তার মানে বোঝা গেল গভর্মেণ্ট অফিসে কেউই কাজ করে না আজকাল।

বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়াল ভগীরথ, খালি পকেটগুলো একবার হাতড়াল।

একটা বাস এসে থামল, ফুটবোর্ডেই চার পাঁচ জন লোক দাঁড়িয়ে।

নীচের টিকিটগুলো করবেন।—কনডাক্টর চেঁচাচ্ছিল।

বাসের হাতলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি লোক পয়সা বার করল, ঠিক সে সময়ে কনডাক্টর আবার চেঁচিয়ে উঠল: পেছনটা ঠিক আছে পার্টনার—

বাসের গায়ে কয়েকটা থাপ্পড়। বাস দৌড়তে আরম্ভ করল। যে লোকটি পয়সা বার করেছিল তার হাত থেকে একটা আধুলি ছিটকে পড়ল রাস্তায়। কিছুই চোখ এড়ায় না ভগীরথের। লোকটি নামবার চেষ্টা করল, আর একজন রাস্তা থেকে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে ফুটবোর্ডে উঠে পড়ল, পয়সা-হারানো লোকটির আর নামা হল না।

ভগীরথ এগিয়ে গেল, কিন্তু তার আগেই একটা ময়লা হাত আধুলিটা চেপে ধরেছে। ছোট হাতের মুঠোটা পা দিয়ে চেপে ধরল ভগীরথ। জুতোর নীচে নরম আঙুলগুলি পিষে গেল, আস্তে আস্তে জুতো ঘষতে লাগল সে। ছেলেটির মুখের দিকে তাকাল—ছেঁড়া ময়লা শার্ট, আট-দশ বছরের একটি রাস্তার ছেলে, যন্ত্রণায় তার সমস্ত মুখটা বিকৃত হয়ে উঠেছে। মুঠোটা আলগা হয়ে গেল, কোনও রকমে হাতটা সরিয়ে নিল সে, জামায় ঘষতে লাগল। ভগীরথ আধুলিটা তুলে নিল।

বখরা করুন সার্, আধুলিটা আমিই আগে ধরেছিলাম।

ভগীরথ তাকাল, ছেলেটির মুখে একটু হাসির আভাস।

বখরা?

হ্যাঁ সার্, আধাআধি।

মুচকে হাসল ভগীরথ, বলল, আয়।

পানের দোকানে আধুলি ভাঙিয়ে সে বলল, নে, চার আনা।

পয়সাটা হাতে নিয়ে ছেলেটি ভাল করে হাসল। আঙুলের রক্ত মুছে ফেলল ময়লা জামায়। একটি চলতি বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল ভগীরথ, গড়িয়াহাটের মোড়ে যাওয়া যাক, সেখানে অনেক লোকের ভিড়, ভিড়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

জায়গা ছিল, বসে পড়ল সে। তার সামনেই একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনবরত পকেট থেকে কাগজপত্র বার করছিল আর ঢুকিয়ে রাখছিল। কিছু কাগজ নীচে ছড়িয়ে পড়ল, ভদ্রলোক উঠিয়ে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল, একখানি দশ টাকার নোট পড়ে রইল নীচে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল ভগীরথ। না, ভদ্রলোক দেখতে পায় নি। এদিক ওদিক তাকিয়ে হাত বাড়াল সে, কিন্তু তার আগেই পাশের সীট থেকে আর একটি লোক প্রায় ছোঁ মেরে নোটটা তুলে নিল। একটা পা লম্বা করে প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল, পা গুটিয়ে নিল। অতি-মৃদু খসখস শব্দটা পর্যন্ত শুনতে পেল ভগীরথ।

তারই বয়েসী লোকটা—কি দু-এক বছর বেশী হবে। ইস্তিরি-করা প্যাণ্ট আর শার্ট, সরু এক ফালি বাহারি গোঁফও আছে আবার; রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

দেশপ্রিয় পার্কের পরের স্টপেজে বৃদ্ধটি নেমে গেল।

বাস-কনডাক্টর টিকিটের গোছা নিয়ে ফটফট শব্দ করল তার মুখের কাছে, ভগীরথ ঘাড় নেড়ে দিল।

গড়িয়াহাটের মোড়ে লোকটি নেমে গেল, ভগীরথ নামল তার পিছনে। মুখ ফেরাল সে, ভগীরথ তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

রাস্তাটা পার হয়ে গড়িয়াহাট বাজারের সামনে এসে দাঁড়াল সে, ভগীরথ তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বখরা করুন সার্: বলল ভগীরথ, টাকাটা আমিই আগে দেখেছিলাম।

যুবকটি তাকাল, সরু গোঁফের নীচে তার হাসির আভাস: বখরা?

হ্যাঁ, আধাআধি।

একটি মেয়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, সাজগোজ-করা মেয়ে, দুজনেই তাকাল একসঙ্গে।

যুবকটি মুচকে হাসল, বলল, আসুন।

খাবারের দোকান থেকে নোটটা ভাঙিয়ে সে রাস্তায় নামল, একখানি পাঁচ টাকার নোট দিয়ে বলল, নিন।

নোটটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ভগীরথ।

ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ঠাকুর-প্রাসাদে সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছে। সাহিত্য-পরিষদের মহারথীগণ ছাড়া বাংলার মনীষীরা প্রায় সকলেই সমবেত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এসেছিলেন। সেদিন ঠাকুরদা কী করেন, কী বলেন, সেইটেই আমার লক্ষণীয় বিষয় ছিল। আমরা পৌঁছুতেই বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে ঠাকুরদাকে অভ্যর্থনা জানাতেই দাদু করযোড়ে মৃদু ভঙ্গীতে অগ্রসর হলেন—যেন সরমকুণ্ঠিতা নববধূ। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে নিয়ে ফরাশে সোনালী জরির কাজ করা জাজিমের ওপর বসালেন, পেছনে কিংখাপের প্রকাণ্ড তাকিয়া। দাদু জাজিম আর তাকিয়াটা ঠেলে সরিয়ে দিলেন, তারপর ভীতিবিহ্বল দৃষ্টিতে একবার উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম দেখে নিলেন।

একে একে শুরু হল সম্বর্ধনার ভাষণ—দাদার সহৃদয়তার কথা, তাঁর যশোলিপ্সাহীন দানের কথা, তাঁর উন্নত চরিত্রের কথা। আজীবন যত সৎকর্ম করে গিয়েছেন, একটার পর একটা যেই উল্লেখ হচ্ছে দাদা যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চান। সাহিত্য-পরিষদে তাঁর উন্মুক্ত হস্তে দান, প্রাচীন গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশ ও হস্তলিখিত পুঁথির মুদ্রণ-ব্যয় বহন ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও কত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী তাঁর কাছে কত সাহায্য পেয়েছেন, তাঁরই অর্থে কত রাশি রাশি পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে; তাঁর সাত্বিক গুপ্ত দানের কথা, কতজনকে কত কী সাহায্য করেছেন তবু লোক-জানাজানির ভয়ে কারও কাছে প্রকাশ করেন নি ইত্যাদি। যখন ক্রমে ক্রমে সেই সব উল্লেখ হতে লাগল, দেখলাম, দাদা ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছেন—যেন আর বসে থাকতে পারেন না।

এর পর সেই চরম মুহূর্ত সমাগত হবে—দাদা ভাষণ দিতে উঠবেন, আমি অনেক আশা নিয়ে বসে আছি।

হরি হরি, তিনি উঠলেন না, রামেন্দ্রসুন্দরকে কাছে ডেকে কানে কানে কী যেন বলে দিলেন। দাদা উঠে ঘোষণা করলেন—

যোগীন্দ্রনারায়ণ পরিষদের স্থায়ী ধনভাণ্ডারে সঙ্কল্পিত পঞ্চাশ হাজার টাকার এক চতুর্থাংশ দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। তা ছাড়াও গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে সাহিত্য-পরিষদে বার্ষিক আট শো টাকা দিতে চেয়েছেন।

সঘন করতালির সঙ্গে সভা ভঙ্গ হল।

ঠাকুরদা পালিয়ে আসতে পারলে যেন বাঁচেন। কিন্তু তা কি হয়? যাঁদের সঙ্গে দাদুর সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না, রামেন্দ্রসুন্দর তাঁদের একে একে চিনিয়ে দেন। আলাপ-পরিচয় চলতে থাকে, বেশ কিছুটা সময় চলে গেল। যিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে এতদিন ছিলেন আজ তাঁকে দেখে সবারই চোখে-মুখে আনন্দের মাত্রা যেন সীমাহীন। আপ্যায়ন আদান-প্রদান শেষ করে যখন তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে এসে গাড়িতে চাপলেন তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ কিছুটা রাত্রি হয়েছে।

ঠাকুরদার যদি কখনও কোন ঘড়ি কেনার প্রয়োজন হত, তিনি স্বয়ং কুক্ কেলভীর দোকানে যেতেন। এবার আমার পিতৃদেব ও পিতৃব্যের জন্যে দুটি পকেট-ওয়াচ কিনতে গেলেন। আমিও সঙ্গে আছি। নিজের পৌত্র হলেও তিনি যথারীতি রামেন্দ্রসুন্দরের অনুমতি নিয়ে তবে আমাকে সঙ্গে নিয়েছেন। ঘড়ি দেখতে দেখতে তাঁর নিজেরও একটা পছন্দ হয়ে গেল, আকারে কিঞ্চিৎ বড়

বলে সেটাকে আম-পাড়া ঘড়ি বলাই উচিত। আমার কথা ছেড়েই দিলাম, কারণ রামেন্দ্রসুন্দরের বিনা হুকুমে আমার জন্যে একটি পয়সার দ্রব্যও কেনা চলবে না—তা সে যত প্রয়োজনীয় বস্তুই হোক না কেন।

ঠাকুর্দা এক কোণে দাঁড়িয়ে ঘড়ি পছন্দ করছিলেন, সঙ্গে তাঁর দুই বাল্যবন্ধু—কালীভূষণ ডাক্তার ও দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য। আমি আর এক কোণে দাঁড়িয়ে একটি অদ্ভুত টাইমিং-ক্লক দেখলাম। প্রত্যেক পনের মিনিট অন্তর বাংলা নাচের গৎ-বাজানো সুবৃহৎ ঘড়িটি দু ভাগে বিভক্ত। উপরের অংশটি একটি ছোটখাটো থিয়েটারের স্টেজ। নীচের অংশে কারুকার্য করা রং-বেরংয়ের চিত্রিত ডায়াল। প্রত্যেক পনের মিনিট অন্তর সম্মুখের যবনিকা সরে যায়, আর দু পাশের উইংস থেকে তিনটি করে ছটি রঙীন শাড়ি-পরা বাঙালী মেয়ের মত পুতুল বেরিয়ে এসে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে আবার তেমনই করেই চলে যায়—সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা পতন। আমি সমস্ত মনোযোগ দিয়ে সেই অপরূপ নৃত্যভঙ্গী দেখে চলেছি। আমার মত বালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে ওখানকার বড় সাহেব ঘন ঘন কোয়ার্টারের কাঁটা সরিয়ে দেন আর অনবরত নাচ চলতে থাকে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই; কারণ ঘড়িটির দাম মবলক দশ হাজার টাকা। গায়ে টিকিট ঝুলছে, একটা বিক্রি হলেই বেশ মোটা লাভ, আর এমনই করেই ভারতীয় রাজন্যবর্গের মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁও মারার তালে এই সব বিদেশী বণিকরা ওত পেতে বসে থাকে। সুচতুর বড় সাহেব এটা ধরে নিয়েছিলেন, যদি আমি ওইটির জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করি, তা হলেই রাজাবাহাদুর আমাকে নিশ্চয়ই ওটা কিনে দেবেন।

দাদুও আমার এবম্বিধ তন্ময়তা দেখে, কাছে এসে আদর করে বললেন, এটি নেবে? তা হলে আমি রামবাবুকে জিজ্ঞেস করে তোমায় কিনে দিতে পারি।

আমার সরাসরি উত্তর শুনে তিনিও চমকে উঠলেন।

না, ওসব বাজে পয়সা খরচ করে লাভ নেই, ওরে ব্বাবাঃ, একটা ঘড়িতে এতগুলো টাকা! বরং গরিবদের দিলে ওরা খেয়ে বাঁচবে!

দাদুর মুখ দেখে তখন কিছু বোঝা না গেলেও, বাড়ি ফিরে এসেই তিনি আমার কথাটি হুবহু নানার কর্ণগত করে মন্তব্য করলেন, আপনি যে নাতিটিকে একেবারে মোহমুদ্গর করে ছেড়ে দিয়েছেন!

আরও কী বলতে গিয়ে দাদুর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। স্বভাবগম্ভীর হলেও, আমার মধ্যে স্বীয় আদর্শের প্রতিফলন দেখে তিনি এবার যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললেন।

এদিকে নানাও কথাটি শুনে, আনন্দের আতিশয্যে সেদিন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না; তখুনি বাজার থেকে গরম গরম জিলিপী আনিয়ে, আমাকে কোলে বসিয়ে খাওয়ালেন। সে কী আদর! এক একটি করে আমার মুখে তুলে ধরেন, আমিও চোখ বুজে ভক্ষণ করে যাই। নাতি-নাতনীদের নিয়ে নানার এই ধরনের ঘরোয়া স্নেহবিহ্বল রূপ, এমন সাংসারিক জীবনের ছবি আমি কখনও দেখি নি। তাই এবার আমাকে উপর্যুপরি দু দিন গরম জিলিপী খাওয়ানো—তাও আবার কোলে বসিয়ে—এ যে অবাক কাণ্ড।

যাই হোক, রামেন্দ্রসুন্দরের পরামর্শে ঠাকুরদা আমাকে একডজন লাল নীল পেন্সিল উপহার দিয়ে লালগোলায় চলে গেলেন।

কয়েক মাস পরে।

একদিন এলেন হারানচন্দ্র রক্ষিত শেক্সপীয়রের বঙ্গানুবাদ নিয়ে। এসেই করযোড়ে বিনয়বিগলিত কণ্ঠে বললেন, আমার একসেট বই লালগোলার রাজা-বাহাদুরকে পাঠিয়েছি। আর এবার লিখছি "ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য"—প্রায় শেষ করে এনেছি, যদি তিনি দয়া করে ছাপিয়ে দেন তা হলে দুঃস্থ সাহিত্যিকের বড় উপকার হয়। এ বিষয়ে আপনি যদি তাঁকে একটু লেখেন—

রামেন্দ্রসুন্দর মুখে সেই চিরন্তন হাসি নিয়ে বললেন, দেখুন, সাহিত্য-পরিষদের যখনই যা প্রয়োজন হয়, রাজা-বাহাদুর মুক্ত হস্তে দান করেন, আর সেজন্যে তাঁর কাছে বহুবার পত্র লিখে ভিক্ষে চাইতে হয়। একজন মানুষের কাছে বার বার লিখতে বড়ই সঙ্কোচ লাগে। আপনিই বরং একবার লালগোলায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, আপনার যা বক্তব্য বলে দেখুন।

রক্ষিত মশায় সযত্নে রক্ষিত ঠাকুরদার লেখা একটি পত্র তাঁর পকেট থেকে বের করে রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে দিয়ে বললেন, আমার প্রথম পত্রের উত্তর না পেয়ে আবার

লিখেছিলাম, এটা তারই উত্তর। তিনি লিখেছেন, রামবাবুর কাছে যাবেন, তাঁর অভিমত পেলে দ্বিমত হবে না।

তা হলে আপনি কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন। আচ্ছা, আমি একবার তাঁর সঙ্গে পত্র ব্যবহার করে দেখি, তারপর জানাব।

হারান রক্ষিত যেন তাঁর হারানো আশা ফিরে পেলেন, বিদায় নেবার সময় পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে কখন আসব ?

এই দিন সাতেক পরে—

আচ্ছা, আগামী রবিবারে আসব কি ?

বেশ, তাই আসবেন।

কার্যতঃ দেখা গেল, রবিবার পর্যন্ত রক্ষিত মশায়ের ধৈর্য রক্ষিত হয় নি। তিনি শুক্রবার প্রাতেই এসেই রামেন্দ্রসুন্দরের পাদপদ্মে সভক্তি প্রণামান্তে নিবেদনমিদং—

রাজাবাহাদুরের পত্র পেয়েছেন কি ?

হ্যাঁ পেয়েছি, তিনি সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন।

রাজাবাহাদুর প্রাতঃস্মরণীয় মহানুভব ব্যক্তি। মনে করেছি বইখানার রাজসংস্করণ করে তাঁকেই উৎসর্গ করব।

বাল্যকাল থেকেই আমার রহস্য করার দিকে একটু ঝোঁক ছিল। রাজা উপাধি সব চাইতে বড় আর রায়-সাহেব সব চাইতে ছোট খেতাব, এটা আমার আগেই শোনা ছিল। তাই বলে ফেললাম, পুস্তকের রায়সাহেব সংস্করণ হয় না ?

তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, হয় বইকি! এই আমাদেরই মত সাধারণ প্রচ্ছদপটে বাঁধাই করে নিলেই হল।

ভ্রূ-কুঞ্চিত রামেন্দ্রসুন্দর ধমকি দিয়ে উঠলেন : বেশী প্রগল্‌ভতা করে না।

রক্ষিত মশাই পুনরায় নানার চরণ বন্দনা করে বিদায় নেবার পরেই বললাম, তুমি তখন আমার ওপর অমন মুখ খিঁচিয়ে উঠলে যে বড় ? কী করেছি আমি ?

উনি রায়সাহেব খেতাব পেয়েছেন। হয়তো ভাবলেন যে তুমি তাঁকেই ইঙ্গিত করে উপহাস করছ। গুরুজনের প্রতি একটা মর্যাদাবোধ থাকা উচিত, নইলে শিক্ষা-দীক্ষার মূল্য কী ?

উত্তর দেবার জন্যে আমার ঠোঁট কেঁপে উঠতেই, তিনি বলে উঠলেন, জানি, উনি যে রায়সাহেব হয়েছেন, তুমি তা জান না।

আমিও জোর গলায় বলি, নিশ্চয়ই জানতাম না, নইলে, বয়োজ্যেষ্ঠই হোক আর কনিষ্ঠই হোক, কাউকে চিমটি কেটে কথা বলার অভ্যেস আমার নেই। তুমি যে মিছিমিছি আমায় তাড়া দিলে, তার ক্ষতিপূরণ দাও।

কী চাও ?

আমি Lamb's Tales from Shakespeare পড়ি, আমার বেশ ভাল লাগে। ওই বাংলা বইগুলো দাও না, অবসর সময়ে পড়ে ফেলব।

তৎক্ষণাৎ সেগুলি আমাকে দিয়ে তিনি যেন নিশ্চিন্ত হলেন। শেক্সপীয়রকে বগলদাবা করে যেই উঠছি এমন সময় প্রবেশ করলেন জে. এল. ব্যানার্জি—মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে চশমা, বেশ সুপুরুষ, দেখতে অনেকটা আমার পিসেমশাইয়ের মত। তিনি এলেই আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। প্রথম দু-একটা বাংলা কথায় আদান-প্রদান করেই তিনি ঝড়ের মত ইংরেজী বলতেন। নানা কিন্তু বাংলাতেই জবাব দিতেন।

আমার হাতে একগাদা বই দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওগুলো কী ? কার বই ?

শেক্সপীয়রের বাংলা অনুবাদ।

এবার জে. এল. ব্যানার্জি বাংলায় উপদেশ দিলেন, মূল নাটক না পড়লে খাঁটি রস পাবে না।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, এখনও সে বয়স হয় নি—বড় হলে পড়বে বইকি!

জে. এল. ব্যানার্জি নানার সামনে বসতেন মেরুদণ্ড সোজা করে—দু-হাঁটু মুড়ে ঠিক শিবাজীর মত—আর সেইজন্যেই তিনি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি চলে যেতেই নানার কাছে জানতে চাইলাম, তিনি বাঙালী, তুমিও বাঙালী—তবে উনি ইংরেজীতে কথা বলেন কেন ?

দাঁতের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো হাসি বেরিয়ে এল—এ হাসির জাত আলাদা—নিরাসক্ত উত্তর পেলাম : যার যা অভ্যেস।

"ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য" বেশ সুন্দর

বাঁধাই হয়ে বাজারে বেরুল। উৎসর্গপত্রে রায়সাহেব হারানচন্দ্র রক্ষিত লিখেছিলেন—কথা মনে নেই, ভাবটা মনে আছে: "ইষ্টদেবীর আরাধনার পর যাঁর মূর্তি আমি পূজা করি"—তারপরই কতকগুলি বিশেষণ দিয়ে—"সেই রাজারাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের শ্রীচরণে তাঁহারই জিনিস তাঁহাকে দিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিলাম।"

আমার ঠাকুরদা উৎসর্গপত্র দেখে বড়ই লজ্জিত হয়ে পড়লেন। কুণ্ঠিত হয়ে রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখেছিলেন, এত বাড়াবাড়ি কেউ যদি করে তা হলে আমার পক্ষে আর কিছু করা বড় মুশকিল হবে। স্বল্প ভাষায় তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর অন্তরের মর্মকথা।

আর একদিনের কথা বলি। একজনকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই নিয়ে এলেন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। পীতাভ বর্ণের আকৃতি। নাম শুনলাম ডাঃ কিমুরা। জাপানী পণ্ডিত, ভারতবর্ষে এসেছেন—ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি-সভ্যতা বিষয়ে জ্ঞানলাভের আশায়। তিনি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে এশিয়ার ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন, তাই প্রাচ্য জ্ঞান ও ধর্মদর্শনের লীলাভূমি ভারতে না এসে উপায় কি!

রামেন্দ্রসুন্দরের কাজ আরও বেড়ে গেল। সোজা কথা নয়—এক পণ্ডিত এসেছেন আর এক মহাপণ্ডিতের কাছে!

প্রাচীন আর্য রীতিনীতি, ধর্ম, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের সুনিপুণ অধ্যাপনায় ডাঃ কিমুরা যে কতখানি উপকৃত হয়েছিলেন তা বুঝতে পারা যায় রামেন্দ্রসুন্দরের তিরোধানে কিমুরা সাহেবের বাংলা ভাষায় লিখিত শ্রদ্ধাঞ্জলি থেকে। এ বিষয়ে তাঁকে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে যেতে হয় নি, রামেন্দ্রসুন্দরই তাঁর জীবনে অদ্বিতীয় হয়ে রইলেন।

এই অপরিসীম জ্ঞানের আস্বাদ স্বয়ং গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। সমগ্র জাপানী জাতির সম্মুখে সেই জ্ঞানের স্বর্ণদ্বার খুলে দিলেন। সেই হল তাঁর গুরুদক্ষিণা। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই উদ্যোগে রামেন্দ্রসুন্দরের কয়েকখানি গ্রন্থ জাপানী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, আর বাংলা ভাষার কোন গ্রন্থের জাপানী ভাষায় সেই সর্বপ্রথম অনুবাদ।

আরও একদিনের কথা।

"পৃথিবীর বয়স" লেখা নানা শেষ করেছেন এবং সেটা নিয়ে আলোচনা চলছে। কয়েকজন শ্রোতাও উপস্থিত আছেন। কথা-প্রসঙ্গে একজন প্রশ্ন করে বসলেন, রামেন্দ্রসুন্দরের বয়স কত?

নানার মুখে একটা অপার্থিব হাসি, গড়গড়ার নলে লম্বা টান দিয়ে বললেন, পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করতে গিয়ে নিজের বয়স হারিয়ে ফেলেছি।

রামেন্দ্রসুন্দর চলে গিয়েছেন। কথাটি বেঁচে আছে।

* * *

কী সুন্দর একটা মিষ্টি গান ভেসে আসে! পশ্চিমদেশীয় একটি ছোকরা হারমোনিয়ম বাজিয়ে চলে যায় আর একটি ষোল-সতেরো বছরের ঘাগরা-পরা মেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে চলেছে—কখনও বা দ্বৈত-সঙ্গীত। আমি রেলিংয়ে ঝুঁকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি। রাস্তায় কত লোকের ভীড় জমে গেল, তাদের চাল-চলন লক্ষ্য করে চলেছি—এমন সময় কে যেন পেছন থেকে আমার মুখ ধরে ঘুরিয়ে দিল, চমকে দেখি রামেন্দ্রসুন্দর!

প্রশ্ন করলেন, পড়াশুনো ছেড়ে কী হচ্ছে?

গান শুনছি, কী চমৎকার গলা!

এ সব বিষয়ে তোমার ব্যুৎপত্তি আবার কবে থেকে হল? ওদিকে মাস্টারমশাই ছাত্রকে বাড়িময় খুঁজে বেড়াচ্ছেন, আর তুমি কিনা এখানে দাঁড়িয়ে বেশ গান শুনছ? দিন দিন বুদ্ধিটা পেকে খয়ের হচ্ছে। তোমায় কী বলেছি, মনে নেই?

আমাকে নীরব দেখেই তিনি আবার বললেন, কী সব দেখছিলে বল?

দেখছিলাম ওদের আর ভাবছিলাম—কোন্ সুদূর পশ্চিম থেকে পেটের দায়ে এই বাংলায় এসেছে, কণ্ঠই তাদের সম্পত্তি, আর এই মূলধন নিয়েই পথেঘাটে কেমন নেচেগেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়।

রামেন্দ্রসুন্দর আমাকে পরতে পরতে বুঝে নিয়েছিলেন বলেই কথাটি তিনি বিশ্বাস করলেন। মাঝপথে আমার এই জীবন-ভাষ্য থামিয়ে বললেন, ওসব ভাবের কথা এখন থাক্, পড়তে যাও।

মাথা নীচু করে পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

[আগামীবারে সমাপ্য]

শুধু একটি তারা

দেবব্রত ভৌমিক

"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।"

শহরের সব আলো যখন একে একে নিভে যায়, এক এক করে আলো জ্বলে ওঠে এখানে। সারাদিন এমনই চুপচাপ নিস্তব্ধ। পথঘাট জনহীন, বাড়িগুলো ঘুমে নিঝুম। সাড়াশব্দ সারা পাড়ায় কোথায়ও বিশেষ থাকে না। শুধু মোড়ের পানওয়ালা বুড়টা সারা দুপুর একা-একা ঝিঁঝিপোকার মত সুর করে করে তুলসীদাসের দোঁহা পড়ে। আর দোকানের সামনে পথের ওপর শুয়ে একটা হ্যাংলা কুকুর পরম উপেক্ষায় সেই একঘেয়ে সুর শুনতে শুনতে ঝিমোয় আর ঠোঁট চাটে। মাঝে মাঝে কেবল কার যেন একটা পোষা ময়না সেই ক্লান্তিকর নিস্তব্ধতাকে খানখান করে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে; আর ঘুম-জড়ানো অলস কর্কশ গলায় গাল পাড়ে কেউ সেটাকে।

এমনই কাটে প্রায় সারা দুপুর। সারা শহরে যখন প্রাণের অফুরন্ত চঞ্চলতা, এখানে তখন ঘুমের অবাধ শান্তি। আর সবার যখন দিন, এখানে তখন রাত।

সারাদিন এমনই রাত হয়ে কেটে যাবার পর যখন বেলা পড়ে আসে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে, কলে জল আসে, কর্পোরেশনের লোকেরা পথে জল দিয়ে যায়, তখন ধীরে ধীরে ঘুম ভাঙতে থাকে সারা পাড়ার। যেন কার যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে আসতে থাকে মৃত পুরীতে। হাই তুলে উঠে বসে এ-পাড়ার বাসিন্দারা সকলে। ঘুম-রাঙা চোখ কচলাতে কচলাতে আলাপ করে এ ওর সঙ্গে। কেউ বা কোন বকেয়া ঝগড়ার সূত্র ধরে গলা ছাড়তে শুরু করে দেয়।

তারপর কলতলায় ভিড় জমে যায় সকলের। গা ধুয়ে সেজেগুজে রাতের জন্যে তৈরি হতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই।

তারপর সারা শহর ঢেকে দিয়ে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, পথঘাট পায়ের শব্দে মুখর হয়ে ওঠে এ-পাড়ায়। ধীরে ধীরে এদিক-ওদিক থেকে উঠতে থাকে ঘুঙুরের আওয়াজ—হারমোনিয়মের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভেসে আসতে শুরু করে গানের শব্দ।

আর এক এক করে আলো জ্বলে ওঠে ঘরে-ঘরে।

কিন্তু ও-ঘরে আলো জ্বলে না কখনও। কোনদিন জ্বলবে বলে সাত নম্বর বাড়ির সিঁড়ির নীচের ও-ঘরখানা তৈরি হয়ও নি। আসলে ঘুঁটে-কয়লা রাখার জন্যই ও-ঘর তৈরি। আর এতদিন তাই ছিলও বটে। বাড়িওয়ালীর ঘুঁটে-কয়লাগুলো আর ভাঙা আসবাবপত্র জড়ো করা ছিল ওখানে। ও-ঘরে যে কোনদিন কাউকে বসান যাবে, যেতে পারে, এ কথা তার সাফ মাথাতেও কখনও আসে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়েটাকে ওখানেই বসাতে হল। অবশ্য বসানো বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, ঠিক করে বলতে গেলে বলা উচিত—ঠাঁই দেওয়া। মেয়েটাকে ওখানে ঠাঁই-ই দেওয়া হয়েছিল।

রোগের লক্ষণ যখন শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আর চাপা থাকল না, সারা গায়ে বীভৎসভাবে ফুটে বেরল, তখন মেয়েটাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দিতে চেয়েছিল বাড়িওয়ালী। নাকের ডগা খসতে শুরু হয়েছে, ঠোঁটে কানে হাতের আঙুলে পচনের পূর্বাভাস সাদার ছোপ ধরেছে, শরীরের আবৃত অংশে গলিত ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তো অনেক আগেই—ও মেয়েকে এখন আর বাড়িতে পুষে লাভ কি! শুধু যে লাভ কিছু নেই, তাই নয়, বরং কিছু ক্ষতি আছে। ওর ঘরে যে কেউ পা দেবে না, এ তো জানাই। কিন্তু চোখের সামনে পরিণামের ওই গলিত ছবি ঘুরে-ফিরে বেড়াতে থাকলে বাড়ির অন্য কোন ঘরে গিয়েও যে বাবুরা বিশেষ স্বস্তি পাবে না, এটা বাড়িওয়ালী তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় খুব সহজেই বুঝে নিয়েছিল। আর তাই ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটাই সব দিক থেকে ভাল বলে মনে করেছিল সে।

কিন্তু তাড়িয়ে দেওয়া যায় নি ওকে। সবাই মিলে

স্রোতের শ্যাওলার মত শুধু ভেসে চলা। শুধু ভয়, শুধু শঙ্কা। চারদিকে শুধু বীভৎস মরণের ছবি।

জাপানী লড়ায়ে বিমানটা কখন যে মাথার ওপরে ভেসে এসেছিল, লক্ষ্য করে নি কেউই। বৃষ্টির ধারার মত অজস্র মেসিনগানের গুলিতে নিমেষে ছিন্নভিন্ন হল পদচারী পলাতক দলটা। বুলেটের আঘাতে বাবার মাথা গুঁড়োগুঁড়ো হল, ঝাঁঝরা হয়ে গেল মার পাঁজর।

মা-বাবার রক্তাক্ত দেহের ওপরে লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদল মেয়েটা। কিছুতেই বুঝতে পারল না যে কেন তার বাবা মাকে এমনই করে মারা হল। যুদ্ধ কাকে বলে, তা তো জানত না বোকা মেয়েটা। তাই সে কোন কারণ খুঁজেই পেল না এ হত্যার। বুঝতে পারল না যে এটা ন্যায়সঙ্গত, এর নাম বীরত্ব, এর নাম স্বদেশপ্রেম।

কিছুই জানত না নির্বোধ মেয়েটা। তের-চোদ্দ বছর বয়েস হলেও বয়সের তুলনায় সে ছিল একটু বেশী বোকা বোকা, একটু বেশী সরল ছেলেমানুষ। আন্তর্জাতিক আইন, রাজনীতি, রাষ্ট্রের অধিকার ইত্যাদি জ্ঞানের কথা কিছুই জানত না সে। তাই সে হঠাৎ এমনই করে মা-বাবাকে হারানোর কারণ বুঝতে পারল না কিছু। শুধু ফুলে ফুলে বোকার মত পথের ওপরে পড়ে কাঁদল।

কিন্তু সে কান্না শোনার মত কারও অবসর ছিল না তখন। বসে বসে কাঁদবার সুযোগও না। কাজেই নিজে থেকেই উঠতে হল আবার। চোখ মুছতে হল। এবং ইম্ফলের দুর্গম পাহাড়ে-পথে আবার দু পা ক্ষতবিক্ষত করতে হল। যদিও জানত না সে কোথায় যাবে, কোথায় গিয়ে কী হবে। কারও কোন ঠিকানাই তার জানা ছিল না।

শত্রুর হাতের মরণকে এড়িয়ে স্বদেশের সীমানায় মিত্র পক্ষের কাছে এসে গেল ওরা। সারাদিন পথ চলে সন্ধ্যায় পথের ধারে গাছের তলায় একদিন বিশ্রামের জন্যে বসল সবাই। বোধ হয় একটু ঘুমই এসেছিল। তাই, কখন যে গৌরবময়-পশ্চাদপসরণে-রত একদল মিত্র সৈন্য চারদিক ঘিরে ধরেছে, বুঝতে পারে নি কেউ। বোঝা যখন গেল, তখন দলের সব কটি মেয়ে (বয়েস নির্বিচারে) অন্তর্হিত হয়েছে, অবশ্য মিত্রদের সঙ্গেই।

যখন চেতনা ফিরল তখন শেষরাত। পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে চাঁদ অস্ত গেছে। কিন্তু তখনও তা আলোয় সারা আকাশ উজ্জ্বল নীলাভ একটা শিরিষে মত ঝকমক করছে কোথায়ও তারা নেই একটাও শুধু পশ্চিম দিগন্তে পৃথিবীর গা প্রায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনে স্নিগ্ধ সাদা একটি তারা স্থির হয়ে শুয়ে আছে।

ঠাণ্ডা হাও আস্তে আস্তে চোখ মেলল মেয়েটি হঠাৎ মনে পড়ল না কিছুই কী ঘটেছে। এ যেন অনে মৃত্যুর পর নতুন করে জন্মলাভ। বিগত জন্মের কথা স্মৃতি থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে। আস্তে নড়েচড়ে শুয়ে চাইল ও। কিন্তু নড়তে পারল না—শুধু তীব্র যন্ত্রণা সারা শরীর শিউরে উঠল। আর সেই দেহের যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির যন্ত্রণাও ফিরে এল মনে। নিজের সম্পূ বিবস্ত্র দেহ, সারা শরীরে অসংখ্য পাশবিক নখদন্তে আঘাতের ক্ষত, আর দুই পা ও উরুতে জমে-থাকা চা চাপ রক্তের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও হঠাৎ যেন সচেতন হল ও।

আর এক মুহূর্তে বোকা মেয়েটার সমস্ত সত্তার মূ চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। এতদিন ধরে চেতনা অবচেতনায় মানুষের জীবন আর মানুষের জগৎ সম্বন্ধে একটা সহজ সুন্দর আনন্দময় ধারণা গড়ে উঠেছিল তা এক নিমেষেই তছনছ হয়ে গেল। প্রচণ্ড আঘাতে এলোমেলো হয়ে গেল মন আর মস্তিষ্কের ক্রিয়া। মা আ বাবার আদরে আদরে এতদিন শুধু ওর দেহের বয়স বেড়েছিল। চোদ্দ বছর বয়েসে আঠার বছরের মেয়ে শরীরকেই শুধু পেয়েছিল ও। মনের বয়েস ন-দশ বছরে চেয়ে এক তিলও বাড়ে নি। কাজেই জীবনের অনে সত্য আর তথ্য সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান ছিল না ওর। তা একটা রূঢ় সত্যের বিকৃত বীভৎস রূপ হঠাৎ এমনই কর দেখতে পেয়ে সমস্ত সত্তা ওর শঙ্কায় ঘৃণায় বিহ্বল হ উঠল।

মানুষ এমনই, আর মানুষের জীবন এমনই! তবে কী করে বেঁচে থাকব আমি? স্পষ্ট করে ভাবতে না পারলে সমস্ত সত্তা জুড়ে এই আকুল প্রশ্ন ধ্বনিত হতে লাগল।

কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না কোথায়ও। বিহ্ব ভয়ে ব্যাকুল হয়ে প্রাণপণে চোখ বুজল ও।

চোখ বুজেও থাকা গেল না বেশীক্ষণ। শান্তি পাওয় গেল না তাতেও। তাই আবার চোখ খুলল। শুধু মে

বাঁচবার তীব্র ইচ্ছে হতে লাগল ওর। সব শেষ হয়ে যাবার ব্যাকুল আশঙ্কায় সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ও আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকল। ডাকল ওর মৃত মাকে: মা, মা, মাগো! আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও।

আর সেই ব্যাকুল প্রার্থনার মুহূর্তেই চোখে পড়ল ওর তারাটা। পশ্চিম দিগন্তে প্রায় পৃথিবীর মাটি ছুঁয়ে স্নিগ্ধ করুণ নক্ষত্রটি অচঞ্চল হয়ে রয়েছে। বোধ হয় যতক্ষণ ও অচেতন হয়ে ছিল, তখনও ওর ধর্ষিত দেহটির ওপরে অমনই করুণ কাতর আলো মেলে রেখেছিল সে। হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে পারে নি নিপীড়নে। কিন্তু স্নিগ্ধ সজল আলোর ধারায় ধুইয়ে দিতে চেয়েছে সব গ্লানি, সব ক্লেদ, যন্ত্রণা।

তারাটির উপর চোখ পড়তেই এমনই মনে হল মেয়েটির। মনে হল যেন ও তারা শুধু ওর জন্যেই উঠেছে, শুধু ওকেই আলো দিচ্ছে। ও যেন শুধু ওর, ওর নিজের। মার মুখে ও অনেকদিন শুনেছে, মানুষ মরে গেলে তারা হয়, তারা হয়ে থাকে আকাশে। পৃথিবীতে যারা আপন জন, যাদের সুখ দুঃখে তাদেরও সুখ দুঃখ, তারা হয়ে তাদের দিকেই অনিমিষে তাকিয়ে থাকে মৃতেরা। অনেক দূরে থাকে তারা; কিন্তু থাকে সব সময় চোখে-চোখেই। চোখে-চোখেই রাখে প্রিয়জনদের।

জ্যোতির্ময় তারাটির ওপরে স্থির দু চোখের দৃষ্টি রেখে সেই কথাই ভাবল ও এখন। মার মুখের কথার মত, মার ঠোঁটের হাসির মত স্নেহে-ক্ষমায়-ব্যথায় করুণ মধুর ওই তারা। মার মতই যেন সন্তানের সব পাপ, সব অপরাধের মার্জনা রয়েছে ওর আলোয়। মার মতই যেন স্নিগ্ধ সুন্দর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে ও পৃথিবীর দিকে—যে-পৃথিবী তার থেকে অনেক দূর আর অনেক পাপে মগ্ন।

মা, মা, মাগো! বার বার ফিস ফিস করে ডাকল মেয়েটি। আর অগাধ শান্তিতে নির্ভাবনায় ধীরে ধীরে চোখ বুজল।

এটুকু পর্যন্ত মনে আছে। এর পরের যে-জীবন, তার সব কথা মনে পড়ে না। সে-জীবনের সম্বন্ধে কোন আগ্রহ নেই ওর। আর তা ছাড়া, সে-জীবনের সব কথাই প্রায় একই ভাষায় লেখা, বৈচিত্র্য নেই কোথাও।

দয়া অনেকেই করেছিল। সেই চোদ্দ-পনের বছর বয়স থেকেই, দয়া করার লোকের অভাব হয় নি। নিষ্ঠুরভাবে একেবারে উপেক্ষাও অবশ্য করেছে অনেকে। কিন্তু তার চেয়েও একটা পরিণত-দেহ অসহায় এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে বোকা মেয়েকে অযাচিতভাবে দয়া করার লোকেরই বোধ হয় সংখ্যাধিক্য ছিল। এই সব পরম দয়ালু পরোপকারী মহৎ-প্রাণ লোকেরা অবশ্য দয়ার বিনিময়ে ওর কাছে সামান্য একটা প্রতিদানও আশা করেছিল সকলেই। সেটা খুব বেশী-কিছু ছিল না, শুধু কিঞ্চিৎ দৈহিক তৃপ্তিদান। তাতে ওর কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু ওদের লাভ আছে। আর তা ছাড়া, ওর লাভ-ক্ষতির প্রশ্নও বিশেষ ওঠে নি কখনও। অর্থ ব্যয় করে যারা দয়া করেছে, তার প্রতিদানে ওটুকু তারা ছলেবলেকৌশলে ন্যায়সঙ্গতভাবেই আদায় করে নিয়েছে। ওর রাজী-অরাজীতে কিছু এসে যায় নি।

এমনই ভাবে অনেক দয়ালু ব্যক্তির হাত ঘুরেই এই শহরে এসে হাজির হয়েছে মেয়েটা। শুধু যে এ দেশের মহদাশয় ব্যক্তিরাই ওর দেহের দুয়ারে অতিথি হয়েছে তাই নয়, ও-আতিথ্য স্বীকার করেছে দূর-দূরান্তের মানুষও। এ-পাড়ায় আসার আগে কিছুকাল ডক এলাকায় ছিল ও। বিশ্বের যত দেশ সভ্য হয়েছে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রীতিনীতি রপ্ত করেছে, সে-সব দেশের বহু জাহাজই এসেছে ওখানে। আর এক-আধ রাতের জন্যে সেই সব সুসভ্য দেশের প্রতিনিধিরা ওদের কাছ থেকে আনন্দ কিনেছে অতি অল্প মূল্যে। কুৎসিততম রোগগ্রস্তকেও ও ফেরায় নি কখনও। কেন না, ঘৃণা ভয় আশা ইত্যাদি সমস্ত মানবিক গুণেরই ওর অবসান ঘটেছিল ইম্ফলের পাহাড়ের সেই রাত্রে। ভবিষ্যৎ বলে কোন কিছুর অস্তিত্বই ছিল না ওর জীবনে। এখন শুধুই বর্তমান, শুধুই বেঁচে থাকা। আর বেঁচে থাকার ওই একটি পথের সন্ধানই শুধু ওর জানা।

কিছু ভাবনা-চিন্তা করার শক্তি ওর ছিল না, বিশেষ করে কিছু অনুভব করার ক্ষমতাও না। শুধু যা ঘটছে, যা ঘটবে, তাকে মেনে নেওয়া—এই-ই ওর জীবন। কিন্তু তবুও প্রতি রাত্রেই চাঁদ মাঝ-আকাশের সীমানা পেরনোর পর থেকেই ওর রক্তে রক্তে ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত অ

এই স্কুল কলেজের আনন্দময় দিনগুলি ওদের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। সবাই ওরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ইন্দুকে নিয়েই কথা—ইন্দুর জীবনে কিন্তু ইতি-হাসের একটা স্থান রয়ে গেছে। ওর স্বামী বাংলার বাইরে কোন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।

দূর প্রবাসে কত সন্ধ্যায় বসে গত জীবনের স্মৃতি ওর সামনে ভেসে যায়—অতীত যেন কথা কয়ে ওঠে। আর ওর মেয়ে উর্ম্মী যখন ইতিহাসে জাহাঙ্গীরের পাতা খুলে পড়ে, তখন হঠাৎ ও হেসে ফেলে।

সেদিনের সেই গিন্নী ইন্দুলেখার সংসারে আজ তার কত কল্পনা সার্থক হয়েছে। সেদিনের খেলা-ঘরের গৃহিনী ইন্দুলেখার সংসার আজ আনন্দময়—কারণ তার সদাজাগ্রত কল্যানদৃষ্টি সংসারে সর্বদিকে প্রসারিত। পরিছন্ন ভাঁড়ার ঘরে মশলাধার আর টিনে রঙীন অক্ষরে লেখা বিভিন্ন ডাল আর মশলার নাম। ধোঁয়া ধুলো নেই রান্নাঘরে—বিভিন্ন দেশের সুন্দর গঠনের বাসনপত্রের সংগ্রহ। রান্নাঘরের পরিবেশে মন খুশী হয়ে উঠে—এখানেই তার কাজ আর অবসর।

ইন্দুর সংসার ছোট—স্বামী আর একমাত্র কন্যা উর্ম্মী। উর্ম্মীর জীবন গান বাজনা, লেখাপড়ায় পূর্ণ। তার কোন কৌতুহল নেই রান্নাবান্না সম্বন্ধে। মা কিন্তু এ নিয়ে ক্ষুন্ন হ'ন। তাকে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু কন্যার এ বিষয়ে কোন আগ্রহই দেখা যায়নি।

তারপর আরো দিন কেটেছে। উর্ম্মী কলেজের পড়া সত্ত শেষ করেছে—পড়াশুনায় তার অনুরাগ, গান বাজনায় তার আগ্রহ অপরিসীম। আর মা দুঃখ পান যে সাংসারিক বিষয়ে সে রয়ে গেছে তেমনি উদাসীন।

এমন মেয়েকেও সংসারের ডাকে সাড়া দিতে হয়—সানাইতে পুরবীর সুর বাজে, বর আসে। বাংলার এক সমৃদ্ধ পরিবারের সুসন্তান।

যে সংসার তাকে বরণ করল সেখানে সে দেখল দেশী ও বিদেশী জীবনধারার ইঙ্গিত। আহারের বিষয়ে ও দেশীবিদেশী নানারকম রান্নায় তাদের পরিতৃপ্তি। এক আনন্দমুখর সুন্দর সংসার।

উর্ম্মী বুদ্ধিমতী মেয়ে। উপলব্ধি করল পরিজনদের সুখী করতে হলে যেমন গানবাজনা পড়শুনোর জীবনে এক বিশিষ্ট স্থান আছে তেমনি সংসারকে উপেক্ষা করা চলেনা, জীবনের সে দিকটা তার অপরিচিতই রয়ে গেছে।

বুদ্ধিমতী মেয়ের মনে পড়ল তার সুগৃহিনী মায়ের কথা। কৌশলে সে একমাসের জন্যে ফিরে এলো তার মায়ের কাছে। ঘোরাঘুরি করতে লাগল ভাঁড়ার ঘর আর রান্নাঘরের আঙিনায়। মা বুঝলেন এ অহেতুক নয়।

মা'র কাছে সে প্রকাশ করলনা সত্য কথাটি। তারপর সে দেখলো নতুন দৃষ্টি দিয়ে মা'র সাজানো সংসারটি। ভাঁড়ার ঘরে দেখলো, সুদৃশ্য ঢাকনা দেওয়া খেজুর গাছ মার্কা 'ডালডার' টিনে সাজানো রান্নার বিভিন্ন উপকরণ।

মার কাছে সে জানলো যে 'ডালডার' উপাদানে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' আর 'ডি' আর সবচেয়ে ওর মজা লাগলো যে মিষ্টি, লুচী থেকে সুরু করে ভাজা, তরকারী, মাছের ঝাল, ঝোল, মাংসের বিভিন্ন প্রণালী সবই 'ডালডায়' রান্না করা যায়—শুধু তাই নয়, খেতেও মুখরোচক হয়। এ হিসাবে দামেও সস্তা আর পুষ্টির দিক দিয়েও এর যথেষ্ট মূল্য আছে। 'ডালডা' সহজে, সর্বদেশে পাওয়া যায় শুধু ওই খেজুর গাছ মার্কা হলদে টিন দেখে নিতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

উর্ম্মী মা'র কাছে 'ডালডার' মাধ্যমে কত রান্না করল—ওর কাছে তা নিত্য নতুন আবিষ্কারের মত। তার রস বৈচিত্র্যে সে নিজেই মুগ্ধ হোল।

শ্বশুরালয়ে যখন সে ফিরে গেল তার বিদ্যাবুদ্ধি আর বিশেষভাবে রান্নার সুখ্যাতি সবাই করতে লাগলেন।

সঞ্চারিত হতে থাকে। আস্তে আস্তে সেই অনুভূতি শিরা-উপশিরার পথ বেয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। শঙ্খবিষের মত সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে চাপা উত্তেজনা। এমনই চলতে থাকে শেষ রাত পর্যন্ত। উত্তেজনা বাড়তে থাকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে।

তারপর রাত যখন শেষ হয়ে আসে, চাঁদ অস্ত যায়, ঘরের জানলা খুলে দিয়ে গরাদ ধরে দাঁড়ায় মেয়েটি। দরজার খিল আগেই বন্ধ করে দেয় সন্তর্পণে—কেউ যেন হঠাৎ ঢুকতে না পারে ঘরে। কেউ পাছে দেখতে পায় এই ভয়েই সারা রাতের জন্যে কোন মানুষকে ও ঘরে নেয় না কখনও। এমনই ও সব ব্যাপারেই বাধ্য; কিন্তু এই একটি ব্যাপারে ওকে কথা শোনাতে পারে নি কোন বাড়িওয়ালীই। এ ব্যাপারে ওর একটা অদ্ভুত একগুঁয়েমিই আছে বরাবর।

জানলা খুলে দিয়ে পশ্চিম দিগন্তে চোখ রেখে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকে মেয়েটি। দাঁড়িয়ে থাকে অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ—যতক্ষণ না রাতের আকাশ চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে যায়, ঊষার প্রথম আলোয় ভরে যায় দিগন্ত।

আর তারপর অদ্ভুত শান্তিতে পরিপূর্ণ মন নিয়ে আস্তে আস্তে জানলা বন্ধ করে দেয় ও। সরে আসে সন্তর্পণে জানলার কাছ থেকে—যেন কেউ দেখতে না পায়, জানতে না পারে।

এমনই চলেছে রাতের পর রাত—ইস্কুলের পাহাড়ের সেই একটি রাতের পর থেকেই।

ভাবতে ভাবতে ঘুম এসেছিল একটু। রোগজীর্ণ দুর্বল দেহে সহজেই ঘুম আসে।

কিন্তু রোজকার মত আজও ঠিক মাঝরাতে ভেঙে যায় ঘুম। কী করে যে রোজ ঠিক একই সময় ঘুম ভাঙে, এই এক আশ্চর্য। সময়ের হিসাব ও রাখে না কখনও, বাইরে থেকে কোন ঘড়ির শব্দও কানে এসে বাজে না। তবুও ঠিক একই সময় ঘুম ভেঙে যায় রোজ।

রক্তে রক্তে বোধ হয় ওর চিন্তার-চেতনার অগোচরেই একটা বিশেষ সময়ের সংকেত বয়ে চলে। আর সেই সংকেতের নির্দেশেই মাঝরাতের পর যখন চাঁদ পশ্চিমের আকাশে চলতে শুরু করে, একটা অদ্ভুত বর্ণনাতীত অনুভূতি আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা শরীরে।

ঘুম ভেঙে যায়।

জেগে জেগে অনুভব করতে থাকে ও, অনেক দিনের পরিচিত অথচ চিরদিনের নতুন সেই অনুভূতিটা ধীরে ধীরে শিরা-উপশিরা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। বিষের জ্বালার মত আস্তে আস্তে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে প্রতিটি কোষতন্তু, প্রতিটি রক্তকণিকা। সমস্ত চেতনা জুড়ে জেগে উঠছে শুধু একটি দৃশ্যের কামনা।

এমনই ভাবে কেটে যায় অনেকক্ষণ। তারপর মোহাচ্ছন্নের মত বিছানায় উঠে বসে মেয়েটি। আস্তে আস্তে একবার ঘরের চারদিকে তাকায়। সারা ঘর নিবিড় অন্ধকার—দেখা যায় না কিছুই। শুধু পশ্চিম-দেয়ালের ফোকরটা উন্মুক্ত; আর দরজার কপাটের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে সরু একটা আলোর সুতো ঘরে ঢুকছে।

দরজাটা ভেজানই আছে, ধাক্কা দিলেই খুলে যাবে—ও জানে। ও জানে, নিঃশব্দেই এ-ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় এখন। চলে যাওয়া যায় ছাদে বা ওদিকের বারান্দায়। আর সেখান থেকে পশ্চিম দিগন্তে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকা যায় যতক্ষণ খুশী—যতক্ষণ দরকার।

যাওয়া যায়—কিন্তু যাওয়া যায় না। মাসীর নিষেধ আছে এ-ঘর থেকে বেরতে।

কিন্তু মাসী তো তেতলায় তার ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন এখন। জানবে কী করে সে!

না, তার চোখ কিছুই এড়ায় না। প্রত্যেক বন্ধ দরজার আড়ালেই তার চোখ পাতা থাকে, তার কান পাতা থাকে। ঘরের মধ্যে কোথায় কী ঘটছে, কে তার নিষেধ অমান্য করছে, তাকে ফাঁকি দিয়ে কে কোন কাপ্তেনের কাছ থেকে বেশী আদায় করে নিচ্ছে—কিছুই মাসীর সাপের মত দু চোখ আর সতর্ক কুকুরের মত দু কান এড়ায় না। সব কিছুই জানতে পারে সে—উপরের ঘরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই।

এ বাড়িতে থেকে মাসীর নিষেধ অমান্য করা যায় না। যারা কখনও করতে চেয়েছে, পোষা গুণ্ডা নান্দুয়ার নির্মম চাবুক চিরদিনের মত সায়েস্তা করে দিয়েছে তাদের।

জানে ও সব। দেখেছে চোখের সামনে বহু বার।

এক উপায় হতে পারে আঙুরের শরণ নিলে। মাসীর স্নেহদৃষ্টি তার উপর সীমাহীন। আধো আধো গলায় আবদার ধরলে ফেলা যায় না কোনটাই। কিন্তু তার সাহায্য নিতে হলে তো বলতে হয় তাকে সব কথা। সে তো আরও অসম্ভব। না, বলা যায় না তাকে এ কথা। শুধু তাকে নয়—কাউকেই নয়। জীবনের গভীর গোপনে যে-রহস্য, যা থেকে তিল তিল করে সুধার মত প্রাণশক্তি ক্ষরিত হয়ে আসছে, দিনের আলোয় মেলে ধরলে তার কোন মানেই থাকে না—কোন যুক্তিতে, কার্য-কারণের সূত্রে তাকে বাঁধা যায় না। তার কথা কেউ কাউকে বলতে পারে না কখনও। হয়তো সব মানুষের জীবনেই এমনই।

না, বলা যায় না আঙুরকেও। তবে? তবে কি এমনই কাটবে সারারাত—আজ রাতও? এ ঘরে আসার পর থেকেই শুরু হয়েছে এই যন্ত্রণা। অনুভূতিটা আসে ঠিক সময়েই—মাঝরাত পেরিয়ে গেলে, চাঁদ পশ্চিমের আকাশে চলতে শুরু করলে। তীব্র বিষের মত ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে দেয় সত্তা। রাত শেষ হয়ে যায়—কিন্তু তৃষ্ণার শান্তি আসে না। শুধু দিনে দিনে তিলতিল করে জমে ওঠে যন্ত্রণা।

আজ রাতও কি কাটবে এমনই করেই? কথাটা মনে হতেই দুর্বল স্নায়ুগুলো টনটন করে উঠল। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল সারা শরীর। বারে বারে ঘরের চারদিকে অক্ষম দৃষ্টি বুলিয়ে আনতে লাগল ও। কিন্তু সারা ঘর শুধুই অন্ধকার। কেবল পশ্চিমের দেয়ালের ফোকরটা দিয়ে বাইরের আকাশের এক টুকরো আলো এসে যেন উপহাস করতে লাগল ওকে।

অনেকক্ষণ সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। দু চোখের দৃষ্টিতে ওর একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা জলজল করে জলতে লাগল। উত্তেজনায় হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে লাগল।

তারপর এক সময় আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। এ-ঘরে ঢোকার পর এই বোধ হয় প্রথম। দুর্বলতায় আর উত্তেজনায় প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। সামলে নিল দেয়াল ধরে। দেয়াল ধরেই আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল পা টিপেটিপে। হাঁটুর কাছে ভেঙে আসতে থাকে; প্রত্যেকবার পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে থাকে বুঝি পড়ে যাবে মেঝের ওপরে হুড়মুড় করে। কিন্তু পড়ে না। এক একটা পা ফেলে; আর সমস্ত শরীরের স্নায়ু শক্ত করে সামলে নেয় তার প্রতিক্রিয়া। তারপর আস্তে আস্তে পা তোলে আবার।

এমনই করেই পায়ে পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে ও। ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণ, এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল, এইটুকু যেতেই কতক্ষণ যে কেটে যায়, ঠিক থাকে না।

পশ্চিম দেয়ালের ফোকরটার নীচে গিয়ে যখন পৌঁছয়, তখন সারা শরীর ওর উত্তেজনায় আর পরিশ্রমে কাঁপছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না আর ও। বসে পড়ে মেঝের ওপরে। খানিকক্ষণ বসে বসে জিরিয়ে নেয়।

তারপর যখন আবার উঠে দাঁড়ায়, সব আশা যেন ওর বালির প্রাসাদের মত ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ে চোখের সামনে। ফোকরটা অনেক উঁচু। হাত বাড়িয়েও ভাল করে নাগাল পাওয়া যায় না—সেখান থেকে পশ্চিম আকাশে দৃষ্টি মেলে দেওয়া তো দূরের কথা।

তবে কি এমনই দাঁড়িয়ে থাকবে ও নীচের অন্ধকারের মধ্যে দু চোখে বিশ্বের অন্ধকার নিয়ে! আর মাথার উপর দিয়ে রাতের আকাশ ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাবে, তারারা জলে জলে ক্ষয়ে যাবে! একটু উপরেই অত আলো—আর একটু নীচেই এত অন্ধকার! কিন্তু এই একটুখানি উঠতে কি ও পারবে না কোনমতেই!

রোষে, ক্ষোভে, অসহ যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মেয়েটা।

সময় এগিয়ে চলে ধীরে ধীরে।

হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে যায়। অন্ধকার ভেদ করে আলো দেখা যায় যেন চোখে। দেয়াল ধরে ধরে আবার ঘরের একটা কোণ লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় ও।

মাসীর ভাঙা আসবাবপত্রে এ-ঘর বোঝাই করা ছিল বরাবর। তার কিছু সরিয়েই ওর ঠাঁই হয়েছে এখানে। কিন্তু এখানে বহু-কিছু জড়ো করা আছে ঘরের একটা কোণ জুড়ে। অন্ধকারের মধ্যে দেয়াল ধরে ধরে সেই দিকেই এগিয়ে যায় ও। কিছু একটা টেনে আনতে পারলে হয়তো তার উপর দাঁড়িয়ে নাগাল পাওয়া যাবে ফোকরটার।

অন্ধকারের মধ্যে হাতে ঠেকল কী একটা উঁচুমত। আস্তে হাতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে ও।. বুঝতে পারে একটা পায়া-ভাঙা পুরনো টেবিল। কবে কার সম্পত্তি ছিল, কে জানে। মাসীর এ গুদাম-ঘরে এক কোণে জমা হয়ে আছে বহুদিন। এটাতেই কাজ চলতে পারে বোধ হয়।

টেবিলটার সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে ও। হিসেব করে দেখতে চায় ওর ভারবহনের ক্ষমতা। একটা পায়া একেবারেই ভাঙা, বাকি তিনটেও নড়বড়ে। তবুও হয়তো দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা যেতে পারে ওটা। আর হয়তো একটা শীর্ণ রোগদুর্বল দেহের ভারও সইতে পারে কিছুক্ষণ।

কথাটা ভাবতেই ভাল লাগে। এতক্ষণ পরে একটু যেন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে ও।

কিন্তু টেবিলটা ধরে নাড়তে গিয়েই বুঝতে পারে যে কাজটা যত সহজ ও মনে করেছিল, আসলে তা নয়। পুরনো আমলের শক্ত মজবুত কাঠে তৈরি জিনিস, ওজন নিতান্ত কম নয়। ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে ওটাকে বয়ে নিয়ে যেতে যতটুকু শক্তি দরকার, এতদিন রোগের শোষণের পর সে শক্তি ওর শরীরে আর অবশিষ্ট নেই।

তবে কি ওটাকে ও নিয়ে যাবে না! মাথার উপর দিয়ে রাতের রুপোলী আকাশ বয়ে যাবে, ঘুরে-ঘুরে শেষ হবে দিনের রুক্ষ রোদে! জানতে পারবে না ও কিছুই! দূর আকাশের তারায় স্নেহের-ক্ষমার-সুন্দরের আলো জলে জলে ক্ষয় হবে, দেখতে পারবে না ও তা! ও শুধু এখানে এই নোংরা ঘরে অন্ধকারের মধ্যে সারা গায়ে এই কুৎসিত গলিত দুষ্ট ক্ষত নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে!

না না, আমি থাকব না কিছুতেই। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলে ও।

আর কথাটা দ্বিতীয় বার যেই মনে মনে উচ্চারিত হয়, টেবিলের কিনারে দৃঢ় হয় ওর দু হাতের আঙুলের চাপ। খসে-যাওয়া আঙুলের ডগা দিয়ে সারা শরীরে বিদ্যুতের শক সঞ্চারিত হতে থাকে। তীব্র যন্ত্রণায় ঝনঝন করে ওঠে সমস্ত দেহ। স্নায়ুকেন্দ্র ফেটে পড়তে চায় অসহ্য ব্যথায়।

কিন্তু হাতের মুঠো শিথিল হয় না একটুও। প্রাণপণে দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত শরীরের শক্তি দু হাতের মুঠোয় জড়ো করে টেবিলটা ধরে টানে ও। আর অচল জবড় বহু কালের পুরনো ভারী টেবিল নড়ে ওঠে আস্তে আস্তে। একটু এগিয়ে যায় উন্মুক্ত ফোকরটার দিকে। মানুষের বহুকালের পুরনো অন্ধকার ভারী অতীত এগিয়ে যায় ভবিষ্যতের আলোকিত জানলার দিকে।

আর একটু, আর একটু, আর একটু।

জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে একটু একটু করে মেয়েটা টেনে নিয়ে যায় টেবিলটাকে। পরম অভিষ্টকে পাবার জন্যে যুগ যুগ ধরে মানুষের যে একাগ্র সাধনা এ যেন ওর সেই সাধনা! এ যেন দুর্গম পথে তীর্থযাত্রীর এগিয়ে চলার তপস্যা!

এমনই করেই চলে মিনিটের পর মিনিট।

তারপর শেষ পর্যন্ত সফল হয় ও। উন্মুক্ত ফোকরটার নীচে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায় টেবিলটাকে। সাফল্যের আনন্দে মন ভরে যায়, অপরিসীম ক্লান্তিকেও তুচ্ছ মনে হয়। সাবধানে সেই ভাঙা টেবিলটাকে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে আস্তে আস্তে তার উপরে উঠে দাঁড়ায় ও।

আর তারপর ফোকরটা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিতেই এতক্ষণের এতদিনের স্বপ্নের আকাশ ঝলমল করে ওঠে চোখের সামনে। সেই পশ্চিম দিগন্ত, সেই পৃথিবীর বুক ছুঁয়ে-ছুঁয়ে জলতে থাকা অনেক দূরের তারা।

হঠাৎ যেন আনন্দে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গলিত ক্ষতভরা দু হাত দিয়ে বুক চেপে ধরে ও। আর নিমেষ-হীন চোখে তাকিয়ে থাকে দূর আকাশের দিকে।

দিগ্বলয়ের ঠিক উপরেই চিরদিনের মত স্নিগ্ধ শুভ্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে নক্ষত্রটা। মার চোখের আলোর মত করুণ, মার ঠোঁটের হাসির মত মধুর। মার মতই যেন অগাধ ক্ষমায়-স্নেহে-ব্যথায় কাতর চোখ মেলে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে—যে-পৃথিবী ওর থেকে অনেক দূর আর অনেক পাপে মগ্ন।

মা, মা, মাগো! স্থির চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ডাকে মেয়েটা।

আর ওর মনে হতে থাকে, যেন সেই অনেক দূরের

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

তারার আলো ধীরে ধীরে ঘিরে ধরে ওকে। এই ঘর, এই সময়, এই দেহ, সব কিছু থেকে যেন ওকে মুক্ত করে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় অনেক দূরে। আর অনেক পরের কোন সময়ে। ওই তারার আলোয় স্নান করে ও যেন অনেক দূর-ভবিষ্যতের একটা মূর্তি হয়ে ওঠে, যে-মূর্তি মায়ের মুখের মত অগাধ স্নেহে-ক্ষমায়-করুণায় অপরূপ।

মানুষের ভবিষ্যতের স্বপ্নের অপরূপ ছবি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত মেয়েটা। অনেক পাপের স্বাক্ষর সারা দেহের গলিত ক্ষতের যন্ত্রণাকেও ভুলে যায়। সময়ের কোন জ্ঞান থাকে না ওর।

কতক্ষণ এমনই ছিল ঠিক নেই। হঠাৎ একটা কালো মেঘ এসে তারাটাকে ঢেকে দিতে চমকে ওঠে ও। হঠাৎ যেন অনেক দূর আর অনেক উঁচু থেকে এই ঘরে এই সময়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয় কেউ ওকে। হঠাৎ যেন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়।

তারাটা কি হারিয়ে গেল একেবারে! ও কি উঠবে না আর কোনদিন; কোনদিন কি দেখা যাবে না আর ওকে!

না, তা হতে পারে না, কিছুতেই হতে পারে না। মনে মনে ভাবল মেয়েটি, মেঘে ঢাকা থাকতে পারে না কখনও ও-তারা। ও-তারা উঠবেই, আবার উঠবে নিশ্চয়ই।

ভাবল। কিন্তু আতঙ্কে কেঁপে উঠল ওর সারা শরীর। অধীর আগ্রহে আর উত্তেজনায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল ও। ফোকরটা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখতে চাইল ভাল করে।

এই নড়াচড়ায় পায়ের নীচে ভারসাম্য কখন যে নষ্ট হয়ে গেছে জানতে পারে নি ও। যখন পারল, তখন আর সামলানোর সময় নেই। হুড়মুড় করে ওকে নিয়েই নড়বড়ে পায়াভাঙা টেবিলটা ভেঙে পড়ল মেঝের ওপর।

* * *

সকালবেলা ওরা যখন ওকে পেল, তখন ওর প্রাণ-হীন দেহ মেঝের ওপরে ভাঙা টেবিলের পাশে পড়ে আছে।

টেবিলটা এখানে এল কোত্থেকে, আর ওই বা ওখানে গেল কেন কিছুই বুঝতে পারল না ওরা।

তারপর যখন সবাই মিলে ধরাধরি করে অন্ধকার ঘর থেকে ওর দেহ বাইরে আলোয় নিয়ে এল, তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়েও অবাক হল ওরা। সমস্ত মুখটা ওর কুৎসিত। নাকের ডগা খসে গেছে, ঠোঁটে কানে দগদগে ঘা, মাথায় চুল নেই একেবারে। কিন্তু আশ্চর্য, সেই কুৎসিত মুখে দুটি চোখ! ও-মুখে যেন বড় বেশী বেমানান, বড় বেশী সুন্দর। বড় বড় চোখ দুটো ওর খোলাই ছিল। আর সেই দু চোখে যেন এ-জগতের বাইরে থেকে কোন স্নিগ্ধ-মধুর আলো এসে পড়েছিল, যেন অনেক দূর কোন পৃথিবীর স্বপ্ন জেগে ছিল।

মেয়েরা সবাই অবাক হয়ে ভাবল, ওর মুখটা যে এত কুৎসিত আর দু চোখ অত সুন্দর, এ তো ওরা দেখে নি কখনও। মুখটা অত কুৎসিত হয়ে গেলেও, চোখ দুটো অত সুন্দর রইল কেমন করে!

সবাই অবাক হয়ে এই কথাই ভাবতে লাগল ওরা।

২১

আজ আমি আমার খোঁড়া পা নিয়েই এগিয়ে চলেছি। আজ মনেই হচ্ছে না যে আমার খোঁড়া পা। যে মেয়েটা সব সময় সকলের আগে এগিয়ে চলতে পারে, সেই আজ পিছিয়ে পড়ছে। বারে বারে পথের ধারে বসে দম নিচ্ছে। পাহাড়ে ঝরনা দেখলেই জল ধরে খাচ্ছে আঁজলা ভরে। আগে কোনদিন তাকে জল খেতে দেখি নি।

আমি আজ তার পিছিয়ে পড়া দেখে ছেরিং পেনছোর সঙ্গে এগিয়ে চলেছি। সে যখন বসেছে আমরাও বসেছি খানিকটা তফাতে। প্রথমটায় ছেরিং পেনছো আমার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছিল। আমিও না বুঝে তার জবাব দিয়েছিলুম। সে বুঝতে পেরেছে কিনা জানি না, তবে আর উত্তর দেয় নি সে কথার। এখন দরকার হলে আমরা ইশারায় কথা বলি।

চলতে চলতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলুম। ভাবছিলুম, নিমার আজ এ কী হল? অসুস্থ স্বামী অচৈতন্য পড়ে আছে একটা মঠের ভেতর। সেই ভাবনায় মেয়েটা সারারাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। কিন্তু যখন চলবার সময় এল, তখন পায়ে আর শক্তি পাচ্ছে না। এটুকু পথ বুঝি একদিনে শেষ করা যাবে না!

দেখতে পাচ্ছিলুম ছেরিং পেনছো মাঝে মাঝেই তাকে তাড়া দিচ্ছে। নিজে পিছিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। তবুও পিছিয়ে পড়ছে নিমা। পায়ে কি তার ফোসকা পড়েছে, না, কাল বিয়ের ভোজ খেয়ে পেটে ব্যথা ধরেছে আজ।

শেষ পর্যন্ত পথেই তাঁবু ফেলতে হল। শেষ রাতে যাত্রা শুরু করেছি। খিদের ও ক্লান্তিতে দেহ আর কারও চলছে না। তাঁবু ফেলা দেখে নিমার উৎসাহ হঠাৎ বাড়ল। শেষ পথটুকু অতিক্রম করে এল সুস্থ মানুষের মত। আমার পাশ দিয়ে গিয়ে নিজের তাঁবুর ভিতর যখন ঢুকল, আমি তার চোখে-মুখে প্রচুর আশ্বাসের ইঙ্গিত দেখলুম।

একটা পাথরের উপর বসে আমি আমার কল্পনাকে ছেড়ে দিলুম হাওয়ার পাখায়। আজ আমার কথা বলার সঙ্গী নেই। আজ শুধু ভাববার অবকাশ। আমার চারিদিকে মানুষ ঘুরে বেড়াবে, কথা বলবে, খাবে, ঘুমবে। আমি যেন মানুষ নই, অন্য কোন জগতের জীবের মত আমি তাদের দেখব, তাদের কথা ভাবব, আর আশ্চর্য হব।

তাঁবুর ভিতর হাপরের ফোঁসফোঁসানি শুনতে পেলুম। আর খানিকক্ষণ পরে হয়তো নিমার হাতের ভেজা পাব। অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে আরও দু-একদিন এই ভেজা আসবে।

নিমার আজ অন্য রূপ আমি দেখলুম। যে মেয়ে স্বামীর ভাবনায় ঘুমতে পারল না সারারাত, সে মেয়ে আজ ইচ্ছে করে পিছিয়ে রইল। একে ইচ্ছে করেই বলব। আমি না বললেও সবাই বলবে। চাকরেরা এ সব বুঝেই আজ অনুমতি না নিয়ে তাঁবু ফেলেছে।

কিন্তু নিমা এমন কেন করল! ইচ্ছে হল, সোজাসুজি তাকে জিজ্ঞেস করে এই প্রশ্নের উত্তর নিই। এদের ভাষা জানলে আজ সকলের আগে আমি তাই করতুম।

আমার সঙ্গে একটা দিন বেশী কাটাতে চায়? তা কেন হবে! আজ শেষ রাতে যখন সে যাত্রা করছিল, তখন তো সে আমাকে ফেলে আসছে বলেই জানত। আর আমাকে ফেলে আসতেই বা তার দুঃখ হবে কেন! একটা অজ্ঞাত বিদেশী মানুষ। সেবা করেছে কর্তব্য বলে। কিন্তু সেই সেবায় আন্তরিকতা ছিল। নিশ্চয়ই তার বেশী কিছু নয়।

আর একটা কথা মনে এল। নিমা কি তার বাইরের পরিবর্তনের কথা ভাবছে! তার স্বামী এই পরিবর্তনকে কী চোখে দেখবে, এই কি তার ভয়! সংস্কারের আবর্জনায় অন্ধকার যে দেশ, সে দেশের লোক কি এই আলোর আস্বাদটুকু সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবে না?

মনে হল, আমার প্রশ্নের উত্তর বুঝি আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছি। নিমার স্বামী নিশ্চয়ই এই পরিবর্তনের কারণ অনুসন্ধান করবে। দীর্ঘ উনত্রিশ বছরের সংস্কারকে উপেক্ষা করার মত শক্তি এ মেয়েটা কোথায় পেল! গভীর ধর্মবিশ্বাসে জড়িয়ে আছে এদের সমাজ-জীবন। ধর্মের চেয়ে বড় বলে কী পেয়েছে নিমা?

গত কয়েকদিনের ঘটনা আমি ভাবতে বসলুম। তার বিশ্বাসের ভিত্তিকে টলাতে পারে এমন তো কিছুই ঘটে নি। সেই ছোকরা লামার হঠকারিতা! সে তো এ দেশে হামেশাই ঘটছে।

তবে কি—

একটা অদ্ভুত ভাবনায় আমার হাত-পা হঠাৎ অসাড় হয়ে এল। তবে কি আমিই নিমার এই পরিবর্তন আনলুম? তার এই পরিবর্তনের জন্য নিমা কি আমাকে সন্দেহ করছে? তার স্বামীও কি তারই মত সন্দেহ করবে আমাকে? কিন্তু আমি তো কাউকেই কিছু বলি নি। এ নিমারই দোষ। তারই তো সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যা ভাবতে তার ভয় করে কোন্ সাহসে সে তা করতে গেল?

নিমা কখন এসে স্তেজার বাটি সামনে ধরেছিল টের পাই নি। তেমনই পরিষ্কার ঝকঝকে বাটি। মুখে এক রকমের অদ্ভুত শব্দ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চায়ের বাটিটা হাতে নিতেই সে আবার তাঁবুর ভিতর ফিরে গেল।

কাল কী হবে তার ভাবনা এল মনে। আমার উপস্থিতি যে একটা নোংরা পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সমাজের রীতি-নীতি আমার জানা আছে। অভিযোগ আমরা আদালতে জানাই, দীর্ঘদিন ধরে তার বিচার হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে সুবিচারও হয়। এদের আদালত এদের কোমরে গোঁজা কিংবা পিঠে বাঁধা। অভিযোগের কারণ ঘটেছে মনে করলেই কোমরের ছুরি কিংবা পিঠের বন্দুক নামিয়ে একতরফা বিচার শেষ করে দেয়। ভাবনার কথাই বটে।

মনে হল, এ পথে এসে ভুলই করেছি। শুধু যে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছি তা নয়, আর একটা নির্দোষ মেয়েকেও জড়িয়েছি সঙ্গে সঙ্গে। আমাকেই উপলক্ষ করে হয়তো একটা পারিবারিক দুর্যোগ তাদের ঘনিয়ে উঠছে। আমি সঙ্গে না থাকলে দুর্যোগটা হয়তো নিমা এড়াতে পারত।

ভাবলুম, রাতারাতি ফিরে যাই—যে পথে এসেছি সেই পথেই। গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে উমেদ সিং না থাক্, অন্য ভারতীয় আছে। সে হয়তো উমেদ সিংয়ের মতই আগ্রহ করে আমাকে সঙ্গে নেবে। এমনই একটা সংকল্প নিয়ে রাতে ঘুমতে গেলুম।

কিন্তু ফেরা হল না। ভোরবেলায় নিমার হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙল। যাত্রার আয়োজন করে সবাইকে সে তখন ঠেলে তুলছে।

লাঠিগাছটা সংগ্রহ করে আবার এসে পথে দাঁড়ালুম। আবার সন্দেহ জাগল মনে। কাল যে মেয়েটা কিছুতেই পথে চলতে চাইছিল না, আজ সে-ই সবাইকে ঠেলে

তুলেছে। অকারণে ঘুমিয়ে থেকে যাত্রার সময় তো পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করে নি!

পা দুটো যখন চলে, মন তখন ঘুমোয় না। বন্ধুর পথ দুর্গম হলে দৃষ্টির সঙ্গে সংহত হয়ে মন মশগুল হয়ে থাকে আত্মরক্ষার চিন্তায়। কিন্তু পথ যখন সমতল, হোঁচট খাবার ভয় নেই বলে মন যখন নিশ্চিন্ত, তখন সেই মনেরই অন্য রকম ভাবনা। কল্পনার পাখায় ভর করে স্বপ্নের দেশে উড়ে যায়। পথ চলতে চলতে আমি নিমার কথাই ভাবতে লাগলুম। মনে হল, তার আজকের আচরণেরও একটা যুক্তি খুঁজে পেয়েছি। দিনের আলোয় সে তার স্বামীর সামনে পৌঁছতে চায়—দিনের আলোয় বুঝি মৃত্যুর বিভীষিকা নেই!

আজ যে প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছি, সেও রুক্ষ, বৃক্ষলতাহীন—অধৈর্য প্রান্তর। জলধারার পাশে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যে তৃণগুল্ম দেখছি, তারও কোন শ্যামলিমা নেই। এক জায়গায় গোটাকয়েক ধূসর খরগোশ দেখলুম। ব্রাহ্মিশাকের মত পাতার কাঁটাঝোপ। তারই আড়ালে কাঁটা বাঁচিয়ে পাতা খাচ্ছে। পথের উপর মানুষের পায়ের শব্দ পেয়ে অতর্কিতে তারা অন্তর্হিত হল।

পরিচ্ছন্ন রৌদ্রকিরণে উত্তাপ লাগছে বাতাসে। নিঃশ্বাসেও টান ধরছে অল্প অল্প। মনে পড়ল নিঃশ্বাসে এমনই টান ধরছিল আস্তাধুরার গিরিবর্ত্ম অতিক্রমের সময়। সে আজ অনেকদিন আগের কথা। কৈলাস পরিক্রমার সময়েও নাকি নিঃশ্বাসের এমনই কষ্ট হয়।

বেলা দুপুরের আগেই আমরা গ্যাংটক গোম্ফায় পৌঁছে গেলুম। কৈলাসের পাদমূলেই এই মঠ। এখান থেকেই কৈলাস পরিক্রমার শুরু এবং এইখানেই শেষ। মঠের চারদিকে অনেক তাঁবু পড়েছে। বণিক ও তীর্থযাত্রী দু দলেরই সেখানে সমান ভিড়।

মঠের ভিতর যাত্রীদের থাকবার ঘরেই আশ্রয় পেয়েছিল নিমার বড় স্বামী। আড়ালে থেকে তাকে দেখলুম। অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে। সামনে যাবার সাহস হল না। সে আমার জন্য নয়, নিমার কল্যাণেই। মনে হল, তাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধের ভিতর আমি তো বাহুল্য। শুধু তাই নয়, আমি তাদের শান্তিভঙ্গ করেছি। তাই আমি মঠের ভিতর ঘুরে ঘুরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে লাগলুম।

এর আগে আমি কখনও মঠ দেখি নি। এটি ছোট কি বড়, তা জানি নে। তবে শতাধিক লামা এখানে বাস করেন বলে মনে হল। তাঁদের জন্য গুহার মত সারি সারি ঘর আছে। নির্জন অন্ধকার ঘরগুলো নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর কঠোর সাধনার জন্য মনোরম। এঁদের প্রার্থনার ঘর দেখলুম। সেখানে অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধের মূর্তি। দেখলুম এঁদের পুথির ঘর। সেখানে অসংখ্য পুথি তাকে তাকে সাজানো আছে। রঙ-ওঠা লাল কাপড় দিয়ে সে সব ঢাকা। দেওয়ালে বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছবি দেখলুম অগণিত, পাথর ও ধাতুর নানা মূর্তিও সাজানো দেখলুম।

নিমা তার স্বামীর কাছে গিয়েছিল। কেন জানি না আমার বাংলা দেশের নববধূর কথা মনে পড়ল। বিয়ের পরে নতুন বউ এসেছে শ্বশুর-ঘর করতে, সেখানে তার খাণ্ডারণী শাশুড়ী আর ননদ আছে। তারা তার প্রত্যেকটি ত্রুটির জন্যে কৈফিয়ত চাইবে নিষ্ঠুর ভাবে। নিমার বিচারের রায় শোনবার জন্য আমি আড়ালে কান পেতে রইলুম।

কিন্তু কান পেতেই বা করব কী! এ দেশে কানের প্রয়োজন তো আমার ফুরিয়ে গেছে। যা দরকার, সে শুধু চোখ দুটোর—যে দুটো মেলে থাকলে কানের অভাব খানিকটা মেটানো যায়।

নিমার কী শাস্তি হল শুনতে পেলুম না। সামনে দাঁড়িয়ে দেখবার সাহস যখন ছিল না, তখন আর আপসোস করে লাভ কি! মনে মনে স্থির করলুম, সামনে গিয়ে বিপত্তি আর বাড়াব না।

দিনের আলো শেষ হবার আগেই দুদিক থেকে যাত্রীরা আসবে। কেউ আসবে দক্ষিণ থেকে পরিক্রমা শুরু করতে আর কেউ আসবে উত্তর থেকে পরিক্রমা শেষ করে। সে সময় একটু তৎপর হয়ে কি কোন ভারতীয় দলকে খুঁজে বার করতে পারব না! হঠাৎ এক রকমের আনন্দে বুকখানা দুলে উঠল। একটা নির্দোষ মেয়ে আমার জন্য অকারণে নিগৃহীত হবে না, এ কি কম আনন্দের কথা!

নিমার হাত থেকেই দুপুরের আহার্য পেলুম। আহারে আমার মন ছিল না। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে মনের খবর আহরণের চেষ্টা করলুম। প্রথম বর্ষার ঘন মেঘ থেকে অবিশ্রান্ত বর্ষণের পর থমথমে আকাশের মত গম্ভীর মুখ। ভাবনায় কিংবা বেদনায় আজ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে।

ছেরিং পেনছো এল এক খণ্ড শুকনো মাংস স্বচ্ছন্দে চিবোতে চিবোতে, হাতে এক বাটি মদ। ভারি খুশী দেখাল তাকে। গদগদভাবে নিমাকে যা বলে গেল, শুনে মনে হল তাকে ভরসা দিচ্ছে। মানে, তার মত একজন অনুগত স্বামী থাকতে নিমার ভয় করবার কী আছে। দরকার হলে বড় ভাইকেও শিক্ষা দিয়ে দেবে জন্মের মত।

নিমার মুখে কিন্তু পরিবর্তন দেখলুম না। একুশ বছরের একটা অকেজো অপদার্থ ছেলের কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারে—ব্যাপারটা এমন সহজ নয়। নিমা তার বুদ্ধি দিয়ে তার স্বজ্ঞা দিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যৎটা যেন দেখতে পাচ্ছে।

মঠের বাইরে নিমারা তাঁবু খাটিয়েছে। সেইখানে নিয়ে গেছে তার অসুস্থ স্বামীকে। আমি তখন পাশের সেই সংকীর্ণ বারান্দার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলুম। নিমার বড় স্বামী আমাকে দেখতে পেয়েছে। প্রথমেই চিনতে পেরেছিল কিনা জানি না, কিন্তু সন্দেহের চোখে দেখে গেছে। খানিকক্ষণ বসে থেকে, আমি উঠে এসেছিলুম যাত্রীদের বড় ঘরখানায়। শ দুই যাত্রী এখানে গাদাগাদি হয়ে রাত কাটাতে পারে। যত বেশী লোক হয় তত আরাম এখানে। বাইরে যখন বরফের কণার মত হিম পড়ে, তখন এতগুলো লোকের নিঃশ্বাসে ঘরখানা গরম থাকে। কম্বলের পাশে একটা মানুষ না থাকলে কম্বল যেন ঠাণ্ডা থাকে সারারাত। নিমারা চলে গেলে আমি সেই মানুষদের অপেক্ষা করতে লাগলুম।

বাইরে তখন ঝড়ের মত হাওয়া বইছে। দিনের দ্বিতীয় প্রহরে রোজই এমনই হাওয়া বয়। কিন্তু আজ যেন সেই হাওয়া বুকের পাঁজরায় এসে আঘাত করছে, অস্থির করছে, বিপর্যস্ত করছে মনটাকে।

এক সময় মঠের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কৈলাসের শুরু এইখান থেকেই। পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা দুরন্ত মেয়ের মত ঝরঝর করে নেমে এসেছে। তারপর দক্ষিণে প্রবাহিত হচ্ছে স্থূলাঙ্গী নারীর মত। দুই পারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করছে একটা কাঠের সেতু। কৈলাস-ফেরত যাত্রীরা এই পথে মঠে ফিরবে।

মনে হল, যারা ফিরবে তাদের সঙ্গে আমার ভাব হবে না। তাদের সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। মুঠো করে যে রত্ন তারা নিয়ে আসছে, আমি তার ভাগ পাব না। বুকের ক্ষুধা তারা চিরকালের মত মিটিয়ে আসছে। আমি কোন্ সান্ত্বনা নিয়ে তাদের সঙ্গে ফিরে যাব!

তাড়াতাড়ি আমি মঠের সামনে ফিরে এলুম। মুখ বাড়িয়ে নীচের পুরনো পথ দেখতে পেলুম নিঃসাড়ে পড়ে আছে। এই প্রাচীন পথে আসবে ক্ষুধার্ত নরনারীর দল। তাদের বুকের ভিতর আমারই মত দুরন্ত ক্ষুধা জ্বলছে দীর্ঘদিন থেকে। নিজের দেশে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলেও তাদের সে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় নি। এই দুর্গম দুস্তর পথে অনাহারে অনিদ্রায় লেংচে লেংচে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছে। প্রাণের মায়া জন্মের মত ত্যাগ করে আসছে। এই হ্যাংলারাই তো আমার আপনার জন। এদেরই জন্যে আমার নাড়ির টান। কিন্তু কই, কেউ তো আসছে না আজ এদিক থেকে!

সন্ধ্যার ছায়া নামছে ক্লান্ত পথের উপর। পশ্চিমের বাতাসে বরফের কণা দানা বাঁধছে, ছুঁচের মত বিঁধবে সারারাত।

আর মাত্র একটি রাত। চরম বোঝাপড়ার জন্যে এত দীর্ঘ সময়ের বুঝি দরকার ছিল না।

২২

মঠের ভিতর যেন ঘণ্টাধ্বনি শুনলুম। মনে হল, মঠবাসীরা এই সঙ্কেতে কোন কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। কৈলাস-ফেরত কয়েকটি তিব্বতী পরিবার এই ঘরটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁরাও সজাগ হয়ে উঠে পড়লেন।

হস্টেলে থেকে যখন কলেজে পড়তুম, প্রহরে প্রহরে তখন ঘণ্টা বাজত। প্রত্যেকটি ঘণ্টার সঙ্গে তখন পরিচা

ছিল। ঘণ্টাকে শুধু একটা ধ্বনি বলে মনে হত না। প্রত্যেকের কাছে তার নির্দিষ্ট অর্থ ছিল, এবং সে অর্থ বাদক ও শ্রোতা উভয়ের কাছেই সমান নির্দেশপূর্ণ। আজ মঠের ঘণ্টা শুনে আমার সেই ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়ল।

তিব্বতী পরিবারদের অনুসরণ করে আমিও মঠের আরাধনার কক্ষে এলুম। ঘরটি এখন আলোয় আলোকময় হয়েছে। দীপাধারে মাখনের প্রদীপ জ্বলছে। তারই পাশে পিতলের আধারে তাল তাল মাখন সঞ্চয় করা আছে। চারিদিক থেকে উগ্র গন্ধ উঠছে লাল ধূপের।

আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সভ্য দেশের সৈন্যদের মত সারি দিয়ে লামারা কক্ষে প্রবেশ করছেন এবং নিঃশব্দে নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসছেন। প্রধান লামা এসে তাঁর কাঠের আসনে উঠে দাঁড়ালেন। উদাত্ত স্বরে মন্ত্রপাঠ করলেন খানিকক্ষণ। অন্যান্য লামারাও এক সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করলেন। তারপর স্তব্ধ হয়ে ধ্যান করলেন কিছুক্ষণ। যাবার আগে আর একবার মন্ত্রপাঠ করে বিদায় নিলেন।

আমার মনে পড়ল, আমাদের দেশের বিশ্বনাথ বা বৈদ্যনাথের শৃঙ্গারতির কথা। গম্ভীর উদাত্ত স্বরে বেদগানের কথা। এদের সন্ধ্যারতির সঙ্গে কোথায় যেন তার মিল খুঁজে পেলুম। মসজিদের প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে মুসলমানদের নমাজ পড়তে দেখেছি, গীর্জায় সম্মিলিত হয়ে খ্রীষ্টানদের বন্দনা গান করতে শুনেছি, উপাসনা সঙ্গীতও শুনেছি ব্রাহ্মদের। এ সবের ভিতর কোথায় যেন একটা মূলগত মিল আছে। ভগবান এক বলেই কি তাঁকে স্মরণ করার রীতিতেও এই একতা!

আমরাও আবার আমাদের ঘরে ফিরে এলুম।

কৈলাসযাত্রী আজ এ ঘরে একজনও নেই। পরে এর কারণ জেনেছিলুম। ভারত থেকে তীর্থযাত্রী যাঁরা আসেন, তাঁরা দূর প্রান্তর পেরিয়ে দারচেনে ছাউনি ফেলেন। অনেকে বিশ্রামও নেন গোটা একটা দিন। মঠে আসতে তাঁদের বড় ভয়। তাঁরা সাহেবদের বইয়ে পড়েছেন যে মঠে এলেই লামারা চা খেতে দেন—তাঁদের নুন-মাখন দেওয়া চা। মুখে দিতেই তা বমি হয়ে যায়। আর বমি হলে কিছুতেই রক্ষে নেই। চকচকে ঝকঝকে ছুরি সোজা ঢুকিয়ে দেবে পেটের ভেতর।

কারও ভয় অন্য রকমের। আমাদের দেশের মন্দির মানেই তো পাণ্ডার রাজ্য। সেখানে ঢুকলে কিছু দ যাবেই। মঠও তো মন্দির, এখানে কি আর সে ভয়টা নেই তিব্বতের মঠে অগণিত লামার বাস। বাইরে বেরি তাঁরা যাত্রীদের ডাকেন হাতছানি দিয়ে। উদ্দেশ্য কী ত জানা নেই। তাই কী দরকার এ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যাবার! তার চেয়ে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মুজতবা আলি সাহেব পাণ্ডাদের অত্যাচারের কথ এক জায়গায় লিখেছেন। তাঁর মতে সর্বদেশে সর্বধর্মে পাণ্ডাই একরকম। কিন্তু বৌদ্ধদের এই সব মঠ দেখলে তাঁর মত যে বদলাবে তাতে সন্দেহ নেই। এখানে লামারা চাইতে জানেন না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কেউ কিছু দিলে মঠের নামে তা জমা হয়। কে একজন অবশ্য বলেছিলে যে, সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে এঁরাও আজকাল চাইতে শিখেছেন। আমি এ কথা মানতে পারি না। আমার কাছে কেউ তো কিছু চান নি।

একটু রাতে দুখানা কম্বল নিয়ে নিমা আমাকে খাওয়াতে এল। আমি আর তার তাঁবুর ধারে যাই নি দেখিই নি কোথায় তার তাঁবু পড়েছে। কেউ না বলে দিলেও অনুমান করতে পারি যে কাল ভোরেই তারা দেশে ফিরবে। এতে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

ছাতু মিলিয়ে স্তেজা খাচ্ছিলুম। এমন সময় ছেরি পেনছো এল ব্যস্তভাবে। গড়গড় করে কী খবর দিয়ে গেল এক নিঃশ্বাসে। নিমার মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল দেখলুম। অসহায়ভাবে তাকালো তার সেজো স্বামীর দিকে।

আজ নিমার চোখে আমি জল দেখলুম। ফরসা গালের উপর দিয়ে বড় বড় ফোঁটায় গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি তখন হতবাক হয়ে গেছি।

চারিদিকে যারা ছড়িয়েছিল, তারাও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে দেখলুম। সবটুকু শুনতে না পেয়ে প্রচুর কৌতূহলী হয়ে উঠছে। ছেরিং পেনছোকে কে একজন একটা প্র করেই বসল। কিন্তু নিমার চোখের দিকে চেয়ে উত্তরটা সে বোধ হয় এড়িয়ে গেল।

আমার ইচ্ছে করছিল, গ্যাকার্কোর মণ্ডি থেকে আমাদের বুড়ো লামাকে ধরে এনে নিমার দুঃখের কথাটা জেনে নিই। জেনে নিই আজ কোন্ দুর্ভাবনায় সংবা তাকে এমন উতলা করেছে। তার বড় স্বামী কি কো

হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে! তীর্থযাত্রা শেষ না করেই কি তারা খুন প্রথম শুরু করবে! ভাবতে ভয় হল যে মঠের ভেতর মানুষ খুন করবে, এমন পাষণ্ডও আছে তিব্বতে!

তারপরে ভাবলুম নিমার যদি কোন বিপদ হয়! সে তো মঠে নেই! স্ত্রীকে অবিশ্বাসী সন্দেহে যদি তাকেই কেটে ভাসিয়ে দিয়ে যায় পিছনের ঝরনার জলে! যারা জানবে তারাও কোন প্রশ্ন করবে না কোনদিন। এ দেশে এসব এমন তুচ্ছ ব্যাপার যে কেউ কোন গুরুত্ব দেয় না এতে। যেন একটা মশা এসে কানের কাছে বিরক্ত করছিল, এক চড়ে সেটাকে শেষ করে দেওয়া হল। বিরক্ত করবারও দরকার নেই। হাতের কাছ দিয়ে একটা পিঁপড়ে যাচ্ছে, টিপে মেরে ফেলা হল। বেশ লাগল পিঁপড়েটাকে টিপে মারতে। একটা মানুষ মারার জন্যে এই আনন্দটুকুই যথেষ্ট।

শোবার জন্যে দুখানা কম্বল দিয়ে নিমারা চলে গিয়েছিল। আমার কিন্তু ঘুম এল না। মনে হল আজ রাতে ঘুমিয়ে পড়লে কাল সকালের আলো আর দেখতে পাব না। নিমার চোখে আজ জল দেখেছি। সে অশ্রুর নিশ্চয়ই একটা গভীর অর্থ আছে। নানা বৈচিত্র্যে কণ্টকিত ছিল আগের কয়েকটা দিন—দুর্দশা আর দুশ্চিন্তা জড়ানো নিষ্ঠুর দিন—কিন্তু নিমার শান্তি তাতে নষ্ট হয় নি। আজ কেন তার চোখে জল দেখলুম!

ঘরের ভিতর পুরুষ ও মেয়েরা নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমচ্ছে। বাচ্চাকাচ্চাও যে দু-একটা আছে তাদেরও সাড়া নেই। মায়ের বুকের ভিতর মিশে গিয়ে তারাও ঘুমিয়ে আছে। আমি শুধু জেগে রইলুম।

তখন রাত কত হবে জানি না। আবছা আলোয় ঘরের ভিতরটা তখন স্বচ্ছভাবে দেখতে পাচ্ছি। বড় দরজার কাছে একটি ছায়ামূর্তি দেখতে পেলুম। সমস্ত স্নায়ুগুলো সংহত করে আমি সেই মূর্তিকে অনুসরণ করলুম দৃষ্টি দিয়ে।

অকস্মাৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে মন আমার ভরে উঠল। নিমা এসেছে। কিন্তু সে কথা কইতে আসে নি। আসে নি তার সঙ্গ দিতে। দু হাত দিয়ে আমায় টেনে তুলল। চোখের ইশারায় বলল তাকে অনুসরণ করতে।

পায়ে পায়ে তার সঙ্গে প্রশস্ত পথে নেমে এলুম। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত পথ। আজও আকাশে মদের ভাণ্ড উল্টে গেছে। কুয়াশার গা চুঁয়ে চুঁয়ে সেই মদ গড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীটা বুঁদ হয়ে গেছে দুরন্ত নেশায়। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এমন আলোর ভেতরেও আমার চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। জগৎটা সংকীর্ণ হয়ে একটা ছোট গণ্ডির মত দেখাচ্ছে। আর সেই জগতে আমরা দুটো প্রাণী।

কতকটা ছুটতে ছুটতে আমরা চলেছি। পথের কাঁকরে হোঁচট খাবার আগেই নিমা আমাকে ধরে ফেলছে। অবশ্যম্ভাবী পতন থেকে বারে বারে আমাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছে এই শক্ত তিব্বতী মেয়েটা। তার চোখের দৃষ্টি আমার চেয়ে বেশী। মনে হল, তার দূরদৃষ্টিও আমার চেয়ে বেশী। জীবনের পথেও আমি এমনই হোঁচট খাচ্ছিলুম। সারাটা পথ আমাকে বাঁচিয়ে এনেছে। এবারও বোধ হয় বাঁচাবার জন্যেই এমন করে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার নতুন সবুজ পোশাকটি দেখলুম তার গায়ে। আজ আর সবুজ মনে হচ্ছে না রঙটা। চাঁদের আলোয় তাকে ধূসর দেখাচ্ছে।

চলতে চলতে মানুষ থেমে পড়ে, অন্ধকারে হোঁচট খায়, পা মচকায়, খানায় পড়ে পাও ভাঙে। জগৎটা কিন্তু থামে না, অন্ধকারে তার পথ হারায় না, মানুষের কান্নায় তার গতি কোনদিন হ্রাস হয় না। মনে হল, জগৎটা যদি আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ থেমে পড়ত! এই পাহাড়টার উপর! তা হলে কুয়াশাও কি আর স্বচ্ছ হত না! উত্তরে কৈলাস আর দক্ষিণে মানস-সরোবরও কি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যেত চিরদিনের মত! কিন্তু কৈলাস আর মানসই তো সব নয়! যা থাকত আমার চিরদিনের হয়ে, তার দামও অনেক

পৃথিবী তবু থামল না। আমরাও ছুটে চলেছি। একে ছোটাই বলব। পাহাড়ে-পথে আমরা এমন করে চলি না। নিমা আমাকে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে! উত্তরে কৈলাসের দিকে, না, দক্ষিণে মানসের তটে! সেও কি পালিয়ে চলেছে ওই অমানুষগুলোর কাছ থেকে! না না, এ আমার অন্যায়। অকারণে আমি তাকে ছোট ভাবছি।

আমি যে তার দুর্বলতার কথা জানি। সে দুর্বলতা একটা বিদেশী যাত্রীর জন্যে নয়, সে তার সংস্কারের প্রতি দুর্বলতা। তার একাধিক স্বামী আছে—তার সংসার আছে। তাদের জন্যই তার দুর্বলতা। আমি তার অতিথি হয়ে ছিলুম। অতিথিকে রক্ষা করার জন্য যে দুর্বলতা, তার উৎস ধর্মবিশ্বাসে। হৃদয়ের নিভৃত কোণে কোন সুস্থ নারী অন্য কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে না।

রাত কত হল? আকাশের চাঁদ দেখে প্রহরের হিসেব করতে শিখি নি, দিনের তৃতীয় প্রহরের পর থেকে পরদিন এক প্রহর পর্যন্ত শীতে বুকের হাড় পর্যন্ত কাঁপে। রাতে চাঁদ দেখে প্রহরের হিসেব করবে, এমন মূর্খ এদেশে নেই। তবে এরা রাতের তৃতীয় প্রহরে কী দেখে যাত্রা করে!

আর একটা চড়াইয়ের মাথায় এসে নিমা থামল। চারিদিকে তাকিয়ে মনে হল, একটা বিরাট প্রান্তরের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। কোনদিকে তার শেষ নেই। কত জিনিসেরই তো শেষ নেই! আমাদের কেন যাত্রা শেষ হল!

শ্রান্তিতে নিমা তখন হাঁপাচ্ছিল। আমিও হাঁপাচ্ছিলুম হাপরের মত। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে দম নিলুম দুজনে।

কুয়াশা তখনও স্বচ্ছ হয় নি। কিন্তু সেই অস্পষ্টতা নিমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নি। যেদিকে যাচ্ছিলুম, সেই দিক দেখিয়ে নিমা বলল: সোমাভাং।

আঙুল দিয়ে তার পশ্চিমের তট দেখিয়ে বলল: গিয়োক্‌পোপের।

আর যা বলল, আমি বুদ্ধি দিয়ে তার অর্থ করলুম—সামনে মানস-সরোবর। তারই তীর দিয়ে আমার ফিরে যাবার পথ। আমি যেন আর দেরি না করি।

কিন্তু এই কি তার অন্তরের কথা!

চাঁদের আলোয় তার সুন্দর মুখখানি আবার দেখতে পেলুম। এক রকমের অদ্ভুত জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টি। সে যেন অন্য জগতের মানুষ। অন্য গ্রহ থেকে আজ বেড়াতে এসেছে।

কতক্ষণ নীরবে কাটল মনে নেই। সেদিন সময়ের হিসেব আমরা রাখি নি। আমার চমক ভাঙল নিমার হাতের স্পর্শে। সে তার সবুজ আলখাল্লাটা আমায় পরিয়ে দিচ্ছিল। তাকে আবার দেখলুম তার সেই পুরো নোংরা ছেঁড়া পোশাকটায়। আজ তাকে বাধা দিতে আমি ভুলে গেলুম।

ডান হাতের মুঠোর ভিতর একটা কবোষ্ণ জিনিসে স্পর্শ পেলুম। আলোয় দেখলুম, একখানি মোহর গলার মালা থেকে যে খুলে দিয়েছে, তার সাক্ষী দিচ্ছে একটি ছোট্ট গোল ফুটো।

আবার নিমাকে দেখলুম চাঁদের আলোয়। জলভরা মেঘের মত থমথম করছে তার মুখখানা। গম্ভীর ভাবে তাকাতেই মুক্তোর মত বড় বড় ফোঁটায় অশ্রুর ধারা নামল। এত জল তার কোথায় চাপা ছিল!

নিমা আমাকে দাঁড়াতে দিল না। দু হাতে ঠেলে দিল সামনের দিকে। শুধু একবার তার নরম হাত দুখানা নিজের হাতের মধ্যে নিতে পেরেছিলুম। নিষ্ঠুর কুয়াশা আমাদের আড়াল করে দিল।

পথ চলতে চলতে কবির কথা আমার মনে পড়ল:

"তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে,
তাকাসনে ফিরে।
সম্মুখের বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।'

২৩

সেদিন আমার কাগজপত্রের আবর্জনার ভিতর একখানা মোহর খুঁজে পাওয়া গেছে। সন্ধ্যেবেলায় কফির পেয়ালার সঙ্গে গৃহিণী সেই সংবাদ পরিবেশন করলেন মোহরখানা দেখিয়ে বললেন: মেয়ের মাথার একটা ফুল গড়িয়ে দেওয়া যাবে।

মোহরখানা হাতে নিয়ে চমকে উঠলুম। এই সে ফুটো মোহর! প্রথম যৌবনে একদিন একে বুকে করে দেশে এনেছিলুম। দুস্তর পার্বত্যপথে অনাহারে অর্ধাহারে কাটিয়েছি কতদিন। কত রাত্রি ঘুমতে পারি নি ক্ষুধার জ্বালায়। কিন্তু এই মোহরখানা সেদিন ভাঙাতে পারি নি। মনের রঙে রাঙা হয়ে আছে ওই সোনাটুকু। বললুম: ও সোনা থাক্, মেয়ের ফুল গড়িয়ে দিয়ো দস্তার টাকায়।

॥ সমাপ্ত ॥

গল্প

মডার্ন ফার্মেসী

হরেন্দ্রনাথ রায়

মডার্ন ফার্মেসী।

ছোট্ট সাইনবোর্ড। একটু তেরছা করে দরজার মাথার ওপরে লটকান।

মডার্ন বলেই হয়তো ভঙ্গিমাটাও তার মডার্ন অর্থাৎ তেরছা।

ফার্মেসীর বাইরেটা যতখানি না মডার্ন অন্দরটা আরও মডার্ন। নিরাভরণত্বে বা স্বল্প আভরণত্বে হার মানায় মডার্ন মেয়েকেও। পুরনো তিন-দুই একখানা টেবিল—আম বা জারুল কাঠেরই হবে। মাথার ওপর বিছানো মসীলিপ্ত বিবর্ণ একখানা অয়েল-ক্লথ। সর্বসাকুল্যে খানতিনেক চেয়ার। তার মধ্যে যেটার বয়স এখনও গিয়ে আশিতে ঠেকে নি, ওদেরই মধ্যে যেটা একটু ডাঁটো, একটু কম নড়বড়ে, সেখানা স্বয়ং ডাক্তার এস. পি. দাসের আর অপর দুখানা রোগীদের জন্য নির্দিষ্ট। ডাক্তার দাস দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি। হঠাৎ যদি রোগীর সংখ্যা কোনদিন বৃদ্ধি পায় সেই সুদিনের আশায় ছোট ঘরখানির আপত্তি সত্ত্বেও আর একখানি ছোট বেঞ্চি এরই মধ্যে কোনমতে ঠেসে-ঠুসে ধরিয়েছেন। দরজা থেকে তিন হাত দূরে ঘরের মধ্যস্থলকে অতিক্রম করে মান্ধাতা আমলের দুটো আলমারি পাশাপাশি দাঁড় করানো। উদ্দেশ্য, ঘরখানিকে সদর এবং অন্দরে ভাগ করা। দুটি আলমারির ডাইনে এবং বাঁয়ের ফাঁক দুটিতে দুখানি খাকী পর্দা ঝোলানো। একখানির গায়ে কাগজ-আঁটা—ডিসপেনসিং রুম, আর একখানির গায়ে আঁটা—প্রাইভেট। এই হল বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম শতকের মডার্ন ফার্মেসীর স্বত্বাধিকারী ডাক্তার এস. পি. দাসের চেম্বার।

ডাক্তার দাস বেঁটে, রোগা, ছিপছিপে লোক। এত রোগা যে বুকের হাড়গুলো তাঁর দেখা যায় স্পষ্টই। পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের একজন নাকি গুনেও ফেলেছে হাড়গুলো। বলে, ডাক্তারের বুকের হাড়গুলো বাঁকা—ধনুকের মত। বুকের একদিকে হাড়ের সংখ্যা সাতখানা আর একদিকে পাঁচখানা। সেই থেকে ছেলেরা তাঁর নাম দিয়েছে ডাক্তার সাত-পাঁচ। আবার কেউ কেউ বলে সাত-পাঁচে ডাক্তার। রোগী যদি দেখতে যান ছেলেরা টিটকিরি দিয়ে ওঠে: ফিজিসিয়ান হীল দাইসেলফ্।

পুরুষস্য ভাগ্যম্। ডাক্তারের ভাগ্য ভাল কি মন্দ, ডাক্তার ক্ষণজন্মা পুরুষ কিনা এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি কেউ কোনদিন। কারণ ডাক্তারের ভাগ্যের বা তাঁর ক্ষণজন্মত্বের কোন লক্ষণই প্রকাশ পেল না যখন তাঁর দেহের ওপর দিয়ে চল্লিশটি বছর পার হয়ে গেল বেশ ধীরে সুস্থে। ডাক্তারের যত রাগ নিজের ভাগ্যের ওপর নয়—মা লক্ষ্মীর ওপর। নিয়মিত পূজা-অর্চনা জপ-তপ করেও যখন লক্ষ্মীকে তুষ্ট করতে পারলেন না, তখন তাঁর যত রাগ গিয়ে পড়ল ওই লাল-চেলি-পরা ঠাকুরের ওপর। এবং তাঁকেই একবার বগলদাবা করবার জন্য তিনি যেন ক্ষেপে উঠলেন। হঠাৎ সুযোগও জুটল তাঁর ফ্লুর প্রসাদে। ফ্লুর বেশ ধরে ওই লাল-চেলি-পরা ঠাকুর একদিন এসে ঢুকলেন মডার্ন ফার্মেসীতে—ডাক্তার এস. পি. দাসের চেম্বারে।

ভগবান যাকে দেন, তাকে এমনই করেই দেন। এখন নাইবার খাবার সময় নেই ডাক্তারের। রোগ এক—সেই কোমরে ব্যথা, মাথার যন্ত্রণা আর জ্বর। কিন্তু রোগী শত-সহস্র হলেও আপত্তি নেই ডাক্তারের। লক্ষণের ব্যতিক্রম কিছু নেই, সুতরাং ভাববারও কিছু নেই। সেই একই ওষুধ, একই রকম শিশিতে ভর্তি হয়ে ফেরে হাতে হাতে। জালা জালা অ্যালক্যালাইন-মিকচার উবে যায় দিন দিন। হাজারে হাজারে এসকোসিন ট্যাবলেট, সালফাডায়াজিন ট্যাবলেট, আর সেই সঙ্গে ভেগানিন বা সারিডন ট্যাবলেট নিঃশেষিত হয়ে আসে ঘণ্টায় ঘণ্টায়। ডাক্তারের ব্যাগ ফুলে-ফেঁপে ওঠে টাকাতে-রেজগিতে। ওষুধের দর বেঁধে দিয়েছেন ডাক্তার। আট আউন্স শিশি এক টাকা পনের আনা। দু টাকায় রোগী ঘাবড়ে যেতে পারে তাই এক টাকা কয়েক আনা মাত্র। চার আউন্স শিশি এক টাকা চার আনা। আর

ট্যাবলেট দিলে ঠকা হয়, তেমন লাভ থাকে না, তাই এলকোসিন আর সালফাডায়াজিন ট্যাবলেটকে গুঁড়িয়ে পুরিয়া করে দেন। আট পুরিয়ার দাম দেড় টাকা। আবার প্রেসক্রিপশনের কোণে কোণে সাঙ্কেতিক ভাষায় দামও লিখে দেন ডাক্তার। ডাক্তারের নামের আদ্যক্ষর 'এস' মানেই এক টাকা পনের আনা, 'পি' মানে দেড় টাকা, 'ডি' মানে এক টাকা চার আনা। 'পিডি' এক সঙ্গে মানে পেড—অর্থাৎ আগে থেকেই ডাক্তারকে দাম চুকিয়ে দিয়েছে রোগী। মন্দাক্রান্তা তালে নয়, দ্রুত তালেই মডার্ন ফার্মেসী চলেছে বেশ। ডাক্তারের মেজাজও খুশী। তবে দু-একটা রোগীই মেজাজটা দেয় মাঝে মাঝে বিগড়ে। বেয়াড়া রোগী, বেয়াড়া রোগ। বাগ মানে না, অভদ্রের মত নিয়ম-কানুনেরও ধার ধারে না। তারা আসে খামোকাই ডাক্তারকে বিপদে ফেলতে। এদের এড়াতে পারলেই ডাক্তার বাঁচেন, কিন্তু পারেন না।

মডার্ন ফার্মেসীতে আজকাল ভিড় লেগেই আছে। সকাল থেকেই ভিড় জমে ওঠে। উদ্বাস্তু কলোনীরই ভিড় বেশী। সর্বহারা না হলে, এমন সর্বশোষণ ডাক্তারের কাছেই বা আসবে কেন তারা! পাঁচজন রোগী ইতিমধ্যে ঠাসাঠাসি করে বসে আছে ঘরে। তাদের মধ্যেই এসে দাঁড়াল শৈলেন দাস এক পাশে। ছেলের জ্বর ছাড়ে না, বাহান্ন দিন ভুগে চলেছে সমানে। ডাক্তারও নিরাময় করতে পারছেন না কিছুতেই। নিরানব্বুই থেকে একশো—এরই মধ্যে দেহের তাপ ওঠা-নামা করে সারাদিন।

মধ্যবিত্ত ঘর। এখন আয়ের চেয়ে ব্যয় দাঁড়িয়েছে বেশী। বাহান্ন দিনে রোগীর পিছনে খুব কম করেও খরচ হয়ে গেছে পাঁচ-সাত শো টাকা। যে হারে শৈলেনের পকেট নিঃশেষিত হয়েছে, ঠিক সেই হারেই ডাক্তারের ব্যাগ ভরে উঠেছে। তবুও রেহাই নেই ডাক্তার এস. পি. ডি.র কাছে! পর পর তিনজন রোগী দেখা শেষ হয়ে গেল ডাক্তারের। ক্লিপে আঁটা একখানা সরু স্লিপ খুলে নিয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে করে লিখে চলেন ডাক্তার। গোনাগুনতি স্লিপ—হারাবার জো নেই একখানাও। দিনের শেষে এই স্লিপ গুনে গুনে প্রেসক্রিপশন মেলাবেন ডাক্তার। বিশ্বাস কাউকে নেই তাঁর। লক্ষ্মী যেমন তাঁকে অবহেলা করে এসেছে এতকাল, আজ তিনি প্রতিশোধ নিতে চান তারই। ব্যাগের মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ করে মারতে চান তাকে।

ডাক্তার এস. পি. ডি. প্রেসক্রিপশন লিখে চলেছেন দ্বিতীয় রোগীর: পটাসসাইট্রাস ৮০ গ্রেন, সোডা-বাই-কার্ব ৬০ গ্রেন—

বাধা পড়ে লেখায়। প্রথম রোগী প্রশ্ন করে, কী খাব ডাক্তারবাবু আজ?

লিখতে লিখতেই ডাক্তার উত্তর দেন, জলসাবু কিংবা অ্যারারুট লেবুর রস দিয়ে সরবত করে।

বিস্কুট?

বেশী নয়, দুখানা। বেশী না চিবনোই ভাল।

রোগী ক্ষুণ্ণ হয়। বলে, শুধু জলসাবু খেয়ে আর কতদিন থাকব ডাক্তারবাবু?

প্রেসক্পশন লেখায় আবার গোলমাল হয়ে যায় ডাক্তারের। বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, রোগ যতদিন না সারে থাকতে হবে।

একটু মিছরির সরবত কি ঘোলের সরবত?

ঘোলের নয়, বরঞ্চ ডাবের জল চলতে পারে।

ডাক্তার আবার লিখে চলেন: সোডা-বাই-কার্ব—কিন্তু আবার বাধা পড়ে। দ্বিতীয় রোগী যেন মুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। ডাক্তারের কলম চলতে দেখেই বলে ওঠে গায়ের ব্যথাটা ডাক্তারবাবু—

যাবে আস্তে আস্তে।

কোমর সোজা করতে পারি না। তার ওপ অরুচি। মুখে কিছু রোচে না। মাথাটাও টিপটি করছে সেই থেকে।

এ জ্বরের নিয়মই এই—তিন দিন বা চার দিনে মেয়াদ। তারপর কমে যাবে সব। বাড়ি গি ভেগানিন ট্যাবলেটটা খেয়ে ফেলবেন।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লেখায় মন দেন: সোডা-বাই কার্ব ৮০ গ্রেন, সিরাপ বাসক এক আউন্স—

আবার বাধা পড়ে। দ্বিতীয় রোগী বলতে থাকে, জ্বর একটু কম ডাক্তারবাবু, কিন্তু কাশিটা যাচ্ছে না কিছুতেই কেশে কেশে পেট টাটিয়ে উঠল বিষফোড়ার মত।

ডাক্তার মুখ না তুলেই বলেন, কদিন হল?

তিন দিন।

এবার সব যাবে। এ ওষুধটা পেটে পড়লেই কমে যাবে সব।

বমি বমি ভাবটাও আছে একটু।

ডাক্তারের মাথায় ঢোকে না এ কথা। তিনি ব্যস্ত সিরাপ বাসক নিয়ে। ভোজটা ঠিক করে উঠতে পারছেন না কিছুতেই। এমন সময় কম্পাউণ্ডার এল প্রথম রোগীর ওষুধ নিয়ে। গোটা তিন চার ওষুধ—শিশিতে লাল রংয়ের মিকচার, পিচবোর্ডের বাক্সে পুরিয়া। গোটা আষ্টেক এনটারো ভ্যায়োফর্মের বড়ি আর প্যাকেটে বিসমাথ্ পেপসিন কম্পাউণ্ড। ডাক্তার লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন একবার। তারপর প্রেসক্রিপশনের ওপিঠে দাম কষতে বসলেন। দাম সবই জানা, তবুও ভড়ং দেখাতে হয়। মিকচারের কোণে 'এস' লেখা। দাম বাঁধা—এক টাকা পনের আনা। শিশি সমেত ওষুধের দাম পড়ে হয়তো বড় জোর চার আনা কি পাঁচ আনা। আট পুরিয়া পাউডারের দাম দেড় টাকা, বড়ির দাম এক টাকা, আর পেটেণ্ট ওষুধের দাম সাড়ে তিন টাকা। ডাক্তার দুবার করে যোগ মিলিয়ে বললেন, আপনার হয়েছে আট টাকা সাত আনা।

শৈলেন তাকিয়ে দেখে, ততক্ষণে রোগীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মৃত্যুদণ্ডের আসামী যেন সে। মাত্র একটু পেটের অসুখ, তাইতেই আট টাকা সাত আনা! রোগীর শ্বাস ওঠে, কষ্টেসৃষ্টে একখানা ময়লা নোট বার করে পকেট থেকে। করুণদৃষ্টিতে একবার নোটখানার দিকে তাকিয়ে দেখে—হয়তো এইটাই তার এ মাসের শেষ সম্বল—তাই শেষ দেখা দেখে নেয় তাকে। মুখ শুকিয়ে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে, মিকচারটাতে কী উপকার হবে ডাক্তারবাবু?

রোগের উপশম হবে।

আর পুরিয়া?

ওটাও সাহায্য করবে অনেকখানি।

ডাক্তার মাথা নীচু করে রেজগি গুনতে শুরু করেন।

তা হলে ট্যাবলেট আর পেটেণ্ট ওষুধটা—

রোগীর ক্ষীণ স্বর কেঁপে ওঠে। যদি দয়া হয় ডাক্তারের, এ দুটো থেকেও যদি রেহাই দেয় তাকে। কিন্তু ডাক্তারের দয়া হয় না। বরং বিরক্তির সব চিহ্নগুলিই ফুটে ওঠে চোখে-মুখে। নোটখানা ব্যাগের মধ্যে গুঁজতে গুঁজতে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলেন, যাতে শীগগির শীগগির সেরে ওঠেন—ছাপোষা মানুষ—বেশীদিন না ভোগেন, তারই ব্যবস্থা ঠিক ঠিক করে দিলাম। কাল সকালে রিপোর্ট দেবেন। রোগের উপশম যদি না হয়, ওষুধটা পালটে দেব। তা বলে রোগীকে তো বেশীদিন কষ্ট দিতে পারব না মশাই। ওসব ছ্যাচড়ামি আমার কাছে পাবেন না।

ডাক্তার ফাউণ্টেনপেনটা একবার ঝেড়ে নিয়ে অসমাপ্ত প্রেসক্রিপশনখানা শেষ করতে মন দেন।

চতুর্থ রোগী সুযোগ খুঁজছিল এতক্ষণ। এইবার একটু সাহস করে গলাটা বাড়িয়ে বলে উঠল, শরীরটা কেমন হালকা হালকা ঠেকে ডাক্তারবাবু। বুকের ভেতর ধড়ফড় করে, উঠতে গেলে বোঁ করে মাথা ঘুরে চোখে অন্ধকার দেখি।

দু নম্বরের প্রেসক্রিপশন লেখা তখন শেষ হয়ে এসেছে ডাক্তারবাবুর। লিখছেন: অ্যাড অ্যাকোয়া ডিষ্টিল টু মেক এইট আউন্স—

অথচ মজা এই যে ডিষ্টিল-ওয়াটার ডাক্তারবাবুর ত্রিসীমানায় কোথায়ও নেই। যা আছে তা টিনের ড্রামে ভরা কর্পোরেশনের বাসী ক্লোরিন মিশ্রিত জল। বাঁধা বয়েন যা শিখে এসেছেন এতদিন, তা ভুলতে পারেন না। অভ্যাসবশে লিখে যান সব প্রেসক্রিপশনেই।

ডাক্তার মুখ না তুলেই প্রশ্ন করেন, টেম্পারেচারটা দেখেছেন? এখন কত?

জ্বর নেই ডাক্তারবাবু।

তা হলে পেট-ফাঁপ-টাপ কিছু আছে? বায়ু চাপেই হচ্ছে ও-রকম।

কিন্তু রোগী স্বীকার করতে চায় না। বলে, পেটে কোন গোলমাল নেই ডাক্তারবাবু। একবার প্রেসারটা দেখুন আপনি।

ডাক্তারবাবু মুখ তোলেন। রোগীকে দেখে বলেন, বয়স হল কত?

তিরিশ।

হুঁ! এ বয়সে ওরকম চেহারায় ব্লাডপ্রেসার না হয়ে পারে না। অত্যন্ত লো প্রেসার হওয়াই স্বাভাবিক

দেখে দিচ্ছি এক্ষুনি। খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু দৃষ্টি রাখতে হবে। ভাল-মন্দ খেতে হবে কিছুদিন। খাওয়া হয় কী?

ডাল-ভাত—

ডাক্তারের মাথা দুলে ওঠে। ডাইনে বাঁয়ে মাথা নড়াচড়া করে। সুর করে বলেন, উহুঁ, চলবে না। ডায়েট আমি ঠিক করে দিচ্ছি। একে লো প্রেসার, তায় দুর্বল শরীর। খাওয়া চাই। খেতে খেতেই ঠিক হয়ে যাবে সব। সকালে উঠে দুটো হাফ-বয়েল ডিম, দু স্লাইস রুটি, এক ছটাক ভাল মাখন, গোটা দুয়েক কমলা-লেবু। ঘণ্টাখানেক বাদে আধ সের খাঁটি দুধ, দুটো মর্তমান কলা আর গোটা দুয়েক ভাল সন্দেশ। ভাতের সঙ্গে আধ ছটাক গাওয়া ঘি, কম করেও একপো পাকা পোনা মাছ। বিকেলে যদি সহ্য হয় দুটো ডিম, দু স্লাইস রুটি, এক ছটাক মাখন, গোটা দুয়েক কমলালেবু আর সন্দেশ। রাত্রে গরম গরম লুচি, তার সঙ্গে আধপো তিন ছটাক মাছ আর আধ সের খাঁটি দুধ। একটু ঘি দুধ মাছ পেটে না পড়লে চলবে কেন? সপ্তাহে অন্ততঃ চারদিন মাংস। এ ছাড়া ফলটা-পাকড়টা যেমন আপেল আঙুর যতখানি পারেন—একপো থেকে দেড়পোটাক—রোজই কিছু কিছু খাবেন। ওষুধ দেব আমি দু-তিনটে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোও খেয়ে যাবেন। দেখবেন, মাস ছয়েকের মধ্যে কেউ চিনতে পারবে না আপনাকে। একেবারে নিটোল হয়ে যাবেন। বুক ধড়ফড়ানিটা যদি বাড়ে, খাটাখাটনিটা কমিয়ে দিয়ে দুদিন বিশ্রাম নিতে হবে আপনাকে। কী করা হয়?

রোগী ঘাবড়ে যায়। জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলে, আজ্ঞে, উপস্থিত কিছুই না। সম্পূর্ণ বেকার। মামার বাড়িতে এসে উঠেছি, চাকরি-বাকরির চেষ্টায় আছি। এখনও সুবিধে করে উঠতে পারি নি কিছুই।

শৈলেন এক পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল মনে মনে—বেকার হয়ে তবুও এখনও কোন রকমে টিকে আছ ভায়া। যার পাল্লায় পড়েছ আর তাও থাকবে না। এবার নিরাকারত্ব প্রাপ্ত হবে শীগগির। পরমব্রহ্মযোগ তোমার অবশ্যম্ভাবী।

ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে চলেন অপর কোন রোগীর দিকে মন না দিয়েই—পটাসসাইট্রাস ৮০ গ্রেন, সোডা-বাই-কার্ব ৬০ গ্রেন, সিরাপ বাসক এক আউন্স ইত্যাদি।

শৈলেন এগিয়ে আসে। ডাক্তার মুখ তুলে প্রশ্ন করেন, খবর কি শৈলেনবাবু?

ভাল না। সেই একভাবেই রয়েছে রোগী।

জ্বর কমে নি?

শৈলেন মাথা নাড়ে।

কদিন হল আজ?

বাহান্ন দিন।

তাই তো!—ডাক্তার চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ রোগটাকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছেন না তিনি। বেয়াড়া রোগ। তাঁকে জব্দ করবার জন্যেই যেন এর আবির্ভাব। ডাক্তার মনে মনেই বলেন, জ্বা-লা-তন! শহরে এত ডাক্তার থাকতে আমার কাঁধে ভর করলি কেন রে বাপু। যা না তাদের কাছে—মজাটা টের পাক তারাও একবার। শৈলেনকে বলেন, রোগীকে আর একবার ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে চাই শৈলেনবাবু। তারপর দরকার যদি বুঝি, অন্য লাইনে চিকিৎসা করব।

শৈলেন চমকে ওঠে। এই বাহান্ন দিনে খুব কম করেও চল্লিশ বার যাতায়াত করেছেন ডাক্তার। তবুও লাইন ঠিক করা হল না তাঁর! রোগী দেখার আশও মিটল না তাঁর! ইতিমধ্যে কত লাইন যে ধরা হল আর ছাড়া হল তার লেখাজোখা নেই। আবার নতুন লাইন! শৈলেন একটু কঠিনস্বরে বলে, এবার কোন্ লাইনে চলবেন ডাক্তারবাবু?

লাইন নির্ভর করছে রোগীর ওপর। তাকে না দেখে বলতে পারছি না কিছুই। পেনিসিলিন পড়েছে কত?

পঞ্চাশ থেকে ষাট লাখ হবে।

ক্লোরোমাইসিটিন ক ফাইল?

সাত। তার ওপর আছে অরোমাইসিন, স্টেপটো-মাইসিন, কেমোমাইসিন—যত রকম মাইসিন আছে সব।

হুঁ! ওদিক দিয়ে যাব না আর। মল-মূত্র পরীক্ষা করেও পাওয়া যায় নি কিছুই। কোলাইটিস ভেবেছিলাম, তাও নয়। এবার মনে করছি রক্তটাকেই কালচার করে দেখব। তারপর দেখব স্পুটামটা। শেষ পর্যন্ত কয়েকটা প্লেট নেব। বুকে ব্যথা বলছিলেন না—

শৈলেন ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। বলে, ডাক্তারবাবু, ছ-সাত বছরের ছেলে আমার—

হলই বা। সিস্টেমেটিক চিকিৎসায় দোষ কী? আর প্লেট নিলেই যে সেই রোগ হবে তার তো কোন মানে নেই। সবই যখন হল, তখন ও কটাই বা বাকী থাকে কেন। আরও আগে থেকেই করানো উচিত ছিল আমার।

শৈলেন মরিয়া হয়ে বলে ওঠে, কিন্তু তাতেও যদি রোগ ধরা না পড়ে ডাক্তারবাবু, তখন?

ডাক্তারের মনে কোন দ্বিধা নেই, কোন অপ্রস্তুতের ভাবও নেই। তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, তখন না হয় ডাক্তার পি. গাঙ্গুলীকেই একবার দেখিয়ে নেওয়া যাবে। ভদ্রলোক চৌষট্টি টাকা ফী করেছেন বটে, কিন্তু কেস ডায়গোনিসিস যা করেন একেবারে মোক্ষম।

শৈলেন একেবারে থ। সিস্টেমেটিক চিকিৎসাই বটে! একেবারে রাজসিক! পি. গাঙ্গুলীতে যদি না হয়, ডাক এস. ভট্টাচার্যকে। তাতেও যদি না হয় ডাক এক শো আটাশ টাকার ফী, পি. রায়কে। অর্থের শেষ থাকতে পারে, দাওয়াইয়ের ভাণ্ডারও অফুরন্ত না হতে পারে, কিন্তু সিস্টেমেটিক চিকিৎসার অন্ত নেই। একটি মাত্র সিস্টেমেটিক চিকিৎসাতেই সে ফতুর, সে দেউলে। নিজের বাক্সে যা কিছু ছিল সব নিঃশেষিত—ছেলের মায়ের গায়ের গয়নাগুলিও একে একে লয়প্রাপ্ত। এখন অবলম্বনের মধ্যে শুধু দেনা আর ধার। শৈলেন অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকে ডাক্তারের মুখের দিকে। ডাক্তার নির্বিকার চিত্তে তখনও লিখে চলেছেন প্রেসক্রিপসশন: অ্যাড অ্যাকোয়া ডিস্টিল টু মেক এইট আউন্স—

শেষ পর্যন্ত রোগ ধরা পড়ে বাষট্টি দিন পর। তবে ডাক্তার এস. পি. দাসের সিস্টেমেটিক চিকিৎসায় নয়—ডাক্তার পি. গাঙ্গুলীর অভিজ্ঞতায়। ডাক্তার দাস ফিরিস্তি দিয়ে যান নিজের কৃতিত্বের। সিস্টেমেটিক চিকিৎসাই তিনি করে এসেছেন বরাবর, গলদ রাখেন নি কোথাও। রক্ত, থুতু, মল-মূত্র থেকে শুরু করে ফটোর পর ফটো তুলিয়েছেন রোগীর। 'ন'-কারন্ত কোন ওষুধই বাদ দেন নি আজ পর্যন্ত। পেনিসিলিন দিয়ে শুরু আর অরোমাইসিন, স্টেপটোমাইসিন, কেমোমাইসি শেষ।

ফিরিস্তির বহর শুনে ভড়কে যান ডাক্তার গাঙ্গু কিছুক্ষণ বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থাকেন ডাক্তার দা মুখের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, আপনার কারন্তের মধ্যে ইনসুলিনও তো পড়ে। তাও দিয়ে নাকি রোগীকে?

আজ্ঞে না। ওইটেই বাদ রেখেছি কেবল। সেপারেশন করে নিয়েছিলাম আগে থেকেই কিনা। ও গ্রুপে পড়ে না।

সদ্বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু রোগীকে খে দিয়েছেন কী?

সেদিক দিয়েও খুব টাইট দিয়েছি সার্। দাঁত দি কুটোটি কাটতে দিই নি একেবারে। লিকুইড ডায়েট- স্রেফ লিকুইড। যত পার জল খাও। কলের জ ডাবের জল, ছানার জল, মিছরির জল—

স্রেফ জল! এই বাষট্টি দিন শুধুই জল!—ডাক্ত গাঙ্গুলী থ হয়ে যান। তাঁর হাতের স্টেথিসকোপ হাতে ধরা থাকে।

তবে তো রোগকে কায়দা করতে পেরেছি সা এক শো তিন সাড়ে তিন টেম্পারেচার থেকে জ্বর এ ঘুরঘুর করছে নিরেনব্বুই একশোর মধ্যে।

ডাক্তার গাঙ্গুলী মুখ ফিরিয়ে নেন। বিরক্তি ফু ওঠে তাঁর সারা চোখে-মুখে। শৈলেনকে লক্ষ্য করে বলে ছেলের আসল রোগ যা তা মরে ভূত হয়ে গেছে কবে এখন ধরেছে নকল রোগে।

নকল রোগে!

শৈলেন চমকে ওঠে।

ভয় পাবেন না। বাষট্টি দিন না খেয়ে আপনার ছে যে বেঁচে আছে আজও, তা আপনার ভাগ্য। যে জ্বর দেখছেন ওটা আসল জ্বর নয়। ওটাকে আমরা বলে থা স্টারভেশন ফিভার—না খেয়ে খেয়ে জ্বর। খেতে দিলে এ জ্বর সারবে না। খেতে দিন, এ জ্বর সেরে যাবে

আর ওষুধ?

শৈলেন প্রশ্ন করে একটু ইতস্ততঃ করে।

ওষুধ!—ডাক্তার গাঙ্গুলী হাসেন: আরও এ

খাওয়াতে চান ছেলেকে! পেটে ওষুধের গাছ বেরুবে যে! যা ওষুধ খেয়েছে, সারাজীবন আর ওষুধ না খেলেও স্বচ্ছন্দে ওর চলে যাবে। ওষুধের পেছনে অনর্থক অপব্যয় না করে কিছুটা খাওয়ার পেছনে খরচ করুন, দুদিনেই সেরে যাবে।

ডাক্তার গাঙুলী উঠে দাঁড়ান। পিছু পিছু উঠে আসেন ডাক্তার দাস মুখ চুন করে। বলেন, আমিও ঠিক ওই কথাই ভাবছিলাম স্যার্, খেতে দেব কি না, কিন্তু সাহস পাই নি।

ডাক্তার গাঙুলী আর রাগ চাপতে পারলেন না। একটু শ্লেষভরেই বলে উঠলেন, মানুষের সেবা করা আমাদের ব্যবসায়ের অঙ্গ। কিন্তু আজ কোথায় আমরা নেমে এসেছি বলুন তো ডাক্তার দাস? মারোয়াড়ীকেও হার মানিয়েছি ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে। চক্ষুলজ্জার বালাই তো রাখি নি, চোখের পর্দাটাকেও কাটতে শুরু করেছি একটু একটু করে।

বলতে বলতে তিনি নেমে গেলেন একটু দ্রুত পদেই।

দিন চারেক পর রোগী বিজ্বর হয়ে ওঠে। নিরাভরণ মা তার শাঁখাসার হাত দুখানি বাড়িয়ে রক্তহীন বিবর্ণ ছেলেকে টেনে নেয় বুকের ওপর—মুখে তার পরিতৃপ্তির হাসি। আর নিঃসম্বল বাবা শূন্য পকেটে হাত দুটি ঢুকিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। দু চোখে হতাশার দৃষ্টি।

নব মেঘদূত

শ্রীশান্তি পাল

ভিজা এলোচুলে নী-রবি উষার কুহেলী-ছায়
এলে পথ ভুলে কি শুভখণে।
শ্রাবণের বেলা কোথা দিয়া আজি বহিয়া যায়—
নাহি জানি অয়ি সুলক্ষণে!
সারাদিন তুমি র'লে বসি মোর বুকের কাছে
শুনাইলে মোরে যত গান তব কণ্ঠে আছে,
আমার ব্যথার লঘু করি ভার এ বরষায়,
স্বপন বুলালে নয়ন-কোণে।
তোমার হাসির চারিমাটুকুরে কি ভরসায়
ফুটালে এ ঠোঁটে সঙ্গোপনে!

তুমি কি আছিলে তুষার-ধবল হিমানী-চূড়ে
অলকাপুরীর জোৎিংশালে?
জানিতে না বুঝি দণ্ডিত পতি কোথায় দূরে
ঘোর বিরহের অরণি জ্বালে!
ভূর্জ নমেরু দেবদারু নাগকেশর-বনে
যে বায়ু ছুটিয়া ফিরিত নিয়ত বিধুর স্বনে,
শৈল-প্রপাতে যে ব্যথা ঝরিত কাফীর সুরে
তাহা কি কাঁদাত অন্তরালে?
কনক-কেয়ূর হীরকের হার ফেলিতে ছুঁড়ে,
কালিমা নামিত তোমার ভালে!

পূর্ব মেঘ কি বিন্ধ্যারণ্যে হারাল দিশা?
হৃষীকেশে এসে পড়িল গলে?
উত্তর মেঘ নীলকণ্ঠে কি যাপিল নিশা,
প্রাতে নন্দায় গেল কি চলে?

রামগিরি-গাথা পৌঁছে নি বুঝি তোমার পাশে?
চাও নি কি কভু নব প্রাবৃটের অসিতাকাশে?
যুবা যক্ষের বক্ষের লিপি বেদনা-মিশা—
লেখে নি দামিনী তাহার কোলে?
নীলগিরিগামী বলাকানিকর তোমার তৃষা
নেয় নি কি গেঁথে কাকলি-রোলে?

এক বরষের প্রতীক্ষা-মাঝে অধীরচিতে
বাহিরিলে প্রিয়-অন্বেষণে।
অলকানন্দা বিলোল-ছন্দা উর্মিগীতে
এল বহুদূর তোমার সনে।
তারপর তব চরণ চলিল দখিন-পানে,
পথ না ফুরায়, বেলা কেটে যায় অসহ টানে,
কোথা রামগিরি, কোথা বল্লভ—চারিটি ভিতে
শুধায়ে বেড়াও সকল জনে।
শাপ-মোচান্ত যক্ষভ্রান্ত অলক্ষিতে
একাকী ফিরিছে ক্ষুণ্ণ-মনে।

নাহি আজি তার যৌবন-মদ-বিবশ আঁখি,
শীর্ণ কপোলে নেমেছে জরা।
আশার কুহকে তোমার বয়স রেখেছে ঢাকি,
তুমি বরতনু বিম্বাধরা।
যক্ষেরে কভু হেরি নি চক্ষে, পেয়েছি তার
বিরহের কথা, প্রেয়সী-পরশ একটি বার;
দেখা পেলে তার মোর দ্বারদেশে, আনিব ডাকি,
কুটিরে দুটিরে মিলাই ত্বরা।
যৌবনটুকু দিয়ে যাই তারে, শিরেতে রাখি
অভিশাপ রাশি অশ্রু-ভরা!

রবীন্দ্র-উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়

সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসাবলীর তিনটি সুস্পষ্ট বিভাগ দেখা যায়। প্রথম যুগের ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সপ্রধান উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'মুকুট', 'রাজর্ষি'। দ্বিতীয় যুগের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাপ্রধান উপন্যাস 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'। তৃতীয় যুগে পড়ে বিবিধ সমস্যাকণ্টকিত অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রধান উপন্যাস 'ঘরে বাইরে', 'চতুরঙ্গ, 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুই বোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়'।

প্রথম যুগের উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রভাব ভাষায় ও বিষয়বস্তু নির্ধারণে প্রতীয়মান। দ্বিতীয় যুগে ভাষায় এবং উপন্যাসের আঙ্গিকে বঙ্কিমের আদর্শ আংশিকভাবে বিদ্যমান মনে হয়। তৃতীয় যুগে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও অনন্যসাধারণ।

বঙ্কিমের উপন্যাসে ইতিহাস নানা ভাবে মালমসলা যুগিয়েছে। খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস সংখ্যায় মাত্র একটি হলেও ইতিহাসের নানা ঘটনা রোমান্সের রঙে উজ্জ্বল হয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনাকে চিত্তাকর্ষক করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ১২৯০, 'মুকুট' ১২৯২, 'রাজর্ষি' ১২৯৩ সালে রচিত হয়। উপন্যাস তিনটির রচনার পূর্বে 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' ছাড়া বঙ্কিমের সকল উপন্যাসই রচিত হয়। প্রথম যুগের রচনায় বঙ্কিমের অনুসরণ সুস্পষ্ট হলেও চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় যুগের রচনায় উপন্যাসের একটি সুর-পরিবর্তন সুন্দর ভাবে লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসের ঘটনা-প্রাধান্য মানসিক দ্বন্দ্ব-প্রাধান্যে পরিণত হয়েছে। সব সাহিত্যেই উপন্যাসের প্রথম যুগে ঘটনাশ্রয়ী গল্পেরই প্রাধান্য। কোনও একটি জিনিস প্রথমে আকৃষ্ট করে তার বাইরের চাকচিক্য দেখিয়েই। ভিতরে প্রবেশ ঘটে অনেক পরে। বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের স্রষ্টা। তাঁর উপন্যাস ঘটনা-প্রধান, গল্প-প্রধান। গল্পের মধ্যে একটু মিথ্যার প্রলেপ থাকে, একটু চমকে দেওয়ার ভাব অসঙ্গত নয়। গল্পের চরিত্র ঘটনার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষ ঘটনার দাস হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে মানুষের হৃদয়কে সব সময়ে টানা যায় না। প্রথম ক্ষুধার মুহূর্তে গোগ্রাসে কয়েক মুঠো গেলা যায়, তারপর তরকারির বিচিত্র স্বাদ গ্রহণে ইচ্ছা হয়। ঘটনাশ্রয়ী গল্পরসও মানবচিত্তকে বেশীক্ষণ আঁকড়ে রাখতে পারে না। তার মধ্যে জ্ঞানরস কিংবা মানবরস ঢোকানোর প্রয়োজন হয়। মহাভারতে প্রথমটির সন্ধান পাই। আধুনিক উপন্যাসকার শেষেরটিকে বেছে নিলেন।

মানবজীবনকে সামনে রেখে উপন্যাসকার ঘটনার জাল বুনতে লাগলেন। উদ্দেশ্য তাঁর চরিত্রসৃষ্টি—যে চরিত্র মানব-জীবনের কাছাকাছি। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে চরিত্রকে গড়তে লাগলেন। সাধু হয়ে উঠল লম্পট, লম্পট তার অসাধুতার খোলস খসিয়ে ফেলতে লাগল। চরিত্রের ক্রমপরিণতি দেখানোই উপন্যাসকারের লক্ষ্য হল। এতে খানিকটা কৃত্রিমতার ভাব থাকেই। গল্প জমে ভালই—লেখক ভাল গল্পকার হলে। কিন্তু জীবন তার স্বচ্ছন্দ গতিতে চলে না, জীবনের পরিণতি পূর্বেই লেখকের মনে ছকা থাকে। সেই ছক অনুসারে ঘটনার ঘুঁটি ফেলে লেখনী। বঙ্কিমের উপন্যাসে এই জাতীয় ঘটনাপ্রাধান্য দেখা যায়। প্রত্যেকটি উপন্যাসই এক-একটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে। চরিত্রটি এক থেকে আর একে পরিণত হয়। যে সব ঘটনা এই পরিণতির জন্য দায়ী, অনেক সময় সেগুলি পরিণতির চমক সৃষ্টির জন্য ঘটনার সুসঙ্গতি বিনাশ করে। রোহিণীর পরিণতি এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় যুগের উপন্যাসে এই ঔপন্যাসিক কাঠামোটি নিয়েছেন ও বঙ্কিমের ভাষার সাধু ছাঁদটি গ্রহণ করেছেন। তবে বঙ্কিমের ও রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষার ছাঁদেও পার্থক্য বিস্তর। প্রথম মিল নজরে পড়ে ক্রিয়ার সাধুরূপে। ক্রিয়ার সাধুরূপ বাদ দিলে বঙ্কিমের সাধুতা তৎসমবাহুল্যে, রবীন্দ্রনাথের সাধুভাষার মধ্যে সুরুচিসম্পন্ন সরলতার প্রাধান্য। অল্প কথায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষার

সাধুরূপ চোখেই পড়ে না, তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক হয়ে লেগে আছে।

চারিত্রিক ক্রমপরিণতির বৈশিষ্ট্যে কিন্তু বঙ্কিমপ্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেভাবেই হোক সুবোধ মহিম লম্পটে পরিণত হয়েছে, নিরাসক্ত বিহারীর আসক্তি প্রকাশ পেয়েছে, বিনোদিনী সাধ্বী বিধবা থেকে রোহিণীর পরবর্তী ও কিরণময়ীর পূর্ববর্তী রূপ গ্রহণ করেছে, ব্যক্তিত্বহীন আশা ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

'নৌকাডুবি' উপন্যাসে চরিত্রের এই পরিণতির রূপটি তেমন সুস্পষ্ট নয়। ঘটনাই এখানে প্রধান। ঘটনাই এখানে পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে। আলোর পশ্চাতে আলোকবাহীর মত ঘটনার পশ্চাতে চরিত্রগুলি। আলোর রেখা সামনের দিকে, বাহকের মুখ উদ্ভাসিত করছে না। 'চোখের বালিতে' চরিত্র সংখ্যায় কম, ঘটনা আরও কম। এই স্বল্পসংখ্যক চরিত্র সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে নব পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। 'নৌকাডুবি'তে চরিত্র খুব বেশী নয়, তবে ঘটনা অত্যন্ত বেশী। চরিত্র পরিণতির কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়ার সুযোগ পায় নি। রবীন্দ্রনাথের এই একমাত্র দুর্বল উপন্যাস। চরিত্র ও ঘটনার সামঞ্জস্যসাধনে এ না হয়েছে বঙ্কিমোচিত, না পেয়েছে রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য।

'গোরার' চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে চরিত্র অসংখ্য, ঘটনা সংখ্যাতীত। তবে সব চরিত্রের বিশেষ করে প্রধান চরিত্রগুলির পরিণতিতে বঙ্কিম-অনুসৃত আদর্শ লক্ষ্য করা যায়। গোরার ব্রাহ্মণগৌরব ধীরে ধীরে ঘুচে এসেছে। বিনয়ের লজ্জা-সঙ্কোচ অল্পে অল্পে কেটে গেছে। ললিতা-সুচরিতার ব্রাহ্মগোঁড়ামী লোপ পেয়েছে। প্রেমিক পানুবাবু পামর পানুতে রূপান্তরিত হয়েছে। শুদ্ধশীলা হরিভামিনীর চিত্তে স্বার্থবিষ দংশন করেছে। ঘটনা ও চরিত্রের সামঞ্জস্যসাধনেও রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রত্যেকটি ঘটনা চরিত্রকে এগিয়ে নিয়ে যায়, প্রত্যেকটি চরিত্র ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। 'গোরা'য় চরিত্র ও ঘটনাবাহুল্য আর একটি কারণে স্মরণীয়। শেষবারের মত ঘটনা ও চরিত্রের এখানে লেখক ছড়াছড়ি করেছেন। অনেকটা দীপ নেভার পূর্বে জ্বলে ওঠার মত। এর পরে ঘটনা ও চরিত্র নিতান্তই পরিমিত হয়ে এসেছে।

বাহ্যিক পরিণতিগত বৈশিষ্ট্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে ছাড়াতে পারেন নি সত্য তবুও রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য এর মধ্যেও পরিস্ফুট। বঙ্কিম উপন্যাসে তাঁর সব প্রতিভার সঞ্চয় নিঃশেষে উজাড় করে ঢেলে দেন তাঁর প্রধান চরিত্রগুলির নির্মিতিতে। প্রধান চরিত্রগুলিই সব। ঘটনার সব লক্ষ্য তাদেরই দিকে। পার্শ্বচরিত্রগুলি টাইপমাত্র। প্রধানকে ফোটানোই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাদেরও যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, তারাও সাধারণ বাস্তব চারিত্রি মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, বঙ্কিমের উপন্যাসে ত পরিচয় মেলে না। রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বচরিত্রগুলিও চরিত্র তাদেরও পরিণতির একটা ইঙ্গিত তাঁর রচনায় মেলে বঙ্কিমের পার্শ্বচরিত্রসৃষ্টি বৈচিত্র্যসৃষ্টির জন্য, তারা সমাে এক-একটি দিকে অঙ্গুলিমাত্র নির্দেশ করে। রবীন্দ্রনাে পার্শ্বচরিত্র মূল ঘটনাস্রোতের সঙ্গে অবলীলাক্রমে মি যায়। শুধু ঘটনাসৃষ্টির জন্য তাদের সৃষ্টি নয়।

এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম দুটি পর্যায়ের উপন্য বঙ্কিমের সঙ্গে মিলই শুধু দেখানো হল। এই দুটি পর্যা প্রথমটিকে ঘটনাপ্রধান ও দ্বিতীয়টিকে চরিত্রপ্রধান বিভ বলা যায়। এই দ্বিতীয় বিভাগ থেকেই মিল সম রবীন্দ্রনাথের স্বাধীন সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়ও ফুটে উঠ থাকে। এই দ্বিতীয় পর্যায়টিই আসলে আধুনিক বাং উপন্যাসের প্রথম পর্যায়। এখন এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যটি দেখা যাক।

দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাস থেকেই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যা শুরু। ঘটনাপ্রধান উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের স্থান যে নগ তা বলাই বাহুল্য। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসই এর একম পীঠস্থান। বঙ্কিম সকল পর্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ দ্বি পর্যায় পর্যন্ত চরিত্রপ্রধান উপন্যাস লিখেছেন। অথচ দ্বিতীয় পর্যায় থেকেই উপন্যাসের এমন একটি বৈশিষ্ট্যে প্রথম সূচনা দেখা গেল, বঙ্কিমের চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে য সন্ধান মেলে নি।

মনের কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে, যে কামনাবাসনা, সন্দেহ, ঈর্ষা, প্রেমপ্রীতি প্রভৃতি। প্রত্যে চরিত্রে অল্পবিস্তর এই গুণগুলি থাকে। সাধা চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে থাকে, মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রপ্র উপন্যাসেও থাকে। রোহিণীর রূপতৃষ্ণা যৌবনতৃ ঠিক বিনোদিনীরই মত। গোবিন্দলাল মহিম অপে কম ঈর্ষাপরায়ণ নয়। ভ্রমর অপেক্ষা আশা কম সাধ্বী ন অথচ এদেরই কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রপ্রধান উপন্যা চরিত্র, কতকগুলি শুধু চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের। সুত মনের বৈশিষ্ট্য থাকলেই মনস্তাত্ত্বিক সৃষ্টি হয় না। সভ মানুষকে নিয়ে কারবার করলে মনের বৈশিষ্ট্য থাকে অথচ তা সঙ্গে সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস না হতেও পারে।

পূর্বেই দেখা গেছে চরিত্রপ্রধান উপন্যাস উদ্দেশ্যমূ এবং কাজেই কৃত্রিমতাদুষ্ট। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে লে চরিত্রগঠনে মনের সব বৈশিষ্ট্যগুলিই নেন, তবে তা মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্যকে নিয়ামকরূপে গ্রহণ করে সেক্সপীয়রের নাটকের আদর্শের সঙ্গে এখানে মিল ে যায়। যার কামনা বেশী, সে কামনার আগুনে নিজে ও অন্য সবাইকে পোড়াবে। তার অন্য সব গুণই অ যেমন সাধারণ মানুষের থাকে। একটি গুণ সর্বপ্র

সেই গুণটির সৃষ্টি, বিকাশ ও পরিণতি দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য। গোবিন্দলালের সব ছিল, শুধু রূপতৃষ্ণা মেটে নি। সকলেরই এ রূপতৃষ্ণা থাকে। গোবিন্দলালের সব গুণের মধ্যে এইটি আকাশভেদী, এইটিই তার পরিণতির সৃষ্টি করে। চরিত্রপ্রধান উপন্যাসে এই প্রধান গুণটি অনেকক্ষেত্রেই নির্দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে। সে তার চরিত্রকে, তার পরিণতিকে এই গুণ দিয়েই গড়ে তোলে।

মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে এ রকম একটি গুণের বাড়াবাড়ি দেখানো হয় না। মনকে এখানে সাধারণ মানুষের মনের স্তরে নামিয়ে এনে বাস্তবপ্রধান করে তোলা হয়। সাধারণ মানুষ রূপতৃষ্ণায় পাগল হয়ে বেড়ায় না। দু-একজন যারা এই স্বাতন্ত্র্য পায়, তারা অসাধারণ; তাদের নিয়ে ঘরের অভাব মেটে না। উপন্যাসের পরিণতির একটা যুগে মানুষ এই অভাব বোধ করে। উপন্যাসে তখনই মনস্তত্ত্বের আমদানি হয়। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে কোন গুণই বড় নয় অথচ অনেক গুণই সক্রিয়। একটি গুণ আকাশ-ছোঁয়া মাথা নিয়ে হাজির হলে তার সঙ্গে মনের অন্য গুণের সংঘাতের প্রশ্নই ওঠে না। সে তখন নিয়তি-নির্ভর হয়ে পড়ে। নিয়তিই তখন তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকা গ্রহণ করে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে নিয়তির সাক্ষাৎ মেলে না। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রধান। নিজেরই গুণগুলির মধ্যে নিয়ত সংঘাত বাধে। রোহিণীর বৈধব্যশুষ্ক মনকে লেখক যেদিকে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন, সে সেদিকেই ছুটে চলেছে। তার গতির পথে বাধা এসেছে বাইরে থেকে। ভ্রমরের বাধা, সমাজের বাধা। সর্বশেষ বাধা গোবিন্দলাল। গোবিন্দলালের পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে সে অনুভব করেছে তার আত্মতৃপ্তিসন্ধানী জীবনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে গোবিন্দলাল।

বিনোদিনীর কিন্তু এই পরিণতি হয় নি। সে প্রথমে কৌতূহলী, পরে ঈর্ষান্বিত, তারপরে বিদ্বিষ্ট হয়ে ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছে। অথচ মনে জানে, পা তাকে যে পথে নিয়ে চলেছে, মন তাকে সেদিকে ঠেলছে না। সে মহিমকে ডোবাচ্ছে আশার সর্বনাশের জন্য, সে আশার সর্বনাশ করছে বিহারীকে কষ্ট দেওয়ার জন্য। সে চায় বিহারীকে, অথচ মহিম তাকে গ্রাস করতে আসছে। সে মহিমকে ঠেলছে না অথচ বিহারীকে ছাড়ছে না। মনের কি জটিল আবর্ত রচিত হয়েছে! তার একদিকে রয়েছে নারী-সুলভ চপল মনোবৃত্তি এবং যৌবনচেতনা, অন্যদিকে ঈর্ষা, আর একদিকে প্রণয়। তার প্রণয়ও কী অপূর্ব! বিধবা রোহিণীর প্রণয়ের সঙ্গে লালসা, আত্মসর্বস্বতা জড়িত। বিনোদিনীর প্রণয়ের মধ্যে তপস্যার স্নিগ্ধতা বিরাজমান। সে অন্তরে বাইরে দ্বন্দ্ব করে চলেছে। সে যা পাচ্ছে, তা চায় না; যা চাইছে, তা পাচ্ছে না। অথচ এরই জন্য অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছে। মহিমের মত ধনীরা তখন একাধিক উপপত্নী রাখতে গর্ববোধ করত। অথচ এখানে সে প্রশ্নই ওঠে নি। এখানে নারী তার দৃপ্ত আত্মমর্যাদায়, সুস্থ স্বাভাবিকতায় ফুটে উঠেছে।

বিনোদিনীর সব কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। তার অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু চাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বেই পরিসমাপ্ত নয়। তার দ্বন্দ্ব আরও গভীরে। যখন বিহারী তাকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হল তখন সে তার আর এক সত্তার সাক্ষাৎ পেল। এতকাল সে তার মনকে জানত না। সে বিহারীকেই একান্ত ভাবে চেয়ে এসেছে, অথচ যখন বিহারী নিজেই ধরা দিল তখন তাকে গ্রহণ করতে পারল না। বিনোদিনীর যে সত্তা এতকাল বিহারীকে চেয়ে এসেছে, তারই তল থেকে নতুনতর সত্তার আবির্ভাব ঘটল। নিজেই নিজের পথের বাধা হয়ে দাঁড়াল। অন্তর্দ্বন্দ্বের এমন শিল্প-সম্মত সমুন্নত বহিঃপ্রকাশ সচরাচর চোখে পড়ে না।

মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাসে মনের জটিলজাল একে একে খেই খুলে যায়। ঘটনা কিছুই নয়। ঘটনা তার নিয়মে বাইরে ঘটে চলে। মনের মধ্যেও আর এক গতির অস্তিত্ব সর্বত্র দৃশ্যমান। ছবি আঁকার জন্য কাগজের প্রয়োজন, কিন্তু বস্তুতঃ ছবির সঙ্গে কাগজের কোন সম্বন্ধই নেই। তেমনই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে ঘটনা। ঘটনা শুধু আশ্রয়-স্থল। সেই আশ্রয়ে মন আপনাকে আপনি গড়ে চলে। মনের নানা বৈচিত্র্য, তাদের চমকপ্রদ আবির্ভাব, মনের হাতেই শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসে এই মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সৃষ্টি করে বাংলা উপন্যাসের মোড় ফেরান।

তৃতীয় পর্যায়ের উপন্যাসে ভাষায়, ভঙ্গীতে, বিষয়বস্তুতে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলি সংখ্যায় সাতটি। উপন্যাসগুলির রচনাকাল ১৩২৩ সাল থেকে ১৩৪১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৩২৩এ 'ঘরে বাইরে' ও ১৩৪১এ 'চার অধ্যায়'। দুটিই রাজনীতিপ্রধান। আরম্ভ ও শেষ রাজনীতিতে। একটিতে অহিংস রাজনীতির জয়গান ও অপরটিতে সহিংস রাজনীতির ব্যর্থতা ঘোষিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে' ও ১৩৩৬ সালের 'যোগাযোগ' স্ফীতকায়। দুটিতেই জমিদারবাড়ির অন্তঃপুর চিত্রিত। অন্যগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসগুলি সব স্ফীতকায়, তৃতীয় পর্যায়ের এই কায়াল্পতা লক্ষণীয়।

এই পর্যায়ের সর্বপ্রথম লক্ষণীয় ভাষা। কী বর্ণনা, কী কথাবার্তা সর্বত্রই লেখক কথ্যভাষাকে গ্রহণ করেছেন, অথচ তা অসাধু ভাষা নয়। ভাষা সর্বত্র সাধু, কথ্য, অলঙ্কৃত, ব্যঞ্জনাপূর্ণ। ভাষাসৃষ্টির জাদুখেলা চলেছে সর্বত্র। মাঝে মাঝে লেখককেও ভাষার মোহে পেয়েছে। ভাষা বক্তব্যকে ছাড়িয়ে গেছে—যেমন 'ঘরে বাইরে' ও 'শেষের কবিতা'তে।

ভাষার ক্ষমতা কত বেশী, এই উপন্যাসগুলি না পড়লে বোঝা যায় না। বক্তব্য কিছু না বুঝে বা বুঝতে চেষ্টা না করেও উপন্যাসগুলি বার বার পড়া যায় শুধু ভাষার জন্য। ভাষার এই অজ্ঞানচেষ্টাকৃত সুষমা ও সমৃদ্ধি শেষ পর্যায়ের উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। মাঝে মাঝে মনে হয় যেন কবি ও কথাশিল্পীতে একটু সমন্বয় হয়েছে এখানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিতরণী নিয়ে বিবিধ খাতে যাত্রা শুরু করেন যৌবনের প্রারম্ভেই। তাঁর শেষ পর্যায়ের এই গদ্যকাহিনীগুলিতে মনে হয় যেন সাগরসঙ্গম হয়েছে সব স্রোতের। ছোটগল্পের রবীন্দ্রনাথ, কাব্যের রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক প্রবন্ধের রবীন্দ্রনাথ, সঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ সবাই এসে যেন এখানে মিলেছেন।

এই পর্যায়ের অনেকগুলি রচনাতেই লেখক চরিত্রকে দিয়ে আত্মকথা বলিয়েছেন। মানুষের মনকে এভাবে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। পাঠক যেন লেখকের চোখ দিয়ে দেখে না, চরিত্রই পাঠকের সামনে আপন অন্তরদ্বার উন্মোচিত করে। যেখানে আত্মকাহিনী নয়, সেখানেও কাহিনীই কথাপ্রধান—অনেকটা নাটকের মত। একমাত্র 'যোগাযোগ' ছাড়া কোথাও লেখকের নিজের মুখে চরিত্রের কথা বলার প্রয়াস বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। ফল হয়েছে, অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি চরিত্রের মুখে শোনানোর জন্য তাড়াতাড়ি তারা হৃদয় স্পর্শ করে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসকে সর্বশেষ স্তরে না হলেও সেই পথে অনেকখানি অগ্রসর করে দিয়েছে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের শেষস্তরে অবচেতন মনের পরিচয় বিধৃত। সেখানে মানুষ মনের কথা বলে না, মনই মনের কথা বলে যায়। সাধারণ চরিত্রপ্রধান উপন্যাস ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে একটি সাজানো-গোছানো, কাটছাঁটের ভাব থাকে। অবচেতন-মানসপ্রধান উপন্যাসে কোনরকম বাছাবাছির বালাই নেই। মনের মুকুরে যখনই যা ধরা পড়ে পাঠক সঙ্গে সঙ্গে তার স্বাদ গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে অবচেতনমানসের পরিচয় পাওয়া না গেলেও আত্মকাহিনী প্রাধান্যে সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসকে ছাড়িয়ে আসার চেষ্টা দেখা যায়।

চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের চারিত্রিক ক্রমপরিণতি একটি বৈশিষ্ট্য। শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে চরিত্রসৃষ্টি করা লক্ষ্য নয়। চরিত্রের ক্রমপরিণতির পরিচয় সূক্ষ্মভাবে কোথাও কোথাও থেকে গেছে, গুছিয়ে প্রকাশ পায় নি। মনে হয়, নিয়মিত চলার পথে চলতে চলতে হঠাৎ যেন আত্ম-সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে একটু পাশে সরে দাঁড়ানো। এই পাশ-কাটানোর ওপরেই আলোর তীব্র জ্যোতি পড়েছে। তারপর কোন্ এক সময়ে পথিক আবার পূর্বপথ খুঁ পেল, পাঠক হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রূপান্তর বা ন সৃষ্টি করার ঝোঁক বিশেষ কোথাও নেই। যেখানে আছে সেখানেও তা সার্থক হয় নি। কুমুদিনী-মধুসূদন জোড়াতালি দিয়ে মেলাতে হয়েছে, অমিতের পরিব আকস্মিকতাদুষ্ট। অন্যত্র পথভ্রান্তি। মনের এব সাময়িক দিক্‌পরিবর্তনের কাহিনী। ছোটগল্পের স এদিকে খানিকটা মিল আছে। তবে অন্তর্দ্ব বাড়াবাড়ি, নানা ঘটনার দাপাদাপি এগুলিকে উপন্যা পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। সমগ্রজীবনের চিত্র অবচে মানসপ্রধান উপন্যাসে মেলে না। রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ের উপন্যাসে এই স্তরের দিকে ক্রম-অগ্রসরের তাই সুস্পষ্ট।

শেষ পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে নিছক প্রেমের কাহি নেই বললেই চলে। 'শেষের কবিতা' এই পর্যায়ের একম প্রেমের কাহিনী এবং তা জলো। এতকাল উপন্য প্রেমের কাহিনীই বর্ণিত হত। প্রেম নিয়েই যত দ্ব মানুষের সুস্থ, সমস্যাহীন জীবনে এ প্রেমের একটা বি স্থান আছে। বিংশ শতাব্দীর কর্মচঞ্চল মানবজীবনে জটিল মানবমনের একটি গ্রন্থিমাত্র। একে নিয়ে কল্প বিলাস করলে আর চলে না। তাই 'শেষের কবি সার্থক হতে পারে নি।

মানুষের দৈনন্দিন ঘরসংসারের অতিপরিচিত এ হৃদয়বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈর্ষা। ঈর্ষা প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে চ কিন্তু ঈর্ষাই প্রেম নয়, প্রেমের বিকৃতি। এই ঈর্ষা বিভিন্ন প্রকাশ দেখি 'দুই বোন,' 'মালঞ্চ' ও 'যোগাযোগে 'চার অধ্যায়ে' ও 'চতুরঙ্গে' প্রেমের প্রকাশ একটু বি পরিবেশে ও পদ্ধতিতে ঘটেছে। অবস্থার বিপাকে কিভাবে করুণ ও মধুর হয়ে ফুটতে পারে, 'চার অধ্যা তারই পরিচয় পেলাম। চতুরঙ্গের আবেদন স আদর্শগত। 'ঘরে বাইরে'তে একটি নারীর স্বাভাবিক স্ব ঘটিয়েছে প্রেমের ছদ্মবেশে হৃদয়েরই অন্য একটি বৃ একক প্রেমের পরিবর্তে প্রেমের নানা বৈচিত্র্য অন্যান্য হৃদয়বৃত্তির বর্ণনায় এই পর্যায়ের উপন্যাসগু বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসের পাশাপা তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে না পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। শেষের উপন্যাসগুলি স্পষ্টতঃই সমসাময়িক উপন্যাসের থেকে পার্থক্য লক্ষ্য ক যায়। এই পার্থক্যেই রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, রবী উপন্যাসের ক্রমপরিণতির ধারায় সুসঙ্গতিও রক্ষিত হয়ে

গ্রন্থ-পরিচয়

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। ১২॥০।

পরিষৎ-প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ বাংলা-রচনাবলীর দ্বিতীয় সংস্করণ অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে প্রকাশিত হওয়াতে প্রমাণ হইতেছে, প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রতি বাঙালীর অনুরাগ বাড়িয়াছে। নূতন সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি চিঠিপত্র ও একটি প্রবন্ধাংশের সংযোজন উল্লেখযোগ্য।

কেশবচন্দ্র সেন : শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। পরিষৎ-সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৯৭ সংখ্যা। ১৲।

অল্প পরিসরের মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনী এবং বাংলা-সাহিত্যে সমাজ-সংস্কারে ও ধর্মান্দোলনে তাঁহার দান অতি নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। যোগেশবাবু বহু পরিশ্রমে এবং নববিধান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বইখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছেন। শেষে ১০১ হইতে ১২৮ পৃষ্ঠার মধ্যে কেশবচন্দ্রের বিবিধ রচনার নিদর্শন দেওয়াতে কেশবচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার কিছু পরিচয় পাঠক পাইবেন।

ছিন্নপত্র : রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। ৪৲।

রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি রবীন্দ্র-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ, এই বিশিষ্টের মধ্যে ১৩১৯ সালে প্রকাশিত 'ছিন্নপত্রে'র স্থান বিশিষ্টতম। গ্রন্থশেষে "গ্রন্থ-পরিচয়" দেওয়াতে বর্তমান সংস্করণের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

স্বরবিতান : ৫২-৫৬ পাঁচ খণ্ড, বিশ্বভারতী। ২॥০, ২॥০, ৩৲, ২॥০ ও ৩৲।

রবীন্দ্রনাথের গানের এই স্বরলিপিগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তাঁহার সুরের এই পাকা দলিলগুলি রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের অনেক আসুরিক বিপদ নিবারণ করিয়া যাইতেছেন, এইজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। ৫২ সংখ্যায় 'অচলায়তন' ও 'মুক্তধারা' নাটকের ২৬টি গান ও শেষ চার খণ্ডে ২০+১৯+২০+২৮=মোট ৮৭টি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গানের স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। স্বরলিপিকার ইন্দিরা দেবী-প্রমুখ রবীন্দ্রসঙ্গীতবেত্তারা।

গীতবিতান : তৃতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। ৫৲।

তৃতীয় খণ্ডের এই সংশোধিত সংস্করণটিতে অনেক বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হইয়াছে—৬৮ পৃষ্ঠাব্যাপী "জ্ঞাতব্য-পঞ্জী" গ্রন্থশেষে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে কুতূহলী পাঠকের বিশেষ লাভ হইয়াছে।

নব জ্ঞান-ভারতী : শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। ২০৲।

বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য ভৌগোলিক অভিধান এই প্রথম। প্রবীণ সংকলয়িতা বহু যত্নে ও পরিশ্রমে প্রায় ছয় হাজার বিষয়ের উপকরণ সংকলন করিয়া প্রয়োজনীয় কথাগুলি সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের শিক্ষায় ও মানসিকতায় আমরা ভূগোলকে উপযুক্ত মর্যাদা দিই না, ফলে ব্যবসায়ে বাণিজ্যে দুঃসাহসিক অভিযানে আমরা পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির পশ্চাতে পড়িয়া আছি। এই 'জ্ঞান-ভারতী' যদি ভূগোলের প্রতি আমাদিগকে আকৃষ্ট করে তাহা হইলেই গ্রন্থকার ও প্রকাশকের এই ব্যয়বহুল সাধুপ্রয়াস সার্থক হইবে।

পৌরাণিক অভিধান : শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৭৲।

জীবনীকোষ, সমর্থকোষ, বিবিধ বৃহৎ অভিধানে প্রদত্ত পৌরাণিককোষ বর্তমানে প্রায় সবগুলিই দুষ্প্রাপ্য। এই অবস্থায় এই সংক্ষিপ্ত চমৎকার পৌরাণিক অভিধানটি প্রকাশ করিয়া শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার একটি মহা সৎকার্য সম্পাদন করিলেন। জাতির ঐতিহ্য ও পুরাণ সম্বন্ধে পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন না করিলে সে জাতি সার্থক সাহিত্যও সৃষ্টি করিতে পারে না এবং পাঠকেরাও সাহিত্যের পূর্ণ মর্ম গ্রহণ করিতে পারে না। 'পৌরাণিক অভিধান'টি বাংলা দেশের সাহিত্যিকদের ও আনুষঙ্গিকভাবে সাধারণ পাঠকদেরও বিশেষ উপকার সাধন করিবে।

মহান ভারত ১ম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব। শ্রীভিক্ষু (ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য)। ভারতী-প্রকাশ, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১। ৭৷৹ ও ৭৷৹।

লেখকের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় বিবেচনা করিলে 'মহান ভারত'কে একটি মহৎ গ্রন্থ বলিতে হইবে। ভারতবর্ষ বলিতে আসলে কি বোঝায় এবং কিসের উপর ইহার গৌরব প্রতিষ্ঠিত 'মহান ভারতে' তাহাই বিশদভাবে শ্রদ্ধাপূর্ণচিত্তে বিবৃত হইয়াছে। ভারতবাসীর বিশেষতঃ হিন্দুমাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে মহান ও বিপুল ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী সে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা উচিত। বেদবেদাঙ্গ উপনিষৎ পুরাণ, ষড়্দর্শন, তন্ত্র, আয়ুর্বেদ ও ভারতীয় সাহিত্যের কথা এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ভাষা সরল ও সহজ, বর্ণনা চিত্তাকর্ষক, বিষয়-বস্তুর গুরুত্ব অসাধারণ। ইহা সত্যই দেশের ও দশের একটি কল্যাণকর গ্রন্থ।

ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিজীবনী : শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত। ক্যালকাটা বুক হাউস। ১২৲।

বাংলা সাহিত্যে ইহা একটি আকর গ্রন্থের স্থান অধিকার করিবে। ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সম্বাদ প্রভাকর' হইতেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগান সংগ্রাহকেরা যে সকল গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলি আজ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। 'বাংলা ভাষার লেখকে'র উপাদানও 'সম্বাদ প্রভাকর' হইতে সংগৃহীত। অথচ আজ পর্যন্ত কেহই কবিদের সম্বন্ধে একমাত্র অবলম্বন ঈশ্বর গুপ্ত লিখিত জীবনীগুলি একত্র করিয়া সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন নাই। প্রকাশ করা উচিত ছিল যেকালে 'সম্বাদ প্রভাকর' বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিত তখন। একমাত্র কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনীটি ঈশ্বর গুপ্তের কালে প্রকাশিত হইয়াছিল। আজ 'সম্বাদ প্রভাকর' দুষ্প্রাপ্যতম পত্রিকা, মাত্র দুই-একটি পাঠাগারে উহার খণ্ড খণ্ড ফাইল আছে। সবগুলি একত্র করিলেও বহু অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। ইহার মধ্য হইতে যে ভবতোষবাবু এই পরিমাণ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। হয়তো ঈশ্বর গুপ্তের একটি-আধটি রচনা আরও পরে আবিষ্কৃত হইবে। কিন্তু তাহাতে দত্ত মহাশয়ের [...] পরিশ্রমলব্ধ উপকরণের বিন্দুমাত্র মর্যাদাহানি ঘটিবে ন[া।] তিনি যাহা দিয়াছেন তাহাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহা[সে] অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

বাল্মীকি রামায়ণ—গদ্যে নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণা[ঙ্গ] সারানুবাদ : ৺শিশিরকুমার নিয়োগী অনূদিত। মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রী[ট,] কলিকাতা-১২। ১২৲।

ভূতপূর্ব পুস্তক-প্রকাশক বরদা এজেন্সীর স্বত্বাধিকা[রী] শিশিরকুমার নিয়োগী মহাশয় প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে [...] প্রকাশালয় হইতে মূল রামায়ণের এইরূপ একটি সংস্ক[রণ] প্রকাশে উদ্যোগী হইয়া কাজে হাত দিয়াছিলেন। ক[য়েক] ফর্মা ছাপাও হইয়াছিল। তাঁহার অনুবাদ পাঠে আ[মরা] তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। শ্রীমান অ[...] মুখোপাধ্যায় যে তাঁহার মৃত্যুর পরেও গ্রন্থটি প্রক[াশ] করিলেন, তাহাতে মৃতের আত্মা তৃপ্ত হইবে। ইদা[নীং] বাংলা দেশে পুস্তক-প্রকাশে যতগুলি মহৎ প্রচেষ্টা হইয়া[ছে] ইহা তাহার অন্যতম। বর্ধমান রাজবাটি, বঙ্গবা[সী,] হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য, এমন কি শ্রীঅমরেশ্বর ঠাকুর ও অন্[য] কয়েকজন পণ্ডিতকৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ বাজ[ারে] পাওয়া দুরূহ। শ্রীরাজশেখর বসু-কৃত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ[...] পাওয়া যায়। শিশিরকুমারের এই রামায়ণখানি সর্ব[...] বোধ্য সাধুভাষায় রচিত হওয়াতে বাংলা দেশের পূর্ব-প[শ্চিম] সর্বত্র সমান আদৃত হইবে। অনুবাদের গুণে ইহা বা[ংলা] ভাষার একটি সাহিত্য-গ্রন্থরূপেও গণ্য হইবে।

স.

রবীন্দ্রনাথের পূরবী ও রবীন্দ্রনাথের মহু[য়া] তিন টাকা ও পাঁচ টাকা। অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। শ[...] লাইব্রেরী, ১০বি কলেজ রো, কলিকাতা-৯।

'পূরবী' ও 'মহুয়া' রবীন্দ্রনাথের দুইটি প্রসিদ্ধ কা[ব্য]গ্রন্থ। কবিজীবনের উত্তর-অধ্যায়ের পরিণত মনন [ও] কল্পনার সার্থক ফলশ্রুতি বহন করে এ দুটি কাব্য স[...] রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশিষ্ট গৌরবে অনন্[য হয়ে] আছে। এর মধ্যে পূরবী বেলাশেষের গান, ম[হুয়া] প্রেমসাধনার কাব্য। প্রথমটিতে মৃত্যুচেতনার মে[...] এ মর্ত্য-সংসারের বৈচিত্র্যের লীলায় উপলব্ধি; অন্যটি

দেহবাসনাকে অস্বীকার না করেও ত্যাগে ও সংযমে দেহাতীত প্রেমে উত্তরণের কঠিন সাধনায় প্রেমিককে আহ্বান। মূর্ত ভাবনা অপেক্ষা বিমূর্ত ভাবনার লীলাই এ দুটি কাব্যে সমধিক প্রকট হয়েছে। সুতরাং, স্বভাবতঃই, এ দুটি কাব্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও গ্রন্থের প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও জটিল হতে বাধ্য। লক্ষ্য করে চমৎকৃত হলাম, কবি-সমালোচক শ্রীঅমিয়রতন মুখোপাধ্যায় তাঁর ওই-নামীয় আলোচনা-গ্রন্থ দুটিতে সেই দুরূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কাজটি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করেছেন। তাঁর এই দুই আলোচনা-গ্রন্থ উপযুক্ত মহলে সবিশেষ আদৃত হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

অমিয়রতনবাবুর রচনার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি স্বয়ং কবি ও ভাবুক, আর তাঁর এই কাব্যভাবনা ও ভাবুকতার ছাপ তাঁর রচনাদেহের উপর সুস্পষ্ট রেখায় মুদ্রিত। তিনি নিজে কবিমন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গহন কাব্যলোকে প্রবেশ করেছেন। ফলে তাঁর আলোচনা কোথাও শুষ্ক-নীরস ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ভাষ্যের স্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, তা তাঁর নিজস্ব সংবেদনশীলতা ও রসানুভূতিতে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-কাব্যের ব্যাখ্যা করতে করতে নিজেই তিনি এক সময় স্রষ্টা হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই স্রষ্টা-মনের পরিচয় বিশেষ করে মূর্ত হয়ে উঠেছে মহুয়া কাব্যের আলোচনায়। ভোগের প্রেম ও সাধনার প্রেমের পার্থক্যটি তিনি অনবদ্য ভাষায় ও ভঙ্গীতে পরিস্ফুট করে তুলেছেন। অমিয়রতনবাবুর মনোগঠনের মধ্যে একটি অধ্যাত্মরসপিপাসু দার্শনিক মন লুকিয়ে আছে। তবে abstration-এর দিকে একটু বেশী ঝোঁক লক্ষ্য করেছি। সেটি কিঞ্চিৎ প্রশমিত হলে মন্দ হয় না। কাব্য এবং কাব্যের আলোচনা যদি সমধর্মী হয়ে ওঠে তবে তার দ্বারা appreciation-এর কাজটি হয়তো সুচারুরূপে সিদ্ধ হয়, বিচার হয় না। অমিয়বাবু বিচার-মার্গের পথিক নন সেটি স্পষ্ট।

পূরবী কাব্যের ব্যাখ্যা করেছেন লেখক এইভাবে—মানুষের জীবনে আনন্দ ও বেদনানুভূতি মিলে যে অখণ্ড চেতনা, তাতে প্রেমের অমৃতত্ব যেমন সত্য, তেমনই মৃত্যুও সত্য। "মৃত্যুর অমোঘতা ও প্রেমের চিরন্তনতা—এই দুই তত্ত্বের অদ্বয় জীবনবোধই পূরবী কাব্যের ঐক্যতত্ত্ব।" অপর-পক্ষে মহুয়া 'মায়ালোকের কাব্য'। মহুয়ায় যে প্রেম কবি বর্ণনা করেছেন তাকে আলোচক "মহুয়া-প্রেম" আখ্যা দিয়েছেন। "সাধনস্বভাব এ প্রেমের চরিত্র। প্রেমাস্পদের মহিমাবিষ্কার এ-প্রেমের লীলাবিলাস। * * * মহুয়া এই প্রেমসাধকের কাব্য—'চিরন্তনী প্রেরণা'র উদ্বেজনা এর রস-সৌন্দর্যে। বস্তুতঃ যা হয়ে আছি তা নয়, প্রেমতঃ যা হতে চাইছি, তারই সংগীতমূর্ছনা মহুয়ায়।" আলোচকের এই রসসন্ধানী মনের পরিচয় প্রতি অনুচ্ছেদে সু-অভিব্যক্ত। রবীন্দ্র-কাব্যে সমালোচনায় অমিয়রতনবাবু রস-সমালোচন-রীতির একটি বিশিষ্ট নতুন পথ খুলে দিয়েছেন বলে আমরা মনে করি।

প্রাণগঙ্গা : শ্রীঅবিনাশ সাহা। প্রকাশ মহল, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

'প্রাণগঙ্গা' শ্রীঅবিনাশ সাহার একটি সুবৃহৎ উপন্যাস। গ্রন্থটিতে জলমাতৃক পূর্ববঙ্গের নদীর স্রোতে গজিয়ে ওঠা একটি চরকে আশ্রয় করে মানুষের ঘর বাঁধার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা অতি মনোজ্ঞ, ভাষার ছন্দে ছন্দে লেখকের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ শহুরে চোখে দেখা ও আঁকা গ্রামের চিত্র নয়, একেবারে খাঁটি একজন গ্রামজীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শিল্পীর পল্লীচিত্রায়ণ। অবিনাশবাবুর এটি প্রথম বৃহদায়তন বই, বৃহদায়তন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বইটির শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা তাঁর এই গ্রন্থরচনার সার্থকতা প্রতিপাদিত হয়েছে। গ্রামের ছবি আঁকায় তাঁর তুলি-কলম যে অনেক পেশাদার লিখিয়ের তুলিকলম অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য 'প্রাণগঙ্গা' উপন্যাসে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। চাষীদের জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। নদীর স্রোতোবাহিত পলিমাটির আস্তরণের উপর একটি চর কী করে ভেসে ওঠে এবং সেখানে কেমন করে ধীরে ধীরে উপনিবেশ গড়ে ওঠে তার একটি অন্তরঙ্গ ছবি উপন্যাসটিতে তুলে ধরা হয়েছে। হয়তো বর্ণনার মধ্যে কিছু খুঁটিনাটিপরায়ণতা আছে, কিন্তু সেটি ধর্তব্য নয় এ কারণে যে এ রকম একটি জীবনচিত্রণের সঙ্গে আমাদের পূর্ব-পরিচয় ছিল না—অন্ততঃ সাহিত্যে। কাজেই অধিকন্তুতে দোষ অর্শায় নি।

উপন্যাসটির আর একটি সম্পদ এর সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর বাণী। হিন্দু ও মুসলমানের পাশাপাশি সৌভ্রাত্রময় মিলিত জীবনের ছবি মনে দাগ কাটে। বর্তমানের এই তিক্ততার দিনে এ রকম একটি প্রীতি-প্রসন্ন আনন্দ-চিত্র বাস্তব সংসারে অপ্রাপণীয় হলেও মনের ভিতর নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে। এ রকম যদি সত্যিই হত তো কী সুখেরই না হত। আদর্শের কল্পনাটুকুও বলকারক।

চরফুটনগর চরের নাম। জমিদারের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে এই চরে বসতি গড়ে তুলল পদ্মার ভাঙনে বাস্তুচ্যুত দীনু বৈরাগী ও করিম ফকির। আজন্মের প্রতিবেশী দুই মিতা। দেখতে দেখতে চরের জনসংখ্যা বাড়তে লাগল। বেশ একটি ধনধান্যপূর্ণ সচ্ছল উপনিবেশের জন্ম হল। করিমের মেয়ের সঙ্গে গঞ্জের পলান ব্যাপারীর ছেলের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় দীনু-করিমের সৌখ্যের এলাকা বিস্তৃততর হল। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ আর কোথায় মেলে। জমিদারের শ্যেনদৃষ্টি পড়ল চরের উপর। তাঁর লোভের সহায় হল চরেরই এক মানুষ—দীনু বৈরাগীদের কথকতার আসরের রামকান্ত। সুখের পল্লীজীবনে ভাঙন ধরল। উপন্যাসের পরিণতিটুকু গভীর

বেদনাত্মক। পাপের ছোঁয়াচ লেগে একটা গোটা চরের আনন্দ-উজ্জ্বল জীবনের প্রবাহ রুদ্ধ হয়ে হেজেমজে গেল।

তাই বলে লেখক নিরাশার বাণী শোনান নি। উপন্যাসের 'প্রাণগঙ্গা' নামের মধ্যে আশার সংকেত নিহিত আছে। নিশি ও ময়নার মধ্যে তিনি চরের প্রাণের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মোট কথা, 'প্রাণগঙ্গা' একটি সার্থক সুন্দর পল্লীকেন্দ্রিক উপন্যাস। এ বই লেখককে প্রতিষ্ঠা দেবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

নারায়ণ চৌধুরী

ইংরেজের দেশে : কুমারেশ ঘোষ। গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

ইংরেজের দেশে রঙ্গব্যঙ্গের প্রখ্যাত লেখক কুমারেশ ঘোষ রচিত ভ্রমণ-কাহিনী।

বলাবাহুল্য ভ্রমণ-কাহিনী বাংলা-সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। ভ্রমণ-সাহিত্য সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের এলাকায় প্রবেশ করেছে আজকাল। তার কারণ বিদেশের পথে-প্রান্তরে যত নরনারীর সঙ্গে লেখকের পরিচয় হচ্ছে, তাদেরই সজীব জীবন্ত আলেখ্য নিবিড় দরদ দিয়ে আঁকছেন তিনি। ফলে উপন্যাস-গল্পের ক্ষেত্র আর ভ্রমণ-কাহিনীর ক্ষেত্র একাকার হয়ে গেছে।

একালের ভ্রমণ-সাহিত্যের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কয়েকটি অভিনবত্বে রসোত্তীর্ণ হয়েছে 'ইংরেজের দেশে'। বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে লেখকের একটি মহৎ প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত—নিছক ভ্রমণের বিবরণ নয়। দেশটার আত্মাকে জানতে হবে, স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের দুর্গ দিয়ে ঘেরা স্বল্পভাষী ইংরেজের মনের সন্ধান দিতে হবে। বলতে দ্বিধা নেই, লেখক সফল হয়েছেন তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায়। কিন্তু এজন্য তাঁকে বহু দুঃখ-কষ্ট-ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

ইংরেজের গৃহী-জীবনের সঙ্গে তার সুখদুঃখের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হওয়ার জন্যই মারাঠী মহিলা মিসেস বেনারসীর বাড়িতে ইণ্ডিয়ানদের সস্তার ডেরা ছেড়ে তিনি 'পেয়িং গেষ্ট' হয়ে এলেন ল্যাফরকেড পরিবারের আশ্রয়ে। মিসেস ল্যাফরকেড—যিনি নিরামিষাশী লেখকের জন্য নিজে সরিষার তেল আর মসলা দিয়ে ইণ্ডিয়ান রান্না করে দিতেন! শুধু মাসান্তে টাকা গুণে নেওয়া 'ল্যাণ্ডলেডী' নন। বইয়ের শেষ পাতা পর্যন্ত মিসেস ল্যাফরকেডের চরিত্রটি আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, ইংরেজ সহজে মন খোলে না, কিন্তু একবার খুললে বিদেশীকে একান্ত আপনার জন করে নিয়ে তাদের দাম্ভিকতার দুর্নামকে মুছে ফেলতে পারে। শুধু মিঃ ও মিসেস ল্যাফরকেড নন, মিঃ ও মিসেস ওটওয়ে, স্ট্যান্সী—আরও অনেক ইংরেজ নরনারীই একান্ত আত্মীয়ের মতই মিশে গিয়েছিলেন লেখকের সঙ্গে।

ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের দুই শতাব্দীর সম্বন্ধ। এই দেশের ওপরে বহু ভ্রমণ-কাহিনীই লেখা হয়েছে। কিন্তু আমার তো জানা নেই, কখনও কোন লেখক এমন নিখুঁত করে এঁকেছেন কি না—লণ্ডনে ভারতীয়দের জীবনযাত্রার ছবি! এডিনবরার ভারতীয় ছাত্র, মেডিকেল ছাত্রী ঈজিপ্টের মেয়ে, লেবানীজ মিঃ হিন্দী, ইণ্ডিয়া হাউসে দেয়ালীর উৎসব দেখতে আসা ডাক্তারী ছাত্রী, বালিগঞ্জের মেয়ে কল্যাণী—এরা সবাই মুহূর্তের জন্য বইয়ের পাতায় এসেছে, কিন্তু স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য, কুমারেশ ঘোষ প্রধানতঃ বাংলা-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা অপুষ্ট শাখা—রসরচনার লেখক। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গই রসরচনার বা হাস্যরসের স্বাভাবিক বাহন। ব্যঙ্গ লেখকের চোখের দৃষ্টি স্বভাবতঃই ধারালো ও তির্যক। কোন ভাবালুতা কি আবেগের বন্যায় Satirist-এর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হতে পারে না। তাই শ্রীঘোষের কাছে জগদ্বিখ্যাত 'টেমস নদী'কে মনে হয়েছে 'একটা খাল মাত্র', পিকাডিলি সার্কাসকে 'আমাদের এসপ্ল্যানেডের অর্ধেক', লণ্ডনের ট্যাক্সি, আমাদের কলকাতার ট্যাক্সির তুলনায় নগণ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য, ওদের পার্লামেণ্ট প্রাসাদ, ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের বাড়ি, বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ—যে বাড়িগুলো একদিন আমাদের এত বড় বিশাল দেশটার অগণন মানুষকে শাসন করেছে বছরের পর বছর। সেই বাড়িগুলির এমন মোহমুক্ত সাদাসিদে বিবরণ দিয়েছেন লেখক যে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। শুধু বিখ্যাত প্রাসাদে নয়, লেখক শিল্পীসুলভ নির্বিকার দৃষ্টির আলো ফেলেছেন লণ্ডনের সর্বত্র। উত্তর-লণ্ডনের গরীব অধিবাসীদের বস্তির জীবন, তাদের সুতীব্র জীবন-সংগ্রাম হাইডপার্কের অন্ধকারে রাত্রির অপ্সরীদের খরিদ্দার শিকারের মত্ত উল্লাস, বয়স-ভাটিয়ে-যাওয়া কুমারী মেয়ের স্বামী খোঁজার করুণ প্রচেষ্টার যেমন পক্ষপাতশূন্য বাস্তব বিবরণ দিয়েছেন, তেমনই অনাবিল আনন্দে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, ইংরেজদের অতীত স্মৃতিকে, পুরানো ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখবার মহান প্রেরণায়।

'ইংরেজের দেশে' মন খুলে লেখা, আর চোখ খুলে দেখার সমন্বয়ে 'ভ্রমণ-কাহিনী'র ছোট গণ্ডী ছাড়িয়ে সৃজনধর্মী সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদপটটিও সুন্দর।

সুভাষ সমাজদার

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৫-২৮৩৮

৩১শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

পৌষ
১৩৬৫

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদা লিখিয়াছেন, "ভায়া হে, গত বিজয়ার মিলনাত্মক প্রভাবে বিগলিত হইয়া কামনা করিয়াছিলাম, হিমালয়ের উচ্চতা হইতে এইবার বাংলাদেশের শ্মশান-সকাশ সমতলে অবতরণ করিব। প্রার্থনা করিয়াছিলাম—

ঝিমিয়ে এল বেলা, এবার কর দয়া,
অনেক ভুলে ভুলে কাটিয়া গেল দিন ;
এখনো মিলিল না আমার বোধগয়া,
দৃষ্টি নয়নের ক্রমশঃ হয় ক্ষীণ।
জীবনে এল ঝড়, বিবাগী-ঝঞ্ঝায়
লোভের সঞ্চয় সকলি উড়ে যায় ;
থামাও মনোরথ, রুধিয়া দাও পথ,
শুধিয়া চলে যাই ধরার মহাঋণ।

তোমাতে বিশ্বাস আনিয়া তার সাথে
শিখাও নিজ 'পরে করিতে নির্ভর,
বাহিরে যত আলো নিবুক অমারাতে
মনের আলো মোরে দেখাক চরাচর।
অনেক বেদনায়, হে প্রভু, বহু দুখে
বিপথে ঘুরে মরা অনেক গেল চুকে ;
কঠিন হল সোজা, ফেলিয়া বহু বোঝা
মরু ও মরীচিকা তরিয়া, এনু ঘর।

যেখানে ভালবাসা, যেখানে প্রেম রয়,
দেবতা, জানিয়াছি সেখানে তব বাস ;
আশার ছলনায় ঘুরিয়া ধরাময়
হয়েছি বারবার মোহের মিছা দাস।
ত্যাগের মহিমায় ভরুক এ জীবন,
হারায়ে সব কিছু লভিব হারাধন ;
তাহার বেশী কভু দিয়ো না মোরে প্রভু,
কাটিতে পারিব না আবার মোহপাশ।

সন্ধ্যা নামিতেছে, অন্ধ রজনীর
পেতেছি সুরভি যে, ভরিয়া যায় মন,
অগাধ শান্তির শান্ত কালো নীর—
শুনি যে কানে তার নীরব আবাহন।
অনেক যুঝিয়াছি এবার বিশ্রাম,
স্নিগ্ধ কর মোর নিদাঘ-পরিণাম—
ভাঙিয়া বহু আশা শেখালে ভালবাসা,
সবার প্রেমে হোক ধন্য এ জীবন ॥

কিন্তু তাহা হইবার নয়, হইলও না। হিমালয়ের গূঢ় গোপন রহস্যলোক হইতে তুষার-মানব বা ইয়েতিদের আহ্বান আসিল। অদম্য কৌতূহল লইয়া তাহাদের সন্ধানে যাত্রা করিলাম সুইডেন ও রুশিয়ার অভিযাত্রী দলের সঙ্গে। ১৯৪৩ সনে সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ হিমালয়-বিজয়ী এরিক শিপ্‌টনের 'আপন ত্যাট মাউনটেন'—'সেই পাহাড়ের চূড়ায়' গ্রন্থে এই ইয়েতিদের খবর পাইয়াছিলাম। শিপ্‌টন হিমাচলের তুষার-পথে তুষার-মানবের পদচিহ্নের আলোক-চিত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন হইতে মাঝে মাঝে কালস্রোতে বুদ্বুদের মত সংবাদপত্রের

savage tribe and swearing at the audience in the foulest language in reply to its catcalls and laughter....

We are still for over thirty years now, enduring the torments of exile, having lost not only all that we possessed in Russia but almost all our friends and relatives who remained there and who were either shot or died of starvation and disease—for there were years in this so-called "Soviet" Russia when people fed on corpses, while the Mayakovskis revelled in luxury and fame. The "poet" Mayakovski, who before the revolution paraded in the streets with a painted snout and published books with titles such as 'The Cloud in Trousers', abandoned all that scandalous behaviour when Lenin came to power, to start on scandalous behaviour of another sort: he became a revolutionary demagogue a fiery bard of communism and red terror....Mayakovski shot himself in 1931, explaining in a note that his "love-boat had grounded," but in the meantime he had got into such good graces with the Kremlin that they put up a monument to him in Moscow, and named the Tverskoi Square and an underground station after him.

একজন আত্মহত্যা করিয়া মরিলেও সোভিয়েট দেশের মায়াকভ্স্কিরা যে সকলে গতায়ু হন নাই, খোদ রাশিয়ায় 'ডক্টর জিভাগো' বইটির সম্বন্ধে গালাগালির বহর দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বোরিস পাস্তেরনাক যদি বাঁচিয়া থাকেন ১০ই ডিসেম্বর তাঁহার জীবনে আবার আসিতে পারে।

—

গত ডিসেম্বর এবং বর্তমান জানুয়ারি মাসে সাহিত্য রাজনীতি বিজ্ঞান ইতিহাস সঙ্গীত নৃত্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ক কনফারেন্স বা সম্মেলন ভারতবর্ষের যত্রতত্র অনুষ্ঠিত হইয়া শীতের শীর্ণ শুষ্ক দিনগুলিকে রসাল ও মনোরম করিয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক রসস্থ হইয়াছে নাগপুর সন্নিহিত অভ্যংকরনগরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চতুঃষষ্টিতম অধিবেশন এবং জব্বলপুরে নিখিলভারত বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের চতুর্দশ অধিবেশন। ভুবনেশ্বরে সর্বভারতীয় কলমনবিস (P. E. N.) সম্মেলন কনারক মন্দিরের সান্নিধ্য সত্ত্বেও তেমন জুত করিতে পারে নাই।

কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইবে যে "মজা" (রাষ্ট্র-ভাষা) লোলুপ দর্শকদের যতই চিত্তচমৎকারী হউক, আসলে নাগপুরে রাজনীতিকেরা এবং জব্বলপুরে সাহিত্যিকেরা নিজেদের বসা-ডালে নিজেরা কুড়ুল মারিয়াছেন। শীতলমস্তিষ্ক সদ্বিবেচক ব্যক্তির নেতৃত্ব এই দুই স্থানে বজায় থাকিলে এইরূপ আত্মঘাতী কাণ্ড ঘটিতেই পারিত না। আমরা এই বিচক্ষণতার পরিচয় একবার পাইয়াছিলাম আমাদের পাড়ার শ্রীমতী পুটুর বিবাহ-ব্যাপারে। পাত্রপক্ষ পুটুকে দেখিতে আসিবে, গোটা পাড়ায় পুটুর সমবয়সী মেয়েদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল। পুটুকে তো তাহারা সাজাইলই, নিজেরাও যথেষ্ট ছিমছাম হইয়া লইল। দরদালানের মেঝেতে বসিবার আসন হইয়াছে, দরজায় জানালায় পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-কুটুম্বের কুমারী মেয়েরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। গৃহকর্তা ভিতরে আসিয়া তাঁহার প্রবীণা মাতাকে (পাড়ার বড়-মা) পাত্রপক্ষকে এইবারে ভিতরে আনিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। বড়-মা দরদালানে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমবেত কুমারীকুলকে একবার পর্যবেক্ষণ করিলেন; তাহাদের মধ্য হইতে বাছাই করিয়া দুজনকে পাকড়াও করিলেন এবং পুত্রবধূর হেপাজতে মেয়ে দুটিকে দিয়া পুত্রকে বলিলেন, এবার ওঁদের ডাক্ বাছা। পুত্র অনিন্দ্যসুন্দরী কুমারী দুইটির দিকে এক নজর চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন, মাতা পৌত্রীর পথের কণ্টক অপসারণ করিলেন। নিজের মেয়েকে ওই দুজনের পাশাপাশি দেখিলে বরপক্ষের কিছুতেই মনে ধরিত না। এই বড়-মা-সুলভ বিচক্ষণতার অভাববশতঃই রাজকাপুর-নার্গিসদের জৌলুসে স্বয়ং জওহরলাল ও ইন্দিরা গান্ধীরা মিটমিট্ করিতে করিতে হারাইয়া গেলেন এবং কংগ্রেস প্যাণ্ডাল কুরুক্ষেত্রে পরিণত হইল।

জব্বলপুর-সাহিত্য-জলসায় জ্যোতিষ্কদের সশরীরে আবির্ভাব ঘটে নাই বটে, জ্যোতিষ্ক-জনয়িতারাই বাজি মাত করিয়াছেন। শুনিলাম তাঁহারা বিজয়গর্বে মণ্ডপেই ঘোষণা করিয়া আসিয়াছেন যে 'নিখিলভারত বঙ্গ-সাহিত্যে'র আগামী অধিবেশন তাঁহারা তারার মালায় সাজাইয়া দিবেন—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা এবং শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারো হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি ভ্রূভঙ্গী ও রূপ-টানের বন্যায় ভাসিয়া যাইবে।

তাই বলিতেছিলাম, আর নয়। "সংস্কৃতি" যতদিন নাবালক ছিল ততদিন রাজনীতি ও সাহিত্যের আওতায় তাহাকে পোষা চলিত কিন্তু সে এখন এমন প্রবল ও

সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছে যে সাহিত্য-রাজনীতি তাহার চাপে কোণঠাসা হইতে বসিয়াছে। জব্বলপুরে চলচ্চিত্র-রঙ্গমঞ্চ পুতনা-রাক্ষসী সাজিয়া শিশু-সাহিত্যকে গ্রাস করিয়াছে এবং নিখিলভারত জাতীয় কংগ্রেসে চিত্রতারকা-পাখারা রাজনীতির ডানা ভাঙিয়া ছাড়িয়াছে। এখন নিজের নিজের কোট বজায় রাখিয়া সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

—

ভারতবর্ষের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব গত পক্ষকালের মধ্যে ঘটিয়া গেল। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা-বিচারমূলক অন্য কয়েকটি সভাও বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রী ভিটল এন. চন্দভারকর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনের সমাবর্তনে বলিয়াছেন, এ যুগের ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার অভাব সর্বাধিক পীড়াদায়ক। তিনি সরাসরি ছাত্রসমাজকে দায়ী করেন নাই—শিক্ষক ও অভিভাবকদের শৃঙ্খলাবোধহীন আচরণকেই দায়ী করিয়াছেন। রাজনৈতিক দলাদলিতে ছাত্রদের নিয়োজিত করিতে গিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দেশের কী সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন আমরা প্রতিদিন পথেঘাটে সভায় সম্মেলনে তাহা লক্ষ্য করিতেছি। ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশের ভবিষ্যৎ-ভরসা তরুণ সম্প্রদায়কে বলি দিতে যাহাদের লজ্জাও নাই, সঙ্কোচও নাই, এমন সব ব্যক্তিকে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃত্ব হইতে অপসারণ অবিলম্বে না করিলে জাতির শিক্ষাই বানচাল হইবে। এই অবাঞ্ছিত প্রয়োগ কীরূপ অরাজকতার সৃষ্টি করিতে পারে সম্প্রতি বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয়-হাঙ্গামায় আমরা তাহা দেখিয়াছি। কাজেই শ্রীচন্দভারকরের সতর্কবাণীতে ভারতবর্ষের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাবধান হওয়া প্রয়োজন। গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীচন্দভারকর অদ্য ২৩ জানুয়ারি কলিকাতা হইতে বোম্বাই ফিরিবার পথে অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দিনে ভারতবর্ষের অন্যতম শিক্ষানায়ক শ্রীজাকীর হোসেন একটা গুরুতর সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্য ছাত্র-বাছাইয়ের যে ব্যবস্থা সর্বত্র চালু হইতে চলিয়াছে তাহাতে প্রবেশিকা বা স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার পরেই বহু ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। শ্রীহোসেন বলিয়াছেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা এই যে বহু-ছাত্রের প্রতিভাই বিলম্বে বিকশিত হইয়া থাকে। কাজেই এই বাছাইয়ে বিলম্বিত প্রতিভারা চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইবে এবং তাহার ফল ভাল হইবে না।• এইরূপ নির্বাচন-ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া বিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধিই তিনি সমীচীন মনে করেন।

শ্রীজাকীর হোসেন শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মের স্থান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্পষ্টতঃই প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলালের "সেকুলার"-নীতির প্রতিবাদ। নীতি ও ধর্মবোধকে বাদ দিয়া কোনও শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। বিজ্ঞানপ্রভাবিত পাশ্চাত্ত্য জগতেও এই তথ্য প্রচারিত হইতে দেখিতেছি। ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেশের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্মবিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে বলিয়াই ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিজাতীয়তা বাড়িয়া চলিয়াছে। অশোক-স্তম্ভ ও অশোক-ধর্মচক্রকে প্রতীকরূপে মাথায় রাখিব অথচ যে ধর্মবিশ্বাস চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে পরিণত করিয়াছিল তাহার নিন্দা করিব, এ বড় বিচিত্র বিপরীত কাণ্ড ভারতবর্ষে হইতেছে। শিক্ষাজীবনের গোড়া হইতে ছাত্রসমাজে এই ধর্মবিশ্বাস পুনঃসংস্থাপিত করার প্রয়োজন হইয়াছে।

—

ডিগ্রীর মোহ কি ভাবে ভারতবর্ষে নূতন জাতিভেদ সৃষ্টি করিতেছে গত ডিসেম্বর মাসের শেষে দিল্লীর সংস্কৃতি-পরিষৎ নামক সাহিত্য-সংস্থার অধিবেশনে অধ্যাপক ডক্টর জে. বি. এস. হলডেন সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ পুরাতন জাতিভেদপ্রথার কবল হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছে বটে কিন্তু এখন হইতে সাবধান না হইলে এই নূতন ডিগ্রীজাত জাতিভেদ অদূর ভবিষ্যতে রীতিমত ছুতমার্গের আমদানি করিবে। ডক্টর জাকীর হোসেনের মত তিনিও মনে করেন শ্রেষ্ঠতম ডিগ্রীই প্রতিভার চরমতম পরিচয় নয়। বিলম্বে কার্যকরী প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্রেরা নিরেস ডিগ্রী সত্ত্বেও সরেসদের ছাড়াইয়া গিয়াছে এরূপ দৃষ্টান্তের

অভাব নাই। এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলা-সাহিত্যে গবেষণার জন্য যাঁহারা ভাল-মন্দ ডক্টরেট উপাধি লাভ করিয়াছেন মাঝে মাঝে তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির যে হাস্যকর পরিচয় পাই তাহাতে এই ডিগ্রীর উপরই ঘৃণা জন্মিয়া যায়। দৃষ্টান্ত দিতে বলিলে অন্ততঃ এক কুড়ি দৃষ্টান্ত এই আসনে বসিয়াই দিতে পারিব। এ দেশে জ্ঞানের গভীরতা প্রায়শঃই ডিগ্রীনিরপেক্ষ—এখন পর্যন্ত ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। সুতরাং ডক্টর হলডেনের কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য।

—

গত ৩০ ডিসেম্বরের দৈনিক 'যুগান্তরে'র সংবাদ-পৃষ্ঠায় "লৌকিকতার পরিবর্তে!" শিরোনামায় একটি সংবাদ দেখিয়া শবদেহে চেতনা-সঞ্চারের আভাস পাইয়াছি। সংবাদটি এই :

"ল্যান্সডাউন রোডের বাসিন্দা শ্রীরমেশচন্দ্র রায় সম্প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহে বরের জন্য কোনও যৌতুক তো লনই নাই, বৌভাতেও কাহারও নিকট হইতে কোনও উপহার গ্রহণ করেন নাই। 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ'-এর অনুরোধটা নিতান্তই মামুলি ভাবিয়া যাঁহারা উপহার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের উহা ফেরৎ লইয়া যাইতে হয়।"

জাতীয় কল্যাণের এত বড় সংবাদ দীর্ঘকাল আমাদের নজরে পড়ে নাই। বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজ এই পণ যৌতুক ও উপহারের নিদারুণ চাপে কতখানি মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে প্রশান্তচন্দ্রের স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট যদি তাহার হিসাব লইতেন তাহা হইলে এই মধ্যবিত্ত সমাজ বেহিসাবী ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া বহুপূর্বেই চিতায় পাশ ফিরিয়া শুইত। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বে শ্রীমতী স্নেহলতার স্মরণীয় আত্মহত্যার পরে বরপণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে যত আন্দোলন, যত বক্তৃতা ও যত সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখিত হইয়াছে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন লইয়াও ততখানি হয় নাই। কিন্তু এত বাগাড়ম্বরের যোদ্ধা ফল দাঁড়াইয়াছে কী! বরপণ ক্রমশঃ দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 'রেট-কাটিং' নয়, 'রেট-এনহান্সিং' কালো বাজারের ঠেলায় কন্যার পিতা সর্বস্বান্ত না হইয়া আর জামাইয়ের শ্বশুর হইতে পারিতেছেন না। প্রতীকারের চেষ্টায় যে ক্ষেত্রে পাপের পরিণাম বৃদ্ধি পায় সে ক্ষেত্রে নীরব থাকাই বিধেয়। সুতরাং বরপণ থাক্, লৌকিকতার কথাই বলিতেছি। এ এক সর্বনাশা সামাজিকতা বাঙালীকে পাইয়া বসিয়াছে। অবাঙালীরা যখন পাঁচ-দশ টাকা মূলধন সম্বল করিয়াই ধীরে ধীরে আখের গুছাইয়া লইতেছে, ফেরিওয়ালা-পানওয়ালা হইতে ছাতু-গুড় লঙ্কার কৃপায় একে একে ঝুনঝুনওয়ালা আগরওয়ালা হইয়া শুরুর দশ বৎসরের মধ্যেই প্রত্যেকে অন্ততঃ দশ দশটা বাঙালী কেরানী ও খাতালেখা বাবুর মনিব হইয়া চোখ রাঙাইতেছে, তখন বাঙালী বাবুরা অন্নপ্রাশন-জন্মদিন বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি লৌকিকতার ব্যাপারে গৃহিণীদের সহিত বচসা করিয়া ঘরে অশান্তি ও বাহিরে ঋণের গুরু-ভারে পীড়িত হইয়া লটারি-ঘোড়া ও গনৎকারের পায়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া শেষ পর্যন্ত গুরুরূপ বয়া আশ্রয় করিয়া ভবার্ণবে ভাসিবার চেষ্টা করিতেছে। স্ট্যাটিসটিকস না কষিয়াও বলিতে পারি, বাংলাদেশের প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থ এই লৌকিকতার বাবদে যে পরিমাণ ব্যয়ে ঝুমঝুমি-চুষিকাঠি-এয়ারগান-কাঠের ঘোড়া-বই-শাড়ি টেবিলল্যাম্প ও গহনা সংগ্রহ করিয়া সামাজিক মর্যাদা বাঁচাইতে বাধ্য হয়, সেই পরিমাণ অর্থকে মূলধন করিয়া ব্যবসা শুরু করিলে বহু বাঙালীই আজ বিড়লা-পোদ্দার (ডালমিয়া-মুন্দ্রা নাই-ই হইল) হইতে পারিত। আর আশ্চর্য, বাঙালীর অন্নবস্ত্রাভাব যত বাড়িতেছে মাসীপিসী-বেলফুল-গঙ্গাজলের সংখ্যাও কি তত বাড়িয়া চলিয়াছে! লগনসার দিন আসিলে তো আতঙ্কে হিমালয়-কন্দরে পলাইয়া বাঁচিবার সাধ জাগে। সবাই এই দুরারোগ্য সমাজ-ব্যাধির নিন্দা করিতেছে, সবাই নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগিতেছে। কিন্তু সবাই জাগিয়া ঘুমাইতেছে। তাই এই শ্রীরমেশচন্দ্র রায়কে আজ নব-স্নেহলতার (কনিষ্ঠ ভাইয়ের বৌভাতে লৌকিকতা-প্রত্যাখ্যান আত্মহত্যা নয় তো কী!) স্থলাভিষিক্ত করিয়া জাতীয় বীরের সম্মান দিতেছি। যদি দশজন বাঙালীও তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হন, তাহা হইলেও দশটা বাঙালী পরিবার রক্ষা পাইবে। নতুবা এই ভয়াবহ লৌকিকতার বন্যায় সমগ্র বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া তথাকথিত 'ছোটলোকদের'ও অধম হইবে। তখন

কোনও লোক বা লৌকিকতাই মধ্যবিত্ত বাঙালীকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

—

জব্বলপুরে শেঠ গোবিন্দদাসের মুখে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রশস্তি বড় মিঠা লাগিল। মনে হইল স্বয়ং গোবিন্দ যেন যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুর-রাজসূয়-যজ্ঞসভায় শিশুপাল-প্রশস্তি করিতেছেন। জব্বলপুরে সমবেত মোট আড়াই জন বাঙালী সাহিত্যিক নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে নিশ্চয়ই খুব আপ্যায়িত হইয়াছেন। শ্রীদেবেশ দাশ সম্ভবতঃ এইবারে একখানি 'জব্বলপরোয়া' লিখিয়া বসিবেন !

—

মাভৈঃ। মালয়ের রবার বন খাণ্ডবদাহনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাক, নিয়ন্ত্রণ-প্রয়াসীদের আর ভয় নাই। নিউ হাভেন (কনেক্টিকাট) হইতে প্রেরিত ৩০ ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ :

"ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুল হইতে গতকল্য এখানে ঘোষিত হইয়াছে যে কয়েকটি কুক্কুরী অন্তঃস্বত্বা অবস্থা হইতে বিনা গর্ভপাতে এবং সম্পূর্ণ নিরাপদে কুমারীত্ব ফিরিয়া পাইয়াছে। একটি নবাবিষ্কৃত ঔষধ এই অঘটন ঘটাইয়াছে। এই ঔষধের আবিষ্কর্তা ইয়েলের ভূতপূর্ব বীজাণুবিদ্ ডক্টর আইভান পারফেণ্টজেব। তিনি ম্যালুসিডন আবিষ্কার ও ইনজেকশনে প্রযোগ করিয়া দেখাইয়াছেন যে গঠিত ভ্রূণ ঔষধের ক্রিয়ায় ধীরে ধীরে রক্তপ্রবাহের মধ্যে জীর্ণ হইয়া যায়।"

নাম দেখিয়া মনে হইতেছে ভদ্রলোক জাতিতে রুশ। রুশের অসাধ্য কাজ নাই। ওই ৩০ ডিসেম্বর মস্কো হইতে সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স এমন একটি রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহার ব্যবহারে দুই হইতে তিন সপ্তাহকালের মধ্যে গ্যাষ্ট্রিক ও ডুয়োডেনাল আল্সার সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে।

এই দুইটি সংবাদ সত্য হইলে দুইটি আবিষ্কারই স্পুটনিক ও রকেটপ্রক্ষিপ্ত সূর্যমণ্ডলযাত্রী কৃত্রিম গ্রহ অপেক্ষাও বিস্ময়কর আবিষ্কার বলিয়া গণ্য হইবে। এখন পর্যন্ত যাহা অনুভূত হইতেছে তাহাতে এই নূতন গ্রহ জ্যোতিষীদের গণনায় কিঞ্চিৎ বিপর্যয় ঘটানো ছাড়া আর কিছু করিবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু অবাঞ্ছিত গর্ভ ও শূলব্যাধি নিবারিত হইলে মানুষের আহার-বিহার-সম্ভোগ সম্ভাবনা ইন্দ্রের কার্যকলাপকেও হার মানাইবে। অবশ্য সকলই ফলেন পরিচীয়তে।

—

অদ্য ২৩ জানুয়ারি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস বলিয়াই যে শুধু স্মরণীয় তাহা নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ২৩ জানুয়ারি আরও দুইটি কারণে স্মরণীয় হইয়া আছে। ঠিক একশত বৎসর পূর্বে ১৮৫৯ সনের এই তারিখে (১২৬৫, ১০ই মাঘ) বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রথম প্রবর্তক, প্রাচীন ও নবীনের সংযোগ-সেতু, বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু প্রভৃতির সাহিত্যগুরু কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এবং ঠিক অর্ধ শতাব্দী পূর্বের এই তারিখে ১৯০৯ সনের ২৩ জানুয়ারি (১০ই মাঘ ১৩১৫) 'প্রভাস-কুরুক্ষেত্র-রৈবতক-পলাশীর যুদ্ধে'র কবি নবীনচন্দ্র সেনের তিরোভাব ঘটে। আজ আত্মবিস্মৃত বাঙালীজাতি ঈশ্বরচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে স্মরণ করে কি না জানি না, তাঁহাদের সাহিত্য-রসধারাকে সঞ্জীবিত রাখিবার যে চেষ্টা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ করিতেছেন সকল বাঙালীর তাহাতে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমগ্র রচনাবলীর একটি সুষ্ঠু সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন পরিষৎ প্রায় সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর প্রথম তিন খণ্ডে নবীনচন্দ্রের পাঁচ ভাগ 'আমার জীবন' মুদ্রিত হইয়াছে, পরিষৎ তাহা অচিরাৎ প্রকাশ করিতেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচনাবলীতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের নিখুঁত পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবনে'ও তেমনই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার স্থানীয় লোকেদের ও প্রবাসী বাঙালীর জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। এই পরিচয় ও ছবি প্রায় হারাইতে বসিয়াছিল। পরিষৎ তাহা পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়া মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করিতেছেন।

—

শ্রীভগবান

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার কথাই একটি কথা—
বলে যাহা ফুরায় নাকো,
ডাকার মত যে ডাকে হে
সে শুনতে পায় তোমার ডাকও।
কিছুই নাহি তোমা বিনা,
তবু শুধায় আছ কি না?
তাই তুমি কি রহস্যময়—
লাবণ্যেতে লুকিয়ে থাকো?

২

সকল দেশ ও সকল জাত—
থাকিতে চায় তোমায় নিয়ে,
জগন্নিবাস তোমার নিবাস,
যুগে যুগে দেয় বানিয়ে।
পূর্ণভাবে সবাই তো চায়,
পূর্ণতা কই কমে না তায়?
সবার চেয়ে তুমিই আপন—
চিনিয়াও কই চিনি হে?

৩

যতই ডাকি, যতই ভাবি—
কঠিন পাওয়া সুদুর্লভে,
চকোরেরও চাঁদকে ডাকা—
দুরন্ত সেই রবেই রবে।
জীবন যে যার গেল বয়ে,
দৃষ্টি চোখের গেল ক্ষয়ে,
উঠান-ভরা রোদ ফুরালো
আবার দেখা কখন্ হবে?

৪

দরশনের সময় গেল—
নিভিছে ওই আলোর চিনা,
পরশনের আকাঙ্ক্ষী হে—
কি দুরাশা তা জানি না!
অনুভবের-অতীত যাহা,
শুভদিন কি আসবে আহা?
সে উৎসবে ভাবছি আমি
চেতন হয়ে রব কিনা?

দিনশেষের গান

শ্রীকালিদাস রায়

চিন্তা কি আর দিন তো এলো ফুরিয়ে।
ক্ষতি-লাভের হিসাব এখন দিই তুড়িতে উড়িয়ে॥
অস্তরবির বিদায়-কিরণ
ছড়ানো শেষ মুঠার হিরণ
ছন্দপুটে বন্দী করে যাচ্ছি রেখে কুড়িয়ে॥

বলাকারা ধায় অসীমে পাখছানিতে যায় ডেকে,
মনের ডানার ঝটপটি সার, উড়তে সে চায় তাই দেখে।
দিগন্তের ঐ সন্ধ্যামণি
পাঠায় রঙিন আমন্ত্রণী
দূর সাগরের উদাস হাওয়া তপ্ত হৃদয় দেয় জুড়িয়ে॥

নেই কোন যান চলার পথে, সবার এ পথ হয় হাঁটিতে
লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটি খেয়া-নায়ের পারঘাটিতে।
বনের পাখি গায় পূরবী
কয় তারা "ভয় কিসের কবি?"
ছায়ায় ছায়ায় পায়ে পায়ে শুকনো পাতা যাই গুঁড়িয়ে॥

ধ্যানের চেয়ে জ্ঞানের চেয়ে কাজের চেয়ে কথায় সার,
ভেবেছিলাম, খেয়ার পথে কথাই এখন লাগছে ভার।
চাই যে এখন নীরবতা
ফুরিয়ে এলো আমার কথা
কালের রাখাল ছাড়ল ধেনু নটেগাছ সে খায় মুড়িয়ে॥

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

॥ আত্মবিসর্জন ॥

৩

রবীন্দ্র-জীবনীকার রবীন্দ্রনাথের সুখদুঃখানুভূতি সম্পর্কে যে তত্ত্বকে কবিমানসের বিচারে মূলসূত্ররূপে গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে আর একটু বিচার-বিশ্লেষণ এখানে অত্যাবশ্যক। তিনি বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের শোক বা সুখ কোনোটিই মনে স্থায়ী রেখাপাত করত না। তাঁর ভাবাবেগের প্রকাশের জন্য, তাকে উদ্বোধিত করবার জন্য, যতটুকু আঘাত প্রয়োজন হত ততটুকুমাত্র তিনি সহ্য করতেন, তার অতিরিক্তকে তিনি আমল দিতেন না। তাঁর দুঃখ তাঁর কাব্যসৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুমাত্র; তারপর সৃষ্টিসুখ সম্ভোগ হয়ে গেলে বিস্মৃতির চিরপাথারে স্মৃতি ডুবে যেত।

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত দুঃখকেও তিনি এই তত্ত্বের দ্বারাই ব্যাখ্যা করেছেন। তাই দেখতে পাই, তিনি রবীন্দ্র জীবনের এই তীব্রতম, মহত্তম দুঃখকেও ক্ষণিক ও ক্ষণস্থায়ী বলেই ধরে নিয়েছেন এবং কবির তৎকালীন রচনাবলী থেকে তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থন সংকলনের প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই মৃত্যুর আঘাত তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য বিচলিত করিয়াছিল' [প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৫১]। 'জীবনের সমস্ত সজীবতা ও সরসতাকে সাময়িকভাবে শুষ্ক ও শীর্ণ করিয়া দিয়াছিল' [পৃ. ১৫৩]। 'মৃত্যুশোক পর্বে জীবনের প্রতি যে বৈরাগ্যভাব ওই কবিতাগুলির মধ্যে ['কড়ি ও কোমলে'র মৃত্যু-সম্পর্কিত কবিতাবলীর কথাই লেখক বলছেন] প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা যে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী হৃদয়ালুতাপ্রসূত তাহা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি' [পৃ. ১৭৫-১৭৬]।

'বালকে' "রুদ্ধগৃহ" প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর অক্ষয় চৌধুরীর সঙ্গে পৌষ মাসে যে "উত্তর-প্রত্যুত্তর" চলে তার বিশ্লেষণ করেও তিনি বলছেন, রুদ্ধগৃহ প্রবন্ধের তাৎপর্য ব্যাখ্যানের মধ্যে 'রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্যতম মূলসূত্র'টি ধরা পড়েছে। 'সেটি হইতেছে, ভুলিয়া যাইবার অসীম ক্ষমতা বা বিস্মৃতি। অর্থাৎ অতীতের অনাবশ্যক আবর্জনাকে ভুলিয়া গিয়া নূতন সত্য গ্রহণে, নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারে, নূতন প্রেম অভিনন্দনের জন্য উন্মুখীনতা' [পৃ. ১৬৭]।

রবীন্দ্রনাথের উপর এই তত্ত্ব আরোপ করবার জন্য উন্মুখ হবার ফলে প্রভাতকুমার একস্থলে রবীন্দ্রনাথ যা অস্বীকার করেছেন সেই কথাই তাঁর স্বীকৃতিরূপে ব্যবহার করে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তিনি লিখছেন:

'তাঁহার বিবাহের মাত্র চারি মাস পরে নবীন জীবনের প্রথমে এই শোক। রবীন্দ্রনাথ ঠিকই লিখিয়াছেন, "ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ;...এইজন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল।" 'যোগিয়া' ও 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি'র মধ্যে এই মুক্তিপ্রয়াসের ধ্বনি জাগিয়াছে' [পৃ. ১৫৪]।

এখানে প্রভাতকুমার কবির 'নবীন জীবনের প্রথমে এই শোক' বলতে যে-শোকের কথা বলেছেন আর রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে 'জীবনে প্রথম যে মৃত্যু'র কথা আছে সে দুটি এক নয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে তাঁর চোদ্দ বৎসর বয়সে মায়ের মৃত্যুর কথাই উল্লিখিত হয়েছে। আর প্রভাতকুমারের উদ্ধৃতিতে উদ্দিষ্ট হয়েছে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রসঙ্গ। 'জীবনস্মৃতি'র "মৃত্যুশোক" অধ্যায় থেকে গৃহীত রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বক্তব্যটি উদ্ধার করলেই প্রভাতকুমারের ভুলটি ধরা পড়বে। সত্যসন্ধ কবি মায়ের মৃত্যু ও কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁর মনে যে ভিন্নতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার হেতু বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, 'যে ক্ষতি পূরণ হইবে না, যে-বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই, তাহাকে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান অঙ্গ ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবল থাকে, তখন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থায়ী রেখায় আঁকিয়া রাখে না। এইজন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছায়া ফেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আপনার কালিমাকে চিরন্তন না করিয়া ছায়ার মতই একদিন নিঃশব্দপদে চলিয়া গেল। * * কিন্তু আমার চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয়া অশ্রুর মালা দীর্ঘ করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশু বয়সের লঘু জীবন বড় বড় মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত দুঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।'[৮]

এখানে 'কিন্তু'-অব্যয় ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ যে কথা স্পষ্টতই অস্বীকার করতে চাইছেন সে কথা জীবনীকার তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধার করে কবির প্রতি অবিচার করেছেন। কেন না এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রভাতকুমারের বক্তব্যের অনুকূল তো নয়ই, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত।

আসলে জীবনীকার কবিমানসে নিরাসক্তিজনিত যে নৈর্ব্যক্তিকতার তত্ত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছেন, আর যে-ক্ষেত্রেই হোক, কাদম্বরী দেবীর ক্ষেত্রে সে তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। জীবনীকার স্বয়ং তাঁর গ্রন্থে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পূর্বে ও পরে, তাঁর সম্পর্কে কবির হৃদয়ানুভূতির উজ্জ্বল স্বাক্ষরযুক্ত যে সব কবিতা প্রবন্ধ ও গ্রন্থোৎসর্গের তালিকা সযত্নে পঞ্জীভুক্ত করেছেন সেগুলি থেকেই তাঁর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে কবির মানস-প্রবণতার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বর্তমান গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে উদ্ধৃত দান্তে পেত্রার্কা ও গেটের প্রেম সম্পর্কে তাঁর সতেরো বছর বয়সের লেখা প্রবন্ধত্রয় থেকে। সেখানে কবিকিশোর দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেমের সঙ্গে গেটের প্রেমের তুলনা করে লিখেছেন, 'দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব, অর্থাৎ সাধারণ। * * সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনও আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটা নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।' প্রভাতকুমার যখন বলেন, রবীন্দ্রনাথের দুঃখ তাঁর কাব্য-সৃষ্টির পক্ষে যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকু মাত্র, তারপর সৃষ্টি-সুখ সম্ভোগ হয়ে গেলে বিস্মৃতির চিরপাথারে স্মৃতি ডুবে যেত, তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ ধিকৃকৃত গেটের হৃদয়ানুভূতির সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ানুভূতির সাধর্ম্য আবিষ্কারের জন্য প্রয়াসী হন। কিন্তু এ বিষয়ে কিশোর বয়সে রবীন্দ্রনাথের যে মনোভাব দান্তে পেত্রার্কা ও গেটে-প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে শুধু তা থেকেই নয়, তাঁর সারা জীবনব্যাপী অনুভূতির সাক্ষ্যবহনকারী রচনাবলী থেকেই প্রভাত-কুমারের বক্তব্যের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথের দুঃখ ও দুঃখসঞ্জাত জীবনবোধ সম্পর্কে সি. এফ. অ্যানড্রুসের সিদ্ধান্তটি এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে নির্ভর-যোগ্য বলে আমরা মনে করি। তিনি লিখেছেন :

Suffering may come to him in incredible forms of pain. No one has suffered more acutely and sensitively than he has done. But as long as the ideal is set before him and a fresh adventure of faith and hope is in sight, he will go through torture, almost intolerable, to one of his supremely refined nature, in order to reach his goal....

The goal itself with him is always high, always glorious, always noble. He has the poet's deep love for the colour and music, the song and drama of life. But all the time, there is an austerity of refinement that is

fastidious in its purity, lest the ideal itself should become debased and the aim low. He cannot bear for a single moment that the beauty of the end in view should be tarnished by any meanness in the process. At the same time his moral idealism is never formal or conventional. It rests upon an unerring aesthetic instinct, which is like a strain of music played upon a perfect instrument by a master-hand. The slightest discord mars for him the whole song. It jars upon his inner spirit, creating an agony which less sensitive natures could not for a moment understand.[৯]

'ধর্ম' গ্রন্থে "দুঃখ" প্রবন্ধে কবি নিজেও বলেছেন, 'মানুষের একটিমাত্র আপনার ধন' আছে সেটি দুঃখধন।...'অতএব দুঃখকে আমরা দুর্বলতাবশত খর্ব করিব না, অস্বীকার করিব না, দুঃখের দ্বারাই আনন্দকে আমরা বড়ো করিয়া এবং মঙ্গলকে আমরা সত্য বলিয়া জানিব।' এই প্রবন্ধে জীবনে দুঃখের প্রয়োজন ও মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করে কবি লিখেছেন, 'মানুষের এই যে দুঃখ ইহা কেবল কোমল অশ্রুবাষ্পে আচ্ছন্ন নহে, ইহা রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত। বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ; তাহাই চক্রপথে ঘুরিতে ঘুরিতে মানব-সমাজে নূতন নূতন কর্মলোক ও সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করিতেছে—এই দুঃখের তাপ কোথাও বা প্রকাশ পাইয়া কোথাও বা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মানব-সংসারের সমস্ত বায়ুপ্রবাহগুলিকে বহমান করিয়া রাখিয়াছে।'

কবিবর্ণিত এই দুঃখতত্ত্ব তাঁর নিজের জীবনের পরম দুঃখের দিনে কি ভাবে কতটা সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠেছে তার সন্ধান করলেই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত দুঃখের আঘাতের স্বরূপনির্ণয় করা সম্ভব হবে।

৪

'বিশ্বজগতে তেজঃপদার্থ যেমন, মানুষের চিত্তে দুঃখ সেইরূপ; তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ।'—দুঃখসত্য সম্পর্কে এই বাক্যটি মহাকবি-কণ্ঠোচ্চারিত দিব্যসংকেত। এই সংকেতের দ্বারাই কবিমানসে অধিবাসিত দুঃখের অনুভূতি ও তার বিচিত্র পরিণতির সূত্রসন্ধান সম্ভব। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সাতাশ বৎসর পরে লেখা 'জীবনস্মৃতি'তে [রচনাকাল ১৩১৮ ভাদ্র-১৩১৯ শ্রাবণ] একান্ন বৎসর বয়সে কবি তাঁর 'চব্বিশ' বৎসর বয়সের মৃত্যুশোক সম্পর্কে যা লিখেছেন সর্বাগ্রে সে কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। কেন না সাতাশ বৎসরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে 'প্রথম-পুরুষে'র মোহমুক্ত দৃষ্টিতে 'উত্তম-পুরুষে'র মর্মশোক সেখানেই নিঃশেষে নির্বারিত হয়েছে। কবি লিখছেন, এতদিন তিনি যে এক নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নাবেশের মধ্যে আবিষ্ট ছিলেন মৃত্যু এসে অকস্মাৎ সেই মোহাবেশ ভেঙে দিয়ে গেল। 'জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে, তাহা তখন জানিতাম না; সমস্তই হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে সে কী ধাঁধাই লাগিয়া গেল।' মুহূর্তের মধ্যে এই ফাঁক-হয়ে-যাওয়া শূন্যতাবোধের মধ্যে কবির কেবলই মনে হতে লাগল, 'যাহা আছে আর যাহা রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া।'

এই চিন্তা, এই চেতনাই কবিমানসে অনুক্ষণ জিজ্ঞাসার আকারে জাগ্রত হয়ে রইল। 'জীবনের এই রন্ধ্রটির ভিতর দিয়া যে একটা অতলস্পর্শ অন্ধকার প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাহাই আমাকে দিনরাত্রি আকর্ষণ করিতে লাগিল। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল সেইখানে আসিয়া দাঁড়াই, সেই অন্ধকারের দিকেই তাকাই এবং খুঁজিতে থাকি—যাহা গেল তাহার পরিবর্তে কী আছে।' 'চারাগাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে, তাহার সমস্ত চেষ্টা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে—তেমনি, মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।'

এই দুর্বিষহ দুঃখের দহনে দগ্ধ হতে হতেই কবি খুঁজে পেলেন অন্ধকারকে অতিক্রম করবার পথ। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে একমুহূর্তে 'নাই' হয়ে গেল বিশ্বজীবনের মধ্যে সে যে 'আছে'—এই প্রতীতিতে দুঃখের অন্ধকারের মধ্যে আনন্দের আলো বিকশিত হয়ে উঠতে লাগল। থাকা এবং না-থাকা, অস্তি এবং নাস্তি—এই দুই বিপরীত কোটি যে এক মহত্তর সঙ্গতিতে—'তদুভয়ে'—মিলিত হয়ে 'জীবন-মৃত্যুর হরণপূরণে' এই বিশ্বজীবনসত্যকে নিত্য-উন্মীলিত করে তুলছে কবি পেলেন এই সত্যের সন্ধান। হাসিকান্নায় নিরেট-করে-বোনা যে জীবনকে তিনি একেবারে চরম করেই গ্রহণ করেছিলেন সেই জীবনের প্রতি 'অন্ধ আসক্তি' জীবনমৃত্যুর হরণপূরণের অখণ্ড লীলারসের উপলব্ধির মধ্যে মুক্তি পেল। ব্যক্তিগত মোহের আসক্তি থেকে বিশ্বগত সত্যের মুক্তিলোকে 'নাই'-অন্ধকারকে অতিক্রম করে 'আছে'-আলোকের মধ্যে এই নিষ্ক্রমণের অনুভূতি বর্ণনা করে কবি লিখেছেন, 'তবু এই দুঃসহ দুঃখের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে, এই দুঃখের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে-গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদি নহি, এই চিন্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল, এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেখিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেই ক্ষণে ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেখিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসারের বিশ্বব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলই প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে-ভার বদ্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাখিয়া দিবে না—একেশ্বর জীবনের দৌরাত্ম্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য নূতন সত্যের মতো আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।'

এই 'আশ্চর্য নূতন সত্যের' সন্ধান, জীবনের প্রতি নিজের অন্ধ আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বসত্যের মধ্যে এই নিষ্ক্রমণের ফলেই কবি 'মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপরে' জগৎকে সম্পূর্ণ করে সুন্দর করে দেখার নূতন সৌন্দর্যদৃষ্টি লাভ করলেন। বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যরূপের সাক্ষাৎ তিনি কি ভাবে পেলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন, 'সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও গভীররূপে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুদিনের জন্য জীবনের প্রতি আমার অন্ধ আসক্তি একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই, চারিদিকে আলোকিত নীল আকাশের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুধৌত চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং সুন্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে-দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।'

আসক্তির বন্ধন থেকে এই মুক্তিকে কবি বলেছেন তাঁর জীবনে যেন 'একটা ছুটির পালা।' 'সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা সৃষ্টিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলৌকিকতাকে নিরতিশয় সত্য পদার্থের মতো মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্বদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। * * কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল বৃষ্টি বাদল শীতেও তেতলায় বাহিরের বারান্দায়, সেখানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

'এ সমস্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছ্রসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়কে যখন নিতান্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তখন পাঠশালার প্রত্যেক ছোটো ছোটো শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম।'

কিন্তু এই মুক্তির আস্বাদন কবি সহজে পান নি। এ মুক্তি পলায়নী-মনোবৃত্তিসম্পন্ন রোমান্টিক কবিমানসের কল্পনাভিলাষ থেকে আসে নি, 'সংসারের বেত-হাতে গুরুমহাশয়ের' আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে তবেই

কবি এই মুক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে 'নাই'-অন্ধকার থেকে 'আছে'-আলোকে এই মুক্তির জন্যে কবির 'সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র যে দুঃসাধ্য চেষ্টা' করত তারই একটি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লিখছেন, 'বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো-একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালোপাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁক-পাড়া কোনো-একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবন-লোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।'

জীবনের নদী গিরি অরণ্যের ঝলমল রূপ দেখার আগে 'সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মত দুই হাত বুলাইয়া ফিরিবার' এই উৎপ্রেক্ষাসৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন কবির পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, এ রচনা মৃত্যুশোকের সাতাশ বৎসর পরে লেখা। অর্থাৎ তখন বেদনার অগ্নিদাহ নির্বাপিত হয়ে অনুক্ষণ-জালার অবসান হয়েছে, রয়েছে তার স্মৃতি। কিন্তু সেই অগ্নিদাহের স্মৃতিমাত্রের উদ্বোধনে যদি এই উৎপ্রেক্ষার সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হলে যখন কবি সেই দাহে দগ্ধ হচ্ছেন তখন তাঁর চিত্তে দুঃখ কী মর্মান্তিক মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এ কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয় যে, যখন অর্ধরাত্রে সেই দুঃখরাজের রথচক্রের বজ্রগর্জনে মেদিনী বলির পশুর হৃৎপিণ্ডের মত কেঁপে ওঠে তখনও কবি সেই প্রচণ্ড আবির্ভাবের জয়ধ্বনি করেছেন। কেন না তিনি জেনেছেন অমাবস্যার অন্ধকারে অনন্ত জ্যোতিষ্কলোককে যেমন প্রকাশ করে দেয় তেমনই দুঃখের নিবিড়তম তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আত্মা আনন্দলোকের ধ্রুবজ্যোতি দেখতে পায়। তাই তাঁর দৃষ্টিতে দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। এই জন্যেই কবিচেতনায় মৃত্যুতত্ত্ব ও দুঃখতত্ত্ব চিরদিন অসামান্য গুরুত্ব পেয়েছে। আর, বলাই বাহুল্য, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুই কবিকে সেই দুঃখের সন্ধান দিয়েছে যে-দুঃখকে তিনি বিশ্বজগতের তেজঃপদার্থের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, মানুষের চিত্তে 'তাহাই আলোক, তাহাই তাপ, তাহাই গতি, তাহাই প্রাণ।' কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুজনিত দুঃখের আগুন তাঁকে শুধু দগ্ধই করে নি, সেই তেজঃশক্তিই তাঁর সত্তায় দিয়েছে আলো, দিয়েছে তাপ, দিয়েছে গতি, দিয়েছে প্রাণ। সাত বৎসর বয়সে একদিন যাঁর সোনার কাঠির ছোঁওয়ায় শিশু রবির ঘুম ভেঙেছিল, সতের-বৎসরব্যাপী অনুক্ষণ সঙ্গ ও সান্নিধ্যের প্রেরণা দিয়ে যিনি সেই শিশুসত্তাকে কবিসত্তায় রূপান্তরিত করেছিলেন, চব্বিশ বৎসর বয়সে তাঁরই শ্মশানবহ্নির অগ্নিশলাকায় উদ্দীপ্ত হয়ে সেই কবি খুঁজে পেলেন তাঁর জীবন ও জগতের মূলসত্যকে। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবনে কাদম্বরী দেবীর স্বেচ্ছামৃত্যুই তাঁর সবচেয়ে বড় প্রেমের দান।

৫

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর সাতাশ বছর পরে 'জীবনস্মৃতি'তে অভিব্যক্ত কবির স্মৃতিচিন্তনের আলোকে মৃত্যুর স্বল্পকালের মধ্যে লেখা রচনাবলীর বিশ্লেষণ করলে সদ্যঃশোকার্ত ও দুঃখাভিহত তরুণ কবিচিত্তের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে। আমরা মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে লেখা অর্থাৎ ১২৯১ বঙ্গাব্দে সাময়িক-পত্রিকায় প্রকাশিত কবির রচনাবলীর কথা উল্লেখ করেছি। ১২৯২ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' এবং 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও কবিতার কথাও এই প্রসঙ্গে অবশ্য-স্মর্তব্য। ১২৯২ সালের 'ভারতী'তে বৈশাখে বেরোয় নূতন (কবিতা) [হেথাও তো পশে সূর্যকর।], পুষ্পাঞ্জলি, রসিকতার ফলাফল (প্রবন্ধ); জ্যৈষ্ঠে বিবিধ প্রসঙ্গ [১-১৩]; শ্রাবণে সাকার ও নিরাকার উপাসনা (প্রবন্ধ); ভাদ্রে বিবিধ প্রসঙ্গের [১-১৭] দ্বিতীয় কিস্তি; এবং ফাল্গুনে 'পত্র' (কবিতা) [জলে বাসা বেঁধেছিলেম, ডাঙায় বড় কিচিমিচি]। এই বৎসরই জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুরবাড়ি থেকে 'বালক' পত্রিকা প্রকাশিত হল। এই বৎসরে কবির বেশীর ভাগ

রচনাই 'বালকে' প্রকাশিত হয়েছে। বৈশাখে 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' (কবিতা), কাজের লোক কে ? [বানরের কাহিনী], মুকুট, গুটিকত গল্প [শিশুশিক্ষামূলক নিবন্ধ], ফুলের ঘা (কবিতা) [বসন্ত বালক মুখভরা হাসিটি]; জ্যৈষ্ঠে মা লক্ষ্মী (কবিতা) [কার পানে মা চেয়ে আছ মেলি দুটি করুণ আঁখি।], লাঠির উপর লাঠি [জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রবন্ধের উত্তর], মুকুট, চিরঞ্জীবেষু [চিঠিপত্র], হেঁয়ালি নাট্য ; আষাঢ়ে সাত ভাই চম্পা (কবিতা), দশদিনের ছুটি [ভ্রমণ কাহিনী, বিচিত্র প্রবন্ধের 'ছোটনাগপুর'], রাজর্ষি [উপন্যাস, এর পর থেকে প্রতিমাসে ক্রমশঃ প্রকাশিত], শ্রীচরণেষু [চিঠিপত্র], হেঁয়ালি নাট্য, আকবর শাহের উদারতা [শিশুশিক্ষামূলক]; শ্রাবণে ন্যায়দর্শ [শিশুশিক্ষামূলক], বীরগুরু [গুরু গোবিন্দের কথা], হাসিরাশি (কবিতা) [তার নাম রেখেছি বাবলারাণী একরত্তি মেয়ে], চিরঞ্জীবেষু, বর্ষার চিঠি (কবিতা), হেঁয়ালি নাট্য ; ভাদ্রে পুরানো বট (কবিতা), শ্রীচরণেষু, হেঁয়ালি নাট্য ; আশ্বিন-কার্তিকে বাঙ্গালা উচ্চারণ [শব্দতত্ত্ব], চিরঞ্জীবেষু, হেঁয়ালি নাট্য ; আকুল আহ্বান (কবিতা) [অভিমান করে কোথায় গেলি। আয় মা ফিরে আয় মা ফিরে আয়।], রুদ্ধগৃহ (প্রবন্ধ), বরফ পড়া [শিশুপাঠ্য], শিখ স্বাধীনতা [শিশুপাঠ্য]; অগ্রহায়ণে বৈজ্ঞানিক সংবাদ [শিশুপাঠ্য], পথপ্রান্তে (প্রবন্ধ), শিউলিফুলের গাছ, হেঁয়ালি নাট্য, একটি প্রশ্ন [শব্দতত্ত্ব]; পৌষে আহ্বানগীত (কবিতা) [পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ], উত্তর-প্রত্যুত্তর [রুদ্ধগৃহ সম্পর্কে অক্ষয় চৌধুরীর পত্র ও রবীন্দ্রনাথের উত্তর], শ্রীচরণেষু, হেঁয়ালি নাট্য ; মাঘে হেঁয়ালি নাট্য, চিরঞ্জীবেষু ; ফাল্গুনে চিঠি (কবিতা) [চিঠি লিখব কথা ছিল, দেখছি সেটা ভারি শক্ত], সংজ্ঞা বিচার [শব্দতত্ত্ব]; এবং চৈত্রে ডেঁপো পিঁপড়ের মন্তব্য [রসরচনা], বানরের শ্রেষ্ঠত্ব [তদেব], জন্মতিথির উপহার (কবিতা) [স্নেহ উপহার এনেছিরে দিতে। লিখেও এনেছি দু তিন ছত্তর], শ্রীচরণেষু, চিরঞ্জীবেষু, সত্য [প্রবন্ধ], অবসাদ (কবিতা—বাল্যকালের লেখা) [দয়াময়ি, বাণি, বীণাপাণি], হেঁয়ালি নাট্য।

এই রচনাবলীর মধ্যে "নূতন" কবিতা এবং "পুষ্পাঞ্জলি", "বিবিধ প্রসঙ্গ", "রুদ্ধগৃহ", "পথপ্রান্তে" ও "শিউলিফুলের গাছ" এই গদ্যরচনাপঞ্চক কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর প্রত্যক্ষ-প্রভাব-সঞ্জাত সৃষ্টি। মৃত্যুশোক কবিমানসে কী বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এই পাঁচটি নিবন্ধের মধ্যে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১২৯১ ও ৯২ এই দু বৎসরের মধ্যে কবির অন্যান্য রচনাকে মুখ্যত দুটি পর্যায়ভুক্ত করা চলে ; প্রথম পর্যায়ে শিশুপাঠ্য রচনা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সমাজ-ধর্ম-সংক্রান্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে মহর্ষিদেব রবীন্দ্রনাথকে আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক-পদের দায়িত্বপূর্ণ কর্মে আহ্বান করলেন। রবীন্দ্রনাথের স্কন্ধে এই প্রথম সামাজিক কর্তব্যপালনের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব ন্যস্ত হল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসাবে নবহিন্দুধর্ম-ব্যাখ্যাতা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরিকরবৃন্দের সঙ্গে এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের বাগ্‌যুদ্ধের সূত্রপাত হল। প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ এবং তদ্দ্বারা সত্যপ্রতিষ্ঠায় তরুণ রবীন্দ্রনাথের নিষ্ঠা ও উদ্দীপনার ফলে "একটি পুরাতন কথা", "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" এবং "সত্য" প্রভৃতি প্রবন্ধের আবির্ভাব ঘটেছে।

কিন্তু শিশুসাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা বহিরাগত নয়, তা তাঁর প্রাণাবেগের তাগিদেই উৎসারিত। ঠাকুরবাড়ির বালকবালিকাদের রচনায় উৎসাহদান এবং তাদের সাহিত্যামোদী করে তোলার উদ্দেশ্যেই 'বালক' পত্রিকার উদ্ভব হয়েছিল। বালকবালিকাদের মধ্যে তখন এ বাড়িতে আছেন প্রতিভা দেবী, সুধীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ও ইন্দিরা এবং ও বাড়িতে গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ। এই নামাবলীর মধ্যে যে নামটি বাদ পড়েছে সেটি হল কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর। 'বালক' প্রকাশের সময় মৃণালিনী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাবধূ। মৃণালিনী দেবী আর ইন্দিরা দেবী ছিলেন সমবয়স্কা। সমবয়স্কা এই দুই বালিকার মধ্যে সখীত্ব-সম্বন্ধ গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব-দাম্পত্যজীবনের প্রথম স্তরে এই সখীত্ব নানাদিক দিয়েই ফলপ্রসূ হয়েছিল। বালিকাবধূর প্রতি কবির পূর্বরাগ-প্রকাশের পক্ষেও তা ছিল সহায়ক। একটা উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। ১২৯২ সালে

বোম্বাই থেকে কবি "চিঠি" নামে একটি পত্রকাব্য প্রেরণ করেন। ফাল্গুনের 'বালকে' তা প্রকাশিত হয়। 'শ্রীমতী—প্রাণাধিকাসু'—এই চিঠির উদ্দিষ্টা। তাতে কবি লিখছেন, 'চিঠি লিখব কথা ছিল, দেখছি সেটা ভারি শক্ত।' এই চিঠিতে যে 'দুষ্টু মেয়েটি'র কথা আছে তার মধ্যে 'বিবি' ও 'ফুলি' দুটি সত্তাই যেন এক হয়ে গেছে। 'ফুলি' অর্থাৎ মৃণালিনী ঠাকুর-পরিবারে এসেও তাঁর পুতুলের খেলাঘর সাজিয়ে পরিতৃপ্ত থাকতেন। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের "বালিকা-বধূ" কবিতায় নিজের বালিকাবধূর বাল্যলীলারই প্রতিবিম্ব কবি রচনা করেছেন। মহর্ষি-পরিবারে মৃণালিনীর শিক্ষা-দীক্ষার যে আয়োজন হয়েছিল তার কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 'বালক' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে-সব শিশুপাঠ্য কবিতা ও নিবন্ধাদি রচনা করেছেন সেগুলির মুখ্যপ্রেরণা এসেছে বালিকাবধূর শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের বাসনা থেকে। 'হেঁয়ালি নাট্যে' মাসের পর মাস তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব খেলাঘরই সাজিয়েছিলেন।

বালিকাবধূর পুতুলের সংসার সম্পর্কে কবির সস্নেহ অনুরাগের একটি মধুর আলেখ্য পাওয়া যাবে একটি অপ্রত্যাশিত সূত্রে। 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ "বাংলা-উচ্চারণে" এই ছবিটি আত্মগোপন করে আছে। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯২ সালের 'বালকে'র আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়; অর্থাৎ কবির বিবাহের ঠিক দু বছর পরে। মহর্ষি-পরিবারে যশোর-খুলনার বধূদের প্রথম সংস্কার হত তাঁদের 'বাঙাল'-উচ্চারণ সংশোধনের দ্বারা। "বাংলা-উচ্চারণ" প্রবন্ধ রচনার মূলে কবিজায়ার উচ্চারণ-সংস্কারের প্রেরণা কবিমানসে ক্রিয়াশীল হয়েছিল অনুমান করা অন্যায় হবে না। এই প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, ইংলণ্ডে থাকতে তাঁর একজন ইংরেজ বন্ধুকে [স্কট-দুহিতা প্রসঙ্গ স্মরণীয়] বাংলা পড়াবার সময় বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে তাঁর মনে যে সব প্রশ্ন জাগে সেগুলি তিনি একটি খাতায় লিখে রেখেছিলেন। বাংলা অভিধানের সাহায্যে উদাহরণ সংগ্রহ করে উচ্চারণের বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টাই ছিল এই লেখার উদ্দেশ্য। কবি লিখছেন :

'এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পুরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, একদিন সকালবেলায় ধুলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে চাহিয়া দেখি—গোটা দশেক হলদে রং-করা মস্ত খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সের মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজপত্র কোথায়। কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড়চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণটুকু পর্যন্ত কিছুরই ত্রুটি দেখিলাম না, কেবল আমার কাগজগুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণের ঘরে এমনই একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিত প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে, তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।"[১০]

এই উদ্ধৃতির অন্তিম মন্তব্যটির ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। কবির নিজের জীবন-ব্যাকরণের তদ্ধিত প্রত্যয়ের বিশৃঙ্খল সূত্রগুলির মধ্যে তিনি যখন একটা নিয়ম আবিষ্কারের জন্য দুঃসাধ্য গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন তখন তাঁর ঘরের বালিকাবধূটি তাঁর পুতুলখেলা নিয়েই পরিতৃপ্ত ছিলেন বলে তাঁর কাছে 'সমস্যাসংকুল এই পৃথিবী' ছিল একান্তই 'নিষ্কণ্টক'। বস্তুত, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুকালে মৃণালিনী ছিলেন নিতান্তই বালিকা। তাঁর পুতুলের খেলাঘরে পৃথিবীর হরণপূরণলীলার কোনই ছায়া তখনও পড়ে নি। বিবাহের অব্যবহিত পরে রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা করেছিলেন সেই 'অকিঞ্চিৎকর' 'নলিনী'-গদ্যনাট্যে তিনি বালিকা 'ফুলি'র যে ভূমিকা কল্পনা করেছিলেন সেদিন তাঁর জীবননাট্যেও তাঁর বালিকাবধূ 'ফুলি'র ভূমিকা তার অধিক ছিল না। এই 'নলিনী' নাটক-রচনার ইতিহাসটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কবির বিবাহের আনন্দানুষ্ঠানকে মধুরতর করে তোলবার জন্য একটি নাটক-

অভিনয়ের প্রস্তাব হল। স্থির হল যে, এই নাটকের রচয়িতা হবেন অভিনেতারা স্বয়ং। মোটামুটি ভাবে একটি গল্পকাঠামো খাড়া করে অভিনয়ের অংশ নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল,—এবং স্থির হল যে, একজন নিজের অংশ লিখে দিলে অন্যজন তাঁর অংশ লিখবেন। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, এ ভাবে নাটক রচনা সম্ভব হয় না। কাজেই শেষকালে রবীন্দ্রনাথ নিজে প্রাথমিক খসড়ার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুললেন যে গদ্যনাট্য তার নামকরণ করা হল 'নলিনী'—রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নাম। নাটক-রচনা শেষ হল বটে, কিন্তু তার অভিনয় আর হল না। বৈশাখে কাদম্বরী দেবী লোকান্তরিতা হলেন।'[১১]

এই গদ্য-নাট্যখানিকে কবি 'অকিঞ্চিৎকর' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু 'মায়ার খেলা'র ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছেন যে, 'নলিনী'র সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে। 'নলিনী' নাটকে নলিনী নীরদ নীরজা ও নবীনকে অবলম্বন করে প্রেমের যে চতুর্ভুজ-সমস্যা রচিত হয়েছে সেখানে 'বালিকা ফুলি' তার শিশুচিত্তের কৌতূহল নিয়ে কেবল দক্ষিণ সমীরণের স্নিগ্ধ স্পর্শের মত নায়ক-নায়িকার চিত্তে লগ্ন হয়ে আছে। কখনও সে তার অজ্ঞাতসারে বকুল গাছের তলায় ঝরে-পড়া সুন্দর ফুলগুলি মাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়; কখনও অন্যের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে তাকে ডাক দেয় ফুলের আর পাখির আর গানের আনন্দমন্ত্রে।

সেদিন রবীন্দ্রজীবনে তাঁর বালিকাবধূ ফুলিরও ছিল ওই একই ভূমিকা। কিন্তু ওই 'নবীনা' 'বুদ্ধিবিহীনা বালিকাবধূ'র প্রতি কবির প্রথমানুরাগ সঞ্চারিত হল মৃত্যুর করুণ পটভূমিকার উপর। হাসিকান্নায় একেবারে নিরেট-করে বোনা জীবনটার একটা প্রান্ত যখন মৃত্যু এসে একেবারে ফাঁক করে দিয়ে গেল তখন কবি প্রত্যক্ষ করলেন যে, কাছে-পাওয়া এবং ধরে-রাখাটাই জীবনের একমাত্র সত্য নয়, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে চলে-যাওয়া এবং ছেড়ে-দেওয়াটাও সমান ভাবেই সত্য। মৃত্যুসাক্ষিক এই জীবনসত্যই 'সোনার তরী'র যুগে "যেতে নাহি দিব" কবিতায় মানবক্রন্দনের মর্মান্তিক ট্র্যাজিক-চেতনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে :

> এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
> সব চেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
> গভীর ক্রন্দন "যেতে নাহি দিব।" হায়,
> তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়!

'মরণপীড়িত এই চিরজীবী প্রেমে'র দৃষ্টি দিয়েই কবি তাঁর বালিকাবধূর অস্ফুট নয়নকমলের দিকে প্রথম সকরুণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। অন্তরে এই উপলব্ধির প্রথম সঞ্চার সম্পর্কে তিনি বলছেন :

'প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ, প্রতিদিনের ধূলারাশি আমাদের চারিদিকে ভিত্তি রচনা করিয়া দেয়, শোকের এক ঝটিকায় সে সমস্ত ভূমিসাৎ হইয়া যায়, আমরা অনন্তের রাজপথে বাহির হইয়া পড়ি। এতদিন আমরা প্রতিদিনের মানুষ ছিলাম, এখন আমরা অনন্তকালের জীব। এতদিন আমরা বাড়ি ঘর দুয়ারের জীব ছিলাম, এখন আমরা অনন্ত জগতের সীমাহীনতার মধ্যে বাস করি। যাহাদিগকে নিতান্ত আপনার মনে করিয়াছিলাম, তাহারা তত আপনার নহে, সেইজন্য তাহাদিগকে বেশী করিয়া আদর করি, মনে করি এ পান্থশালা হইতে কে কবে কোন্ পথে যাত্রা করিবে, এ দুদিনের সৌহার্দ্যে যেন বিচ্ছেদ বা অসম্পূর্ণতা না থাকে।'[১২]

মৃত্যুপ্রত্যক্ষ-করা এই 'বিশ্লেষবিধুরাতি'—এই হারাই-হারাই ভাব থেকেই তরুণ কবির দাম্পত্যচেতনার প্রথম সুর রচিত হয়েছে। এই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ রয়েছে ১২৯২ সালের বৈশাখে প্রকাশিত "নূতন" কবিতায়। এই কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন :

> একি ঢেউ-খেলা হায়, এক আসে আর যায়,
> কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
> বিলাপের শেষ তান না হইতে অবসান
> কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি।
> আয় রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দু-দিন বই
> এ পবিত্র অশ্রুবারিধারা।
> সংসারে ফিরিব ভুলি, ছোটো ছোটো ফুলগুলি
> রচি দিবে আনন্দের কারা।
> না রে, করিব না শোক, এসেছে নূতন লোক,
> তারে কে করিবে অবহেলা।
> সেও চলে যাবে কবে, গীত গান সাঙ্গ হবে,
> ফুরাইবে দু'দিনের খেলা।[১৩]

'এসেছে নূতন লোক', 'সেও চলে যাবে কবে, গীত গান

সাঙ্গ হবে', এবং দু'দিনের খেলা ফুরিয়ে যাবে—এই চেতনাতেই কবি তাঁর সংসারের একটি নিঃসহায় বালিকামূর্তির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। এই একই অনুভূতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে পরবর্তী বৎসরের 'ভারতী ও বালক'-এ প্রকাশিত "বিরহীর পত্র" কবিতায় [ভাদ্র, ১২৯৩, পৃ. ৩১৪-১৫]। সেখানেও একই চেতনার অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হবে। প্রবাসে গিয়ে প্রোষিত-ভর্তৃকা ত্রয়োদশী বধূর কথা চিন্তা করে কবি লিখছেন :

হয় কি না হয় দেখা, ফিরি কি না ফিরি,
দূরে গেলে এই মনে হয়,
দুজনার মাঝখানে অন্ধকারে ঘিরি
জেগে থাকে সতত সংশয়।
এত লোক, এত জন, এত পথ গলি,
এমন বিপুল এ সংসার,
ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি,
ছাড়া পেলে কে আর কাহার!

* * *

কে কোথায় হারাইব কোন্ রাত্রিবেলা
কে কোথায় হইব অতিথি।
তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি।

তাই মনে করে কিরে চোখে জল আসে
একটুকু চোখের আড়ালে।
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালবাসে
সেও কি রবে না এককালে।
আশা নিয়ে একি শুধু খেলাই কেবল—
সুখ দুঃখ মনের বিকার।
ভালোবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল,
চায়, পায়, হারায় আবার।[১৪]

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুশোক কবিকে কি ভাবে তাঁর বালিকা-বধূর প্রতি আকৃষ্ট করেছে, কি ভাবে বিচ্ছেদের অনুক্ষণ-আশঙ্কা নবমিলনকে অশ্রুমধুর করে রেখেছে এই রচনাগুলি তারই চিরন্তন সাক্ষী।

[ক্রমশঃ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

৮ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৬২-১৬৩।

৯ The Poet, Golden Book of Tagore, পৃ. ২৫-২৬।

১০ বালক, আশ্বিন-কার্তিক ১২৯২। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র রচনাবলী-১২, পৃ. ৩৩৯-৪০।

১১ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রজীবনী-১, পৃ. ১৫০-৫১।

১২ বিবিধ প্রসঙ্গ, ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

১৩ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র রচনাবলী-২, পৃ. ৩৫।

১৪ দ্রষ্টব্য, তদেব, পৃ. ৫৩-৫৪।

প্রসঙ্গ কথা

সৃজনধর্মিতার লক্ষণ

নারায়ণ চৌধুরী

আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে 'সৃজনধর্মিতা' কথাটা নিয়ে বড় বেশী বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে। এ রকম মতবাদের প্রবক্তার অভাব নেই যাঁরা বলেন, সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বোধ্য-দুর্বোধের প্রসঙ্গ অবান্তর; সাহিত্য সৃজনধর্মিতার লক্ষণ দ্বারা মণ্ডিত হয়েছে কিনা সেইটেই হল আসল বিচার। এই বিচার-পরীক্ষায় যে রচনা পাস-মার্ক পেয়ে গেল তার শত দোষ মাপ, সাত খুনেও তার বিরুদ্ধে নালিশ জানানো চলবে না। আবার কেউ কেউ আছেন, যাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, একটি তিল-পরিমাণ সৃজনাত্মক রচনা তাল-পরিমাণ অন্যবিধ রচনা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। দুটো খুচরো কবিতা, তিনটে পাঠক-রঞ্জনী গল্প লিখে যিনি সাহিত্যে সস্তা লোকখ্যাতি অর্জন করেছেন এবং ওই কৃতিত্বের পুঁজিটুকু বাদে যাঁর আর কোন মানসিক সম্বল নেই, তিনি একজন প্রকৃত পণ্ডিত, গবেষক, ইতিহাসকার, মনীষী অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ। কেন না তিনি 'সৃষ্টিধর্মী' রচয়িতা আর শেষোক্ত জনেরা সাহিত্যের নিতান্তই কোদাল-চালিয়ে লেখক মাত্র। এঁদের বিদ্যাবত্তা মনীষা চিন্তাশীলতা সমাজকল্যাণ-স্পৃহা সমাজসচেতনতা কিছুই কিছু নয়, এঁদের কোন-কিছুরই কোন মূল্য নেই; শুধু সাহিত্যের আকাশে জলজল করে শোভা পাচ্ছে কয়েকটি সৃজনধর্মী তারা, যাদের রোশনাইয়ে আর সবাকার প্রতিভা একান্ত নিষ্প্রভ, মলিন।

তারার উপমাটি উদ্দেশ্যহীন নয়। বর্তমান প্রসঙ্গে তার একটি বিশেষ প্রয়োগসিদ্ধতা রয়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের কোন-এক পুচকে কবি কয়েক বছর আগে কোন-এক বিশিষ্ট সমালোচককে এই বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন যে, তিনি সমালোচকের চেয়ে বড় এই কারণে যে তিনি 'তারা সৃষ্টি' করতে পারেন, সমালোচকের তারা সৃষ্টির ক্ষমতা নেই। সমালোচক যতই ওই কবির কবিতায় গলদ আবিষ্কার করুন না কেন, কবিকে ছাড়িয়ে তিনি কখনই উঠতে পারবেন না, যেহেতু তিনি 'স্রষ্টা', সমালোচক স্রষ্টা নন।

অহো সৃষ্টির মহিমা! দুটো ঠুনকো কবিতা লিখলেই তারা সৃষ্টি হয়ে গেল! তারা সৃষ্টি এতই সহজ কথা! খাঁটি কবিরা সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনায় প্রাণের গভীর আকূতি ঢেলে কবিতা রচনার দ্বারা কাব্যাকাশে দুটি কি চারটি তারা ফুটিয়ে যান, আর ওই সদ্যোজাত কবি দুদিন কবিতা লিখেই দাবি করছেন তিনি তারা সৃষ্টি করতে জানেন! কাব্যরচনা মাত্রই যেন ফুলঝুরি বাতির আগুন, যার একটু স্ফুলিঙ্গ যোগে বাতি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তারা ছিটনো কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু আকাশের তারা অত সস্তায় গজায় না। তেমন তারা সৃষ্টির জন্য জীবনব্যাপী মনন ধ্যান অনুশীলনের প্রয়োজন। কোন্‌টি তারা আর কোন্‌টি উল্কার ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্য মাত্র সেটি নিরূপণে সর্বদাই বিচার-তীক্ষ্ণতা জাগিয়ে রাখতে হয়। এই ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি হামেশা ঘটে থাকে, আর তা ঘটে বলেই উল্কাপাতরূপ সাময়িক আলো-বিচ্ছুরণকেও তারার গরিমা মনে করে আত্মসন্তোষ লাভে আমাদের আগ্রহের কমতি দেখা যায় না।

উপরের কথাগুলি নিছক সাধারণ মন্তব্য নয়, আমাদের সাহিত্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতটি বিশেষ ভাবে মনে রেখে এ সকল কথা বলছি। নূতন-প্রকাশিত যেমন-তেমন কোন গল্প-উপন্যাস-কবিতার বইকে পুস্তক-সমালোচনায় অগ্রপ্রাধান্য দিয়ে ও তাদের সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ব্যবস্থা করে তারপর তার তলায় কোন এক

সুখ্যাত মনীষীর বা ইতিহাসকারের মূল্যবান গ্রন্থের দায়-সারা গোছের আলোচনা পত্রস্থকরণের নজির আমাদের সাময়িক পত্রাদিতে ও দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য-ক্রোড়পত্রে এতই অধিক ও ঘনঘনদৃশ্যমান যে দৃষ্টান্তস্বরূপ কোন বিশেষ পত্র-পত্রিকাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এটি একটি পরিচিত কার্যক্রম এবং এই বাবদে সৃজনধর্মী সাহিত্যের পোষকতা করা হচ্ছে বলে সম্পাদকের মনে যে আত্মপ্রসাদের ভাব নেই তাও জোর করে বলবার উপায় নেই। এই আত্মপ্রসাদের যুক্তি কী। যুক্তি এই যে, সৃজনধর্মী সাহিত্য অর্থাৎ সৃজনের লক্ষণাক্রান্ত সাহিত্য যে-কোন সময় যে-কোন অবস্থায় মননশীল সাহিত্য অপেক্ষা অধিক বরণীয়। গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে প্রথমের মূল্য যৎকিঞ্চিৎ আর শেষোক্তের মূল্য সবিশেষ হলেও কোন কারণেই ক্রমের ব্যতিক্রম বা বৈপরীত্য ঘটানো চলবে না। হেতু? না, হেতু এই যে, সৃষ্টি সব সময়েই সৃষ্টি, আর মননশীল সাহিত্যে যতই কেন না বুদ্ধি ও বিদ্যার তীক্ষ্ণতা দীপ্তি মৌলিকতা পরিলক্ষিত হোক তার স্থান সর্বদাই সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নীচের কোঠায়। এর থেকে উদ্ভট এবং হাস্যকর যুক্তি আর কী হতে পারে জানি না।

আমাকে কেউ ভুল বুঝবেন না। সত্যিকার সৃষ্টিধর্মী (creative) সাহিত্যের মূল্য-মর্যাদা খাটো করা আমার আদৌ অভিপ্রায় নয়, কোন সম্যক্‌দর্শী সমালোচকেরই তা অভিপ্রায় হতে পারে না। প্রকৃত সৃজনী প্রতিভার লক্ষণাক্রান্ত রচনা সব-সেরা সৃষ্টি, তার সঙ্গে অন্য কোন প্রকার রচনাই তুলনীয় নয়। কালিদাস ভবভূতি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস মাইকেল বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ পুরাতন-নূতন স্বদেশীয় লেখকগণ—বিদেশী লেখকদের কথা আপাততঃ উহ্যই থাকল—তাঁদের রচনার সৃষ্টিমাহাত্ম্যে যে কীর্তির অধীশ্বর হয়েছেন তার দীপ্তি বোধ হয় কোন কালেই ম্লান হবার নয়। এই সব লেখকের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল সৃষ্টির সম্ভাব্যতা ও মৌলিকতা, আর ওই কারণেই বিশেষ করে এঁরা কালজয়ী মহিমার অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু এঁদের বেলায় যে নিয়মের সত্যতা প্রতিপন্ন, সেই নিয়ম সবার বেলায় খাটবে এমন হওয়া সম্ভব নয়। এই নিয়মের বিপরীতটি সত্য নয়। 'সৃষ্টিধর্মী' আখ্যায় যে সকল রচনা বাজারে চলে তার অধিকাংশই সংজ্ঞার্থে সৃষ্টিধর্মী নয়, সুতরাং সৃষ্টিধর্মিতার কৃতিত্ব ও গৌরব তাদের প্রাপ্য নয়। মন থেকে যা-হোক তা-হোক কিছু একটা বানিয়ে লিখলেই তা সৃষ্টিধর্মী হয় না। তথাকথিত সৃষ্টিধর্মিতার আবরণে আপনাকে আবৃত করে কত যে ভুষো মাল বাজারে চলছে তার আর লেখাজোখা নেই। এখনকার অধিকাংশ গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা-কবিতার বিষয়বস্তু ও রচনা-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, সেগুলি সৃষ্টিধর্মী রচনা তো নয়ই, আসলে তাদের কোন পর্যায়েই ফেলবার উপায় নেই। এর চেয়ে সাধারণ মানের প্রবন্ধ-নিবন্ধ শিক্ষা ও তথ্যমূলক রচনা অনেক—অনেক বেশী মূল্যবান। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার আর যে অপূর্ণতাই থাক্ সৃষ্টিধর্মিতার ভড়ং নেই। তাদের একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকে এবং সে বক্তব্যটি উপযুক্ত উপাদানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হলেই তাদের কাজ ফুরিয়ে গেল। কিন্তু পূর্বোক্ত শ্রেণীর রচনাগুলি যে আসলে কিছুই নয়। গল্প-উপন্যাস নামে যেগুলি চলে হয় সেগুলি অসার মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী, নয় যাহোক-তাহোক একটা জীবনের খণ্ডচিত্রকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে রাঙিয়ে-ছুপিয়ে পাঠকদের সামনে পরিবেশনের চটুল প্রয়াস। তাদের পিছনে না আছে দার্শনিকতার প্রজ্ঞাশীল দ্যোতনা, না আছে কাব্য-কল্পনার গাঢ় অনুভূতি, না বা বাস্তব চেতনার ঋজু-কঠিন ভিত্তিভূমি। আর কবিতা নামে যে সব সাজানো-লাইনে-ভাগ-করা অক্ষর-সমারোহ আজকাল পত্র-পত্রিকায় চোখে পড়ে তার তো অধিকাংশেরই কোন মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না। ওসব হিংটিংছট বর্গায় রচনা এত বেশী সাংকেতিকায় ভরা যে ওই বিশেষ প্রকরণে অভ্যস্ত পাঠক ছাড়া তাদের মর্মোদ্ধার করা কারও পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। ধাঁধাকে ধাঁধা বললে তার রহস্যের কিনারা না হলেও তার স্বরূপটি অন্ততঃ বোঝা যায়, কিন্তু যেইমাত্র তার উপর সৃষ্টিধর্মিতার লেবেল আঁটা গেল অমনই সেটি এক স্বর্গীয় বস্তুতে পরিণত হয়ে গেল। তখন তার চেকনাই-ই বা কত, তদ্দরুন ডঙ্কানিনাদই বা কত! সৃষ্টিধর্মিতার অজুহাতে ও আচ্ছাদনে কত যে আবর্জনা সাহিত্যের আস্তাকুঁড় থেকে সাহিত্যের সদর-আঙিনায় প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

আসলে অধিকাংশ রচনার বেলায়ই সৃষ্টিধর্মিতা কথাটি একটি কল্পকথা মাত্র। ওই মহৎ পরিচয়ের দ্বারা রচনা-মাত্রকে পরিচায়িত করবার চেষ্টা কথাটির অন্তর্নিহিত মহত্ত্বের অপকর্ষ ঘটানো। যে-কোন যুগে যে-কোন পর্বে মুষ্টিমেয়সংখ্যক রচনাকেই কেবলমাত্র সত্যিকার অর্থে সৃষ্টিধর্মী আখ্যা দেওয়া যায়। কিন্তু এখন যেন 'সৃষ্টিধর্মী' বিশেষণ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে হরির লুঠ চলছে। যেমন-তেমন একটা মন-গড়া লেখা হলেই দিয়ে দাও তার উপর সৃষ্টিধর্মিতার তিলক-ছাপ। তাতে লেখারও কৌলীন্য লেখকেরও কৌলীন্য। এতদ্বারা লেখকদের মধ্যে যে একটা কৃত্রিম শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হচ্ছে সেদিকে কারও দৃক্‌পাত নেই। এক শ্রেণীর লেখককে কুলীন বললে অন্য এক শ্রেণীর লেখককে অকুলীন বলতে হয়। কারণ কুলীন কথাটা আপেক্ষিক। কিন্তু যথার্থই লেখকসম্প্রদায়ের ভিতর এই কুলীন-অকুলীন মেলপর্যায়ের অবতারণা যুক্তিযুক্ত কিনা সে কথা কেউ ভেবে দেখেন না। যেসব লেখক অন্যবিধ রচনাকর্মের অনুশীলনে নিরত আছেন তাঁরা যেহেতু লৌকিক অর্থে 'সৃষ্টিশীল' লেখক নন সেই কারণেই যেন তাঁদের উপর আমরা বীতরাগ। তাঁদের আর-সব কৃতিত্ব খারিজ প্রায়, শুধু তাঁদের একটি 'অকৃতিত্ব'কে চিহ্নিত করে আমরা তাঁদের উপর মহা-খাপ্পা হয়ে আছি। আমরা তাঁদের বিদ্যাবত্তার সম্মান দেব না মনীষা ও চিন্তাশীলতার সম্মান দেব না তথ্যসংগ্রহনিষ্ঠার সম্মান দেব না অধ্যবসায়ের সম্মান দেব না; শুধু যে তাঁরা সস্তাদরের গল্প-উপন্যাস-কবিতাকারের মত গল্প-উপন্যাস-কবিতা লিখতে জানেন না সেইটি বিশেষ ভাবে মনে রেখে তাঁদের প্রতি বিমুখ হয়ে থাকব। আমাদের সবটুকু পক্ষপাত ও আদর ঢেলে দেব কতকগুলি প্রায়শঃবিদ্যাহীন চিন্তাবর্জিত রম্যতা-বিলাসী বক্র-মেরুদণ্ড তথাকথিত সুকুমার কলা-শিল্পীর উপর; কিন্তু যাঁরা সমাজজীবনে বলিষ্ঠ মনন মনস্বিতা জ্ঞানস্পৃহা সত্যানুরাগ চারিত্রিক দৃঢ়তার ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের জন্য এতটুকু প্রীতির সঞ্চয়ও আমাদের ঝুলিতে তোলা থাকবে না। এ এক আশ্চর্য সাহিত্য-সংসারে আমরা বাস করছি। বাজার-চলতি গল্প-উপন্যাসের প্রতি শুধু যে তরুণ-বয়সী পাঠকদেরই উৎসাহ-আতিশয্য তাই নয়, গোবদা-গোবদা সব প্রবীণদের মধ্যেও ওই খাতে দুর্বলতা সুপ্রকট। কিশোর-যুবা-প্রৌঢ়-বৃদ্ধ যিনিই হোন সকলের মধ্যেই একটা অবুঝ শিশুমন লুকিয়ে আছে, আর ওই শিশুমনেরই প্রকাশ দেখতে পাই অপাঠ্য কথামাত্রসার গল্প-উপন্যাসের বই নিয়ে হুড়োহুড়িতে, লুকিয়ে যৌন সাহিত্য পড়ায়, সিনেমা-স্টারদের ক্রিকেট-খেলায় সোৎসাহ দর্শক রূপে যোগদানে, জাতীয় রাজনীতির সাম্বৎসরিক অধিবেশনের পবিত্র মণ্ডপে বোম্বাই-মার্কা ফিল্মী নায়ক-নায়িকাদের এনে জমায়েত করানোয়। এ দুর্বলতা বোধ হয় মানবস্বভাবে সহজাত, নয়তো এসব বস্তুর হাস্যকরতা সহজেই লোকের চোখে পড়ত। এ দুর্বলতার তুলনা নেই বলেই সম্ভবতঃ তার অসঙ্গতি কারও চোখে পড়ে না।

যে-সকল গল্প-উপন্যাস গ্রন্থ সৃষ্টিধর্মী আখ্যায় আখ্যাত হয়ে বাজারে জনপ্রিয়তা অর্জন করে তাদের স্বরূপ খানিকটা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে মন্দ হয় না। এ থেকে আমরা সৃষ্টিধর্মিতার কাপট্যটুকু ধরে ফেলতে পারব। অবশ্য যে সকল বই সত্যিসত্যি সৃজনী প্রতিভার লক্ষণ-মণ্ডিত সেগুলি মূল্যবান গ্রন্থ, সাহিত্যের ভাণ্ডারে দীর্ঘকাল সর্বপ্রযত্নে রক্ষিতব্য, তারা আমার আলোচনার লক্ষ্য নয়। আমি শুধু এখানে সেইসব বইয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই, যেগুলি মন-থেকে-বানানো কাহিনী অথচ কোনক্রমেই যাদের উপর সৃষ্টিধর্মিতার কিংবা মৌলিকতার গৌরব আরোপ করা চলে না। যাকে বলে স্বকপোলকল্পিত রচনা বা মন-গড়া সৃষ্টি এগুলি নাকি তাই; ওই অজুহাতে এসব বইয়ের রচয়িতাদের প্রায়শঃ মৌলিকতার গৌরব দাবি করতে দেখা যায়। তাঁরা তা পেয়েও থাকেন, কেন না আমাদের সাহিত্যের সমালোচক ও পাঠকদের মধ্যে মৌলিকতা সম্বন্ধে অদ্ভুত সব ধারণা বিদ্যমান আর সেই সব ধারণার সুযোগ গ্রহণে সংশ্লিষ্ট লেখকদের মধ্যে তৎপরতার কখনও অভাব হয় না। কিন্তু সত্যই যদি ওই বহুকথিত মৌলিকতাকে খুঁটিয়ে বিচার করা যায় তা হলে কী দেখতে পাই? প্রশ্নটি নিয়ে একটু সবিস্তারে নাড়াচাড়া করা যেতে পারে।

ধরুন একটি বাজার-চলতি প্রেমমূলক উপন্যাস, যার জনপ্রিয়তার খ্যাতি আকাশে-বাতাসে ছড়ানো। সে বই কলেজ স্ট্রীটের বই-বিক্রির হাটে কাউণ্টারে আসতে না আসতেই ফুরিয়ে যায়। এমনও হওয়া সম্ভব যে সে বই

যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, সিনেমা-হাউসের কিংবা র‍্যাশান-দোকানের লম্বা লাইনের মত 'কিউ' দিয়ে বইখানা কিনতে হয়েছিল। অনেকে এই জন্যে আগাম নাম রেজেষ্ট্রি করেছে, কেউ কেউ আগাম টাকাও জমা দিয়েছে। এসব বৃত্তান্ত আজ আর অবিশ্বাস্য মনে হয় না। আমাদের সাহিত্যের হালচাল আজকাল আমেরিকার সাহিত্য-বাজারের ধরন-ধারন অনুযায়ী চলতে শুরু করেছে। বোম্বাইয়ের সিনেমা-শিল্পের ধারা-ধরনের সঙ্গেও তার কতকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যাই হোক, বইখানা তো 'গরম পিঠা'র মত কাটছে (ইংরেজী বাক্যরীতি পাঠক মার্জনা করবেন), কিন্তু তার কাহিনীটি কী? কাহিনী হচ্ছে এই যে, একটি কলেজ-পড়ুয়া তরুণ ও তারই সহপাঠিনী একটি ছাত্রী একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে একই দালানের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে সহপাঠিতার সূত্রে চেনা থাকলেও পূর্ব-পরিচয় ছিল না। এই সূত্রে হল। একই সঙ্গে একই অবস্থায় বৃষ্টিতে ভিজতে বাধ্য হওয়ায় তাদের মধ্যে একটা সাময়িক সমস্বার্থবোধের সূক্ষ্ম সম্পর্ক গড়ে উঠল। প্রথম দিনের আলাপে আন্তরিকতা থাকলেও আড়ষ্টতা ছিল। পরে আরও মেলামেশা জানা-চেনার ফলে এই আড়ষ্টতা কেটে গেল। তারা ক্রমশঃ পরস্পরের নিকটতর হতে থাকল। এবং যা এ-জাতীয় রোমান্টিক ধরনের বইয়ে স্বভাবতঃই প্রত্যাশিত, ওই নৈকট্য প্রেমে পরিণত হল। প্রেম হলেই বিয়ে করবার সাধ যায়, ছেলেটি মেয়েটিকে বিয়ে করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটি ধীরা স্থিরা ছেলেটির তুলনায় স্বতঃই অধিকতর সংসারবুদ্ধিসম্পন্না, সে ছেলেটিকে কলেজ থেকে পাস করে বেরিয়ে উপার্জনক্ষম হয়ে তারপর বিয়ে করবার পরামর্শ দিলে এবং ততদিন নিজে প্রতীক্ষারতা থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলে। কিন্তু পাস করে বেরোবার পর ছেলের চাকরি আর জোটে না। একটা যেমন-তেমন চাকরির আশায় আপিসে আপিসে ছেলেটি হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মেয়ের বাপ ছেলের আর্থিক অবস্থার দৈন্য স্মরণ করে মেয়ের অন্যত্র বিয়ের চেষ্টা দেখতে লাগলেন এবং দুজনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিলেন (লেখক এই সুযোগে ছেলে মেয়ে উভয়ের তরফে খুব একচোট বিরহের নাকীকান্না কেঁদে নিয়েছেন)। কিন্তু তাতে যোগাযোগ বন্ধ হল না। চিঠিপত্রে পূর্ণোদ্যমে মন-দেওয়া-নেওয়ার বাক্যবিলাস চলতে লাগল। অবশেষে ভাগ্যক্রমে ছেলেটির একটি চাকরি জুটল। সওদাগরী আপিসের কনিষ্ঠ কেরানির পদ। মেয়ের বাপের মন প্রথমটায় ছেলের এই মামুলী চাকরি-লাভের সংবাদে খুঁতখুঁত করলেও শেষ পর্যন্ত ভিজল। একটা শুভদিন দেখে ওদের বিয়ে হল। এতদিনের এত হা-হুতাশ বুক-ধুকপুক অধীর প্রতীক্ষার অবসান হল। বইয়ের উপর মধুরে মধুর যবনিকাপাত হল।

এখন, এই-যে কাহিনীর ছাঁচ, এর দ্বারা পাঠক-সাধারণের কতটুকুই বা আনন্দ কতটুকুই বা মঙ্গল সাধিত হয়? এ নিতান্ত একটি গতানুগতিক প্রেম-কাহিনী, শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহের সূত্রে খানিকটা কাঁদুনি গাওয়ার অবকাশ আছে বলে তা দিয়ে পাঠকের মন ভিজানোর চেষ্টা হয়েছে বইটিতে। সরলমনা পাঠক-পাঠিকাদের উপর সে চেষ্টার ফল একেবারে ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু তাতে কি বইটি সৃষ্টিধর্মিতার পর্যায়ে উন্নীত, মৌলিকতার পদবীতে ভূষিত হয়েছে দাবি করা যায়? এক জোড়া তরুণ-তরুণীর জীবনে প্রেমের আবির্ভাব এবং তদ্দরুন জৈব আকুলি-বিকুলি আর মিলন-বিরহের দোদুল্যমানতা অর্থাৎ একান্তর ক্রমে পুলকবিহ্বলতা আর দুঃখাতুরতা সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ জরুরী এমন কি জীবনমৃত্যু-প্রশ্নবৎ মনে হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ না তাদের প্রেমের মধ্যে একটা গভীর কাব্যানুভূতি কিংবা জীবনরহস্যবোধের সঞ্চার হচ্ছে ততক্ষণ ওই প্রেমের সম্ভাব্য শুভ অথবা অশুভ পরিণামে পাঠক-সাধারণের কী এসে যায়? এ রকম জৈবপ্রেম তো জগৎ-সংসারে আকছার সংঘটিত হচ্ছে, তা সাহিত্যপাঠকের নিকট আদৌ কোন সংবাদ নয়। সাহিত্যপাঠকের নিকট তখনই এই প্রেম সংবাদ বলে গণ্য হবে, যখন এর ইন্দ্রিয়-মোহের ভিতর দিয়ে কালো আকাশের পটে চকিতে-ভেসে-ওঠা উজ্জ্বল বিদ্যুল্লতিকার মত অতীন্দ্রিয়ের অস্পষ্ট ঝলকানি ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত হয়ে উঠবে। দেহ থেকে দেহাতীতে যাওয়ার সামান্য সংকেত যে প্রেমের মধ্যে নেই সে প্রেম নিতান্ত জৈব স্তরে সীমাবদ্ধ এবং জৈব কামনা-বাসনাতেই

নিঃশেষিত। তেমন প্রেমের কাহিনী পরিবেশনের জন্য সাহিত্য নয়, আর যদি বা এ-জাতীয় প্রেম-কাহিনী কোন বইয়ের উপজীব্য হয় তা হলে কোনক্রমেই তার উপর মৌলিকতার বা সৃষ্টিধর্মিতার শিরোপা আঁটা চলবে না। না, কোন অবস্থাতেই এ-জাতীয় রচনার গায়ে সৃষ্টির তিলকচর্চার অবকাশ নেই। মৌলিকতা বস্তুটি এত সস্তা কিংবা ফেলনা নয় যে যেখানে-সেখানে মৌলিকতা আবিষ্কার করে আমরা পাঠকেরা রোমাঞ্চিত-কলেবর হব। সৃষ্টির একটি প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তা পাঠকের মনকে উচ্চগ্রামে উন্নীত করবে, তার হৃদয় ঊর্ধ্বানুভূতিতে ভরে তুলবে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বিভূতিভূষণের রচনায় আমরা এই ঊর্ধ্বানুভূতির সাক্ষাৎ পাই। তাঁদের কোন কোন রচনা বার বার পড়লেও পুরনো হয় না। তাঁদের রচনা যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির লক্ষণযুক্ত তার একটি প্রমাণ এই যে, এঁদের কোন বই পড়তে গেলে ঠিক প্রাত্যহিক জগতের স্তরে বিচরণ করা আর সম্ভব হয় না, পাঠকের অজ্ঞাতসারেই পাঠকের মন পার্থিব আবেষ্টনীর দৈনন্দিন ধূলিমলিন পরিবেশ অতিক্রম করে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী হয়। এঁদের তিনজনারই কোন-না-কোন বই আছে যা একেবারে সত্তার মূল ধরে নাড়া দেয়। একেই আমরা বলব সৃষ্টিধর্মিতা মৌলিকতা সৃজনাত্মক প্রতিভা—যেখানে-সেখানে মৌলিকতা দর্শনে আত্মহারা হয়ে ওই দুর্লভ বস্তুর পরিমাণ-স্বল্পতার অপব্যয় ঘটাতে আমরা নারাজ। রাজ্যের আবর্জনা-জঞ্জাল, যা সচরাচর কথা-সাহিত্য নামে সাধারণ্যে পরিচিত, ভাগ্যে কলেজ স্ট্রীটের একটি প্রশস্ত সংরক্ষণ-ক্ষেত্রকে তার dumping ground হিসাবে পেয়েছে, নয়তো আস্তাকুঁড়েই সেগুলির সত্যিকার স্থান হওয়া উচিত। রঙচঙে মলাটে শোভিত হয়ে এসব বই নাকি বিয়ের উপহার হিসেবে খুব বিক্রি হয়। ওজন দরেও যেগুলি বিক্রি হওয়ার যোগ্য নয় সে সবের এমন শুভ সদ্গতি আমাদের সাহিত্যিক পরিস্থিতির বদ্ধমূল দুর্গতিটাকেই শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

পুনরুক্তির ঝুঁকি নিয়ে আমি আর একবার বলব, বানিয়ে লেখাটাই সৃষ্টিমূলক লেখা নয়। ওই বানানোর মধ্যে রচয়িতার কল্পনাকুশলতা কল্পনার ঐশ্বর্য উদ্দেশ্যের সততা ও গভীরতা ঊর্ধ্বমনন ইত্যাদি বিরল গুণগুলির পরিচয় সংবদ্ধ থাকা চাই। প্রকৃত সৃষ্টিধর্মী রচনার একাধিক লক্ষণ আছে।—হয় সে রচনা মনে বিশুদ্ধ আনন্দের বোধ জাগাবে, নয় তা মনকে কোন একটা মহৎ ভাবের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করবে, নয় মনের জড়ত্বনাশা হয়ে তাকে কর্মে উদ্দীপিত করবে। আত্মিক কিংবা আধ্যাত্মিক সঙ্কটে সমাধানের আশায় পথ হাতড়ে ফিরেও মানুষ যখন পথ খুঁজে পায় না তখন সৃজনাত্মক সাহিত্য তাকে পথের হদিস দেয়। পুরাতন ক্লাসিক সাহিত্যের কথা আর নাই তুললাম, এ যুগেও এমন কিছু-কিছু বই লেখা হয়েছে যা পাঠকের মনকে ঊর্ধ্বগ অভীপ্সায় কানায় কানায় ভরে তোলে। রচনা বাস্তব সংসারের রুক্ষ-মলিন ঘটনা নিয়েই হোক আর অবাস্তব স্বপ্নজগতের মায়াকুহেলিঢাকা অদেখা পরিবেশ নিয়েই হোক, সৃষ্টিধর্মিতার সংস্পর্শে অচিরেই সে রচনার গোত্রবদল হয়। সৃষ্টিধর্মী রচনা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মনকে প্রাত্যহিকতার মালিন্যস্পর্শ থেকে মুক্ত করবেই, তাকে অসীমের সুরে বাঁধবেই; মরমী কবিদের কৃপায় সীমা-অসীমের তত্ত্বকে ঘিরে বহুতর হেঁয়ালির সৃষ্টি হলেও, সীমা-অসীমের আলো-ছায়ার লীলা নিরন্তর আমাদের জীবনে চলছে। অতি গদ্যময় মানুষের প্রাণেও কখনও কখনও সুন্দরের ছোঁয়ায় অসীমের দোলা লাগে। তারপরই হয়তো দিনগত পাপক্ষয়জনিত প্রাত্যহিকতার ভাঁটার টানে ওই ক্ষণস্থায়ী ভাবের জোয়ারের আর লেশমাত্রও বর্তমান থাকে না, তা হলেও ওই কিছুক্ষণের আবেশকে কোনক্রমেই মিথ্যা-মরীচিকা বলা যায় না। সেটি ক্ষণিক দীপ্তির বিস্ফুরণের পর ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেও সত্য—অপ্রতিরোধ্য সত্য।

সৃষ্টিধর্মী মহৎ সাহিত্যের প্রধান কাজই হল আমাদের জীবনে ওই আবেশের সৃষ্টি করা ও তাকে যত বেশীক্ষণ সম্ভব ধরে রাখা। পাঠক-মনের উপর যে গ্রন্থের এই আবেশময় প্রভাব যত বেশী সে গ্রন্থ সৃষ্টিধর্মিতার মানদণ্ডের বিচারে তত পরীক্ষোত্তীর্ণ। এ সাহিত্য সংসারের নিত্যকার অভাব-অভিযোগ অন্যায়-অবিচার অত্যাচার-শোষণের চিত্র তুলে ধরলেও পাঠকের মনকে সেই স্তরেই আবদ্ধ করে রাখে না, তাকে উচ্চগ্রামে মুক্তি দেয়।

অভাববোধের পীড়ন জনিত suffocation পাঠককে অস্বস্তিকবলিত করলেও শেষ পর্যন্ত ওই suffocation-এর রুদ্ধশ্বাস নিষ্পেষণ থেকে পাঠকমন অব্যাহতি পায় রচনার শিল্প-সৌন্দর্যের আনন্দে। সৃষ্টির মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে যা মনকে এই মুক্তির চেতনা দান করে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে প্রতি সার্থক সৃষ্টিধর্মী রচনার প্রকৃতিই কিছু-না-কিছু পরিমাণে transcendental, উদ্বর্তনমুখী। যে রচনায় প্রাত্যহিকতার গ্লানি-মালিন্য আর জৈব জীবনের গতানুগতিক তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে উঠবার আশ্বাস নেই, নেই দিনানুদৈনিকতাকে অতিক্রমণের সংকেত, সে রচনা প্রভূতস্ফীতকায় আর বহুসংস্করণধন্য হলেও তাকে সৃষ্টিধর্মিতার বিচারে সংশয়ের চোখে না দেখে পারা যায় না।

কিন্তু সার্থক সৃষ্টিমূলক রচনায় এ মুক্তির বোধ থাকবেই। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র কথাই ধরা যাক। এটি আসলে একটি গ্রামীণ পরিবারের কঠোর দারিদ্র্যের চিত্র। কিন্তু দারিদ্র্যের বার্তা পাঠকসমক্ষে পরিজ্ঞাপনই এর মুখ্য লক্ষ্য নয়। তা যদি হত তা হলে আর দশটা বাজার-চলতি বাস্তবধর্মী উপন্যাসের সঙ্গে এর বিশেষ কোন পার্থক্য থাকত না। বইতে অপুদের সংসারের দারিদ্র্যের বার্তাকে শতগুণে ছাপিয়ে উঠেছে কয়েকটি মৌল মানবীয় সদ্বৃত্তির ঊর্ধ্বদ্যোতনা—সন্তান-বাৎসল্য, মাতৃস্নেহ, পতিভক্তি, ভাই-বোনে নিবিড়-গভীর ভালবাসা, শিশুর আদিম সারল্য ও জন্মসংস্কারবৎ নিসর্গ-প্রীতি, ঈশ্বরানুভূতি, স্বপ্নিলতা এবং কল্পনায় আনন্দ ও মুক্তি। দারিদ্র্য এই বইয়ের কেন্দ্রগত তথ্য। কিন্তু রচনাগুণে দারিদ্র্যের তিক্ততা জ্বালা বেদনা অপমান অভিশপ্ততার বোধ এক অপূর্ব মানবপ্রেম ও নিসর্গপ্রেমের পবিত্র বারিনিষেকে অভিসিঞ্চিত হয়ে শোধিত মার্জিত রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পাঠকের মনে দারিদ্র্যের জ্বালা ধরানো এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, এ বইয়ের উদ্দেশ্য পাঠকের মনকে মানবীয়তার অনুভূতির দ্বারা পরিপ্লাবিত করা। সে উদ্দেশ্য 'পথের পাঁচালী' বইয়ে সর্বতঃ সাধিত হয়েছে।

তেমনই তারাশঙ্করের 'কবি'। এক গ্রাম্য কবিয়ালের কাহিনী। কবিয়ালের জীবন স্থূল, তার রচনা আন্তরিকতা-মণ্ডিত হলেও তা-ও স্থূল, যে দুটি নারীর ভালবাসা সে পেয়েছিল সেই ঠাকুরঝি ও বসনের জীবনও গ্রামসমাজের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়ানো স্থূলতায় মণ্ডিত, বিশেষ, বসন ঝুমুর দলের মেয়ে, পণ্যা নারীর স্বগোত্র, তার জীবনে স্থূলতাই শুধু নয় অসামাজিকতাও যথেষ্ট পরিমাণে প্রকট; কিন্তু রচনার মাহাত্ম্যে তারাশঙ্কর এই সামান্য তিন মানুষের সম্পর্ককে কী অসামান্য উচ্চতায়ই না নিয়ে তুলেছেন! তারাশঙ্করের অন্তর মানবদরদে পূর্ণ, তাই তাঁর অঙ্কিত প্রেম জৈব আকর্ষণের প্রেম নয়, তা বেদনা ও কারুণ্যে অশ্রুটলটল। প্রেমের বেদনায় প্রেমের রূপজ মোহের গোত্রান্তর ঘটে আর এই গোত্রান্তরের চিত্রই লেখক দেখিয়েছেন নিতাই কবিয়ালের প্রতি ঝুমুর দলের নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়ে বসনের ভালবাসায়। 'কবি' উপন্যাসে এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত যে, দেহ থেকে দেহাতীতে উত্তরণের মধ্যেই প্রেমের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা নিহিত। কাহিনী-মাধ্যমে এই বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লেখক একই কালে সৃষ্টিধর্মিতারও শ্রেষ্ঠ দাবি পরিপূরণে অগ্রসর হয়েছেন। কেন না, পূর্বেই বলা হয়েছে যে, প্রকৃত সৃষ্টির একটি প্রধান লক্ষণই হল যে তা মূলতঃ transcendental; গতানুগতিক থেকে বিশেষে, বাস্তব থেকে স্বপ্নে, ধরা থেকে অ-ধরায়, দেহ থেকে আত্মায়, সীমা থেকে অসীমে ক্রমিক ঊর্ধ্বগতির মধ্যে সৃষ্টিশীল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সংকেত নিহিত।

এ রচনা বা এমনতর রচনা হলে তবে তাকে সৃষ্টিশীল আখ্যা দিতে পারি। তাই বলে রাম শ্যাম যদু মধু উপন্যাস নামের আবরণে যে-কিছু বানানো গল্প লিখবে তাকেই সৃষ্টিশীল রচনা বলে ধেই ধেই করে নাচতে হবে এতটা গল্প বা উপন্যাসমনস্ক পাঠক আমরা নই সে কথা অকপটে স্বীকার করব। উপন্যাসের আমি একজন খুঁতখুঁতে পাঠক, যে কোন উপন্যাস হাতের কাছে এলেই প্রবহমান যুগরুচির সঙ্গে তাল রেখে আর-সব কাজ ফেলে রেখে তাকে গেলায় নীতিতে আমার কোন আস্থা নেই (আজকের দিনের অধিকাংশ উপন্যাসই বাজে জঞ্জাল—কি এদেশে কি ওদেশে)। ও-রকম অভ্যাস দ্বিপ্রাহরিকনিদ্রাবিলাসী পাঠিকাদের জন্য তোলা থাক্, বাজার-চলতি উপন্যাস-লিখিয়েরা পাঠিকাসম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে তাঁদের জয়জয়কার করতে থাকুন, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই।

পূর্বে যে কথা বার বার লিখে ক্লান্ত হবার দাখিল হয়েছে সে কথা আবারও লিখছি: উপন্যাসশিল্প নিছক পর্যবেক্ষণনির্ভর আর কাহিনীসর্বস্ব হলে সে উপন্যাসের বিশেষ কোন দাম নেই। উপন্যাসের আবেদন পাঠকমনে সুদৃঢ়রূপে মুদ্রিত করতে হলে পর্যবেক্ষণ আর নিছক কাহিনী-বয়নের ক্ষমতার বাড়া শক্তি অর্জন করতে হবে। যে পর্যবেক্ষণের পিছনে মনন নেই, যে কাহিনী কাব্যানুভূতি অথবা জীবনরহস্যবোধের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যার একমাত্র অবলম্বন দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাপ্রবাহ কিংবা মামুলী জৈব আকর্ষণ-বিকর্ষণের খেলা, তেমন পর্যবেক্ষণ আর তেমন কাহিনী সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হতে পারে কিন্তু বিচক্ষণ পাঠকের প্রত্যাশা থেকে তা দূরবর্তী হয়েই থাকে। পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় অথবা তীক্ষ্ণতায় সৃষ্টিধর্মিতা নেই, সৃষ্টিধর্মিতা আছে তাকে জীবনবোধের দ্বারা মণ্ডিত করার মধ্যে। কাহিনীর চাতুর্যেও প্রকৃত সৃষ্টিলক্ষণকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে তার ভিতর গভীর সত্য ও সৌন্দর্যের প্রণোদনা ফুটিয়ে তোলার মধ্যে। সত্য সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমাহারে সৃষ্টিধর্মিতা।

এবার একটি অভিমত নিবেদন করব, যা অনেকেরই নিকট চমকপ্রদ মনে হতে পারে কিন্তু যা সর্বৈব সত্য। এই-যে তথাকথিত গল্প-উপন্যাস-কবিতাকে আমরা 'সৃষ্টিধর্মী' 'সৃষ্টিধর্মী' বলে উল্লম্ফ হই, তাদের অনেকেরই ভিতর সৃষ্টিধর্মিতার বাষ্পও নেই, বরং অনেক সার্থক আপাত-মৌলিকতাহীন অন্যবিধ রচনার মধ্যে সৃষ্টিধর্মিতার লক্ষণ লুকিয়ে আছে বলে আমার ধারণা। ছেলেবেলায় অবনীন্দ্র-নাথের 'রাজকাহিনী' পড়েছিলুম। বইটির ছাপ আজও মন থেকে মুছে যায় নি। রাজকাহিনীর গল্পগুলি মৌলিক নয়, রাজস্থানের কাহিনী থেকে নেওয়া। কিন্তু সে কাহিনী অনেকানেক তথাকথিত মৌলিক গল্প-উপন্যাস থেকে অনেক বেশী মৌলিক ও সৃষ্টিধর্মী রচনা বলে আমি মনে করি। আর-একটি বই বিনয় সরকারের 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর'। বাংলা দেশের হাজারে হাজারে ছেলে তাদের উঠতি বয়সে এই বই পড়েছে। নিগ্রোজাতির এক কর্মনায়ক বুকার টি. ওয়াশিংটনের ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়ার নিতান্ত গদ্যময় কাহিনী এ বইয়ের উপজীব্য বিষয়। কিন্তু এই বই অগণিতসংখ্যক কিশোরের মনকে তাদের চরিত্রবিকাশের প্রাথমিক অধ্যায়ে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। পুস্তকের ফলাফল দিয়ে যদি পুস্তকের প্রকৃতি-বিচার করতে হয় তো এ বইকেই আমাদের সত্যিকার সৃষ্টিধর্মী বই আখ্যা দিতে হয়। তৃতীয় একখানি বই হল "শ্রীম" কথিত 'রামকৃষ্ণ কথামৃত'। এ বই লক্ষ লক্ষ বাঙালী পাঠ করেছেন এবং তা থেকে জীবনে পথ চলার অপরিমেয় পাথেয় ও অনুপ্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। এই একখানি গ্রন্থ কত মানুষের ভাবজীবনকে যে গড়ে তুলেছে তা বলে শেষ করা যায় না। আর একখানি বই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাল্মীকির জয়'। পুরাণ-আলম্বী কাহিনী সেই হিসাবে দৃশ্যতঃ মৌলিকতাহীন, কিন্তু আশ্চর্য সে বইয়ের আবেদন! আজকের দিনে তো এ বইয়ের একটা বিশেষ আবেদন, একটা বিশেষ রূপক-তাৎপর্য রয়েছে বলা যায়। এমন বইকেই আমরা সৃষ্টিধর্মী বই বলব। মনকে যা মাতায় রাঙায় ভাববিভোর করে তোলে তা-ই সৃষ্টিধর্মী। উপরের উল্লিখিত বই চারটির মধ্যে তেমন উপাদান প্রচুর নিহিত আছে। সমপ্রকৃতির এইরূপ আরও অনেক বইয়ের নাম করা যায়, যাদের মধ্যে একটু অনুসন্ধান করলে সৃষ্টিশীলতার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এ সব সৃষ্টিশীল নয়, সৃষ্টিশীল হল নেত্য ঝি আর গিন্নীমায়ের কুটনো কোটা আর বাটনা বাটা নিয়ে পারিবারিক কোন্দলের চিত্রসম্বলিত বই কিংবা শিপ্রা আর পার্থপ্রতিমের (আধুনিক উপন্যাসের যে-কোন দুটি ফ্যাশনেবল নাম), এরা ওরা এবং আরও অনেকের অসার মন-দেওয়া-নেওয়ার গল্প? বুদ্ধির বৈক্লব্য বিচারের ভ্রান্তি এর থেকে আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারে কি?
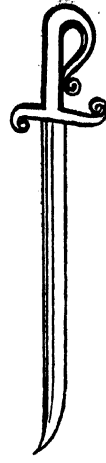
সেই তখনকার বনলতা। আর আজকের বনলতা। কতদিন হল? বছর পনের না? তখন কোন্ সাল? পঁয়তাল্লিশ বোধ হয়, আর আজ উনষাট। পনের বছর।

রঞ্জন বলেছিল, একদিন তোমাকে বলতেই হবে বনলতা, রাজার কোন কাপড় নেই, রাজা উলঙ্গ হয়ে রাস্তা দিয়ে চলেছে।

বনলতা বলেছিল, না না, তা হতে পারে না। এত বিপুল ঐশ্বর্য সব মিথ্যে? তুমি ভীরু, এই অনন্ত পরিশ্রম তুমি সইতে পার না, তাই তুমি পালাতে চাইছ।

রঞ্জন বলেছিল, লোভীরা সত্যবাদীদের এই বলে গালাগাল দেয় বটে। সংসারে লোভীর সংখ্যাই কোটি কোটি, তাই গলার জোরে তারা মেরে দেবার চেষ্টা করে, তাই সবচেয়ে সাহসী লোককে ভীরু বলে। সত্যবাদীর কি হয় জান? হাসি পায়। সে বোঝে, ওরা ভীড় করে দেখছে বলে বুঝতে পারছে না, বুঝতে চেষ্টা করছে না, সবাইকার ভয় হয়তো অন্য কেউ ঐশ্বর্য দেখছে, সে না দেখলে বোকা বনবে, তাই গোলে হরিবোল দিয়ে বলছে, জয় রাজার জয়। কিন্তু একদিন কোথাও না কোথাও কেউ রাজাকে একলা দেখবে, শাস্ত্রীদের ভয় থাকবে না, পাখি পড়াবার লোক থাকবে না, সেদিন সে নিজের চোখে রাজাকে দেখবে, আর দেখবে রাজা উলঙ্গ। রাজাকে মুখোমুখি একলা তোমাকে দেখতেই হবে বনলতা, সেদিন তোমাকে বলতেই হবে রাজা উলঙ্গ।

চোদ্দ বছর বয়স বেড়ে গেছে বনলতার তারপর। রাজাকে কি একলা দেখতে পাচ্ছে?

সেদিন বনলতা চেঁচিয়ে উঠেছিল: না না আমি বিশ্বাস করি না। অর্থহীনতার কষ্ট আমি সইব কী করে?

রঞ্জন শান্ত হেসে বলেছিল, কষ্টের চেয়ে সত্য বড়।

বনলতা শেষ শক্তি দিয়ে বলেছিল, শীতল সত্যের চেয়ে ঐশ্বর্য বড়।

সুপ্রিয়র বুকে মাথা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল বনলতা: তুমি বিশ্বাস কর ওর কথা?

মধুর হেসে সুপ্রিয় বলেছিল, না, এত রূপ, এত রঙ, এত শক্তি, এত প্রচেষ্টা মিথ্যে হতে পারে না, এর নিশ্চয়ই কোন মূল্য আছে, আমি তা গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

বনলতা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, শুধু বিশ্বাস নয়, আমাদের দেখাতে হবে আমরা ভুল নয়।

সুপ্রিয় বলেছিল, আমরা তো ভুল নয়।

কি যে কষ্টের দিন গিয়েছে, সে শুধু বনলতাই জানে। সেই কষ্টের দিনের কি শেষ হল? আজও হয় নি।

আজ মনে হয় দরকার কী ছিল অত কষ্টের। আর পাঁচজন মেয়ের মত না ভেবে ঘরসংসার করে গিয়ে যা হয়

তাকে কপালের ওপর চাপিয়ে দিলেই হত। খাওয়া দাওয়া থাকা।

রঞ্জন বলেছিল, দেখ, খাওয়া-দাওয়া থাকাটাই অধিকাংশ লোকের পক্ষে সত্য এবং একমাত্র সত্য, এবং স্বাভাবিক। ফাইলাম কর্ডেটের ম্যামেলিয়া ক্লাসের এক ধরনের জীব তো আফটার-অল। কিন্তু ওই সেপিয়েনস হয়ে মুশকিল হয়েছে। এক-আধটা ছিটকে পড়ে বড় বেশী রকম সেপিয়েনস, তারা আবার সমস্তটার মানে খুঁজতে চায়। তাই তোমার বন্ধু বাসন্তী যখন কিছু না ভেবে চিন্তেই ঘরসংসার করবে, তুমি মাঝে মাঝে থমকে উঠবে, কেন করছি, কী এর মানে? খিদে পেলে বাসন্তী যখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে খাবারের খোঁজ করবে, ওর ইনসটিংক্ট করাবে ওকে, সেরকম তোমার 'এক্স্ট্রা-সেপিয়েনস্ব' তোমাকে পাগলের মত ছোটাবে, জানবার জন্যে, কেন বেঁচে আছি।

সুপ্রিয়ও বলেছিল, সমস্ত কাজের মধ্যে এ প্রশ্ন মানুষের মনে ঘুরে ফিরে বেড়াবেই। সাময়িকভাবে এড়িয়ে গেলেও একদিন না একদিন এর উত্তর খুঁজে বের করতেই হবে।

কিন্তু সুপ্রিয় কেমন সামঞ্জস্য করে নিয়েছিল। গভীর চিন্তাশীল, কিন্তু কাজকর্ম আচার ব্যবহার সংযত। আর রঞ্জন ঠিক তার উল্টো, একটা চিন্তা মাথায় ঢুকলে তার হেস্তনেস্ত না করে তার ভাত হজম হবে না, ইনকিওরেবলি ডেসপ্যারেট। সুপ্রিয়কেই ভাল লাগল বনলতার, কিন্তু রঞ্জনের কেমন একটা অন্ধ আকর্ষণ ছিল, কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারত না।

সুপ্রিয়র সঙ্গে ফিফ্থ ইয়ারের মাঝামাঝি আলাপ হয়েছিল, আর তা ক্রমশই গড়াতে গড়াতে সিক্সথ ইয়ারের গোড়ার দিকে যেখানে চলে গিয়েছিল, মুখে স্বীকার না করলেও তারা মনে মনে স্পষ্ট বুঝে নিয়েছিল সেটাকে কী বলে।

আর সেই সময় রঞ্জন এসে ভর্তি হল। প্রথমে কারোর নজরে পড়ে নি। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে কারোর চিনতে বাকি রইল না।

বনলতা সুপ্রিয়কে জিজ্ঞাসা করল, নতুন ছেলেটি কোথা থেকে এসেছে?

সুপ্রিয় বলল, বোম্বে থেকে এসেছে। কলকাতায় ওর দাদুর সম্পত্তি পেয়েছে, বাবা ভিয়েনায় থাকেন, দাদা দিল্লীতে সরকারী চাকরী করেন, সুতরাং মাকে নিয়ে ওকেই চলে আসতে হয়েছে।

ওর বাবা ভিয়েনায় কী করেন?

অত কি জানি? শুনেছি উনি একজন ভাল সার্জন।

বড্ড বিলেত ঘেঁষা, না? ক্লাসে টাই-ফাই পরে আসা এই কলকাতায় কেমন যেন দেখায়।

সুপ্রিয় হাসল, কোন কথা বলল না, সামান্যতম পরনিন্দাও সে করে না।

আচ্ছা, সেদিন ক্লাসে ও সারের সঙ্গে মূলার মূলার করে কী অত তর্ক করছিল?

আজ বনলতা বুঝতে পারে, সুপ্রিয়র মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিল। শেষ দিকটা সুপ্রিয়ও বুঝতে পারে নি, একেবারে নতুনতম প্রবন্ধের উল্লেখ করছিল রঞ্জন। তবে এটুকু বুঝতে পারছিল, বাজে কথা বলছে না ছেলেটি, এই দিকটা ওর ভাল করেই পড়া আছে।

সুপ্রিয় বনলতাকে বলল, সার্ একেবারে পুরনো থিওরি পড়াচ্ছিলেন। ও বলছিল, ও থিওরিটা আউট অফ ডেট হয়ে গেছে—বলে মূলার এ সম্বন্ধে কী বলেছেন সে কথা ও বলছিল।

বনলতা বলল, বাসন্তী বলে, ছেলেটি ভয়ানক চালবাজ। ক্লাসে ওই সব বড় বড় কথা বলে চাল মারে। তোমার কী মনে হয়?

হালকা মুহূর্তে কারুর নাম না করে সুপ্রিয় অনেক ভুঁইফোড় ছেলের গল্প করেছে—নতুন বইয়ের সামনের কয়েকপাতা পড়ে ক্লাসে কতরকম কায়দাকানুন কত ছেলে করল, দুদিনে কলেজে হৈচৈ ফেলে দিয়ে ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লিখে হঠাৎ একটা পরীক্ষায় ভাল করে উত্তুঙ্গ গাম্ভীর্য নিয়ে চলতে শুরু করল—কিন্তু কই শেষ পর্যন্ত তো বেশী টিকতে পারল না। এ ছেলেটির ভঙ্গীও সেই ভুঁইফোড়দের মত, হয়তো তাদের চেয়েও খারাপ, এ বড় বেশী উদ্ধত। কিন্তু এর নামে সুপ্রিয় কিছুক্ষণ চুপ করেই রইল, তারপর বলল, ওই ছেলেটি অনেক জানে আর এর বুদ্ধিমত্তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে।

তোমার চেয়ে বেশী জানে না।—বনলতা মাথা নাড়ল: সে হতে পরে না।

কথাটা শুনে হয় তো সুপ্রিয়র তৃপ্তি লেগেছিল, কিন্তু এ ধরনের আলোচনায় তার রুচিতে তার ঔদার্যে লাগত। যাক গে এসব কথা।—বলে প্রসঙ্গ এড়িয়ে সে অন্য কথা তুলেছিল।

বনলতাও ভাবত আলোচনা করবে না। কিন্তু ছেলেটিকে নিয়ে এত আলোচনা হত চারিদিকে যে শুনতেই হত তার কথা, আর কেউ কেউ যখন বলত, এবার সুপ্রিয় ডুববে, তখন বনলতা ছেলেটির কথা না ভেবে পারত না।

বনলতার ভয় করত ওকে। আর সেই ভয় বেড়েই চলল। ক্লাসে আগে আগে যদি কোন প্রশ্ন কেউ না পারত, শেষ পর্যন্ত সার্ বলতেন, সুপ্রিয় তুমিই বল, আর সুপ্রিয় যদি না বলতে পারত তা হলে বোঝা যেত সার্ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ইদানীং দেখা যেতে লাগল কোন প্রশ্ন সুপ্রিয়ও না পারতে পারে, কিন্তু রঞ্জন পারবেই। যেদিন রঞ্জনকে আগে জিজ্ঞেস করতেন আর রঞ্জন বলতে পারত না, বনলতা নিশ্চিন্ত হত। যেদিন সুপ্রিয়কে আগে জিজ্ঞেস করতেন আর সুপ্রিয় বলতে পারত না, বনলতার বুক ডুরডুর করে উঠত, মনে মনে বলত, রঞ্জন যেন না পারে। কিন্তু অধিকাংশ দিনই বনলতার বুকের ডুরডুরুনি বিষণ্ণতায় পর্যবসিত হত, রঞ্জন বলে দিয়েছে। অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে বসত বনলতা, ছেলেটি এত জানল কী করে।

আর সেই দেখে দ্বিতীয় বেঞ্চে সুপ্রিয়র মুখ কেমন যেন শুকিয়ে উঠত, সুপ্রিয়র শুতে যাবার সময় আরও পেছিয়ে যেত রাত্রে।

বাসন্তী কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করত না ছেলেটি চালবাজ ছাড়া আর কিছু। লেডিজ-কমনরুমে বাসন্তী যা মজা করত! নকল করতে ওস্তাদ বাসন্তী। রুমালটা গলায় বেঁধে বলবে এইটা হল টাই। তারপর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীতে সেটা রগড়াতে রগড়াতে সামনের দিকে ঝুঁকে বাঁ দিকে ঘাড়টা একটু হেলিয়ে খানিকটা নাকী সুরে ইংরেজীতে বলবে, হিয়ার ডারউইন ইজ ইন এরর। দি পয়েণ্ট টু বি কনসিডারড ইজ—

বলে মাথাটা ঝাঁকাবে একটু। সবাই হেসে ফেলবে। নিখুঁত নকল হয়েছে।

রাণী বলবে, বাট হোয়াট ইজ ছাট পয়েণ্ট ?

বাসন্তী খুব গম্ভীর মুখে বুকে একটা টোকা দিয়ে বলবে, ছাট পয়েণ্ট ক্যান ওনলি বি আণ্ডারস্টুড বাই এ জিনিয়াস লাইক মি, দ্য গ্রেট জ্যাকড।

হাসির ধুম পড়ে যায়। বনলতাও হেসে ফেলে। সত্যি ছেলেটিকে বড় উদ্ধত ও অহঙ্কারী বলে মনে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গিয়ে বাসন্তীকে বলে, ছি ছি, লোকের চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়।

বনলতার কেমন একটা দুর্বলতাও আছে রঞ্জনের ওপর, মার মত করুণা, ওর চেহারার জন্যে। বড্ড রোগা আর বড্ড কালো, লম্বা। প্যাণ্ট পরলে এত খারাপ দেখায়! কুৎসিত দেখতে, মানতেই হবে ওকে।

সবাই যখন বিলিতি দাঁড়কাক বলে বনলতা হেসে ফেলে, কথাটা যথাযোগ্য বোধ হয়। কিন্তু বনলতা নিজে কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে না। মজা এই যে ছেলেটির সেদিকে গ্রাহ্যই নেই। দুদিন অন্তর নতুন প্যাণ্ট ভাঙে আর টাই বোধ হয় রোজ পালটায়। আর এমন গটমট করে চলে কারোর যদি মনে হয় কোন পোশাকে তাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে সে যেমন সচেতন পরিবেশ-নির্বিকার হয়, সে রকম। বাসন্তী একদিন মুখের সামনে মুচকি হাসল, ওর গ্রাহ্যই নেই, গটগট করে সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাসন্তী কিন্তু থামল না, মজার এতবড় একটা সুবিধা পাওয়া গিয়েছে, নিত্য নতুন ফন্দী বেরুত ওর মাথা থেকে, কিন্তু রঞ্জনের গ্রাহ্য নেই।

ঠাট্টার মাত্রা বাড়াতে বাড়াতে বাসন্তী একদিন এক কাণ্ড করে বসল। পুজোর ছুটির আগের দিন মেয়েরা রান্না করে ছেলেদের খাইয়েছিল। বাসন্তী জল দিচ্ছিল। রঞ্জন বলল, আমাকে একটু জল দেবেন। গ্লাসে সামান্য জল আছে।

কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাসন্তী বলল, গ্লাসে ঢিল ফেলুন, জল ওপরে উঠে আসবে।

কলসিতে ঢিল ফেলার ঈশপের গল্পের সঙ্গে রঞ্জনের দাঁড়কাক নামটা মিশিয়ে মেয়েদের এত সুড়সুড়ি দিল যে সবাই হেসে ফেলল।

কিন্তু হাসি বেশীক্ষণ থাকল না। সবাই সবিস্ময়ে দেখল, এই প্রথম রঞ্জন কী বলতে গিয়ে কোন কথা বলতে পারল না। শুধু থরথর করে ঠোঁট কেঁপেই চলল, ওর কালো মুখটা জমাট লাল হয়ে উঠল, কয়েক সেকেণ্ড ধরে ও

স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই পারল না। তখন আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়েছিল, ছেলেরা কোনমতে খেয়ে উঠে গেল। মেয়েরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাসন্তী দুর্বলকণ্ঠে বলল, ওকি নামটা জানে? না হলে তো এমন কিছু মারাত্মক রসিকতা নয়।

বনলতা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এল। ছেলেরা সিগারেট খাচ্ছিল। বনলতা সুপ্রিয়কে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, মেয়েদের মধ্যে ওর নামে একটা রসিকতা আছে, সে কি ও-কথা জানে?

কি, দাঁড়কাক?—সুপ্রিয় ক্ষুব্ধ গলায় বলল, খুব ভাল করেই জানে।

কী করে জানল?

তা জানি না। কি রকম জানি না, সবাই জানে।

ভেতরে এসে বলতে বাসন্তী বনলতার দুটো হাত জড়িয়ে ধরল: কী হবে? তোকে ভাই একটা কিছু করতেই হবে। ছুটিতে টিউটোরিয়াল ক্লাস হবে, আমি মুখ দেখাব কী করে?

শেষ পর্যন্ত বনলতা আর রাণী গিয়েছিল হস্টেলে। সুপ্রিয় ওর ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল দুজনকে।

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকারে একটা চেয়ারে জবুথবু হয়ে বসেছিল রঞ্জন।

বনলতা বলল, সমস্ত মেয়ের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি।

নিজের ঘরের পরিবেশে ওর পুরনো ঔদ্ধত্য ফিরে এসেছিল। কড়কড়ে গলায় বলল, যেটা ক্ষমা করবার জিনিস নয় সেটাকে ক্ষমা করব কী করে। আপনি করতেন অনুরূপ অবস্থায়?

বনলতার মুখে উত্তর জোগায় নি, রাগ হয়েছিল বাসন্তীর ওপর, চেহারা একটা মারাত্মক ব্যাপার, এ নিয়ে রসিকতা জানোয়ারও সহ্য করবে না।

সেদিন বনলতারা ফিরে এসেছিল।

পরদিন সেমিনারের মিটিং শেষ করে বনলতা বাড়ি ফিরছিল, হস্টেলের মুখে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা।

রঞ্জন বলল, আপনার সঙ্গে একটা প্রয়োজন আছে। আপনি একবার দয়া করে যদি হস্টেলে আসেন—

ঘরে এসে রঞ্জন বলল, কালকের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত। ব্যাপারটা গুড হিউমারে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কাল একটি কারণে এমনিতেই ভয়ানক ডিপ্রেসড ছিলাম। তাই চেষ্টা করেও সংযত হতে পারি নি। মাঝে মাঝে আমরা এত হোপলেসলি ফ্রেল হয়ে যাই। কিন্তু আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। রঞ্জন থামল কিছুক্ষণ।

বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে মনে হয় ব্যাপারটা যেন হয় নি। রঞ্জন এমনভাবে বলল, যেন দোষটা তারই।

বনলতা হাঁ করে চেয়েছিল। ছেলেটিকে বাইরে থেকে এত উদ্ধত মনে হয়, কিন্তু এত নরমও সে হতে পারে!

রঞ্জন বলল, আপনি হয়তো মনে করছেন আমার খুব কষ্ট হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মোটেই নয়। ছেলে-বেলা থেকে শুনে শুনে আমার সয়ে গেছে। কোন অনুভূতিই হয় না। তবে কোথাও ঠেকলে অস্বস্তি লাগে। সত্যি কথা বলতে কি, কাল আমি একটা ইণ্টারভিউতে এজন্যে ঠেকেছি, সেইজন্যে বুঝতেই পারছেন—

রঞ্জন হাসল। বনলতা দেখল, ঠিক ছেলেমানুষের হাসি। বনলতার ভারী মন কেমন করে উঠল, আহা, ও যতই বলুক, কষ্ট নিশ্চয়ই হয়।

বনলতা জিজ্ঞেস করল, কিসের ইণ্টারভিউ?

ও বলল, রস ফাউণ্ডেশন একটা ইণ্টারন্যাশনাল ইউথ ফোরামের বন্দোবস্ত করেছেন জেনিভায়। শর্তগুলো অত নজর করে পড়ি নি আমি। একজন কর্তা বললেন, আপনি সবগুলো শর্ত পড়েছেন ভাল করে? কণ্ডিশন নাম্বার সিক্স? আমি তখন দেখি লেখা আছে, দি ক্যাণ্ডিডেট মাস্ট বি ফেয়ার লুকিং। অতগুলো লোকের সামনে ঠিক ওই অবস্থায় পড়ে আমার এত লজ্জা করল। তারপরেই আপনাদের খাওয়া-দাওয়া।

ছি ছি।—বনলতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: এ রকম নিয়ম থাকা উচিত নয়।

যাক গে।—রঞ্জন দৃঢ়স্বরে বলল, শেষ পর্যন্ত আমি বেরিয়ে যাবই। একটা রস ফাউণ্ডেশন গেল তো বয়ে গেল।

এরপর থেকে রঞ্জনের ঔদ্ধত্যকে আর ঔদ্ধত্য বলে মনে হত না বনলতার, কেমন ছেলেমানুষী মনে হত। আর

এত ভাল লাগত, মনে হত, রঞ্জন বসে বসে থাবে আর ও দেখবে, খুব ভাল লাগবে ওর।

সেদিন রঞ্জনের ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখেছিল বনলতা, বই বই আর বই। ড্রয়ারে খাটে মশারির চালে জানলায়।

বনলতা বলেছিল, আপনি খুব পড়েন, না ?

না, আজকাল আর তেমন পড়াশুনা করতে পারি না, চশমার পাওয়ারটা বড্ড বাড়ছে।—এতদূর বনলতার মনে হয়েছিল বিনয়, তারপর রঞ্জন যখন সরলভাবে বলল, কিন্তু খুব পড়তে পারলে বেশ হত, না ?—তখন বনলতার ভাল না লেগে পারে নি।

বনলতা বলল, নিজের বিষয়ের বাইরের এইসব বই আপনি পড়েন ?

রঞ্জন বলল, আজকাল বুঝতে পারি ওটা ননসেন্স। আমাদের ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ, আর বিষয়গুলো ক্রমশই এত স্পেশালাইজড হয়ে যাচ্ছে যে সবকিছু জানা অসম্ভব। ফ্যারাডে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি দুইই করেছিলেন, কিন্তু আজকালকার একজন সায়েন্টিস্ট ফিজিক্সের একটা শাখার খবরই ভাল করে জানেন না। আমাদের জুওলজিই ধরুন না, জেনেটিক্সের লোক অ্যানাটমি ভুলে গেছেন।

বনলতা বলল, তবুও সব বিষয়ের মোটা মোটা লাইনগুলো আপনার জানা আছে।

তাতে শুধু দার্শনিক হওয়া যায়।—রঞ্জন হেসেছিল : আর সেটা ক্ষতি।

নতুন আলাপ। তাই বনলতা কথা বাড়ায় নি। কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হয়েছিল, দার্শনিক হলে ক্ষতি কী ? বনলতার নিজের ধাতটা দার্শনিক ধাঁচের আর তার মনে হত, এটা তার একটা শ্রেষ্ঠত্ব।

অনেক পরে রঞ্জন বলেছিল, দু রকমের দার্শনিক মন আছে, থিওরেটিকাল আর প্র্যাকটিকাল।

বনলতা হেসেছিল : সে আবার কী ?

রঞ্জন বলেছিল, কেউ কেউ ভ্যালুগুলো বিশ্লেষণ করে, বোঝে, কিন্তু জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করে না, আর পাঁচজনের মত সংসারের সুখদুঃখ নিয়ে থাকে। সংসারের দিক থেকে তারা প্র্যাকটিকাল লোক হতে পারে, কিন্তু তাদের মন থিওরেটিকাল ফিলোজফার। আর কেউ কেউ আছে, যদি সে কোন ভ্যালু বার করে, তাকে জীবনে লাগাবে, সংসারের লোকে তাকে যাই বলুক না কেন।

কথাটা সত্যি। আর বনলতার মনে হত, যারা রঞ্জনের ওই প্র্যাকটিকাল ফিলজফার তাদের মনের একটা অসাধারণ পৌরুষ আছে আর সেটা অত্যন্ত সুন্দরও। বনলতা বুঝতে পারত সে বিমুগ্ধ পশুর মত এগিয়ে চলেছে, কিন্তু উপায় নেই, বনলতার হাত নেই।

সুপ্রিয় সব বুঝত, কিন্তু বুদ্ধিমান মেয়ের ওপর জোর করা হাস্যকর সেটাও বুঝত সে। তাই বনলতা যখন বলত, আমি হস্টেলে গিয়ে ওর সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করি বলে তোমার রাগ হয় ? সুপ্রিয় বলত, তোমাকে বেঁধে রেখে আমার আনন্দ বাড়ত না।

বনলতা বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করে, সুপ্রিয়র মত মানুষ হয় না। যে মানুষটা কৃতী অর্থবান সুন্দর, তার জীবনে আর একজন বনলতা আসার এমন কিছু অসুবিধা নেই। কিন্তু সে আর একজন বনলতার দিকে চাইবেও না, শুধু এই বনলতার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে বসে থাকবে। সমস্ত মনটা উদার করে রেখেছে বনলতার ত্রুটিবিচ্যুতি ভুলে যাবার জন্যে। আর চলায় কথাবার্তায় এত ডিগনিটি, শুধু রঞ্জনের প্রশংসা করবে। প্রশংসা করলে কী হবে বনলতা জানে। রঞ্জনের অনেক দোষ, সাংসারিক জীবনের মাপকাঠিতে ও চেহারাতে শূন্য পেয়েছে আর ব্যবহারেও সবাই ওকে শূন্যই দেয়। কিন্তু ওর কোন দোষ বনলতার মনে আজকাল অস্বস্তিই আনে না, বনলতার মনে হয়, রঞ্জনের সম্বন্ধে ওটা ভাববার কথাই নয়। যখন জানলায় নিমগাছটা ক্রমশই অস্পষ্ট আর কালো হয়ে আসে, ঘরের কোণগুলোয় অন্ধকার জমাট হয়, বনলতার খেয়াল থাকে না। কোলে তিন চারটে বই নিয়ে রঞ্জনের চেয়ারে বসে হাঁ করে শুনছে। রঞ্জনের একটা পা মুড়ে খাটের ওপর তোলা, কথার জোরের সঙ্গে ডান হাতের তর্জনী ঝাঁকাচ্ছে। কী নিখুঁত বিশ্লেষণ। একজন নিপুণ শল্য চিকিৎসক যেন চোখের সামনে ঘটনাগুলো ব্যবচ্ছেদ করছে আর তাদের সংস্থান দেখিয়ে দিচ্ছে, কোথায় ক্ষত আছে দেখাচ্ছে, কোথায় সুস্থ আছে দেখাচ্ছে। তারপর ঊর্ধ্বে উঠে যাবে, পাহাড়ের চূড়োর মত জায়গায়, যেখান থেকে জ্ঞানের অনেক রাজ্যের সীমানা দেখা যাবে। এক রাজ্যের

সঙ্গে আর এক রাজ্যের সম্পর্ক কী বুঝিয়ে দেবে। আর সবশেষে নিজের মন্তব্য জুড়বে।

এই মন্তব্যগুলো আশ্চর্যজনক, প্রত্যেক দিনই নতুন কিছু বলবে একটা। হেসে বলবে, ইদানীং এই আইডিয়াটা মাথায় এসেছে, লিখেও ফেলেছি অনেকটা, শেষ হলে তোমায় দেখাব।—বনলতা জিজ্ঞেস করবে, কোথায় পাঠাবে?—লণ্ডন উইকলিতে আমি রেগুলার লিখি।—তাই নাকি? বনলতা লণ্ডন উইকলির নাম শুনেছে, বড় বড় মাথা কাজ করে সেখানে, নোবেল লরিয়েটও দু-একজন আছেন। বনলতার মুখে বিস্ময় ফুটে উঠবে। অন্ধকারে বুঝতে না পারলেও বনলতার নড়াচড়া দেখে রঞ্জন অনুভব করবে সেটা। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে বলবে, ওরা খুব টাকা দেয়। যেন অনেক টাকা পাবার লোভে লেখে। তারপর নিজেই বলবে, বেশীদিন আর লেখা চলবে না।

কেন?

বিদ্যে যথেষ্ট নেই। এই পুঁজি নিয়ে বেশী পাকামো চলবে না। ভাবছি, জুওলজি ছাড়া আর কিছু করব না।

হয়তো সত্যিই এই পুঁজি নিয়ে চলবে না, কিন্তু বনলতার মনে হয় পুঁজি বটে একখানা।

বাসে আসতে আসতে বনলতার বিস্ময় লাগবে, এই তো হাজার হাজার লোক চলেছে, কেউ তো এমন করে ভাবে না, ভাবতেও পারে না—রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় একজনই হয়।

গোড়ায় অল্পই আলাপ ছিল। সেই প্রথম আলাপের পর টিউটোরিয়ালে মাঝে মাঝে কথা হত। বনলতার মনে হত ব্যক্তিগত আলাপে ছেলেটি বেশ স্নিগ্ধ, ঔদ্ধত্যটা নেহাতই বাইরের, আর একটা বিষণ্ণ কোমলতা জাগত ওর সেই ইণ্টারভিউয়ের কথা মনে করে। ও যতই বলুক ওর কষ্ট হয় না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই হয়। শুধু বুদ্ধিমান বলে বাইরে চেপে রাখে।

এপ্রিলের মাঝামাঝি একটা পরীক্ষা হয়েছিল, তখনও ওর সঙ্গে চেনাশোনা তত বেশী হয় নি, কিন্তু যখন রেজাল্ট বেরুতে দেখা গেল সুপ্রিয় সেকেণ্ড হয়েছে, তখন বনলতা আশ্চর্য হয়ে অনুভব করল যদিও সে সারা বছর প্রার্থনা করে এসেছে—রঞ্জন না পারে, রঞ্জন না পারে—রঞ্জন পেরে গেল বলে তার দুঃখ নেই, বরং মন্দ লাগছিল না সুপ্রিয়ের কোন দিক তো শূন্য নয়, ওর একটা দিব যদি একটু কম হয়ে যায় ক্ষতি কি। রঞ্জনের একট দিক শূন্য আছে, সুতরাং আর একটা দিক সম্পূর্ণরূপে ভরতি হওয়া চাই।

তারপরেও বনলতা রোজই মনে মনে ইচ্ছে করত, সুপ্রিয়ই জিতুক। কিন্তু সেটা যেন তার ইচ্ছে করা কর্তব্য বলে। ফলাফলের সম্বন্ধে বনলতা ক্রমশই নিস্পৃহ হয়ে উঠছিল, যেই হোক প্রথম হলেই হল।

কিন্তু রঞ্জনের একটা দিক কি শূন্য আছে? শেষদিকে বনলতার তা মনেই হত না, বাইরের চেহারাটা সম্বন্ধে চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল আর মনের কূলকিনারা পেত না, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে নতুন ঐশ্বর্য। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশুনো নিয়ে থাকতে ভালবাসত বনলতা, তাই সুপ্রিয়কে তার ভাল লেগেছিল। পড়াশুনো খুব ভাল, কিন্তু পড়াশুনো যে মানুষের চরিত্র হয়ে উঠতে পারে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বনলতা রঞ্জনের ক্ষেত্রে।

পরে সুপ্রিয়র বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে বনলতা বলেছিল, যে মনটা সবচেয়ে বেশী ঐশ্বর্যবান সে মনটা সবচেয়ে রিক্ত হল কী করে বল দেখি?

কথাটা সুপ্রিয়র নিশ্চয়ই শুনতে কষ্ট হয়েছিল, তার মনও কম ঐশ্বর্যবান নয়, কিন্তু তা নিয়ে মান-অভিমান করার মত মানুষ সুপ্রিয় নয়। স্বচ্ছ উদারতার সঙ্গে বলেছিল, হয়তো ও যা বুঝেছে ওর পক্ষে ঠিক, আমরা যা বুঝেছি তা আমাদের পক্ষে ঠিক।

রঞ্জনের যুক্তি অন্য রকম। সুপ্রিয়র কথা শুনলেও বলবে, ও যা বুঝেছে সেটা ঠিক। কিন্তু তার চেয়েও বৃহত্তর সত্য আছে। তার আলোয় দেখলে সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে মনে হয়।

প্রথম প্রথম বনলতা বুঝতে পারে নি, ডেটা হাতে পেলেই তা থেকে একটা থিওরি গড়বার অনৈসর্গিক ক্ষমতা পেয়েও, প্রাচীন গ্রীক থেকে আধুনিক প্রেমের কবিতা সত্যি করে উপভোগ করবার দুর্লভ মনোবৃত্তি নিয়েও রঞ্জন আস্তে আস্তে এক সর্বগ্রাসী শূন্যতার দিকে এগিয়ে চলেছে। টালিগঞ্জের ওদের বাড়ি কোর্ট থেকে যখন খালাস পেল, তখন রঞ্জন একদিন বনলতাকে বলল, চল না, দেখে আসি কেমন বাড়ি।

তখন ফাইনাল পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। কোনদিন বনলতা রঞ্জন, কোনদিন বনলতা সুপ্রিয়, কোনদিন বা তিনজনেই অকারণে এদিক ওদিক বেড়াতে যেত, কখনও বা সিনেমা থিয়েটারে যেত। শুনে বনলতা বলল, আপত্তি কি?

টালিগঞ্জে গড়িয়ার রাস্তায় বাড়ি। গেট থেকে লাল রাস্তা চলে গেছে। দুদিকে রক্তকরবীর ঝাড়, মাঝে মাঝে ঝাউ, আর রোয়াকের সামনে দুটো নিষ্পত্র গুলঞ্চ গাছ ফুলে ফুলে সোনালী হয়ে রয়েছে। দু পাশে দুটো ছোট ছোট মাঠ, সীমানায় কৃষ্ণচূড়া। বাড়িটা একতলা, বাংলো প্যাটার্নের। লাল টালির চাল, সামনের বারান্দায় বেতের চেয়ার-টেবিল পাতা, দু পাশে দুটো ঘরের জানলায় পর্দা দেওয়া। ভেতরে মাঝখানের ঘরটা ড্রইং রুম, গালচে পাতা, একপাশে শোফা কতকগুলো, অন্যদিকে একটা নীচু ডিভান। কয়েকটা বিলিতি ছবি। একপাশে শোবার ঘর, আর একপাশে লাইব্রেরি। ভেতরে আরও দুটো শোবার ঘর, কিচেন বাথরুম।

রঞ্জন বলল, দাদু বাড়িটা ইদানীং তৈরি করিয়েছিলেন। ওঁর রুচির সঙ্গে নিখুঁত মিলে গেছে। একেবারে ছবির মত বাড়ি।

তোমার দাদু কী করতেন?

কর্মজীবনে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কিন্তু কবিতাও লিখতেন—রিটায়ার করে শুধু কবিতা লিখেছেন। তুমি ওঁর কবিতা পড়েছ? 'পাহাড়ে বিকেল' পড়েছ?

আরে, সোমনাথ মুখোপাধ্যায় তোমার দাদু নাকি?

হ্যাঁ।

বনলতা মাথা দুলিয়ে বলল, আশ্চর্য।

মানে?

আমার ভয়ানক ভাল লাগে। সত্তর বছর বয়সের লেখাতেও কী আবেগ, যুবকদেরও হার মানিয়ে দেয়।

সেটা কি ভাল?

কেন?

বুড়োদের বুড়ো হওয়াই ভাল, যুবক সাজতে চেষ্টা করা মানে শিঙ ভেঙে বাছুরের দলে ঢোকা।

যদি কারও মনের শক্তি থাকে কেন তিনি আসবেন না।

শক্তি থাকে ওসব বাজে কথা, লোভ থাকে। যাকগে।—বলে রঞ্জন প্রসঙ্গ ফিরিয়ে দিয়েছিল: বাড়িটা কিন্তু খুব ভাল।

সোমনাথ মুখোপাধ্যায় খুব একজন বিখ্যাত কবি নন, বনলতাও বেশী মাথা ঘামাল না। বাড়িটা কিন্তু সুন্দর সত্যি করেই। বনলতা বলল, কলকাতায় আছি বলে মনেই হয় না। মনে হয় বাংলা দেশের বাইরে কোথাও ছুটি উপভোগ করছি।

শোবার ঘর থেকে জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে রঞ্জন বাইরের দিকে চাইল: দেখ, ওই গুলঞ্চ গাছগুলো সিম্পলি মারভেলাস, কী ফ্রেস আর কী আশ্চর্য রঙ, সূর্য ডোবার সময় যখন ওদের ওপর আলো এসে পড়বে, যা সুন্দর হবে!—রঞ্জন একটা জিভে আওয়াজ করল—যেন কিছু মিষ্টি জিনিস চুষছে।

আর এই ঘরটা, এটা আর একটু ভাল করে সাজানো দরকার। ঘরের চারিদিকে চাইতে চাইতে রঞ্জন বলে, এত জিনিস বেশী রাখলে ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়। ওই খাটটা ওপাশে রাখব, যেন চোখ খুলেই সূর্য ওঠা দেখা যায়। আর ইজিচেয়ারটা ওই জানলার পাশে, যাতে ওতে বসে বসে সূর্য ডোবা দেখা যায়।

তুমি কি কবিতা লিখবে নাকি?

নাঃ, শুধু উপভোগ করার জন্যে, চোখটা আর কানটা খুলে রাখ, আর উপভোগ কর।

রঞ্জন ইজিচেয়ারটায় বসে পা তুলে দিল। তারপর শুরু হল আবৃত্তি। ও যখন এমনি তর্ক করে তখন একটু নাকী সুর লাগে, কিন্তু আবৃত্তির সময় কি পরিষ্কার গলা! ইউরিপিডিস থেকে খানিকটা বলল, তারপর শেক্সপীয়ার থেকে খানিকটা, আধখানা করে বলল, ভুলে গেছি। তারপর বলল, দেখি শেলি-কীট্স মনে আছে কিনা। এখানে আর আটকালো না, একটার পর একটা আবৃত্তি করে যেতে লাগল।

বনলতা মুগ্ধ হয়ে শুনল, তারপর বলল, দাদুর সুযোগ্য নাতি।

রঞ্জন হেসে বলল, আমারও তাই মনে হত। ছেলেবেলায় আমি কবিতা খুব ভালবাসতুম। আর রক্তের

জন্মে তো পাগল। বাবার ঘরে অনেক ওষুধ থাকত, তার নানা রঙ। আমার কি খেলা ছিল জান?

কী?

বাবার ফেলে দেওয়া শিশি জমাতুম। আর পুরনো ওষুধগুলো ঢালাঢালি করে নতুন রঙ বের করতুম। কত যে রঙ তৈরি করেছিলুম তার ঠিক নেই। আর কী সব আশ্চর্য আশ্চর্য রঙ—সবুজ, সোনালী, ভায়োলেট, লাল, দুধেনীল। আর গাছের পাতা—গাছের পাতা যোগাড় করতুম শুধু সবুজ রঙ দেখব বলে। কত যে সবুজ—সাদাসবুজ থেকে আরম্ভ করে কালো সবুজ। আমি দেখতুম আর ভাবতুম, কী আশ্চর্য, পৃথিবীটা এমন সুন্দর কেন।

বনলতার কেমন মনে হচ্ছে ও কলকাতায় নেই, বাংলাদেশের বাইরে পাহাড়তলীর কোন ছোট্ট সুন্দর শহরে একটি মনোরম নির্জন বাংলোয় একজন মনের মত লোকের সঙ্গে ছুটি উপভোগ করতে এসেছে। প্রগল্‌ভতা বলে কোন জিনিস এখানে নেই। বনলতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: শুধু রঙ আর গাছের পাতা নিয়েই তোমার পৃথিবীটাকে সুন্দর বলে মনে হত?

রঞ্জন হেসে একবার বনলতার মুখের দিকে চাইল। বলল, না, আমার গোটা মনটাই রসিক ছিল। একবার সবে শীত পড়েছে, বোম্বে থেকে পুণা যাচ্ছি। দুপুরবেলা ট্রেনটা একটা ছোট্ট স্টেশনে হঠাৎ থেমে গেল, একটা মিলিটারী ট্রেনকে পাস করাবে। বসে বসে আমার গায়ে ব্যথা লাগছিল, আমি উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালুম। স্টেশনের সামনে ছোট্ট একটা টিলা, তার ওপর স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার্স, গাঢ় লাল রঙ, কাঠের ঝরোকা দেওয়া। তার পাশে একটা নিমগাছ পাতায় পাতায় গোটা ছাদটিকে ছেয়ে রেখেছে। সেই নিমগাছের তলায় একটা ছোট্ট খাটিয়াতে তখন আমার বয়সী একটি মেয়ে একমনে একটি মাসিক পত্রিকা পড়ছে। আর একটি ধবধবে ছাগলছানা তার কোলে লুটোপুটি খাচ্ছে। রঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে শূন্যে চেয়ে রইল, যেন সে ছবিটি আবার দেখছে। বলল, আমার বুক আনন্দে বেদনায় টনটন করে উঠেছিল।

বনলতা বলল, সে আনন্দ সে বেদনা কোনদিন কোথাও গভীর হয় নি?

রঞ্জন চকিতে একবার তার দিকে চাইল, তারপর হেসে বলল, ও।—তারপর বলল, হয় নি, কিন্তু একটা ঘটনাকে হব হব বলে ধরতে পার তুমি। কিন্তু মুশকিল, তখন জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়ার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

বনলতা মনোযোগ দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

রঞ্জন বলল, তখন বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজে আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। রমলা তোষনিওয়াল সেখানে আমার সহপাঠিনী ছিল। আর আমার লিটারারি সোসাইটি করে বেড়াতে খুব ভাল লাগত।

তার মানে?

রমলা লিটারারি সোসাইটির সেক্রেটারি ছিল।—রঞ্জন হাসল।

তারপর?

তখন তো ছোট, মুখে কিছু বলা হয় নি। কিন্তু দুজনেই বুঝতুম।

তারপর?

তারপর জেনে কী হবে। বেশীদূর এগোয় নি।—রঞ্জন উঠে পড়ল: না না, ব্যর্থ প্রেম নয়। নভেল পড়ে পড়ে আমাদের ধারণা হয়ে গেছে প্রেম জমে উঠে বিয়ে নয় ছাড়াছাড়ি হাহুতাশ। কিছুই নয়, শুধু দুজনের বয়স বেড়ে গেল। রমলা একজন মহিলা হয়ে উঠল—সে হৈচৈ পিক্‌নিক্‌ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর আমি তখন সিরিয়স পড়াশুনোর নতুন স্বাদ পেয়েছি। মনে হচ্ছিল, সংসারে নামবার আগে সব জেনে নিতে হবে, পাকাপোক্ত লোক হয়ে সংসারে নামতে হবে, আমি পড়াশুনোয় ডুবে গেলুম।

আশ্চর্য কিছু নয়, সিরিয়স ছেলেমেয়েরা অনেক সময় ওই বয়সে কিউরিওসিটি থাকলেও প্রেমে না নেমে পড়াশুনো শুরু করে দেয়। কিন্তু ফাটল শুরু হল কী করে?

সেটা আমার পাকামি, তুমি শুনলে হাসবে।

বলই না।

ফোর্থ ইয়ারের গডবোলে ছিল ম্যাগাজিনের সম্পাদক কিন্তু সে কিছু দেখত না, আমি আর রমলাই ক্লাসের শেষে বসে বসে লেখা সংশোধন করতুম। একদিন কাজ করতে করতে দেখি রমলার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। আমি বললুম

[২৮২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

দেহতত্ত্ব বা শারীর-দর্শন

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

বাউল সাধনার দেহতত্ত্ব নয়। ভারতের প্রাচীন ঋষি ও আচার্যগণ কোন্ কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে মানব-দেহের কথা আলোচনা করিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিব। এই সকল আলোচনার মধ্যে আমরা প্রাচীন পণ্ডিতগণের তাত্ত্বিক দৃষ্টিরও পরিচয় পাইব। যে দেহকে অনিত্য জানিয়াও আমরা সকলের চেয়ে প্রিয় বলিয়া মনে করি, যে দেহের সুখে ও দুঃখে আমরা নিজেদের সুখী ও দুঃখী বলিয়া ভাবি, যে দেহে শৈশব, কৌমার, যৌবন, জরা প্রভৃতি অবস্থান্তর ঘটে, মৃত্যুর পর যে দেহ ভস্মীভূত বা সমাহিত হয়, সেই দেহের চিন্তায় যে প্রাচীন ঋষিগণ উদাসীন ছিলেন, ইহা সম্ভব নয়। যে বার্ধক্য, জরা ও মৃত্যুর বীভৎস দৃশ্য দর্শনে শাক্যসিংহ ভোগসুখে বীতরাগ হইয়াছিলেন, উহাও তো দেহেরই চিরন্তন ধর্ম। আমরা বিদেহ রাজ্যের অধিবাসী নহি, তাই আমরা দেহের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলিয়া মনে করি। ইহাকে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয় দেহাত্মবুদ্ধি। আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে এক শ্রেণীর দার্শনিকের উদ্ভব হইয়াছিল, যাঁহারা দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। যাঁহারা চার্বাক মতের অনুসরণ করিতেন, তাঁহারা বলিতেন, স্বর্গ মিথ্যা, অপবর্গ মিথ্যা, পরলোকে আত্মার অস্তিত্ব থাকে, এ কথাও মিথ্যা। যখন আমরা বলি 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' ইত্যাদি, তখন 'আমি' শব্দে দেহটাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। আমাদের দেহ জড় বস্তু, তবে জড়ের সমবায়েই ইহাতে চৈতন্যের উদ্ভব হইয়াছে, আর মৃত্যুর পর এই চৈতন্য চিরতরে লুপ্ত হইবে। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষবাদী, তাই তাঁহারা যে সকল ভূত চোখে দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পান, তাহাদেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন। চার্বাকগণের মতে ভূত চারিটি, ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। এই চারিটি ভূতের সমবায়ে পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন। সুতরাং বৃহস্পতির শিষ্যগণ মানব-দেহকে পাঞ্চভৌতিক বলিয়াও স্বীকার করেন না। চারিটি ভূতেই যদি কাজ চলে, তবে ধরা-ছোঁয়ার অতীত আর একটি ভূতকে তাহারা মানিবে কেন?

কিন্তু আমাদের দেহ যে পঞ্চভূতে গঠিত, এ বিশ্বাস বোধ হয় হিন্দু জাতির মজ্জাগত। এ বিশ্বাসের মূলে আছে দার্শনিক বিশ্লেষণ। আমরা চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করি, কর্ণের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করি, নাসিকার দ্বারা নানা গন্ধের আঘ্রাণ করি, জিহ্বার দ্বারা মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত ও কষায় রসের আস্বাদন করি, ত্বকের দ্বারা কোমল, কর্কশ, উষ্ণ, শীতল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য স্পর্শ করি। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রস ও পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ। সুতরাং আমাদের দেহ পঞ্চভূতাত্মক। আবার আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি, পৃথিবী আমাদের নিকট রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দময়ী। তাই বহির্জগতের প্রত্যেকটি বস্তুও পঞ্চভূতে গঠিত। আমাদের দেহ একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা microcosm, যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহাই আছে ভাণ্ডে। 'পঞ্চভূত' সম্পর্কে দার্শনিক বিশ্লেষণের কি সার্থকতা, সে বিষয়ে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন 'পঞ্চভূত' নামক প্রবন্ধে ('জিজ্ঞাসা' দ্রষ্টব্য)। আমাদের 'ভূত' আর পাশ্চাত্ত্য রসায়নের 'মৌলিক পদার্থ' (element) যে এক নয়, এ কথাটিও তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন।

যাহা হউক, আমরা বোধ হয় সকলেই ভূতের বেগার খাটিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

> 'মলেম ভূতের বেগার খেটে,
> আমার কিছুই সম্বল নাইকো গেটে,
> পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
> তারা কারো কথা কেউ শোনে না, দিন তো
> আমার গেল কেটে।'

এই 'বেগার খাটার' অবসান ঘটিবে কবে? যেদিন অন্তিম শয্যায় শয়ন করিব। কিন্তু যতদিন কামনা-বাসনা

থাকিবে, ততদিন তো কর্মবন্ধন খণ্ডিত হইবে না। অজ্ঞানের ঠুলি যতদিন চক্ষু হইতে খসিয়া না পড়িবে, ততদিন 'কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মতই' তো ভবের গাছে ঘুরিতে হইবে। একজন মনস্বী লেখকের ভাষায় বলি, মৃত্যু আমাদের নির্বাণ নহে, তিরোধান মাত্র। মৃত্যুতে আমাদের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহটা পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়। সাধক গোবিন্দ চৌধুরী গাহিয়াছেন—

'আমি চল্লেম রে ভাই সেই আনন্দ-কাননে,
ওরে সংসারেরি লোকে যারে শ্মশান বলে ভয় পায় মনে,
আমার জল যাবে সেই জলাধারে তেজ যাবে সেই বৈশ্বানরে
ওরে রক্তগত বায়ু আমার মিলবে মহা সমীরণে।'

গানটির মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। আদি বিদ্বান কপিল মুনি সর্বপ্রথম এই সত্যটি পৃথিবীতে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—বিনাশ কথাটির অর্থ কারণে লয় হওয়া। আধুনিক বিজ্ঞানও এ কথাটি মানিয়া লইয়াছে।

আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা মানুষের দেহকে উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহারা যে শারীর-বিজ্ঞানেরও চর্চা করিতেন, আয়ুর্বেদশাস্ত্রে, বিশেষতঃ, সুশ্রুত-সংহিতার 'শারীর স্থানে' তাহার নিদর্শন আছে। মহর্ষি সুশ্রুত মানুষের আত্মা ও দেহ উভয়কেই স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, আমাদের দেহে আছে তিনটি দোষ, পাঁচটি ইন্দ্রিয় ও সাতটি ধাতু। অবশ্য, মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয় যে পাঁচটি, এ কথাটি শুধু আমাদের দর্শনশাস্ত্রে নয়, পাশ্চাত্ত্যের মনোবিজ্ঞানেও স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের অধিকারী, এই পাঁচ ইন্দ্রিয় যেন জ্ঞানের পাঁচটি দ্বার। আবার আমাদের দেহ বায়ু, পিত্ত ও কফের অধিষ্ঠান-ভূমি, ইহাদিগকে কখনও বলা হইয়াছে দোষ, কখনও বলা হইয়াছে ধাতু, কখনও বলা হইয়াছে মল। এখানে বলিয়া রাখি, 'পঞ্চভূতের' ন্যায় 'ত্রিদোষতত্ত্ব'ও দার্শনিক বিশ্লেষণের ফল। 'সপ্তধাতু' বলিতে প্রাচীনেরা বুঝিয়াছেন রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। মনস্বী বাগ্‌ভট বলেন, যিনি ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার দেহে ওজ নামক অষ্টম ধাতু উৎপন্ন হয়। এই ওজোধাতুই উৎসাহ, প্রতিভা, ধৈর্য, লাবণ্য ও সৌকুমার্যের উৎস। বাগ্‌ভটের ভাষায়—

'যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলাদয়ঃ।
যন্নাশে নিয়তং নাশো যস্মিং তিষ্ঠতি জীবনম্‌॥
নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ।
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য-লাবণ্য-সুকুমারতাঃ॥'

আচার্য শঙ্কর বলেন, যাহা দগ্ধ বা ভস্মীভূত হয়, তাহার নাম দেহ। (দহ্‌ ভস্মীকরণে) কিন্তু এ কেমন কথা হইল! সকল সম্প্রদায়ের মানুষের দেহ তো আর মৃত্যুর পরে ভস্মীভূত হয় না। কাহারও দেহ মৃত্তিকায় সমাহিত হয়, কাহারও দেহ জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, কাহারও দেহে বা মাংসাশী বিহগকুলের উদর-পূর্তি হয়। অবশ্য, আচার্য শঙ্কর নিজেই এইরূপ পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, যাহা জীবিতকালেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতেছে, তাহার নাম দেহ।

আমরা যদি বলি, শঙ্কর এখানে দেহ অর্থে মন বুঝিয়াছেন, তবে বিশেষ দোষ হয় না। আবার আত্মা কথাটিও দেহ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা, আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

বিদেশী পণ্ডিত বলিবেন, আচার্য শঙ্কর ভয়ানক নৈরাশ্যবাদের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি ভারতীয় দর্শন নৈরাশ্যবাদ প্রচার করে? মানুষ যে সাধনার দ্বারা চিরকালের জন্য দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারে, এ কথা তো ভারতের প্রায় প্রত্যেক দার্শনিকই স্বীকার করেন। আচার্য শঙ্কর যে মুক্তির কথা বলেন, সেও তো নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অবস্থা (A state of positive bliss)।

তবে ব্যাকরণের দিক দিয়া বিচার করিলে এ কথা বলিতে হয় যে দেহ কথাটি দহ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন হয় নাই। দেহ কথাটি নিষ্পন্ন হইয়াছে দিহ্‌ ধাতু হইতে। আমাদের এই অন্নময় কোষের উপচয় বা বৃদ্ধি ঘটে বলিয়াই ইহার নাম দেহ, আর ইহা শীর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম শরীর, আবার একই সঙ্গে ভাঙাগড়া চলে বলিয়া ইহার নাম পুদ্গল (পূর্যতে গলতি চ—যাহা একই সঙ্গে পূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়)। আমাদের দেহের মধ্যে অনুক্ষণ যে ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া চলিতেছে তাহাকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে বলে metabolism। আমাদের দেহের মধ্যে যে অপচয় বা অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহার পাশ্চাত্ত্য নাম

catabolism। আর দেহের মধ্যে যে উপচয় বা ক্ষয়পূরণের প্রক্রিয়া চলিতেছে, তাহার পাশ্চাত্ত্য নাম anabolism। বার্ধক্যে আমাদের দেহে যে পরিমাণে ক্ষয় হয়, সেই পরিমাণে ক্ষয় পূরণ হয় না। সুতরাং আমাদের দেহ জরায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। মানুষ তখন নানাপ্রকার রসায়ন সেবন করিয়া জরাকে ঠেকাইয়া রাখিতে চায় কিন্তু প্রকৃতির বিধানকে সে লঙ্ঘন করিতে পারে না। রামেন্দ্রসুন্দর সত্যই বলিয়াছেন, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে শেষ পর্যন্ত হার মানিতেই হয়। তাই মানুষ অপত্যের মধ্য দিয়া বাঁচিতে চায়, সংসারে কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিতে চায়। হায় রে বুদ্ধিহীন মানব! বাঁচিবার জন্য তোমার এ কী অক্লান্ত ও দুর্দমনীয় প্রয়াস!

মানুষের দেহ যখন জরাগ্রস্ত হয়, তখনও সে মোহিনী আশার ছলনায় মুগ্ধ হয়, বিষয়বাসনারূপ মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ধাবিত হয়। আচার্য শঙ্কর বলেন—

'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত কম্পিত শোভিতদণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং॥'

বার্ধক্যে মানুষের অঙ্গসমূহ গলিত হয়, মস্তকের কেশসমূহ পক্ব হয়, বদন দন্তশূন্য হয় (আজকাল অবশ্য দন্তচিকিৎসকের কৃপায় এরূপ বৈদান্তিক হওয়ার প্রয়োজন নাই), কম্পিত করে যষ্টি শোভা পায়, তথাপি মানুষ আশা ত্যাগ করে না।

কবি কর্ণপূর বলেন—

'বয়ো জীর্ণং হা ধিক্ তদপি ন জীর্ণো মদভরঃ
শ্লথং চর্মাঙ্গেভ্যস্তদপি ন রাগঃ শ্লথ এব।'

তোমার তো বয়স জীর্ণ হইল, হা ধিক, তবু তোমার অহঙ্কারের ভার একটু জীর্ণ হইল না, তোমার তো অঙ্গসমূহে চর্ম শিথিল হইল, তবু তোমার বিষয়ের প্রতি অনুরাগ একটু শিথিল হইল না।

শ্লোকটির চতুর্থ চরণে ভক্ত কবি মানুষকে কল্যাণের পথ নির্দেশ করিয়াছেন, 'জনঃ কংসারাতেশ্চরণকমলায় স্পৃহয়তু', অর্থাৎ মানুষ কংসারাতির (শ্রীকৃষ্ণের) চরণকমলের জন্য লালায়িত হউক।

ভর্তৃহরি বলিয়াছেন, 'রূপে জরায়া ভয়ম্'। অর্থাৎ রূপে জরার ভয় রহিয়াছে। আমাদের জীবন চঞ্চল, যৌবন ততোধিক চঞ্চল, জীবনের পশ্চাতে মৃত্যু ও যৌবনের পশ্চাতে জরা ধাবিত হইতেছে, এই প্রত্যক্ষ সত্যও আমরা ভুলিয়া যাই। ভগবান বুদ্ধের উপদেশে রূপজীবিনী অম্বপালী 'থেরী' হইয়া যে চমৎকার গাথা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি যৌবনের বিগত দিনগুলির সঙ্গে বার্ধক্যের দিনগুলির তুলনা করিয়াছেন, যৌবনে তাঁহার দেহের অঙ্গে অঙ্গে যে রূপ ও লাবণ্যের তরঙ্গ খেলিয়া যাইত, তাহা এখন স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে, জরার কুশ্রীতা এখন তাঁহার সমস্ত অঙ্গ অধিকার করিয়াছে, তাই অম্বপালী অনিত্য ও পরিবর্তনশীল দেহের প্রতি মোহ পরিত্যাগ করিতে মানুষকে উপদেশ দিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, ভারতীয় ঋষিগণ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলেই ত্রিদোষতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে এই তিনটি দোষ বা ধাতুর সমতার নাম স্বাস্থ্য, কিন্তু এ সংসারে সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা অতি বিরল। তাই কেহ বাতপ্রকৃতি, কেহ পিত্তপ্রকৃতি আবার কেহ বা শ্লেষ্ম-প্রকৃতি, আর চিকিৎসককে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই ধাতুগত পার্থক্য উপলব্ধি করিতেই হইবে। যথার্থ চিকিৎসক জানেন, রাম ও শ্যামের ব্যাধি এক হইলেও চিকিৎসার পদ্ধতি স্বতন্ত্র হইতে পারে। উপনিষদের ঋষিগণ বলিয়াছেন, আত্মাকে জান। আমরা বলি শরীরং বিদ্ধি; আত্মাকে জানার পূর্বে নিজের দেহকে জান, এবং দেহটিকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করিতে চেষ্টা কর। কোন্‌টা তোমার পথ্য আর কোন্‌টা অপথ্য, কোন্ ভেষজ তোমার পক্ষে উপযোগী, আর কোন্‌টাই বা অনুপযোগী, সে সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ কর, এক কথায় বলিতে গেলে 'স্বস্থবৃত্ত' কাহাকে বলে, তাহা জানিয়া লও। ত্রিদোষতত্ত্ব সম্পর্কে আয়ুর্বেদে নানা স্থানে আলোচনা রহিয়াছে। কৌতূহলী পাঠক পরলোকগত কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্তের 'আয়ুর্বেদীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব' গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। কেহ কেহ মনে করেন, যে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরস দেহের ক্ষয় সাধন করে (catabolic hormone), তাহাকেই প্রাচীন ঋষিরা বলিতেন পিত্ত, আর যে গ্রন্থিরস দেহের উপচয় সাধন করে (anabolic hormone), তাহাই প্রাচীন পরিভাষায় শ্লেষ্মা, আর

যাহাকে sympathetic nerve-current বলা হয়, তাহাই আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বায়ু। এই মতের মধ্যে কিছুটা সত্য রহিয়াছে। বায়ুর ক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে বলা হইয়াছে—

'পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ।
বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ॥'

নির্বাণলাভের পর ভগবান বুদ্ধ প্রথম যে উদানটি উচ্চারণ করেন, তাহাতে তিনি দেহকে গেহের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। 'বাসনা'কে তিনি বলিয়াছেন 'গৃহকারক'। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস দেহকে আত্মার বন্ধন বলিয়া মনে করিতেন। আমাদের দেহটা যেন পিঞ্জর আর আত্মা মুক্তগগনচারী বিহঙ্গম। আমাদের দেশের অনেক সাধক আবার দেহকে 'তরী'র সঙ্গেও তুলনা করিয়াছেন। সাধক গাহিয়াছেন—

'যে জন শ্রীগুরু করে কাণ্ডারী,
ডোবে না তার দেহতরী।'

আমরা বলিয়াছি, বাউল সাধকের দেহতত্ত্ব আমরা আলোচনা করিব না। শুধু এই কথাটি বলিয়া রাখি যে, বাউল সাধনায় মানব-দেহ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেরই প্রতীক। তাঁহাদের মতে এই দেহেই কাশী, কাঞ্চী, প্রভাসাদি যাবতীয় তীর্থ বিরাজিত। মুসলমান বাউল বলেন, এই দেহেই রহিয়াছে মক্কা, মদিনা প্রভৃতি তীর্থ। সুতরাং বাহিরে ছুটাছুটি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। একমাত্র মনের মানুষ বা গুরুকে আশ্রয় করিয়া সাধনা করিলেই মানুষ ভবসমুদ্র হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।

আমাদের দেশের যোগিগণ যে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর কথা, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি চক্রের কথা, দ্বিদল প্রভৃতি পদ্মের কথা বলিয়াছেন, উহা তাঁহাদেরই অনুভবগম্য। এ সকল বিষয়ের আলোচনায় আমরা অধিকারী নহি। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন, যোগী নাভিতে মনঃসংযোগ করিলে কায়ব্যূহের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, শারীর-বিজ্ঞান (Anatomy ও Physiology) আয়ত্ত করিতে পারে।

মানবদেহকে এ দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ তিনটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিয়াছেন। একটি আসক্তের দৃষ্টি, একটি বিরক্তের দৃষ্টি, আর একটি বিজ্ঞানী বা প্রজ্ঞানীর দৃষ্টি।

নরনারীর অন্তরে বয়ঃসন্ধিকালে যে আসঙ্গ-লিপ্সা জাগে, যৌবনে তাহাই দুর্নিবার হইয়া উঠে। অবশ্য, বর্বর মানুষের লালসা নিতান্তই জৈব স্তরের ব্যাপার, কিন্তু মার্জিতরুচি মানুষের কামনা কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, অলস কল্পনাবিলাস বা দিবাস্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করে। তিনি তাঁহার প্রিয়াকে বলেন, 'অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা'। কিন্তু তাঁহার কামনা দেহকে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয় না, এমন কথা বলা যায় না। আমরা দেহহীন প্রেম বা Platonic Love-এর কথা শুনিয়া থাকি সত্য, কিন্তু কামগন্ধহীন প্রেমও যে কোন মুহূর্তে দেহের স্তরে নামিয়া আসিতে পারে। প্রাচীন কবিগণ যে নারীদের রূপ-যৌবন, বিভ্রম-বিলাস প্রভৃতির বর্ণনা করিতে গিয়া উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের ছড়াছড়ি করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহাদের ভোগাসক্তিই প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। 'শৃঙ্গার-রসাষ্টক', 'শৃঙ্গারতিলক', 'শৃঙ্গারশতক' প্রভৃতি কাব্য কবিদের যৌনলালসার বিজৃম্ভণ মাত্র। ভারতীয় কবিগণ কোথাও রূপজ মোহকে অস্বীকার করেন নাই, দেহহীন প্রেমেরও জয়গান করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, উদগ্র আসক্তির পথ শ্রেয়ের পথ নহে। মহাকবি কালিদাস ভোগাসক্তির কবি কিন্তু এই আসক্তি যে অনেক সময় মানুষের জীবনকে অভিশপ্ত করে, সে চিত্রও তিনি দেখাইয়াছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, কালিদাস একই সঙ্গে ভোগাসক্তি ও ভোগবিরতির কবি। শুধু কালিদাস কেন, ভারতের ঋষি-কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাস দেখাইয়াছেন, ধর্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলে কাম বা রূপজ মোহ মানুষকে মহতী বিনষ্টির পথে লইয়া যায়। সীতার অনুপম রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া রাবণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

'ন মন্মথশরাবিষ্টং প্রত্যাখ্যাতুং ত্বমর্হসি।'

আমি মন্মথ-শরে আবিষ্ট, আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে।

'তব ভাগ্যেন সম্প্রাপ্তং ভজ মাং বরবর্ণিনি।'

তোমার ভাগ্যবশত আমি উপস্থিত হইয়াছি, হে সুন্দরি, আমায় ভজনা কর।

আবার মহাভারতের বনপর্বে দেখিতে পাই, রূপে মুগ্ধ

জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিবার পূর্বে তাঁহার প্রতি এই ভাবে 'প্রেম-নিবেদন' করিয়াছিলেন। অবশ্য, ইহা প্রেম নহে, রূপজ মোহ মাত্র; ইহাতে ফেনিলোচ্ছল মদিরার মত্ততা আছে, স্নিগ্ধ প্রশান্তি নাই। এই মোহ, এই ভোগাসক্তি, পাঞ্চভৌতিক দেহের প্রতি এই লালসা যে বিদ্বান ব্যক্তির বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে, ভারতের ঋষি-কবি এ কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। বাল্মীকি ও বেদব্যাস ভোগাসক্তির কবি নহেন, কিন্তু কামার্ত পুরুষ নারীরূপের চিন্তনে বা বর্ণনে যে সুখ সম্ভোগ করে, সৌন্দর্যের কবি কালিদাস যেন সেই সুখটুকু আহরণ করিতে চাহেন, ঋতু-বৈচিত্র্যের বর্ণনা করিতে গিয়াও তরুণ-তরুণীর মুগ্ধ চিত্তে ঋতুর যে আবেদন, তাহাকেই তিনি প্রাধান্য দেন। আবার রূপমুগ্ধ দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার সম্পর্কে বলেন—

'অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ চ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥'

অথবা বিরহী যক্ষ যখন মেঘকে প্রিয়ার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণিভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাৎ যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥'

তখন বুঝিতে পারি, মহাকবি কালিদাস স্বয়ং রূপে মুগ্ধ, ভোগে আসক্ত। অবশ্য, এই মোহ বা আসক্তি যেখানে মানুষকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে, সেখানেই জীবনের ছন্দপতন হয়। মহাকবি কৌশলে এই তত্ত্বটুকুও আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আবার এ কথাও সত্য যে, কালিদাস পৃথিবীর সকল পাত্র হইতেই আনন্দ-মদিরা-ধারা পান করিতে চাহিয়াছেন, পানের উন্মত্ততা চাহেন নাই। একজন রসিক পুরুষ বলিয়াছেন—

'বিনোদমাত্রমেবেদং ইতি যস্যাবধারণা।
বিটবৃত্তং স জানাতি'—

ইহা শুধু আমার বিনোদ বা খেলামাত্র, এইরূপ যাঁহার দৃঢ় নিশ্চয় হয়, তিনিই বিদগ্ধ লম্পটের আচরণ জানেন।

সাহিত্যে পুরুষের অপেক্ষা নারীর রূপের বর্ণনা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে, পুরুষ-কবির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ইহার অন্যতম কারণ। শিভ্যালরির যুগে পুরুষ নারীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, নারী তাহার নিকট ministering angel। আমাদের চণ্ডীতে নারীকে জগন্মাতার অংশস্বরূপিণী বলা হইয়াছে—

'ভবন্তি বিদ্যাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু ॥'

কিন্তু এ দৃষ্টি সাধকের দৃষ্টি, আর রূপমুগ্ধ পুরুষ যেখানে নারীকে দেবী সম্বোধন করে, সেখানে তাহার দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে এই দৈহিক মিলনের কামনা। সন্তানের জন্ম এক অপূর্ব রহস্য, আর এই সন্তানের জন্মের পরেই জননীর দেহে ও মনে ঘটে এক অদ্ভুত রূপান্তর। যদিও এ কথা সত্য যে জায়ার মধ্যে আমরা পুনরায় জন্মগ্রহণ করি (জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ), তথাপি জননী যেমন করিয়া সন্তানের মধ্যে আপন সত্তাকে অনুভব করে, পিতা তেমন করে না। সন্তান কিন্তু জনক-জননী উভয়ের হৃদয়কে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই ভাবে বিবাহের পর নরনারীর আসঙ্গ-লিপ্সা ধীরে ধীরে শোধিত হইয়া প্রেম বা স্নেহসারে পরিণত হয়।

আমরা প্রসঙ্গান্তরে আসিয়া পড়িয়াছি। যে কথা বলিতেছিলাম। আমাদের দেশে যেমন কোন কোন কবি নারীর রূপ-লাবণ্যের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন, তেমনই আবার কোন কোন কবি (অর্থাৎ জ্ঞানী) আমাদের মনকে মোহ-প্রবুদ্ধ করিবার জন্য নারীদেহের বিশ্লেষণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন, নিজের দেহের জঘন্যতার কথাই প্রথম চিন্তা করিবে, তারপর অপরের দেহের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিবে।

'শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।'

বাহিরে ও অন্তরে শুচি হইবে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও চিন্তা করিবে যে, আমার এই নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহটিকে যতই আমি শুচি রাখিতে চেষ্টা করি না কেন, কিছুতেই শুচি রাখিতে পারি না। এই ভাবে নিজের দেহের জঘন্যতা উপলব্ধি করিবে। তখন আর অপরের দেহের প্রতি লালসা জন্মিবে না। তখন যে মোহের বশে নারীকে 'অনবদ্যাঙ্গী' বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই মোহের আবরণ

খসিয়া পড়িবে, আবার নারীর চোখে যে নরবপু পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, উহাও অত্যন্ত বীভৎস বলিয়া মনে হইবে। বিদর্ভনগরের রূপজীবিনী পিঙ্গলা এই ভাবেই তো ভোগাসক্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পতঞ্জলি বলেন, আমরা যে অনিত্য দেহকে নিত্য বলিয়া মনে করি, অশুচি দেহকে শুচি বলিয়া মনে করি, আর দেহকে আত্মা বলিয়া মনে করি, তাহার মূলে রহিয়াছে অবিদ্যা। আমাদের দেশের অনেক সাধক দেহের অনিত্যতা ও অশুচিত্বের কথা চিন্তা করিয়া দেহের প্রতি মমত্ব-বোধ ও ভোগাসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় 'ভক্তিযোগে' রিপুজয়ের যে সকল পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন ('কাম' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য), তাহার মধ্যে একটি শরীরের জঘন্যতা-চিন্তন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ) যে এককালে এইরূপ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, 'রামকৃষ্ণ-কথামৃতে' তাহার নজীর আছে। 'শান্তিশতকে'র রচয়িতা শিহ্লন মিশ্র কবিত্ব-পূর্ণ ভাষায় ভোগাকাঙ্ক্ষার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, মানব-দেহ যে অনিত্য ও জুগুপ্সিত এ কথাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করিলে বলিতে পারি, কালিদাস যদি 'রোমান্টিক' কবি, শিহ্লন মিশ্র তবে 'অ্যান্টি-রোমান্টিক।' যোগোপনিষদে শুকদেব ও ব্যাসদেবের সংবাদে দেখা যায়, শুকদেব দেহের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই সংসার-বন্ধনে বাঁধা পড়েন নাই। শুকদেব মানব-দেহের কদর্যতা দেখাইবার জন্য এই সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন, যথা—'অমেধ্যপূর্ণ', 'কৃমিজাল-সংকুল', 'স্বভাব-দুর্গন্ধি', 'মূত্রবিষ্ঠানুলিপ্ত', 'পূতি-চর্মাবনদ্ধ' অর্থাৎ অপবিত্র চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ইত্যাদি। মানবদেহ সম্পর্কে এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অন্য কোন দেশের কবি হয়তো করেন নাই। যে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্থানে স্থানে কবির ভোগাসক্তি প্রকট হইয়াছে, তিনিও 'হিতমালা' কবিতায় লিখিয়াছেন—

'যুবতীর স্তনদ্বয়ে মাংসপিণ্ড সার,
কনক-কলস সহ তুলনা তাহার॥
কফ আর কাসে ভরা নারীর বদন।
মূত্রক্লেদময় সদা নারীর জঘন।
উপমায় করিশুণ্ড হতেছে বর্ণন॥
এমন যে নারীদেহ নিন্দার নিলয়।
কবিমুখে কখনই নিন্দনীয় নয়॥
* * *
অসার ভাবিয়া সার একে কয় আর।
অতএব কবির চরণে নমস্কার॥

শিহ্লন মিশ্রও বলিয়াছেন, যাহারা মহামোহে অন্ধ তাহাদের নিকট কোন্ বস্তু না রমণীয় হয়! সাহিত্যে নারীর চেয়ে পুরুষের দান অধিক, তাই সাহিত্য যেমন নারীদেহের প্রশস্তিতে মুখর তেমনই আবার নারী নিন্দায় পঞ্চমুখ। অবশ্য নরনারী-নির্বিশেষে মানবদে একই উপাদানে গড়া, মানুষের দেহের পরিণতিও এক তাই যোগোপনিষৎ নারীদেহ ও নরদেহ উভয়ের বীভৎসতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

অবশ্য যেখানে নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে নারী পুরুষ উভয়েই অপরাধী, সেখানে অনেক মহাপুরুষও নারী স্কন্ধেই সমস্ত দোষ চাপাইয়া দিয়াছেন। আচার্য শং বলিয়াছেন—'দ্বারং কিমেকং নরকস্য ?—নারী।' কি এই নরকের দ্বার না থাকিলে আচার্য শঙ্করই বা কোথ থাকিতেন ? ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

'দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী পলক পলক লহু চোষে

আর ভক্ত কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি,
আগে ইচ্ছা-সুখে পান করে বিষের জ্বালায় ছটফটি

অবশ্য, এ কথা সত্য যে, ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য শঙ্কর, ভ তুলসীদাস বা মাতৃসাধক রামপ্রসাদ, ইঁহাদের কেহ জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ারের মত নারীবিদ্বেষী ছিলে না, পুরুষকে মোহপ্রবুদ্ধ করিবার জন্যই তাঁহারা এইরূ উক্তি করিয়াছেন।

কিন্তু জ্ঞানীর চোখে ভালবাসা ও ঘৃণা উভয়ই তো মনে বিকার মাত্র। আধুনিক মনস্তত্ত্ব বলেন, ভালবাসা ও ঘৃ একই মনোভাবের দুইটি দিক (Love is ambevi lent)। প্রাচীন গ্রীকগণ সম্ভবতঃ এই তত্ত্ব জানিতেন তাই তাঁহাদের মদন পঞ্চশর নহেন, কিন্তু তাঁহার বাণে অদ্ভুত শক্তি। তিনি এক হস্তে যে বাণ ধারণ করেন, উহ আঘাতে নরনারী পরস্পরের প্রতি প্রেমে আসক্ত হন, অ তাঁহার অপর হস্তে যে বাণ রহিয়াছে, তাহার আঘা

নরনারী পরস্পরকে ঘৃণা করে। আমরা সর্বদা দেহের কদর্যতার কথা চিন্তা করিয়া দেহের প্রতি ঘৃণার ভাব জন্মাইতে পারি, তথাপি প্রবল রিপুর তাড়নায় সাময়িক-ভাবে আমাদের বিচারবুদ্ধি লুপ্ত হইতে পারে। বিশেষতঃ, সর্বদা দেহের অশুচিতার কথা চিন্তা করা সুস্থ মনের পরিচয় নয়। তাই আমরা যদি নারীকে মহামায়ার অংশ-স্বরূপিণী বলিয়া ভাবনা করিতে অভ্যস্ত হই (ভাবনা জিনিসটি মনের বিলাস নহে), তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টি হইতে মোহের আবরণ অপসারিত হইবে। আবার অবস্থাবিশেষে, পুরুষ নারীকে কন্যাভাবেও ভাবনা করিতে পারেন। নারীও পুরুষকে পিতৃভাবে অথবা পুত্রভাবে দেখিতে পারেন। ভ্রাতা-ভগিনীর সম্পর্কও পবিত্র, কিন্তু আমাদের দেশের বহুদর্শী প্রাচীন ঋষিগণ এরূপ ভাবনা করিবার নির্দেশ দেন নাই। আজকাল কেহ কেহ নরনারীর মধ্যে সখ্যের সম্পর্ক স্থাপন করার পক্ষপাতী, এই সম্পর্কে নারী পুরুষের প্রিয়বান্ধবী, আর পুরুষও নারীর প্রিয়বান্ধব, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, নরনারীর মধ্যে সখ্যরসের সম্পর্ক যে কোন মুহূর্তে শৃঙ্গাররসে পর্যবসান লাভ করিতে পারে।

'সমুদায় নারীজাতি জননী আমার'—কেমন করিয়া এই ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

এ দৃষ্টি বিরক্তের দৃষ্টি নয়, ইহা প্রজ্ঞানীর দৃষ্টি।

আমাদের মানসিক বিকারের মূলে অনেক সময় থাকে প্রবৃত্তির সহিত বিবেকের বা সামাজিক কল্যাণবুদ্ধির দ্বন্দ্ব। প্রবৃত্তি আমাদের উচ্ছৃঙ্খল ভোগের পথে আকর্ষণ করে, আর শুভবুদ্ধি আমাদিগকে সংযমের পথে চালিত করিতে চায়। অনেক সময় মানুষের কামনা স্বাভাবিক পথে প্রবাহিত না হইয়া বক্র পথে প্রবাহিত হয়, ইহাতে আমাদের আত্মমর্যাদা-বোধে আঘাত লাগে। ফলে আমাদের মনে নানাপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয়। মনের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে সংযত ও জিতেন্দ্রিয় হইতেই হইবে। আমাদের শাস্ত্র (শিবসংহিতা) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, সংযমের পথই জীবনের পথ, শ্রেয়ের পথ, আর অসংযমের পথ মৃত্যুর পথ, প্রেয়ের পথ, (the primrose path of dalliance)।

মানুষ বিধাতার এক বিচিত্র সৃষ্টি—বিচিত্র তাহার রূপ, তাহার বর্ণ, তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার ভাষা, তাহার আচার-অনুষ্ঠান, তাহার ধর্ম। মানুষের হাসিকান্নারই বা কত বৈচিত্র্য! মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য দেখিয়া প্রাচীনকালেই নানাজাতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে এ দুইয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। প্রাচীন গ্রীসদেশে মানুষের দৈহিক আকৃতি দর্শনে তাহার চরিত্র-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে এবং স্বয়ং সক্রেটিস এই বিদ্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে বলা হইয়াছে, মানুষের হৃদয় তাহার মুখে প্রতিফলিত হয়, আবার এ কথাও বলা হইয়াছে যে, মানুষের মুখের ভাব অনেক সময় তাহার অন্তরের নীচতাকে গোপন করে। সেক্সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের ইয়াগো-চরিত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আমরা নাট্যকারের ভাষায় বলিতে পারি, 'A man may look like the innocent flower and be the serpent within it'। ভারতের ঋষিগণ বলেন, মানুষের নয়নে তাহার মনের ভাব প্রতিফলিত হইবেই। বুদ্ধদেবের অন্তরের স্থির প্রশান্তি ও নাদিরশাহের নররক্ত-লোলুপতা যে তাঁহাদের চোখে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু যে বিদ্যা আয়ত্ত করিলে আমরা সকল সময়েই মানুষের চক্ষুর্দ্বয়ে তাহার অন্তরের প্রতিফলন দেখিতে পাই, সে বিদ্যা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। মহাভারতে এই বিদ্যাকে বলা হইয়াছে 'চাক্ষুষী বিদ্যা'। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিলে আমরা স্থিরনেত্রে অপরের চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাকে অভিভূত করিতে পারি, তাহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে পারি। ক্ষেত্রবিশেষে এই বিদ্যার অপপ্রয়োগও হইতে পারে, আবার এই বিদ্যার দ্বারা অপরের রোগ নিরাময়ও করা যাইতে পারে (Therapeutic use of hypnotism)। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ 'পাতঞ্জল দর্শনে'র ভূমিকায় চাক্ষুষী বিদ্যা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন।

মহামতি চরক বলেন, মানুষের আকৃতি বর্ণ প্রভৃতি দর্শন করিয়া বা তাহার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তাহার প্রকৃতি অনুমান করা যায়, অর্থাৎ সে বাতপ্রকৃতি, কি পিত্তপ্রকৃতি কি শ্লেষ্মপ্রকৃতি তাহা বলিতে পারা যায়। Personal Equation গ্রন্থে লুই বার্মাণ (Louis

Berman) বলেন, কোন মানুষের আকৃতি, তাহার দেহের দৈর্ঘ্য বা হ্রস্বতা প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে আমরা বলিতে পারি তাহার দেহে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরসের ক্ষরণ স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক এবং ইহা হইতে আমরা বলিতে পারি, মানুষটির প্রকৃতি কিরূপ হইবে।

সংসারে কোন মানুষের সঙ্গে কোন মানুষের মিল নাই। মানুষের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, কোন মানুষ খাটো, কোন মানুষ লম্বা, কেউ কালো, কেউ গৌরবর্ণ ইত্যাদি। এ সব পার্থক্যের মূলে আছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরসের ক্রিয়া। কিন্তু সংসারে কেহই নিজের দেহ লইয়া সুখী নয়। স্থূলাঙ্গেরা কৃশ হইতে ও ক্ষীণাঙ্গেরা স্থূলাঙ্গ হইতে চায়, খাটো মানুষ লম্বা হইতে ও লম্বা মানুষ খাটো হইতে চায়। তাই একজন মনীষী বলিয়াছেন—'Like all fat men who want to be thin and thin men who want to be fat, tall men who want to be short are as numerous as short men who want to be tall'।

মহর্ষি চরক বলেন—সংসারে আট প্রকার পুরুষ নিন্দার যোগ্য। আট প্রকার কি কি? অতি হ্রস্ব, অতি দীর্ঘ, অতি স্থূল, অতি কৃশ, অতি শ্বেত, অতি কৃষ্ণ, অতি লোমা ও অলোমা। এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু বেচারা মানুষকে বড় একটা দোষী করা চলে না।

আমাদের ভারতবর্ষে বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তিত হইলেও জীবনকে কখনও অস্বীকার করা হয় নাই, তাই মানুষের স্থূল দেহ বা অন্নময় কোষকে উপেক্ষা করা হয় নাই। দার্শনিকেরা অবশ্য শুধু স্থূল শরীরের কথাই বলেন নাই, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের কথাও বলিয়াছেন। আমাদের জাগ্রদবস্থায় মন স্থূল শরীরে অবস্থান করে, স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্ম শরীর ক্রিয়াশীল হয়, আর সুষুপ্তির অবস্থায় মন কারণ শরীর বা আনন্দময় কোষ আশ্রয় করে। কিন্তু দর্শনের গহন অরণ্যে আমরা প্রবেশ করিব না। প্রাচীনেরা যে আমাদের স্থূল দেহের যথাযথ মূল্য দিয়াছেন সে কথাটি স্মরণ রাখিব। বেশী উদ্ধৃতি দিবার প্রয়োজন নাই। মহর্ষি চরক বলেন—দেহের স্বাস্থ্য বা আরোগ্যই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উত্তম মূল (ধর্মার্থ-কামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্), আর রোগ হইতেছে তপস্যা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য ও আয়ুর বিঘ্নস্বরূপ। মহাকবি কালিদাস 'কুমারসম্ভবে' বলিয়াছেন—শরীরই ধর্মসাধনের আদি (শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্)। তাই, যাহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা স্বাস্থ্যের বিধিসমূহ পালন করেন, কারণ, তাঁহারা জানেন Prevention is better than cure।

আমাদের দেহ জরা-মরণের অধীন বটে কিন্তু মানুষ সাধনা ও তপশ্চর্যার দ্বারা এই দেহকে দিব্য দেহে রূপান্তরিত করিতে পারে। এই রূপান্তরই সকল ধর্ম-সাধনার লক্ষ্য। ভাবনার দ্বারা মানুষ এই জীবনেই নবজন্ম লাভ করিতে পারে। মহাপুরুষ ঈশা (Jesus) বলিয়াছেন, নবজন্ম লাভ না করিলে কেহ দিব্যধামে (স্বর্গরাজ্যে) প্রবেশ করিতে পারে না। 'Unless ye are born again, you cannot enter into the kingdom of God'। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি, শুধু তাহার দ্বারাই আমাদের দেহ গঠিত হয় না, আমরা যাহা চিন্তা করি, তাহার দ্বারাও আমাদের দেহ গঠিত হয়। চিন্তাই মানুষের কর্ম ও বাক্যের উৎস। যিনি কায়মনোবাক্যে শুদ্ধ, তাঁহার দেহ, বিশেষতঃ মুখমণ্ডল এক দিব্য ভাবে উদ্ভাসিত হইবেই। যিনি মনকে সকল দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, যাঁহার অন্তরের সকল চাঞ্চল্য, সকল কামনাবাসনা স্তব্ধ হইয়াছে, তিনি ভাগ্যবান। অথর্ববেদে বলা হইয়াছে—

'ব্রহ্মচর্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।'

ব্রহ্মচর্য ও তপস্যা দ্বারা দেবতারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মচর্য বা পবিত্রতার সাধন এবং তপস্যার দ্বারাই মানুষ দেবতা হইতে পারে। অথর্ববেদে আরও বলা হইয়াছে—যদি ভোগ তোমার জীবনের কাম্য হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মচারী হইবে। বাস্তবিক, অমিতাচারী ব্যক্তি ভোগ হইতে সুখ আহরণ করিতে পারে না, যিনি বীর্যবান, তিনিই যথার্থ ভোগী হইতে পারেন।

ব্রহ্মচর্যের সাধনা বাস্তবিক পক্ষে মনুষ্যত্বেরই সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন—গাছ যখন ছোট থাকে, তখন উহার চারিদিকে বেড়া দেওয়া দরকার, নতুবা ছাগল-গোরুতে খাইয়া ফেলিবে। যিনি ব্রহ্মচারী হইতে বা পবিত্রতার সাধনা গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহাকে সংযতবাক্, মিতাহারী, মিতাচারী হইতে হইবে, দৃষ্টিকে

বিশুদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এইজন্যই বিদ্যার্থীর প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

'অহেরিব গণাদ্ভীতো মিষ্টান্নাচ্চ বিষাদিব।
রাক্ষসীভ্য ইব স্ত্রীভ্যঃ স বিদ্যামধিগচ্ছতি।'

যে বিদ্যার্থীগণকে (জনতা বা আড্ডাকে) সর্পের মত, মিষ্টান্নকে বিষের মত ও নারীকে রাক্ষসীর মত ভয় করে, সেই বিদ্যা লাভ করে। এ ব্যবস্থা বিদ্যার্থীর জন্য, কিন্তু বিদ্যার্থিনী সম্পর্কেও একই কথা। বিদ্যার্থিনীও পুরুষকে রাক্ষসের মত ভয় করিবে। এই শ্লোকের দ্বারা ছেলে-মেয়েদের অবাধ মিশ্রণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী যৌগিক আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি অভ্যাস করিবেন। এই সমস্ত প্রক্রিয়া চিত্তসংযমের সহায়তা করে। অবশ্য এ সকল বিষয় গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচারীকে সর্বদা বলিষ্ঠ আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত রাখিতে হইবে। যখনই তাহার মন কোন কারণে বিচলিত হইবে, তখনই তিনি চিন্তা করিবেন, 'আমি মানুষ, কোনরূপ হীন কার্য আমার দ্বারা সম্ভবপর নয়।'

ব্রহ্মচারী প্রতিদিন আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মপরীক্ষা করিবেন ও দিনলিপি রাখিবেন।

তিনি প্রতিদিন ভগবানের চরণে প্রার্থনা ও তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিবেন।

আমাদের শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যিনি ব্রহ্মচারী, তিনিই দেবতা, যিনি ব্রহ্মচারিণী, তিনিই দেবী। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের দেহ ও মনে এক অসামান্য তেজের আবির্ভাব হইবে এবং উহার বলে আমরা সর্বদা আত্মরক্ষা করিতে পারিব। তান্ত্রিক সাধকগণ কুণ্ডলিনী জাগরণের কথা বলিয়াছেন। ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইবেন এবং আমাদের দেহ ও মন মহাশক্তির আধার হইবে। আমাদের চিত্তবৃত্তি তখন সহজে নিরুদ্ধ বা একাগ্র হইবে অর্থাৎ আমরা যোগী হইতে পারিব।

তন্ত্রশাস্ত্রে সত্ত্ব, রজ ও তমো গুণ অনুসারে মানুষকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে। সত্ত্বগুণীর জন্য দেবাচার, রজোগুণীর জন্য বীরাচার ও তমোগুণীর জন্য পশ্বাচারের বিধান দেওয়া হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কে যাহাদের কিছুমাত্র ধারণা আছে, তাঁহারা জানেন, 'পশ্বাচার' বলিতে পশুর আচার বুঝায় না। তন্ত্রশাস্ত্র প্রত্যেক মানুষকে অভয় দিয়াছেন, প্রতিটি মানুষকে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। তন্ত্র বলিতেছেন—প্রতিটি মানুষ ধ্যান জপ প্রভৃতির মধ্য দিয়া নবজন্ম লাভ করিতে পারে। আর এই নবজন্ম লাভ না করিলে, দেবতা না হইলে দেবতার পূজায় আমাদের অধিকার জন্মে না। মানব যখন দেবজন্ম লাভ করে, তখন তাহার স্থূল দেহের রূপান্তর ঘটে। সে তখন নূতন দেহ লাভ করে। এই নূতন দেহকেই কেহ বলেন পক্ব দেহ, কেহ বলেন সিদ্ধ দেহ, কেহ বলেন অপ্রাকৃত দেহ বা ভাগবতী তনু। এই নবজন্ম লাভের দুর্লভ অধিকার শুধু মানুষের, কারণ 'Man is made in the image of God,' আর এই জন্যই মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।'

আমাদের শাস্ত্রে নরজন্মকে দুর্লভ জন্ম ও মানুষকে অমৃতের সন্তান বলা হইয়াছে। এই দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া আমরা কি পশুর মত ভোগ-সুখে প্রমত্ত হইব? আপাত-রমণীয় হইলেও সে যে মৃত্যুর পথ, মহতী বিনষ্টির পথ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা যাহাকে শ্রেয়ের পথ বলেন, দুর্গম হইলেও সেই পথেই আমাদের যাত্রা করিতে হইবে, কারণ, উহাই বাঁচিবার পথ, সেই পথে যাত্রা করিলেই আমরা অশোক ও অভয় হইব ও অমৃতলাভের অধিকারী হইব। পাশবদ্ধ জীব আমরা তখন পাশমুক্ত শিবে পরিণত হইবে। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের Life Divine, এই অবস্থায় মানুষ ত্রিকালজ্ঞ হন, ক্রান্তদর্শী ঋষি হন। আমরা যেন এই নবজন্ম-লাভের সংকল্প গ্রহণ করি এবং সাধনায় অবিচল হই, নানা প্রতিকূল অবস্থায় আমরা যেন শ্রেয়ের পথ হইতে স্খলিত না হই, তবেই বিধাতার আশীর্বাদ বর্ষার বারিধারার ন্যায় অজস্র ধারায় আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইবে।

[পূর্বানুবৃত্তি]

কয়েক মাস কাটল। মাসীমার অসুখের খবর পেয়ে আবার কাঁচামাটি যেতে হল। মাসীমা মারা গেলেন। শেষ কাজের সব খরচ তাদের দিতে হল। গৌরদাসের হাতে টাকা ছিল না। তার এক-এক হাতে এক গাছা করে দু গাছা সোনার চুড়ি ছিল। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। আঁট হয়ে বসেছিল। একটু বড় করে, নূতন করে গড়িয়ে নেবার মত সামর্থ্য ছিল না গৌরদাসের। পরতে কষ্ট হত। তবু বাবার স্মৃতিচিহ্ন বলে হাত থেকে খুলে ফেলতে মন রাজী হয় নি। মাসীমার কাজে সেই দু গাছা চুড়ি হাত থেকে খুলে দিল। তারই টাকায় মাসীমার শেষ কাজ করা হল। আড়ম্বর হল না বটে কিন্তু নিখুঁতভাবে কাজটা হল।

একটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে আজ।

পাড়ার মেয়েরা বাগানের পুকুরে স্নান করত। সকলেই তাকে স্নেহ করত, সম্মান করত। সে যে এক-সময়ে শহরে থাকত, লেখাপড়া শিখেছিল, ভাগ্যদোষে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ে আছে, তারা শুনেছিল, বিশ্বাসও করেছিল। গৌরদাসের পাড়াতেই মামারবাড়ি ছিল। যদিও মামারবাড়ির কেউ বেঁচে ছিল না। ভিটে পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সম্পর্কে পাড়ার প্রৌঢ়া গিন্নীরা তাকে নাতবউ বলে ডাকতেন। হাসি-ঠাট্টাও করতেন—বিশেষ করে পাড়ার মোড়ল অদ্বৈতদাস বাবাজীর স্ত্রী রাঙাদিদিমা। তাঁর গায়ের রঙ খুব ফরসা ছিল বলেই তাঁর নামের আগে ওই বিশেষণটা তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা বসিয়ে দিয়েছিল। রাঙাদিদিমা তাদের দুজনকে স্নেহ করতেন। প্রায়ই খবরাখবর নিতেন। বাড়িতে কোন ভাল খাবার জিনিস জুটলে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁদেরও অবস্থা ভাল ছিল না। অদ্বৈতদাস কীর্তন গাইতেন ভাল। পাড়ার কয়েকজন লোককে নিয়ে একটি কীর্তনের দল ছিল তাঁর। মাঝে মাঝে ডাক আসত ভক্ত গৃহস্থদের বাড়ি থেকে। তাতে কিছু আয় হত। কিছু জমিজমাও ছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মন ছিল উঁচু। রাঙাদিদিমার কাছাকাছি পাড়ায় সব বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। তাঁরই চেষ্টাতে পাঠশালার ছাত্র কিছু বেড়েছিল। আয়ও কিছু বেড়েছিল।

একদিন বিকেলে পুকুরে গা ধুতে গিয়ে রাঙাদিদিমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘাটে আর কেউ ছিল না। রাঙাদিদিমা তাকে লক্ষ্য করছিলেন, সে বুঝতে পারে নি। রাঙাদিদিমা ঘাট থেকে উঠে আসবার মুখে বললেন, হ্যাঁ নাতবউ, তোর কি সন্তান-সন্ততি কিছু—

কয়েকদিন ধরে তারও মনে ওই সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে নি। লজ্জায় মুখ লাল করে জবাব দিল, কী করে জানব বলুন।

পরদিন সকালে নদী থেকে স্নান করে ফেরবার সময়ে দিদিমা খবরটা গৌরদাসকে দিয়েছিলেন।

শোবার ঘরের বারান্দায় বসে সে পুজোর আয়োজন

করছিল। গৌরদাস এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রথমে সে কারণটা বুঝতে পারে নি। মুখ তুলে বিস্ময়ের স্বরে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাপড় ছাড়বে না?

গৌরদাস গম্ভীর মুখে বলল,' ভাল করে দেখছি তোমাকে।

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে সে বলল, কখনও দেখ নি নাকি?

গৌরদাস জবাব দিল, রাস্তায় রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা হল—

লজ্জায় তার মাথাটা নেমে আসতে চাইছিল। কণ্ঠস্বরে কাঁপন লাগবার উপক্রম। তবু অবুঝের ভান করে বলল, বেশ তো, কী হয়েছে তাতে?

গৌরদাস হেসে বলল, তুমি নাকি মা হবে?

রাধা জবাব দেয় নি। একবার মুখ তুলে স্বামীর চোখে চোখ মিলিয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

সেইদিন থেকে তাদের জীবনের রূপ বদলে গেল। একসঙ্গে এতদিন পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও তাদের ওতপ্রোতভাবে মিলন ঘটে নি। অতি সূক্ষ্ম অপরিবাহী অভ্র-পাতের মত তার কৈশোরজীবন তাদের দুটি সত্তাকে বিযুক্ত করে রেখেছিল। সন্তান-সম্ভাবনা তাদের একান্তভাবে মিলিয়ে দিল।

সংসারে তার মূল্য বেড়ে গেল। গৌরদাসের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি। কাজ-কর্মে চলা-ফেরায় হাজার রকমের বিধি-নিষেধের বেড়া উঠল তার চারপাশে। পাড়ার প্রধান মেয়েরা, বিশেষ করে রাঙাদিদিমা, সকাল-সন্ধ্যায় এসে কত রকমের উপদেশ দিতে লাগলেন।

চন্দ্রা ও রতন খবর পেয়ে দেখতে এল একদিন। চন্দ্রা তখন কাঁচামাটিতে মামীমার কাছে ছিল। রতনের মনিবের কাজ চলছিল কাঁচামাটি থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে। ওখানে বনের ধারে একটা এরোড্রোম, আর সৈন্যদের ছাউনি তৈরি হচ্ছিল। রতন সেখানেই থাকত। মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যেত।

সেই কয়েকটা মাস যে কত আনন্দে কেটেছিল, স্পষ্ট মনে পড়ে রাধার। স্বামী-স্ত্রীতে কত তর্ক! স্বামী বলত, খোকা তোমার মত দেখতে হবে! অমনই ফরসা রঙ, অমনই চমৎকার মুখ, কোঁকড়া চুল। সে মুখ চোখ ঘুরিয়ে বলত, তুমি জ্যোতিষী কিনা! শুনে দেখেছ! আমি বলছি, তোমার মত দেখতে হবে। দুজনে প্রত্যেক দিন কত রাত পর্যন্ত কত আলোচনা! ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখা! খোকা বৈষ্ণব-বাড়ির ছেলেদের মত মানুষ হবে না। স্কুলে লেখাপড়া শিখবে, খুব বড়লোক হবে, তার মা-বাবাকে কত ভালবাসবে, ভক্তি করবে। লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে।

অবশেষে তাদের স্বপ্ন সত্যিই সফল হল। খোকা এল কোলে। ননীর মত কোমল, টগর ফুলের মত গায়ের রঙ; যেমন সুন্দর মুখ, তেমন সুন্দর চোখ, তেমনই সুন্দর দেহের গঠন। তাকালে চোখ ফেরানো যেত না এমন। গৌরদাসের আর আনন্দের সীমা রইল না।

রতন ও চন্দ্রা খবর পেয়ে খোকাকে দেখতে এল। দুজনে দুটি টাকা হাতে দিয়ে খোকার মুখ দেখল। রতন গৌরদাসকে ডেকে ঠাট্টা করে বলল, রাধামাধবের ভাবী সেবাইত এসে হাজির হয়েছে! চন্দ্রা খোকাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে দিল। আড়ালে খোকার হাতে একটি গিনি দিয়ে বলল, কাউকে বলিস নি দিদি। এই কমাসে কিছু কিছু করে টাকা জমিয়েছিলাম। পাড়ার একজনকে বাজারে মল্লিকদের দোকানে পাঠিয়ে একটি গিনি কিনে আনিয়েছিলাম। খোকার জন্যে দুটি দুধ-বালা গড়িয়ে দিবি। যাবার আগে খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে বলল, খোকাকে নিয়ে চললাম দিদি। তারপর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, খোকাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না দিদি। চোখ দুটি তার ছলছল করে উঠল।

খোকার অন্নপ্রাশনের সময় এসে গেল। হাতে টাকা নেই। গৌরদাস ভেবে অস্থির। সে বলল, থাকগে বাপু, কাজ নেই কিছু করে। রাধামাধবের পুজো করিয়ে শ্রীচরণের ফুল মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ো। একটু পায়স-ভোগ দিয়ে তাই একটু মুখে দিয়ো। ওতেই হবে। গৌরদাস হাঁ বা না, কিছুই বলল না। দিন কয়েক পর তেলিদের একজনকে ডেকে এনে বলল, মঙ্গলীকে কিনতে চায় লোকটি। মঙ্গলী তো দুধ-টুধ কিছু দেয় না এখন। ওকে বিক্রি করে দিই। কি বল? সে প্রবল আপত্তি জানাল, না-না, তা হবে না,

পেটে বাচ্চা রয়েছে ওর, দুদিন পরে প্রসব করবে, খোকন আমার দুধ খাবে। গৌরদাস বলল, পঞ্চাশ টাকা দাম দিতে চাইছে। বিক্রি করে কাজটা চালাই এখন। পরে আবার একটা গাই কিনলেই হবে। খোকার অন্নপ্রাশনে দু পাঁচজন লোক খাবে না, দু পাঁচজন লোক আশীর্বাদ করে যাবে না, সেটা কি ভাল হবে? সে আর আপত্তি করল না।

পঞ্চাশ টাকা নগদ হাতে তুলে দিয়ে লোকটি মঙ্গলীকে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে মঙ্গলীর কী করুণ ডাক! বার বার থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে ফিরে তাকাল। লোকটা ওর গলার দড়ি ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলে গেল। গৌরদাসের চোখ থেকে, তারও চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

অন্নপ্রাশনের দুদিন আগেই রতন ও চন্দ্রা এসে পড়ল। মঙ্গলীকে বিক্রি করা হয়েছে শুনে চন্দ্রা বলল, ছি ছিঃ দিদি! বাড়িতে কচি ছেলে। গাই আবার বিক্রি করে! আমাকে একটি বার যদি জানাতিস। গৌরদাসকে ধমকাতে লাগল, গৌরদা, কবে তোমার বুদ্ধি হবে! গাইটা বিক্রি করবার আগে একবার আমাদের বললে না?

রতন বলল, যা হবার হয়েছে, কাজটা ভাল করে করবার ব্যবস্থা করতে হবে, বুঝলে গৌরদা।

গৌরদাস মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, হবে তো বলছ, কিন্তু—

কথা শেষ করতে না দিয়ে রতন বলল, টাকা? তার জন্যে চিন্তা নেই, টাকা আমার সঙ্গেই আছে।

রতন সব ব্যবস্থা করল। পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল। রাঙাদিদিমা ও অন্যান্য প্রবীণারা একদিন আগে থেকে এসে নানা কাজে সাহায্য করলেন। অদ্বৈতদাস বাবাজী সেদিন রাধামাধবের পূজা করলেন, ভোগ দিলেন। তাঁর দল নিয়ে কীর্তন করলেন, খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন খুব ভাল ভাবেই হল। সকলের খাওয়া শেষ হতে রাত হয়ে গেল।

সকলে খোকাকে দেখল। আশীর্বাদ করল। সকলেই পঞ্চমুখে প্রশংসা করল তাদের খোকার: চমৎকার ছেলে হয়েছে! অদ্বৈতদাস বাবাজী বললেন, একজন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেছেন! শ্রীজ্ঞানদাস ঠাকুরের বংশে জন্ম তোমার ভাই! অনেক বৈষ্ণব-চূড়ামণি জন্মেছিলেন তোমাদের বংশে। জগৎকে পাপ-তাপে তাপিত দেখে করুণা-পরবশ হয়ে তাঁদেরই কেউ আবার ফিরে এসেছেন। খোকাকে কোলে নিয়ে নত মুখে বসেছিল সে। মনে মনে বলল, কেউ তোমরা চিনতে পার নি। স্বয়ং নাড়ু-গোপাল এসেছেন আমার কোলে—যাঁকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম।

সেদিন চন্দ্রা তাকে নড়তে দেয় নি। বলল, খোকনকে নিয়ে বসে থাক। আমি সব দেখছি, সারাদিন নিজে সব কাজ করল চন্দ্রা। রতনও খুব খাটল। পরের দিন ওদের যেতে দেওয়া হল না। যে কদিন চন্দ্রা ছিল এক শয্যায় রাত কাটিয়ে দিল তারা। সারারাত্রি চন্দ্রা খোকাকে বুকে জড়িয়ে রাখত।

পরদিন রতন ও চন্দ্রা চলে গেল। জীবনযাত্রা আবার অভ্যস্ত পথে চলতে লাগল। একটি কাজ শুধু কমেছিল—মঙ্গলীর সেবা। শূন্য গোয়ালটার দিকে তাকালেই বুকটা খচ করে উঠত। মঙ্গলী তখনও তাদের ভুলতে পারে নি। কোন কোন দিন সন্ধ্যার আগে এসে তাদের গোয়ালে ঢুকত। তার নূতন মালিক এসে তাকে টেনে নিয়ে যেত। গৌরদাসের পাঠশালার কাজে চাড়টা কিছু বাড়ল। নিজে হতে বাড়ে নি। খোকার জন্য খরচ বেড়েছিল, দুধ কিনতে হচ্ছিল। যুদ্ধের দরুন জিনিস-পত্রের দাম চারগুণ বেড়েছিল। অতি কষ্টে সংসার চলছিল। সে অনেকদিন ধরেই গৌরদাসকে বলছিল, জমির আয়ে চলবে না। পাঠশালাটিই ভাল করে কর। মাইনে বাড়াও। সব জিনিসের দাম এত বেড়েছে, মাইনে বাড়বে না কেন?

পাড়ার মুরুব্বীদের কাছে কথাটা পাড়ল গৌরদাস। সকলে গৌরদাসের কথার যুক্তি স্বীকার করল। মাইনে কিছুটা বাড়িয়ে দিতে রাজী হল সবাই। গৌরদাস মন দিয়ে পাঠশালার কাজ করতে লাগল।

আজকাল পাঠশালায় পড়াতে যাওয়ার সময় হত না তার। খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত সারাদিন। যখন নেহাৎ ছোট ছিল, তখন ঘুম পাড়িয়ে এসে নিজের কাজ করত। হঠাৎ খোকন কেঁদে উঠত। হাতের কাজ ফেলে ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিত। কিছুতেই কোল থেকে নামতে চাইত না খোকা। হাতের কাজ পড়ে থাকত। খোকন যখন হামাগুড়ি দিতে শিখল সর্বদা এক

চোখ তার দিকে রাখতে হত। কখন কী অনর্থ বাধিয়ে বসে এই ভয়ে। বাধিয়ে বসতও এক-একদিন। একদিন পড়ে গিয়ে হাঁটুর কাছটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। রক্ত দেখে খোকনের কী কান্না! একদিন একটা লঙ্কা মুখে দিয়ে এক চিৎকার করে কেঁদে উঠল খোকা। মুখ-চোখ লাল টকটকে হয়ে উঠল। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ালো তাকে।

গৌরদাস কাজের মধ্যেও উঠে এসে মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যেত। খোকাকে পাঠশালায় নিয়ে যেতে চাইত। সে নিষেধ করত, না বাপু, মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে. ভাল করে পড়াও। এক-একবার এসে বরং দেখে যেয়ো।

মাস কয়েক কাটল। খোকা একটু বড় হল। জুঁই ফুলের কুঁড়ির মত দুটি ছোট দাঁত বার হল। দু-একটি কথা বলতে শিখল—মা, বাবা, মাসী। কথা বুঝতেও শিখল। চাঁদনী রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে—আয় চাঁদ আয় বললেই খোকন তার ছোট ছোট হাত দুটি চাঁদের দিকে বাড়িয়ে আ—আ—বলে ডাকত। হাত ঘুরোলেই নাড়ু দেব বললেই খোকন তার ডান হাতের ছোট মুঠোটি ঘোরাতে থাকত। দাঁত দেখি তোমার বললেই—খোকন ছোট ছোট মুক্তোর মত সাদা দাঁত দুটি বার করে দেখাত। দেখে রাধার বুকে আনন্দের বান ডেকে উঠত।

খোকাকে ভাঙা-চুরো কয়েকটা আজে-বাজে জিনিস হাতের কাছে দিয়ে, উঠোনে বসিয়ে দিয়ে সে রান্না-ঘরে রান্না করত। খোকা খেলা করত। অর্থহীন কত কথা বলত খোকা। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে সে মাঝে মাঝে দেখত—কোথায় রয়েছে খোকা, কী করছে খোকা। হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে গেলে খোকা হেসে উঠত। কখনও হয়তো সে কাজে অন্যমনস্ক হয়ে উঠত; হঠাৎ মনটা চমকে উঠত—খোকা! কোন সাড়া-শব্দ নেই। কোথায় গেল খোকা! ধড়ফড় করে উঠে বাইরে গিয়ে দেখত খোকা মাটির উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত খোকাকে দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠত তার। দেখে মনে হত—যেন সে এ জগতের নয়। এত সুন্দর! এত সুকুমার! এত মায়াবী! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন-প্রাণ ভরে ওঠে। দেখে সাধ মেটে না, বুকে চেপে ধরে রেখেও হারাবার ভয় যায় না। হয়তো কোন দেবশিশু পথ ভুলে এসেছে, আবার কখন ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে।

তাড়াতাড়ি খোকাকে বুকে তুলে নিত, আঁচল দিয়ে গায়ের ধুলো মুছে দিয়ে বুকে চেপে ধরত। বুকের ভিতর নির্ভয়তা জাগত। মাকে ছেড়ে খোকা কি কখনও ফিরে যেতে পারে? স্বর্গে কি এমন মা আছে—যার বুকের রক্ত অমৃত হয়ে উঠে খোকার ক্ষুধা মেটাবে?

সংসারে অভাবের কাঁটা দিন দিন তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগল। সব জিনিসই দুর্মূল্য। চিন্তায় রাত্রে তাদের ঘুম হত না। সারারাত ছটফট করত। ভাবত, যদি ভাল ধান হয় তবেই রক্ষা। না হলে কী করে যে কী হবে—ভেবে থই পেত না তারা।

তবে চন্দ্রা মাঝে মাঝে সাহায্য করত। খোকার খরচ প্রায় তার টাকাতেই চলত।

গৌরদাসের উপর চন্দ্রার দুর্বলতা প্রায় স্পষ্ট ধরা পড়ত তার চোখে। গৌরদাসকে দেখলেই তার মুখখানি প্রভাতে উদয়াকাশের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। গৌরদাসকে সেবা করলে কৃতার্থ হয়ে যেত। আগে তার রাগ হত। আজকাল মায়া হত বরং। ভাবত—এতেই যদি শান্তি পায় তো পাক। কী ক্ষতি হবে তার! তা ছাড়া খোকাকে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার জন্য ক্ষতি হলেও সে সব ক্ষতি হাসিমুখে সহ্য করবে।

সে বৎসরের মত বর্ষা রাধা জীবনে দেখে নি। সারা শ্রাবণ ও ভাদ্র অজস্র বর্ষণ হল। পুকুর-ডোবা জলে থই থই করতে লাগল। তাদের খিড়কির দরজা পর্যন্ত জল ঠেলে এল। নারকেল গাছের গোড়াগুলো জলে ডুবে গেল, তাদের বাড়ির সামনের মাঠটা জলে ডুবে গেল—সারা মাঠটা একটা বিস্তৃত বিলের মত দেখাতে লাগল। নদীতে একটানা বান চলতে লাগল। মাঝে মাঝে দু পাশের বাঁধ ভেঙে দু পাশের জমি ভাসিয়ে দিতে লাগল। আশ্বিন মাস পর্যন্ত আকাশে মেঘের আসর ভাঙতে চাইল না। একবার নীল আকাশ দেখা যেতে না যেতেই মেঘের মসীলেপন শুরু হয়ে যেত। শরতের যে প্রখর রৌদ্র শস্যচারাদের সতেজ ও সবুজ করে তোলে, তার অভাবে ধানের চারাগুলিকে পোকায় আক্রমণ করল। কচি কচি সবুজ পাতাগুলি হলদে হয়ে উঠল। আউশ

ধানের কচি শীষগুলি ক্ষীণ বিবর্ণ হয়ে উঠল। তারা যে কৈশোর অতিক্রম করে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হয়ে শস্যকণার গর্ভধারিণী হবে—তার সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে উঠতে লাগল। চাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। গৌরদাসের মুখে চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে উঠল—এক কণাও ধান তার ঘরে বোধ হয় এবার ঢুকবে না। তার সমস্ত জমি, দেবোত্তর এক চকে পনেরো বিঘা জমি—সব নদীর ধারে। কতকগুলো জমিতে নদীর বান এসে বালির পুরু স্তর ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার ধানের চারা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাকী জমিগুলিতে মড়ক লেগে ছিল। প্রতিকার প্রার্থনা করে রাধামাধবের কাছে ভোগ দিল গৌরদাস।

সারা তল্লাটে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হল। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া। এক নাগাড়ে তিন-চারদিন প্রবল জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী চিকিৎসা হল তো রোগী বাঁচল, না হলে মৃত্যু। গ্রামে ডাক্তার ছিল না। পাঁচ-ছ মাইল দূরে একজন ডাক্তার ছিলেন—রঘুনাথ ডাক্তার। খুব নাম-ডাক, কিন্তু মোটা ফী। তাঁকে ডাকবার মত সঙ্গতি খুব কম লোকেরই ছিল। অনেকে বিনা চিকিৎসায় মরতে লাগল। গৌরদাস প্রতিষেধক হিসাবে সকলের জন্য স্নান-জলের ব্যবস্থা করল।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার আক্রমণ রোধ করা গেল না কিছুতেই। খোকার উপরেই প্রথম আক্রমণ হল। একটা থালা ও একটা গেলাস বিক্রি করে ডাক্তার ডাকা হল। খোকা সপ্তাহখানেক ভুগে সেরে উঠল। কিন্তু ভারী দুর্বল হয়ে গেল। মুখখানি সরু ও লম্বাটে হয়ে উঠল; ডাগর-ডাগর চোখ দুটি আরও ডাগর দেখাতে লাগল; মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল; মনের আনন্দ থিতিয়ে এল। যেখানে বসিয়ে রাখত, সেখানেই বসে থাকত, অথবা ঘুমিয়ে পড়ত। তার অফুরন্ত কথা ও হাসির উৎস ক্ষীণ হয়ে উঠল। তার সারা অঙ্গ হলদে হয়ে উঠল। গৌরদাসকে সে বলল, কি হবে গো!

গৌরদাস বলল, রাধামাধব যা করবেন, তাই হবে—তাঁকে ডাক। তারা নিজেরাও একে একে পড়ল। গ্রামের এক কবিরাজের কাছ থেকে এনে ওষুধ খেতে লাগল। জ্বর একবার ছাড়ল কিন্তু কিছুদিন পরে আবার ধরল। শেষে একসঙ্গে দুজনেই পড়ে গেল। মুখে জল দেবার লোক রইল না। রাঙাদিদিমা খবর পেয়ে এসে সংসারের ভার নিলেন, রাধামাধবের সেবার ব্যবস্থা করলেন। আর কবিরাজকে ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

চন্দ্রাকে খবর দেওয়া হল না। তারা নিজেরাও ভুগছিল। চন্দ্রা হয়তো নিজে আসতে না পারলেও কোন লোকের ব্যবস্থা করত। কিন্তু একজন লোক এনে খাওয়াতে তাদের ইচ্ছা ছিল না। ঘরে মাত্র মাস তিন-চার দুজন লোকের মত খাবার ছিল।

দুর্গাপূজা এসে পড়ল। আকাশ নির্মেঘ নীল হয়ে উঠল। সূর্যের আলোয় কাঁচা সোনার রঙ লাগল। বর্ষা-ধৌত পরিচ্ছন্ন প্রকৃতি সেই আলোতে ঝলমল করতে লাগল। পুকুরের উপরটা অজস্র শালুক ও পদ্মফুলে সাদা হয়ে উঠল। ঘাসে-ঢাকা পথ-ঘাট সাদা ও বেগুনে ফুলে ভরে উঠল। সামনের সারা মাঠটা বক ও মৎস্য-ভুক পাখির দল মৎস্য শিকার করে বেড়াতে লাগল। নদীতীরে কাশের বন ফুলে সাদা হয়ে উঠল। দুপুরে গোচারণের মাঠে গাছের ছায়ায় রাখাল বালকদের খেলা জমে উঠল। ঘরে ঘরে ভিক্ষুকেরা একতারা বাজিয়ে আগমনীর গান গেয়ে বেড়াতে লাগল।

দক্ষিণে সারা মাঠে পোকা লাগলেও উত্তর-মাঠের আমন ধানের গাছগুলোর বেশী ক্ষতি হয় নি। কাজেই ষোল আনা না এলেও অন্ততঃ আট আনা ফসল ঘরে আসবে—এই ভেবে চাষীদের মনে কতকটা সান্ত্বনা এসেছিল। তারা ধান-চাল বিক্রি করে পূজোর আয়োজন করতে লাগল।

কিন্তু গৌরদাসের মুখের আঁধার কাটল না। তারও। যন্ত্রের মত সে নিজের কাজ করত। রান্না করত, ঘরদোর পরিষ্কার করত, খোকার আদর-যত্ন করত। খোকা আজকাল বড় কাঁদুনে হয়েছিল। সারাদিন কোলে থাকতে চাইত। কোল থেকে নামিয়ে দিলেই কাঁদতে থাকত। খোকাকে কোলে করেই কাজ সারতে হত তাকে। গৌরদাসও নিজের কাজ যথানিয়মে ও যথাসময়ে করে যেত। কিন্তু যে আলোতে সারা গাঁয়ের মানুষের মন ঝলমল করে উঠেছিল, তার একটি ক্ষীণ রশ্মিও তাদের মনে পড়ল না। এক কণা ধানও

তাদের ঘরে উঠবে না, এ তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিল। কী করে যে তাদের সারা বছর চলবে, এই চিন্তার গাঢ় মেঘ তাদের মনের আকাশে দিবারাত্র কালো হয়ে জমেছিল। তার উপর আসন্ন পুজোর খরচ। তাদের নিজেদের কিছু হোক না হোক খোকার পোশাক না কিনে তো উপায় ছিল না। কত সাধের খোকা—ভিখারীর ছেলের মত খালি গায়ে পুজো দেখবে, ভাবলেই সারা মন ব্যথাতুর হয়ে উঠত। গৌরদাসকে জিজ্ঞাসা করল একদিন, খোকার পোশাকের কী হল? গৌরদাস জবাব দিল না। ম্লান চিন্তিত মুখে বসে রইল। গৌরদাস যখন কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না, সে কানের ফুল দুটি খুলে গৌরদাসের হাতে দিয়ে বলল, খোকার একটা পোশাক, তোমার ধুতি, আমার শাড়ি—যা যা দরকার কিনে নিয়ে এস। গৌরদাস নিতে রাজী হয় নি প্রথমে। বলেছিল, এ ছাড়া তো আর এক দানাও সোনা নেই তোমার গায়ে। তাও আমি দিই নি। তোমার বাবার দেওয়া। এ আমি নিতে পারব না। তার চেয়ে দু-চার-খানা বাসন থাকে তো দাও, তাই দিয়ে যা হয় কিনে নিয়ে আসি। সে বলেছিল, স্বামী-পুত্রের অসময়ে কাজে লাগবে, সেই জন্যেই তো মেয়েছেলের গয়না পরা। যদি কোন-দিন সুদিন আসে আবার গড়িয়ে দেবে। হেসে বলল, আর খোকা যদি আমার মানুষের মত মানুষ হয় তো কথাই নেই। বলে খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, মনের নিঃশেষ-প্রায় দ্বিধাটুকু সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলেছিল। তার মনে হল, সামান্য গয়না কেন, যদি খোকার জন্য, স্বামীর জন্য হৃদয়ের রক্ত দিতে হয়, বুকের হাড়গুলো একটি একটি করে খুলে দিতে হয়, তাতেও সে কোনদিন পিছপা হবে না।

কাঁচামাটি গাঁয়ের কাছে, বলরামপুরের বাজারে মল্লিকদের গয়নার দোকান, কাপড়ের দোকান—দুই-ই এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় দোকান। বিয়ের সময়, পুজোর সময়, চার পাশের গাঁয়ের লোক গয়না কাপড় কিনতে ওখানেই যেত। গৌরদাসও ফুল দুটি নিয়ে ওখানেই গেল। গয়নার দোকানে সে দুটি বিক্রি করে খোকার পোশাক, শাড়ি-ধুতি কিনে নিয়ে এল।

যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসের দাম তিন-চার গুণ বেড়ে গিয়েছিল। খোকার পোশাকটির দাম বেশ লেগেছিল, কিন্তু দেখে তার পছন্দ হল না। রাগ হল গৌরদাসের ওপর: ভাল মানুষ! ভাল মানুষী করলে এ সংসারে চলে! রতন হলে হয়তো এই দামে এর চেয়ে অনেক ভাল জিনিস আনত।

সপ্তমীর দিন থেকে আকাশ মেঘে ছেয়ে ফেলল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। বিকেলের দিকে আকাশ আরও কালো হয়ে উঠে চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠল। বাতাসের বেগ বাড়ল এবং সন্ধ্যার পর থেকে প্রবল ঝড় ও প্রবল বর্ষণ শুরু হল। সারা আকাশ আলকাতরার মত কালো হয়ে উঠল, অন্ধকারে দু হাত দূরের জিনিস দেখা দায় হয়ে উঠল, বৃষ্টির ছাট তীরের মত গায়ে লাগল, ঝড়ের ঝাপটায় গাছপালাগুলো মাটিতে নুয়ে পড়তে লাগল, ঘরের দেওয়ালগুলো দুলে দুলে উঠছে মনে হতে লাগল। এমন ঝড় সে জীবনে দেখে নি। যত রাত বাড়তে লাগল, ঝড়বৃষ্টির প্রাবল্যও তত বাড়তে লাগল। বাগানের কয়েকটা গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। পাড়ার আরও অনেক গাছ ভেঙে পড়তে লাগল। তাদের রান্নাঘরের চালটা উড়ে গেল, শেষে একটা দেওয়াল ভীষণ শব্দে ভেঙে পড়ল। কার ঘর ভেঙে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। নদীর একটানা গর্জন, পাখিদের আর্ত কলরব, ঝড়ের উন্মত্ত হুঙ্কার, বৃষ্টির একটানা ঝমঝম শব্দ—সব মিলে মনে হতে লাগল, তাণ্ডব নৃত্যোন্মত্ত মহাকালের চরণের আঘাতে সারা সৃষ্টি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

শোবার ঘরের এক কোণে গৌরদাস ও সে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। তার কোলে খোকা ঘুমোচ্ছিল। ঘরের কতকটা চাল থেকে খড় উড়ে গিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, ঘরের চালটা উড়ে যাবে, দেওয়াল চাপা পড়ে তাদের সবারই জীবন্ত সমাধি ঘটবে। তারা রাধামাধবকে ডাকতে লাগল।

অষ্টমীর দিন সকালে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। ঝড় ও বৃষ্টি দুই কমে এল। সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবেশীদের খবর নিতে লাগল। বড় বড় গাছ অনেক ভূমিসাৎ হয়েছিল। তাদের বাড়ির সামনে প্রাচীন বকুল গাছটা পড়ে গিয়েছিল। গ্রামের অনেক ঘর পড়ে

গিয়েছিল। তেলীদের একজন বুড়ী দেওয়াল চাপা পড়ে মরেছিল। নদীর বান প্রবল হয়ে উঠে দুকূল ছাপিয়ে দিয়ে সারা দক্ষিণ মাঠ ব্যেপে প্রবল বেগে বইতে লাগল। তেলীদের চণ্ডীমণ্ডপের টিনের চালটা উড়ে গিয়ে কতকটা দূরে একটা পুকুরে পড়েছিল। সারা গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল। বুড়োবুড়িরা বলাবলি করতে লাগল, মায়ের পূজোয় এমন বিপর্যয় জীবনে দেখি নি।

তাদের রান্নাঘরের চাল উড়ে গিয়েছিল। একদিকের সমস্ত দেওয়াল পড়ে গিয়েছিল। বাকী দেওয়ালগুলো গলে গলে রান্নাঘরের সারা মেঝে কাদায় ভরে উঠেছিল। হাঁড়ি-কুঁড়ি মেঝেতে গড়াচ্ছিল, চাল-ডাল, মসলার হাঁড়িগুলোও গড়িয়ে সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। উঠোনে জল জমে কাঠগুলো সব ভিজে গিয়েছিল। কী করে যে রান্না হবে ভেবে সে দিশেহারা হয়ে গেল। খোকা সকালে ঘুমোচ্ছিল। তাকে বেশ করে ঢাকাঢুকি দিয়ে, কোমর বেঁধে ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। গৌরদাস রুটিন মাফিক সকালে উঠল, বাগানের পুকুরে স্নান সেরে এসে রাধামাধবের পূজোর ব্যবস্থা করতে লাগল।

দুপুরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে সূর্য ঝলমল করে দেখা দিল। পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘগুলো পালিশ করা রূপোর পাতের মত ঝকঝক করতে লাগল। করাল প্রলয়ঙ্করী রূপ বর্জন করে প্রকৃতি আবার শান্ত রূপ ধারণ করল। সারা পৃথিবী শুভ্র আচ্ছাদনে সর্বাঙ্গ ঢেকে গভীর ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্না হয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। চারদিকে সর্বনাশের হাহাকারের মধ্যেও মানুষের মনে ক্ষীণ আনন্দের সুর বাজতে লাগল। সন্ধ্যার পর যখন আকাশে চাঁদ উঠল, চাঁদের আলোয় আকাশ ও পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চিক্কণ তরু-পল্লব চিকমিক করতে লাগল। তখন মনে হল যে, কল্যাণময়ী মা মানুষের ঘরে এসেছেন, তাঁরই প্রসন্ন হাসিতে সারা বিশ্ব-প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারই স্পর্শ পড়ল মানুষের মনে। তারা নিজেদের দুঃখ-দৈন্য ভুলে গেল।

বিজয়ার পরদিন এল চন্দ্রা ও রতন। খোকার জন্য বেশ ভাল পোশাক এনেছিল, তা ছাড়া নানারকম খেলনা। তার জন্য শাড়ি, গৌরদাসের জন্য ধুতি। চন্দ্রা এসেই খোকাকে কোলে তুলে নিল, তাকে নিজের হাতে পোশাক পরিয়ে দিল। খোকার মুখে হাসি দেখা গেল। গৌরদাস ও রতন কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। গৌরদাস বলল, আমারও অমন মাসী থাকলে, আমাকে অমন পোশাক পরিয়ে দিলে, আদর করলে, ঠিক অমনই হাসতাম।

চন্দ্রা মুখ-চোখ ঘুরিয়ে আবদার-ভরা কণ্ঠে বলল, অমন পোশাক এনে দিলে পরতে তুমি? চোখোচোখি চেয়ে রইল দুজনে। রতনের সঙ্গে তারও চোখোচোখি হল। রতনও যে বোঝে সব—বুঝতে দেরি হল না তার।

বিকেলে সে ও চন্দ্রা বসেছিল শোবার ঘরের বারান্দায়। উঠোনে একটা দড়ির খাটিয়ায় রতন বসে চা খাচ্ছিল। বড় বড় লোকের কাছে কাজ করে চা খাওয়ার অভ্যাস হয়েছিল রতনের। সঙ্গে করে চা-চিনি নিয়ে এসেছিল চন্দ্রা। এসেই বার করে দিয়েছিল। সে কিছুই বলে নি। চন্দ্রা তাদের অবস্থা বুঝেই কাজ করেছিল, তাতে বলবার কিছুই ছিল না। চা চন্দ্রাই তৈরি করে দিল। গৌরদাস বাড়িতে ছিল না। রাত্রে ওদের দুজনের জন্য খাওয়ার একটু বিশেষ ব্যবস্থা করবার ইচ্ছে হয়েছিল তার। জিনিস-পত্র আনতে সে-ই তাকে শহরে পাঠিয়েছিল।

রতন বলল, রান্নাঘরটা তো গেছেই। শোবার ঘরের চালের অবস্থাও সঙ্গীন। ওটার অন্ততঃ কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

তার বলতে ইচ্ছে হল, দরকার যে তা আমাদের জানা আছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা হবে কী করে? কিন্তু চুপ করে রইল। চন্দ্রা বলল, দিদি বলছে, ছোট ভাই থাকতে দাদার কী ভাবনা? সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, চন্দ্রার মিথ্যে কথা—আমি কিছুই বলি নি।

রতন বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এ এমন একটা কিছু খরচের ব্যাপার নয়। কিন্তু গৌরদা রাজী হবে কী? ও তো এক উদ্ভট মানুষ! নিজের ভাঙা-ফুটো যা আছে তাইতেই সন্তুষ্ট। কেউ ভাল করে দিতে চাইলেও শুনবে না।

চন্দ্রা ভ্রূ কুঁচকে প্রতিবাদ করল, ছোট ভাইয়ের প্রণামী দেওয়ার মত যদি দাও তো নেবে না কেন? দান করার মত দিলে নেবে না। কারও কাছে কিছু চাইবে না কখনও। ওই ওর চিরদিনের স্বভাব!

গৌরদাসের নিন্দা সহ্য হত না চন্দ্রার। সত্যিই ভালবাসত ওকে।

পরদিনই ওরা চলে গেল।

[ক্রমশ]

পাহাড়তলীর গল্প

রমেন্দ্রলাল রায়

ভুটান পাহাড়ের একেবারে পায়ের কাছে চা-বাগিচার শ্যামাস্তরণ। পশ্চিমে দিগন্ত রোধ করে দাঁড়িয়েছে খাড়া পাহাড়, ঘন বন। নাম হোলা পাহাড়। এই পাহাড়, ভুটান পাহাড়েরই একটা অংশ। দূরে দেখা যায়, বনশীর্ষে দু-একটা বস্তি। এগুলি পাহাড়ী বস্তি। একটা বস্তির নাম টোটো বস্তি। সারা ভুটানে এরা একমাত্র নগণ্য গোষ্ঠীই নয়, নিতান্তই অবহেলিত। এর পশ্চাতে ইতিহাস আছে, কাহিনী আছে, উপকথা আছে, এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক।

অন্যান্য দিনের মত ভোর-ভোর উঠে বারান্দায় এসে বসেছে ধ্রুব রায়। চা-বাগিচার মুনশী রুদ্রমানের বাড়ির বারান্দা। যে বারান্দা থেকে ইচ্ছে করলেই দু চোখের নজর চালিয়ে পুব-দক্ষিণ-পশ্চিমের বন-পাহাড় পৃথিবীটার অবাক সৌন্দর্যের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়া যায়।

সকালের রোদ ভুটান পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় রঙের হোলি ছড়িয়ে দিয়েছে। একটু একটু করে লাল-কমলা-বেগুনী-ধূসর এবং তারপরে পারার মত রঙ প্রত্যক্ষ হচ্ছে। কাঁপছে—সদ্য-সৃষ্ট তিলোত্তমা কাঁপছে! ভুটান পাহাড়ের সব অংশই দেখা যায় না। খুব কাছে বলে সামান্য অংশই প্রত্যক্ষ। নীচের পাথুরে পৃথিবী থেকে উপর চূড়া পর্যন্ত খাড়া পাহাড়। গায়ে নানা রকম ঘন গাঢ় সবুজ লাবণ্য। দূর থেকে নীলা মেঘের মত দেখায়। এখন সেখানে সকালের রোদ বিচিত্র রঙের হোলি খেলছে। ক্ষণে ক্ষণে রঙ পালটাচ্ছে। দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায় ধ্রুব রায়। এমন অবসর জীবনে আসবে ভাবতে পারে নি ধ্রুব রায়। ধীরে ধীরে রঙটা মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশের মেঘে মেঘে বিচিত্র চিত্রাঙ্কন এখন যেন থেমেছে। একটা কাঁপা কাঁপা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। তীব্র হচ্ছে সকাল। এখনই দিনযাত্রা শুরু হবে।

কাঞ্ছা (নেপালী ভৃত্য) চা-পরোটা এনে টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বলল, চিয়া খানোস (চা খান)।

অবাক হল ধ্রুব রায়। কাল থেকে কাঞ্ছাই চা খাবার দিচ্ছে। এর আগে বরাবর সীতা সমস্তই নিজের হাতে করেছে, এনে দিয়েছে, দাঁড়িয়ে থেকে খাইয়েছে। সীতা মুনশীর পুত্রবধূ। মেজো ছেলে পতিমানের বউ। শিক্ষায় বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ-মার্জিত এক চমৎকার নেপালী মেয়ে। কালিম্পঙ শহরের কনভেন্টে পড়াশুনা করেছে। কালিম্পঙ পাহাড়ের সোহাগে মমতায় রূপ আর স্বাস্থ্য হয়েছে অপরূপ।

চা সামনে নিয়ে ধ্রুব রায়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। চা খেতে একটুও ইচ্ছে নেই। সমস্ত শরীরের আগ্রহ যেন অদৃশ্য। দেহকোষে ক্ষুধাবোধের তাড়নাটা এই মুহূর্তে নেতিয়ে পড়ল। চা বোধ হয় জুড়িয়ে যাচ্ছে। কাল থেকে নিয়মের ব্যতিক্রম হচ্ছে। এখন উঠে একটু 'আপে' গেলে মন্দ হয় না। সেখানেই যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল ধ্রুব রায়। নীচু জমি থেকে ক্রমশঃ পাহাড়ী উচ্চতায় যে সমস্ত বস্তি, ওগুলোকে 'আপ' বলে এখানকার লোক।

চিয়া খানোস রয়জী!—একটা রক্তোচ্ছল কণ্ঠস্বর। টেবিলের একটা কোণে হাত রেখে সীতা আহ্বান করছে। আবার বলছে, চা খান রয়জী, প্লীজ। ধ্রুব রায় তার চোখের দিকে অপলকে চেয়ে রইল। এই মুহূর্তে যেন বউটি কেঁদেছে। চমৎকার দুটি অরণ্য-নীল চোখে কান্নার প্রহেলিকা। বেশ বোঝা যায়—এই মাত্র সে আঁচল ঘসে এসেছে। থমথমে সুন্দর মুখটিতে অশ্রুরেখার আভাস। সুন্দর নাকের বাঁশি লালচে হয়ে উঠেছে।

ধ্রুব রায় উঠে পড়েছিল, তাই একটু কৈফিয়ত তৈরি করে বলল, একটু 'আপে' যাব—মিঃ ঝা'র সঙ্গে দরকার। আর স্কুলটাও ঘুরে আসব। খেতে ইচ্ছে নেই এখন—

সীতা অস্থির হয়ে উঠল : না না বসুন, খেয়ে তবে যাবেন। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, আমি এক্ষুনি বদলে আনছি। ততক্ষণে খাবারটা খেতে থাকুন।—চায়ের পেয়ালা তুলে নিয়ে সীতা বাড়ির অন্দরে চলে গেল।

আবার বারান্দা। ফাঁকা, নির্জন, নিরালা। ইচ্ছে করলেই এখন ভাবনাটাকে যেমন তেমন ঘোরানো চলে। পরম রমণীয় কল্পনায় পাক করা চলে। কিন্তু সীতার কান্নাজর্জর চেহারাটা মনের মধ্যে সেই পুরনো বোধটাকে জাগিয়ে তুলেছে। চা-বাগিচার মুনশীর ঘরের বধূ সীতা—যে ঘরের জানলা দরজায় পর্দা। পর্দার ওপারে সীতার সংসার—একান্ত জীবন। কিন্তু সীতার ভাগ্যটা একটা স্থায়ী আক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়। সীতা বাস করে স্বামীর সঙ্গে—শ্বশুর, শাশুড়ী, জায়ের সঙ্গে। দুর্ভাগ্য সীতার। কালিম্পঙের কনভেন্টে থেকে যে মেয়ে পড়াশুনা করেছে, এমন মেয়ের ভাগ্যের চাকা ঘোরায় একজন অতি স্থূলরুচির ড্রাইভার! সীতার স্বামী পতিমান সকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নিজের ট্রাক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ভাড়া খাটায়। তারপর পুরো একপেট হাঁড়িয়া গিলে টলমল পায়ে নিশাচরের মত ঘরে ফেরে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর। হাসি, গান আর গালাগালি, আদর এবং প্রহার একই নিয়মে সে প্রয়োগ করে সীতার ওপর। রাত্রির পর রাত্রি। একটা উচ্ছৃঙ্খল প্রলাপী কণ্ঠ আর একটা চাপা কান্নার হাহা-শ্বাস রোজই শোনা যায়—দিনের পর দিন।

এক এক সময়ে ধ্রুব রায় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পতিমানটাকে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া উচিত। সীতা ও পতিমান। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে কত ব্যবধান! সাগর প্রমাণ। স্থূল ও সূক্ষ্ম। শিক্ষা ও অশিক্ষার ঘরকন্না। একটি মধুর স্বপ্নমন কালিম্পঙের সুন্দর জগৎ থেকে ছিটকে পড়েছে। অতর্কিত ভাগ্য।

কী ভাবছেন রয়জী?—একমুখ চমৎকার মধুর হাসি নিয়ে সীতা চায়ের পেয়ালা নামিয়ে দিয়ে তাকাল। সে ইতিমধ্যে মুখ ধুয়ে স্বাভাবিকরূপে এসেছে। ধ্রুব রায়ের খানিক আগের অবাক্ চাহনিটা সীতা পর্দা টেনে বন্ধ করতে চায়।

নিন, চা খান?—স্তব্ধ ধ্রুব রায়কে তাড়া দিল সীতা: চেয়ে চেয়ে কী দেখছেন, আর ভাবছেন?

ধ্রুব রায় সংক্ষেপে হেসে বলল, কিছুক্ষণ আগেই তোমার কান্না দেখেছি, এখন তোমার হাসি-পান্না দেখছি। মুখ মুছে এলেও চোখের জলের ইতিহাস কি মুছতে পারবে ভাওজী? (নেপালী ভাষায় বউদিকে ভাওজী বলে)।

দু চোখের ভ্রূতে টঙ্কার হানল সীতা, কণ্ঠে ধমক: দুষ্টুমি হচ্ছে রয়জী? না, চুপ করে শুভবয়ের মত চা খেয়ে নিন। তারপর যত খুশী কথা বলবেন। চা কিন্তু জুড়িয়ে গেলে আর আমি করে দেব না।—হাতটা চোখে-মুখে বুলিয়ে নিয়ে সীতা এসে চেয়ারের পাশে ঘনিষ্ঠ হল।

দেবে না? আচ্ছা, কাল আস নি কেন, ভাওজী?—সীতা বলে ডাকতে ইচ্ছে হলেও ধ্রুব রায় কখনও সীতা বলে ডাকে নি। একটু সম্ভ্রম, একটু দূরে থেকেই নরম সুরে ভাওজী বলেই ডেকে এসেছে আজ দু মাস ধরে। এবার কণ্ঠে সমস্ত উৎকণ্ঠা একযোগে ঠেলে উঠল: দু দিন তুমি আস নি কেন সীতা! কাঞ্ছাকে কেন পাঠিয়ে ছিলে? আজও না এলেই পারতে! আজও তো কাঞ্ছাই সব ভাল ভাবেই করতে পারত।—শিশুর মত অভিমান করল ধ্রুব রায়। আজ যেন সীতা বড় বেশী অন্তরঙ্গ। দুদিনের ভাবনায় চিন্তায় শুধু সীতাই ছিল বিষয়। ধ্রুব রায় অন্য কিছু ভাবতে পারে নি। সীতা যেন এখন একান্ত আপন। 'ভাওজী' না বলে সীতা বলে ডাকার ইচ্ছাটা উৎকণ্ঠ হয়ে উঠেছে।

কাল পরশু তোমার জন্য কত ভেবেছি সীতা!

অদ্ভুত হাসি ছড়িয়ে তাকাল সীতা: আমার জন্য ভাবনা হয় বুঝি রয়জী? আমি ভাবতাম, আমার মত একটা পাহাড়ী মেয়ে কাছে এলেই তুমি বিরক্ত হও।

ধ্রুব রায়ের শরীরে প্রথম বয়সের রক্ত ছলাৎ-ছলাৎ আরম্ভ করল। সে প্রবল প্রতিবাদ করে বলতে গেল, না-না, কী যে বল।

বলা শেষ না হতেই সীতা তেমনই মিষ্টি ধীর ভাবে বলে যেতে লাগল, তুমি কোনদিন তো আমার সঙ্গে নেহাৎ দরকারী ছোট ছোট কথা ছাড়া কথাই বল নি। ভাল করে তাকাও নি পর্যন্ত। তোমার সময় খুব দামী না?

চায়ে চুমুক দিয়ে ধ্রুব রায় বলে উঠল, তুমিই বা কটা কথা বলেছ?

সীতা হাসল: বলব কী? সব সময়ই তোমার কাজ করে যাই। জান না, মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে কথা বললেই

দোষ হয়। তোমার কথা শোনার জন্যেই তো আমি যখন তখন আসি। তুমি বুঝি রাগ কর?

হ্যাঁ রাগ করি। চোখের জল মুছে কাছে এলেই আমি রাগ করি।

কী বলছ রয়জী!—চকিত হয়ে উঠল সীতা। ছটফট করে সরে দাঁড়াল। চোখেমুখে আলতো হাত ঘষল: এই, ডাকছে! যাই এবার, নইলে বকবে। কোথাও গিয়ে কিন্তু দেরি করো না। ঠিক বারোটায় এসেই কিন্তু স্নান-খাওয়া করবে। আমি কিন্তু বসে থাকব।—সীতা সোজা প্রশ্নটার উত্তর এড়িয়ে গেল।

সীতা বসে থাকবে! ধ্রুব রায়ের জন্য একজন অন্ততঃ এই পাহাড়তলীর একটা বাংলো-বাড়ির নিভৃতে বসে ভাববে! মনে পড়ে আর এক দিনের কথা। তখন বড় লাজুক লাজুক মুখ ধ্রুব রায় এই নেপালী পরিবারটার মধ্যে বড় সংকোচে চলাফেরা করত। সীতাই তখন বলেছিল, ভাওজীর সঙ্গে ভাল করে কথা বল না কেন রয়জী? ভয়-ডর হয় নাকি? আচ্ছা বল তো, আমি কী? বাঘ ভালুক?—বড় তীক্ষ্ণ মার্জিত এ মেয়ে। গলাটাকে আরও মিষ্টি মধুর করে বলেছিল, রয়জী, তোমার বেঙ্গলের গল্প শুনতে খুব ইচ্ছে হয়। শোনাবে? বল না।—আব্দার ধরেছিল। তখন এতটা সহজ হয়ে কথা বলতে পারে নি ধ্রুব রায়।

এখন দুপুর। হোলা পাহাড়, ভুটান পাহাড়ের গায়ে পালে পালে ভেড়া চরছে। তাদের চমৎকার কাবরী কাটা শিঙে ঝিলমিল রোদ নাচছে। স্তব্ধ দুপুর সচকিত করে আকাশ-পাহাড় চক্কর দিচ্ছে বড় বড় পাখিগুলো। বিরাট বিরাট ডানায় সাঁইসাঁই ঝড়। ঘন সবুজ চা-বাগিচার সারি-সমারোহ দু ধারে, মাঝখানের সোজা দীর্ঘ বহুদূর-উধাও পীচ ঢালা পথে রোদ জলছে।

ধ্রুব রায় মন্থরগতিতে নামছিল ডাউনে। এই পাহাড়, চা-বাগিচার রূপময় দেহ যেন পাশাপাশি চলছে।

সারা গায়ে রোদের ভাপ ছুটছে। সাইকেলটা বারান্দার থামে ঠেসিয়ে ধ্রুব রায় এসে বসল।

বেলা বারোটার দুপুর। এখন স্নান-খাওয়ার পালা। ছাড়া কাপড়, গেঞ্জি পায়জামা ময়লা হয়েছিল—স্নান করার সময়ে বা যখন-তখন পরা যেত। এখন সেগুলি পাওয়া যাচ্ছে না। শেষে কলতলায় এসে দাঁড়াল ধ্রুব রায়। কলটা খুলে দিয়ে মাথা পেতে দিল। ঝরঝর জলের ফোয়ারা ঝরছে। আর তখনই একরাশ সাবান মাখা কাপড় নিয়ে এল সীতা। এক বালতি ভরতি কাপড়। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সীতা এত ঘনসান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে যে এমন ব্যবধানে কলতলার প্ল্যাটফর্মে দুজন নরনারী কাজ করতে পারে না। অন্ততঃ ধ্রুব রায় এমন অবস্থায় কখনও পড়ে নি।

নিঃসংকোচে সীতা ওইটুকু কলতলায় হাঁটুর উপরে কাপড় গুটিয়ে বেশ জুত করে বসল। জলঝাঁঝরের ফাঁকে চোখ খুলেই অবাক হয়ে গেল ধ্রুব রায়।

নিরালা নির্জন দুপুর। তিন পাশে ঝুপরি ঝুপরি চা গাছের সারি। অনেক দূর দূর পাহাড়ের একটি-দুটি চূড়া রৌদ্রের নেশায় আচ্ছন্ন। নীলা মেঘ এসে ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের গায়ে ঘন গাছের জটলা। যেন সিঁড়ির মত সাজানো গাছ-গাছালির বন। সবুজের সমারোহ। সাঁইসাঁই আওয়াজে ছায়ার গজ ফেলে ফেলে পাহাড়-পৃথিবী মাপতে মাপতে দুটি একটি প্রকাণ্ড পাখি পাহাড়চূড়ার পিছনে অদৃশ্য হচ্ছে—আবার ঘুরে ঘুরে আসছে। আকাশে পৃথিবীতে ডানায় ডানায় পরিশ্রমের বৃত্ত আঁকছে বিচিত্র অধ্যবসায়ে—নিরলস মেহনত দিয়ে। আর ধ্রুব রায়ের চিন্তাটা আধাআধি হয়ে অদৃশ্য হচ্ছে। অর্ধবৃত্তরেখার দুটি প্রান্ত পাহাড় আর পাহাড়তলীতে ঠেকছে।

দূর দূর পাহাড়ের দুটি একটি তীক্ষ্ণ চূড়া। সেখানে মেঘ-ছায়া-রৌদ্রের খেলা।

ধ্রুব রায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। ডাক দেয়, সীতা—

স্বাস্থ্যসৌন্দর্যে ভরপুর, কর্মের চাঞ্চল্যে অস্থির এক পাহাড়ী যুবতীর দেহ চকিত হয়ে ওঠে। তেরছা চোখ হেনে বলে, এখন কথা বলে না, কাজ করছি।—সীতা মাথা নীচু করে গোপন হাসি হাসে।

হুহু বাতাস চা-পাতির গন্ধ বয়ে চকিতে আসছে। ঝিরঝির গাছের পাতা ঝরছে। জমির ঘাস-ছায়া ঝিমোচ্ছে। চারিদিকে চা-বাগিচার সবুজ অন্তরাল। কোন বাধা নেই কোনখানে। ধ্রুব রায় পরিপূর্ণ চোখে দেখল সীতাকে। এমন স্বাস্থ্যসৌন্দর্যে সমৃদ্ধ নারী কখনও চোখে

পড়ে নি। ধারাজলের ফাঁকে চোখ রেখে যেন একটা স্বপ্ন-অধ্যায় পড়া হয়ে গেল। হালকা রঙের কাঁচুলি সোনারঙ বুকে একান্ত মজে গিয়েছে। অমন তীক্ষ্ণ রঙ, দেহের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য পাহাড়েই দেখা যায়।

এক এক করে কাপড় কেচে তুলছে সীতা। কাপড় কাচার তালে থরে থরে সুবিন্যস্ত যৌবন নাচছে। ধ্রুব রায়ের রক্তের দরিয়া দুলছে। ঝড় উঠবে বুঝি এখুনি। কই অতীত জীবনে এমন ঝড় তো ওঠে নি কখনও। দেহের কোষে কোষে স্নায়ুতে স্নায়ুতে টঙ্কার দিয়ে উঠছে আনন্দিত আক্ষেপ।

ধ্রুব রায় ডাকে, সীতা—

ধমকে উঠল সীতা: আবার ডাকে! সীতা নয়, বল ভাওজী।

আশ্চর্য কুহক। ঘাড় কাত করে তাকায়, ঠোঁটের হাসিটাকে টিপে টিপে শাসন করে।

নিরালা নির্জন দুপুরের অন্তরালে স্নানটা ইচ্ছে করেই বিলম্বিত করে ধ্রুব রায়। এক আশ্চর্য পাহাড়-পৃথিবীর রূপকথা অঙ্কিত হচ্ছে ধ্রুব রায়ের মনে।

কথাটা বলি-বলি করেও বলা যায় না। নেহাৎই একটা তুচ্ছ কথায় সেই অতি গভীর কথাটা ফেটে যায়। ধ্রুব রায় বলে, সীতা, আমার একটা ধুতি গেঞ্জী এই মাত্র খুঁজে পেলাম না, দেখেছ কোথাও?

খিলখিল করে হেসে উঠল সীতা। ফেনায়িত এক গুচ্ছ কাপড় তুলে ধবল নধর সুন্দর হাতে: দেখ তো চিনতে পার কি না?

হাত বাড়িয়ে ধ্রুব রায় বলল, দাও কেচে ফেলি।

কচি খুকির মত কলকলিয়ে উঠল সীতা: না না, আমি এক্ষুণি কেচে দিচ্ছি। তুমি নিয়ে গিয়ে রোদে দেবে। আর একটু স্নান কর না—আমি ততক্ষণে কেচে ফেলব। কিন্তু খুব সাবধান, কথা বলতে পাবে না।

এ এক নতুন সুর ফুটছে কণ্ঠে। চারিপাশে অপরূপ সঙ্গত। নিরালা দুপুর। একেবারে নিঃশ্বাসের সীমানায় যুবতী পর্বতকন্যা। ধ্রুব রায়ের স্নানের জল-ঝটকা সীতার গায়ে ছিটকে ছড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরের মত জমছে।

সীতা বলে, আমি তোমার কাপড় কেচে দিলাম, আমায় তুমি কী দেবে?

হেসে উঠল ধ্রুব রায়: কেন প্রহার!

আবার ধমকের আভাস জাগল লাল লাল পাতলা দুটি ঠোঁটে: ইস, কত যবর!

এগিয়ে এল ধ্রুব রায়: দেখবে?

হেসে উঠে চোখে শাসন করল সীতা: চুপ কর। বাঙালীবাবু, বড় দুষ্টু বাবু। আবার এমনি করলে, তোমার সঙ্গে কথা বলব না, এই বলে রাখছি।

সন্ধ্যা নামছে হোলা পাহাড় ভুটান পাহাড় ডিঙিয়ে এখানে এই চা-বাগিচার কোলে। চা গাছের নরম নরম পাতায় কুঁড়িতে জোনাকির মিটিমিটি আলোর হাসি। চুপ করে বসেছিল ধ্রুব রায়। একটা পুরাপুরি হিসাব একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব কিছুতেই মিলছে না। এই তো মাসখানেক আগে এসে যখন মুনশীর বাড়িতে উঠল ধ্রুব রায়, তখন দরজায় উঁকি দিয়েই হেসে উঠেছিল দুই জায়ে। সীতা আর পেমা। সমবয়সী দুই সখী। হেসে অমনই দরজা দড়াম করে বন্ধ করেই ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল ভিতরে। বিকেলের চা-খাবার এল কাঞ্ছার হাতে। রাতের খাবারও এনে দিল কাঞ্ছা।

অতঃপর শোবার সমস্যা। সীতা আর পেমা একটা হারিকেন ধরিয়ে ইতস্তত: করছিল। কাঞ্ছা ছিল না ঘরে। বোধ হয় দারু খেতে গিয়েছে। বাড়ির কর্তা ছেলে সকলেই একটু চৌরস হাঁড়িয়া টানতে গিয়েছে। ফিরতে রাত হবে।

পেমা ঠেলে দেয় সীতাকে, সীতা ঠেলে দেয় পেমাকে: যা না বাবুজীর শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আয়, আর।—ফিসফিস কথার আনন্দেই যেন বলে, আর অমনি পেতেও দিয়ে আসবি বিছানাটা।—আর তার পরেই হাসি—খিলখিল হাসি। কী কারণে হাসে তারা কে জানে!

মনে মনে রাগ হচ্ছিল ধ্রুব রায়ের। হিন্দীতে বলেছিল, দিজিয়ে বাত্তি, মেরে শোনে কো জায়গা হম দেখা। আপ লোকোন কো আনে কো কোই জরুরৎ নহি। সে কথাতেও হাসি। শেষে প্রৌঢ়া মুনশীর স্ত্রী এসে ধমকে দিতে থামে।

ধীরে ধীরে কাঞ্চার হাত থেকে খাওয়ার দায়িত্ব কেন সীতা নিজের হাতে নিল সে কারণ দুর্বোধ্য। এক মাস ধরে সময়ের গণ্ডগোল হতে পারে না। ঠিক সময়ে ধ্রুব রায়কে খেতে শুতে হয়। কতকটা লজ্জায় কতকটা স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে। দেরি'হলে এদের কষ্ট হতে পারে।

এই তো সেদিনের কথা। দুপুরে এই চা-বাগিচার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিশির জোর করে ভাত খাইয়ে দিল ধ্রুব রায়কে। তার জন্য কৈফিয়ত দিতে হয়েছিল সীতার কাছে। মিশির অর্থাৎ মিশ্র—মৈথিলী ব্রাহ্মণ। কত কথা, কত গল্প কিস্‌সা শুনিয়েছিল। এই চা-বাগিচা, গভীর অরণ্য, গম্ভীর পর্বত, উদ্দাম পাহাড়ী নদী ও মানুষগুলির জীবন সম্বন্ধে অনেক কাহিনী সে শুনিয়েছিল, আলোক দান করেছিল।

সে-ই বলেছিল ধ্রুব রায়ের কানে কানে, কেমন দেখছেন এই জায়গা? চা-বাগিচা, পাহাড়ের নেশা এখনও ধরে নি দেখছি আপনাকে। সেইজন্যই মন-মতি খুব খুশী দেখতে পাচ্ছি নে। শিকারে গিয়েছেন এর মধ্যে? যান নি? ওঃ আচ্ছা। দেখুন, আগে ঘুরে ঘুরে দেখুন। সাইকেল নিয়ে নয়, পায়ে হেঁটে যাবেন। মোরগার পয়লা ডাকে উঠে যাবেন, পাহাড়ের বুকে পা দিয়ে হাঁটবেন। ঝরণা, জঙ্গল, পাহাড়ী নদীর কিনারে একটু বসবেন। রোদ হলে বসবেন ছায়ায়। সেখানেও মানুষ দেখতে পাবেন—অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

আরও অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ হয়ে খুব ঘন গাঢ় গলায় বলেছিল মিশির, জানেন মিঃ রায়, এই পাহাড়ী মানুষগুলি বড় অদ্ভুত। এরা ভালবাসে কথা। খুব ঝটপট জওয়াব। স্পষ্ট তীক্ষ্ণ। চিন্তা করে নয়, অনর্গল যা মুখে আসে তা-ই।—গলায় আরও খানিক ঘন রহস্যের আরক মিশিয়ে ওই মিশ্রই বলেছিল, মেয়েরা আরও—

ধ্রুব রায় বলল, কী আরও!

মিশ্র বলল, ও, বুঝতে পারলেন না, বুঝিয়ে বলছি। আমি মোশায় এখানে আজ চৌদ্দ বছর আছি। নিজের চোখে দেখেছি, ঠকেছি, শিখেছি অনেক। মেয়েরা আরও ভাল। ওরা ভালবাসে মুখের কথা, গল্প-ছড়া, রসের কিস্‌সা, মজাদার কাহিনী। অল্প বয়েসী মেয়েদের জন্য কিছু গল্প মনে করে রাখবেন। আপনার কাজ দেবে। যেমন তেমন করে মশলা দিয়ে গল্প বানাবেন। আমি মোশায় এখানে চৌদ্দ বছর পার করে দিয়েছি দেশ ছেড়ে এসে। অনেক ঘুরেছি, দেখেছি জেনেছি। এই চা-কে বগিচা পাহাড় একদম নূতন জিন্দগী বনিয়ে দিয়েছে আমার। এই জায়গা ছেড়ে গিয়ে কোথাও বেশী দিন থাকতে পারি না।—মিশ্রর মুখ চোখ আর কথাগুলি বড় ধারাল কিন্তু বড় ভাল।

দু ধারে ঝুপরি ঝুপরি চা-গাছের সারি। অন্ধকারে তার মধ্যপথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ধ্রুব রায় সেই কথাই ভাবছিল।

ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হচ্ছে না। অর্ধবৃত্তের চকিত চমক কেবল। সে চমকে একটা নারীমনের অনেকগুলি বৃত্তি পাক খাচ্ছে।

কয়েক ঘণ্টা চলে গিয়েছে। খেয়ালই করতে পারে নি ধ্রুব রায়। রাতের খাবার নামিয়ে দিয়ে সীতা কখন এসে দাঁড়াল। সামনের অন্ধকারটি আরও ঘন করে যেন সীতা নিজের মুখে মেখে এসেছে। কেঁপে ওঠে ধ্রুব রায়: কী হয়েছে সীতা?

চাপা গলায় শাসিয়ে ওঠে সীতা: বাজে বকো না। আমার হবে আবার কী? দুপুরে কোথায় ছিলে? খাবার নিয়ে বসে ছিলুম। এমনি করেই কষ্ট দিতে হয়! কি, কথা বলছ না যে! উত্তর দাও।

এক অনাস্বাদিত আনন্দের বেদনায় ধ্রুব রায়ের দু চোখ ঝাপসা হয়ে পড়ে। সামনে একটি পাহাড়ী মায়া-প্রশ্নের সুমধুর বিভ্রম। বড় জীবন্ত, বড় উজ্জ্বল, বড় মমতাময়। কোন কথা না বলে আনন্দে চোখ বন্ধ করে ধ্রুব রায়।

এমনই কতদিন। একদিন বাড়ির সকলে সিনেমা দেখতে গিয়েছে। ধ্রুব রায়কে মুনশী পীড়াপীড়ি করেছিল, কিন্তু ধ্রুব রায় রাজী হয় নি সিনেমা যেতে। রাতে খেতে বসে কিছু মুখে তুলতে পারল না ধ্রুব রায়। কেমন যেন ইচ্ছা হচ্ছে না। কাঞ্চা দাঁড়িয়ে ছিল। ধ্রুব রায় বলল, অব তুম যাও। আউর কুছ নেহী চাহিয়ে।

কাঞ্চা বলল, মাফ কিজিয়ে বাবুজি, আভি যানে কো

হুকুম নেহী। মাজী গোস্‌সা হোগা। আপ খাইয়ে—পুর্‌রা পেট।

মাজী! কৌন?

আশ্চর্য, সীতা সিনেমা যাবার আগে ধ্রুব রায়কে দেখতে পায় নি। তাই এই কাঞ্ছাকে কড়া হুকুম দিয়ে গিয়েছে, বাবুজীকে সামনে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াবি। নেপালী ভীম বাহাদুর তার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ছাড়বে। পুর্‌রা পেট খেয়ে তবে উঠতে হয়েছিল ধ্রুব রায়কে।

পিঠে ঝোরা বেঁধে চা-পাতি তুলতে চলেছে সারি সারি পাহাড়ী মেয়ে। সকালের রোদ একটু একটু করে প্রখর হচ্ছে। হোলা পাহাড়, ভুটান পাহাড় ধীরে ধীরে নেশাগ্রস্ত হচ্ছে। দুপুরের আগেই রাশি রাশি চা-পাতি এসে জমবে পাতিঘরে। মাপ হবে—তারপরে মজুরী নিয়ে চলে যাবে কান্থিরা যে যার ঘরে।

এই পাহাড়ের দিন শেষ হয়ে এল। ফিরে যেতে হবে ধ্রুব রায়কে। সমস্ত দিনের ঘোরাঘুরিতে শরীর এখন অবসন্ন। সন্ধ্যা নামছে বিষণ্ণ ধোঁয়ার মত। এই চা-বাগিচা, অরণ্য পাহাড়ের পৃথিবীটা ছেড়ে যেতে হবে আবার সেই পুরাতন কর্মক্ষেত্রে। চলে যেতে হবে—চলে যেতে হবে এই করুণ হাহাকারটাই যেন আওয়াজ দিচ্ছে হাওয়ার ডানায়।

আর একটা দিন শেষ হল। আর একদিনের সকাল। চা নিয়ে এসেছে সীতা। চোখে চোখ রাখতে গিয়েই চমকে ওঠে ধ্রুব রায়। যেন রাতে ভাল করে ঘুময় নি সীতা। চোখের পরিমণ্ডলটা ক্রমশ কালিবর্ণ হতে আরম্ভ করেছে। একটা নিরক্ত ক্লান্তমুখ মেয়ে। তবু সে মুখ হাসে ধ্রুব রায়কে দেখে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সীতা আনন্দ-চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটু হাসতে পায়। মেয়েটা ক্ষণিকের জন্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

পতিমান বেশী রাতে ঘরে আসে মত্তাবস্থায়। তারপরেই শুরু হয় পৈশাচিক পীড়ন একটি সুকুমার নারীর দেহমনের উপর। প্রতিদিন তিল তিল করে একটা দানব বর্বর আনন্দে একটা নারীমনকে হত্যা করছে।

ধ্রুব রায় কী প্রতিকার করতে পারে? মনের হিংস্র সত্তাটা মাঝে মাঝেই দাঁত মেলতে চায়। সে দাঁত দিয়ে পতিমানকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছিঁড়ে ফেলতে পারে যে কোন মুহূর্তে। একটা প্রাগৈতিহাসিক দাঁত ধ্রুব রায় অতি কষ্টে চেপে রাখে।

দিনের অধিকাংশ সময় পতিমান বাড়ি থাকে না। খেতে খেতে ধ্রুব রায় ভাবে। চিন্তায় ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে গেলেই সীতা ধমকে উঠবে—খাচ্ছ না যে রয়জী? তারপরেই একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে এটা ওটা খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবে। অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলবে—আমাদের তো রান্না ভাল না। মাছ তরকারী রাঁধতে জানি না। খেতে ভাল লাগবে কেন? ধ্রুব রায় রসিকতার সুযোগটা ছাড়ে না। বলে, না গো সুন্দরী, 'বিদ্যুৎবস্ত্র ললিত বনিতা' তোমার হাতের সবকিছু আমার ভাল লাগে।

তবে খাচ্ছ না যে বড়?

তোমার কথা ভেবে মরি। শুকিয়ে যাচ্ছ কেন?

খিলখিল হাসির বাজনা বাজিয়ে সীতা বলল, তোমাকে বলেছে! আমি শুকিয়ে যাচ্ছি!—বলেই ঠোঁট উলটিয়ে এক বিচিত্র ভঙ্গি করল। তারপরেই ভ্রু টান করে অবাক হওয়ার ভান করে বলল, ওমা, তোমার নজর তো ভাল নয়। পরের ঔরতের দিকে নজর দিতে নেই তা জান।—বলেই আবার উদ্দাম হাসির তুফান তুলল। দীঘল সোনারঙ দেহের দরিয়ায় খুশীর ঢেউ যেন ছলাৎ ছলাৎ করছে। সে ঢেউয়ের মুখে মুখে হাসির চুমকি।

আর দিন চার পরেই ধ্রুব রায়কে চলে যেতে হবে। মুনশীর বাড়ির একটা দুঃসাধ্য দুর্বোধ্য জটিল জমা-খরচ কিছুতেই মেলানো যাচ্ছে না। অসাধ্য অনায়ত্ত এক নেশা। সীতা যেন একরাশ উগ্রগন্ধি পুষ্পিত বিভ্রম। দিশা হারিয়ে যায় ধ্রুব রায়ের।

সন্ধ্যা নামল সবে ধূপসৌরভের মৃদু কুজ্ঝটিকার জাল ছড়িয়ে। সমস্ত ভুটান পাহাড়ের তলার সীমানায় এক শুরু আরণ্য গাম্ভীর্য। সমস্ত দিনের কঠোর শ্রমে ধ্রুব রায়ের শরীর এখন অবসন্ন। সাইকেলটা বারান্দায় ঠেলে রেখে ধ্রুব রায় চেয়ারে বসে চোখ টিপে ধরল আঙুল দিয়ে। যেন এই পরিশ্রমের পৃথিবীর দিকে তাকালেই

আবার ডাক আসবে মেহনতের। যেন এই ঘাস জমি চা-বাগিচা, পাথর অরণ্য পাহাড় চিৎকার করে উঠবে—সকল পরিশ্রমী মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তোমারও শ্রম সংযোগ কর।

এখানে ধ্রুব রায়ের কোন আত্মীয় বান্ধবের কিংবা চেনাশোনা অন্তরঙ্গের ঘর নেই। তবু চলে যেতে হবে বলে ধ্রুব রায়ের মন এমনই কাতর হয়ে পড়ছে কেন? একটি মেয়ের জন্য সে এত বেশী চিন্তা করে! একটা বর্বর মানুষকে সে শাস্তি দিতে চায় কেন? সে কদিন পরেই চলে যাবে জেনেও সীতা কেন এমন করে ধ্রুব রায়ের দিকে ঘনিয়ে আসছে! এক বেলা খেতে না এলেই কৈফিয়ত দিতে হবে!

ধ্রুব রায় একদিন এই হেঁয়ালির ফাঁস থেকে আলগা হওয়ার জন্যই সীতাকে বলেছিল, আচ্ছা, এত যে কৈফিয়ত তলব—বলতে পার আমি তোমার কে?—কণ্ঠে বোধ হয় বেশ একটু বন্দী পাখির ছটফটানি ছিল।

পলকে কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল সীতা। মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই অদ্ভুত এক হাসি ও শাসনপ্রশ্রয়ের বিচিত্র ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। মুখটা ঘুরিয়ে ডানা ঝাপটাল সীতা: জানি নে যাও।—কিছু সময়ের ডানা কাঁপে। শান্ত উদাস ভঙ্গিতে দেহটা বারান্দার থামে এলিয়ে দিয়ে বলল, রয়জী, বলতে পার আমার জীবনটা এমন হল কেন?

হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসে রায়। গা ঝাড়া দিয়ে বসে খুব তাড়াতাড়ি বলে, দেখি দেখি, তোমার হাতটা দেখি।

সীতা হাতটা বাড়ানোর আগেই খপ করে ধরে ফেলে ধ্রুব রায়। তালুতে চোখটা বুলিয়ে চোখ বোজে। কালিম্পঙের কনভেণ্টে যে মেয়ে কৈশোর জীবন সাঙ্গ করে এল—এখানে এমন তিলতিল করে সেই সুন্দর মেয়েটির মৃত্যু হচ্ছে!

রাত অনেক হয়েছে। বিশৃঙ্খল মাতাল গলায় গান করতে করতে পতিমান আসছে। ত্রস্তে সীতা সরে গেল। ভিতরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপরেই মাতালটার দাপাদাপি শুরু হল। অস্ফুটে কাঁদছে সীতা, শুনতে পেল ধ্রুব রায়।

ধ্রুব রায়ের প্রাগৈতিহাসিক দাঁতটা হিংস্র গর্জন করে উঠল: পতিমান!

মাতালটা টলতে টলতে বেরিয়ে এল, অ্যাং, কেয়া বোলতা?

দেহটা ফুঁসছে, চোখ দুটো জ্বলছে। ধ্রুব রায় ভাবল, এই মুহূর্তে ঘুষি মেরে মাতালটার মুখ ভেঙে দেয়। কিন্তু চোখে জল, মিনতি ভরা চাহনি নিয়ে সীতা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার আবছা অন্ধকারে। না, হল না। অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত ঘষে ধ্রুব রায় হাঁকল, পতিমান, রাত অনেক হয়েছে—

মাতালটা টলতে টলতেই বলল, ইয়েস, আই নো, গুড্ মর্ণিং মিস্টার।—বলেই সীতাকে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল।

এখন একা। রাত্রি ঘন হচ্ছে। দপ-দপ জোনাকির আলো ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত চা-বাগিচায়। ঝুপরি ঝুপরি চারায়। মাতালটা কোন্ ঘুমের অতলে তলিয়ে গিয়েছে কে জানে।

একক বসে ঘরের গুহায় অতন্দ্র জাগছে ধ্রুব রায়। রাশি রাশি অন্ধকার দরজা জানলায় হাহা করছে। করুক। এক ক্ষুব্ধ কামনা অন্ধকারে অন্ধ হয়ে যাক। ঠিক তখুনই একেবারে এক ধাক্কায় দরজাটা ঠেলে ঝড়ের বেগে ধ্রুব রায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সীতা। কান্নায় বেদনায় ত্রস্ত গলায় সে বলছে, এই দেখ রয়জী, আমাকে কেমন মেরেছে।

মুখে এক বীভৎস প্রহার-কলঙ্ক। অসভ্য ড্রাইভারটা হাঁড়িয়া গিলে এসে মেরেছে। ইচ্ছে করেই হ্যারিকেনটা বাড়িয়ে দিল না ধ্রুব রায়। শুধু পরম মমতায় সীতার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, ক্রুটাল স্যাভেজারি। দেখি দেখি, আর কোথায় মেরেছে!

সীতা সোজা কোল ছেড়ে দাঁড়াল। ততক্ষণে কান্না শুরু হয়ে গিয়েছে। বলল, এই দেখ না, এই দেখ।—হাতে গলায় মুখের যত্র-তত্র ছড়ির আঘাত। কালশিরে।

পতিমানের সঙ্গে বিয়ে হওয়া থেকে এমনই অত্যাচার দিনের পর দিন হয়ে এসেছে সীতার উপর। কান্নায় আকুল গলায় সীতা ফুঁপিয়ে উঠল: দিস ইজ মাই লাইফ

দূরতর আকাশে

কুমুদ ভট্টাচার্য

দূর দৃষ্টি বারে বারে ঠেকে যায় দিক্‌চক্রবালে,
আটকায় আকাশের নীল ঊর্ধ্বে যখনই তাকাও ;
পেরিয়ে পথের বাধা সে দৃষ্টি কি যাবে কোনও কালে
শূন্যের ওপারে আরও ?—অন্বিষ্টাকে পাবে কি কোথাও ?

যদিও যন্ত্রের হাত বাড়িয়েছি আকাশের পানে,
নক্ষত্রের ভূমিখণ্ডে ফেলব পা হয়তো বা কালই,
মহাকাশ থেকে ছিঁড়ে এক একটি আঁকশির টানে
পাড়ব অনেক ফল এবং কুড়বো করতালি,—

তথাপি কী পাব শেষ ? মিটবে কি সবখানি ক্ষুধা ?
একটি বিদ্যুৎবহ্নি জাগবে কি মনের অতলে,
রহস্যের উৎসমুখ খুলে দেবে প্রাচীনা বসুধা,
আজন্ম ধ্যানের স্বর্গ ধরা দেবে বাতায়নতলে ?

তা যদি না হল, তবে কী হল, কী হল শেষতক,
আম্রের আশ্বাসহীন সেই তো কুড়নো আম্রাতক ?

—

শ্যামলীকে

সলিল মিত্র

প্রস্ফুট জীবন তব সে আমার প্রেমের গৌরব।
দূর হতে দেখিয়াছি : আজও আমি দেখিতেছি তোমা'—
তোমারে বেসেছি ভাল জীবনের নিশ্চিত সম্ভব—
আমার নিকটে তুমি তাই এক অযুক্ত উপমা !

নৈকট্যের মিতালিতে রিক্ত মন আজিও কাঙাল—
অজস্র সম্ভার নিয়ে জেগে আছে লোলুপ কামনা,
আমার এ ভীরু প্রেম চায় তব মনের নাগাল,
মন যে তোমারে চায় এ কথা কি তুমিও জান না ?

ফুটুক কুসুম হয়ে মোর স্বপ্ন ব্যাপ্ত সুরভিতে,
আমার প্রমত্ত স্বপ্ন তাই তো তোমাকে পাঠালেম :
দেউলে হৃদয় নিয়ে আমি সখি চাই না ফিরিতে,
তোমার মনের তীর্থে চুপে চুপে তাই তো এলেম।

প্রতীক্ষাজাগর মনে বেঁচে আছে আকাঙ্ক্ষার কলি,
প্রাণের বৈভব চাই : আর চাই তোমাকে শ্যামলী।

—

রয়জী। জাস্ট সী।—আজ সীতা এতদিন পরে তার বেদনাকে ব্যক্ত করল। আদিম বর্বর অসভ্য বন্য মানুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ধ্রুব রায়ের শরণ নিয়েছে।

কালিম্পঙের কনভেণ্ট থেকে শিক্ষা নিয়ে এল যে মেয়ে তারই বরাতে জুটল এক আদিম বর্বর—যে মনে মমতার জন্ম হবে না কোনদিন।

ধ্রুব রায়ের হাতটা স্বাভাবিক ভাবেই উঠে এসে সীতাকে কোলে টেনে নিয়ে তার কাঁধ ছুঁয়ে চক্রাকারে সমস্ত শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। দীঘল সুঠাম দেহটা কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে। ধ্রুব রায়ের নীরব মমতায় সীতা অভিভূত। অনেক কথা বলা হল কোন কথা না বলেই।

বাংলা ও নেপালের দুটি অল্পবয়েসী বেহিসেবী রক্তের কামনা অনেকক্ষণ থরথর করল। দুটি পাহাড়—সমতল প্রাণের মধ্য অনেক কষ্টের প্রহর পার করে দিল।

কণ্ঠে প্রাণের সমস্ত দরদ উজাড় করে দিয়ে ধ্রুব রায় বলল, আই অ্যাম সরি সীতা, ইউ আর ফর এ তার্তার।—আজকে কোন বেদনা জানাতেই দুজনের কোন বাধা নেই।

সেদিন সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি ঝরল। পাহাড়ী অঞ্চলের বৃষ্টি। বুকের উপরে নিটোল নিবিড় তৃপ্তির তন্দ্রায় স্বপ্নে আচ্ছন্ন সীতার দিকে তাকাল ধ্রুব রায়। একখানি সুকুমার দীঘল সুঠাম নারীদেহ। সোনারঙ তনু। আস্তে আস্তে কপালের সাপটানো চুল সরিয়ে দিয়ে ডাকল, ওঠ ওঠ সীতা, ভোর হয়ে এসেছে।

ঘুমে জাগরণে মাখামাখি হাসিমুখ সীতা বলল, তুমি কি আজই যাবে রয়জী ?

না, এখানেই একটা স্কুল হবে নতুন, চেষ্টা করে তাতেই কাজ নেব।—ধ্রুব রায় অর্থপূর্ণ হাসি ছড়াল : তবে তার আগে একবার কলকাতা থেকে ঘুরে আসব।

—

ঘরে-বাইরে

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

রামেন্দ্রসুন্দর

[পূর্বানুবৃত্তি]

কিছুদিন পরেই রামেন্দ্রসুন্দর পার্শিবাগান ছেড়ে দিয়ে পটলডাঙার বাড়িতে উঠে এলেন, খুব কাছেই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাড়ি। দুজনের ঘন ঘন যাতায়াত চলতে থাকে। একদিন বিকেলে সার্ আশুতোষ এসে উপস্থিত। সঙ্গে আরও দু-চারজন লোক। কে এসে দাদাকে আগেই খবর দিল যে, সার্ আশুতোষ দূরে গাড়িটা রেখে হেঁটে তাঁর বাড়ি খোঁজাখুঁজি করছেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা শীতলচন্দ্রকে বললেন, যাও তো একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে, শাস্ত্রী মশাইয়ের বাড়ি থেকে দুখানা চেয়ার শীগগির নিয়ে এস।

শীতলচন্দ্র তাড়াতাড়ি রওনা হতেই আবার তাঁকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ দেখো, যেন তাঁর কাছে আশু মুখুজ্জের নাম করো না।

পরে এর কারণ শুনেছিলাম, ওঁদের মধ্যে নাকি তেমন বনিবনাও নেই।

রামেন্দ্রসুন্দর বাড়িতে একেবারে বাংলা প্রথায় ফরাশে বসেই লেখাপড়া করতেন, তাই ভাল চেয়ারের বালাই তাঁর ছিল না। তিনি মনেপ্রাণে, শিক্ষায়-দীক্ষায় খাঁটি বাঙালী ছিলেন। বিলিতি ভাবধারাকে বাংলার মাটি বাংলার জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিজস্ব অননুকরণীয় সাবলীল ভঙ্গীতে খাঁটি স্বদেশী পাঁচন তৈরি করেছিলেন। ভাষা ছিল তাঁর অনবদ্য, দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি সহজ সরল ভাষায় বলে যাওয়াই ছিল তাঁর অপূর্ব রচনার প্রধান বিশেষত্ব। স্বাদেশিকতা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। আচারে ব্যবহারে সাহেবিয়ানার নামগন্ধ নেই, গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করেও তিনি সব কিছুর বাইরে—দামামা বাজিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় তিনি চিরপরাঙ্মুখ। জনকোলাহল মুখরিত কলিকাতা মহানগরীর নিভৃতপ্রান্তে বসে আত্মসমাহিত ভাবের মানুষ এই রামেন্দ্রসুন্দর। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে একবার এসেছেন তাঁরাই জানেন, কী এক বিরাট, ঋষিকল্প, সর্বত্যাগী মহাপুরুষ ছিলেন তিনি—যিনি অর্থের বিনিময়ে তাঁর স্বাধীন চিন্তাকে কখনও কারও কাছে বিক্রয় করেন নি। বিদ্যার গভীরতা ছিল তাঁর অসীম, অথচ বাইরে লোকজানানোর স্পৃহা নেই। তাঁর চরিত্রে, তাঁর প্রতিটি কথায়, তাঁর চালচলনে, আচার-ব্যবহারে কী বলিষ্ঠ আত্মসংযম। দীর্ঘদিন তাঁর কাছে বাস করার সৌভাগ্য হয়েছিল। অসংশয়ে বলতে পারি, একদিনের জন্যেও রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে অসুন্দরের লেশমাত্র চোখে পড়ে নি। এইখানেই রামেন্দ্র-মানসের অভিব্যক্তি আর সেই অকম্পিত চেতনালোকের প্রসাদেই রূপায়িত হয়েছে সমগ্র বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অপূর্ব কান্তি—তার অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশ। আমার বাল্য কৈশোর ও যৌবনোন্মুখ জীবনের স্মৃতির পাতা যখন উল্টে দেখি, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। হিসাবের খাতায় তাঁকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। তাঁর ভাবগম্ভীর মূর্তি, তাঁর চারিত্রিক ঐশ্বর্য, তাঁর গতি ও ভঙ্গীর ঝলক আমার জীবনে একটা গভীর রেখা টেনে দিয়েছে।

অর্থ-খ্যাতি বা পদমর্যাদার প্রলোভন তাঁর ছিল না। উপাধির বিড়ম্বনাকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন ভারতীর একনিষ্ঠ সাধক—সাহিত্য-পরিষদের সৃষ্টি পুষ্টি ও বিস্তৃতির চেষ্টা রামেন্দ্র-জীবনের সাধনার অঙ্গীভূত ছিল। মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং অবিচলিত

শ্রদ্ধা না থাকলে যে কোনও জাতিই বড় হতে পারে না, এই ছিল তাঁর জীবনের উপলব্ধি—তাঁর মজ্জাগত বিশ্বাস। তাই তিনি বাঙালীকে বীরের ভাষা দিয়ে গিয়েছেন, বীরের সঞ্জীবন-মন্ত্র শুনিয়ে গিয়েছেন। দধীচির মত আপন অস্থি, আপন প্রাণ, আপন তপস্যা দিয়ে সাহিত্য-পরিষদকে সঞ্জীবিত করে গিয়েছেন, সমস্ত অশুভকে চূর্ণ করে তিনি এক সুরলোকের প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কথায় কথায় একটু বেশী দূরে এসে পড়েছি, আবার খেই ধরতে হবে।

সার্ আশুতোষ এসে পড়েছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের দৌহিত্র নির্মল বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তিনি এসে তার পরিচয় জেনে নিয়েই পেট টিপে প্রশ্ন করলেন, কই হে, তোমার দাদু কোথায় ?

আগেই বলেছি নির্মল বেশ সাদাসিদে ধরনের ভাল ছেলে। সে ভয়ে ভক্তিতে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে তাঁকে পৌঁছে দিল। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কী একটা অনুরোধ নিয়ে তিনি নাকি এসেছিলেন।

তখুনি তাঁর জলযোগের আয়োজন করা হল। খাঁটি দেশী খাবার—ভীমনাগের সন্দেশ, বেলের সরবত, আরও কত কী! সরবত খেতেই সার্ আশুতোষের বেলের কলপ দেওয়া গোঁফজোড়া আরও ফুলে উঠল। সে এক অপরূপ দৃশ্য!

তারপর অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনার পর তিনি বিদায় নিলেন। সার্ আশুতোষকে সবাই তখন রয়াল বেঙ্গল টাইগার বলত। বজ্রকঠিন, স্বাধীন সবল চিত্তের মানুষ। রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনপীঠ ছিল যেমন সাহিত্য-পরিষৎ, সার্ আশুতোষেরও ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। সে যেন জগৎসভায় সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে—এইই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, এইই ছিল তাঁর অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা।

আমার ঠাকুরদাদার আহ্বানে তিনি লালগোলায় পারিতোষিক বিতরণী সভায় গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র—বন্ধুবর শ্যামাপ্রসাদ। অসুস্থ থাকায় রামেন্দ্রসুন্দর সেবার লালগোলায় আসতে পারেন নি।

সার্ আশুতোষ পুরস্কার বিতরণের পর সুদীর্ঘ ইংরেজিতে বক্তৃতা দিলেন। ধন্যবাদ দেবার ভার পড়ল আমার ওপর।

বাংলাতেই বলতাম, কিন্তু সার্ আশুতোষ ইংরেজিতে বললেন, তাই আমাকেও বিদেশী ভাষার আশ্রয় নিতে হল।

মনে পড়ে গেল, আজ যদি রামেন্দ্রসুন্দর আসতেন, তা হলে তিনি বাংলা ছাড়া ইংরেজিতে কখনই ভাষণ দিতেন না। এ সম্বন্ধে স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতির ভাষায় বলি—"প্রিন্সিপ্যাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালীর ধুতি চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশকরূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এইজন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তৃতীয়বার অনুরুদ্ধ হইয়া লেখেন, 'বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইসচ্যান্সেলার স্যর ডক্টর দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন।"

দেশাত্মবোধই ছিল রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্যসাধনার মূল ভিত্তি। তিনি বাংলার উপকরণেই বাংলার পূজা করতেন—বাংলার ভাবসম্পদেই বাংলা ভাষার সেবা করেছেন।

স্যাডলার কমিশন শিক্ষা বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের অভিমত জানতে চাইলে তিনি যে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছিলেন, কমিশনের রিপোর্টে আমরা তার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। তিনি লিখেছিলেন—

"Western Education has given us much, we have been great gainers ; but there has been a cost, a cost as regards culture, a cost as regards respect for self and reverence to others ; as regards the nobility and dignity of life."

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর এই স্যাডলার কমিশন রিপণ কলেজ পরিদর্শন করতে আসেন। কমিশনের কর্তা

স্যাডলার সাহেব রামেন্দ্রসুন্দরের প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে জনৈক অধ্যাপককে প্রশ্ন করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশে রামেন্দ্রসুন্দরের মত এই রকম তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন লোক নিযুক্ত না করে কতকগুলো ছেলেছোকরা নিযুক্ত করা হয়েছে কেন ?

উত্তরে শুনেছিলেন—This is the fate of our country.

প্রথম যখন বাংলার বুক চিরে দু ভাগ হয়ে গেল—সেই বঙ্গভঙ্গে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন প্রচণ্ড। তাঁর জন্মস্থান জেমো কান্দীর ঘরে ঘরে তাঁর রচিত 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' পাঠ হত। কলকাতায় আমরাও সব ভাই-বোনে তিনবার সমস্বরে বলতাম—

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।

বছরে বছরে ওই অরন্ধনের দিনে আমাদের ঘরে উনুন জ্বলত না। আমরাও তাঁর সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের দিনটি যথাসম্ভব শুচিতার সঙ্গে পালন করতাম।

সেদিন রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা সবাই মিলিত কণ্ঠে বলতাম—

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার হাওয়া বাঙলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান।
বাঙলার ঘর বাঙলার মাঠ
বাঙলার বন বাঙলার হাট
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান।
বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

তারপরেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃবন্দনার সেই শাশ্বত বাণী আমরা সকলেই উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করে যেতাম—

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্য শ্যামলাং মাতরম্‌
বন্দে মাতরম্‌।

আমাদের সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের ভাবে বিভোর উচ্ছল কণ্ঠও ধ্বনিত হয়ে উঠত। প্রত্যক্ষদর্শী যাঁরা এখনও বর্তমান আছেন—এই দৃশ্য তাঁদের আজীবন মনে থাকবে। ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না এমনই একটা আন্তরিকতার দীপ্তি তার মধ্যে জড়িয়ে ছিল।

এই দিনে রামেন্দ্রসুন্দর গরদের ধুতি চাদর পরতেন। এবম্বিধ বেশ ধারণের কারণ জানতে চাইলে তিনি আমায় বলেছিলেন, বিশেষ কারণ কিছু নেই, তবে মা ফি-বছরে পুজোর সময় গরদের ধুতি চাদর দিয়ে থাকেন—আর সেটা এই দিনে ব্যবহার করাই তো উচিত।

পাঠ্যজীবনে রামেন্দ্রসুন্দর দিনরাত অত্যধিক পরিশ্রম করার দরুন মাঝে মাঝে মাথার যন্ত্রণায় ভুগতেন। এবার সেটা প্রবলভাবে দেখা দিল। শরীর ইদানীং যেন আর চলতে চায় না, তাঁর বড় সাধের সাহিত্য-পরিষদেও যেতে পারেন না—সাময়িকভাবে অবসর নিয়েছেন। মনের অবস্থাও ভাল নয়। রিপণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত দু বেলাই রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখতে আসেন, ডাক্তারও আসেন দু বেলাই। একদিন তিনি ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন, দেখ, শরীরে খুব কষ্ট পাচ্ছি বটে, কিন্তু মনে হচ্ছে, মাথাটা যেন আরও পরিষ্কার হয়েছে। এর কারণ কী, বলতে পার ডাক্তার ?

ডাক্তার নিরুত্তর।

বিপিনবিহারী গুপ্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, অনেক কথাই মনে আসে, যদি বলে যেতে পারতাম! যখন ভাল ছিলাম, তখন আপনি প্রায়ই আমাকে নূতন কিছু লিখতে বলতেন। ভাবতাম, নূতন বলার কিছু নেই। যাও বা ছিল, একজন না একজন কেউ সে বিষয়ে বলেছেন। আজ রোগশয্যায় শুয়ে সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা নূতন আলো দেখতে পাই—ইতিহাস, দর্শন, সব কিছুরই একটা নূতন ব্যাখ্যা দিতে ইচ্ছে হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠে হতাশার সুর!

অধ্যাপক বিপিনবিহারী বললেন, আমি তো দু বেলাই আসি। বেশ তো, আর একটু সকালেই এসে হাজির হব, আবার কলেজ ফেরতা সোজা এখানেই চলে আসব। আপনি বলে যাবেন, আমি সেগুলি লিপিবদ্ধ করে রাখব।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী ভাবলেন, রামেন্দ্রসুন্দর এই রচনার মধ্যে ডুবে থাকলে হয়তো কিছুটা স্বস্তিও পাবেন আর দৈহিক যন্ত্রণাও ভুলে থাকবেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের চোখে মুখে আনন্দ।

তাই ঠিক হল। যথাসময়ে অধ্যাপক আসেন, রামেন্দ্রসুন্দর বলে যান—অধ্যাপকেরও কলম নিয়মিত চলতে থাকে।

'বিচিত্র প্রসঙ্গে'র সৃষ্টি এমনিভাবেই হয়েছে। কী অনবদ্য ভাষা আর কী অতলস্পর্শী ভাবের অভিব্যক্তি।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী অত্যধিক পান খেতেন, অন্দর থেকে হরদম পান সেজে পাঠিয়ে দিত—তিনি পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করে ফেলতেন। কলমেরও বিরতি নেই, তাম্বূল চর্বণেরও কামাই নেই। বাড়ির সবাই বিরক্ত—তার কারণ, ঠিক সময়ে নানার ওষুধ পড়ে না, পথ্য দেওয়া চলে না, এ আবার কী একটা নূতন উপসর্গ এসে জুটল! প্রায়ই দেরি হয়ে যেত বলে, বিপিনবাবুও ওখানেই স্নানাহার সেরে সটান কলেজে রওনা হতেন।

একদিন রবিবার—বিপিনবাবুর কলেজ নেই—বারে বারে স্নানাহারের তাগাদা সত্ত্বেও তিনি কলম ছেড়ে উঠতে পাচ্ছেন না, কারণ রামেন্দ্রসুন্দর সেদিন একটা গুরুতর গবেষণার কথা বলে চলেছেন। নানার পথ্যেরও অনেকটা দেরি হয়ে যাচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে অনুজ দুর্গাদাস ত্রিবেদী ছুটে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে বিপিনবিহারী বাবুকে দু হাতে তুলে নিয়েই সটান বাইরে চলে গেলেন। ধ্যানমগ্ন রামেন্দ্রসুন্দরের হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। মুখ ফিরিয়ে বালকের মত গোঁ ধরে বসলেন, সেদিন তিনি কিছুই খাবেন না। অগত্যা রামেন্দ্রসুন্দরের সামনে বিপিনবাবুর কাছে দুর্গাদাস ত্রিবেদী ক্ষমা চাইলেন। তিনিও নানাকে বুঝিয়ে বললেন, আপনারই ওষুধপথ্যের দেরি হচ্ছে বলেই আমাকে দুর্গাদাসবাবু সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ঘটনার পর অধ্যাপক বিপিনবিহারী সময়ে গেলেন—ঠিক কোন্ সময়ে তাঁকে কলম ছেড়ে উঠতে হবে। কিন্তু নানা তাঁর নিজের শরীরের প্রতি সমান নির্বিকার! এও জ্ঞান-তপস্বী রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি রূপ।

ওদিকে দেড় বছর হল একটি মেয়ে হওয়ার পরেই গিরিজামাসী কেবল ভুগছেন। অসুখ সারতে চায় না—ক্রমে বেড়েই চলেছে। মাসীমার দুই পুত্র চার কন্যা। জ্যেষ্ঠ নির্মলের কথা আগেই বলেছি। কনিষ্ঠ সুবিমল যখন হামাগুড়ি ছেড়ে টাল খেয়ে চলতে শুরু করেছে, নানা তাঁর কনিষ্ঠ জামাতা শীতলচন্দ্র রায়কে সামটায় পত্র দিলেন—"ঘোষ সাহেব হাঁটিতে শিখিয়াছে।"

সুবিমলের গায়ের রঙ কিঞ্চিৎ ময়লা। সে সময়ে যে গয়লা বাড়িতে দুধ যোগান দিত, তার গায়ের রঙটাও অনুরূপ ছিল বলেই নানা আদর করে সুবিমলের নাম রেখেছিলেন "ঘোষসাহেব"। সেই "ঘোষসাহেব" এখন পুরোদস্তুর ইঞ্জিনিয়ার—বিলেত ফেরত, তবে ঘোষ নয়—সাহেব হলেও তার চাল-চলনে ঘোষণার বালাই নেই।

গিরিজামাসীকে নিয়ে যমে-মানুষে লড়াই চলেছে। প্রত্যহই চিকিৎসক আসেন, দেখে যান, ফী নেন, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুবিধ ওষুধের প্রেসক্রিপশন করেন, কিছুতেই আর ফল হয় না। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হয়ে উঠল।

ডাক তাঁর এলে ডাক্তারের ক্ষমতা নেই যে কাউকে ধরে রাখে! রামেন্দ্রসুন্দর মাদুলি বা টোটকা-টুটকি ব্যাপারে কখনই বিশ্বাস করতেন না। এখন যেন তিনি কী রকম হয়ে গেলেন। যে যা বলেন, তাতেই তিনি সম্মতি দিয়ে যান—দৈবপ্রক্রিয়াও বাদ পড়ে নি। গিরিজামাসী যে কক্ষে রোগশয্যায় শায়িতা, সেখানে কালীপুজোও হয়ে গেল। তবু নিয়তির অলঙ্ঘনীয় বিধান রোধ করবার শক্তি মানুষের নেই।

দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। মাসীমার অবস্থা এখন-তখন।

ম্লানপাণ্ডুর আকাশ, নীচেও তার প্রতিচ্ছবি। দোতলার সংলগ্ন খোলা ছাতে খালি গায়ে বসে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত, হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট থরথর করে কেঁপে উঠছে—সেই কাঁপুনি আর থামতে চায় না। গিরিজামাসীকে দেখে ডাক্তার সামনে আসতেই কে যেন

তাঁর হাতে নির্ধারিত ফী গুঁজে দিল। তিনি সেটা নিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললেন, আমায় ক্ষমা করুন, আজ আর টাকা নিতে পারব না, ত্রিবেদীমশাই!

রামেন্দ্রসুন্দর স্তব্ধ। শূন্য আকাশের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ক্ষণকাল পরে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে একটা মর্মভাঙা স্বর বেরিয়ে এল: কোন রকমেই কি আর গিরিজাকে ধরে রাখা যায় না, ডাক্তারবাবু?

রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

ডাক্তার নীরব। উদ্গত অশ্রুবারি গোপন করবার জন্যে তিনি মুখ ফিরিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

গিরিজামাসী আর নেই।

রামেন্দ্রসুন্দরের অবস্থা বর্ণনাতীত, অন্তরের জমাট ব্যথা চোখে মুখে ফেটে পড়তে চায়! সামনে মাতৃহীন পুত্র-কন্যারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে আছে, তাদের হাহাকার যেন আর কানে শোনা যায় না! যাকে তাঁর রেখে যাবার কথা, সেই আজ তাঁকেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! এই কি বিধিলিপি! এই কি বিশ্বনিয়ন্তার খামখেয়ালী ভাঙাগড়া!

গিরিজামাসী চলে যাবার পরেই একটা গাঢ়কৃষ্ণ যবনিকা রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনে নেমে এল।

মনের এই দুঃসহ অবস্থায় তিনি আমার জননীকে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। কিন্তু চিঠিখানা যেন আমার মাকে লেখা নয়—তার মধ্যে তিনি নিজেই যেন নিজেকে বিশ্লেষণ করে সান্ত্বনা কুড়িয়ে নিতে চান। মানুষ কেন আসে, কেন যায়, আনন্দ পায় কেন, সেই মানুষই তখনি আবার দুঃখে কেন বাক্যহারা হয়ে পড়ে, কোন্ অদৃশ্য-লোকের ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়ে চলেছে—শোক তাপ আশা আনন্দ বিরহ-মিলনের এই অপূর্ব রচনা! জ্ঞান কর্ম ও বৈরাগ্য-সাধনার প্রতীক রামেন্দ্রসুন্দর, স্বভাব-গম্ভীর, চিরসংযত, প্রজ্ঞাবান রামেন্দ্রসুন্দর, 'নিয়মের রাজত্ব'-রচয়িতা রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞানময় জীবনেও জেগে উঠেছে যেন অনিয়মের এলোমেলো অসংখ্য জিজ্ঞাসা!

নানীর মুখের দিকে আর তাকানো যায় না, নানাও যেন কেমন হয়ে গেলেন, বাইরে থেকে সম্যক্ বোঝা না গেলেও ভিতরে যে ভাঙন ধরেছে তার কোনও ভুল নেই। সাধারণতঃ তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন, শোকের আঘাতে আরও যেন কথা ফুরিয়ে গেল।

গিরিজামাসীর স্বামী শীতল মেসোমশায়ের অবস্থা ততোধিক। তাঁদের বাল্যকালেই বিয়ে হয়েছিল, তখন থেকেই মাসীমার কাছছাড়া হন নি। এতদিনের বন্ধন কোন্ নিষ্ঠুর বিচারে ছিঁড়ে গেল, সে কথাই ঘরের এক কোণে বসে বসে শুধু চিন্তা করেন। একদিন রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, একনিষ্ঠ হয়ে এতদিন কাটানোর পর যদি কেউ ছেড়ে চলে যায়, মৃত্যুর পরেও কি তার সঙ্গে আবার দেখা হয়?

একটা অতি দীন শুষ্ক ম্লান হাসি তাঁর অধরে ফুটে উঠল। উদাস দৃষ্টি মেলে বললেন, ঠিক জানি না, তবে নিষ্ঠার মূল্য যদি কিছু থাকে, সংস্কারের মধ্য দিয়েই হয়তো দেখা পাওয়া যায়!

শীতলবাবু আবার প্রশ্ন করেন, তবে শুনতে পাই ব্যবহারিক জগতে যা সত্যি, পারমার্থিক জগতে তাই নাকি মিথ্যে?

স্থূলের সঙ্গে সূক্ষ্মের পার্থক্য থাকবে বইকি। আর তাই নিয়েই সত্যি-মিথ্যের মাপকাঠি তৈরি হওয়াটা বিচিত্র নয়।

এই সব বলে তিনি এমন ভাব দেখালেন যেন এ নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান না।

বিপদ কখনও একলা আসে না। কিছুদিনের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দরের জননী আমাদের পদ্মমাও মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। রামেন্দ্রসুন্দরকেও আর ধরে রাখা যাবে কিনা সেও একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপর্যুপরি দু-দুটো আঘাত সেই নির্বিকার মানুষটিকেও এবার বিকারের আওতায় এনে ফেলেছে। রোগজীর্ণ দেহে মাতৃশ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করে আবার কলকাতায় ফিরে এসেই সেই যে শয্যা গ্রহণ করলেন, আর উঠলেন না।

ব্রাইটস্ পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে, যন্ত্রণায় ঘুম হয় না। হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল রামেন্দ্রসুন্দরের গায়ে হাত বুলিয়ে মানসিক শক্তি সঞ্চালন করে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দেন, কিন্তু সে আর কতক্ষণ! ঘুম ভেঙে গেলেই আবার যে-কে সেই। এই সময় একদিন দুঃখ করে তিনি বললেন, পার্শীবাগানের বাসার রোগযন্ত্রণায় বড় কষ্ট পেয়েছিলাম, মা আমাকে

কোলে নিয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়েছিলেন, তাঁর সর্বদুঃখহারী আশীর্বাদেই আমার কষ্টের লাঘব হয়েছিল। আজ আমার মা নেই, কে আর আমাকে শান্তি দেবে!

এই কথা বলে তিনি অসহায় বালকের মত কেঁদে উঠলেন।

হয়তো কোন এক অজানা রহস্যলোকের আহ্বান তিনি শুনতে পান; তাই একদিন দুম্বাকে ডেকে বললেন, মণীন্দ্র, একবার ডি. এল. রায়ের সেই "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" গানটি আবৃত্তি করে শোনাও—

কবিতাটি মণীন্দ্রের মুখস্থই ছিল। শেষের চরণ দুটি যখন সে আবৃত্তি করছিল—

পরিহরি ভব সুখ দুখ যখন মা
শায়িত অন্তিম শয়নে—
বরিষ শ্রবণে মাতঃ তব জলকলরব
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে—

রামেন্দ্রসুন্দর শুয়ে ছিলেন, তাঁর দু চোখ বেয়ে গঙ্গা-যমুনার ধারা নেমে আসে। সকলেরই মন বিষাদাচ্ছন্ন—যেন একটা ঘন কালো মেঘ ছেয়ে এসেছে। সকলেরই চোখে মুখে আসন্ন বিচ্ছেদের করুণ ছায়া। এমনই ভাবে আরও কয়েকদিন কেটে গেল বিছানায় শুয়ে শুয়েই। একদিন শুনলেন তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। চোখ দুটি যেন জলে উঠেই নিভে গেল। তাঁর জীবন-মন্থন-করা সেই পরিষদে যাবার শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন—এও রামেন্দ্রসুন্দরের একটা মর্মান্তিক বেদনা। সেই দুঃখই তাঁর দিনগুলিকে দুর্বহ করে তুলেছিল।

ঠিক এমনই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাইট উপাধিত্যাগের সঙ্কল্প জানিয়ে বড়লাটকে যে ইংরেজী পত্র লিখেছিলেন তার বাংলা তর্জমা বসুমতী কাগজে প্রকাশিত হল। রোগশয্যায় শুয়েই রামেন্দ্রসুন্দর সংবাদপত্র পড়লেন।

স্বদেশী যুগ থেকে আরম্ভ করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভাবের আদান-প্রদান হত।

কবিগুরু সেই মনীষীর সম্বর্ধনায় স্বহস্ত-লিখিত সুদীর্ঘ অভিনন্দনপত্রে লিখেছিলেন, "সর্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য ধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমায় সাদর অভিবাদন করিতেছি।"

রবীন্দ্রনাথের উপাধিবর্জনের সংবাদ পেয়েই রোগশয্যায় শায়িত রামেন্দ্রসুন্দর তাঁকে একবার শেষ কাছে পেতে চাইলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস ত্রিবেদীকে দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলে পাঠালেন, আমি উত্থানশক্তিরহিত, একবার পায়ের ধুলো চাই, আর নাইট উপাধিত্যাগের মূল ইংরেজী পত্রখানি যেন তিনি দয়া করে সঙ্গে নিয়ে আসেন।

খবর পেয়েই কবিগুরু ছুটে এলেন তাঁর বাড়িতে। অভিন্নহৃদয় রবীন্দ্রনাথও বুঝে নিলেন কেন এই আকুল আহ্বান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কালিদাস নাগ—যিনি আজ বাংলার অন্যতম বিজ্ঞ সুধী। ডাঃ নাগের মুখেই শুনেছি, রামেন্দ্রসমীপে যাত্রার প্রাক্কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, একজন খাঁটি মানুষকে দেখে আসবে চল।

রবীন্দ্রনাথ এসে পড়েছেন। রাস্তায় ভীড় জমে গেল। একদিকে উৎসুক দর্শকের সজীব চঞ্চলতা, আর একদিকে গৃহের অভ্যন্তরে আত্মীয়স্বজনের অচঞ্চল নীরবতা। কী যেন একটা অনাগত আশঙ্কায় সকলেই ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি বিরাট হৃদয়ের মিলন-তীর্থে সবাই নীরবে চেয়ে দেখল—রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনধারা যেন সেদিন রবীন্দ্রসঙ্গমে মিশে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দর অনুরোধ করেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি স্বয়ং আপনার মুখে একবার শুনতে চাই।

তিনিও একখানি নীল কাগজে লেখা সেই পত্রটি বের করে দৃপ্তকণ্ঠে পড়ে শোনালেন। একটা গভীর পরিতৃপ্তি ফুটে উঠল ত্রিবেদীতাপসের মুখে। শারীরিক অসুস্থতার তীব্রতা তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। সেদিন তাঁকে দেখে কে বলবে, তিনি বহুদিন যাবৎ এমন কঠিন অসুখে ভুগছেন! দেহে যেন কোথাও এতটুকু গ্লানি, এতটুকু জ্বালা, এতটুকু যন্ত্রণা নেই। দুজনের মধ্যে অনেক কিছু আলোচনা চলতে থাকে। রামেন্দ্রসুন্দরের সর্বাঙ্গে উৎসাহের আবেগ। নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের শিখা বুঝি এমনই করেই জলে ওঠে।

কম্পিতস্বরে রামেন্দ্রসুন্দর বলেন, আমি আর উঠতে পারি না, দয়া করে আপনার পদধূলি আমার মাথায় দিন।

পায়ের ধুলো দিতে গেলে পা তুলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ

চিত্রতারকার মত লাবণ্য —

কত সহজেই আপনার হতে পারে!

কিছুতেই রাজী নন। নানা কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করেন, আমার শেষ ভিক্ষা, দয়া করে প্রার্থনা পূরণ করুন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তিম ইচ্ছা কি উপেক্ষা করতে পারেন?

কবিগুরু বিদায় নিলেন। এদিকে রামেন্দ্রসুন্দরও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সে তন্দ্রা আর ভাঙল না। যাঁর সব কিছুই সুন্দরের প্রকাশ, তাঁর মৃত্যুতেও সুন্দরের সাহচর্যে সেই চিরসুন্দরের দেখা এমন সুন্দরভাবে তিনি পেয়ে গেলেন। সেই স্বদেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁর শেষ নিঃশ্বাস কোন এক নিস্তরঙ্গ জ্যোতির্লোকে বিলীন হয়ে গেল। অর্ধশতাব্দীর গৌরবময় ইতিহাস স্তম্ভিত হয়ে সেই চলমান জীবনের মহাপ্রস্থানের পথে শূন্যপ্রেক্ষণে চেয়ে রইল।

যুগে যুগে মহামানব আসে আবার চলে যায়। তিনিও এসেছিলেন আমাদের মধ্যে, দিয়ে গিয়েছেন তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতি আর সাধনার আলো, রেখে গিয়েছেন তারই পরিচয় তাঁর অতলগভীর অপূর্ব রচনাবলীর মধ্যে। স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তিকে রূপ দেবার জন্যে বুকের রক্তে প্রতিষ্ঠিত করেছেন—বাঙালীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি কখনও লেখা হয়, রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন-কথা তার মধ্যে একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হয়ে থাকবে। সৃষ্টিই কষ্টিপাথর, জনপ্রিয়তার হঠাৎ ফিকে জৌলুস নয়। অবাক হয়ে ভাবি, নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখা এই রামেন্দ্রসুন্দরকে! তিনি কোন্ জগৎ থেকে এসেছিলেন, আবার কোন্ জগতেই বা চলে গেলেন! কী বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর অন্তরে আর কী সুমহান আদর্শ ছিল তাঁর সম্মুখে! আজ বাঙালী ও বাংলাকে চিনতে গেলে, জানতে হবে রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনালব্ধ এই সুন্দর জীবনটিকেও।

কে সেই—যিনি এই মহাজীবনকে পৃথিবীর জীবনে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর পথটুকু এমন সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন! সেই অদৃশ্য মহাশক্তিকে নমস্কার!

আজ শুধু অন্তর্জগতে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রেমতর্পণ করলেই আমাদের কর্তব্য ফুরিয়ে যাবে না, বহির্জগতেও তার নিদর্শন চাই, তাঁকে উপযুক্ত অর্ঘ্য দেবার আসন আমাদের গড়ে তুলতে হবে। আমি শুধু ব্যষ্টির কথা বলি না, সমগ্র জাতি সমষ্টিগত ভাবে সেই ভগবানের চিহ্নিত মানুষটিকে প্রত্যক্ষ পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করুক তবেই তাঁর কাছে আমাদের জাতীয় ঋণ যদি কিছুটা পরিশোধ হয়। ব্যক্তিগত ভাবে, আমার পিতামহ—মহারাজা স্যর্ যোগীন্দ্রনারায়ণ রামেন্দ্রসুন্দরের জন্মভূমিতে তাঁরই নামে হিন্দু ও মুসলমানের জন্যে দুটি পৃথক পান্থনিবাস ও তৃষ্ণার্ত নরনারীর জন্যে রামেন্দ্রসরোবর করে দিয়েছেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাংলার বহু খ্যাতনামা সাহিত্যানুরাগীই সেদিন উপস্থিত ছিলেন। আজ বাংলার মনীষী এবং সাহিত্য ও শিক্ষাব্রতীদের কাছে আমার এই একটি প্রশ্ন, সমষ্টিগত ভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার উপযুক্ত পন্থা কি আমরা আজও খুঁজে পাই নি? বাঙালীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান বিস্তারের রাজ্যে যাঁর এতখানি দান, চিন্তাশক্তির পরিশুদ্ধ আলোয় চেতনাশীল জাতির চিত্তে সেই রামেন্দ্রসুন্দরের উপযুক্ত স্মারক প্রতিষ্ঠায় একটা অনির্বাণ আবিকম্পিত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠুক—নব-জাগ্রত জাতির চক্ষে সেই আনন্দ-সুন্দর জীবনের মর্মকথা পাঠ করে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হই, এই আমার সর্বশেষ নিবেদন।

* * *

স্মৃতি বড় মধুর, স্মৃতি বড়ই পীড়াদায়ক!

আমার বাল্য ও কৈশোরের দিনে তুমি এসে দাঁড়িয়েছিলে! তোমার নিষ্কলুষ ভাবধারা, তোমার তেজোদ্দীপ্ত মূর্তি, তোমার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমার জীবনকে সঞ্জীবিত করেছে, পরিপ্রকাশের দিকে এগিয়ে দিয়েছে; জানিয়ে দিয়েছে, জীবন কত উচ্চ, কত সুন্দর, কত মহীয়ান! সেই জীবনের অধিপতি তুমি, হে রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার সুন্দর ছোঁয়া পেয়ে খুঁজে পেয়েছি এমন একটা কিছু—ভাষা যেখানে মূক, হৃদয় যেখানে পরি-পূর্ণ আনন্দে স্তব্ধ। যা শুধু অতীন্দ্রিয় জগতেই বোঝা যায়, অথচ ধরা যায় না। এই দৃশ্যজগতে তুমি আজ আমার কাছে নেই, তবু তুমি আছ—আমার সর্বাঙ্গীন অনুভূতির গভীরে তুমি মুখর হয়ে আছ। আমার তন্দ্রায় জাগরণে, আমার স্পন্দিত কল্পলোকে, আমার ধ্যানের ধারণায়, আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে—চেতনার উত্তরণতীর্থে সেই আলোকতীর্থে প্রতিষ্ঠা করেছি তোমার রত্নসিংহাসন। দুজনের মধ্যে আজ মরণসিন্ধু কল্লোল করে চলেছে। এই দুস্তর ব্যবধানের এপারে দাঁড়িয়ে আমি দীর্ঘশ্বাসের সেতুবন্ধ রচনা করেছি—তার ওপর দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছে দিলাম তোমারই কথা। তুমি সেই জ্যোতির্লোক হতে আমায় আশীর্বাদ কর।

॥ সমাপ্ত ॥

চিতোর তীর্থে

শ্রীহৃষিকেশ দেব

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটে নি, রাত্রি-শেষের অন্ধকার যেন ঘন কুয়াশার বোরখায় মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। ওভারকোট জড়িয়ে তিন বন্ধু গাড়ি থেকে নামলুম চিতোর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। শেষ অগ্রহায়ণের হৈমন্তিক রাজস্থানী হাওয়া আমাদের সারা শরীরে বুলিয়ে দিল শীতল স্পর্শ।

চোখের পাতায় এখনও ঘুমের আমেজ লেগে আছে। বাকী রাতটুকুর আশ্রয়ের জন্যে উচ্চতর শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামশালায় প্রবেশ করলুম। অসমাপ্ত নিদ্রা পূর্ণ করার আশায় বন্ধুরা আরাম-কেদারায় শরীর বিছিয়ে দিলেন। আমি চায়ের যোগাড় করলুম রিফ্রেসমেণ্ট-রুমে। ইতিপূর্বে চিতোর স্টেশনটি অত্যন্ত উপেক্ষিত ছিল। ভারত-সরকারের সাম্প্রতিক 'টুরিস্ট' পরিকল্পনার দৌলতে বর্তমানে পুনর্নির্মিত হয়েছে, এবং ভ্রমণ-বিলাসীদের অন্যান্য সুখ-সুবিধার সঙ্গে রিফ্রেসমেণ্ট ও রিটায়ারিং-রুমেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকজন সৌভাগ্যবান যাত্রী নাকি ইতিপূর্বেই রিটায়ারিং-রুমটি দখল করে নিয়েছেন শুনলুম।

পানীয় সমাপ্ত করে বাইরে এসে দাঁড়ালুম। অন্ধকার তখন ফিকে হয়ে আসছে। পূবের আকাশে চলেছে বর্ণাঢ্য প্রলেপের দ্রুত পট-পরিবর্তন। মনে হয়, কোন এক পাগল শিল্পী তার অফুরন্ত রঙের ভাণ্ডার উজাড় করে দিচ্ছে বৈচিত্র্যের পর বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে। কুয়াশা ভেদ করে সূর্যের আলো আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে নজরে পড়ে, আরাবল্লী গিরিমালার নীলাভ আভাস। চিতোর দুর্গের বিস্তৃত প্রাচীরও ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পাহাড়ের উপরে।

সারা ভারত জুড়ে ঘুমিয়ে আছে এমনই কত দুর্গ, কেল্লা, আর তাদের ধ্বংসস্তূপ অপরূপ সব কাহিনীর মায়া জড়িয়ে। নবরাজগৃহে পাষাণ-প্রাচীরের ছায়ায় দেখেছি পিতৃদ্রোহী বুদ্ধদ্বেষী নৃপতির রূপান্তর বুদ্ধভক্ত অজাতশত্রুতে। আগ্রাদুর্গের বৈভব আর বিলাসচিহ্নের মাঝখানেও প্রাসাদ-অলিন্দে ভেসে বেড়ায় ক্ষমতাচ্যুত বন্দী বৃদ্ধ শাজাহানের দীর্ঘশ্বাস। গোয়ালিয়র দুর্গে ঝাঁসীর রাণীর অস্ত্র-ঝংকার আর মৃগনয়নার প্রেমকাহিনীকে ছাপিয়ে ওঠে গর্ভগৃহ থেকে বন্দী মুরাদের আর্তনাদ। লালকেল্লার প্রাচীরে পাঠ করেছি মোগল-মহিমার সমাধি-ইতিহাস। রূপমতী আর বাজবাহাদুরের মরণ-জয়ী প্রেম অনুভব করেছি মাণ্ডুর ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু মেবারের রাজধানী চিতোরের গৌরব বুঝি সবাইকে ছাপিয়ে, সবার চেয়ে পৃথক্, আপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। স্ব-মহিমা-ভাস্বর সমুন্নত শির ওই চিতোরগড়—তাই মৃত অতীতের জাদুঘর নয়, পবিত্র তীর্থভূমি।

আপন ধমনীতে সূর্যবংশোদ্ভব রামচন্দ্রের পবিত্র শোণিতের দাবি করেন বাপ্পাদিত্যের বংশধর চিতোরের রাজকুল। ইতিহাস কিন্তু বলে, রাজপুতের ন্যায় মিশ্ররক্ত জাতি নাকি ভারতে দুর্লভ। অস্ত্রহাতে মধ্য-এশিয়ার শক-হূনদের যে বিপুল স্রোত উন্মাদ কলরবে একদা এ দেশে প্রবেশ করেছিল, এবং লুণ্ঠনের প্রথম উন্মাদনার অবসানে ভারতেরই সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে একীভূত হয়েছিল, রাজপুতরা তাদেরই সন্তান। অস্ত্রবলে নিজেদের জন্যে তাঁরা ক্রয় করে নিয়েছিলেন সূর্য-বংশ চন্দ্র-বংশের গৌরবময় ক্ষাত্র-ঐতিহ্য। কিন্তু তারপর স্বোপার্জিত সে গৌরবকে দীর্ঘদিন আপন রক্তের বিনিময়ে করেছেন মহিমান্বিত, প্রাণদানে নিজ অধিকারকে করেছেন দৃঢ়। শিবাজীর সৃষ্ট মহারাষ্ট্রশক্তির চাতুর্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা তাঁদের ছিল না, তাই ভারত-ইতিহাসের পাতায় বীরত্বের আর মহত্বের অপরূপ কাহিনীর মালা গাঁথলেও সুপরিণত রাষ্ট্র-গঠনের স্মরণীয় কোন স্বাক্ষর রাজপুতরা রেখে যেতে পারেন নি। তাঁদের ইতিহাস তাই এক একটি দলের, সমস্ত জাতির নয়। মারাঠার আছে সম্মিলিত পরিচয়, আছে রাষ্ট্রগঠনের প্রচেষ্টা।

কিন্তু যে প্রেরণায় শিবাজী সমস্ত জাতিকে এক করতে চেয়েছিলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতে সে সাধনাও ব্যর্থ

হয়ে গেল। অবশেষে একদিন আপন ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ মহারাষ্ট্রশক্তি পশ্চিমঘাটের রুক্ষ পর্বতমালা থেকে বাংলার সমতল পর্যন্ত ভারতের বুকে শুধু একটা অভিশাপের মতই ছড়িয়ে পড়েছিল। অত্যাচার লুণ্ঠন আর হাহাকারের বন্যা বয়ে গিয়েছে সেদিন তাদের অশ্বক্ষুরচিহ্নিত পথে। তারপর আত্মঘাতী সংগ্রামের শেষে তারাও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ইতিহাসের পাতা থেকে। চিতোরের স্বাতন্ত্র্যও একদা লোপ পেয়েছিল মোগলশক্তির দুর্বার গতিমুখে, কিন্তু মহারাষ্ট্রের কলঙ্ক কখনও তাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবি থেকে তার অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণ পর্যন্ত সকলেরই হৃদয়ে তাই চিতোরের আসন অনন্য। রাজপুতের আত্মত্যাগের জ্বলন্ত কাহিনী মরুভূমি, অরণ্য, জনপদের ভৌগোলিক ব্যবধান তুচ্ছ করে বাঙালীর ভাবপ্রবণ মনে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার সাক্ষ্য বহন করছে আজিও চিঠিপত্রের উপরে 'সাড়ে চুয়াত্তর' লেখার প্রথা। আকবরের চিতোর বিজয়ের পর নিহত রাজপুতদের যজ্ঞোপবীতের ওজন হয়েছিল সাড়ে চুয়াত্তর মণ। চিঠির উপর সাড়ে চুয়াত্তর চিহ্ন উপেক্ষা করে অনধিকারী সে চিঠি পাঠ করলে চিতোরের রাজপুতহত্যার পাপের জন্তে দায়ী হবেন, এই হচ্ছে ইঙ্গিত।

কী করে বাঙালী নিজেকে চিতোরের পরম আত্মীয় করে তুলেছিল, হয়েছিল তার গৌরবের অংশভাগী, তা হয়তো বিস্ময় সৃষ্টি করে বহু অবাঙালীর মনে, হয়তো বা তাদের ঠোঁটে বিদ্রূপের কুঞ্চন জাগাও আশ্চর্য নয়। বাঙালীর যোদ্ধৃপ্রবণতার প্রশংসা তাঁরা করেন নি। রঘুর দিগ্বিজয়ী বাহিনীর সম্মুখে বাঙালীর আচরণকে কালিদাসও ব্যঙ্গ করে বলেছেন 'বেতসী বৃত্তি'। বন্যার প্রবল জলস্রোতকে বেতগাছ বাধা দেয় না, মাথা নীচু করে মেনে নেয়। জল সরে গেলেই আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়।

ইতিমধ্যে আলো প্রবেশ করেছে ওয়েটিং-রুমের ভিতরে। "ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম"—বন্ধুরাও এসে দাঁড়ালেন প্ল্যাটফর্মের উপরে। দূরদিগন্তের পটভূমিকায় সমতল থেকে পাঁচ শো ফুট উপরে চিতোরের দুর্গ-প্রাচীর এবার পরিষ্কার হয়ে উঠেছে :

ঐ তার গিরিদুর্গে অবরুদ্ধ নিরর্থ ভ্রূকুটি,
ঐ তার জয়স্তম্ভ তোলে ক্রুদ্ধ মুঠি
বিরুদ্ধ ভাগ্যের পানে।
মৃত্যুতে করেছে গ্রাস তবুও যে মরিতে না জানে,
ভোগ করে অসম্মান অকালের হাতে
দিনে রাতে।...

কিংবদন্তী বলে, পাণ্ডবদের তৈরি এই দুর্গ, যার প্রাচীন নাম ছিল চিত্রকূট। ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বল্লভী রাজবংশের রাজ্যহারা সন্তান বাপ্পা মৌর্য-রাজপুত রাজা মানসিংহকে পরাজিত করে চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভগবান একলিংগ মহাদেবের করুণায় রাখাল-বালক বাপ্পা পেলেন সিংহাসন। রাজ্য-ঐশ্বর্য-সম্পদও তাই রানার নয়, একলিংগজীর। রানা শুধু তাঁর প্রতিনিধি মাত্র—"একলিংগজীকি দেওয়ান।"

টাঙ্গাওয়ালারা এসে চারপাশে ভীড় জমাতে শুরু করেছে চিতোরগড় দেখাতে নিয়ে যাবার বাসনায়। অতএব তাড়াতাড়ি স্নান সারা হল ওয়েটিং-রুমের ঠাণ্ডা জলেই। খুব তাজা মনে হচ্ছিল নিজেদের।

কলকাতায় আত্মীয়-বন্ধু অনেকেই যাত্রারম্ভে সাবধানবাণী শুনিয়েছিলেন বহুবার। নভেম্বরে রাজস্থান? শীতের কাপড় কী নিচ্ছি? আরও অনেক কিছু। তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিল, বুঝি বা আমরা মেরু অঞ্চলেই অভিযান করছি।

কথাটা সত্যি। নভেম্বরের যে কদিন আমরা রাজস্থানে ছিলুম, শীতের আতিশয্য কোথাও অনুভব করি নি, এবং শীত-বস্ত্রও তাই অনেকাংশেই অব্যবহৃত ছিল। আরামের প্রয়োজনে গরম জল ব্যবহার করা ছাড়া ঠাণ্ডা জলেই স্নানাদি সম্পন্ন করেছি অধিকাংশ সময়ে।

ঘণ্টাখানেক পর আমাদের নিয়ে টাঙ্গা ছুটে চলল পিচ-বাঁধানো রাস্তা দিয়ে। দু ধারে অনুর্বর রুক্ষ প্রান্তর। দ্রুত নিঃশেষিত কুয়াশার ভেতর দিয়ে আসছে নরম রোদের মিঠে আমেজ। ঘোড়ার গলার ঘণ্টার সঙ্গে তার জোর কদমের আওয়াজ মিলে একটা সুরময় আবেশের সৃষ্টি করছে। এগিয়ে চলার ছন্দে আমরাও দুলে দুলে উঠছি।

একদল রাজপুতানী কিশোরী দুধের কলসী মাথায়

নিয়ে শোভাযাত্রা করে চলেছে গান গেয়ে কোন দূর গাঁয়ের উদ্দেশে। প্রভাতসূর্যের আলো পেতলের উপরে ঝলসে উঠছে—যেন স্বর্ণচূড় মুকুট মাথায় চলেছে রূপ-কাহিনীর দেশের কন্যারা। তাদের গানের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি নি, কিন্তু কান পেতে শুনতে ইচ্ছে করে সেই পল্লীগাথার সুর। আমারও মন গুণগুণ করে ওঠে: "গোরি ধীরে চল, গগরিয়া ছলক না যায়।" তাদের পায়ের মঞ্জীর বেজে উঠছে তালে তালে। আর বুকের ওড়না ফুলে উঠছে হাওয়ায়। সে ওড়নার আর ঘাগরার কতই না রঙ—যেন আকাশের রামধনু নেমে এসেছে মাটিতে। এই মরুভূমির দেশে প্রকৃতি করেছে কার্পণ্য, চোখ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে অন্তহীন রুক্ষ ধূসর শূন্যতায়। সে অভাব পূরণ করছে এ দেশের অধিবাসীরা তাদের পোশাকে অফুরন্ত রঙ ঢেলে। মেয়েরা সেজেছে লাল কাঁচুলি, সবুজ ওড়না আর হলদে ঘাগরায়—তাতে আবার বহুবর্ণ রঞ্জিত কারুকার্য। পুরুষেরাও মাথায় বাঁধে রঙিন পাগড়ী, পরিধানে রঙিন ধুতি। রঙের খেলা হোলি তাই বুঝি রাজস্থানের প্রধান উৎসব।

বন্ধুদের কাছে আমার চিন্তাধারা প্রকাশ করতেই কবিত্বে অবিচলিত শ্রীমান্ তার অর্থনৈতিক গাম্ভীর্যে মন্তব্য করল, রঙিন কাপড় ব্যবহারের প্রধান কারণ হচ্ছে, এই মরুভূমির দেশে যাতে ময়লাটা বোঝা না যায়। এক প্রস্থের বেশী পোশাক রাখা বা সে পোশাক নিয়মিত পরিষ্কারের বিলাসিতা এই দারিদ্র্যের দেশে সম্ভবও নয়।

বাস্তববাদী বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিলুম, প্রয়োজনকে সুন্দর করে তোলাই তো কবি-মনের পরিচয়। নইলে সারা দেশটাই সন্ন্যাসীর গেরুয়া পরে থাকলেও কাজ হত। কই, উত্তর-প্রদেশ-বিহারে তো দেখতে পাই না এ রঙের সমারোহ। তা ছাড়া অভিমতটা ঠিক আমারই আবিষ্কার ভেব না। রবীন্দ্রনাথেরও এই মত।

শ্রীমান্ জিজ্ঞেস করল, রবীন্দ্রনাথ আবার কোথায় এ কথা বলেছেন?

হেসে বললুম, আছে আছে, 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' খুললেই পাবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, বাংলা দেশের মেয়েদের শাড়ির প্রধান রঙই হচ্ছে সাদা, যদিও সৌখিন বাহারের জন্যে অনেকে হয়তো ঝকমকে রঙ লাগান। বাংলা দেশের প্রকৃতিই যে রঙিন, তার ঘন শ্যামলের মাঝখানে সাদা রঙে কালো পাড়টি যেমন মানায়, এমন আর কিছু নয়। আর রাজস্থানে? সাদা কাপড় চোখেই পড়বে না। কণ্ঠের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ওখানকার মেয়েরা মাথায় করে কলসীতে নিয়ে আসে জল, আর চোখের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে বইয়ে দেয় রঙের ঝরণা।

আমার সাক্ষীর সামনে এবার শ্রীমানকে নীরব হতে হল। আমাদের গাড়ি মেয়েদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। তাদের গান বন্ধ হল না, যদিও লম্বা করে টানা ঘোমটার ফাঁক দিয়ে পথচলতি রাজপুতানীদের কাজল-কালো চোখ চকিতে দেখে নিল পরদেশী মুসাফিরদের।

শ্রীমান্‌কে বললুম, জান, এ পথ দিয়েই একদিন শিকারে যাচ্ছিলেন মেবারের যুবরাজ অরিসিংহ। পথে দেখা চাষীর মেয়ে লছমীর সঙ্গে। এমনই ভোরের আলো ঝলসে উঠছিল তারও মাথায় দুধের কলসীর গায়ে। উদ্যানলতার শোভায় অভ্যস্ত রাজকুমারের মন সেদিন ভুলিয়ে দিল বনলতা।

শ্রীমান্ বলল, জানি, এ গল্প 'রাজকাহিনী'তে আমিও পড়েছি।

আগ্রাতে আকস্মিকভাবে আমাদের ভ্রমণ-পথের সঙ্গী হয়েছেন মিস্টার সিন্‌হা। উদয়পুর থেকে কলকাতা ফিরে যাবেন। তিনি এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথা শুনছিলেন। শ্রীমানের মন্তব্যে নীরবতা ভঙ্গ করে বললেন, তা হোক, বেশ লাগছে শুনতে। আপনি বলুন।

তাঁর আগ্রহে উৎসাহ বোধ করলুম। বললুম, এ গল্পের তো শেষ নেই, যুগ হতে যুগান্তরে চলে এসেছে একই কাহিনী। দুষ্মন্ত আর শকুন্তলারই নতুন রূপ। অরিসিংহ বরণ করে নিয়ে এলেন চিতোরের রাজবধূরূপে লছমীকে। কিন্তু বরণডালার ফুল না শুকোতেই মধু-যামিনীর আবেশ চোখে না মিলাতেই চিতোরের দুর্গদ্বারে বেজে উঠল আলাউদ্দীন খিলজীর রণডঙ্কা। পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি পৌঁছেছে দিল্লীর পাঠান সুলতানের কানে, তাঁকে চাই সুলতানের লালসা-তৃপ্তির জন্যে। সে হচ্ছে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। যে আগুন সেদিন জ্বলে উঠেছিল, তাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন মহারানা, যুবরাজ অরিসিংহ

আর তাঁর দশজন ভাই, রাণী পদ্মিনী আর মেবারের রমণীরা—পুড়ে ছাই হয়ে গেল সমস্ত চিতোর। মুসলমানের তরবারিতে আত্মাহুতি দিল তিরিশ হাজার চিতোরবাসী। শুধু রইলেন কৈলারা দুর্গে দ্বিতীয় কুমার অজয়সিংহ রাণী লছমী আর অরিসিংহের ছেলে হাম্বিরকে নিয়ে। বহুদিন পর হাম্বিরই আবার পাঠানের হাত থেকে চিতোর উদ্ধার করেছিলেন।

গল্পের মধ্যে কখন্ দু ধারের মাঠ অতিক্রম করে আমরা চিতোর গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেছি। পথ এবার সরু হয়ে এসেছে। দু পাশে জীর্ণ অসংস্কৃত গৃহের সারি, দোকান-হাট-বাজার। চিতোর দুর্গের পাদমূলে মাত্র কয়েক শো ঘর বাসিন্দা নিয়ে চিতোর গ্রাম। দাওয়ায় বসে হুঁকো টানতে টানতে বৃদ্ধ রাজপুত দ্রুত ধাবমান একার আওয়াজে নিস্পৃহভাবে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। হয়তো অলসমুহূর্তে প্রতিবেশীর সঙ্গে আলোচনাও করে: আরে ভাই, ইস্ খণ্ডহরকো দেখ্নেকে লিয়ে ইত্নে লোক কেঁও আতে হেঁ ?

চিতোরের সর্বাঙ্গে দারিদ্র্যের পরিচয়, অনুন্নত সর্বহারা রূপ। বন্ধুদের বললুম, রাজস্থানের এই এক ছবি। বিজলীবাতি আর হাওয়াগাড়ির যুগ থেকে অনেক দূরে, সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় চিতোর এখনও নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে আছে। এর পাশে মনে পড়ে জয়পুরকে—আলোয়-আনন্দে-সম্পদে উজ্জ্বল ভারতের একটি সুন্দর প্রাণচঞ্চল আধুনিকতম শহর।

শ্রীমান্ বলল, হ্যাঁ, চিতোর যখন স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছে, লুণ্ঠিত-বিধ্বস্ত হয়েছে, রাজস্থানের অনেকেই তখন তৈমুরের বংশধরদের হাতে মেয়ে বা বোন তুলে দিয়ে দিল্লীশ্বরের আশ্রয়ে শান্তি খুঁজে নিয়েছেন। আর এর সবচেয়ে বড় লাভটুকু পেয়েছিল জয়পুর। তাই তো তার এত উন্নতি।

বললুম, আজকের দিনের কালনিরপেক্ষ বিচারে রানা প্রতাপকে হয়তো একটা বিরাট ফ্যানাটিক বলেও মনে হবে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, মুসলমানরা যুদ্ধ করেছে, আর হিন্দুরা শুধু আত্মহত্যা করেছে। সেদিন মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে নিলে মেবারের জনসাধারণের বহু দুর্গতিই দূর হত। আকবর বাদশার মনে সত্যিই অখণ্ড ভারতের প্রেরণা এসেছিল, অথবা ছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন, সে কথা জানি না। শুধু জানি, বাংলা থেকে রাজস্থান—তাঁর অপ্রতিহত রথচক্রের চাপে সমভূমি হয়েছিল। আর এই জয়যাত্রায় তিনি প্রধান সহায় পেয়েছিলেন জয়পুরের অম্বরপতি মানসিংহকে। বাংলার কেদার রায় ঈশা খাঁ-ই বল, অথবা মেবারের প্রতাপসিংহ-ই বল, সর্বত্রই মোগলের ঝাণ্ডা বহন করে এগিয়ে এসেছেন রাজা মান।

টাঙ্গাওয়ালা নীরবে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমরা থামতেই পেছনে তাকিয়ে বলল, মান নেহী বাবু, ও তো বেইমান রাজা থা।

বিস্মিত হলুম সবাই। ইংরেজের লেখা ইতিহাস পড়ে রাজস্থানকে জেনেছি, সন-তারিখ মুখস্থ করে পাস করেছি, স্বাজাত্যবোধের অভিমানও কিছুটা আছে। কিন্তু চিতোরের এই গ্রাম্য অশিক্ষিত দরিদ্র টাঙ্গাচালক ছোট্ট দুটি কথায় জানিয়ে দিল, নিজের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওর অনুভূতি কতখানি তীব্র। আমাদের আলাপ তার বোধগম্য হবার কথা নয়। কিন্তু মানসিংহের নামই ওকে আত্মসচেতন করে তোলার জন্যে ছিল যথেষ্ট।

টাঙ্গাওয়ালা আবার বলল, বাবুজী, চিতোর ভুখা দেশ, গরীব। এ দেশের লোক তো দু দণ্ড স্থির হয়ে বসবার সময় পায় নি কখনও, লড়াই করেই জীবন কেটেছে। কিন্তু ধর্ম রক্ষার জন্যে তারা সব কষ্ট সহ্য করেছে। তারা জানে, জো দৃঢ় রাখৈ ধর্মকো, তিহি রাখৈ কিরতার—যে ধর্মে দৃঢ় থাকে, ভগবান তারই দলে। চিতোরের মহারানার জয়পুরে ধনসম্পদ না থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তাঁর প্রজাদের কাছে তিনি হিন্দুসূর্য।

অজান্তেই আলোচনার খেই আমাদের গেল হারিয়ে। নীরব যাত্রীদের বহন করে গাড়ি বাঁধানো পথে উঠে এল। আঁকা-বাঁকা পথ চলে গিয়েছে পাহাড়ের উপরে। সামনেই দুর্গের প্রবেশ পথ বাদল দরওয়াজা। এমনই আছে সাতটি প্রবেশ-পথ, চিতোরের সাতজন বীরের নামে তাদের পরিচিতি। আজ তাদের লৌহকপাট আর নেই দুর্গকে সুরক্ষিত করবার জন্যে, উচ্চমিনারে সদা-জাগ্রত চক্ষু ভল্লধারী শাস্ত্রী দূর দিগন্তে তাকিয়ে থাকে না, নহবতখানায় বেজে ওঠে না দুন্দুভি।

চোখ তুলে তাকাতেই নজরে পড়ে বিস্তৃত দুর্গপ্রাচীর। প্রথম দর্শনেই মনে হয়, কী দুর্ভেদ্য এর গঠন, যেন দীর্ঘদিন শত্রু-আক্রমণ প্রতিরোধের সংগ্রামই ছিল এখানে একমাত্র উদ্দেশ্য। আক্রান্ত চিতোর কতবার আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় নিয়েছে রুদ্ধকপাট তোরণগুলির পেছনে। আবার এদেরই উন্মুক্ত দ্বারপথে অবারিত জলস্রোতের মত এগিয়ে এসেছে মেবারের বীর যোদ্ধারা শত্রু সংহারে।

সতর বৎসরের যুবক গোরা আর তার বারো বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল এ পথেই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছেন আলাউদ্দীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে। যুদ্ধান্তে বাদল একা ফিরে এলেন দুর্গে। কর্মদেবী ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, বল বাদল, আমার স্বামীর বীরত্বের কাহিনী শুনি। বাদল বললেন, মাগো, চাষীরা যেমন মনের আনন্দে পরিপূর্ণ মাঠের শস্য কেটে নিয়ে আসে, তিনিও তেমনি দু হাতের তলোয়ারে সংখ্যাতীত তুর্কী ধ্বংস করছিলেন। অবশেষে তাঁরই আহরিত শস্যের মাঝখানে তিনি আপন বিশ্রাম-শয্যা রচনা করেছেন।

১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার দুর্গদ্বারে বেজে উঠল আকবরের রণভেরী। বারো বছর বয়সে তিনি দিল্লীর সিংহাসনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী হয়েছেন, আজ তাঁর বয়স তেইশ। সারা হিন্দুস্থানে অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাঁর চোখে, সহায় পেয়েছেন রাজস্থানেরই অম্বর, বিকানীর, যোধপুর এবং আরও অনেককে। যদি ওই ক্ষুদ্র চিতোরই হয় একমাত্র বাধা সে স্বপ্নের সফলতার পথে, তাকে মুছে দিতে হবে দুনিয়ার মানচিত্র থেকে। চিতোর-অধিপতি উদয়সিংহ—রানা সংগর অযোগ্য ভীরুহৃদয় সন্তান উদয়সিংহ—চিতোর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু চিতোর সেজন্যে বীরশূন্য হয় নি। শিশোদীয় পতাকার সম্মানরক্ষার জন্যে উদ্বেলিত হয়ে উঠল তার নামহীন জনগণ। নেতৃত্বের ভার নিয়ে এগিয়ে এলেন জয়মল্ল আর পুত্ত। দিল্লীশ্বরের বাহিনী রুদ্ধগতি হল দুর্গের পাদমূলে। চিতোর অবরোধের সেদিনের ছবি আঁকা আছে 'সচিত্র আকবরনামা'র পাতায় পাতায়। অবশেষে রাতের গভীরে দুর্গ-প্রাচীরের সংস্কারের নির্দেশ যখন দিচ্ছিলেন জয়মল্ল, দূর থেকে মশালের আলোয় নজর পড়ল আকবরের। স্বহস্তে বন্দুক ছুঁড়ে আকবর হত্যা করলেন জয়মল্লকে। চিতোর জয়ের পথ হল নিষ্কণ্টক। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিজয়ী আকবর সসৈন্যে প্রবেশ করলেন দুর্গে।

সেদিন দুর্গের অপর দ্বারপথে বেরিয়ে গেল একদল দরিদ্র চিতোরবাসী। পুরুষানুক্রমে মেবারের বীর যোদ্ধাদের অস্ত্র প্রস্তুত করেছে তারা। তুর্কীর জন্যে, চিতোরের ধ্বংসকারীদের জন্যে পারবে না নিজেদের সে ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে—তাতে যে শুধু মাতৃভূমির অধীনতার নাগপাশই দৃঢ়তর হবে। 'গড়িয়া লোহার' পরিচয়ে চার শো বছর তারা পথকেই আশ্রয় করে নিয়েছে, দেশ থেকে দেশান্তরে অতিক্রান্ত করেছে বর্ষার অবিরাম ধারাপাত, শীতের তীক্ষ্ণ দংশন, গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ। অন্তরে তাদের প্রতিজ্ঞা, পরপদানত চিতোরে আর ফিরবে না। বৃটিশ-শাসনের অবসানে চিতোর দুর্গে উঠল স্বাধীন ভারতের তেরঙা পতাকা। কিন্তু লোহারদের কথা সবাই ভুলেছিল সেদিন। অবশেষে মেবারের রানা ভূপালসিংহের অনুরোধে এলেন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, দুর্গপ্রাকারের উপরে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করলেন সমবেত গড়িয়া লোহারদের দুর্গে প্রবেশের জন্যে, ঘোষণা করলেন স্বাধীন ভারতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত চিতোরে পর-শাসনের অবসান। বললেন, আজ চিতৌরগড় হমারা হৈ। ভারতের জয়ধ্বনিতে চিতোরের আকাশকে চকিত করে জনতা প্রবেশ করে দুর্গপথে, বুঝি ইতিহাস এগিয়ে চলে মধ্যযুগের ধ্বংসস্তূপ থেকে ভাবীকালের একতাবদ্ধ ভারতের পথে। সেদিন ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল।

অব উতারনে হোগা সাব। টাঙ্গাওয়ালা আহ্বান জানাল। তাকিয়ে দেখি আমরা দুর্গের ভেতরে এসে পৌঁছেছি। সারথি জানাল, রথ আর অগ্রসর হবে না, এবার আমাদের পদব্রজে সব কিছু দেখতে হবে। পরিদর্শনান্তে তাকে যথাস্থানে প্রস্তুত পাওয়া যাবে।

চিতোরের মাটিতে পা দিয়ে দাঁড়ালুম সবাই।

প্রাচীরের পাশে সাত-আটজন ভদ্রলোক এবং একজন মহিলা নীচের সমভূমির দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁরা এবার সকৌতূহলে আমাদের লক্ষ্য করছেন।

একজন এগিয়ে এলেন। নমস্কার করে বাংলাতেই বললেন, এই আসছেন বুঝি? চিনতে পারেন তো?

বললুম, কোথায় দেখেছি বলুন তো?

শ্রীমান্ বলল, হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বোধ হয়, যাত্রার দিন। তাই নয়?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, ঠিক ধরেছেন। তারপর থেকে একই ট্রেনে এসেছি, একই স্টেশনে নেমেছি, আবার পাশের কামরায় উঠেছি। আজ এই চিতোর দুর্গে সাক্ষাৎ। তিনি নিজেই পরিচয় দিলেন, তাঁরা পাঁচ বন্ধু (পঞ্চপাণ্ডবও বলতে পারেন) রেল কর্মচারি, ছুটিতে পাস নিয়ে বেরিয়েছেন। আরও জানালেন, মহিলা এবং ওঁর সঙ্গী দুজন আলাদা এসেছেন—বাঙালীই। না, এঁদের সঙ্গে আলাপ নেই। এখানেই প্রথম দেখা।

একটি কৃষ্ণকায় দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তি এতক্ষণ আমাদের সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল। সামনে এসে বলল, ক্যা, আপ বঙালসে আয়া? হম্ হৈ চিতৌর ফোর্টকা গাইড। আপকো সেবা করনেকো লিয়ে কোশিস করতা।

রেলদলের মুখপাত্র বললেন, বুঝলুম। কিন্তু বাপু তোমার এ ধ্বংসস্তূপে আর কী দেখাবে? আমরা যে আগ্রা ফোর্ট দেখে আসছি।

গাইড বলল, বাবুজী, চিতৌর ঔর আগ্রা ফোর্টকা ফারাক আপকো কেয়া সমঝায়গা:

তালমে ভোপাল তাল, ঔর সব তলৈয়া হৈ।

গড়মে চিতৌর গড়, ঔর সব গড়ৈয়া হৈ।

তারপর ব্যাখ্যা করে দিল—হ্রদ বলতে ভোপালের হ্রদ, আর সব তো ডোবা। কেল্লা হচ্ছে চিতোর, আর সব তো নকল। উত্তেজিত হয়ে বলে, বাবুজী, আমি আগ্রা কোর্টের গাইড নই, আমি চিতোর ফোর্টের গাইড। বেগমদের গোসলখানা আর বাদশাদের নাচঘর এখানে পাবেন না। সে হচ্ছে আম্বের। তাকিয়ে দেখুন এই ধ্বংসস্তূপের দিকে, খুমান থেকে আকবর বাদশা—কত আক্রমণকারী এদের উপর আঘাত হেনেছে। কান পেতে শুনুন, এর প্রতিটি পাথর কথা বলবে আপনাদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে মিশে আছে পৃথ্বিরাজের প্রেম, ধাত্রী পান্নার ত্যাগ, ভামশার দান, ঝালাপত্তি মান্নার প্রাণ বিসর্জন, শক্তাবত-চন্দাবতের কত পুরুষানুক্রমিক বিরোধ। এখানে কোথায় দাঁড়াবে গোলামীর ধ্বজাবাহীরা? মোগলের দাস মানসিংহের সঙ্গে একাসনে বসতে ঘৃণা করেছিলেন রানা প্রতাপ। আম্বেররাজ তাই ছুটে গেলেন দিল্লীতে —আকবরের পদাশ্রয়ীদের মাঝখানে দেবেন না একজনকে মাথা উঁচু রাখতে। ' মেবারবাসী কিন্তু ভয় পায় নি, ডেকে বলেছিল, ঠিক হৈ, তুম্হারা ফুফাকো ভি বলালেও। রাজা বিহারীমল্লের মেয়ে—মানসিংহের পিসীকে বিয়ে করেছিলেন আকবর। বিদ্রূপের লক্ষ্যটা ছিল সেদিকেই। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হলেন। পরমাত্মীয়রা বিপক্ষে; সহায় নেই, সম্বল নেই, মাথার উপরে একটা আশ্রয় পর্যন্ত নেই, ক্ষুধার্ত শিশু-সন্তানরা অনাহারে কাঁদছে, তবুও বন থেকে বনান্তরে প্রতাপ ঘুরে বেড়িয়েছেন, মনে শুধু অনির্বাণ সাধনা—চিতোরের মুক্তি।

উত্তেজনায় গাইডের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছিল। একটু থেমে বলল, বাবুজী, এই হচ্ছে চিতোরের কাহিনী। আমি অশিক্ষিত, আপনাদের কী বলব? যদি এই ধ্বংসস্তূপ ছাড়া কিছু না দেখাতে পারি, মাপ করবেন। শীষমহল আর আঁখমিচৌলীর গর্ব চিতোরের নয়।

চারিদিকে সবাই ভীড় করে দাঁড়িয়েছিলেন। বাচন-ভঙ্গী আমাদের খানিকটা কাবু করে এনেছিল সন্দেহ নেই। ওকেই পথি-প্রদর্শক করে এগিয়ে যাচ্ছি, পেছন থেকে আহ্বান এল, শুনুন। তাকিয়ে দেখি মহিলার সঙ্গী ভদ্রলোকদ্বয়ের একজন বলছেন। এগিয়ে এসে বললেন, আমাদের ফেলে যাচ্ছেন কী অপরাধে? যদি আপত্তি না থাকে, সব কিছু এক সঙ্গেই ঘুরে দেখা যাক না।

মিস্টার সিন্‌হা রেলের লোক। নব পরিচিত রেলকর্মীদের দলে ভিড়ে মহোৎসাহে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি ফিরে বললেন, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, সে তো অতি আনন্দের কথা। প্রবাসে বাঙালী মাত্রই সজ্জন। আমাদেরই আমন্ত্রণ জানানো উচিত ছিল, ত্রুটি মার্জনা করবেন।

বিশদ বিবরণে প্রকাশ পেল, ভদ্রলোকের নাম শৈলেন্দু মজুমদার, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা ইরা মজুমদার এবং বন্ধু বোসবাবু। চিতোর স্টেশনের রিটায়ারিং-রুমটি তাঁরাই দখল করেছেন, এ খবরও পেলুম। মধ্যভারত ভ্রমণ সেরে

এসেছেন, চিতোরের পথে রাজস্থান শুরু। পরবর্তী গন্তব্যস্থল উদয়পুর। শ্রীমান্ বলল, তাই নাকি? আমরাও তো এখান থেকে যাচ্ছি উদয়পুর। সেখানে রাজস্থান পর্যায় সমাপ্ত করে যাত্রা করব মধ্যভারত। আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই আমাদের ভ্রমণ-পথের অনেক জরুরী খবর পাওয়া যাবে।

শ্রীযুক্তা মজুমদার আমাকে বললেন, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি বলুন তো? আচ্ছা, আপনি কি বালীগঞ্জে থাকেন?

দক্ষিণ-কলিকাতার একটি খ্যাতনামা পার্কের পশ্চিমে আমার অধিষ্ঠান। রাস্তার নাম শুনেই তিনি বললেন, কী আশ্চর্য! আমাদের বাড়ি থেকে একটা ঢিল ছোঁড়ার দূরত্বও নয়। বাড়ির পথে যেতে আসতে দেখেছি নিশ্চয়। তাই-ই পরিচিত মনে হচ্ছিল। আলাপ হল হাজার মাইল দূরে চিতোরে এসে।

সবাই হাসলুম। বললুম, আমার চেহারাটা যে দৃষ্টি আকর্ষণীয়, এ খবর তো জানা ছিল না। আর, আলাপের কথা বলছেন? জন্মান্তরের পরিচয়—কখন্ কোথায় গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রান্তে ধরা পড়ে কে জানে!

ভদ্রমহিলা এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। বললেন, তা গ্রহ-নক্ষত্রের চক্রান্তে ধরা যখন পড়েই গিয়েছেন, কলকাতা ফিরে আমাদের যেন একেবারে মুছে ফেলবেন না মন থেকে।

বললুম, আপাততঃ মুছে ফেলা তো আর সম্ভব হচ্ছে না, একসঙ্গে যখন উদয়পুর যাচ্ছি।

মুছে ফেলা সত্যিই আর সম্ভব হয় নি। চিতোর থেকে উদয়পুর একই ট্রেনে ভ্রমণ এবং উদয়পুরে একই অতিথি-শালায় সহ-অবস্থানের মাঝে মজুমদার-দম্পতি তাঁদের স্বভাবজ আন্তরিকতায় এবং প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারে দুই অনাত্মীয় যুবককে বিনা আয়াসে আপন করে নিলেন। তাঁদের রুচিশীল মধুর সাহচর্যে প্রবাসের কটি দিনের স্মৃতি আজিও উজ্জ্বল হয়ে আছে। কলকাতা ফিরে এসে মহানগরীর কলরোল আর শত কর্মচাঞ্চল্যেও সেই আকস্মিক পরিচয়কে হারিয়ে যেতে তাঁরা দেন নি, বরং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতেই পরিণত করেছেন।

গাইড মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনছিল, বলল, আপলোগ্ উদয়পুর যায়গা? তব্ তো আপ্ রাজস্থানকা কাশ্মীর যা রহা হৈ।

উদয়পুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খ্যাতি পূর্বেই শুনেছিলুম, সাক্ষাতেও সেদিক থেকে নিরাশ হই নি। মরুভূমির দেশের মাঝখানে উপবাসী চোখের তৃষ্ণা যেন জুড়িয়ে যায় অফুরন্ত শ্যামলিমায়। ফতে সাগর, উদয় সাগর, পিচৌলার জল-টলমল নীল বুকে কালোছায়া মেলে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ পাহাড়ের দল। আর আছে রাজাদের প্রাসাদ, বিলাসকুঞ্জ, রক্ষিতার জন্যে উপবন গৃহ "সহেলিয়োঁ কী বাগ।" রূপজীবিনীর বিলাস-সজ্জায় উদয়পুর অলঙ্কৃত। তার সর্বাঙ্গে চিহ্নিত হয়ে আছে মেবারের অধঃপতনের ইতিহাস। বীর সংগ্রামীর তরবারি-সম্বল কঠোর জীবনের পরিবর্তে কোমল শয্যার আরামে আর নর্তকীর নূপুর-নিক্বণ-মুখর ব্যসনেই প্রতাপসিংহের বংশধরেরা সেদিন খুঁজে পেয়েছিলেন সার্থকতা। চারিদিকে তাকিয়ে মনে শুধু বার বার প্রশ্ন জাগে :

এ কি আত্মবিস্মরণ মোহ,
বীর্যহীন ভিত্তি-'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।

আপন বীরত্বে উন্নীত-শির, মর্যাদায় উদ্ধত, দুঃখবরণে অপরাজেয় চিতোর বুঝি তাই ইঁট-কাঠ-পাথরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আছে লজ্জায়। সযত্নে আবরণ টেনে দিয়েছে ঝোপঝাড় আর আতাগাছের জঙ্গল। এই জঙ্গল আর ধ্বংসস্তূপের মাঝে এগিয়ে যেতে এক জায়গায় গাইড থমকে দাঁড়ায়, হাত তুলে দেখায়, অন্ধকার গহ্বর, সিঁড়ি চলে গিয়েছে তার ভেতরে। পরিচয় শুনি, জহরকুণ্ড—সংখ্যাতীত রাজপুত রমণীর দেহভস্মে পবিত্র এর ধূলিকণা। আমাদের সঙ্গে আলোর ব্যবস্থা ছিল না, অন্ধকারেই দেওয়াল ধরে সবাই নেমে গেলুম সিঁড়ি দিয়ে। কিছু দূর গিয়েই পথ রুদ্ধ হয়েছে কঠিন পাষাণ প্রাচীরে। হয়তো প্রাচীরের ওধারে গহ্বর চলে গিয়েছে আরও অতলে। মনে পড়ে, এই জহরকুণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি বড় মধুর করুণ কাহিনী। সে কাহিনী মেবারের রাণী কর্মদেবী আর দিল্লীর বাদশা হুমায়ুনের। তখন ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শা আক্রমণ করেছে মেবার। অপূর্ব

শৌর্য আর নির্ভীক আত্মদানেও চিতোর বুঝি রক্ষা পায় না। সারা হিন্দুস্থানে কে আছে বীরপুরুষ সে বিপদ থেকে চিতোরকে উদ্ধারের শক্তি রাখে? অনন্যোপায় কর্মদেবী আপন হাতের রাখী পাঠিয়ে দিলেন হুমায়ুনের কাছে। পত্র লিখলেন: আজ থেকে তুমি আমার রাখীবন্ধ ভাই। আমার সম্মানও তাই তোমার হাতেই তুলে দিলুম। সুদূর পূর্ব-ভারতে হুমায়ুনের লড়াই চলছে তখন পাঠান শের শার সঙ্গে। ভারতে মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বুঝি সমাধি রচনা করবে বাংলার মাটিতে। কিন্তু বীরের হৃদয় ছিল হুমায়ুনের। বিপন্না মহিলার আবেদন তাঁর প্রাণে সাড়া জাগাল। হিন্দু রাণী কর্মদেবীকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁর মুসলমান ভাই ছুটে চললেন বাংলা থেকে রাজস্থান। শের শাকে দমনের কর্তব্য রইল মুলতুবী। অধিকাংশ মুসলমান নৃপতির সঙ্গেই আমাদের পরিচয় লুণ্ঠক আর নারীহরণকারীরূপে। হুমায়ুন নিজেকে সে ধারার এক মহৎ ব্যতিক্রমই প্রমাণ করেছিলেন সেদিন। রাজ-অন্তঃপুরের গবাক্ষে কর্মদেবীর প্রতীক্ষা কিন্তু সফল হল না। হুমায়ুন তখনও অনেক দূরে। বাহাদুরের সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করল চিতোরে। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে, করতলে অশ্রু মুছে কর্মদেবী ঝাঁপিয়ে পড়লেন জহরকুণ্ডে। সহস্র বাহু মেলে লেলিহান অগ্নিশিখা তাঁকে বুকে তুলে নিল। তারপর এলেন হুমায়ুন। তাঁর সৈন্যদের কাছে পরাজিত হয়ে বাহাদুর চিতোর ছেড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু হুমায়ুনের মনে সেদিন কোথায় বিজয়ের উল্লাস? কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে তিনি শুধু কেঁদে বেড়ালেন, খুঁজে ফিরলেন তাঁর অদেখা বোনের স্মৃতি।

অন্ধকারে জহরকুণ্ডের ধূলি তুলে মাথায় দিলেন শ্রীযুক্তা মজুমদার। অতীতের স্মৃতির উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমরা উঠে এলুম উপরে।

চারিদিকের ধ্বংসস্তূপের মাঝে এখনও দাঁড়িয়ে আছে রাজরাণী মীরার গোপাল মন্দির। রানা সংগর পুত্র ভোজরাজের পরিণীতা স্ত্রী ছিলেন মীরা (১৫০০-৪৭ খ্রীঃ)। শক্তিসাধনার দেশে তিনি নিয়ে এলেন প্রেম-ভক্তির বাণী। রাজ-অবরোধের অনুশাসন তাঁকে আবদ্ধ করে রাখতে পারল না। বৃন্দাবনের পথে পথে কৃষ্ণ-প্রেমে পাগলিনী মীরা খুজেছেন তাঁর গিরিধারী গোপালকে, কণ্ঠে সুরময় উপলব্ধি: 'বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা'।

মন্দিরের পাশেই মীরার ধর্মপথের প্রদর্শক রুইদাসের সমাধি। নিরাভরণ মাটির স্তূপের উপর একটি তুলসী গাছ সাধকের স্মৃতি রক্ষা করছে। মুচির সন্তান রুইদাস, জুতো সেলাই তাঁর জীবিকা। ঘরের চালে খড় নেই, হাঁড়িতে অন্ন নেই, দিন চলে না, অস্পৃশ্য-অশুচি, সকলের ঘৃণ্য জীবন। কিন্তু সেজন্যে মনে কোন দুঃখ নেই। নিজের হাতে তৈরি শ্রেষ্ঠ জুতো-জোড়া কোন বৈষ্ণবের ঘরের দুয়ারে রেখে আসতে পারলেই পরিশ্রম সার্থক মনে করেন রুইদাস। তারপর চোরের মত লুকিয়ে চলে আসেন কুটীরে—গোবিন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ দূর হয়। লোকে কিন্তু বোঝে না। এক সাধু তাঁকে দিয়ে যান পরশ-পাথর। পরশ-পাথরের ছোঁয়ায় রুইদাসের লোহার হাতুড়ী সোনা হয়। রুইদাসের অশ্রুধারা আর বাধা মানে না। ইষ্টদেবতার সামনে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা জানান: আমার দুঃখের দিনের দেবতা, তোমাকে তো আমি যেতে দেব না। সাধুকে ডেকে বলেন, নিয়ে যাও ঠাকুর তোমার পাথর। ওতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এই অন্ত্যজ দরিদ্র রুইদাসই বুঝি ভিখারিণী মীরার গুরুর আসনের একমাত্র অধিকারী।

আর আছে ভবানী মন্দির। ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে রানা মুকুলজী এর সংস্কার করিয়েছিলেন। গাইড অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের মন্দিরের চারদিকে ঘুরিয়ে দেখালে প্রাচীরের অপরূপ ভাস্কর্য—নৃত্যরতা নারী, সশস্ত্র নর, কেলিরত মিথুন, অশ্ব-হস্তী-রথ, জীবনের কত বিচিত্র প্রকাশ। বলল, বাবুজী, যোদ্ধা রাজপুতের পাষাণ-কঠোর দেহের আড়ালেও লুকিয়ে ছিল একটি শিল্পী-মন। কিন্তু মুক্ত-তরবারি-সম্বল রণক্ষেত্রের বিপদ-সংকুল জীবনই তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে অষ্টপ্রহর। শিল্প-লক্ষ্মীর নৈবেদ্য তাই তো আর সাজানো হল না সাধ পূর্ণ করে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে আছেন চিতোরেশ্বরী দেবী চামুণ্ডা। আর আছেন প্রজ্জ্বলিত ঘৃত-প্রদীপে উদ্ভাসিত বিরাট ত্রিমূর্তি মহাদেব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের অধিকর্তা। ছায়াচ্ছন্ন প্রায়ান্ধকার গর্ভগৃহে দাঁড়িয়ে সেদিন অদ্ভুত একটা

শিহরণ অনুভব করেছিলুম। যুক্তিবাদী মন তার সকল অবিশ্বাস নিয়ে মন্দিরের বাইরেই পড়ে ছিল। শুধু মনে হচ্ছিল, এখনই বুঝি দেবী চামুণ্ডা তাঁর পাবকশিখার মত রূপবহ্নি নিয়ে আবির্ভূতা হবেন আমাদের সম্মুখে, যেমন একদিন তিনি দেখা দিয়েছিলেন রানা লক্ষ্মণসিংহকে। চিতোর-প্রাসাদের নীরব অন্ধকার শতদীর্ণ হয়ে পড়েছিল : ম্যয় ভুখা হুঁ। কণ্ঠে তাঁর নৃমুণ্ড-মালা, দক্ষিণ হস্তের খড়্গ থেকে ঝরছে শত্রু-শোণিত। লোল জিহ্বায় মিশে আছে অতৃপ্ত ক্ষুধা। আলাউদ্দীনের কবল থেকে স্বদেশ রক্ষার জন্যে অগণিত বীরের প্রাণদানে সেদিন দেবীর ক্ষুধার কি তৃপ্তি হয়েছিল? সে প্রশ্নের জবাব পাই নি। পা টিপে টিপে মন্দির থেকে বেরিয়ে এলুম সবাই, সামান্যতম শব্দেও তার নিস্তব্ধ গাম্ভীর্যকে বিঘ্নিত করবার সাহস ছিল না।

কাছেই গোমুখী উৎস। নির্মল স্বচ্ছ জল। রাজবধূ রাজকুলবালারা আসতেন এখানে অবগাহনে। পাশেই তাঁদের সজ্জা-গৃহ। তার প্রাচীরে এখনও অঙ্কিত রয়েছে শৃংগার-রতা রূপসীর প্রতিচ্ছবি। জলের নীচে ডুবে আছেন দুটি শিবলিংগ—একটি শ্বেত পাথরের, অপরটি কালো কষ্টি পাথরের।

চিতোর পরিক্রমা সমাপ্ত হয়ে এল। সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রানা কুম্ভ কর্তৃক নির্মিত জয়স্তম্ভ—কুম্ভশ্যাম। বিদ্যোৎসাহী, সুকুমারকলার পোষক কুম্ভের শাসনকালে (১৪৩৩-৬৮ খ্রীঃ) মেবারের রাজশক্তি-ক্ষমতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। প্রতিবেশী মুসলমান শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে অপ্রতিহত বিজয়ের কাহিনীই এ সময়ের ইতিহাস। মালবের সঙ্গে মেবারের সংঘর্ষ ছিল বহুদিনের। কুম্ভ মালবের সুলতান মহম্মদ খিলজীকে পরাজিত করে ছ মাস চিতোরে বন্দী করে রাখেন। সেই বিজয়েরই স্মৃতি রক্ষা করছে এই ১২০ ফুট উঁচু জয়স্তম্ভ। দেব-দেবীর কমনীয় মূর্তিতে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত এর সর্বাঙ্গ। দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে প্রস্তুত (১৪৪২-৪৯ খ্রীঃ) এই জয়স্তম্ভ স্থপতি-বিদ্যার এক বিস্ময়। নির্মান-কৌশলে চিতোরের এই জয়স্তম্ভকে টড সাহেব কুতুবমিনার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।

কুম্ভচরিত্রে বীরের দার্ঢ্যের সঙ্গে শিল্পানুরাগেরও অভাব ছিল না। কাব্যে ও সঙ্গীতে ছিল তাঁর বিশেষ অধিকার। গীত-গোবিন্দর উপরে প্রামাণিক ভাষ্য এবং সঙ্গীত লহরী ও সঙ্গীত রাজ নামক দুখানা সঙ্গীতশাস্ত্র-বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা হিসাবেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

এক শো উনত্রিশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা উঠে এলুম স্তম্ভের শীর্ষে। সমস্ত চিতোর এবার আমার সম্মুখে প্রসারিত: বাপ্পা রাওয়ের হাভেলি, হাম্বিরের ঝোপড়া, পদ্মিনী মহল, রানা কুম্ভের অর্ধভগ্ন প্রাসাদ, জৈন মন্দির, জৈনগুরু আদিনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত দ্বাদশ শতাব্দীর কীর্তিস্তম্ভ, রানা ফতেসিংহের 'ফতে প্রকাশ' সবই দেখতে পাচ্ছি।

মধ্যরাতের নিঃসঙ্গ চাঁদ যখন তার আকাশ-পরিক্রমার পথে চুপ করে তাকিয়ে থাকবে নীচের ধ্বংসস্তূপের দিকে, অসংখ্য নক্ষত্রের আলো নিরবধি সময়ের সাক্ষীরূপে শুধুই কাঁপবে, আর দূর বনান্তরাল থেকে ভেসে আসবে নিশীথ সমীরণ একটা সীমাহীন দীর্ঘশ্বাসের মত—সে সময় হয়তো কোন এক জাদুমন্ত্রে আবার জেগে উঠবে এই মৃত নগরী, চারণ বন্দনা গাইবে, জয়ধ্বনি তুলে এগিয়ে যাবে সৈনিকের দল, সপারিষদ মহারানা প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে গ্রহণ করবেন তাদের অভিবাদন, পর্দার অন্তরাল থেকে রাজমহিষী কোন বীরের উদ্দেশে ছুঁড়ে দেবেন রেশমী রুমালে বাঁধা মোহরের তোড়া।

অতীতের গৃহছাড়া কত অশ্রুতবাণী বাতাসে কানাকানি করে বেড়াচ্ছে। চোখের সামনে ভেসে উঠছে ভারতের ইতিহাস। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের বারো তারিখ, খানুয়ার যুদ্ধে রানা সংগ পরাজিত হলেন পাণিপথ-বিজয়ী বাবরের মুসলমান-বাহিনীর কাছে। অষ্টাদশ-সংগ্রামের বীর যোদ্ধা রানা অপমানে লজ্জায় আর চিতোরে প্রত্যাবর্তন করলেন না। গঙ্গা পেরিয়ে চলে গেলেন বিশ্বনাথের বারাণসীতে। মেবারের সঙ্গে হিন্দুর গৌরব-সূর্যও সেদিন ভারতে অস্তমিত হল। অবিশ্যি ইসলাম ইতিপূর্বেই হিন্দুস্থানের মাটিতে তার অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছে। আর, ভারতের সমাজ-জীবনকে দিয়েছে দ্বিখণ্ডিত করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আগমনের পূর্বেও ভারতের সমাজে অংশভাগ ছিল। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মও নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু তারা সকলেই ছিল একই ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ। তাই নানা সংঘাত ও সামঞ্জস্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বৈদিক যুগ বৌদ্ধযুগে, বৌদ্ধযুগ পৌরাণিক যুগে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিদেশী রাজশক্তির আগমনের সঙ্গে এই স্বাভাবিক সৃষ্টিকার্য পেল বাধা। ইসলাম নিয়ে এল সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা, নতুন সমাজ, নতুন ধর্ম। উত্তর-সীমান্তের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আভাসও ছিল এতদিন ভারতবাসীর অজানা। দীর্ঘদিনের স্বাতন্ত্র্য তাদের আন্তর্জাতিক চেতনাকে করেছিল আচ্ছন্ন। প্রথম আঘাতের আকস্মিকতা কেটে যেতেই তাই ভারতীয় জীবন নিজের চারদিকে গড়ে তুলল কঠিন আবরণ, সযত্নে আশ্রয় নিল সেই আবরণের আড়ালে আত্মরক্ষার তাড়নায়। দ্বিজাতিতত্ত্বের সেদিনই হল প্রথম বীজবপন। তারপর কত শতাব্দী চলে গিয়েছে, কত রাজা কত রাজনীতিক চেষ্টা করেছেন সে ফাটল মেরামতের, কিন্তু সবই হয়েছে চোরাবালির উপরে ঘর বাঁধার চেষ্টা। দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষকে দিতে হল তার মূল্য রাজনীতি-সম্পর্কশূন্য সংখ্যাহীন নিরীহ নরনারীর রক্তে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে দাঁড়ালুম। সবাই কখন চলে গিয়েছে আমাকে একা রেখে। জয়স্তম্ভের অদূরেই আমাদের রথ অপেক্ষা করছে দেখতে পাচ্ছি। আমাকেও এবার নীচে যেতে হবে।

নায়িকা

সঙ্কর্ষণ রায়

বাস পান্না পেরিয়ে এসেছে। পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা বামিঠার দিকে নেমে গেছে। এক পাশে অতলস্পর্শী গহ্বরের নীচে সমতলভূমির অস্পষ্ট নীল আভা, অন্য পাশে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে সেগুন বনের সবুজ ঢেউ প্রায় যেন আকাশ ছুঁয়েছে। এ পথে বনবাসী পাণ্ডবদের আনাগোনার পথের পুথি উদ্ধার করতে বেরিয়েছেন বেনারসের বিদ্যাপীঠের পণ্ডিত রামব্রিজ মিশ্র। তিনি তাঁর সহযাত্রী ভাস্কর মিত্রকে বলছিলেন, এ বনের বর্ণনা বনপর্বে পাবেন। এখানে একটা জলপ্রপাতের কাছে পাণ্ডবরা অনেক দিন কাটিয়েছিলেন। এখান থেকেই তাঁরা অজ্ঞাতবাসের জন্য বিরাটনগর যাত্রা করেন।

ভাস্কর মাদ্রাজের আর্ট কলেজের অধ্যাপক। আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের আমন্ত্রণে সে খাজুরাহো চলেছে। সেখানকার একটি মন্দিরের ভেতরকার প্রদক্ষিণ-পথের ধ্বসে যাওয়া কতকগুলো পাথরের ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের পুনরুদ্ধার করতে হবে তাকে। দু-একবার ইতিমধ্যে খাজুরাহো ঘুরে এসেছে সে। মন্দিরগুলো ঘুরে ঘুরে উৎকীর্ণ প্রাচীরচিত্রের অনুকরণে কতকগুলো স্কেচ করে আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ডিরেক্টর তার ড্রইং দেখে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এই কাজের ভার দিয়েছেন।

ভাস্কর বাসের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ভাবছিল, হারানো শিল্পের পুনরুদ্ধার শুধুই কি মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যের সম্ভার থেকে অনুকরণ করে যাবে! আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্ট হয়তো তাই চায়, কিন্তু তার মন তাতে সায় দেয় না। তার শিল্পী-মনের প্রতিবাদ যেন এই বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণীতে সেগুন গাছের পাতায় পাতায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছে। বেলে পাথরের স্তরে স্তরে যেখানে প্রকৃতির ভাস্কর্যের আয়োজন, পাহাড়ের মাথায় যেখানে মেঘের আসন, সহস্র বৎসর পূর্বের শিল্পীর প্রেরণার উৎস সেখানেই ছিল। কিন্তু আজকের শিল্পীর চোখে তা ধরা পড়ে না, মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ নায়িকাদের প্রস্তরীভূত যৌবনসম্ভারের রেখাগুলিকে অনুসরণ করতেই সে চায়।

রামব্রিজ মিশ্রের কথাগুলি অন্যমনস্ক ভাস্করের কানে যায় নি। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল যে, মিশ্রজী তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেছেন। সে ঈষৎ চমকে উঠে মিশ্রজীকে বলল, আপনি আমাকে কিছু বলছিলেন?

মিশ্রজী হেসে বললেন, কী ভাবছেন অত!

ভাস্কর সলজ্জ হেসে বলল, তেমন কিছু নয়।

বেশী ভাববেন না। বরং দেখুন। প্রকৃতি যে কত বড় শিল্পী তা দু চোখ ভরে দেখুন। প্রকৃতির এই শিল্পসৃষ্টির কাছে খাজুরাহোর মন্দিরগুলোও তুচ্ছ।

খাজুরাহো গিয়েছেন কখনও?

না, যাই নি। যেতে চাইও নে। প্রকৃতির ভাস্কর্যকে বিপর্যস্ত করে পাহাড় থেকে পাথর কেটে মানুষ যে ছেলেখেলা করেছে তা দেখবার প্রবৃত্তি আমার হয় না। শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসের মধ্যে হাস্যকর স্পর্ধা রয়েছে। আপনি নিজে শিল্পী, আপনি হয়তো আমার কথা মানতেই চাইবেন না। কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন দেখি, এই যে বিন্ধ্যপর্বত ধাপে ধাপে সমতলের দিকে নেমে যাচ্ছে, এর ছন্দ মানুষ কি শত চেষ্টা করেও ফুটিয়ে তুলতে পারবে?

ভাস্কর গম্ভীর মুখে চুপ করে রইল।

রামব্রিজ মিশ্র বললেন, এ বারে আমাকে নামতে হবে। পাহাড়ের নীচেই পাণ্ডব-প্রপাত। ওখানে পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা করেছিলেন। মহাভারতের বর্ণনা মিলিয়ে হয়তো ওখান থেকে বিরাটনগরের পথের সন্ধান পেয়ে যাব। আপনিও আসুন না আমার সঙ্গে। বনপর্বে বর্ণিত বনে বিচরণ করে বেড়াই আমরা।

ভাস্কর বলল, আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্ট যে আমাকে কন্ট্রাক্ট দিয়ে বেঁধে রেখেছে, কী করে আর যাব বলুন। মতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের ভেতরকার কতকগুলি লুপ্ত খোদাই

করা পাথরের ফলক উদ্ধার করতে হবে। সুরসুন্দরী ও শালভঞ্জিকা নায়িকাদের মূর্তি।

মিশ্রজী মুচকি হেসে বললেন, কোথায় পাবেন সে সব নায়িকাদের ?

ঈষৎ বিব্রত হয়ে ভাস্কর বলল, স্কেচ তো করাই আছে, ড্রইংগুলো আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর অ্যাপ্রুভ করেছেন।

কিন্তু কোথা থেকে স্কেচ করলেন ?

মন্দিরের গায়ে খোদাই করা মূর্তিগুলো থেকে।

নিষ্প্রাণ পাথরের ফলক থেকেই উদ্ধার করেছেন তা হলে। নায়িকাদের খুঁজে পান নি, তাই না ?

ভাস্কর আরক্ত মুখে চুপ করে রইল।

একটু বাদেই কেন নদীর ধারে নেমে গেলেন মিশ্রজী।

কেন নদী পেরিয়ে কিছু দূর যেতে চন্দ্রনগর। চন্দ্রনগরের কাছেই রাজগড়ে রাজা ছত্রসালের প্রাসাদ। তারপর মিনিট পনেরো বাদে বাস পৌঁছে গেল বামিঠাতে।

সেদিন বামিঠাতে হাট বসেছে। মস্ত বড় হাট। অনেক দূর দূর থেকে লোকজন এসে ভিড় করেছে, ছতরপুর ও খাজুরাহো থেকেও এসেছে। হট্টগোলের কমতি নেই।

বাস বেশ কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াবে এখানে। সবাই বাস থেকে নেমে গেল হাট দেখবে বলে। ভাস্কর একা বসে রইল।

মিশ্রজীর কথাগুলো তার কানের মধ্যে তখনও সির-সির করছে। দর্পণের সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গিমা, দয়িতের আলিঙ্গনে আত্মহারা মুগ্ধ দৃষ্টি, বিরহিণীর উদাস আঁখি—দেয়ালে উৎকীর্ণ প্রস্তরীভূত কল্পনার বাইরে কোথায় এদের সে খুঁজবে! সহস্র বৎসর আগে শিল্পীরা কোথায় খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁদের নায়িকাদের, কে তাকে বলে দেবে ?

বাস যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে কতকগুলো মনিহারীর দোকান বসেছে। সে সব দোকানে মেয়েদের খুব ভিড়। নানা রকম চটকদার সামগ্রী ওদের চোখে চমক লাগায়। নাড়াচাড়া করে আর দেখে, মাঝে মাঝে তাদের স্বামীদের ডেকে এনে বায়না ধরে এটা ওটা কিনে দিতে। ওদের মধ্যে ফুলমতিয়াও ছিল।

যৌবনগর্বে উদ্ধত হলেও বেশ নরম মুখখানা, হাসিখুশি, চপল। বিশ বছরের শিহর-জাগা যৌবনের বেগ যেন দেহমনে সজাগ। হালকা ছন্দে ছুটে বেড়ায়, অকারণে হাসে। ঘুরতে ঘুরতে একটি মনিহারী দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় ফুলমতিয়া। আঁচলে গেরো দিয়ে বাঁধা টাকা দুটোকে সে ছুঁয়ে দেখে বার বার ঠিক আছে কিনা। অন্য সব মেয়েরা যখন এটা-ওটা ধরে নাড়াচাড়া করছে, সে দাঁড়িয়ে থাকে। করকরে তাজা দু-দুটো নোট নিয়ে সে এসেছে—দুটো টাকা মানে অনেক পয়সা। আগে কখনও পয়সা নিয়ে হাটে আসে নি। স্বামীর সঙ্গে আসত। স্বামীর কাছে বেশী পয়সা থাকত না, বড় জোর দু আনা কি চার আনা। আজকাল সে রোজগার করছে রোজ এক টাকা করে। তার স্বামী যদি জানতে পারে অবাক হবে।

দোকানদার তার দিকে চেয়ে বলল, চাই কি কিছু ?

কত কী-ই তো চাইবার আছে। তার অনেকদিনের সব সাধ ওই সব চকচকে জিনিসগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রতিফলিত হচ্ছে। কিন্তু কোন্‌টি ছেড়ে কোন্‌টি কিনবে!

হঠাৎ একটি বড় আয়নার দিকে তার নজর পড়ল। রুপোলী ফ্রেমে আঁটা, আলো ঠিকরে পড়ছে। আয়নাটি তুলে নিতে তার হাত কাঁপে। আলো-ঝলমল আশ্চর্য একটা স্বচ্ছতার মধ্যে আশেপাশের সব কিছুই ফুটে উঠছে—সবচেয়ে আশ্চর্য একখানা মুখ। বাড়িতে একটা ছোট্ট ভাঙা আয়না আছে, তাতে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, নিজের মুখখানাও ভাল করে দেখতে পারে নি সে কখনও। তাই বুঝি নতুন আয়নায় ফুটে-ওঠা নিজের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সে। খাজুরাহোর মন্দিরের গায়ে খোদাই করা সব সুন্দর মুখের চেয়েও তো সুন্দর।

হঠাৎ ফিক করে হেসে ফেলে ফুলমতিয়া। সে হাসি আয়নাতেও ঝলসে ওঠে।

দোকানদার বলল, এক টাকা দাম। নেবে তো টাকা দাও শীগগির, না নেবে তো রেখে দাও।

আঁচলের গেরো খুলে একটি টাকা বের করে দোকানীকে দিল ফুলমতিয়া। আর সব মেয়েদের চোখে ঈর্ষার বিদ্যুৎ ঝলক দেয়।

বাসের পাশের নিমগাছের তলাটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। সেখানে দাঁড়িয়ে নতুন কেনা আয়নাটিতে নিজের মুখ দেখে ফুলমতিয়া।

ফুলমতিয়াকে দেখতে পায় নি ভাস্কর। সে তখন আয়না হাতে নিয়ে দাঁড়ানো নায়িকাদের খোদাই করা মূর্তির কথা ভাবছিল। অমনই একটা মূর্তি তাকেও খোদাই করতে হবে। কাণ্ডারিয়ার মন্দিরের মহামণ্ডপের স্তম্ভে উৎকীর্ণ মূর্তিটি থেকে সে স্কেচ করেছে। তাই থেকে খোদাই করবে। শিল্পসৃষ্টি নয়, শিল্পানুকৃতি। তাতেই খুশী হবেন আর্কিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের কর্তৃপক্ষ। মৌলিক শিল্পকর্মের পৃষ্ঠপোষক নন তাঁরা, প্রাচীন শিল্পসামগ্রীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাঁদের।

ফুলমতিয়া একবার আড়চোখে তাকাল ভাস্করের দিকে। ভাস্কর তাকে দেখছে না দেখে ভারি রাগ হল তার। তাকে না দেখে থাকতে পারে এমন পুরুষমানুষ সে দেখে নি।

অন্যমনস্কগোছের ওই অদ্ভুত মানুষটিকে ফুলমতিয়া আবার দেখতে পেল খাজুরাহোর মতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের উঁচু প্রাঙ্গণে। বিরাট চুটো লালচে পাথরের সামনে সে বসেছে ছেনি-হাতুড়ি নিয়ে। পাশে কতকগুলো ছবি-আঁকা কাগজ।

ফুলমতিয়া মন্দির সারানোর কাজে নিযুক্ত মজুরদের সঙ্গে কাজ করে। তার গাঁয়ের মোড়লের কথায় তাকে কাজে নিয়েছে মজুরদের সর্দার। তার স্বামী বাবন পান্নাতে চলে যাওয়ার পর থেকে সে এই কাজে লেগেছে।

মতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের সিঁড়ির খানিকটা ভেঙে গিয়েছে, ভাঙা পাথর সরিয়ে নতুন পাথর লাগানো হচ্ছে। ফুলমতিয়া এখানে কাজ করে।

কাজে তেমন মন নেই ফুলমতিয়ার। কাজ থেকে পালিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সে আবিষ্কার করল ভাস্করকে।

ভাস্কর এক মনে কাজ করে যাচ্ছে। হাতুড়ির আঘাতে ছেনির মুখে ফুটে উঠতে থাকে উদ্ধতযৌবন নায়িকার মূর্তি। কর্মরত ভাস্করের দিকে চেয়ে রইল ফুলমতিয়া। ভাস্কর তাকে দেখে নি। ফুলমতিয়া খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে সরে এল। অদূরে মন্দিরের চত্বরের এক কোণে তার খাবারের পুঁটলিটি রাখে সে রোজ। অনেক দূরের গ্রাম থেকে সে আসে, ভোর হবার আগেই রওনা হয়, ফিরতে হয় সন্ধ্যা। খাবার রাত্তিরে করে রাখে, সকালে বেঁধে নিয়ে আসে। দুপুরবেলা এখানে বসে খায়। মতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের চত্বরের এই কোণটি অপেক্ষাকৃত নির্জন। এখানে আর কেউ আসে না। পুঁটলিটিতে খাবার ছাড়া থাকে তার প্রসাধনের সামগ্রী, চিরুণী, কাজল, পাউডার আর বামিঠার হাটে কেনা সেই আয়নাটিও।

খাবার খেয়ে আয়নার সামনে বসে কাজললতা বের করে চোখে কাজল আঁকে ফুলমতিয়া, মুখে পাউডারের মৃদু প্রলেপও বোলায়।

নিজেকে রোজই যেন নতুন করে আবিষ্কার করে সে। আয়নায় প্রতিফলিত বিপুল যৌবনসম্ভারের দিকে চেয়ে সে ভাবে, এ কি তারই দেহের দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে, না, শুধু ছায়া!

নিজের রূপের মধ্যে আত্মহারা হয়ে যায় ফুলমতিয়া। হঠাৎ তার দু চোখ বেয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়ে। যৌবনের সোনার কাঠির ছোঁয়ায় পুষ্পিত তার এই বিস্ময়কর রূপ কি কখনও বাবনের চোখে পড়ে নি! বাবন কি অন্ধ! সে কী করে তাকে ছেড়ে আছে!

হঠাৎ তার মনে পড়ল বাবন তাকে ছেড়ে যেতে চায় নি। সে-ই এক রকম জোর করে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছে পান্নাতে। পান্নার হীরের খনিতে কাজ করলে নাকি অনেক টাকা পাওয়া যায়, এ কথা শুনেছিল সে তার পাশের বাড়ির সোনীর স্বামীর কাছে। বাবন ও সব কথা কানেও তুলত না, পয়সা রোজগারে তার মন ছিল না। কর্মহীন আলস্যে দিন কাটাতে সে ভালবাসত। অনেক কান্নাকাটি জেদাজেদি করে শেষ পর্যন্ত বাবনকে সে পাঠাতে পেরেছে পান্নাতে। যাবার সময় রাগ করে একটি কথাও বাবন বলে নি তার সঙ্গে। পরে সে সোনীর স্বামীর কাছে শুনেছিল বাবন নাকি তাকে বলেছে যে সে আর ফিরে আসবে না।

এক এক সময় ফুলমতিয়ার মনে হয়, সত্যিই যদি বাবন ফিরে না আসে! আয়নার মধ্যে ফুটে ওঠা ওই ব্যর্থ নিষ্ফল যৌবন নিয়ে কী করবে সে!

এত কাছে বসে আছে ফুলমতিয়া, অথচ ভাস্কর তাকে

দেখতে পায় নি। সে তখন সহস্র বৎসর পূর্বে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ শিল্পকর্মের পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত। প্রসাধনরতা নায়িকা—হাতে-ধরা আয়নায় একাগ্রদৃষ্টিতে গ্রীবা হেলিয়ে দেখছে নিজেকে। যন্ত্রের মত কাজ করে যাচ্ছে ভাস্কর। প্রস্তরীভূত যৌবনের মধ্যে শুধু নিষ্প্রাণ শীতলতা। পুষ্পিত দেহবল্লরী নয়—পাথরে উৎকীর্ণ কতকগুলো রেখামাত্র।

ফুলমতিয়ার মনে হল বাবনের মত ভাস্করও বুঝি অন্ধ।

বিশ্বনাথের মন্দিরের সামনে পান্নার বাস এসে দাঁড়ায়। দু বেলা দুটো করে বাস আসে পান্না থেকে। বাস আসবার আগে বিশ্বনাথের মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ায় ফুলমতিয়া।

বিশ্বনাথের মন্দিরের বাইরের দেয়ালে গবাক্ষবর্তিনী প্রতীক্ষমাণা নায়িকার সুন্দর মূর্তি আছে একটি। একটি পাথরের ফলকে মূর্তিটিকে খোদাই করছিল ভাস্কর।

গবাক্ষে প্রস্তরীভূত উদাস দৃষ্টি। কিন্তু সে দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা বা আশা তো নেই! ভাস্করের শিল্পীমনে প্রতিবাদ জাগে—তার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একটি নিষ্প্রাণ প্রতীক্ষাকে আবার আর একটি পাথরে পুনরুৎকীর্ণ করে তার ভেতরকার শিল্পসৃষ্টির তাগিদকে তিলে তিলে গলা টিপে মেরে ফেলছে সে। এ তো সে চায় নি।

ফুলমতিয়া সেদিন খোঁপায় একটি লাল রঙের গোলাপ গুঁজেছিল। অন্যান্য দিনের চেয়েও বেশী করে টেনে এঁকেছিল কাজলের রেখা তার আয়ত চোখ দুটিতে। পথের পানে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চেয়েছিল সে—পান্নার বাস আসবে একটু বাদেই।

যমুনিয়া এসে হেসে বলল, খুব তো সেজেছিস লো! কে আসবে?

ফুলমতিয়া বলল, কে আবার আসবে!

আ আমার পোড়া কপাল! কেউ আসবে না—তবু এই সাজের ঘটা!

কেন? কেউ না এলে সাজতে নেই নাকি?

ফুলমতিয়ার চোখ দুটি ছল ছল করে।

বাস আসে। কিন্তু বাবন এল না। ও কি আর আসবে না!

সযত্নে আঁকা কাজলের রেখা চোখের জলে মুছে যায়।

ছেনিতে হাতুড়ির আঘাত পড়ে। ভাস্কর এক মনে খোদাই করে যাচ্ছে প্রতীক্ষায় উদাস দৃষ্টির প্রস্তরীভূত বেদনাকে।

ভাস্করের সামনে দিয়েই হেঁটে চলে গেল ফুলমতিয়া, ভাস্কর তাকে দেখতে পেল না।

শেষ পাথরের ফলকটিতে খোদাই করতে হবে মিথুন মূর্তি। ভাস্করের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শালভঞ্জিকা ও সুরসুন্দরীদের বিলোল কটাক্ষের সামনে আলিঙ্গনাবদ্ধ মিথুন।

মিলনের শতদল—ছেনিতে হাতুড়ি ঠুকে তার উত্তাপের স্পর্শ খোঁজে ভাস্কর। কিন্তু প্রস্তরীভূত শীতলতা যেন নিবিড়তম আলিঙ্গনকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ভাস্করের ছেনি-ধরা হাত যেন ক্রমশঃ অসাড় হয়ে আসে।

বাবন ফুলমতিয়াকে খুঁজছিল। পান্না থেকে এসে পৌঁছেছে সে এইমাত্র।

আজ আর পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে নি ফুলমতিয়া। মতঙ্গেশ্বরের মন্দিরের চত্বরের কোণ থেকে তার পুঁটলিটি তুলে নিয়ে সে তার গাঁয়ে ফেরবার উদ্যোগ করছিল। হঠাৎ বাবন এসে দাঁড়াল তার সুমুখে।

চোখ তুলে চমকে ওঠে ফুলমতিয়া। গলায় তার স্বর ফোটে না। মুহূর্তের মধ্যে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয় দুজনে। এরই জন্য বুঝি সমস্ত দিনটা প্রতীক্ষা করে ছিল।

হঠাৎ চোখ তুলে তাকাল ভাস্কর, এই প্রথম দেখল সে ফুলমতিয়াকে।

পাথরে উৎকীর্ণ শীতল আলিঙ্গনের সামনে ওই নিবিড় মিলনের পুষ্পিত বিকাশ! এর জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

মনে হল বৃথাই এতদিন পাথরে খোদাই করেছে। প্রস্তরীভূত নায়িকাদের পুনরুদ্ধারে অসাড় তার শিল্পীমনে হঠাৎ দোলা লাগে।

অসমাপ্ত মিথুন মূর্তিটি সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। উন্মত্তের মত ভেঙে ফেলে সে তার অনেক দিনের পরিশ্রমে উৎকীর্ণ প্রসাধনরতা নায়িকা—বাতায়নবর্তিনী উদাস প্রতীক্ষাকে।

ব্রহ্ম সত্যম্

শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

আমাদের দেশে অদ্বৈত দর্শন বহু প্রচারিত। তবে যেভাবে এই দর্শনের প্রচার হয় তা-ই আসল অদ্বৈত দর্শন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করার সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের ধারণা, অদ্বৈত দর্শনের দুর্ব্যাখ্যায় দেশ ছেয়ে গেছে। সাধারণ লোক মনে করে, অদ্বৈত তত্ত্ব বোঝা বুদ্ধির সাধ্যাতীত; আসলে এটা যেন বোঝার কোন ব্যাপারই নয়, জগতের সঙ্গে বা জাগতিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে এর যেন কোন সম্পর্ক নেই। আমরা বলি, তা হবে কেন? অদ্বৈতবাদ এমন কিছু বলে নি যা বোঝাই যায় না। আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার বিচার-বিশ্লেষণ করেই অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কথা শুনে কেউ হয়তো হেসে বলবেন, হ্যাঁ, এটা একটা সংবাদই বটে। আমরা বলি, এ কথায় হাসি পাওয়ার কিছু নেই। যদি বিশ্বাস না হয় তবে অবধান করুন।

অদ্বৈতবাদের প্রথম ও মূল প্রস্তাব—ব্রহ্ম সত্যম্। এই মতবাদে আর যা কিছু বলা হয়েছে তা এই প্রথম প্রস্তাব থেকেই নিঃসৃত। সুতরাং অদ্বৈতবাদের নির্গলিতার্থ—ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। এবার আমরা চেষ্টা করে দেখি এ কথা বোঝা যায় কিনা।

ব্রহ্মই একমাত্র সত্য—এ কথা বুঝতে হলে প্রথম জানা দরকার সত্য বলতে কী বোঝায়। আমাদের ধারণা, সত্যের প্রকৃতি আলোচনা করলেই ব্রহ্মের কথা আপনি এসে যাবে। ব্রহ্মকে পেতে হলে এই ক্ষেত্রে রুদ্ধ কক্ষে তপস্যার প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন একটু ধৈর্যের।

অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, যা কোন না কোন সময়ে থাকে না তাকে সত্য বলা যায় না। সত্য হবে তাই যা কখনও নাই এমন হতে পারে না। যা চিরকাল থাকে, যা নাই এমন ভাবাই যায় না বা যার অভাব ভাবতে গেলেই তাকে স্বীকার করতে হয়, তারই নাম সত্য। যদি কেউ বলেন, এ কথার প্রমাণ কী? আমরা বলব, আমাদের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ। অবিশ্বাসীর তাতেও বিশ্বাস হবে না জানি। তাদের জন্যই বিস্তারিত করে বলি।

আমরা কখনও কখনও ভাষায় এমন শব্দ ব্যবহার করি যা কোন না কোন বস্তু সূচনা করে বলে মনে করি। আসলে কিন্তু এরা কোন বস্তুই বোঝায় না। 'আকাশ-কুসুম' 'বন্ধ্যাপুত্র' প্রভৃতি এই জাতীয় শব্দ। 'আকাশ-কুসুম' বা 'বন্ধ্যাপুত্র' বলতে কোন বস্তু বোঝায় কি? আকাশে কি কখনও কুসুম ফোটে? বন্ধ্যার কি কখনও পুত্র হয়? অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, এই জাতীয় শব্দ সম্পূর্ণ অসৎ বা অলীক বস্তু সূচনা করে। অর্থাৎ এই জাতীয় শব্দের যে বিষয় তা অসৎ।

কিন্তু, রজ্জুতে যখন লোকে সর্প দেখে, তখন সেই সর্পও কি অসৎ! অদ্বৈতবাদীদের মতে যা কখনই প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয় না, তাই অসৎ। অন্ধকার রাত্রিতে রজ্জুতে সর্প তো নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়। যদি তা প্রকাশিত না হয় তবে লোকে ভয় পায় কেন? ভয়ে কাঁপেই বা কেন? কেঁপে কেঁপে কখনও কখনও ছুটেই বা পালায় কেন? সুতরাং রজ্জুতে যে সর্প দেখি তা প্রকাশিত হয় বলে অসৎ নয়। কিন্তু, তা বলে কি এই সর্প সত্য? যখন আমরা আলো নিয়ে আসি তখন দেখি যেখানে সাপ দেখেছিলাম আসলে সেখানে একটা দড়ি পড়ে আছে। যদি সাপ সত্য হত তবে আলো নিয়ে আসার পরও নিশ্চয়ই তা সেখানে থাকত। সুতরাং রজ্জুতে যে সর্প দেখি তা সত্য নয়, অসত্য। তবে তা বন্ধ্যাপুত্রের মত অসত্য নয়। কেন নয়, তা তো আগেই বলেছি।

এখানে প্রশ্ন উঠবে, রজ্জুতে যে সর্প দেখি তা তো সত্য জ্ঞানের বিষয় নয়; সুতরাং রজ্জুতে সর্প যে সত্য নয়, এ আর বেশী কথা কি? যে যে ক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান সত্য হয় বলে ধারণা, সেই সেই জ্ঞানের বিষয়ও কি অসত্য? যদি তাও যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় তবে

না বলি একটা নূতন কথা হল। কিন্তু, তা কি আর প্রমাণ করা যায়? আমরা বলি, নিশ্চয়ই যায়।

আমাদের যত রকমের অভিজ্ঞতা হয় আমরা তাদের তিন ভাগে ভাগ করতে পারি:—স্বপ্নের অভিজ্ঞতা, জাগ্রতকালীন অভিজ্ঞতা ও সুষুপ্তির অভিজ্ঞতা। এই তিনটি ছাড়াও সাধারণতঃ আমাদের কোন অভিজ্ঞতা হয় কি? বোধ হয়, হয় না।

স্বপ্নের অভিজ্ঞতা রোমান্সের আলো-আঁধারি লীলায় রহস্যময়। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার মধ্যে যে একটা সুখের আমেজ আছে, তা আর অস্বীকার করবে কে? স্বপ্নে ভিখারীও রাজা হয়, রাজাও ভিখারী হয়। কিন্তু কবি বলেন—"নিশার স্বপন সুখে সুখী যে, কী সুখ তার? জাগে সে কাঁদিতে।" স্বপ্ন সত্য নয়। কিন্তু কেন নয়? কারণ, ঘুম থেকে জাগলেই স্বপ্নও থাকে না, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুও থাকে না। জাগ্রত অবস্থায় বুঝি, যদি স্বপ্ন সত্য হত তবে তা দিনের আলোয় এখনও থাকত। কিন্তু, যেহেতু নেই, সুতরাং সত্য নয়।

স্বপ্ন অসত্য হলেও জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাকে সাধারণতঃ আমরা মিথ্যা বলি না। কিন্তু কেন? যে কারণে স্বপ্নকে অসত্য বলি সেই কারণেই জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাকেও মিথ্যা বলতে হয়। স্বপ্নকে মিথ্যা বলি তার কারণ স্বপ্ন চিরকাল থাকে না। জাগ্রত অবস্থার অভিজ্ঞতাও কি চিরকাল থাকে? জগতের কোন বস্তু কি চিরস্থায়ী? এমন কি কোন বিষয় আছে জগতে যা কোনদিনই নাই এমন হয় না? কবি বলেছেন—"কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, ধন, মান।" কথাটা কবির কল্পনা নয়, বাস্তব। সমস্ত কিছুই এখানে চলে চলে যায় বলেই তো এটা জগৎ। এখানে সব কিছুই সরে সরে যায় বলেই এর নাম সংসার। সুতরাং এই জগৎ বা সংসার সত্য হবে কী করে?

এখানে প্রশ্ন ওঠে, সবই যদি অসত্য তবে সত্য কি কিছু নেই? আমরা বলি—আছে, তবে "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।" এবার অদ্বৈত বেদান্তীর শরণ নিই। তিনি বলেন, চিৎ বা চৈতন্যই সত্য। কারণ চিৎ বা চৈতন্য নেই এমন কথা ভাবাই যায় না। কথাটা খুলেই বলি।

চিৎ বা চৈতন্যের বিষয় স্থায়ী নয়, এমন কথা সহজেই বুঝি। স্বপ্নচৈতন্যের বিষয়, জাগ্রতচৈতন্যের বিষয় চিরস্থায়ী নয়, এ তো এই মাত্রই দেখলাম। কিন্তু, চৈতন্য সম্বন্ধেও এ কথা খাটে কি? চৈতন্য চিরস্থায়ী নয়, এ কথা ভাবতে বা বুঝতে গেলে চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কারণ, চৈতন্য ছাড়া কোন কিছু ভাবা বা বোঝা যায় কি? অচেতন লোক কোন কিছু ভাবতে বা বুঝতে পারে নাকি? আসলে চৈতন্য নেই বা চৈতন্য চিরস্থায়ী নয়, এমন কথা ভাবাই যায় না। সুতরাং চিৎ বা চৈতন্য সৎ বা সত্য।

এই চৈতন্য এক ও অবিভাজ্য। কিন্তু কেন? ভেবে দেখুন—'চৈতন্য বিভাজ্য' এ কথা বুঝবেন কী করে? এ কথা বুঝতে গেলে চৈতন্য দিয়েই তো বুঝতে হয়। সুতরাং এই ক্ষেত্রে চৈতন্যকে জ্ঞানের বিষয় করতে হবে। কিন্তু, জ্ঞান বা চৈতন্য কি কখনও জ্ঞান বা চৈতন্যের বিষয় হয়? জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় কি কখনও এক হতে পারে? যে আঙুল দিয়ে আমরা সব কিছু ধরতে পারি সেই আঙুল দিয়ে সেই আঙুলটিকে ধরা যাবে কি? সুতরাং চৈতন্য দিয়ে সব কিছু জানা যায়, কিন্তু চৈতন্য জানা যায় না। আর এই তো কারণ যার জন্য বলি চৈতন্য অবিভাজ্য। যা অবিভাজ্য তা কি কখনও বহু হয়? সুতরাং চৈতন্য এক।

সাধারণতঃ আমরা বিষয় ছাড়া চৈতন্য পাই না। চৈতন্য বলতেই কোন না কোন বিষয়ের চৈতন্য বোঝায়। কিন্তু আমরা যে 'চৈতন্যে'র কথা বলছি তার সঙ্গে বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ, যদি বিষয়ের সম্পর্ক থাকত তবে বিষয়ের বিভিন্নতা অনুসারে চৈতন্যও বিভিন্ন হত। 'টেবিলের চৈতন্য' আর 'চেয়ারের চৈতন্য' কি এক? কিন্তু আমাদের এই চৈতন্য এক। এখানে প্রশ্ন ওঠে, এমন চৈতন্য কোন অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় কি?

অদ্বৈত বেদান্তী বলেন, সুষুপ্তি অবস্থায় আমরা এই চৈতন্যের আভাস পাই। স্বপ্নহীন সুখনিদ্রাকে সুষুপ্তি বলে। অবশ্য এমন নিদ্রা খুব কম লোকের ভাগ্যেই জোটে। মানুষের জীবনের জটিলতা যত বাড়ছে তার সুখনিদ্রা ততই বিঘ্নিত হচ্ছে। তবুও এ কথা অস্বীকার

উশ্রী প্রপাতের ধারে

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

মধ্যাহ্ন স্তিমিত ক্লান্ত। অরণ্যের নীরন্ধ্র নির্মিতি
ম্লানচ্ছায়া অবলিপ্ত সমাহিত গম্ভীর নির্জন।
দিগন্ত-প্রান্তর ঘিরে পাহাড়ের উৎসঙ্গ প্রসার
সে প্রাঙ্গণে বসে শুনি ক্ষুব্ধ জলপ্রপাত গর্জন।

গর্বোদ্ধত প্রাণোচ্ছ্বাস উদ্বেলিত উন্মত্ত অধীর
বিদ্রোহী স্রোতের প্রাণ প্রকাশের ব্যথায় অস্থির।

মৃত্যুনীল স্তব্ধতায় বসে আছি প্রস্তরের বুকে
সম্মুখে কেবল বাজে ধ্রুপদের সুগম্ভীর নাদ,
অশান্ত অশ্রান্ত স্রোতে প্রত্যহের প্রবাহ-বিপ্লব
পর্বত প্রাচীর ভেঙে পেয়েছে সে মুক্তির আস্বাদ।

সমগ্র চেতনা নিয়ে প্রপাতের বিদ্রোহ সংগীত
শুনেছি বিস্মিত প্রাণে দূরান্তের আমরা যাত্রিক,
গম্ভীর নিঃস্বনমুর অবিচ্ছিন্ন স্রোতের ধারায়
পর্বত অরণ্য আর ভরে দিল দূর দিগ্বিদিক।
মহান বিপ্লব ধ্বনি এই জলপ্রপাতের বুকে
কোথা থেকে প্রাণ পেল অবিশ্বাস্য যৌবন কৌতুকে!

কতক্ষণ কেটে গেছে। ফিরে যাব। অপরাহ্ণ-আলো
নির্জন শালের বনে বিদায়ের বেদনা বিছালো।

করলে চলবে না যে, এখনও মানুষের সুষুপ্তি হয়। যদি তা না হত তবে মানুষ পাগল হয়ে যেত। কেন না কোন রাত্রিতে সুষুপ্তি নিশ্চয়ই হয়। এই সুষুপ্তির অভিজ্ঞতাটি কেমন ধারার?

সুখনিদ্রার সময় সুখনিদ্রাটি কেমন তা জানা যায় না। ঘুম ভাঙলে তবে বুঝি, কেমন ঘুম ঘুমিয়েছিলাম। সুষুপ্তির পর ঘুম ভাঙলে লোকে বলে, কাল রাত্রিতে বেশ সুনিদ্রা হয়েছিল, কিছুই টের পাই নি। সুষুপ্তি অবস্থার এই পরিচয় প্রণিধানযোগ্য।

সুষুপ্তিতে কোন বস্তুর জ্ঞানই থাকে না। সেইজন্যই বলি, কিছুই টের পাই নি। কিন্তু বস্তু ছিল না বলে জ্ঞান বা চৈতন্য ছিল না এমন কথা ঠিক নয়। জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকলে কিছুই টের পাই নি এই বোধ হল কী করে? সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, সুষুপ্তি অবস্থায় বিষয় ছাড়াই জ্ঞান থাকে। সুষুপ্তি আমাদের এক বাস্তব অভিজ্ঞতা। সুতরাং অভিজ্ঞতায় বিষয় ছাড়াও চৈতন্য পাওয়া যায়, এ কথা অস্বীকার করার আর উপায় কী?

সুষুপ্তিতে যে শুধু বিষয়হীন চৈতন্য পাওয়া যায়, তাই নয়। এই অবিষয় চৈতন্য আনন্দরূপ তাও বোঝা যায়। যদি এই চৈতন্য আনন্দরূপ না হত, তবে সুষুপ্তি ভাঙলে লোকে সুখনিদ্রার কথা বলবে কেন? 'সুখনিদ্রা হয়েছিল' এই কথা থেকেই বোঝা যায় স্বপ্নহীন নিদ্রায় যা পাই তা সুখ বা আনন্দরূপ। নইলে সুখ এল কোথা থেকে? এই মাত্র বলেছি, স্বপ্নহীন নিদ্রায় বিষয়হীন চৈতন্যই শুধু থাকে। সুতরাং এই চৈতন্যই আনন্দরূপ।

আগে আমরা দেখেছি, চিৎ বা চৈতন্যই সৎ বা সত্য। এমন দেখেছি, তা আনন্দরূপও বটে। অদ্বৈতবাদীরা এই চিৎ বা সৎ ও আনন্দ তারই নাম দিয়েছেন ব্রহ্ম। সদচিদানন্দং ব্রহ্ম। সুতরাং ব্রহ্মই সত্য, এ বিষয়ে আর সন্দেহ কী?

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, 'ব্রহ্ম সত্যম' এ কথা কোন অদ্ভুত দুর্বোধ্য কথা নয়। ব্রহ্ম বলতে কী বোঝায় এবং সত্যই বা কী, তা যদি জানা যায় তবে 'ব্রহ্ম সত্যম' বোঝা খুব একটা দুঃসাধ্য কর্ম নয়। কিন্তু, বোঝার চেষ্টা করে কে? সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা না করে গালাগাল দেওয়া কি নির্বুদ্ধিতা নয়? আমরা অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে বরাবরই এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে এসেছি। না বুঝে কথা বলা আমাদের অনেকেরই স্বভাব। কিন্তু, এই নির্বোধ স্বভাব পরিত্যাগ করাই উচিত।

শিমুল ফুল

সন্তোষকুমার দত্ত

রাস্তার বাঁকে এই শিমুলগাছটা অনেকদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকদিন হবে। আজ যেমন তার শাখাপ্রশাখায় অজস্র রক্তগুচ্ছের সমারোহ দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি বছর এমনই সময়ে ঠিক এই রকম সাজেই একে দেখা যায়। ফাগুনে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাল লাল ফুল ঝরে পড়ে। রাস্তার খানিকটা জায়গা লাল হয়ে যায়। পথচলতি মানুষ আনমনেও একবার চোখ তুলে তাকায়।

কিন্তু সে বছরে—একবার। কেবল এই সময়টা। তারপর শিমুলতুলো আর কচিপাতা দেখবার জন্যে কে আর আসে! ফুল থাকলে তবে তো মানুষের মনকে টানে!

রাধা ফুলতলায় এসে দাঁড়াল।

আজ এই শিমুলগাছটা আছে, অজস্র ফুলও আছে, কিন্তু যে ভালবাসত এই ফুল, সে আজ নেই। নেই মানে রাধার কাছে নেই—বোধ হয় মনের কাছেও নেই।

রাধা চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকায়। অন্যবারের থেকে এবারে ফুল হয়েছে অনেক বেশী। আর ফুলগুলো যেন একটু বেশী লালচে!

সে এগিয়ে এসে গাছের গোড়ায় দাঁড়াল। হাতটা গাছের গায়ে রেখেই তাড়াতাড়ি টেনে নিল। একটা কাঁটা ফুটে গিয়েছে। একটু একটু রক্ত বেরুচ্ছে।

রাধা হাতটা চেপে ধরে। রক্তের বিন্দু একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠে। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রাধা ভাবে, এবারের ফুলগুলো বোধ হয় রক্তের মত এমনই লাল!

চকিতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। একদিন এই ফুল পাড়তে এসে সুনীলের পা কেটে গিয়েছিল। রাধা নিজের কাপড় ছিঁড়ে তার পায়ের আঙুল বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, কী ঘন রক্ত তোমার!

সুনীল হেসেছিল: আর কত লাল দেখছিস।—কোঁচড়ে ভরা এক রাশ শিমুল ফুল সে তার মাথায় ফেলে দিয়েছিল: মিলিয়ে দেখ্, দেখি কোন্টা বেশী লাল!

রাধা লজ্জা পেয়েছিল সেদিন।

আর আজ সে কথা মনে করে—

হ্যাঁ, আজ শিমুলতলায় দাঁড়িয়ে শুধু সুনীলের কথাটাই তার মনে পড়ছে।

সুনীল। সেই সুনীল! গ্রামের আবহাওয়ায় মানুষ। সরল সুন্দর জোয়ান ছেলে। লেখাপড়া শিখেছিল মন্দ নয়। রাধা তাকে খুব পছন্দ করত।

সেই সুনীল শেষ পর্যন্ত—

শেষের কথা থাক্। আগের কথাটাই রাধা ভাবছে। এই নাম নিয়ে সুনীল তাকে কত রাগিয়েছে।

এই রাধি!

রাধি কেন! রাধালতা বলতে পার না?

না, পারি না! পারব না কোনদিন।—সুনীল স্পষ্ট উত্তর দিত: আমার সঙ্গে যাবি কিনা বল্?

বারে! এত বড় মেয়ে হয়েছি, বাড়িতে বকবে না!—রাধা চোখ তুলে সুনীলের দিকে চেয়ে থাকে।

অত কথা শুনতে চাই না।—সুনীলের স্বরে অধৈর্য দেখা দেয়: ফুল পাড়তে যাবি কিনা আমি শুনতে চাই?

না। তুমি ভেবে দেখ, যদি মা বকে।—কিশোরী মেয়ের গলায় সকাতর অনুনয়ের সুর।

কিন্তু তার শেষ কথা শোনবার আগেই সুনীল হনহন করে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। রাধা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এদিক-ওদিক তাকায় আর ভাবে, না, এখন কোন মতেই যাওয়া চলবে না। মা রয়েছে বাড়িতে। রাধার মন বিষণ্ণ হয়ে ওঠে।

সে এমন কী বড় হয়েছে যে মা তাকে বাইরে বেরুতে বারণ করেছে! কী এমন বয়েস তার! মোটে চোদ্দ বছর। এই বয়েসে বাইরে বেরুলে কী হয়? রাধা নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে। উত্তর পায় না। আরও কষ্ট হয় তার মনে।

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন— এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
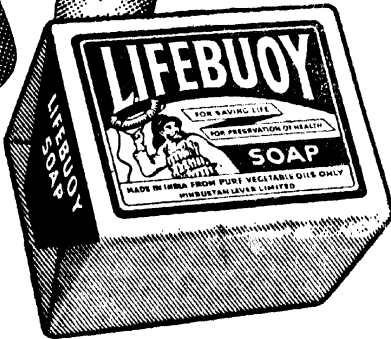
ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে পাশের বাগানে গিয়ে ঢোকে। একরাশ গাঁদা ফুল ফুটে রয়েছে। চিনে গাঁদা, পদ্ম গাঁদা, ভেলভেট কত রকমের। এটা রাধার নিজের শখের বাগান।

কতক্ষণ ফুলের দিকে তাকিয়ে ছিল কে জানে। বোধ হয় তার নেশা লেগেছিল। হঠাৎ রাধা চমকে ওঠে। গায়ের ওপর কী যেন পড়ছে! কতকগুলো কুটনোর খোসা গায়ের ওপর ফেলে দিয়েছে। নিশ্চয়ই ছোট ভাইটার কাজ।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রাধার ক্রোধ হাসিতে রূপান্তরিত হয়: তুমি!

বেড়ার ও-পাশে সুনীল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

ভাল করে তাকিয়ে রাধা দেখল, একরাশ শিমুল ফুল তার চারপাশে পড়ে রয়েছে।

নীচু হয়ে একটা ফুল তুলে নিয়ে দেখতে থাকে সে, সত্যি, কী সুন্দর! কত লাল এর পাপড়িগুলো!

কেন আমার জন্যে আনতে গেলে তুমি!—হাসিমুখে বেড়ার ওপাশে তাকাতে গিয়ে রাধা বিস্মিত হয়। ইতি-মধ্যে সুনীল কখন চলে গেছে সে জানতে পারে নি।

সেদিন রাধার মনে ভারী কষ্ট হয়েছিল। সুনীল কি এমনই করেই বার বার তার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে! কেন, কী এমন দোষ করেছে সে!

সেদিন রাধা বুঝতে পারে নি। বোঝবার মত বয়েস তার ছিল না। কিন্তু দু বছর পরে সুনীল যখন তার সামনে এসে বলেছিল, শুনেছিস রাধি, আমি কলকাতায় যাচ্ছি।

হ্যা।—রাধা সেদিন ছোট্ট করে মাথা নেড়েছিল।

সুনীলের মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। কোথাকার কোন্ শহরে গিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, তার থেকে এই বেশ ছিল।

রাধার ওই মিষ্টি হাসি আর পিঠভর্তি একরাশ কালো চুল সুনীলকে ভাবুক করে দেয়। তখন যেন সব ভুল হয়ে যায়। রাধার ওই কালো চুলের ঢেউ একবার মুঠো করে ধরবার অদম্য ইচ্ছা তার মনের মধ্যে ছটফট করে।

সেই সুনীল কলকাতা যাবার নামে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে রাধার মুখের দিকে চেয়ে তারপর বলেছিল, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। কেমন?

আচ্ছা।—রাধা মাথা নীচু করে জবাব দিয়েছিল।

তারপর মাথা তুলে দেখল সুনীল অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

সেই দিন—হ্যাঁ সেই দিনই রাধা তার দু বছর আগের প্রশ্নের জবাব পেয়েছিল।

সুনীল কিন্তু যত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলেছিল, তত তাড়াতাড়ি আসতে পারে নি। কারখানায় ছুটি কি সহজে মেলে! সপ্তাহে একদিন। সে দিনটা তার বড় কষ্ট হয়। রাধার কথা বার বার মনে পড়ে। এখানে এসে সুনীল দু বার সিনেমা দেখেছে। রাধার মুখখানা ঠিক ওই সিনেমার মেয়েদের মত সুন্দর। অমনই টানাটানা চোখ। রঙটাও বেশ ফরসা। তবে একটা বিষয়ে রাধা এখনও পেছিয়ে রয়েছে। শহরে মেয়েদের মত সাজগোজে সে এত রপ্ত হয়ে ওঠে নি। সুনীল ভাবে, বাড়ি গেলে সে রাধাকে এসব কথা বলবে। চিরকাল কি আর গেঁয়ো হয়ে থাকলে চলে!

সেই যাব-যাব করে যাওয়া হল বছর শেষের মাথায়। কিন্তু দেশ থেকে গিয়েছিল যে সুনীল, আর দেশে ফিরে এল যে, তার মধ্যে অনেকখানি ব্যবধান। এক বছরে তার রূপান্তর ঘটে গেছে।

গাঁয়ে ফেরবার পথে সুনীল দেখল শিমুলগাছটা তেমনই রয়েছে—ফুলে ভর্তি। লাল লাল রক্তগুচ্ছ তার সর্ব অঙ্গে। সে একবার চোখ তুলে তাকাল। গাছটায় অনেক ফুল ধরেছে।

সুনীল ভাবে, কলকাতার বড়লোকের বাড়ির বাগানে যে সব বিলিতি ফুল ফোটে, তার তুলনা হয় না। কেমন সুন্দর সব ফুল! কেমন রঙ!

রাধার সঙ্গে দেখা হল তাদের বাড়িতেই।

কেমন আছেন কাকীমা!—সুনীল বিকেলের দিকে তাদের বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল।

কে সুনীল! আয় বাবা, আয়। রাধার মা তাকে বসতে দেন: উঃ, কতদিন তুই দেশ ছাড়া! আয় বোস্।

রাধা ব্যস্ত হয়েই বেরিয়েছিল, কিন্তু সুনীলের দিকে চাইতেই তার বুকটা কেমন করে ওঠে।

এ কী চেহারা হয়েছে সুনীলের! আর এ কী সাজ! সাদা পা-জামার ওপর নীল রঙের সার্ট পরেছে। চোখের কোল বসা, পানের রঙে ঠোঁট লাল!

পরক্ষণেই রাধার মনে হল, হয়তো বা শহরের নিয়মই এই। সে কখনও শহরে যায় নি। জানবে কেমন করে!

কী রে রাধি, মস্ত বড় হয়ে উঠেছিস দেখছি!—সুনীল চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। রাধা লজ্জায় মাথা নীচু করে। মায়ের সামনে সুনীল তো কোনদিন এমনই নির্লজ্জের মত চাইত না।

পরের দিন রাধা বলল, এবারে কত শিমুল ফুল ফুটেছে দেখেছ!—কথাটা বলেই সে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। ওই শিমুলগাছটা যেন তাদের মিলনের সাথী। কতদিনের কত অলিখিত ইতিকথা—কত হাসি আর চোখের জলের নীরব সাক্ষী।

সুনীল বলে, এখনও ছেলেমানুষের মত ওই ফুল তোর ভাল লাগে!

তোমার লাগে না?—বিস্মিত রাধা পালটা প্রশ্ন করে।

সুনীল হাসে: বুঝলি রাধি, আমাদের কারখানার বড় সাহেবের বাগানে যে সব ফুল ফোটে, তুই দেখলে অবাক হয়ে যাবি। তার তুলনায় এ শিমুল ফুল—যেন চাঁদের কাছে জোনাকি।

উপমাটা সুনীলের নিজেরই ভাল লাগে। আত্মপ্রসাদের একটা অপূর্ব তৃপ্তি নিয়ে সে রাধার দিকে চেয়ে থাকে।

আবার আহত হয় রাধার মন। কলকাতায় গিয়ে সুনীলের বাচালতা বেড়েছে। এই সুনীল কী রকম মুখচোরা ছিল, তা ভাবতেই হাসি পায়।

সুনীলের কথা ভাবতে ভাবতে রাধা এক সময়ে শিমুলতলায় বসে পড়েছিল। এবার উঠে দাঁড়াল।

সেদিন যার কথা ভেবে তার হাসি পেয়েছে আজ তার কথা চিন্তা করতে চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে।

রাধা হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়। তারপর দূরের দিকে চেয়ে থাকে। ওই তো সামনেই সুনীলদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

সুনীল ওখানে আর কোনদিন ফিরে আসবে কিনা কে জানে! শহরের মোহ তাকে এমন করে পেয়ে বসবে, তা কি রাধা জানত। তা হলে তাকে আজ একা এমনই ভাবে শিমুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত না।

রাধা আপন মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

আর যদি বা ফিরে আসে তবে সে একা আসবে না। আসবে সেই ঘোমটা-টানা মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে। সে কথা মনে পড়তে রাধার চোখে জল এসে যায়।

কাল সকালে খবরটা এসেছে। সুনীল বিয়ে করছে। খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে।

সে মেয়েটা দেখতে কেমন কে জানে! নিশ্চয়ই রাধার চেয়ে সুন্দরী! না হলে কি আর সুনীল অমনই ভুলেছে!

গত বছর এমনই সময় সুনীল এসেছিল। তারপর বছর কেটে গেল—সে দেশে আসে নি। হঠাৎ কাল খবরটা এসেছে।

রাধা ভাবছে, সেবারে যখন সুনীল চলে যায়, সে জল আনবার ছুতো করে পথে বেরিয়েছিল। ঘাটের পাশ দিয়ে পথ। সুনীলকে দেখে ভরা কলসী নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল।

সুনীল বলেছিল, চললাম রাধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে রাধা বলেছিল, আবার এস। আসবে তো?

জলভরা চোখে সুনীলের দিকে সে তাকিয়েছিল।

আসব বইকি।—সুনীল হেসেছিল। তারপর রাস্তার বাঁকে গিয়ে রুমাল নেড়ে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল।

রাধা কি জানত যে, সুনীল সত্যিই তার কাছে থেকে বিদায় নেবে! শহরের লোকেরা কি সত্যিই অমনই রুমাল উড়িয়ে বিদায় দেয়! দেয় বইকি! না হলে সুনীল ওসব শিখল কোথা থেকে! অতখানি পরিবর্তন হলই বা কেন!

রাধা ভাবে, না জানি সে শহরটা কেমন! কী আছে সেখানে? কী এমন মায়া? কী এমন টান? কিসের লোভ—যার জন্যে সুনীল অমন হয়ে গেল?

রাধার বুক থেকে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।

হাতের দিকে নজর পড়তে সে দেখল রক্তটা এখনও রয়েছে। রাধার বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে। সুনীলকে পাবার জন্যে সে নিজের রক্ত পর্যন্ত দিতে পারত।

সেখানেই রাধার সবচেয়ে বড় অপমান। রূপ-যৌবনের প্রতিযোগিতায় শহরের মেয়ের কাছে তার হার হয়ে গেছে। বড্ড বেশী হার। তার জ্বালাটাও অনেকখানি।

রাধা এবার বাড়ির দিকে পা বাড়াল। আর কোন-দিন সে শিমুলতলায় আসবে না। এসে লাভ কী! মাঝখান থেকে স্মৃতির জ্বালায় মন পুড়বে।

কিন্তু যাবার আগে সে একবার থমকে দাঁড়াল। তারপর কী ভেবে একটা শিমুল ফুল কুড়িয়ে নিল। অভ্যাস মত ফুলটাকে খোঁপায় দিতে গিয়ে হাত নামিয়ে নিল।

না! সে আর কোনদিন শিমুল ফুল খোঁপায় দিতে পারবে না।

ফুলটাকে ফেলে দিয়ে দ্রুতপদে সে বাড়ি ফিরে চলল।

* * *

তারপর মাত্র একটি সপ্তাহ পার হয়েছে, আজ আবার রাধা ফুলতলায় এসে দাঁড়াল। মুখ যদি মনের প্রতিবিম্ব হয়, তা হলে আজ রাধাকে দেখলে অবাক হতে হবে। আজ সে অপরূপ সাজে সেজেছে। শুধু তাই নয়, তার মুখের রেখায় আর চোখের কটাক্ষে বিজয়িনীর দৃষ্টি। সে শিমুলতলায় এসেছে অন্য কোন কারণে নয়, শুধু একটা ফুল নিয়ে যেতে। হাঁ—মাত্র একটা ফুল। বর্ণে লাল—বর্ণনায় অপূর্ব। বড় দরকার তার।

ফুলতলায় দাঁড়িয়ে সে একবার ওপরের দিকে তাকাল। তারপর চোখ নামিয়ে একটুখানি হাসল।

হাসবে নাই বা কেন! আজ যে তার হাসির দিন। সেদিনের চোখের জলের দেনা আজ হাসি দিয়ে শোধ করবে, খুশীতে মন ভরিয়ে তুলবে, এই তার পণ।

ঠোঁট বেঁকিয়ে রাধা আবার একটু হাসল। কী বোকা সে। বোকা না তো কী!

আজকের ব্যাপারটা তো সে প্রথমে বুঝতেই পারে নি। অবাক হয়ে গিয়েছিল।

আজই দুপুরে: হঠাৎ কয়েকটা শাঁখের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল।

রাধা বিছানায় উঠে বসল। ব্যাপার কি!

তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে এসে শুনল, সুনীল তার নতুন বউ নিয়ে এসেছে।

পাড়ার আর পাঁচজন বউ-ঝিয়ের মত রাধা তাড়াতাড়ি সুনীলদের বাড়ির দিকে গেল। কিন্তু বাড়ির সামনে এসে তার পা উঠল না। দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

সুনীল নিয়ে এসেছে শহরের মেয়ে—না জানি কত সুন্দর! সাজ-পোশাকের কত আড়ম্বর! তার কাছে রাধা অতি তুচ্ছ।

ততক্ষণে বাড়ির মধ্যে বউ-দেখার হুল্লোড় পড়ে গেছে।

রাধা এবার মন ঠিক করে ফেলল, একবার নিজের চোখে বউকে সে দেখে আসবে। সেই সঙ্গে সুনীলকেও।

সুনীলের মুখে তৃপ্তির হাসিটা কেমন, সেটা অন্ততঃ তাকে দেখে বুঝে আসতে হবে। রাধার কষ্ট হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সুনীল তো সুখী হয়েছে!

পায়ে পায়ে সে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

তারপর?

তারপর যা হল, তা আর রাধা ভাবতে পারে না।

কালো রোগা যে মেয়েটা ঘোমটা দিয়ে বারান্দায় বসে রয়েছে, ওই কি সুনীলের বউ! মুখ বুজেও যে সামনের উঁচু দাঁত দুটোকে ঢাকা রাখতে পারছে না!

রাধার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমের ঘোরে সে স্বপ্ন দেখছে না তো! চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নিয়ে সে একেবারে বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ চোখ পড়ল ঘরের মধ্যে। সেখানে দাঁড়িয়ে সুনীল রাধার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। রাধার চোখের দৃষ্টি সুনীলের দৃষ্টির সামনে গিয়ে থেমে গেল।

কী দেখছে সুনীল! কী বলতে চায়!

রাধা দেখল, সুনীলের কালো চোখে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। অদ্ভুত, অপূর্ব সে দৃষ্টি। তার ব্যাখ্যা চলে না। পৃথিবীর সমস্ত প্রেমিকের বেদনা ঘনীভূত হয়ে যেন সেই দৃষ্টির মধ্যে ধরা দিয়েছে। এখুনি বোধ হয়—

সে দৃষ্টির সামনে রাধা আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। আজ একবার শিমুলতলায় যেতে চায় সে।

স্মৃতিকে মুছে ফেলতে সে চায় না। বরং তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

সুনীল—সেই সুনীল, অমন কুৎসিত একটা বউ এনেছে! মেয়েটা শুধু অসুন্দর নয়, শীর্ণ। রূপে, যৌবনে, এমন কি বোধ হয় মনেও!

কিন্তু সুনীলের মুখে তৃপ্তির হাসি সে দেখে নি। দেখেছে গভীর একটা ব্যথার ছাপ। এখানেই রাধা বিজয়িনী। এখানেই তার সান্ত্বনা।

রাধা একটা শিমুল ফুল তুলে নিয়ে যত্ন করে খোঁপায় পরতে গেল। কিন্তু হল না। চকিতে একটা কথা মনে পড়ে গেল। সুনীলকে দেখলে মনে হয় যেন বড় একা। তাই আজ তার চোখের দৃষ্টিতে শুধু ব্যথাই প্রকাশ পায় নি। অসহায়তাও দেখা দিয়েছে।

খোঁপায় ফুল দিয়ে সুনীলের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে অপমান করতে সে পারবে না।

তার থেকে এই ফুলটা তার হাতে দিয়ে সামনে থেকে সরে যাবে সে। সুনীলের সামনে আর কোনদিন দাঁড়াবার অধিকার তার থাকবে না।

ফুলটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সে একটুখানি দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর?

একটু আগে যে রাধা মুখে হাসি নিয়ে ফুলতলায় এসেছিল, এখন যাবার সময় চোখের কোণে এক ফোঁটা জল নিয়ে সে ফিরে চলল। মনে মনে শপথ করল, আর কোনদিন শিমুলতলায় সে আসবে না।

যুগান্তরকারী উপন্যাস

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

উপন্যাসের উৎকর্ষ বিচারে আমাদের সমালোচকেরা অনেক সময় শিথিলভাবে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করে থাকেন। কোন একটা বিশেষ দিক থেকে উপন্যাসটি একটু ভাল লাগলেই তখনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন—"বইখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস হয়েছে।" অথচ উপন্যাস বিচারে 'যুগান্তরকারী' কথাটি কতটা অর্থবহ সে কথা তাঁরা চিন্তাও করেন না। বর্তমান প্রবন্ধে যুগান্তরকারী উপন্যাসের স্বরূপলক্ষণ কী, পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যে যুগান্তরকারী উপন্যাস কাকে বলা চলে তার একটা মোটামুটি পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। এ ক্ষুদ্র নিবন্ধের স্বল্প পরিসরে এ পরিচয় যে নিতান্ত অসম্পূর্ণ হবে তা বলাই বাহুল্য।

ভাবাদর্শ, জীবনজিজ্ঞাসা, চরিত্রবিশ্লেষণ বা টেকনিকের অভিনবত্বে যখন কোন উপন্যাস সমসাময়িক এবং পরবর্তী কথাশিল্পী বা সমাজ-জীবনের ওপর অনতিক্রমণীয় প্রভাব বিস্তার করে তখন তাকে বলা চলে যুগান্তরকারী উপন্যাস।

এ শ্রেণীর উপন্যাস সমকালীন বা উত্তরকালের ঔপন্যাসিকের মনে যে শুধু সৃষ্টিপ্রেরণার সঞ্চার করে তা নয়, সকল যুগের সাহিত্যপাঠকের সদাজাগ্রত চৈতন্যকে চকিত করে নতুন ভাবধারা ও রূপাঙ্গিকের স্পর্শে। মহৎ ভাবাদর্শের প্রেরণায় কখনও পাঠকের মন হয় উদ্দীপ্ত, আবার কখনও নতুন টেকনিকের ঔজ্জ্বল্যে শিল্পী খুঁজে পায় নবসৃষ্টির ইঙ্গিত। এ ধরনের উপন্যাস সব সময় মহৎ সৃষ্টির পর্যায়ে উন্নীত না হলেও যে অনন্য সৃষ্টি হয়ে ওঠে এবং সমসাময়িক সৃষ্টিমূলক সাহিত্যের গতিনির্ণয়ে সহায়তা করে তা নিঃসন্দেহ।

উদাহরণস্বরূপ ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্যামুয়েল রিচার্ডসনের একখানি উপন্যাসের কথা ধরা যাক। রিচার্ডসনের মননশক্তি ছিল সীমাবদ্ধ; এ ছাড়া আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রিচার্ডসনকে মনে হবে একজন বিরক্তিকর তরল ভাবপ্রবণ লেখক হিসেবে। কিন্তু মননশক্তির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তিনি সে যুগে এমন একখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন যার প্রভাব রুশোর মত মননশীল ব্যক্তিকেও উদ্বুদ্ধ করেছিল এরূপ একখানি বই লিখতে যা নাকি একযুগব্যাপী পাঠকের মনকে বেদনার্দ্র করে রেখেছিল। রিচার্ডসনের এই উপন্যাসখানির নাম হল 'ক্লেরিসা' (Clarissa)। প্রকাশকাল: ১৭৪৮ সন। আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসখানিকে সৃষ্টি হিসেবে উচ্চ শ্রেণীর মনে না হলেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তাঁর যুগবিচারে উপন্যাসখানি অনন্য সৃষ্টি; এ অনন্যতার মূল কারণ হল সাম্যবাদী ভাবের ক্রমবিকাশের ধারায় এই উপন্যাসখানির দান অমূল্য। এটা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন লেখক একটি ঝিকে তাঁর রোমান্সের নায়িকা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। প্রধানতঃ সে যুগের মেয়েদের জন্যই তিনি উক্ত উপন্যাসখানি লিখেছিলেন, এবং সে হিসেবে উপন্যাসখানি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছিল সন্দেহ নেই। টেকনিকের দিক দিয়েও উপন্যাসখানি একটি অভিনবত্বের দাবি করতে পারে, কারণ তিনিই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ঔপন্যাসিক, যিনি পূর্ব শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কথাকার ডিফোর আত্মকথা-বর্ণনামূলক কথা বলবার ভঙ্গীকে বর্জন করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে গল্প বলার রীতির প্রবর্তন করেন; এই রূপাঙ্গিকের সাহায্যে চরিত্রগুলির মনোবিশ্লেষণেও তিনি অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সমসাময়িককালে এই উপন্যাসখানি ইংলণ্ড ও কন্টিনেন্টে কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আলোচনার যোগ্য। উপন্যাসখানি শুধু যে সমকালীন ইংরেজের অন্তরে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা নয়, সমসাময়িক কালের জার্মানী ও ফ্রান্সের পাঠকও এই বইখানি পড়ে যথেষ্ট চোখের জল ফেলেছিল। ফরাসীতে বইখানির অনুবাদ হয়েছিল, আর সমস্ত কন্টিনেন্টে এই ধরনের উপন্যাস লেখার একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক দিদেরো

(Diderot) রিচার্ডসনের প্রতিভাকে মোসেস (Moses), হোমার, ইউরিপিডিস ও সফোক্লিসের সঙ্গে তুলনা করতেও কুণ্ঠিত হন নি। ফরাসী কবি আল্‌ফ্রেড দ্য মুসে (Alfred de Musset) প্রবল ভাবাবেগে উপন্যাসখানিকে জগতের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বর্ণনা করে গেছেন। ফরাসী দেশের পাঠিকাদের ওপর এই উপন্যাসখানি যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল, সে সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। Madame de Stael নামে একজন গভীর আবেগপ্রবণ মহিলা রিচার্ডসনের মৃত্যুর পর প্যারী থেকে লণ্ডনে আসেন শুধু নারীদরদী রিচার্ডসনের সমাধির ওপর বসে একটু কাঁদবার জন্যে। লণ্ডনে এসে ওঠেন তিনি গোল্ডেন ক্রস হোটেলে ; পরদিন সকালে ফ্লিট স্ট্রীটের সেণ্ট ব্রাইড সমাধিক্ষেত্রে এসে রিচার্ডসনের সমাধির কাছে বসে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। পরে অবশ্য তিনি জানতে পারেন যে, যে সমাধির ওপর তিনি এত অশ্রুবর্ষণ করেছেন, সে সমাধি প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রিচার্ডসনের সমাধি নয়, সম্পূর্ণ অসাহিত্যিক রিচার্ডসন নামক একজন কসাইয়ের সমাধি মাত্র।

রিচার্ডসনের তরল ভাবালুতামুক্ত বাস্তব-জীবনের ছায়াপাতে জীবন্ত উপন্যাস সৃষ্টি করে ইংরেজী উপন্যাস রচনার মোড় ঘুরিয়ে দেন হেনরি ফিল্ডিং খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। সে হিসেবে তাঁর টম জোন্স (Tom Jones, ১৭৪৯) একখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক টম জোন্সের জীবনে দোষত্রুটির সীমাসংখ্যা নেই—সে লম্পট, মদ্যপ, ক্রীড়াসক্ত ; কিন্তু এ সমস্ত দোষদুর্বলতা সত্ত্বেও জোন্স সাহসী, বদান্য ও ভদ্র—ভালমন্দের সমবায়ে টম জোন্স মানুষ। এই "মানুষে"র চরিত্র সৃষ্টি করে ফিল্ডিং ইংরেজী সাহিত্যে এক নতুন আদর্শ স্থাপন করলেন। বাস্তবজীবনের চিত্রকর হিসেবে হ্যাজলিট ফিল্ডিংকে তুলনা করেছেন হগার্থের (Hogarth) সঙ্গে ; আর মানবপ্রকৃতি-সন্ধানী দ্রষ্টা হিসেবে তাঁর স্থান নির্দেশ করেছেন শেক্সপীয়রের কিছু নিয়ে।*

ইংরেজী উপন্যাসের আবার মোড় ঘুরল ওয়াল্টার স্কটের প্রতিভা স্পর্শে। ১৮১৪ সনে তাঁর রচিত Waverly Novels প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল জনপ্রিয় রচনা হিসেবে উপন্যাসটি সমসাময়িক আর সমস্ত সাহিত্য-শিল্পকে হার মানিয়েছে। রিচার্ডসন আর ফিল্ডিংয়ের রচনার অনুকরণপ্রিয়তা অন্ততঃ সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হয়েছে, মিসেস র‍্যাডক্লিফের রোমান্সগুলো তাদের অভিনবত্ব হারিয়েছে, মারিয়া এজওয়ার্থ (Maria Edgeworth) আর লোকে পড়ে না। স্কটের Waverly প্রকাশের পূর্বে যেখানে উপন্যাস-পাঠক ছিল শত শত, Waverly প্রকাশের পর সেখানে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেল হাজারে হাজারে। স্কটের Waverly উপন্যাসকে নিঃসন্দেহে যুগান্তরকারী উপন্যাস বলে অভিহিত করা চলে।

কী সে স্কটের জাদুমন্ত্র যার সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডের অগণ্য পাঠককে মাতিয়ে তুললেন ? সে জাদু হল জীবনের তুচ্ছ পারিপার্শ্বিকতার ঊর্ধ্বে যে পরম আস্বাদ্য রোমাণ্টিক স্বর্গলোক বিরাজ করে সুদূরপ্রসারী কল্পনার সাহায্যে সে স্বপ্নরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলেন তিনি অগণিত পাঠকের সামনে। ইংরেজী উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে স্কট বিদ্রোহী, এ বিদ্রোহ গতানুগতিক যুক্তিপূর্ণ রচনার বিরুদ্ধে,—তাঁর উপন্যাস ফিল্ডিংয়ের বাস্তবতা আর রিচার্ডসনের তরল ভাবালুতার বিরুদ্ধে যেন মূর্ত প্রতিবাদ। তাঁর কল্পনা পাঠকের মনকে সবেগে টেনে নিয়ে গেল যেন সামনের আলোকিত রাজপথ থেকে সুদূর পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায়। উপন্যাস-শিল্পে এই নতুন প্রাণপ্রবাহ সৃষ্টির জন্য স্কট ইংরেজী সাহিত্যে রোমাণ্টিক আন্দোলনের অন্যতম নায়করূপে পরিচিত।

স্কটের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনা যথাযথভাবে অনুসৃত হয় নি এ কথা খুবই সত্য, কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাকে ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় স্থাপন করে তিনি সমসাময়িক পাঠককে বিস্মিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর উপন্যাসের ঘটনাবলী অনুধাবন করলে দেখা যাবে, সুদীর্ঘ আট শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত সে সমস্ত ঘটনা। উন্মুক্ত জীবনপরিবেশকে ভালবাসতেন স্কট, সক্রিয় মানুষের বীরকীর্তিগুলো আকর্ষণ করেছিল তাঁর অন্তরের অন্তহীন শ্রদ্ধা, অথচ সরল মানুষের সহজ জীবনযাত্রাও

* "As a painter of real life he was equal to Hogarth, as a mere observer of human nature, he was little inferior to Shakespeare."—Hazlitt.

অর্জন করেছিল তাঁর অকুণ্ঠ প্রীতি। সেজন্য সাহিত্যক্ষেত্রে স্কটের স্থান অপ্রতিহত—আজও কাহিনীকার হিসাবে স্কটের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সমসাময়িক ইংরেজ ও ফরাসী রোমান্টিক ঔপন্যাসিকদের ওপর স্কটের প্রভাব প্রত্যক্ষ। অন্ততঃ ত্রিশ বছর যাবৎ প্রখ্যাত ফরাসী কবি-ঔপন্যাসিক ভিক্টোর হিউগো ছিলেন স্কটের ভাবশিষ্য। স্কটের উপন্যাস-রচনারীতি অনুসরণ করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন James, Ainsworth, Lytton, Kingsley, Victor Hugo আর Dumas। জনৈক সমালোচকের মতে উত্তরকালের মানুষ দান্তে, সেক্সপীয়র ও ডিকেন্সের কাছে যতটা ঋণী স্কটের কাছে তার চাইতে কম ঋণী নয়।*

ভিক্টোরীয় যুগে ডিকেন্সের যুগান্তরকারী উপন্যাস প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী উপন্যাসের গতিপথ আবার পরিবর্তিত হল। স্কট-প্রদর্শিত রোমান্টিক স্বর্গলোক থেকে পাঠকের দৃষ্টিকে তিনি সবলে আকর্ষণ করলেন নির্যাতিত মানবতার দিকে। বিপুলকায় লণ্ডন শহরের রাস্তায় রাস্তায় যে বঞ্চিতের দল ঘুরে বেড়ায়, ফ্যাক্টরীর যে সমস্ত শ্রমিক গ্লানিকর জীবন যাপন করে, আর নগরীর অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি-ঘুপচিতে যে অসংখ্য মানুষ অখ্যাত জীবন যাপন করে তাদের বেদনার বাণীকে মুখর করে তুলেছিলেন ডিকেন্স তাঁর দীপ্ত বর্ণনা ও ট্র্যাজিক হিউমার দিয়ে। তাঁর উপন্যাসেই ভিক্টোরীয় যুগের সমাজ-চেতনা প্রথম সার্থক রূপ পেল। সাম্যবাদী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ডিকেন্স তাঁর উপন্যাসের মাধ্যমে নীতিপ্রচার করেছিলেন সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রচারধর্মকে শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করতে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন, সে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ডিকেন্স। যে মহৎ উপন্যাস-শিল্পে ভিক্টোরীয় যুগ সমৃদ্ধ তার পথিকৃৎ ডিকেন্স। ডিকেন্সের উপন্যাস স্থানে স্থানে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে দুর্বল সন্দেহ নেই, কিন্তু যে জীবনচেতনায় তাঁর উপন্যাসগুলো স্পন্দমান, তাতে সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রম্পটন-রিকেটের ভাষায় এ কথা বলা চলে, কালের পরিবর্তনে সেগুলো কখনও পুরনো হবে না, বা সামাজিক রীতির পরিবর্তনে সেগুলো কখনও তার বৈচিত্র্য হারাবে না।† তুচ্ছ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সাধারণ লোকের জীবনকাহিনী বলার ক্ষেত্রে ডিকেন্স এখনও উল্লেখযোগ্য শিল্পী, তাঁর প্রদর্শিত রীতি অনুসরণ করে তাঁর যুগে ও পরবর্তীকালে আরও কত সার্থক শিল্পী ইংরেজী উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছেন; কিন্তু ডিকেন্সের প্রতিভা এখনও অম্লান। Pickwick Papers থেকে তাঁর শেষ অসমাপ্ত রচনা Edwin Drood পর্যন্ত প্রায় সমস্ত রচনাই সশ্রদ্ধ উল্লেখের দাবি রাখলেও ডিকেন্সের David Copperfield নিঃসন্দেহে একখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি ডিকেন্সের প্রথম সংঘাতপূর্ণ জীবনের ছায়াপাতে জীবন্ত; এ ছাড়া এই উপন্যাসের আরও অনেক অংশ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তাই এই জীবনধর্মী উপন্যাস ডিকেন্সকে ইংরেজী সাহিত্যে অমরত্ব দান করেছে।

ভিক্টোরীয় যুগের শেষ পর্যায়ে যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে বিখ্যাত হন শার্লোট ব্রন্টে ও টমাস হার্ডি। ব্রন্টের 'জেন আয়ার' (Jane Eyre ১৮৪৭) নিঃসন্দেহে একখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস। তিনটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রন্টে ইংরেজী উপন্যাস-জগতে এই অসাধ্যসাধন করতে সক্ষম হন। প্রথমতঃ তাঁর রচনার অন্তরঙ্গ ভঙ্গী। এলিজাবেথীয় যুগের উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক—যেমন ডিফো, রিচার্ডসন, ফিল্ডিং, স্টার্ন, স্মলেট, বা গোল্ডস্মিথ—এঁরা সকলেই যেন পাঠক-সমাজ থেকে একটু দূরত্ব রক্ষা করে তাঁদের কাহিনী শোনাচ্ছেন; এমন কি স্কটের ভেতরও অন্তরঙ্গতার সুর নেই। জেন অস্টেনও কাহিনী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছেন। ডিকেন্স অবশ্য তাঁর রচনার ভেতর সহজ আনন্দময় ও বন্ধুত্বের সুরটি বজায় রেখেছেন, কিন্তু 'জেন আয়ার' উপন্যাসে ব্রন্টে যে সুরটি যোজনা করলেন সে সুর ইংরেজী উপন্যাসে অভিনব—সে সুর নিবিড় অন্তরঙ্গতায় ভরা—নিজেকে যেন সমস্ত উপন্যাসের ভেতর বিস্তার করে দিয়েছেন ব্রন্টে। সমস্ত উপন্যাসটি লেখিকার ব্যক্তিত্বের সৌরভে আকর্ষণীয়।

ব্রন্টের উপন্যাসের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তাঁর অগ্নিগর্ভ আবেগ প্রকাশের (note of passion) তীব্রতা। নারীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে জীবনকে দেখার দুঃসাহস ব্রন্টের আগে আর কেউ করেন নি। নিঃসঙ্গ অবদমিত নারীত্বকে এতটা গভীর আবেগের তীব্রতা দিয়ে শুধু তাঁর যুগে কেন, আধুনিক স্বাধীন ভাবপ্রকাশের যুগেও খুব কম লোকই ফোটাতে পেরেছেন। নারীও যে মানুষ, তারও যে ভাবনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা আছে—এ সত্যের গভীর উপলব্ধি ব্রন্টের উপন্যাস।

একটা প্রবল বিদ্রোহের চেতনা ব্রন্টের উপন্যাসের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর অন্তরের বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছে বিভিন্ন ধারায়। প্রথমতঃ উপন্যাসের নায়িকা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন; দ্বিতীয়তঃ, জীবনধারায় নারীর স্থান সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাকে তিনি উল্টিয়ে দেন; তৃতীয়তঃ, জীবন-পরিবেশে

---

* Posterity owes him nearly as great a debt as it owes to Dante, Shakespeare and Dickens—The Outline of Literature, Ed. by John Drinkwater, Pp. 464.

† Age cannot wither them nor custom stale their infinite variety.—A History of English Literature, [illegible]

তিনি যে অস্বাভাবিকতা কুটিলতা ও নির্মমতা দেখেছিলেন, তাকে ফুটিয়ে তোলেন জীবন্ত রেখায়। নারী শুধু মাত্র মোমের পুতুল—পুরুষের বহুকালপ্রচলিত এ ধরনের ধারনার মূলে, কঠোর আঘাত করেন তস্তে প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নারীচরিত্র সৃষ্টি করে।

ভিক্টোরীয় যুগের শেষ যুগান্তরকারী উপন্যাস-লেখক টমাস হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮)। প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য শক্তির কাছে মানবজীবনের ব্যর্থতা, প্রকৃতির বিরাটত্বের কাছে মানুষের ক্ষুদ্রতা, দৈবের অনতিক্রমণীয় শক্তিকে এড়িয়ে যাবার জন্য মানুষের অসার্থক প্রয়াস—হার্ডির উপন্যাসকে মহাকাব্যের গৌরব দান করেছে। গভীর জীবন-চেতনার সাহায্যে হার্ডি উপলব্ধি করেছিলেন, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষ সংস্কারের দ্বারা অন্ধ ; তাই মানবচরিত্রের গভীরতম রহস্য সন্ধান করতে হলে যেতে হবে আদিম প্রকৃতির বুকে প্রতিপালিত সাধারণ মানুষের মধ্যে। সেজন্য আমরা দেখতে পাই, মানবপ্রকৃতির এ আদিম রূপের রহস্য উপলব্ধির জন্যে জীবনের অনেক সময় কাটিয়েছেন হার্ডি লণ্ডনের সভ্য নাগরিক জীবন থেকে দূরে ওয়েসেক্সের জলাভূমিতে ও গোচারণভূমিতে, আর উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি আদিম প্রকৃতির লীলানিকেতন প্রাচীন ওয়েসেক্সের এগ্‌ডন হিদ্‌। একটা দেশের একটা ক্ষুদ্র অঞ্চলকে কোন মহৎ উপন্যাসের পটভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করেন নি আর কোন ঔপন্যাসিক, যেমন করেছেন হার্ডি তাঁর যুগান্তরকারী উপন্যাস The Return of the Native-এ (১৮৭৮)। এই উপন্যাসখানি পড়তে গিয়ে প্রথমেই মনে হবে, যেখানে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য মানবচরিত্রের অতলান্ত রহস্য উদ্ঘাটন, সেখানে উপন্যাসের পটভূমিকা এত সীমাবদ্ধ কেন ? কিন্তু কথাটা ভোলা উচিত নয় যে, বিস্তৃত ও গভীর জীবনবোধের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্যে পটভূমিকার বিস্তার ততখানি অপরিহার্য নয়, যতখানি প্রয়োজন মানবচরিত্র সম্পর্কে লেখকের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি। অনুভূতির যদি গভীরতা থাকে তা হলে সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যেও মানবজীবনের সমস্ত বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করা সম্ভব। হার্ডি ছিলেন মানবচরিত্রের সেই গভীর অনুভূতিশীল পাঠক ; তাই তিনি সমস্ত জগৎকে, মানবজীবনের সমস্ত গৌরব ও ব্যর্থতাকে প্রতিবিম্বিত দেখতে পেয়েছিলেন এগ্‌ডন হিদের (Egdon Heath) ক্ষুদ্র পরিধিতে।

দার্শনিকের দৃষ্টি নিয়ে হার্ডি দেখেছেন ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে। পটভূমিকা সৃষ্টির দিক দিয়ে হার্ডি ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অদ্বিতীয়। The Return of the Native-এর পটভূমিকা Egdon Heath শুধু মাত্র একটি ভৌগোলিক স্থান মাত্র নয়, একটা অশরীরী আত্মার মত এই স্থানটি সমস্ত উপন্যাসের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে, আর চরিত্রগুলির অন্তর্লোক উদ্ঘাটনে সক্রিয় সহায়তা করেছে। হার্ডির প্রতিভার স্পর্শে প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্যও অর্জন করেছে একটা স্বতন্ত্র ও অধ্যাত্ম সত্তা—ইংরেজী সাহিত্যে যার তুলনা আর মেলে না। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে এই ছিল হার্ডির দৃষ্টি—এ দৃষ্টি দিয়েই তিনি দেখেছিলেন ওয়েসেক্সের কৃষক-জীবনকে, আর এ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন মানবচরিত্রের গভীরে। ইংরেজী উপন্যাসের ক্ষেত্রে হার্ডির প্রতিভা অনন্য এতে সন্দেহ নেই।

১৯১৪ থেকে ১৯৩৯ সন অবধি (দুটো মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী) ইংলণ্ডে যে যুগ চলছিল তাকে বলা চলে একটা বিপর্যয়ের যুগ। এ বিপর্যয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল অর্থনৈতিক, নৈতিক ও মননশীলতার ক্ষেত্রে। এ বিপর্যয়ের ফলে সাহিত্য রচনার উপাদানেও এল জটিলতা ; আর ঔপন্যাসিককেও উপন্যাস রচনায় এমন একটা টেকনিক উদ্ভাবন করতে হল যার মধ্যে জীবন সম্পর্কে সমস্ত ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া চলে। এ পর্যন্ত নাটকে, রচনা-প্রবন্ধে, বা দীর্ঘ কবিতায় জীবন সম্বন্ধে যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে রূপ দেওয়া হত তাও অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল অভিনব টেকনিকে রচিত উপন্যাসে। উপন্যাসের আঙ্গিক হয়ে উঠল অনেকটা হোল্ড অলের (hold all) মত, যার মধ্যে সব রকমের চিন্তা-ভাবনাকে ঢুকিয়ে দেওয়া চলে।

এ নতুন টেকনিকে উপন্যাস রচনা করে ইংরেজী উপন্যাস-জগতে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিলেন জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১)। তাঁর এই যুগান্তরকারী উপন্যাসের নাম হল Ulysses। ১৯১৪ সনে এই উপন্যাস রচনা শুরু করতে গিয়ে জয়েসের মনে এই ইচ্ছাটা প্রচ্ছন্ন ছিল, "Police notwithstanding, I should like to put everything in my novel"। বাস্তবিকই বইখানা ছাপা হবার আগে যখন পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়েছিল তখন আমেরিকার কোর্টের নির্দেশে সে প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। আট বছর পরে বইখানি প্রকাশিত হয় প্যারিসে ১৯২২ সনে ; আর দীর্ঘ বিশ বছরের আগে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা বইখানিকে ইংলণ্ডে প্রকাশ করতে বা বিক্রি করতে অনুমতি দেয় নি।

ডাবলিনের কয়েকটি লোকের জীবনের একটি দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে (১৬ই জুন, ১৯০৪) এই উপন্যাসখানি লিখিত। তাঁদের চিন্তাধারা ও জীবনের কর্মধারাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে এই উপন্যাসে অত্যন্ত বিচিত্র ভাবে এবং বিস্তৃত কৌশলের সাহায্যে। এ কলাকৌশলের অধিকাংশই ইংরেজী উপন্যাস-জগতে অভিনব। এ অভিনবত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল বিষয়বস্তুর চাইতে প্রকাশভঙ্গীর ওপর গুরুত্ব অর্পণ। শব্দ ব্যবহারে অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন জয়েস এই উপন্যাসে শব্দগুলোকে ভেঙে ; সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে শব্দার্থে নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন তিনি ; নতুন রূপাঙ্গিকে উপন্যাস

রচনায় এরূপ শব্দসৃষ্টির উপযোগিতা প্রমাণ করেছেন জয়েস এই উপন্যাসে। নির্জ্ঞান (unconscious) মনের স্বরূপ উদ্ঘাটনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তিনি তাঁর এই অদ্ভুত শিল্পকর্মে। কোথাও কোথাও আবার তিনি অবতরণ করেছেন মানুষের অবচেতন মনের অন্ধ গুহায়। সম্পূর্ণ নতুন টেকনিকে রচিত জয়েসের উক্ত উপন্যাসখানি তাঁর যুগের ঔপন্যাসিকদের রচনার ওপর বিস্তার করেছে একটি অনতিক্রমণীয় প্রভাব। এই উপন্যাসের সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা চিন্তা করে একজন সাহিত্যিক মন্তব্য করেছেন—"...writers who have never read it—perhaps never heard of it—have yet been influenced by it in one way or another."

শুধু ইংরেজী সাহিত্যে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও এরূপ যুগান্তরকারী উপন্যাসের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম ঔপন্যাসিক Gustave Flaubert তাঁর আপাত-দুর্নীতিমূলক উপন্যাস Madame Bovary লেখার জন্য আইনের দায়ে পড়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই উপন্যাসে বুর্জোয়া সমাজের মনোবৃত্তির তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনায় তিনি যে বাস্তবসচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তা পরবর্তীকালে ফরাসী ঔপন্যাসিকদের ওপর দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। গী দ্য মোপাসাঁ, গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়, জোলা, দোদে প্রভৃতি ফরাসী বাস্তববাদী ঔপন্যাসিক তো তাঁর সাহিত্যশিষ্য-শ্রেণীভুক্তই হয়েছিলেন, এ ছাড়া আধুনিক ফরাসী বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে খুব কম লেখকই আছেন যিনি ফ্লবেয়ারকে সাহিত্যগুরু বলে স্বীকার করেন না।

নিছক বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনা করে এ যুগে পৃথিবীতে খ্যাতিমান হয়েছেন রাশিয়ার অমর কথাশিল্পী Count Leo Tolstoy (১৮২৮-১৯১০)। রাশিয়ার ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমিকায় রচিত তাঁর সুবিখ্যাত উপন্যাস War and Peace শুধু রাশিয়ার সাহিত্যে নয়—পৃথিবীর উপন্যাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ। মহাকাব্যের বিরাট বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণের সংক্ষুব্ধ জীবনের পটভূমিকায় মানবজীবনের আদর্শ অনুসন্ধান করেছেন টলস্টয় এই মহা-উপন্যাসে। মানবজীবনের এই আদর্শ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা শুধু যে তাঁর সমকালীন রাশিয়ার লেখকদের অন্তরে বিরাট অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল তা নয়, সমস্ত পৃথিবীর মননশীল লেখক ও শান্তিবাদীদের মনেও জাগিয়ে তুলেছে মানবজীবনের আদর্শ সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন। রমাঁ রলাঁর (Romain Rolland) মত ফরাসী মানববাদী জীবন-শিল্পী প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন টলস্টয়ের জীবনাদর্শের দ্বারা। রলাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস জাঁ ক্রিস্তফের (Jean Christophe) ওপর টলস্টয়ের জীবনাদর্শের প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। বর্তমান কালে দ্বন্দ্বমুখর ও প্রতিক্রিয়াশীল মানবপ্রবৃত্তির পটভূমিকায় মানবজীবনের শ্রেয় ও কল্যাণবোধের যে আদর্শ অনুসন্ধান-চেষ্টা চলছে সমস্ত জগৎব্যাপী, তার পথিকৃৎ জীবনশিল্পী টলস্টয়। মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এই বইখানির মত এত লোকপ্রিয়তা বোধ হয় আর কোন উপন্যাস লাভ করে নি; অনেক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকও এই উপন্যাসখানিকে বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে অভিহিত করতে দ্বিধা করেন নি। বর্তমান পৃথিবীর উপন্যাসশিল্প-জগতে একটা নতুন যুগের বাণী বহন করে এনেছে টলস্টয়ের এই যুগান্তরকারী উপন্যাসখানি।

শুধু আদর্শবাদ নয়, শুধু বাস্তববাদও নয়, উপন্যাস-শিল্পের সঙ্গে মননধর্ম যুক্ত করে আধুনিক জীবনবাদী উপন্যাস রচনার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান (১৮৭৫) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস Magic Mountain-এ। এ হিসেবে এই উপন্যাসখানিকে বলা চলে যুগান্তরকারী উপন্যাস। আধুনিক জীবনের উৎকেন্দ্রিকতার ফলে বিশ্ববিধানে যে ভাঙন-প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে, মানবসমাজের সে বেদনাবহ পরিণাম মানকে অনুপ্রাণিত করেছিল এই যুগান্তরকারী উপন্যাস রচনায়। দীর্ঘ দশ বছর লেগেছিল উপন্যাসখানি সমাপ্ত করতে (প্রকাশকাল ১৯২৪) এই চিন্তাশীল মনীষীর। নিত্য নতুন ভাবধারা ও নবজাগ্রত শক্তির প্রভাবে আমাদের আধুনিক সমাজজীবনের ভিত্তি কিরূপে নড়ে উঠছে, আর এই ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে আমরা কি ভাবে একটা অদ্ভুত জীবনচেতনা নিয়ে বেঁচে আছি, তীক্ষ্ণ মননশীলতার সঙ্গে তার শিল্পরূপ দিয়েছেন মান তাঁর Magic Mountain-এ। স্বীয় যুগের জীবন ও চিন্তাধারার সম্পূর্ণ রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন মান তাঁর এই মননশীল উপন্যাসখানিতে। রসসৃষ্টির সঙ্গে মননশীলতা সংযোগ করে উপন্যাস রচনায় একটা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন টমাস মান—সেজন্য বিশ্বসাহিত্যে এই উপন্যাসখানি যুগান্তরকারী উপন্যাস বলে পরিগণিত হবে সন্দেহ নেই।

আমাদের বাংলা সাহিত্যেও যুগান্তরকারী উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচ্য।

উলঙ্গ রাজা

(২২২ পৃষ্ঠার পর)

কী হয়েছে ? ও বলল, বোধ হয় জ্বর হয়েছে। আমি ডাক্তারের ছেলে, প্রায় ইন্‌সটিংক্টলি হাতটা উঠে গেল ওর নাড়ি দেখতে। নাড়ি দেখলুম, কিন্তু আরও কিছু দেখলুম। দেখলুম হাতে খুব আনন্দ হচ্ছে, নরম মত হাত, আর সেই সময় দুটো হাড়ে আঙুল ঠেকল। নতুন জুওলজি পড়ছি, সদ্য সদ্য শিখেছি, রেডিয়াস আর আল্‌না। সেদিন রাত্রে ভয়ানক আনন্দ হল আর কষ্ট হল, গায়ে হাত দেওয়াটা অনিবার্যভাবে ঘুরে ফিরে মনে পড়ছিল আর আমার মনে হল আমি এতে অন্যায় অসভ্যতা করছি, তাই সেটাকে চাপতে গেলুম। আমি ভাবলুম, ওকে খুব খারাপ ভাবলে বোধ হয় এ আনন্দটা আর আসবে না। তাই যখনই ওর নরম হাতটা মনে পড়ল আমি জপতে লাগলুম—রেডিয়াস্ আল্‌না, রেডিয়াস আল্‌না। আর সেইটাকে জোর দেবার জন্যে বইয়ের কঙ্কালের ছবি দেখলুম। আচ্ছা, তুমি ফ্রয়েডে বিশ্বাস কর ?

হঠাৎ ফ্রয়েড হাজির হল কেন ?—বনলতা বলল, খানিকটা বিশ্বাস করি, পুরো নয়।

হ্যাঁ, ওইটাই ঠিক।—রঞ্জন বলল, যদি শুধু ফ্রয়েড সত্যি হত তা হলে কঙ্কালের ছবিটা বেশীক্ষণ যুঝতে পারত না। আমার ক্ষেত্রে আর একটু উলটো হল। একবার মনে হত রমলার সাদা চামড়া আর একবার মনে হত কঙ্কাল। তখন তো আমি ফ্রয়েড-টয়েড কিছু জানি না, শুধু আমার অসহ্য কষ্ট হত, আমি বুঝতে পারি না আমার কী করা উচিত। কয়েক মাস ধ্বস্তাধ্বস্তির পর আমি জুওলজির রাস্তা ধরে সাইকোলজি আর সেক্‌সোলজির রাজ্যে গিয়ে পড়লুম। আর আরও মাস দুয়েক পর বুঝলুম ব্যাপার জটিল। তখন রমলার সম্বন্ধে আমার কেমন একটা ভীতি জন্মে গেল, আর আমি আস্তে আস্তে সরে এলুম।

তারপর ?

তারপর আর কি—জান জান, যত পার জানো। যে মনটা আবেগপ্রবণ কবিতাবিলাসী ছিল, সেটা একটার পর একটা কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে এগলো। জুওলজি তো নিজের বিষয়, যতদূর সম্ভব ফিজিক্স কেমিষ্ট্রি ম্যাথেমেটিকস্ আর সাইকোলজি। বলা বাহুল্য এখন বুঝি, এমন কিছু পড়া হয় নি। কিন্তু ওই সমস্ত রাস্তা ছুঁয়ে পেরিয়ে যে মনটা বেরিয়ে এল, সে পৃথিবীটাকে অন্য চোখে দেখতে শুরু করল। একটা ঘটনা দেখলেই সে তার বিশ্লেষণ শুরু করে, কী করে এরকম হল, আর এর ফলে কী হবে। তার কি শীতল হয়ে গেল, কোন কিছু করতে ইচ্ছে করে না, মনে হত হ্যাঁ, এই মেকানিজমটা এই পরিবেশে এইভাবেই তো রি-অ্যাক্ট করবে। আচ্ছা, এইটুকুমাত্র কর, কিন্তু এতে উচ্ছ্বসিত হবার কিছু নেই, তোমাকে তো এইরকমই করতে হবে। জান, তারপর রমলার সঙ্গে দেখা হল, চৌপাটিতে ওর স্বামীর সঙ্গে বেড়াচ্ছে। কোথায় সেই ভাল লাগা, কোথায় সেই ভীতি। মুখটা পাংশু মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে অ্যানালিসিস শেষ হয়ে গেল, চোখ গাল আর পেট দেখে মনে হল মাস আড়াই হয়েছে, বছর হিসেব করে মনে হচ্ছে এই প্রথম, শাড়ি দেখে মনে হচ্ছে আর্থিক অবস্থা ভালই, এই সমস্ত কথা।

বনলতা বলল, কী যা তা অসভ্যের মত কথা বলছ।

রঞ্জন বলল, আমি পাকামী করছি না। তারপর থেকে লজ্জা নামক অনুভূতিটা শূন্যে এসে দাঁড়াল। এখনও আমার বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই, শুধুমাত্র সামাজিক কনভেনশন বলে ওটাকে স্বীকার করি।

বনলতা কথাটা ঘুরিয়ে দিল, কিন্তু এই অ্যানালিটিক মন নিয়ে তুমি কি খুব লাভবান হয়েছ মনে কর ?

তা জানি না। কিন্তু তা ওয়াইডেস্ট রেঞ্জ অব ফ্যাক্টসকে কোরিলেট করে। আর সেই জন্যে তা সবচেয়ে বেশী সত্য দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

কিন্তু সত্য কি সব ? রমলাকে দেখে তোমার কোন কষ্ট হল না, কোন আনন্দ হল না, এতে তোমার জীবন কতখানি বাসী হয়ে গেল, সেটা তুমি বুঝতে পারছ না ?

যেখানে সত্য জীবনকে বাসী করে তোলে, সেই সত্যে আমাদের কী লাভ ?

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভোগ করে কী লাভ ?

বনলতা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, যাক গে, ঝগড়া হয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জন বলল, হ্যাঁ, মাথা গরম করার চেয়ে কবিতা হোক। কিন্তু আমি তো অনেক কবিতা বললুম। তুমি গান গাও বরং একটা।

বনলতার একবার অস্বস্তি হল, গান গাইবে কি ? তারপর গাইল। দ্বিতীয় গানটার সময় হঠাৎ রঞ্জন আস্তে আস্তে বনলতার কব্জিতে হাত ঘষে ওর গান থামিয়ে দিল। তারপর বলল, দেখ।

বনলতা দেখল, জানলার বাইরে আকাশে অনেক দূরে একরাশ সাইরাশ মেঘ। মিহি নরম, আর তার ওপরে পড়ন্ত বেলার গোলাপী আলো এসে পড়েছে।

রঞ্জন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, উমার মাথার চুল।

সেইজন্যে বনলতা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি। ওর দাদুর বৃদ্ধ বয়সে যৌবন নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটাকে ও গালাগাল দেবে, তারপরই ও দাদুর বাড়ি তৈরির রুচির প্রশংসা করবে। একবার হয় তো রমলাকে নিস্পৃহ চোখে লেবরেটরির পায়রার মত দেখবে, তারপরই একেবারে পার্বতীর মাথার চুল দেখবে মেঘে। আসলে ও সংসারের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকতে চায়, কিন্তু কোথাও না কোথাও আহত হয়ে অভিমানে নিস্পৃহতার ভঙ্গী করে।

কোথায় ও আহত হয়েছে ? বনলতা কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। বনলতা তখন নিজে ভাবতে শুরু করল, কোথায় ওর ক্ষতস্থান ? ওর শরীর ? বনলতা অনেক ভাবল, শেষ পর্যন্ত ধারণা হল, ওই শরীরই তাকে জীবন সম্বন্ধে অভিমানী করে তুলেছে।

ও হয় তো চেপে যায়, ওই রমলাই ওকে আঘাত দিয়েছে। বনলতার মন কেমন করে, মেয়েগুলো কী, শুধু বাইরেটা দেখে।

এর মাস পাঁচেক পরে বনলতা একদিন এমনভাবে রঞ্জনের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল, যা দেখে রঞ্জনের জীবনানন্দ দাশের সেই বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু রঞ্জন একবার মুখ তুলেই অন্যদিকে তাকিয়েছিল, তারপর রোদ নরম হয়ে গিয়েছে বলে উঠে পশ্চিমের জানলাটা খুলে দিয়েছিল আর দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলেছিল, মা, আমাদের চা পাঠিয়ে দাও।

বনলতার মনে হয়েছিল, হয়তো ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পাচ্ছে। আর একদিন চোখ তুলে তাকাল বনলতা। রঞ্জন একবার চোখ তুলল, কিন্তু তাতে কোন উত্তর নেই। বলল, কাল জার্নাল পড়তে পড়তে দেখলুম কম্পারেটিভ ফিজিওলজির একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। আমি পড়ি নি, উলটে-পালটে দেখলুম, আমার মনে হল, তোমার রিসার্চ লাইনেরই কাজ। তুমি দেখে নিতে পার ওটা।

পরদিন কলেজে গিয়ে বনলতা খুঁজে বের করেছিল প্রবন্ধটা। ঠিকই বলেছে রঞ্জন, তার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তার মানে তার সম্বন্ধে প্রখর সচেতন, কোথায় কিভাবে এগোলে সে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারবে রীতিমত চিন্তা করে তা নিয়ে।

কিন্তু সমানে বনলতার চোখকে উপেক্ষা করে যাবে ! একদিন নয়, দুদিন নয়, বেশ কয়েকদিন। না না, বনলতার অপমান নেই, অন্য সব মেয়েদের মত আদর খাবার ইচ্ছে তার নেই, যতদিন না আঘাতের ভয় পেরিয়ে সোজা ও চোখ তুলে তাকায়, ততদিন অপেক্ষা করতে রাজী আছে সে।

কিন্তু দিনের পর দিন গেল।

[ক্রমশ]

কলা-লক্ষ্মী

শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ ("ভাস্কর")

মানবমনের নিভৃত নিলয়ে ঘুমানো চেতনা শিরে,
তোমারি সোনার কাঠি যবে ছোঁয়াও পেলব করে,
চেতনা জাগিয়া ওঠে, ধীরে নয়ন মেলে,
পুলকে শিহরি ওঠে, রোমাঞ্চ বহিয়া যায়,
হেরি তব প্রসন্ন আনন মধুময় মায়াময়।
দুর্বার সে মায়া চেতনারে করে নিশ্চেতন,
কল্পনা রাঙিয়া ওঠে, ফুটে ওঠে অযুত কুসুম,
রূপরসগন্ধভরা হৃদয়কাননে,
জ্বলে ওঠে অগণিত তারকার রাশি
ঝলমলি ওঠে যেন মনের আকাশ।
কানে পশে বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার,
উন্মত্ত হরষে ভরি ওঠে কল্পনার জাল।
জাগে রূপকথা, মৃদু মলয়ভরে
প্রকম্পিত হয়ে ওঠে কবিত্বপল্লব।
মানবের চিরন্তন আশা,
বাসনা ও কামনার চিরাতৃপ্ত তৃষা,
কত মিলনবিরহগীতি
অঞ্চল ভরিয়া দেবি! দাও ঢালি
মানবের লেখনীর প্রস্রবণমূলে।
নাচি ওঠে, হাসি ওঠে বিচিত্র চিত্রের ডালি,
রামধনুবর্ণ যেন আকাশ ছাড়িয়া
আপনি জুড়িয়া বসে চিত্রপট 'পরে।
পাষাণের গাত্র ভেদি জাগি ওঠে অপূর্ব সুষমা,
কত মোহন ভঙ্গিমা, কত কায়া মনোরমা
প্রাণ লভি হাসে যেন পাষাণ প্রতিমা!
মায়াময়ি! মায়া তব ঢাকি আছে
বিশ্বের অণু পরমাণু।
অতি তুচ্ছ তৃণদল, বিরাট ভূধরশিখর
নীল নভস্থল, নীল সাগরজল, শ্যামল প্রান্তর,
কুসুমের অগণিত বর্ণগন্ধলীলা—
এ যে তোমারই মধুর হাসি, স্বপ্নময়, মায়াময়, মোহময়
তোমার প্রসন্ন হাসি নাকি বড় ভয়ানক!
তোমার মায়ার জালে মানবের ইহকাল পরকাল
যায় নাকি রসাতলে। কিন্তু দেবি!
তোমারে করিলে হেলা,
সমগ্র বিশ্বের প্রাণ শুকাবে নিমেষে,
পরিণত হবে ধরা ক্লিন্ন অভিশপ্ত জড়স্তূপে।
সমগ্র জীবন শুধু, হবে এক মরুভূমি ধূধূ।
রহ তুমি চিরদিন উচ্চাসনে সমাসীন
আপন অম্লান গৌরবে।
হে দেবি! চরণে প্রণতি করি বিনয়ের সাথে।

যদিও আড়ালে থাকে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

যদিও আড়ালে থাকে তবু তাকে কখনো সহসা
চেনা যায় বিদ্যুৎ-স্ফুরণে। গন্ধবহ চন্দ্রালোকে
যখন বাজায় রাত একতারা। মুখে তীব্র কশা
যে-মুহূর্তে জাগে ক্ষোভে মজানদী। নিদ্রাহীন চোখে
ঘর বাঁধবার প্রেম জাগে প্রেমিকার। বোবা মুখে
ফোটায় ফুলের ভাষা সহিষ্ণু প্রেমিক। যে-সময়ে
অরণ্য ছড়ায় পথে মুঠো-মুঠো জুঁই। দুঃখেসুখে
সমুদ্র সন্ধানী মন ছোটে মোহনায়। অবক্ষয়ে
পথের সমাপ্তি নয় কিন্তু কোনো গূঢ় চেতনার
নিশ্চিত আশ্বাস কেউ মরুতে বালুতে কাদাজলে
নিয়তই আনে। আর, যদিও সে আড়ালেই থাকে
পদ্মিনী নারীর মত, অন্তরালে গর্ভকোষ তার
প্রাণের স্পন্দনে সঞ্জীবিত। রুক্ষ যাত্রাপথতলে
সে কেবল রক্ত মুছে ফুলের স্তবক তুলে রাখে

গ্রন্থ-পরিচয়

সন্ন্যাসী একা যাত্রীঃ শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী। শরৎ পুস্তকালয়, ৩ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩। তিন টাকা

বিনোবাঃ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ। অভয় আশ্রম, সি ২৮ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। এক টাকা।

দাদাঠাকুরঃ শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পাঁচ টাকা।

উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থই জীবনীগ্রন্থ। তন্মধ্যে প্রথম গ্রন্থটি মহাত্মা গান্ধীর জীবনকাহিনী, দ্বিতীয়টি গান্ধীজীর ভাবশিষ্য তাঁরই আদর্শের উত্তরসাধক ভূদান আন্দোলনের প্রবক্তা আচার্য বিনোবা ভাবের জীবনচরিত, তৃতীয়টি ঠিক সমগোত্রের মানুষের জীবনকাহিনী না হলেও তার ভিতর বিবৃত হয়েছে এমন এক মানুষের জীবনকথা, যে মানুষ অধুনাকার সমাজে স্বয়ং একটি প্রতিষ্ঠান, যাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রাচীন ভারতের অনাড়ম্বর সরল জীবনাদর্শ, সততা ও সদাচার এবং তেজস্বিতার এক সুন্দর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। দাদাঠাকুর প্রধানত: এ কালের মানুষের কাছে সুরসিক আর আমুদে লোক বলে পরিচিত হলেও ওটি তাঁর আংশিক পরিচয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের আরও কয়েকটি বিশিষ্ট দিক আছে। এক হিসাবে তিনি গান্ধীজীদেরই গোত্রের মানুষ। কেন এ কথা বলছি সে কথা বুঝতে হলে তাঁর জীবনীগ্রন্থখানা একবার সবাইয়ের হাতে নিয়ে দেখতে হয়। যাই হোক, এখানে যে ক্রমে বই তিনটি বিন্যস্ত হয়েছে তা ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব ও মর্যাদার তারতম্য অনুযায়ী, এই বিন্যাসের মধ্যে বই তিনটির আপেক্ষিক ভাল-মন্দের ধারণা সৃষ্টির কোন চেষ্টা নেই, আত্মপক্ষ সমর্থনে ও পাঠকদের সম্ভাব্য অন্যবিধ সিদ্ধান্তের নিরসনে এ কথা বলা দরকার।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে গান্ধীজীর চমৎকার একটি জীবনী রচনা করেছেন। গান্ধীজীর জীবনের ঘটনাবলী সুপরিজ্ঞাত, তাঁর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে [illegible] আছে। তবে এই নাতিবিস্তৃত বইটির সার্থকতা এইখানে যে, এতে লেখক গান্ধীজীর সাধনার অনন্যতা ও সকল বাধাবিপত্তি অসহযোগের মধ্যেও তাঁর একলা চলবার অনমনীয় দৃঢ়তাকে কেন্দ্রস্থ বিষয় হিসাবে গণ্য করে তার চারপাশে ঘটনাক্রমকে সাজিয়েছেন। বইয়ের ওইরূপ নামকরণ এই কারণেই। বইটিকে তিনি পরিবেশ, আভাস, প্রস্তুতি, প্রয়োগ ও প্রয়াণ এই কটি বিভাগে বিভক্ত করে গান্ধীজীর জীবনের ক্রমিক বিকাশের ধারাটিকে সুপরিস্ফুট করে তুলেছেন। নোয়াখালি পরিক্রমা ও প্রয়াণের অধ্যায় দুটি মনের উপর গভীর রেখাপাত করে।

ভাষা বেশ পরিচ্ছন্ন, সংহত, সাহিত্যসম্মত। জায়গায় জায়গায় ছাপার ভুল আছে। পুস্তকের মলাটটি রঙচঙে, সেটিও এই বইয়ের পক্ষে বেমানান হয়েছে। এসব ছোটখাট বিচ্যুতি বাদ দিলে, গ্রন্থটি সুলিখিত ও সুমুদ্রিত। এর সর্বত্র সমাদর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

দ্বিতীয় গ্রন্থ আচার্য বিনোবা ভাবের একটি নাতি-সংক্ষিপ্ত জীবনী। সুলিখিত ও উপযুক্ত তথ্যভারে সুসমৃদ্ধ। গ্রন্থের লেখক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ ভূদান আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট। বিনোবাজীর জীবনসাধনা ও জীবন-দর্শনের তিনি সবিশেষ অনুশীলন করেছেন এবং তৎকৃত 'গীতাপ্রবচন' তিনি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বিনোবাজীর প্রবর্তিত সর্ববিধ কার্যধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের ছাপ এই গ্রন্থের সর্বত্র সুপ্রকট। নিছক জীবনী রচনার মনোভাব থেকে এই গ্রন্থখানির জন্ম হয় নি, এর পিছনে লেখকের আদর্শবাদ এবং প্রত্যয়শীলতাও সমান ক্রিয়াশীল রয়েছে। লেখক বিনোবার বাল্যজীবনের ইতিবৃত্ত দিয়ে আরম্ভ করে যৌবনে তাঁর সংসারত্যাগ, পরিব্রাজক জীবনে ব্যাপক শাস্ত্রাধ্যয়ন, গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে যোগদান, নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কৃচ্ছ্রসাধন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে তাঁর মানসিক জীবনের অগ্রগতি, বৃহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ, কারাগার

জীবন, 'গীতাই' রচনা, স্বীয় কর্মোদ্যোগের মধ্য দিয়ে গান্ধীজীর সর্বোদয় আদর্শের ক্রমসম্প্রসারণ, ভূদান গ্রামদান জীবনদান আদর্শের প্রবর্তনা পর্যন্ত বিনোবার জীবনের সব কয়টি উল্লেখযোগ্য স্তর তিনি একে একে এখানে বিবৃত করেছেন। বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে ভাষা, ব্যাখ্যায় বিশ্লেষণে বিবরণ সংকলনে কোথাও অস্পষ্টতার লেশ মাত্র নেই। মোট কথা, বিনোবার জীবন ও জীবনদর্শন সম্পর্কে পূর্বাপর ধারাবাহিকতা ও প্রয়োজনীয় তথ্যসম্বলিত চমৎকার একটি জীবনীগ্রন্থ এই বই। বিনোবাজীর কর্মদর্শন আজ শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বে সাড়া জাগিয়েছে। গীতোক্ত কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির এমন অসাধারণ সমন্বয় আজকের পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তিত্বের ভিতর সংসাধিত হয়েছে বলে আমি জানি না। বর্তমান ভারতে এঁর তুল্য ব্যক্তি আর নেই। এঁর জীবনকথা যত আমরা জানব তত আমাদের মঙ্গল। বাঙালীর ঘরে ঘরে এই বইটির প্রচার হওয়া দরকার।

দাদাঠাকুরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্বেই কতকটা আভাস দেওয়া হয়েছে আশ্চর্য চরিত্রের মানুষ এই দাদাঠাকুর—শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়। নির্লোভ সদাচারী এক সত্যনিষ্ঠ তেজস্বী ব্রাহ্মণ। এঁর বিষয়ে যত চিন্তা করা যায় তত বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। এমন মানুষ আজকের দিনের পরিবেশে সম্ভব দাদাঠাকুরকে প্রত্যক্ষ না জানলে সে কথা বিশ্বাস হওয়াই শক্ত। বাহ্যত: দাদাঠাকুর হাস্যরসিক অপূর্ব শব্দকুশল আমোদপ্রিয় একজন ব্যক্তি; মুখে মুখে তিনি ছড়া বানাতে পারেন, লোকের বাঁকা কথার মুখের মত জবাব (retort) দিতে তিনি ওস্তাদ, রাজা মহারাজা সাহেবসুবোর খাস দরবার থেকে শুরু করে দীনদরিদ্রের জীর্ণ কুটির পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর সমান গতিবিধি। হক্‌কথা তিনি কাউকেই শোনাতে ভয় পান না, তা তিনি যতই পরাক্রান্ত ব্যক্তি হোন না কেন—কিন্তু এ সবই হল তাঁর স্বভাবের বহিরঙ্গের দিক্‌। তাঁর স্বভাবের আর একটি দিক্‌ আছে যেখানে তিনি গভীরতত্ত্বসন্ধানী, ইষ্টদেবতায় একান্তভাবে সমর্পিতচিত্ত, শোকে অবিচলিত, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সেবাপরায়ণ, অন্যায়ের প্রতিরোধে সদাযত্নপর, বেশভূষায় আচারে-ব্যবহারে সারল্য ও অনাড়ম্বর সহজতার মূর্ত প্রতীক, ভোগে বীতস্পৃহ, নির্লোভ ও স্বল্পে তুষ্ট, স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচারী। এ জিনিস এমনিতে হয় না—এর জন্য সাধনা চাই। বিশ্বাসের নিষ্ঠা চাই। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা চাই। প্রকট রসরসিকতা ও আনন্দবিতরণচেষ্টার অন্তরালে অপ্রকট এই সব মহৎ বৃত্তিরই তিনি অনুশীলন করেছেন আজীবন।

এই রকম একজন বিস্ময়কর মানুষের জীবনকাহিনী সংবদ্ধ করেছেন পণ্ডিচেরী আশ্রমের শ্রীনলিনীকান্ত সরকার—যোগ্য গুরুর যোগ্য শিষ্য। নলিনীকান্ত বহুকাল দাদাঠাকুরের সংস্রবে কাটিয়েছেন, তাঁকে নানা ভাবে কাছে থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। সেই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের সুফল এই বইয়ে দুই হাতে বিলনো হয়েছে। নলিনীকান্ত সুলেখক, তদুপরি রসিক, তায় তিনি দাদাঠাকুরের ঘনিষ্ঠ পরিচিত জন—কাজেই দাদাঠাকুরের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুটনে যোগ্যতম লেখনীরই প্রয়োগ এক্ষেত্রে হয়েছে। একজন হাস্যরসিক সম্বন্ধে লিখছেন আর একজন হাস্যরসিক। ফলে ষোল-আনার উপর সতেরো-আনা সরসতার প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে আমাদের ভাগ্যে। বইটিতে চরিত্র-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে দাদাঠাকুরের রস-রসিকতার নমুনাও বহু সংকলিত হয়েছে। ফলে বইখানা সব দিক দিয়েই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। আনন্দ এবং অনুপ্রেরণা দুইয়েরই সুপ্রচুর উপাদান বিধৃত রয়েছে বইটিতে। এমন একখানি বই ঘরে ঘরে সংরক্ষিত হওয়ার যোগ্য।

নারায়ণ চৌধুরী

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩১শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

মাঘ
১৩৬৫

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদা লিখিয়াছেন,

"ভায়া হে, তোমরা—পুস্তক ও সংবাদপত্র ব্যবসায়ীরা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তকস্থ বিদ্যাকে করায়ত্ত করিয়াছেন বলিয়া খুবই বিচলিত হইয়াছ দেখিতেছি। বিচলিত হইবার কথাই। কারণ, একে তো জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর এই করভার নীতিগত ভাবেই অন্যায়, তদুপরি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু পশ্চিমবঙ্গেই এই অন্যায় সাধিত হইতেছে—অন্য কোনও ভারতীয় রাজ্যে ইহা প্রচলিত হয় নাই। দুষ্টলোকে বলাবলি করিতেছে—অত্রস্থ মুখ্যমন্ত্রী জ্ঞান ও বিদ্যা, কবিত্ব ও সাহিত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধান্বিত নহেন। তিনি তোগলকীয় খামখেয়ালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার খেলায় মাতিয়াছেন বটে কিন্তু তাঁহার মারবারী-রঞ্জনী বুদ্ধি বিদ্যাকে বিন্দুমাত্র আমল দেয় না। তাহারা দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়া থাকে, বর্তমান বাংলা সাহিত্যের বড়বাবু তারাশঙ্করের নামটা পর্যন্ত তিনি ঠিকমত জানেন না। কখনও তারাপ্রসন্ন, কখনও তারাকিশোর, কখনও তারাচাঁদ নামে তাঁহার উল্লেখ করেন। অধিকতর দুষ্টলোকে রটনা করে, যদি নববিধান ব্রহ্মমন্দির কর্তৃক ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাদি, প্রেমকাব্য, রম্যরচনা ও উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশিত হইত তাহা হইলেই বাংলা দেশের পুস্তক-ব্যবসায় এই বিক্রয়কর হইতে রক্ষা পাইত। মতলববাজ লোকের এই সকল কুৎসায় কান দিয়ো না ভাই। শ্রদ্ধেয়ের প্রতি অশ্রদ্ধেয় বাক্য যেখানে উচ্চারিত হয়, কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ। আসলে, কারও দোষ নয় হে ভায়া, এ কালধর্মের খেলা; কলিমাহাত্ম্যে এইরূপ ঘটিতেছে এবং ঘটিবেই। বিষ্ণুপুরাণে কলিকাল-প্রসঙ্গ মিলাইয়া দেখিতেছিলাম। পুরাণকার বলিতেছেন:

'ব্রহ্মণ! কলিযুগে মানবগণের প্রবৃত্তি ও আচার-ব্যবহার বর্ণের অনুরূপ ও আশ্রমের অনুরূপ হইবে না। তৎকালে মনুষ্যের যে কোন বাক্যই শাস্ত্র, মনঃকল্পিত দেবতার সৃষ্টি ও ইচ্ছানুরূপ আশ্রমের সৃষ্টি হইবে। সকলেই অর্থোপার্জনে ব্যগ্র, জ্ঞানোপার্জনের পথ রুদ্ধ হইবে। তৎকালে অন্যায়তঃ উপার্জন করিতে সকলেই লোলুপ হইবে। রাজগণ প্রজাপালন না করিয়াও শুল্কছলে প্রজাদের ও বণিকগণের ধন হরণ করিবে। প্রজারা দুর্ভিক্ষ ও রাজকরে পীড়িত হইয়া দুঃখিতান্তঃকরণে কদন্ন-ভূয়িষ্ঠ দেশ আশ্রয় করিবে।'

পৌরাণিক ঋষির কথায় আস্থা রাখিয়ো এবং বিশ্বাস করিয়ো ইহাই একালে তোমাদের বিধাতৃনির্দিষ্ট নিয়তি। কাজেই চেঁচামেচি হরতাল না করিয়া আর একবার বিধান-বিধাতার দরবারে ধর্না দাও। তিনি দেহ-বেদনার ভিষক্ হইলেও তোমাদের মনোবেদনাও উপলব্ধি করিবেন।

তবে একটা কথা তোমাদের বিবেচনা করিতে বলি। স্কুল-কলেজের পাঠ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তকের উপর কর-আরোপ অন্যায় ও জন-সাধারণের স্বার্থবিরোধী মানিলাম। কিন্তু রম্যরচনা-গল্প-উপন্যাস? যদি তামাক-সিগারেট-মদ, চা-কফি-কোকো, সাবান-পাউডার-কেশতৈল প্রভৃতি ভোগের ও বিলাসের সামগ্রী ট্যাক্সনীয় হয়, সাহেব-বিবি-গোলাম, ছুরি যৌদি,

পুতুল দিদি, কিনু গোয়ালার গলি, বেগমবাহার লেন, বারো ঘর এক উঠোন প্রভৃতি বই এবং টাকের উপর টেক্কা, শানকিতে বজ্রপাত, মোহন-কালোভ্রমর মার্কা বই কি দোষ করিল ? ভোগের দিক দিয়া ইহারাও কি কম উপভোগ্য! শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেই দোষ দিলে চলিবে না ; একটা ন্যায়সঙ্গত রফা তো করিতে হইবে।

ভায়া হে, বিদ্যা ও জ্ঞান সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর আগ্রহ বিষয়ে বড়াই এবং বাড়াবাড়ি সাজে কি ? আমাদের জ্ঞানের পরিধি এবং বিদ্যাবত্তার গভীরতা যাচাই ও পরিমাপ করিয়া দেখিলে কি দেখিতে পাও ? একজন পণ্ডিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তি একটু মাপজোক করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন একটি প্রবন্ধাকারে তাহা পাঠাইলাম। ছাপিয়া দিলে বাঙালীর উপকার হইবে। প্রবন্ধটি এই :—

‘বর্তমানকাল অল্পবিদ্যা ও লঘুচিত্ততার কাল’

বর্তমানকাল অল্পবিদ্যার কাল। পূর্বকালে বিদ্যার্থীরা একটি বিশেষ বিদ্যাকে আপনার অনুশীলনের বিষয় করিতেন এবং অনেক বৎসর ধরিয়া তাহা অধ্যয়ন করিতেন, সুতরাং তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। অধুনাতন কালে অধিকাংশ লোকে নানা বিষয় জানিতে ইচ্ছা করে ও নানা বিষয়ের অনুশীলন করে, সুতরাং কোন বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। রাজসাহী প্রদেশের বিল সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, কিন্তু গভীর নহে, তাঁহাদিগের বিদ্যাও সেইরূপ। বর্তমানকাল পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের কাল। লোকে এক্ষণে আপনাদিগের মনাগারকে পঞ্চপ্রকার পুষ্পদ্বারা সজ্জিত পুষ্পাধার স্বরূপ করিতে চাহে। লোকে এক্ষণে দশকর্মান্বিত হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। বিশেষতঃ আমরা বুঝিতে পারি না যে, সংবাদপত্রের সম্পাদকের আসনে কি ঐন্দ্রজালিক গুণ আছে যে একজন অজ্ঞ-ব্যক্তি তাহাতে উপবিষ্ট হইলে তিনি একেবারে সর্বজ্ঞ হইয়া উঠেন। বর্তমানকালে যে বিশেষ বিদ্বান ব্যক্তি নাই তাহা আমরা বলিতেছি না ; কিন্তু অধিকাংশ লোকই অপ্রগাঢ়বিদ্যাসম্পন্ন। বর্তমানকালেও কতকগুলি ব্যক্তি একটি বিশেষ বিদ্যাকে অধ্যয়নের বিষয় করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন বটে, কিন্তু ইঁহাদিগের সংখ্যা অল্প। অধিকাংশ ব্যক্তিই চঞ্চল ষট্‌পদের ন্যায় পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করে, কোন পুষ্পেতেই সন্তুষ্ট হয় না। তাহারা কবিতা ছাড়িয়া পুরাবৃত্ত, পুরাবৃত্ত ছাড়িয়া বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ছাড়িয়া দর্শন, এইপ্রকার অধ্যয়নের বিষয় দিবসের মধ্যে নিয়তই পরিবর্তন করে। অতএব কোন বিষয়েতেই প্রকৃত ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক, কিন্তু একটি বিশেষ বিষয়কে অধ্যয়নের বিষয় করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করা উচিত। পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যে কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বর্তমানকাল লঘুচিত্ততার কাল। অধিকাংশ লোকই কোন প্রগাঢ় বিষয়ের পুস্তক অধ্যয়ন করে না। অধিকাংশ লোকই কেবল সংবাদপত্র উপন্যাস ও নাটক পড়িয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের চিত্ত লঘু হইয়া পড়ে। গুরুতর বিষয়ের অনুশীলন জন্য যে প্রকার মানসিক পরিশ্রম ও অধ্যবসায় আবশ্যক তাহা তাহাদের থাকে না। তাহারা এমনি পরিশ্রম ও অভিনিবেশে বিমুখ যে, বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি গুরুতর বিদ্যাবিষয়ক সংবাদ তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইলে তাহা তরল ও লোকরঞ্জন আকারে প্রদান করিতে হয়। বিজ্ঞান ও দর্শন উপন্যাসের আকারে না পরিণত করিলে তাহা তাহাদিগের গ্রাহ্য হয় না। লোকে এক্ষণে শিক্ষা অপেক্ষা আমোদ অধিক প্রার্থনা করে। বর্তমান প্রস্তাব লেখক একবার মেডিকেল কলেজের রসায়নবিদ্যার কোন অধ্যাপকের উপদেশ শ্রবণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উপদেশ-কালে মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের বর্ণ ও আকৃতির সহিত রাসায়নিক পদার্থ ও তদ্বর্ণ পরিবর্তনের উপমা দিয়া আপনার উপদেশকে মনোরঞ্জক করিতেন ; তাঁহার ছাত্রেরা এই জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। বিলাতে লোকে যাহাতে বিজ্ঞান পাঠে প্রবৃত্ত হয় এইজন্য তরল ও মনোরঞ্জক ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান-বিষয়ক সারসংগ্রহ পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেগুলি সারসংগ্রহ বলিয়া প্রকাশিত কিন্তু বস্তুতঃ তাহাদের ন্যায় অসার পুস্তক আর নাই ও তাহাতে সচরাচর এত ভুল থাকে যে তাহা গণনা করা দুষ্কর। বিলাতের অধিকাংশ লোকে উপন্যাস পাঠের জন্য সাধারণ পুস্তকাগারের স্বাক্ষরকারী হয় এবং ক্রমাগত উপন্যাস পাঠ

করিয়া অত্যন্ত লঘুচিত্ত হয়। এতদ্রূপ লঘুচিত্ততা আমাদিগের দেশেও ক্রমে প্রবল হইতেছে। উপন্যাস ও নাটক আমাদিগের দেশে এক্ষণে যেমন বিক্রীত হয় এমন অন্য কোন প্রকার পুস্তক হয় না। পূর্বকালে ধর্মগ্রন্থ পাঠে লোকে যেমন অনুরক্ত ছিল এক্ষণে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। বর্তমানকাল উন্নতির কাল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সাধারণ লোকে যখন লঘুচিত্ত ও আমোদের প্রিয় হইয়া উঠিতেছে তখন বর্তমান কালকে কি প্রকারে প্রকৃত উন্নতির কাল বলা যাইতে পারে।'

তাই বলিতেছিলাম, ভায়া হে, যদি সত্যকার জ্ঞানার্জনই বাঙালীর লক্ষ্য হয় তাহা হইলে যেমন করিয়া পার এই অসার কামকণ্ডুতিবর্ধক রম্যরচনা-গল্প-উপন্যাসের ভয়াবহ বন্যাকে রোধ কর ; জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাম করিয়া এই সকল অমেধ্য বস্তুর প্রসার-প্রচারের সুবিধা করিয়া দিয়ো না। গাঁজা-আফিম-মদ সম্বন্ধে সরকারের যে ব্যবস্থা, এইগুলি সম্বন্ধে অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা যাহাতে অবলম্বিত হয় তাহার চেষ্টা কর।"

—

যিনি বহুবর্ষ পূর্বে একদা কলেজের গ্যালারির লেকচার-বিমুগ্ধ ছাত্র-সমাজ হইতে দৃষ্টি অপসারণ করিয়া রঙ্গমঞ্চ-গ্যালারির দর্শকদের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসরকাল নিবদ্ধ রাখিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন তিনি যদি শেষবারের জন্য 'পদ্মভূষণ' উপাধি বর্জনের অছিলায় গ্যালারির দর্শকদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন, তাহা এমন কিছু দোষের ব্যাপার হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। শিশিরকুমার ভাদুড়ী চিরদিনই সুদক্ষ অভিনেতা এবং তাঁহার অভিনয়ে হাততালি দিবার লোকের অভাব কোনওদিনই হয় নাই। তাঁহার আচরণ যদি কাহারও অসঙ্গত ঠেকিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাকে শুধু সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে শিশিরকুমার জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য নন, নাট্যাচার্য মাত্র। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ে এবং আচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীতে তফাত থাকিবেই।

—

অদ্যকার (২০।২।৫৯) সংবাদপত্রে দুটি সংবাদ দেখিলাম। ১। বীরভূম-বর্ধমানের চালের কলগুলি ধানের অভাবে বন্ধ হইতে বসিয়াছে এবং ২। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নামে বাংলা দেশের গ্রামকে শহর করিবার খাতে আরও কয়েক কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। গতকল্য বিধান-পরিষদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, এই সকল ইট-সিমেন্টে টাকা লগ্নী আপাতফলপ্রসূ না হইলেও ভবিষ্যতের আদায়-(return) সম্ভাবনা বিরাট।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বর্ধমান বীরভূম অঞ্চলে কত রকমের কত বিচিত্র নামের ধান্য উৎপন্ন হইত তাহার একটা হিসাব আমরা পাইয়াছি। বর্ধমান রাজার দিলখোসাবাগের তদানীন্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাখালদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হিসাবের ভূমিকাস্বরূপ তিনি বলেন—

"বঙ্গদেশে ধান্যই সর্বপ্রধান শস্য, এবং উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহুবিধ প্রকার উৎপন্ন হয়, প্রায় বৎসরের প্রতি মাসেই কোন না কোনপ্রকার ধান্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন প্রকার ধান্য বৎসরের তিন সময়ে উৎপন্ন হয়। ভাদ্র মাসে আশু ধান্য, কার্তিক মাসে নেয়ালি বা কেলেস ধান্য এবং পৌষ মাসে হৈমন্তিক বা আমন ধান্য উৎপন্ন হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বৃষ্টি হইলেই জমিতে চাষ দিয়া উক্ত তিন প্রকার ধান্য বপন করা হয়। আশু ধান্য রোপণ করা হয় না, উহা যে জমিতে উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই বপন করিতে হয়, এবং পরিপক্ক হইলে ভাদ্র মাসের শেষে অথবা আশ্বিন মাসের প্রথমে কাটিয়া লওয়া হয়। নেয়ালি বা কেলেস ধান্য ওই প্রকার বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে একস্থানে বীজ বপন করিয়া আষাঢ় অথবা শ্রাবণ মাসের মধ্যে তাহাদিগকে তুলিয়া ধান্যক্ষেত্রে অন্যূন অর্ধ হস্ত দূরে রোপণ করিতে হয়। আশ্বিন মাসের শেষে অথবা কার্তিক মাসের প্রথমে কাটিয়া লইতে হয়। আমন বা হৈমন্তিক ধান্য ওই প্রকার বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে একস্থানে বীজ বপন করিয়া আষাঢ় অথবা শ্রাবণ মাসের মধ্যে তাহাদিগকে তুলিয়া ধান্যক্ষেত্রে অন্যূন অর্ধ হস্ত দূরে রোপণ করিতে হয় এবং পরিপক্ক হইলে অগ্রহায়ণ মাসের শেষে অথবা পৌষ মাসের মধ্যে কাটিয়া লইতে হয়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিজ অঞ্চলের ২৭৯ রকম ধানের সন্ধান দিয়াছেন; তন্মধ্যে আমন ২৩৭ প্রকার, আশু

৩২ প্রকার ও নেয়ালি ১০ প্রকার। আমনের মধ্যে 'পেসোয়ারী' নাম দেখিয়া একটু চমক লাগিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য নজরে পড়িল, "পেসোয়ার হইতে আনাইয়া বর্ধমানে আবাদ করা হইয়াছে, ধান্তের কোনও রূপ পরিবর্তন হয় নাই।"

এই দুই শত উনআশি রকমের ধানের নাম-তালিকাই কী বিচিত্র। কয়েকটি খুব জানা নাম কিন্তু অধিকাংশই অজানা। যেমন—(আমনের মধ্যে) অতি রং, ছোট বনগোটা, ছাঁচি মোল, বাঁকুই, হাতিশাল, গোবিন্দভোগ, সলাঝাটি, বাঁকচুড়, বিজাশাল, সোনামুখী, রূপশাল, মৌরিশুঁড়া, খেজুরছড়ি, দাদখানি, খাসখানি, লিচুশাল, গোপালভোগ, বাঁশমতী, চিনিশঙ্কর, পরমাসুশাল, দুধকলমা, দুধে নোনা, গন্ধমালতী, মুগিবালাম, কাত্তিকশাল, ক্ষীরসেপাতি, বাঁশমুখী, পদ্মকিশোর, রামশাল, চিনিশঙ্খ, মহিষমুড়ি, কুসুমশাল, চামরশাল, উড়িশাল, উড়ি, জগন্নাথভোগ, পরমান্নশাল, লক্ষ্মীবিলাস, সমুদ্রফেনা, রাঁধুনীপাগল, সিন্দুরটুপী, লালবালাম, পক্ষীরাজ, হিতকুমারী, কাবারচিনি, সীতাভোগ, বাঁকতুলসী, বাদশাভোগ, নীলকণ্ঠ, তুলসীমঞ্জুরী প্রভৃতি; (আশুর মধ্যে) জামাই নাড়ু, ছেটী, জটাকলমা, লঘু, ভাবা, পারিজাত, পদ্মশাল, কেউটেশাল, দুর্গাভোগ, মুক্তাহার প্রভৃতি এবং (নেয়ালির মধ্যে) ভূতমুড়ি, ঝাঁঝি, লঘুবালাম প্রভৃতি। মোট ২৭৯টি নাম। আমাদের সুপরিচিত চামরমণি চালের নাম চামরমালি লেখা হইয়াছে।

গত শতাব্দীতে যে অঞ্চলে ধানের এই বাহার ছিল বিগত আশি বছরের বিপুল বৈজ্ঞানিক উন্নতি সত্ত্বেও সেখানে চালকলে ধানের অভাব হইতেছে ইহার কারণ নিশ্চয়ই জমির অক্ষমতা নয়, কর্মী মানুষের অভাব। গ্রামের মানুষ শহরের বিলাস-স্বাচ্ছন্দ্যের অলীক লোভে শহরমুখী হওয়াতে বাংলাদেশের কোনও গ্রামই আর স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। খাদ্যাভাব তো ঘটিয়াছেই, বিভিন্ন বৃত্তির লোকের অভাবে গ্রামের মানুষকে শুধু দাড়ি কামাইবার জন্তই কলিকাতার হেয়ারকাটিং সেলুনে ছুটিতে হইতেছে। গ্রামগুলিকে আবার স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সজীব করিয়া সেখানকার অধিবাসীদের ফিরাইয়া আনিতে না পারিলে এত গ্রামোদ্যোগ, এত ভূদান, এত নজী তালিম, এত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সমস্তই নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হইবে। কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে কয়েকটা প্রাসাদোপম অট্টালিকা মাথা খাড়া করিয়া উঠিয়া কালের তাড়নায় পরিত্যক্ত জীর্ণ ও ধ্বংস হইয়া শ্মশান-স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইবে, মধ্যপন্থীয় দালালদের আপাত লাভ ছাড়া কোনও মানুষের কোনও উপকারে আসিবে না। অবশ্য বিষ্ণুপুরাণের কলিকাল মাহাত্ম্যে এই কথাও বলা হইয়াছে—"মনুষ্যেরা গৃহাদি নির্মাণকেই ধনসঞ্চয় মনে করিবে।"

এই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম কিন্তু এই বর্ধমান জেলাতেই সেদিনও ছিল। সেদিন মানে উনিশ শতকে। যাঁহারা রমেশচন্দ্র দত্তের 'সংসার' 'সমাজ' পড়িয়াছেন তাঁহারা ঐতিহাসিকের লেখনীতে বাংলার সজীব গ্রামের ছবি দেখিয়াছেন। আমরা এখানে আর একটি ছবি দাখিল করিতেছি।

গ্রামের নাম রামচন্দ্রপুর। "জেলা চৌকী পরগণে সহর বর্দ্ধমান। স্টেসন গুস্করা, সাহেবগঞ্জ ডিভিজান।" এই রামচন্দ্রপুরে কবি হরিশচন্দ্র রায়ের বাস ছিল। তিনি উনিশ শতকের শেষার্ধে এই কাব্য "সত্যনারায়ণের কথা ও স্বগ্রাম বর্ণন" পয়ারছন্দে লিখিয়াছিলেন। এক শত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশে এমন গ্রাম আরও অনেক ছিল। কবি হরিশচন্দ্রের "স্বগ্রাম বর্ণন" এই :—

"স্বর্গ হতে স্বগ্রাম সুখের স্থান ভাই।
অতএব গ্রামস্থ সমস্তকে খেয়াই ॥
রামচন্দ্রপুর গ্রাম নামে পাপ হরে।
এমন সুখের স্থান দেখি না সংসারে ॥
আদি দেব কটা রায় গ্রামের ঈশ্বর।
প্রচণ্ড প্রতাপ যাঁর খ্যাত চরাচর ॥
বৈশাখী পূর্ণিমার দিন গাজনের ঘটা।
অদ্যাবধি এক কোপে কাটে নয় পাঁঠা।
আশ্চর্য্য মহিমা ইহা নাহি কোন স্থানে।
নিযুক্ত আছেন দেব গ্রামের রক্ষণে ॥
আর বিগ্রধামে বিগ্র সেবা যে বিস্তর।
বৃন্দাবন বলি ভ্রম হয় নিরন্তর ॥
শ্রীরাধামোহন রাধাকান্ত বলরাম।
নিত্যসেবা রাধাবল্লভ পূর্ণ করেন কাম ॥

রাধারমণ গোপীনাথ অপ্রকাশ এবে।
ঠাকুর হরির পাট আছে সমভাবে॥
ব্রহ্মশিলা বাসুদেব নারাণ শ্রীধর।
লক্ষ্মীনারায়ণ নাড়ুগোপাল আর দামোদর॥
বিপদভঞ্জনদেব শ্রীমধুসূদন।
আহা কিবা তাঁহার মণ্ডপ সুদর্শন॥
অনাদি স্থাপিত লিঙ্গ বাণেশ্বর হর।
মঠসহ প্রতিষ্ঠিত ছাড়া নাহি ঘর॥
দোলযাত্রা রাসযাত্রা জন্মমহোৎসব।
বার মাসে তের পর্ব্ব বর্ত্তমান সব॥
মঙ্গলচণ্ডী মনসা ষষ্ঠী আছে স্থানে স্থানে।
ভদ্রকালী পঞ্চানন নৈঋত ঈশানে॥
গ্রামের পশ্চিমোত্তরে যমুনার গড়।
বিবিধ বিহঙ্গ কেলি করে নিরন্তর॥
দক্ষিণেতে সুবিস্তীর্ণ ভূমির নাম ডাঙ্গা।
পূর্ব্বদিকে নিম্নভূমি ঐ ভগ্ন ভাঙ্গা॥
নিকটেতে সরোবর রায়দীঘি নাম।
সুধাসম বারি তার অতি অনুপম॥
বড় বড় জলাশয় আছে গ্রামমাঝে।
এ হেন সুতৃপ্ত বারি না হেরি সমাজে॥
চতুর্দ্দিকে রীতিমত স্থানেতে উদ্যান।
বহুবিধ বৃক্ষেতে অপূর্ব্ব শোভমান॥
তিনদিকে গ্রামপার্শ্বে নীচজাতির বাস।
গোপ, সৎগোপবর্গে সদা করে চাষ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব আর কায়স্থ গণক।
পরিপাটী বাসস্থান ভিন্ন ভিন্ন চক॥
তন্তুবায় তাম্বুলী বণিক কর্ম্মকার।
মদক রজক নাই* ছুতার সোণার॥
বিবিধ জাতির বাস গণ্ডগ্রাম বটে।
রায় রেয়ে বাবুয়ান আছে নানা ঠাটে॥
সুরম্য সুন্দর অট্টালিকা বহুতর।
কাঁচা পাকা কোঠা একতলা বড় ঘর॥
প্রশস্ত সকল বর্ত্ম পল্লীতে পল্লীতে।
বর্ষায় কর্দ্দম পদে না পায় লাগিতে॥
গ্রামেতে আছে চৌবাড়ী ট্রেনিং ইস্কুল।
অভাব দেখি না কিছু সমস্ত প্রতুল॥
কেহ লিখে কেহ পড়ে কেহ করে নিক†।
পত্রগতায়াত হেতু আছে লেটারবক্স॥
ডাক্তার ভিষক অন্য চিকিৎসক আছে।
বিশারদ সম সব রোগীদের কাছে॥

গ্রামের এই সম্পদ, সমৃদ্ধি, স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও শান্তির কারণও কবি নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ এই যে, গ্রামকে ধারণ ও শাসন করিবার উপযুক্ত কীর্তিমান মানুষ গ্রামেই অবস্থান করিতেন, এম-এল-এ বা এম-এল-সি হইবার মোহে শহরে ধাওয়া করিতেন না। অথবা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ মধ্যাহ্নে একটি করিয়া বায়ু-নিরোধক কচি ভাবের লোভে বালিগঞ্জ আলিগঞ্জে পাকা-পাকি ডেরা বাঁধিতেন না। পঞ্চ, দ্বিপঞ্চ ও ত্রিপঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার ঘটা অট্টালিকা সমারোহে যতই ঘন এবং ঋণ-ভারে যতই ঘোরালো হউক গ্রামে শিক্ষিত সক্ষম সজীব মানুষের বাস পুনঃস্থাপিত না হইলে সমস্তই বিফলে যাইবে। কবি হরিশচন্দ্র তাঁহার গ্রামের কৃতী ও যশস্বী মানুষদেরও তালিকা দিয়াছেন।

* * *

গ্রামের সুখশান্তি বিঘ্নিত এবং গ্রামের মানুষের সহজ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া বাংলা দেশে যে শহর ও শহরতলী দিনে দিনে সমৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর ধারণা বাংলাদেশের জনসাধারণকে যদি এখনও সচকিত-সচেতন না করিয়া থাকে তাহা হইলে আর কবে করিবে! কিছুদিন পূর্বে ভগ্নদূত শ্রীঅশোক সেন মারফৎ শ্রীনেহরু প্রচার করিয়াছিলেন যে, কলিকাতা মৃতের শহর, দিগ্‌ভ্রষ্ট শহর এবং কলিকাতা তাঁহার দুঃস্বপ্ন। গত ১৭শে ফেব্রুয়ারি নয়াদিল্লীর লোকসভায় তিনি কলিকাতার নূতন পরিচয় দিয়াছেন—কলিকাতা শোভা-যাত্রার শহর। পূর্বাপর উভয় মন্তব্য মিলাইলে শ্রীনেহরুর বক্তব্য স্পষ্টতর হইয়া উঠে, কলিকাতা মৃতের শোভাযাত্রার শহর অথবা শবযাত্রার শহর। অর্থাৎ এখানে মৃত মহাত্মা গান্ধী অথবা মৃত কার্ল মার্ক্সকে কাঁধে লইয়া অবিরাম মুমূর্ষু মানুষের মিছিল চলিয়াছে।

* নাই—নাপিত † নিক—সোনা, 'করে নিক' অর্থাৎ উপার্জন করে।

আমরা মনে করি এই কলিকাতা শহরে বাংলাদেশের গ্রামের শব কাঁধে লইয়া দুর্ভাগা গ্রামবাসীরাই নিরন্তর শ্মশান-শোভাযাত্রা করিয়া চলিয়াছে। এই শহর আত্মঘাতের শহর। শহর ও শহরতলীর পাটকলগুলিতে গ্রামের মানুষেরাই নিজেদের ফাঁসীর দড়ি নিজেরাই পাকাইয়া চলিয়াছে, প্রস্তুত হইবার জন্য নিজেরাই বাটার কারখানায় জুতার উপর জুতা প্রস্তুত করিয়া চলিয়াছে। ওদিকে জীবনধারণের উপযোগী অন্নশস্য গ্রামের মাটিতে বন্দী হইয়া হাহাকার করিতেছে, তাহাদের মুক্তিদাতা হলধরেরা সকলেই শহরে কল-কবলিত হইয়াছে।

—

গোপালদার এইবারকার পত্রের শেষাংশ এই :—

"ভায়া হে, আর একটি ব্যাপারে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। সংবাদপত্রের টুক্‌রা টুক্‌রা খবর পড়িয়া অনুমান করিতেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহিত্যিকদের জন্য একটি পিঁজরাপোল বানাইবার তালে আছেন। পৃথিবীর সর্বকালীর ও সর্বদেশীয় সাহিত্যের ইতিহাস আমি যতটুকু জানি, এইরূপ কাণ্ড আর কোথাও কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। প্রাচীনতম কাল হইতে সেদিনও পর্যন্ত রাজা-বাদশাদের দরবারে রত্নরূপে সাহিত্যিকেরা সম্মানিত ও পালিত হইয়া আসিয়াছেন, অনেকে ভূমি, গোধন অথবা ধন লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, বহু কবি-সাহিত্যিক বৃত্তিলাভে সম্মানিত হইয়াছেন কিন্তু এজমালী হারে সাহিত্যিকদের অশনবসন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা বিপ্লবোত্তর রাশিয়াতেই সর্বপ্রথম চালু হইয়াছে। রাশিয়ার সাহিত্য-পিঁজরাপোলের প্রথম সম্মানিত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গর্কী; ক্যাপ্রিদ্বীপে তাঁহার আরামের যে ব্যবস্থা সোভিয়েট সরকার করিয়া দিয়াছিলেন তাহা লোভনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই আরামের জন্য তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে হইয়াছিল; তাঁহার সাহিত্যিক সত্তা রাজনৈতিক সত্তায় বিসর্জন দিতে হইয়াছিল। রাজনীতি-নিরপেক্ষভাবে শুধু সাহিত্যিক হিসাবে রাশিয়াতে ১৯১৭ হইতে আজ পর্যন্ত কোনও সাহিত্যিক আহার ও আশ্রয় তো পানই নাই, লাঞ্ছিত নিগৃহীত ও বিতাড়িত হইয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহাদিগকে মরিতে অথবা বাঁচিতে হইয়াছে। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি সত্যসত্যই এই ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বামপন্থী কোনও সাহিত্যিক কি সেখানে প্রতিপালিত হইবে?

দিল্লীর সংবাদে পড়িলাম, আমাদের কবিশেখর কালিদাস রায়, তোমাদের কালিদাস দাদাকে সেখানকার বাঙালীরা সম্বর্ধিত করিয়াছেন। নিজ বাংলাদেশেও তিনি কম সম্মানলাভ করেন নাই যদিও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রায়শঃই তাঁহাকে দেশবাসীর অবহেলা ও উপেক্ষার জন্য কাঁদুনী গাহিতে শুনি। বাংলাদেশের তরুণ ও প্রৌঢ় সাহিত্যসমাজ তাঁহাকে সর্বদা অগ্রজের সম্মান দিয়া থাকে, তাঁহার অসম্মান করিবে কাহার সাধ্য! তিনি যদি সাহিত্যিক না হইয়া রাজনীতিক হইতেন তাহা হইলে শুধু মতান্তরের জন্য পরবর্তীয়েরা তাঁহার কি দুর্দশা ঘটাইত সুরেন্দ্রনাথ বিপিনচন্দ্রের দৃষ্টান্তেও কি তিনি তাহা শেখেন নাই? চিত্তরঞ্জন ঠিক সময় বুঝিয়া দার্জিলিঙে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানই তাঁহাকে বরণীয় ও স্মরণীয় করিয়াছে। আমাদের বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ বারীনদা এখনও তোমাদের কাছাকাছিই আছেন, তাঁহার কি দুর্দশা ঘটিয়াছে একবার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়ো। রাশিয়ার বিশ্ববিশ্রুত বিপ্লবী প্রিন্স ক্রোপট্‌কিন বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় কি নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন একটু চেষ্টা করিলেই জানিতে পারিবে।

তাই বলিতেছিলাম, যদি সাহিত্যিক হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চাও, দোহাই তোমাদের, রাজা, রাষ্ট্র ও রাজনীতির আশ্রয় কদাপি লইও না। ক্ষমতাশালীর জাতে জাত দিয়া আজ পর্যন্ত বহু হিন্দু মরিয়াছে, সাহিত্যিকেরা যেন সাধ করিয়া এই আত্মবিলুপ্তি না ঘটায়। আমার দ্বারা যদি দেশের কোনও কল্যাণ হইয়া থাকে দেশের শাসনকর্তার অবশ্য কর্তব্য আমি অক্ষম হইলে বৃত্তি দিয়া আমাকে পালন করা। কিন্তু সাহিত্যিকের আরামের জন্য রাজনীতিকেরা আখড়া করিয়া দিবে, সেখানে আশ্রয় লইবার পূর্বে সাহিত্যিকের যেন মৃত্যু হয়।

ভায়া হে, আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর পরে সাহিত্যদৈত্য মহামতি টলস্টয়ের কথা স্মরণ হইতেছে। রাজা তাঁহাকে সম্মান করেন নাই, রাজনীতিকেরা তাঁহাকে ভয়ে ও ঘৃণাভয়ে বর্জন করিয়াছিলেন, অথচ কী সম্মান, কী শ্রদ্ধা

তিনি শুধু স্বদেশবাসীর কাছে নয়, সমগ্র পৃথিবীর কাছে পাইয়াছিলেন। তাঁহার কথা মনে হইলেই আমাদের রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। এই জগৎব্যাপী স্বতঃস্ফূর্ত শ্রদ্ধাই সত্যকার সাহিত্যিকের কাম্য এবং যে সাহিত্যিক নিজের সৃষ্টির দ্বারা অধিকার অর্জন করেন তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য আলেকজাণ্ডারের ছিল না, সিজারের ছিল না, চেঙ্গীস খান, তৈমুরলঙ্গের ছিল না, হিটলারের ছিল না এবং আফ্রিকার ক্রুশভেরও নাই। বার্টন ('অ্যানাটমি অব মেলাঙ্কলি'), মেলভিল ('মবি ডিক') এবং এমিয়েল-('জার্নাল')এর মত কাহারও কাহারও ভাগ্যে সম্মান বিলম্বে আসিয়াছে কিন্তু তবু আসিয়াছে। এমন কি জেরার্ড ম্যানলে হপকিন্সও কালপ্রবাহে হারাইয়া যান নাই। যাহা হউক, টলস্টয়ের কথা বলিতেছিলাম। রাশিয়ার জার তাঁহাকে কী সমৃদ্ধি দিতে পারিতেন! কিন্তু তাঁহার পরবর্তী সাহিত্যিকেরা তাঁহাকে কী চোখে দেখিতেন তাহার একটি ছবি আইভান বুনিন তাঁহার 'স্মৃতি ও আলেখ্যে' দিয়াছেন। ১৮৯৩ সন, বুনিন তখন মাত্র তেইশ বৎসরের যুবক, তিনি থাকিতেন পোলটাভায়। তখন পর্যন্ত লিও টলস্টয়কে দেখার সুযোগ তাঁহার হয় নাই কিন্তু দেখিবার জন্য ছটফট করিতেছেন :—

'অনেক বছর হ'ল আমি সত্যিই তাঁর প্রেমে পড়েছিলাম। তার মানে, আমার মনের মন্দিরে তাঁর যে মূর্তি আমি গড়েছিলাম তাকে ভালবেসেছিলাম এবং রক্ত-মাংসের মানুষটিকে দেখবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলাম। এই ব্যাকুলতা আমার নিত্য সঙ্গী ছিল। কিন্তু কি করব বুঝে উঠতে পারতাম না। ইয়াসনায়া পলিয়ানায় [টলস্টয়ের শেষ আশ্রম] যাব? কিন্তু কোন্ অজুহাতে যাব? সেখানে না হয় গেলাম, কিন্তু কি বলব তাঁকে? শেষ পর্যন্ত আর থাকতে পারলাম না, গ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল দিনে হঠাৎ আমার কিরঘীজ ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলাম।'

কিন্তু মাত্র আশি মাইল ব্যবধানের প্রায় সবটাই অতিক্রম করিয়া বুনিন সাহস হারাইলেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৯৩ সনে তিনি সংবাদ পাইলেন টলস্টয় মস্কো আসিয়াছেন। তিনি বহুকষ্টে রেলপথের নিদারুণ ধকল সহ্য করিয়া মস্কো ছুটিলেন এবং শেষ পর্যন্ত টলস্টয়ের আবাস-স্থলের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন।

'তারপর কি ঘটল আমি কেমন করে বর্ণনা করব? জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি কিন্তু তুষারে যেন জমে গেছে। আমি সমস্ত পথটা ছুটে গিয়েছি। যখন পৌঁছেছি তখন আমার দম ফুরিয়ে এসেছে। চারিদিক নির্জন, নিঝুম—জ্যোৎস্নাস্নাত ছোট রাস্তাটি জনশূন্য, সামনের দরজায় কেউ নেই। গেট খোলা, জনমানবহীন। তুষারাচ্ছন্ন উঠোনও খালি। উঠোন ছাড়িয়ে বাঁদিকে একটা কাঠের বাড়ি, তার দু-চারটা জানলা থেকে লাল আলো আসছে। আরও বাঁয়ে সেই কাঠের বাড়ির পেছনে একটি বাগান। বাগানে পৌঁছে মাথা তুলে একবার চাইলাম, শীতের আকাশে তারাগুলি মিটমিট করে জ্বলছে—যেন পরীর দল। সবকিছু মিলে সত্যিই যেন একটা রূপকথার রাজ্য। বাগানখানা আশ্চর্য, বাড়িটা অদ্ভুত; আর ওই আলোকিত জানলাগুলোর আড়ালে কী ইঙ্গিতময় রহস্য; রহস্য—কারণ তাদের আড়ালে যে তিনি ছিলেন! আমার আশপাশে এমনই নিযুতি যে আমি আমার হৃদ্‌স্পন্দন পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছিলাম। সে স্পন্দন আনন্দের, আবার ভয়েরও।'

ভক্তে ও দেবতায় শেষ পর্যন্ত দেখা হইল। টলস্টয় প্রশ্ন করিলেন, 'বুনিন? তুমি কি মস্কোতে অনেক দিন এসেছ? কেন? আমাকে দেখতে? কি বললে? তুমি একজন তরুণ লেখক? খুব ভাল। নিশ্চয়ই লিখবে, লেখার নেশা যতদিন থাকবে লিখে যাও। কিন্তু মনে রেখো, লেখাটাই জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।'

বিদায় দেওয়ার সময় হইলে টলস্টয় বুনিনকে শেষ কথা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তোমাকে এবং ওই সঙ্গে বাংলাদেশের কালিদাস রায় প্রমুখ সকল সাহিত্যিককে শুনাইবার জন্যই আমার এই প্রসঙ্গের অবতারণা। টলস্টয় বলিলেন, 'হ্যাঁ, বিদায়, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তিনি আমার হাত চেপে ধরে আর একবার বললেন, মস্কো এলে আমার সঙ্গে দেখা করো। আর দেখ, জীবনের কাছ থেকে খুব বেশী কিছু প্রত্যাশা করো না, এখন যেমন আছ এর চেয়ে ভাল সময় জীবনে কখনো আসবে না। মানবজীবন অবিচ্ছিন্ন সুখের জীবন নয়, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত সুখের উদয় হয় মাত্র। সেইটুকুর মর্যাদা দিতে শেখ এবং সেই সুখের স্মৃতিতে বেঁচে থাক।'

টলস্টয়ের স্মৃতিতে আমার চিত্ত ভারাক্রান্ত, এখন আর

কিছু বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। তোমরা সাহিত্যিক, শুধু সাহিত্যেই প্রতিষ্ঠিত হও, ভগবান বুদ্ধের কাছে নিরন্তর সেই প্রার্থনাই করিতেছি। —ইতি গোপালদা।"

—

মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখিত কাব্য 'Captive Ladie' ("Visions of the' Past" সহ) ১৮৪৯ সনের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ হইতে বাহির হয়। ইংরেজী সাহিত্যে যশোলাভের উচ্চাশা মধুসূদনের আবাল্য ছিল এবং এই 'ক্যাপটিভ লেডী' কাব্যখানির উপর তাঁহার অনেক ভরসা ছিল। সুতরাং তিনি এদেশে অবস্থিত সহৃদয় ইংরেজদের মতামত সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। বন্ধু গৌরদাস বসাকের মারফৎ তিনি তাঁহার বইখানি কলিকাতায় কাউন্সিল অব এডুকেশনের তদানীন্তন সভাপতি ভারতবিখ্যাত ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বীটনকে (বেথুন) পাঠাইয়াছিলেন। বীটনের মন্তব্য মধুসূদনের সাহিত্যসাধনার গতি ইংরেজী হইতে ফিরাইয়া বঙ্গভাষাভিমুখী করিয়া দেয়। সুতরাং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে মধুসূদনের উদ্দেশে গৌরদাস বসাককে লিখিত ড্রিঙ্কওয়াটার বীটনের পত্রখানি গুরুত্বপূর্ণ। পত্রের প্রথমাংশ এই :

I beg that you will convey my thanks to your friend for the gift of his poem. It seems an ungracious return for his offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is, that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry. As an occasional exercise and proof of his proficiency in the language, such specimens may be allowed. But he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.

এই পত্রের তারিখ—কলিকাতা, ২০ জুলাই, ১৮৪৯। "The same advice which I have already given to several of his countrymen" বাক্যটি অনুসন্ধিৎসু গবেষকের কৌতূহল উদ্রেক করে। এই advice বা উপদেশ বীটন কাউন্সিল অব এডুকেশনের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার-বিতরণী-সভায় বক্তৃতাকারে দিয়াছিলেন। ১৮৪৯ সনের মার্চ মাসে এই সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভাপতি বীটনের বক্তৃতার মর্ম একটি সমসাময়িক পত্রিকা (বৈশাখ ১২৫৬, এপ্রিল ১৮৪৯) হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :

"শিক্ষাসমাজাধিপতি বিদ্যোৎসাহী বীটন্ সাহেব অনেকানেক বিষয়ে ছাত্রদিগের যথোচিত প্রতিষ্ঠা করিয়া এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যে হিন্দু ছাত্রেরা যে প্রকার প্রখর বুদ্ধিশালী, তাহাতে যদি তাহারা অল্পবয়সে বিদ্যানুশীলনের অভ্যাস পরিত্যাগ না করেন, তবে স্বগুণে বুদ্ধিবিষয়ে অতিপ্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন বিশেষতঃ তিনি এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষাশিক্ষা আবশ্যকতা বিষয়ে যে সবিবেচনাসিদ্ধ বক্তৃতা করিয়াছে তাহা পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছি। তিনি এরূ কহিয়াছেন,

'এইক্ষণে যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় বিবিধপ্রকার বি শিক্ষা করিতেছেন, স্বদেশীয় লোকদিগকে সেই সমস্ত বিদ্যা উপদেশ দেওয়া তাঁহারদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে বিদ্যাদান করিয়া যে মহোপকা করিতেছেন, এই প্রকারেই তাহার পরিশোধ করা উচিত কিন্তু তাঁহারা বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া স্বদেশের ভা শিক্ষা না করিলে কখনই এ ভার মোচন করিতে সম হইবেন না, কারণ বাঙ্গলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোকের বা আছে, সকলেই যে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইবে, ই কদাপি সম্ভাবিত নহে।

'কলিকাতায় যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় গ পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক আমার নিকট আনয়ন করে আমি তাহারদিগকে সর্ব্বদাই কহি যে বঙ্গভাষা শিক্ষ করাই তোমারদিগের যশঃপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় তাঁহারদিগের রচিত প্রস্তাব সমুদায়ের যথোপযুক্ত প্রশংস করিয়া পরে কহিয়াছি, যে যদি তোমরা আমার পরাম গ্রহণ কর, তবে এ প্রকারে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্ট পরিত্যাগ কর। যদি তোমারদিগের গ্রন্থকর্ত্তা হইবা অনুরাগ ও তদুপযোগী ক্ষমতা থাকে, তবে স্বকীয় ভাষা গ্রন্থ রচনা করিতে, অথবা ইংরাজি গ্রন্থের উত্তমোত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে স্থায়িতর কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে। যাঁহারা প্রথমে এই প্রথাবলম্বী হইয়া কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারদিগের নিমিত্ত বিপুল যশঃ সঞ্চিত রহিয়াছে।'"

স্মরণ রাখিতে হইবে মধুসূদনের 'ক্যাপটিভ লেডী' তখনও প্রকাশিত হয় নাই। তিনি মাত্র পঁচিশ বর্ষ বয়স্ক যুবক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখনও এগারো পূর্ণ হয় নাই। আরও মনে রাখিতে হইবে যে, অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগর মহাশয় তখনও ইংরেজীর আদর্শে কোনও সাহিত্য পুস্তক রচনা করেন নাই। বীটনের ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রই তাহার প্রমাণ।

—

লজ্জার সহিত স্বীকার করিতেছি গোপালদা একটি অন্যায় কার্য করিয়াছেন, উপরে মুদ্রিত তাঁহার পত্রমধ্যে কোনও আধুনিক পণ্ডিতের রচনা বলিয়া তিনি যে প্রবন্ধটি ("বর্ত্তমানকাল অল্পবিদ্যা ও লঘুচিত্ততার কাল") উদ্ধৃত করিয়াছেন, দেখিতেছি তাহা তিরাশি বৎসর পূর্বে 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা'য় (১৮৭৬ সন, আষাঢ়) প্রকাশিত হইয়াছিল। আশ্চর্য!

॥ একাদশ অধ্যায় ॥

॥ আত্মবিসর্জন ॥

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।'[১৩] কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দু বৎসরের মধ্যে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'রুদ্ধগৃহ', 'পথপ্রান্তে' ও 'শিউলিফুলের গাছ' এই পাঁচটি গদ্যরচনায় মৃত্যুশোক কবিমানসে কী বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই সাক্ষ্য বহন করছে। জীবন জগৎ ও প্রেম সম্পর্কে কবির চিন্তা ও চেতনা মৃত্যুর কঠিন কষ্টিপাথরে নিকষিত হয়ে প্রথম এই রচনাগুচ্ছে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এগুলির মূল্য অপরিসীম। বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এই রচনাগুচ্ছের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ ভাবসম্বন্ধ বিরাজমান। তার মধ্যে রুদ্ধগৃহ ও পথপ্রান্তের রচনারীতি এক, অর্থাৎ এ দুটি প্রবন্ধরূপেই গ্রথিত; শিউলিফুলের গাছ একটি বিশুদ্ধ রূপকাত্মক রচনা। আর পুষ্পাঞ্জলি ও বিবিধ প্রসঙ্গের রচনারীতি মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে লেখা কবির প্রথম মন্ময় গদ্যগ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গে'রই অনুরূপ। অর্থাৎ এগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনুচ্ছেদে বিভক্ত। পুষ্পাঞ্জলিতে সবসুদ্ধ বারোটি অনুচ্ছেদ আছে, আর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তেরোটি এবং ভাদ্র সংখ্যায় সতেরোটি মোট ত্রিশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র কয়েকটি অনুচ্ছেদ চলতি ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩৪২) 'নানা কথা'র আকারে গ্রথিত হয়েছে। কাদম্বরী দেবীর প্রতি অনুরক্তির কথাই শুধু যে এই রচনাগুলির মধ্যে আছে তা নয়, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রমানসের মূল ভাবসূত্রগুলিরও পরিচয় এগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই এই রচনাগুচ্ছকে প্রধানতঃ দু ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, প্রথম ভাগে মৃত্যুরচিত অপার বিচ্ছেদের একপারে দাঁড়িয়ে কবির ঐকান্তিক অনুরক্তির কথা, আর দ্বিতীয় ভাগে মৃত্যু-তীর্ণ অভিজ্ঞতায় জীবন ও জগতের সম্বন্ধে যে নূতন চিন্তাধারা উদ্ভূত হয়েছে তার কথা।

'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি বলছেন, 'হে জগতের বিস্মৃত, আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন? এ সব লেখা যে আমি তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে, তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না! এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার কথার একটিও কাহারও মনে থাকিবে না—কিন্তু ইহার একটি-দুটি কথা ভালবাসিয়া তুমিও কি মনে রাখিবে না! যে-সব লেখা তুমি এত ভালবাসিয়া শুনিতে, তোমার সঙ্গেই যাহাদের বিশেষ যোগ, একটু আড়াল হইয়াছ বলিয়াই তোমার সঙ্গে আর কি তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই! এত পরিচিত লেখার

একটি অক্ষরও মনে থাকিবে না? তুমি কি আর-এক দেশে আর-এক নূতন কবির কবিতা শুনিতেছ?'

যিনি 'জগতের বিস্মৃত', কিন্তু কবির 'চিরস্মৃত', তাঁর জন্যেই কবির এসব রচনা অথচ তাঁকে শোনাতে পারছেন না বলে কবির দুঃখের শেষ নেই! যে-সব লেখা তিনি এত ভালবেসে এতদিন শুনতেন, তাঁর সঙ্গেই যাদের বিশেষ যোগ ছিল, দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছেন বলেই তাদের সঙ্গে আর তাঁর কোনো সম্বন্ধ নেই এ চিন্তা কবির পক্ষে দুর্বিষহ। কিন্তু শুধু কাব্যরচনার সঙ্গেই যে তাঁর বিশেষ যোগ ছিল তাও তো নয়, সুদীর্ঘ সতেরো বৎসর ধরে কবির সম্পূর্ণ জীবনটাই যে তাঁর সঙ্গে সুখেদুঃখে গ্রথিত হয়ে উঠেছিল। সে কথাকেই বিশেষ করে স্মরণ করে কবি লিখেছেন, 'আমাকে যাহারা চেনে সকলেই ত আমার নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু সকলেই কিছু এক ব্যক্তিকে ডাকে না, এবং সকলকেই কিছু একই ব্যক্তি সাড়া দেয় না! এক-এক জনে আমার এক-একটা অংশকে ডাকে মাত্র, আমাকে তাহারা ততটুকু বলিয়াই জানে। এই জন্য, আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহার একটা নূতন নামকরণ করিতে চাই; কারণ, সকলের-সে ও আমার-সে বিস্তর প্রভেদ। আমার যে গেছে সে আমাকে কতদিন হইতে জানিত;—আমাকে কত প্রভাতে, কত দ্বিপ্রহরে, কত সন্ধ্যাবেলায় সে দেখিয়াছে! কত বসন্তে, কত বর্ষায়, কত শরতে আমি তাহার কাছে ছিলাম! সে আমাকে কত স্নেহ করিয়াছে, আমার সঙ্গে কত খেলা করিয়াছে, আমাকে কত শতসহস্র বিশেষ ঘটনার মধ্যে খুব কাছে থাকিয়া দেখিয়াছে! যে-আমাকে সে জানিত সে সেই সতের বৎসরের খেলাধুলা, সতের বৎসরের সুখদুঃখ, সতের বৎসরের বসন্ত বর্ষা। সে আমাকে যখন ডাকিত তখন আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের অধিকাংশই, আমার এই সতের বৎসর তাহার সমস্ত খেলাধূলা লইয়া তাহাকে সাড়া দিত। ইহাকে সে ছাড়া আর কেহ জানিত না, জানে না। সে চলিয়া গেছে, এখন আর ইহাকে কেহ ডাকে না, এ আর কাহারও ডাকে সাড়া দেয় না! তাঁহার সেই বিশেষ কণ্ঠস্বর, তাঁহার সেই অতি পরিচিত সুমধুর স্নেহের আহ্বান ছাড়া জগতে এ আর-কিছুই চেনে না। বহির্জগতের সহিত এই ব্যক্তির আর-কোন সম্বন্ধই রহিল না—সেখান হইতে এ একেবারেই পালাইয়া আসিল,—এ-জন্মের মত আমার হৃদয়কন্দরের অতি গুপ্ত অন্ধকারের মধ্যে ইহার জীবিত সমাধি হইল।' [পুষ্পাঞ্জলি]

কিন্তু পরমুহূর্তেই কবির মনে হয়েছে সতেরো বৎসরেই তো জীবন শেষ হয়ে যাবে না! 'এমন ত আরো সতের বৎসর যাইতে পারে! আবার ত কত নূতন ঘটনা ঘটিবে, কিন্তু তাহার সহিত তাঁহার ত কোন সম্পর্কই থাকিবে না! কত নূতন সুখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি ত হাসিবেন না—কত নূতন দুঃখ আসিবে কিন্তু তাহার জন্য তিনি ত কাঁদিবেন না। কত শত দিনরাত্রি একে একে আসিবে কিন্তু তাহারা একেবারেই তিনি-হীন হইয়া আসিবে! আমার সম্পর্কীয় যাহা-কিছু তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ আর এক মুহূর্তের জন্যও পাইব না! মনে হয়—তাঁহারও কত নূতন সুখ দুঃখ ঘটিবে, তাহার সহিত আমার কোন যোগ নাই। যদি অনেক দিন পরে সহসা দেখা হয়, তখন তাঁহার নিকটে আমার অনেকটা অজানা, আমার নিকট তাঁহার অনেকটা অপরিচিত। অথচ আমরা উভয়ের নিতান্ত আপনার লোক!' [পুষ্পাঞ্জলি]

কিন্তু এই তো মর্ত্যনিকেতনে মানবজীবনের নিয়তি! বিচ্ছেদ-বেদনা যতই মর্মান্তিক হোক, কালের প্রলেপে তার অগ্নিজ্বালা ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে আসবে, এমন কি তারপর একদিন বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়ে স্মৃতির সঞ্চয়গুলি কোন্ অদৃশ্য শূন্যলোকে হারিয়েও যাবে। বিরহীচিত্ত যতই চাক তার অন্তরবেদনা চিরন্তন হয়ে থাকবে, জীবনসত্যের অমোঘবিধানে একদিন সে দেখতে পায়—

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়!

এই তো জগতের নিয়ম! 'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি বলছেন, 'এ নিয়মের অর্থও বুঝি আছে! যতদিন কাজ করবে ততদিন প্রকৃতি তোমাকে মাথায় করে রাখবে। কিন্তু যেই তোমার দ্বারা আর কোন কাজ পাওয়া যাবে না, যেই তুমি মৃত হলে, অমনি সে তাড়াতাড়ি তোমাকে সরিয়ে ফেলবে—তোমাকে চোখের আড়াল করে দেবে—তোমাকে এই জগৎদৃশ্যের নেপথ্যে দূর

...রে নেবে। এমন না হলে মৃতেরাই এ জগৎ অধিকার করে থাকত, জীবিতদের এখানে স্থান থাকত না। কারণ, মৃতই অসংখ্য, জীবিত নিতান্ত অল্প। আমাদের চিরজীবনের কাজের, চিরজীবনের ভালবাসার এই পুরস্কার! এই ত চিরদিন হয়ে এসেছে, এই ত চিরদিন হবে!' এই নিষ্ঠুর জীবনসত্য তরুণ বিরহীচিত্তকে পীড়িত করেছে, তাই কবি বলছেন, 'তাই যদি সত্য হয়, তবে এই অতিশয় কঠিন নিয়মের মধ্যে আমি থাকিতে চাই না! আমি সেই চিরবিস্মৃতদের মধ্যে যাইতে চাই—তাহাদের জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে! তাহারা হয়ত আমাকে ভুলে নাই, তাহারা হয়ত আমাকে চাহিতেছে। এককালে এ জগৎ তাহাদেরই আপনার রাজ্য ছিল। কিন্তু তাহাদেরই আপনার দেশ হইতে তাহাদিগকে সকলে নির্বাসিত করিয়া দিতেছে—কেহ তাহাদের চিহ্নও রাখিতে চাহিতেছে না! আমি তাহাদের জন্য স্থান করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আমার কাছে থাকুক! বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাস হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দুদিনের হয় তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই না কেন। সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে; সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙিয়া লইয়া গেছে—যাবার সময় সে আমার কাছে কাঁদিয়া গেছে—যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে, এই জগতের মধ্যাহ্নকিরণে কি তাহার সেই ভালবাসার মালা প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব! আমার সঙ্গে তাহার যখন দেখা হইবে তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালবাসার পরিণামস্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না, কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্ক মালা! সেগুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে না!' [পুষ্পাঞ্জলি]

এই জগতের মধ্যাহ্নকিরণে প্রতি মুহূর্তে যদি সবই শুকিয়ে যায়, তাহলে আজীবনের এত ভালবাসার এই পরিণাম—কেবল কতকগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্কমালা। বহন করে চলতে কবিচিত্ত কিছুতেই রাজি নয়; তাই কবি বলছেন, 'বিস্মৃতিই যদি আমাদের অনন্তকালের বাসা হয় আর স্মৃতি যদি কেবলমাত্র দু দিনের হয়, তবে সেই আমাদের স্বদেশেই যাই না কেন। সেখানে আমার শৈশবের সহচর আছে।' বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'বিস্মৃতির দেশ'কেই কবি তাঁর 'স্বদেশ' বলেছেন। বিরহীচিত্তের এই স্বপ্নের ভুবন এই বিস্মৃতির দেশ কবিমানসে যে নূতন ভাবানুষঙ্গ রচনা করেছে, তা থেকে আমরা রবীন্দ্র-কাব্যলোকে এখন থেকে বার বার আর একটি জগতের কথা শুনতে পাব। জগতের সমীপিত্বি সকলের শেষে রবিহীন মণিদীপ্ত সেই প্রদোষের দেশ। তাহার অতীত তীরে কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে, সেখানে কবির বিরহী ভাবনা বার বার ছুটে যেতে চাইবে। মৃত্যুর পরে আমাদের প্রাণের সহচরদের সেটি প্রয়াণলোক। সেই স্বপ্নের ভুবন জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর, তা বিরহীর হৃদয়সংবেদ্য ভাবসত্য দিয়ে গড়া।

৭

আমরা বলেছি, আলোচ্য রচনাগুচ্ছের আদিতে আছে পুষ্পাঞ্জলি আর শেষে শিউলিফুলের গাছ। পুষ্পাঞ্জলির একটি অনুচ্ছেদে আছে, 'তুমি যে-ঘরটিতে রোজ সকালে বসিতে তাহারই দ্বারে স্বহস্তে যে-রজনীগন্ধার গাছ রোপণ করিয়াছিলে তাহা কি আর তোমার মনে আছে! তুমি যখন ছিলে তখন তাহাতে এত ফুল ফুটিত না, আজ সে কত ফুল ফুটাইয়া প্রতিদিন প্রভাতে তোমার সেই শূন্য ঘরের দিকে চাহিয়া থাকে। সে যেন মনে করে, বুঝি তাহারই পরে অভিমান করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ! তাই সে আজ বেশি করিয়া ফুল ফুটাইতেছে। তোমাকে বলিতেছে, তুমি এস, তোমাকে রোজ ফুল দিব! হায় হায়, যখন সে দেখিতে চায় তখন সে ভাল করিয়া দেখিতে পায় না—আর যখন সে শূন্যহৃদয়ে চলিয়া যায়, এ-জন্মের মত দেখা ফুরাইয়া যায় তখন আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলে কি হইবে! সমস্ত হৃদয় তাহার সমস্ত ভালবাসার ডালাটি সাজাইয়া তাহাকে ডাকিতে থাকে। আমিও তোমার গৃহের শূন্যদ্বারে বসিয়া প্রতিদিন সকালে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধ ফুটাইতেছি—কে দেখিবে! ঝরিয়া পড়িবার সময় কাহার পদয় চরণের তলে ঝরিয়া পড়িবে! আর সকলেই ইচ্ছা করিলে এই ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া মালা গাঁথিতে পারে, ফেলিয়া দিতে পারে—কেবল

তোমারই স্নেহের দৃষ্টি এক মুহূর্তের জন্যও ইহাদের উপরে আর পড়িবে না।'

আমরা 'পুষ্পাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি দেখি নি, রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে জীবনস্মৃতির গ্রন্থপরিচয়ে পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে ভারতী থেকে 'পুষ্পাঞ্জলি' সমগ্রভাবে সংকলিত হয়েছে। সংকলনকর্তা বলেছেন, 'পাণ্ডুলিপিতে ইহার পর একটি গান আছে—কেহ কারো মন বুঝে না (গীতবিতান)'।[১০] এখানে গীতবিতান থেকে উক্ত গানটি উদ্ধারযোগ্য :

কেহ কারো মন বুঝে না, কাছে এসে সরে যায়।
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়।
বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায়॥
মুখের পানে চেয়ে দেখো, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখ না ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না,
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়॥[১১]

পুষ্পাঞ্জলির আলোচ্য অনুচ্ছেদ এবং এই গানটির সঙ্গে শিউলিফুলের গাছ-এর ভাবানুষঙ্গ মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, একই হৃদয়বাসনা 'শিউলিফুলের গাছে' সমর্পিত হয়েছে। প্রথম দুটি ক্ষেত্রে কবির নিজের ভাষায় গদ্যে ও গানে যে কথা ব্যক্ত হয়েছে 'শিউলিফুলের গাছে' তাই বিশুদ্ধ রূপকের সাহায্যে উচ্চারিত। শিউলিফুলের গাছ বলছে :

'আমি সমস্ত দিন কেবল টুপ্‌টাপ্‌ করিয়া ফুল ফেলিতেছি; আমার ত আর কোন কাজ নাই। আমার প্রাণ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, আমার সাদা সাদা হাসিগুলি মধুর অশ্রুজলের মত আমি বর্ষণ করিতে থাকি।

* * *

'বাতাস আসিয়াছে। ভোরের বেলায় জাগিয়া উঠিয়াই আমাকে তাহার মনে পড়িয়াছে। রাত্রে সে স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে জাগিয়া আমার কোলের উপর আসিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়ে। আমার কোমল পল্লবের স্তরের মধ্যে আসিয়া সে আরাম পায়।...

* * *

'আমি এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকি—যাহার জন্য আমার ফুল ফুটিতেছে মনের সাধ মিটাইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে পারি না। এইজন্য আমি সমস্ত দিন ফুল ফেলিয়া ফেলিয়া দিই—আমি দাঁড়াইয়া থাকি কিন্তু আমার সুগন্ধ আমার প্রাণের আশা ঘুরিয়া বেড়ায়। আমার ফুলগুলি আমি বাঁধিয়া রাখি না, তাহারা উড়িয়া যায়। তাহাদের আমি জগতে পাঠাইয়া দিই, আমার আনন্দের বার্তা তাহারা দূরে গিয়া প্রচার করিয়া আসে। আমি আমার অজানা অচেনাকে ফুলের অক্ষরে চিঠি লিখিয়া পাঠাই। নিশ্চয় তাহার হাতে গিয়া পৌঁছায়, নহিলে আমার মনের ভার লাঘব হয় কেন? আমি নীলাকাশে চাহিয়া উদ্দেশে আমার প্রিয়তমের চরণে অনুক্ষণ অঞ্জলিপূর্ণ ফুল ঢালিয়া দিই, আমি যেখানে যাইতে পারি না, আমার ফুলেরা সেখানে চলিয়া যায়।'[১৮]

এখানে দেখা যাচ্ছে, পুষ্পাঞ্জলির অনুচ্ছেদে এবং গানটির মধ্যে যে নৈরাশ্যের ভাব ফুটে উঠেছিল এখানে তা পরিবর্তিত হয়ে একটি সার্থকতার আনন্দ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। গানে কবি বলেছিলেন :

বাতাস যখন কেঁদে গেল প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁঝের বেলায় একাকিনী কেন রে ফুল ঝরে যায়।

কিন্তু 'শিউলিফুলের গাছ' বলছে, 'জগতের প্রেম আমার মধ্যে ফুল হইয়া ফুটিয়া জগতে ফিরিয়া যায়। আমার যত আছে তত দিই। আরো থাকিলে আরো দিতাম।

'দিয়া কি হয়? শুকাইয়া যায় ছড়াইয়া যায়—কিন্তু ফুরাইয়া যায় না, আমার কোল ত শূন্য হয় না, প্রতিদিন আবার আমার প্রাণ ভরিয়া উঠে। প্রতিদিন নূতন প্রাণের উচ্ছ্বাস হৃদয় হইতে বাহির করিয়া সূর্যালোকে ফুটাইয়া তোলা, এবং প্রতিদিন আনন্দধারা অজস্রধারে জগতের মধ্যে বিসর্জন করিয়া দেওয়া এই সুখই ত আমি কেবল জানি; তারপরে আমার ফুল কে চায় আমার ফুল কে গ্রহণ করে, আমার ফুল কে দলন করে আমি তাহার কিছুই জানি না। মনের মধ্যে এই বিশ্বাস যে, আমার এই ফুল ফোটান' ফুল-বিসর্জন অবশ্য কিছু না-কিছু কাজে লাগেই। আমার ঝরা ফুলগুলি জগৎ কুড়াইয়া লয়। অতীত আমার ঝরা ফুল লইয়া মালা গাঁথে। আমার সহস্র ফুল অবিশ্রাম ঝরিয়া ঝরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের জন্য এক অপূর্ব নূতন শতদল রচনা করে। প্রভাতকলাকের

তালে তালে আমার ফুলের পতন। সেই সুমধুর ছন্দে আমার ফুলের পতনে জগতের নৃত্যগীত সম্পূর্ণ হইতেছে।

'আকাশের তারাগুলিও স্বর্গীয় কল্পতরুর ঝরা ফুল। তাহারা কি কোন কাজে লাগে না? মালার মত গাঁথিয়া কেহ কি তাহাদের গলায় পরে নাই? কোমল বলিয়া আমার ফুলগুলির উপরে কেহ কি পা-ও রাখিবে না? আমি জানি আমার ফুলগুলি ঝরিয়া জননী লক্ষ্মীর পদ্মাসনের তলে পুনর্জন্ম লাভ করে। সেখানে অমৃতধারায় অনন্তকাল প্রফুল্ল হইয়া থাকে। সেই অমর সৌন্দর্যের স্তরের উপর স্তরে জগদ্ব্যাপী স্তরের মধ্যে একটি ছোট পাপড়ি হইয়া আনন্দে বিকশিত হইতে থাকে।'

এই অংশে অভিব্যক্ত শিউলিফুলের গাছের আত্মকথা কবির আত্মকথারই প্রতিধ্বনি। 'কড়ি ও কোমল' কাব্য-গ্রন্থে সংকলিত 'সনেটগুচ্ছে'র ভূমিকা হিসাবে কবি যে কবিতাটি বসিয়েছেন তারও নাম 'ছোটোফুল'। সেখানে কবি বলছেন:

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক্, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।

*　　*　　*

ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

ছোটো ছোটো ফুলে মালা গেঁথে বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশের সঙ্গে যোগস্থাপনের মধ্যেই সেদিন কবি গভীর আশ্বাসের সন্ধান পেয়েছেন।

৮

রবীন্দ্রনাথের প্রেমচেতনা, প্রকৃতিচেতনা ও সৌন্দর্য-চেতনার নানা স্তর। এই সব স্তরভেদের ফলেই কবির কাব্যলোকে নানা বৈচিত্র্য নানা ভাবানুষঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর কঠিন কষ্টিপাথরে নিকষিত হয়েই তাদের স্বর্ণকান্তি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি বলেছেন, 'যখন আমাদের প্রিয়বিয়োগ হয় তখন সমস্ত জগতের প্রতি আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়, অথচ সন্দেহ করবার মত কোনো কারণ দেখতে পাইনে বলে হৃদয়ের মধ্যে কেমন আঘাত লাগে। যেমন নিতান্ত কোনো অদ্ভুতপূর্ব ঘটনা দেখলে আমাদের সন্দেহ হয় বুঝি আমরা স্বপ্ন দেখছি, আমাদের হাতের কাছে যে-জিনিস থাকে তাকে ভালো করে স্পর্শ করে দেখি এ-সমস্ত সত্য কিনা, তেমনি আমাদের প্রিয়জন যখন চলে যায়, তখন আমরা জগৎকে চারদিকে স্পর্শ করে দেখি এরাও সব ছায়া কিনা, মায়া কিনা, এরাও এখনি চারদিক থেকে মিলিয়ে যাবে কিনা। এই সত্যপরীক্ষার প্রথম স্তরে জগৎ ও জীবনের প্রতি জাগে গভীর অভিমান। আমাদের সবচেয়ে আপনার জন যখন একেবারেই 'নাই' হয়ে গেল তখনও চারদিকের আর সব কিছু ঠিক আগের মতই রয়েছে; প্রকৃতির এই বিধানকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। কিন্তু যখন বিরহী চিত্তে বিশ্বাস ফিরে আসে, 'নাই'-অন্ধকারের মধ্যে যখন সে 'আছে'-আলোকের সন্ধান পায়, তখন সে অনুভব করতে পারে 'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং'—তিন-ভুবন জুড়েই তার স্মৃতি, তার প্রেম, তার সৌন্দর্য-মূর্তি।' 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র আরম্ভেই এই চেতনাকে ভাষা দিয়ে কবি বলছেন, 'আমি মাঝে মাঝে ভাবি, এই পৃথিবী কত লক্ষকোটি মানুষের কত মায়া কত ভালবাসা দিয়া জড়ান। কত যুগযুগান্তর হইতে কত লোক এই পৃথিবীর চারিদিকে তাহাদের ভালবাসার জাল গাঁথিয়া আসিতেছে! মানুষ যেটুকু ভূমিখণ্ডে বাস করে, সেটুকুকে কতই ভালবাসে। সেইটুকুর মধ্যে চারিদিকে গাছটি, পালাটি, ছেলেটি গরুটি তাহার ভালবাসার কত জিনিসপত্র দেখিতে দেখিতে জাগিয়া উঠে; তাহার প্রেমের প্রভাবে সেটুকু ভূমিখণ্ড কেমন মায়ের মত মূর্তি ধারণ করে, কেমন পবিত্র হইয়া উঠে, মানুষের হৃদয়ের আবির্ভাবে বন্য প্রকৃতির কঠিন মৃত্তিকা লক্ষ্মীর পদতলস্থ শতদলের মত কেমন অপূর্ব সৌন্দর্য প্রাপ্ত হয়। ছেলেপিলেদের কোলে করিয়া মানুষ যে গাছের তলাটিতে বসে সে গাছটিকে মানুষ কত ভালবাসে।

প্রণয়িনীকে পাশে লইয়া মানুষ যে আকাশের দিকে চায় সেই আকাশের প্রতি তাহার প্রেম কেমন প্রসারিত হইয়া যায়। যেখানেই মানুষ প্রেম রোপণ করে দেখিতে দেখিতে সেই স্থান প্রেমের শস্যে আচ্ছন্ন হইয়া যায়! মানুষ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহার প্রেমের পাশে পৃথিবীকে সে বাঁধিয়া রাখিয়া যায়। অতীতকালের সংখ্যাতীত মৃত মনুষ্যের প্রেমে পৃথিবী আচ্ছন্ন; সমস্ত নগর গ্রাম কানন ক্ষেত্রে বিস্মৃত মনুষ্যের প্রেম শত সহস্র আকারে বিচরণ করিতেছে। মৃত মনুষ্যের প্রেম ছায়ার মত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। আমাদের সঙ্গে শয়ন করিতেছে। আমাদের সঙ্গে উত্থান করিতেছে।' এই অনুভূতিরই অপূর্ব-সুন্দর কাব্যরূপ পাই 'সোনার তরী'র "পুরস্কার" কবিতায়—

> শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
> চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;
> সমস্ত প্রাণে কেন-যে কে জানে
> ভরে আসে আঁখিজল,
> বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
> বহু দিবসের সুখেদুখে আঁকা,
> লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
> সুন্দর ধরাতল।

শুধু তাই নয়, কবি বলছেন 'আমরাও সেই মৃত মনুষ্যের প্রেম, নানা ব্যক্তি-আকারে বিকশিত।'[১২] তাছাড়া এই অনুভূতিও কবির হয়েছে যে, মানুষের প্রেম যেন জড় পদার্থের সঙ্গেও লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। 'নূতন বাড়ির চেয়ে যে-বাড়িতে দুই পুরুষে বাস করিয়াছে সেই বাড়ির যেন বিশেষ একটা কি মাহাত্ম্য আছে! মানুষের প্রেম যেন তাহার ইটকাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছে এমনি বোধ হয়। বিজনে অরণ্যের বৃক্ষ নিতান্ত শূন্য, কিন্তু যে বৃক্ষের দিকে একজন মানুষ চাহিয়াছে, সে বৃক্ষে সে মানুষের চাহনি যেন জড়িত হইয়া গেছে। বহু দিন হইতে যে গাছের তলায় রৌদ্রের বেলায় মানুষ বসে সে গাছে যেমন হ'রবর্ণ আছে তেমনি মনুষ্যত্বের অংশ আছে।'[১৩]

এই মনুষ্যত্বের অংশ, মানুষের প্রেম দিয়ে জড়ানো বলেই এই জড়জগৎ—আমাদের এই মর্ত্যনিকেতন কবির কাছে প্রিয়তম হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, প্রভাতসংগীতের যুগে একদিন এক দিব্যাবেশে কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, 'একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত।' সেদিন কবি তাঁর অন্তরে ঔপনিষদ সত্যেরই আনন্দ-স্পন্দ অনুভব করেছিলেন। এই রূপের জগৎ বিশ্বরূপেরই খেলাঘর। যা-কিছু পরিদৃশ্যমান সমস্তের মধ্যে তাঁরই আনন্দরূপ অমৃতরূপের প্রকাশ! আর কবি এই পৃথিবীকে এই নিসর্গলোককে আর এক দিক থেকে দেখলেন। এই দুই দেখার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। একটি জ্ঞানের আলোকে দেখা, আর একটি প্রেমের আলোকে দেখা। কবির কাব্যলোকে এই দুই দেখা কি ভাবে কতটা সার্থকতা পেয়েছে, অনুভবের ক্ষেত্রে সেখানে কতটুকু তর-তম ভেদ রয়েছে কবির নিসর্গচেতনার আলোচনায় তা অবশ্যই বিচার্য।

শুধু নিসর্গ-প্রকৃতিই নয়, নিসর্গ-সৌন্দর্যকেও কবি এই একই প্রেমের আলোকে নূতন করে দেখেছেন। 'পুষ্পাঞ্জলি'তে পাই, 'আমরা যাহাদের ভালবাসি তাহারা আছে বলিয়াই যেন এই জ্যোৎস্নারাত্রির একটা অর্থ আছে—বাগানের এই ফুলগাছগুলিকে এমনিতর দেখিতে হইয়াছে—নহিলে তাহারা যেন আর-একরকম দেখিতে হইত। তাই যখন একজন প্রিয়ব্যক্তি চলিয়া যায় তখন সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়া যেন একটা মরুর বাতাস বহিয়া যায়—মনে আশ্চর্য বোধ হয় তবুও কেন পৃথিবীর উপরকার সমস্ত গাছপালা একেবারে শুকাইয়া গেল না! যদিও তাহারা থাকে তবু তাহাদের থাকিবার একটা যেন কারণ খুঁজিয়া পাই না। জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের প্রিয়-ব্যক্তিকে তাহাদের মাঝখানে বসাইয়া রাখিবার জন্য। তাহারা আমাদের ভালবাসার সিংহাসন। আমাদের ভালবাসার চারিদিকে তাহারা জড়াইয়া উঠে, লতাইয়া উঠে, ফুটিয়া উঠে। এক-একদিন কি মাহেন্দ্রক্ষণে প্রিয়তমের মুখ দেখিয়া আমাদের হৃদয়ের প্রেম তরঙ্গিত হইয়া উঠে, প্রভাতে চারিদিকে চাহিয়া দেখি সৌন্দর্য-সাগরও তাহারই এক তালে আজ তরঙ্গ তুলিয়াছে—কত বিচিত্র বর্ণ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র গান! কাল যেন জগতে এত মহোৎসব ছিল না। অনেকদিনের পরে সহসা যেন সূর্যোদয় হইল। হৃদয়ও যখন আলো

দিতে লাগিল সমস্ত জগৎও তাহার সৌন্দর্যচ্ছটা উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সমস্ত জগতের সহিত হৃদয়ের এক অপূর্ব মিলন হইল। একজনের সহিত যখন আমাদের মিলন হয়, তখন সে মিলন আমরা কেবল তাহারই মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না, অলক্ষ্যে অদৃষ্টে সে মিলন বিস্তৃত হইয়া জগতের মধ্যে গিয়া পৌছায়। সূচ্যগ্র ভূমির জন্যও যখন আলো জ্বালা হয়, তখন সে আলো সমস্ত ঘরকে আলো না করিয়া থাকিতে পারে না।'

এই অংশে কবির সৌন্দর্যানুভূতি সম্পর্কে একটি নূতন কথা কবির মুখে শুনতে পাওয়া গেল। জগতের সমুদয় সৌন্দর্য যেন আমাদের ভালবাসার সিংহাসন! প্রিয়জনের মৃত্যুর পর কবি তাঁকে সেই সৌন্দর্যের সিংহাসনেই সমাসীন দেখতে পেয়েছেন। বলাকার ৭-সংখ্যক কবিতায় কবি শাজাহানের তাজমহলকে বলেছেন সম্রাট-কবির নব-মেঘদূত। এই সৌন্দর্যদূত বিরহী-প্রেমিকের প্রাণের আকূতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে সেই অলক্ষ্যের পানে যেখানে তাঁর বিরহিণী প্রিয়া মিশে আছেন—

প্রভাতের অরুণ আভাসে
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ-নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে।

'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থেও দেখা যাবে কবি ইমনকল্যাণে তাঁর 'মানসপ্রতিমা'র উদ্দেশে যে প্রেম-সংগীত রচনা করেছেন তাতেও আছে—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে,
তোমারে করেছি রচনা;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম-গগন-বিহারী।

কবি যখন মৃত্যুর পর তাঁর মানসপ্রতিমাকে বিশ্বসৌন্দর্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখলেন তখনই তাঁর শূন্য ভুবন পূর্ণ হয়ে উঠল। বিশিষ্ট রূপসীমার মধ্যে হারিয়ে তিনি তাঁকে ফিরে পেলেন বিশ্বের অপরিমেয় প্রেমের মধ্যে, অপরিসীম সৌন্দর্যের মধ্যে।

৭

জীবনস্মৃতিতে কবি বলেছেন, যাকে ধরেছিলেন তাকে ছাড়তেই হল, এটাকে ক্ষতির দিক দিয়ে দেখে যেমন তিনি বেদনা পেয়েছিলেন, তেমনি একে মুক্তির দিক দিয়ে দেখে একটা উদার শান্তিও বোধ করেছিলেন। অর্থাৎ মরণের বৃহৎ পটভূমিকায় কবি জীবনের প্রতি নিজের অন্ধ আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত হলেন। 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রথম কিস্তির অষ্টম অনুচ্ছেদের শেষে কবি বলছেন, 'শোকে আমাদের সংসারের ভার লাঘব করিয়া দেয়, আমাদের চরণের বেড়ি খুলিয়া দেয়, সংসারের অবিশ্রাম মাধ্যাকর্ষণ-রজ্জু যেন ছিন্ন করিয়া দেয়।' এই অবস্থায় কবির মনে এই জগৎ ও জীবনসত্য সম্বন্ধে যে নূতন উপলব্ধি হল তারই প্রকাশ আমাদের আলোচ্য রচনাপঙ্কের 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে'র মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই দুটি রচনা পরস্পরের পরিপূরক। 'রুদ্ধ-গৃহে' অভিব্যক্ত অনুভূতিকে কবির নবলব্ধ জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে তাঁকে ভুল বোঝা খুবই স্বাভাবিক। অক্ষয় চৌধুরীও তাঁকে ভুল বুঝেছিলেন। ১২৯২ সালের পৌষ মাসের 'বালকে' অনুযোগের সুরে তিনি কবিকে যে পত্র লেখেন তার প্রত্যুত্তরে কবি তাঁর নিজের বক্তব্যকে তাঁর নবলব্ধ জীবনবোধের আলোকেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। কবির এই উপলব্ধি যে তাঁর শোকবিমূঢ় চিত্তের একটা সাময়িক অনুভূতিমাত্র তা নয়, এই উপলব্ধিই এখন থেকে তাঁর চেতনা ও চিন্তায় স্থায়ী আকারে দেখা দিয়েছে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'রুদ্ধগৃহ' ও 'পথপ্রান্তে' লেখার ঊনত্রিশ বৎসর পরে 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'ছবি' ও 'শাজাহান' কবিতায় কাব্যচ্ছন্দে এই একই উপলব্ধির পুনঃপ্রকাশ ঘটেছে। আমরা যে-অর্থে রুদ্ধগৃহ ও পথপ্রান্তেকে পরস্পরের পরিপূরক বলেছি সেই অর্থে 'ছবি' ও 'শাজাহান' এই দুটি কবিতাও পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। প্রেম ও জীবনের সম্পর্ক কি, এই জিজ্ঞাসাই ওই প্রবন্ধযুগল ও কবিতাযুগলের প্রধান উপজীব্য। আমরা এখানে ছবি ও শাজাহান কবিতার কাব্যবিচারে প্রবৃত্ত হব না, রচনা দুটির উৎস-সন্ধানও আমাদের বর্তমান

উদ্দেশ্য নয়, আমরা শুধু ভাবানুষঙ্গের দিক দিয়ে রুদ্ধগৃহ ও পথপ্রান্তের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য সন্ধান করব।

'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে কবি বলছেন, 'বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে—তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জ্বলে না, দিনের বেলা সে-ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে।

* * *

'এ-ঘর বিধবা। এক জন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ-গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে। সকলেরই এমন একজন আছে যে মরিলে পৃথিবীর আর সকলই মরিয়া যায়—পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় মৃত্যু থাকে না।

'এ-জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, মৃত কোথাও টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধিভবন মৃত্যুকে পাথরচাপা দিয়া রাখে, মৃত্যুকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে। কৃপণ যেমন তাহার বহুমূল্য মানিকটি লোহার সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখে, সমাধিভবন তেমনি মৃত্যুর কঙ্কালটিকে বহুমূল্য রত্নের মত চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাখে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। * *

'পৃথিবীর এমন কোন্‌খানে আমরা পদক্ষেপ করিতে পারি যেখানে মৃত জীবের সমাধি নাই। কিন্তু পৃথিবীর দ্বার অবারিত। পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয়, জীবনকেও কোলে করিয়া রাখে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মত খেলা করে।

* * *

'পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হয়। জীবন যেমন আসে জীবন তেমনি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেমনি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা কেন? * * জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিও না। হৃদয়ের দুই দ্বারই সমান খুলিয়া রাখো। প্রবেশের দ্বার দিয়া সকলে প্রবেশ করুক, প্রস্থানের দ্বার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।'

'শাজাহান' কবিতায় এই জীবন-সত্যই আরো সুন্দর ও সুগ্রথিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে কবি বলছেন, জীবনের খরস্রোতে মানুষ নিত্য-ভাসমান। ভুবনের ঘাটে ঘাটে এক হাটে বোঝা নিয়ে সেই বোঝা অন্য হাটে শূন্য করে দিয়ে তাকে এই সংসার থেকে চলে যেতে হবে, অথচ প্রিয়জনকে হারিয়ে প্রেমিকের বিরহীচিত্তের একান্ত প্রার্থনা হল, তার অন্তর-বেদনা যেন চিরন্তন হয়ে থাকে। মমতাজ-বিরহী শাজাহান তাঁর মর্মনিঙড়ানো উপলব্ধি দিয়েই গড়ে তুললেন তাঁর অমর শিল্প তাজমহল। তারপর কালস্রোতের অনিবার্য বেগে তিনি ও তাঁর সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর তাজমহল দেশকালের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে শিল্পরূপে তাঁর মর্মবেদনাকে চিরন্তন করে রেখেছে। যুগ-যুগান্তর ধরে তার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে চিরবিরহীর সেই মর্মবাণী 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া'। এখানেই কবিচিত্তে জিজ্ঞাসা জেগেছে, শিল্পে যেমন একটি মুহূর্তই অনন্ত হয়ে ওঠে জীবনেও কি তা সম্ভব? স্মৃতির সমাধিমন্দির রচনা করে কি প্রাণের একদিনের প্রেমকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে? তারই উত্তরে কবি বলছেন—

সমাধি মন্দির
এক ঠাঁই রহে চিরস্থির;
ধরার ধুলায় থাকি
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।

জীবন গতিচঞ্চল। কাজেই যে-প্রেম বেঁধে রাখে, যে-প্রেম এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে-প্রেম জীবনধর্মের বিরোধী বলে জীবনের চলার পথে তাকে পিছনেই পড়ে থাকতে হবে। 'যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে নাহি জানে' সে-প্রেম জীবনের দোসর নয়। যে-প্রেম প্রাণের মধ্যে নিত্য প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল সে প্রেম আমাদের বেঁধে রাখে না। সে চলার পথে মানুষকে নিত্যই এগিয়ে

দেয়। পথিক মানুষের জীবনে প্রেমের এই সত্যকেই কবি 'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে ভাষা দিয়েছেন। তিনি বলছেন—

'আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়া পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহারা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা সুখ দুঃখ ভুলিতে ভুলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতি নিমেষের ভার ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসি কান্না আমার লেখার উপরে পড়িয়া অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভুলিয়া যায়, তাহাদের প্রেম তাহারা রাখিয়া যায়।

'আর কিছুই থাকে না কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহারা সমস্ত পথ কেবল ভালবাসিতে বাসিতে চলে। পথের যেখানে তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালবাসে। সেইখানেই তাহারা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চায়—তাহাদের বিদায়ের অশ্রুজলে সে জায়গাটুকু উর্বরা হইয়া উঠে। তাহাদের পথের দুই পার্শ্বে নূতন নূতন ফুল নূতন নূতন তারা ফুটিয়া থাকে। নূতন নূতন পথিকদিগকে তাহারা ভালবাসিতে বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে তাহারা চলিয়া যায়; প্রেমের প্রভাবে তাহাদের প্রতি পদক্ষেপের শ্রান্তি দূর হইয়া যায়।

* * *

'প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্যই তাহাকে পথের আলো বলি।

* * *

'পথ দেখাইবার জন্যই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্য কেহ আসে নাই। এই জন্য কেহই ভিড় করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ করিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর-কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।'[২১]

এই প্রবন্ধে কবি প্রেমকে বলছেন 'পথের আলো।' পথিক মানুষের জীবনের চলার পথে প্রেম আলো দেখায়। সে আলো অনির্বাণ। এমন কি যাকে আজ ভালবেসেছি তাকে একদিন আপাতদৃষ্টিতে ভুলেও যেতে পারি। কিন্তু প্রেম যদি এগিয়ে যাবার প্রেরণা রূপে আমাদের জীবনে এসে থাকে তা হলে তার আলো কোনদিনই নিভবে না। প্রেমের এই সত্যই 'ছবি' কবিতায় ভাষা পেয়েছে। জীবনের পথে এক সঙ্গে চলতে চলতে একদিন যে মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গেল, আড়াল হল বলেই যে সে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল তা নয়। সে আমাদের চোখের আলো হয়েই আমাদের মধ্যে বেঁচে রইল। অর্থাৎ তার প্রেম প্রেমিকের চোখে যে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল সেই আলো দিয়েই বিরহী তার বিশ্বভুবনকে দেখতে পায়। 'ছবি' কবিতায় তাই কবি বলেছেন :

নয়ন-সমুখে তুমি নাই ;
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

'পথপ্রান্তে' প্রবন্ধে কবি প্রেমকে বলেছিলেন পথের আলো, কিন্তু বিরহী-কবিচিত্তে তাঁর 'ভালোবাসার ধন' যেদিন 'কবির অন্তরে কবি' হয়ে ওঠেন সেদিন আলো বাইরে থেকে জলে না, কবির অন্তরেই তাঁর প্রাণের প্রদীপ হয়ে জলে ওঠে। সেই আলোয় কবি তাঁর মর্মলোকে এবং বিশ্বলোকে কখনো দেখেন তাঁর মানসপ্রতিমাকে আর কখনো দেখেন তাঁরই প্রেমের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে অনুরঞ্জিত এই বিশ্বভুবনকে।

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১৫ মা ভৈঃ; বিচিত্র প্রবন্ধ, রচনাবলী-৫, পৃ. ৪৪১।
১৬ রচনাবলী-১৭, পৃ. ৪৯৪।
১৭ গীতবিতান, প্রেম-পর্যায়ের ৩৬৫ সংখ্যক গান, পৃ. ৪২২।
১৮ বালক, ১২৯২, পৃ. ৩৮৫-৮৭।
১৯ বিবিধ প্রসঙ্গ (অনুচ্ছেদ-২), ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২।
২০ তদেব (অনুচ্ছেদ-৩)
২১ দ্রষ্টব্য, রচনাবলী-৫, পৃ. ৩৭৯-৩৮২।

স্বগত ঃ রোগশয্যায়

অসিতকুমার

আমি বড় ক্লান্ত শুধু এই কথা মনে রেখ তুমি।
তোমাদের কাছ থেকে বহুদূর আপন হৃদয়ে
বাস করি একা একা। গতিহীন আমার সময়ে
কেবল আকাশ আছে, আর আছে, ধুধু ছায়াভূমি।

হয়তো আমার কথা সব-ই ভুল। হয়তো সকল-ই
মনের কুহকে গড়া। বারে বারে তবু মনে হয়
যদিও আপন মনে একা একা আমি কথা বলি
তবু তার-ই মাঝে আছে তোমার-ও প্রাণের পরিচয়।

জীবনের শুরু, শেষ, সীমা কই, শুধু তার স্বাদ
এ জীবনে ধরা দেয়। এই বাঁচা, এই চেয়ে দেখা
মনে মনে চাওয়া, আর সে চাওয়ার খুশী ও বিষাদ
এও তো সে জীবনের, তুমি যার চেয়েছ প্রসাদ
সাগরে ঢেউয়ের মত সকলে-ই এক তবু একা,
ওঠা-পড়া ভাঙা-গড়া সে-ই এক আশা অবসাদ॥

পাথরের চোখ

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক সন্ধ্যা, অনেক সকাল স্বপ্ন-প্রদীপ জ্বেলে
বুক জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল কালো শহরের 'সেলে'···
আজও চোখ দুটি রেখে সেদিকের বোবা জানালার দিকে
চেয়ে থাকি রোজ সেই নিভে-যাওয়া আকাশ-দীপের দিকে।

কি দিয়ে জ্বালব ওরে পোড়া মন, সে প্রদীপ পাব বলতে?
আশা-পিলসুজে পালিশ ঘষছি : নেই তেল, নেই সলতে।

চোখের আকাশে আলো নেই তাই এ আকাশ আলোহারা
চেয়ে থাকা মিছে : ছাই-হওয়া মন সে শুধু ভস্ম তারা।
বৃথা সে তারার বন্ধ্যা দুয়ারে আজও তবু বার বার
মাথা কুটে মরি : এক ফোঁটা আলো কেউ তো দেয় না ধার!

দুটি পাথরের চোখ ভরে কবে আলো পাব পার বলতে?
আশা-পিলসুজে পালিশ ঘষছি : নেই তেল, নেই সলতে।

নিস্ফলা এই মরু-নীলিমায় নীল পদ্মের কুঁড়ি
ফুটবে না আর জানি তবু তার মাধুকরী নিয়ে ঘুরি!
সোনালী আশার জরি-সুতোটিকে স্বপ্নের সূচে ভরে
ছেঁড়া আকাশের বিবর্ণ বুক মরি শুধু রিপু করে।

খসে খসে পড়ে নভো-দিগন্ত, বাকি শুধু বুক জ্বলতে :
আশা-পিলসুজে পালিশ ঘষছি : নেই তেল, নেই সলতে!

প্রসঙ্গ কথা

বাস্তবতার মোহ

নারায়ণ চৌধুরী

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্থার কোয়েসলার ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে এক বক্তৃতায় তিনি সাহিত্য-শিল্পীর ভূমিকা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, শিল্পীর দায়িত্ব অতি কঠিন দায়িত্ব। সার্কাসের নিপুণ দড়ির খেলার খেলোয়াড় যেমন দড়ির উপর স্বীয় ভারসাম্য রক্ষা করে অগ্রসর হয়, শিল্পীকেও তেমনি সাহিত্য-রজ্জুর উপর পদে পদে ভারসাম্য রক্ষা করে সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হয়। একটু তিনি অসাবধান হয়েছেন কি তাঁর পা হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তাঁর চলার পথের একদিকে আছে প্রচার-সাহিত্যের খানা, অন্যদিকে আছে বাস্তববিমুখ শূন্যগর্ভ বাক্‌চাতুরীর গভীর খাদ। এই দ্বিবিধ পতন-সম্ভাবনার বিপদ সম্পর্কে শিল্পীকে সর্বদাই অবহিত থাকতে হয়।

কোয়েসলারের এই বিশ্লেষণ খুবই খাঁটি সন্দেহ নেই। আমাদের দেশেও বলা হয়েছে, সাধকদের চলা ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে চলার মতই কঠিন ও আয়াসসাপেক্ষ। সাহিত্যও উচ্চমার্গের একটি সাধনা। সুতরাং সাহিত্য-শিল্পীকেও ক্ষুরের ধারের উপর দিয়ে সর্বদা চলতে হবে তাতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু আপাতত এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য আমি লেখনী ধারণ করি নি। আমার বিচার্য অন্য বিষয়। কোয়েসলার শিল্পীকে দুটি বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে বলেছেন—প্রচার-প্রবণতা ও বাস্তববিমুখতা। কিন্তু বাস্তববিমুখতা যেমন একটা বিপদ, অতিরিক্ত বাস্তবসচেতনতার বিপদ তার চেয়ে কম ভয়াবহ নয়। সমাজজীবনের বাস্তবের দিকে পিঠ দিয়ে থেকে অসার বাক্‌চাতুরীর মোহে নিছক ও নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার লীলায় মেতে ওঠবার যেমন আমরা সার্থকতা খুঁজে পাই নে, তেমনি আত্যন্তিক বাস্তবতার প্রতি অনুরাগবশে বাস্তব জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটির চিত্রায়ণেরও যুক্তি বুঝি না। বাস্তববিমুখতা যদি মন্দ হয় তো অতিরিক্ত বাস্তব-মুখিনতাও কম মন্দ নয়। এই শেষোক্ত বিষয়ের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাতের জন্যই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন নবীন কথা-সাহিত্যিকের রচনায় প্রায়শঃ যে নগ্নতা ও নিরাবরণতার চিত্র দেখা যায় তা এই বাস্তবতার অজুহাতেই সাধারণতঃ অঙ্কিত হয়ে থাকে। সুতরাং বাস্তবতার নিষ্ঠায় কোথাও না কোথাও আমাদের সীমারেখা টানা দরকার। বাস্তব-বিমুখতা যেমন ভাল নয়, তেমনি আত্যন্তিক বাস্তববাদকেও গ্রাহ্য মনে করবার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্যন্তিক বাস্তববাদের ত্রুটি দুইটি—নগ্নতা ও খুঁটিনাটি-পরায়ণতা। সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধারা-ধরন যাঁরা অবধান সহকারে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, এই দ্বিবিধ ত্রুটিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে পরিদৃশ্যমান। হয় খুঁটিনাটির বর্ণনায় লেখক প্রয়োজনের অতিরিক্ত মনোযোগ অর্পণ করেন, নয় তো সমাজের পচনশীল গলিত কদর্য দিকটিকে বাস্তবনিষ্ঠার নামে পাঠকসাধারণের অনভ্যস্ত চোখের সামনে মেলে ধরেন। এইরূপ মেলে ধরায় পাঠকের চক্ষু পীড়িত হয়, জ্বালা অনুভব করে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাতে লেখকের কিছু যায়-আসে না। তিনি আধুনিক কালের সমাজ-বাস্তবতার আদর্শের (social realism) একজন প্রবল অনুরাগী। পাঠকের মনে অনুকূল-প্রতিকূল যে প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন, তিনি এই ভেবে আত্মসন্তোষ অনুভব করেন যে, তিনি তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে বাস্তবতার পোষকতা করছেন, তিনি সমাজ-অচেতন বা সমাজবিমুখ এমন অপবাদ আর তাঁর বিরুদ্ধে চাপাবার জো রইল না।

সমাজ-সচেতনতার আদর্শ মূলতঃ সৎ আদর্শ হয়েও এইভাবে কার্যতঃ তা নবীন কথাসাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন করে চলেছে। সমাজ-বাস্তবতার আদর্শকে গ্রহণ করে তাঁরা যুগের দাবি যেমন পূরণ করছেন তেমনি উৎসাহের উগ্রতা ও আতিশয্যবশতঃ সেই আদর্শের সীমা লঙ্ঘন করে তাঁরা যুগের দাবীর বিরুদ্ধতাও করছেন। সমাজ-বাস্তবতার মানে এই নয় যে নির্বিচারে ও নিরঙ্কুশ ভাবে সমাজের সর্বপ্রকার বাস্তবকে সাহিত্যে রূপদানে অগ্রসর হতে হবে। জীবনের সত্যমাত্রই সাহিত্যে চিত্রিতব্য নয়। জীবনের অগুনতি সত্যগুলি থেকে বাছাইয়ের একটা কাজ আছে, সে কাজ যিনি যত সুষ্ঠুভাবে নিষ্পাদন করতে পারেন ও সেই নির্বাচিত সত্যগুলিকে যিনি যত সংযম ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে চিত্রায়িত করতে পারেন তিনি তত উঁচুদরের শিল্পী। জীবনে যা যা ঘটে তার সব-কিছুকে এবং যেমন যেমন ভাবে ঘটে হুবহু সেই ভাবে তাদের সাহিত্যে রূপ দিতে গেলে সাহিত্য একটা উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্যের ক্ষেত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য। পবিত্র সাহিত্যের ক্ষেত্রকে এমন একটা হাটের হট্টগোলে পরিণত করতে কার মন চাইতে পারে একমাত্র শোধনাতীত মজ্জাগত একপেশে বাস্তববাদী ছাড়া? সাহিত্যের সত্য আর বাস্তবের সত্যকে সমার্থক আর সমীকৃত মনে করা থেকেই সাম্প্রতিক সাহিত্যে যত বিপত্তির উদ্ভব হয়েছে।

তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যসৃষ্টির অবাস্তবতা ও অতিরিক্ত কাল্পনিকতা সৌন্দর্যবাদ লীলাবাদ প্রভৃতির অযৌক্তিকতা সম্পর্কে একদা সতর্কবাণী উচ্চারণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিশ্বের প্রায় সকল দেশে যুদ্ধপূর্ব সাহিত্যের একটা প্রধান লক্ষণই হল বিশুদ্ধ সৌন্দর্যায়ণের আনন্দে বুঁদ হয়ে থেকে জীবনসত্যকে ভুলে থাকা। একমাত্র জার-আমলের রুশ সাহিত্য ও বাস্তববাদী ঘরানার উনিশ-শতকীয় ফরাসী সাহিত্যকে এ কথায় ব্যতিক্রম বলা যায়। শিল্পী তাঁর স্বয়ংরচিত আত্মকেন্দ্রিকতার বিবরে স্বেচ্ছাবন্দী থেকে বাস্তব জীবনের সত্যের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণার বশে কেবলই কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে শূন্যমার্গে ভেসে বেড়াতে ভালবাসতেন। এই অবাস্তব গগনবিহার বা কল্পনার গজদন্ত মিনারে স্বেচ্ছাবন্দিত্বকে কেউ বলেছেন অব্যাহতিবাদ কেউ বলেছেন নন্দনবাদ। কিন্তু নাম এর যাই হোক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই দৃষ্টিভঙ্গী ও তৎপ্রসূত সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে সন্দেহাতীত উৎকর্ষের অনেক লক্ষণ বিদ্যমান থাকলেও বিশ শতকের যুদ্ধ ও যুদ্ধপরবর্তী পৃথিবীর প্রচণ্ড রূঢ় অভিজ্ঞতা ওই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকে অপরিহার্য করে তুলেছিল। তারই খাত বেয়ে এল যুদ্ধপরবর্তী সমাজ-বাস্তবতার আদর্শের ঘোষণা। যুগের প্রয়োজনে এর আবির্ভাব অনিবার্য ছিল। বিশ শতকের গোড়ায় বা প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পরে যে-সব সাহিত্যশিল্পীর জন্ম, তাঁরা তাঁদের চোখের উপর দেখলেন পুরাতন মূল্যবোধ একে একে সব গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সমাজের পুরনো কাঠামো যুদ্ধের প্রচণ্ড ধাক্কায় বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, সমাজ-সম্পর্ক শ্রেণী-সম্পর্ক লোকব্যবহার পারিবারিক বন্ধন প্রভৃতির মধ্যে অভাবিতপূর্ব সব ধারণার উন্মেষ হয়েছে এবং সেই সকল ধারণার দ্বারা নূতন সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সামাজিক বৈষম্য সামাজিক ন্যায়বিচারের অভাব ধনী-নির্ধনের অবস্থায় দুস্তর ব্যবধান শ্রেণীতে শ্রেণীতে স্বার্থবোধের দ্বন্দ্ব প্রচণ্ড একটা ভারের মত নতুন কালের শিল্পীদের বুকের উপর চেপে বসেছে। এরকম যখন শিল্পী-সাহিত্যিক শ্রেণীর মানসিক অবস্থা, তদবস্থায় পুরাতন বিশুদ্ধ সৌন্দর্যায়ণের নীতিতে আর কাজ চলবার উপায় ছিল না। যুগের দাবী পূরণার্থেই সমাজ-বাস্তবতার আদর্শের সূচনা হল, হয়ে ভালই হল। আর্থার কোয়েসলার সম্ভবতঃ ওই অর্থেই, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদের বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা থেকেই বাস্তববিমুখ শূন্যগর্ভ বাক্‌চাতুরীর বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি জানিয়েছেন এবং ওই হুঁশিয়ারির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর গভীর বাস্তবপ্রীতি। তাঁর সাহিত্যও এই বাস্তবপ্রীতির সাক্ষ্য দেয়—শুধু সমাজের বাস্তবই নয় রাজনীতির বাস্তব আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বাস্তবও। এই শক্তিধর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত বাস্তবকেই ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে, বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় ও উপযুক্ত দার্শনিক প্রত্যয়ের সহিত।

কিন্তু দার্শনিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে বলিষ্ঠ ভঙ্গিমায় বাস্তবতার চর্চা এক আর নিছক পর্যবেক্ষণের উপর একান্ত

নির্ভরতায় জীবনের হুবহু অনুকৃতির ভিত্তিতে বাস্তবতার চর্চা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা ও সূক্ষ্মতা কথাসাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ কিন্তু একমাত্র সম্পদ নয়। পর্যবেক্ষণপটুতা মননের দ্বারা মণ্ডিত হওয়া চাই। নইলে সেই পর্যবেক্ষণ প্রায়শঃ খুঁটিনাটিপরায়ণতায় কণ্ঠিত ও অবসিত হতে বাধ্য। এবং, যা আরও ভয়ের কথা, লেখকের সংযমবোধ যদি তাদৃশ পাকা না হয়, তা হলে ওই দুর্বলতার রন্ধ্রপথে নগ্নতার আত্মপ্রকাশ ঘটা কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নয়, এবং বলা বাহুল্য, তা ঘটেও থাকে। সম্প্রতি একজন প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক দৈনিক পত্রিকার এক প্রবন্ধে সাহিত্যে পাপ-পুণ্য সু ও কু এই দুইয়েরই স্থান আছে যুক্তিতে বাস্তবতার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন এবং এটিকে আধুনিক সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ বলেছেন। সাহিত্যে আলো-ছায়া সু ও কু পাপ-পুণ্য উভয়বিধ চিত্রণের স্থান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কোন্ লেখক কী মনোভাব থেকে ওই মিশ্র চিত্রণের অভিমুখে ঝোঁকেন সেটিরও হিসাব নেওয়া উচিত। এই বিচার-ক্রিয়া বাদ দিয়ে নিছক আদর্শের ঘোষণা হিসাবে লক্ষণটিকে ব্যক্ত করলে সত্যের পুরাপুরি প্রতিষ্ঠা বোধ হয় হয় না। এ-জাতীয় অস্পষ্ট বা অসমাপ্ত উক্তিতে নবীন সাহিত্যিক যাঁরা ক্লেদরতির উপাসক তাঁরা বরং উৎসাহিতই হন এবং তাঁদের নগ্নতাধর্মী অতি-বাস্তব সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূলে প্রবীণের সমর্থন পাওয়া গেছে মনে করে প্রতি পদে তাল ঠুকে বেড়াবার জোর খুঁজে পান। বিপথগামী তরুণ সাহিত্যিকদের প্রতি শুধুমাত্র শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে এরূপ অহেতুক পক্ষপাত প্রদর্শন বিচক্ষণ প্রবীণের পক্ষে উচিত কার্য হয় কিনা তা তাঁকেই বিবেচনা করে দেখতে বলি। —এমন বিচক্ষণ প্রবীণ, যিনি নিজের লেখায় কখনও সংযমভ্রষ্ট হন না, বাস্তবতার দাবী পূরণ করতে গিয়েও কোথাও শোভনতার গণ্ডী লঙ্ঘন করেন না। তিনিও ভাল-মন্দের আলোছায়া ঘেরা বিমিশ্র জীবনেরই চিত্রকার কিন্তু সাহিত্যের স্বধর্ম সম্পর্কে তাঁর নিজের বোধ অতিশয় গভীর বলে এ যুগের ধ্যান-ধারণায় লালিত এবং সমাজ-বাস্তবতার আদর্শে দীক্ষিত হয়েও কোন অবস্থাতেই ক্লেদরতির কাছ ঘেঁষতে তাঁকে দেখা যায় না। এমন যিনি লেখক তিনিই কিনা আধুনিক সাহিত্যের অতিবাস্তবধর্মী সৃষ্টির জয়গানে মুখর হয়েছেন! একবার তিনি ভেবেও দেখলেন না তাঁর এই সমর্থন অনভিজ্ঞ আর অপরিণতবুদ্ধি নবীনদের হাতে কী সাংঘাতিক অস্ত্রই না তুলে দিচ্ছে! প্রবীণের এই বিচারবৈক্লব্যে গভীর বেদনার ক্লেশ অনুভব করি।

আমি এ কথা পূর্বেও একাধিক বার বলেছি আবারও বলি, পাপের চিত্রকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ায় দোষ নেই, কিন্তু কেন তা দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে লেখকের বিবেক সর্বাবস্থায় সাফ থাকা চাই। লেখকের অভিপ্রায়ের শুদ্ধি অথবা মালিন্যের উপরই তাঁর ওই-জাতীয় চিত্রায়ণের ভাল-মন্দ প্রধানতঃ নির্ভর করছে। লেখকের উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, সেক্ষেত্রে সত্যনিষ্ঠার তাগিদে অতি-বাস্তবতার অবতারণা করলেও তাতে বিশেষ কোন দোষ অর্শায় না, কেন না লেখকের সাহিত্যধর্মই শেষ পর্যন্ত তাঁকে অনাচারের কবল থেকে রক্ষা করে। তাঁর সহজাত সৌন্দর্যবুদ্ধিই তাঁকে বলে দেয় বাস্তব জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে তাঁর এই পর্যন্ত যাওয়া চলে, এর বেশী অগ্রসর হলে সেটি ফোটোগ্রাফী হয়তো হবে সাহিত্য আর থাকবে না। তা ছাড়া, কোন ক্ষেত্রে যদি নিষ্করুণ সত্যের অলঙ্ঘনীয় দাবী পূরণের জন্য সমাজসম্মত শোভনতার সীমা লঙ্ঘনের প্রয়োজন হয়ও সেক্ষেত্রে লেখকের অভিপ্রায় দিয়ে ওই কার্যের ভাল-মন্দ বিচার করতে হবে; অভিপ্রায়ের সততায় ও মহত্ত্বে অনেক সময় অতি-বাস্তবতার চিত্রণের দোষ কেটে যায়।

যেমন, প্রখ্যাত অনেক বিদেশী লেখকের উপন্যাসে নিরাবরণ দেহচিত্রণ আছে, কিন্তু তাঁরা ওই শ্রেণীর চিত্রণকে তাঁদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন সাধারণ পাঠকের যৌনানুভূতিতে সুড়সুড়ি জাগিয়ে বইয়ের কাটতি বাড়াবার জন্য নয়, মানবজীবনের ও মানব অস্তিত্বের কোন একটি মৌল তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই সম্ভবতঃ, নয়তো অসংযমের কুফল বর্ণনার জন্য। তাঁদের শক্তি এবং মানসিক প্রস্তুতিই তাঁদের সম্পর্কে কোনরূপ ভুল বোঝবার অবকাশ আমাদের দেয় না। তাঁরা যে উচ্চতা ও পবিত্র গাম্ভীর্যের পটভূমি থেকে বাস্তবের বিচার করেন সেই উচ্চতাই তাঁদের সর্বপ্রকার ক্লেদরতির কলুষ থেকে রক্ষা করে। তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিশালত্বই তাঁদের অভিপ্রায়ের

সততার নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ স্বরূপ। এমিল জোলা, আনাতোল ফ্রাঁস, রলাঁ, জিদ্, মোরিয়াক, টমাস মান, ওদিকে রুশ সাহিত্যের দিক্‌পালগণ—সকলেরই রচনা সম্পর্কে এ কথা বলা চলে। টমাস মানের Death in Venice বড় গল্পটির কথাই ধরা যাক। আপাতদৃষ্টিতে এ কাহিনীর বিষয়বস্তু perverse, এমন কি অশ্লীলও বলা চলে। কিন্তু এ গল্পের কী প্রতিবাদ্য? নীতির সঙ্গে সৌন্দর্যস্পৃহার দ্বন্দ্ব, আর এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার ফলে একজন বর্ষীয়ান খ্যাতিমান জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-শিল্পীর সারা জীবনের সাধনার ও সাফল্যের বুনিয়াদ এক লহমায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। শিল্পীর মৃত্যু হল। এ গল্পের বিষয়বস্তুতে morbid বা perverse বা indecent যে মনোভাবেরই ছোঁয়া লাগুক না কেন, অনীতির পোষকতা এ গল্পের লক্ষ্য নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। সঙ্কীর্ণ নীতিবাদী অর্থে নয়, এক মহত্তর জীবনসত্যের অভিব্যক্তিরূপে এখানে বৃহৎ নীতির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সকল বড় শিল্পীরাই তাই করে থাকেন, অতীতে করে এসেছেন, ভবিষ্যতেও তাই করবেন। মহাভারতেও কত অসামাজিক প্রসঙ্গের বর্ণনা আছে। তা বলে তার গ্রহণে বাধা হয় না। একজন ধ্যানসিদ্ধ ঋষির নৈর্ব্যক্তিক নিরাসক্ত ব্যাপক জীবন-অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা প্রাচীন ভারতের ওই জীবনের বৈচিত্র্যকে মেনে নিই। দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের প্রজ্ঞাদৃষ্টিই মহাভারতের কাহিনীতে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আপাত-কলুষের সম্ভাবিত কুফলের হন্তারক।

কিন্তু ধ্যানদৃষ্টি তো পরের কথা, বর্তমানকালীন যে-সব লেখকের অভিপ্রায়ের সততা পর্যন্ত নেই, তাঁদের সম্বন্ধে কী বলা যায়? তাঁরা যে প্রায়শঃ তাঁদের গল্পে উপন্যাসে সস্তা মন-দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী আর নর-নারীর স্থূল জৈব সম্পর্কের চিত্রায়ণের সমারোহ ঘটান, সে কি কোন মহৎ অভিপ্রায়ের চরিতার্থতার জন্য, কোন মৌলিক জীবন-সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য? না কি নিছকই পাঠকের প্রসুপ্ত কামায়নের প্রবৃত্তিকে চাগিয়ে তোলবার জন্য? সাধারণ পাঠকশ্রেণীর মধ্যে বইয়ের বিক্রি বাড়াবার জন্য, কতকগুলি ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন গবেট প্রকাশকের অর্থলালসার শিকার হবার জন্য? কোন্ অভিপ্রায়ে তাঁরা এই অতি বাস্তবধর্মী নগ্নতার চিত্র পরিবেশনে প্ররোচিত হন সেটা তাঁরা বুকে হাত দিয়ে পরিষ্কার করে বলুন। তাঁদের বিবেকও নির্মুক্ত হোক আমরাও অপ্রিয় সমালোচনার দায় থেকে রেহাই পাই। তাঁদের কি সেই মানসিক প্রস্তুতি আছে—বুদ্ধিগত ও অনুভূতিগত প্রস্তুতি—যার বলে তাঁরা স্থূল জৈব সম্পর্কের চিত্রণকে মৌলিক একটি জীবনসত্যের প্রকাশ হিসাবে শিল্পসৌন্দর্যের উচ্চতর ক্ষেত্রে উন্নীত করতে সমর্থ? বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ রোহিণী ও গোবিন্দলালের, 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনী ও নগেন্দ্রের সম্পর্কের রূপায়ণের বেলায়, রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনী ও শচীশ, 'ঘরে বাইরে'তে বিমলা ও সন্দীপের সম্পর্কের রূপায়ণের বেলায়, এমন কি শরৎচন্দ্র তাঁর 'গৃহদাহ' উপন্যাসে অচলা ও সুরেশের জৈব সম্পর্কের রূপায়ণের বেলায় যে আশ্চর্য কলা-কুশলতা, সংযম ও উদ্দেশ্যের সততার পরিচয় দিয়েছেন, তার শতাংশের একাংশ ক্ষমতাও কি বর্তমানের দেহবাদী লেখকদের লেখনীতে প্রকাশ পেয়ে থাকে? এ শুধু শক্তিরই তারতম্যের প্রশ্ন নয়, দৃষ্টিভঙ্গীরও মৌলিক তারতম্যের প্রশ্ন। অধিকাংশ আধুনিক লেখকেরই দৃষ্টিভঙ্গী খুব নীচু সুরে বাঁধা। সহজ সাফল্য সস্তা খ্যাতি ও অনায়াসলভ্য অর্থের প্রতি মোহ এঁদের মহৎ সাহিত্যব্রত থেকে স্খলিত করে ফাঁপা পেশাদার লিখিয়েতে পরিণত করেছে। এঁরা বিত্তকৌলীন্যের আদর্শের নিকট গললগ্নীকৃতবাস এবং প্রকাশকচক্রের আজ্ঞাবহ। এঁরা লেখা নিয়ে খেলা-খেলা ব্যসনে নিয়োজিত, মহত্ত্বের ও চরিত্রবত্তার সামান্যতম বীজও বোধ হয় এদের মধ্যে নেই। Scribe-এর বেশী সম্মান যাঁদের প্রাপ্য নয় তাঁরা সব সাহিত্যের এক-একজন কেউকেটা হয়ে সাহিত্যের messiah রূপে সম্বর্ধনা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে আক্ষরিক অর্থে নিম্ন-মাঝারিদের মেলা বসেছে। 'মেলা' বলাও বোধ হয় ঠিক হল না, 'নিম্ন-মাঝারিদের গাজন বা হাট' বললেই বোধ হয় পরিস্থিতির সত্যতর বর্ণনা করা হয়। শক্তির সঞ্চয় এঁদের নিতান্ত অপ্রতুল; শক্তির এই ঘাটতি এই-সব নিম্ন-মাঝারির দল পূরণ করবার চেষ্টা করছেন সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বারা ও গায়ের জোরে। সংখ্যাশক্তির বাহুল্যে এঁরা সংখ্যালঘুকে চেপে মারবার চেষ্টা করছেন, যদিও এমন হওয়া মোটেই আশ্চর্য

নয় যে, সত্য হয়তো ওই আপাত-নিঃসঙ্গ সংখ্যালঘুদের সঙ্গেই রয়েছে। কোন সাহিত্যিকচক্র দলভারী অর্থাৎ মাথা-গুনতিতে ভারী হলেই মাথা সেখানে বিরাজ করবে এমন কোন কথা নেই। ইতিহাসের শিক্ষা এবং সাহিত্যের অভিজ্ঞতা বরং ভিন্ন কথা বলে। মাথাগুনতির ভার-বহুলতা সংহতি ও সঙ্ঘবদ্ধতার' নামে অনেক সময়ই যে মিথ্যা ও অত্যাচারের আকারে আত্মপ্রকাশ করে এ আজ আর কিছু নতুন তথ্য নয়। গণতন্ত্রের অনেক সুফলের সঙ্গে তার এই অভিশাপ সম্পর্কেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই আজ সচেতন। এই মিথ্যার অত্যাচারের কাছে একক হলেও সত্য মাথা নোয়ায় না। সত্য নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব জীবন বরণ করবে তবু প্রাণ গেলেও মিথ্যাকে সত্য বলে স্বীকার করবে না। শুদ্ধমাত্র শক্তির বাহ্বাস্ফোটে বিহ্বল হয়ে সংখ্যাশক্তির বাহুল্যের নিকট সত্য মাথা নুইয়েছে সত্যসাধনার ইতিহাসে এমনতর নজির কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সংখ্যাশক্তিকে বাধিত করবার জন্য সত্য কোন সময়েই মুচলেকা দিয়ে সংসারে আসে না, সেটি তার ভূমিকাও নয়।

যাক, যে কথা বলছিলাম। আধুনিক বাস্তববাদী সাহিত্যের দুটি লক্ষণ আমাকে বিশেষভাবে পীড়া দেয় সে কথা পূর্বেই বলেছি। এক নগ্নতা, দুই খুঁটিনাটি-পরায়ণতা। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের শেষোক্ত লক্ষণটি সম্পর্কে বর্তমানে কিছু বলব।

একটা কথা আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, বাংলা সাহিত্যের পরিধি বিস্তৃততর হয়েছে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বেড়েছে। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। এ কথা খুবই সত্য যে পূর্বের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার সাধিত হয়েছে। এখন নতুন নতুন দেশ নতুন নতুন পরিবেশ বাংলা সাহিত্যে আশ্রয়-ভূমি খুঁজে পেয়েছে এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য বৈচিত্র্য সাধিত হয়েছে। এত বৈচিত্র্যের স্বাদ আমা পূর্বে পাই নি। এখন বাংলা কথাসাহিত্যের সুবিস্তৃত আঙিনায় নাগারা এসেছে, আন্দামানী আদিবাসীরা এসেছে, তিব্বতীরা এসেছে, পূব-বাংলার বেবাজিয়ারা এসেছে, এতাবৎ-সাহিত্যে-অপরিজ্ঞাত অন্য দেশ ও সম্প্রদায়ের মানুষেরা এসেছে। শুধু তাই নয়, বাংলা দেশের অভ্যন্তরেও বিষয়বস্তুর মনোনয়নে লেখকের দৃষ্টি পূর্বের তুলনায় বহুগুণ সম্প্রসারিত হয়েছে। এককালে যে সব শ্রেণীর মানুষের কথা সাহিত্যে স্থান পাওয়া অভাবিত ছিল, নির্যাতিত শোষিত সেই সব অবহেলিত মানবকের দল আজ সাহিত্যের আসরে তাদের স্থান করে নিচ্ছে। জেলেদের মাছধরার কাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস রচিত হতে পারে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ বস্তু অকল্পনীয় ছিল, এখন ঠিক এই বিষয়েরই উপর তিন-তিনটি পূর্ণাবয়ব উপন্যাসের খবর সাহিত্যামোদী পাঠকমাত্রেই রাখেন। বাংলার বাইরেকার নানা দেশ ও জাতির অভিমুখে এবং বাংলার ভিতরে নীচুতলার সম্প্রদায়গুলির দিকে শিল্পদৃষ্টির এই সম্প্রসারণ ও ব্যাপ্তি যে সাহিত্যের অগ্রগতির পক্ষে নানা দিক দিয়েই শুভ সূচনা করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এতে যে শুধু সাহিত্যের বৈচিত্র্যই বাড়ছে তাই নয়, লেখকদেরও মনোদিগন্তের সম্প্রসারণ ঘটছে বলে মনে করি। শিল্পদৃষ্টির এই ক্রমস্ফুট ঔদার্য ও উন্মুক্তির পথে তাঁদের মনের আবিলতা একদিন কেটে যেতে পারে এমন আশা আজকের পরিস্থিতিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও একদিন সত্য হয়ে ওঠা আশ্চর্য নয়।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, শিল্পদৃষ্টির এই সম্প্রসারণ ও ব্যাপ্তি যেমন শুভের ইঙ্গিতবাহী হয়ে এসেছে, তেমনি অন্যদিকে কিছু অনিষ্ট-সম্ভাবনাও বয়ে নিয়ে এসেছে। ওই ব্যাপ্তির সুড়ঙ্গপথে লেখকদের খুঁটিনাটিপরায়ণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য শক্তির দ্বারা এই খুঁটিনাটিপনার অভিশাপ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব, কিন্তু বর্তমান লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যাশিত সেই শক্তির উন্মেষ হতে এখনও অনেক বিলম্ব বলে মনে হয়। আলোচ্য খুঁটিনাটিপরায়ণতা বস্তুটি কী সেটি একটু সবিস্তারে বলা প্রয়োজন।

দেখা যায় লেখকেরা অনেক সময় নূতন পরিবেশের কথা বলতে গিয়ে কাহিনীর সুছাঁদ বিন্যাস ও তার নিটোল পরিণতির প্রতি তাদৃশ মনোযোগ আরোপ না করে পাঠকের মনে অপরিচয়ের চমক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বইয়ের ভিতর অর্ধ-জ্ঞাত অজ্ঞাত শব্দজালের কুহক সৃষ্টি করেন। ওই অপরিচিত শব্দসমাবেশকে যে কাহিনীর রসময়তার মধ্যে চারিয়ে মিশিয়ে দেওয়া দরকার, নিজেদের নূতনত্বের মোহে এবং পাঠকমনে নূতনত্বের মোহ সৃষ্টির তাগিদে

সে কথা আর লেখকদের মনে থাকে না। ফল দাঁড়ায় এই যে, ওই সব অনভ্যস্ত অপরিচিত শব্দ কাহিনীদেহে বিস্ফোরকের ন্যায় চড়চড় করতে থাকে ও তদ্দ্বারা পাঠকের দৃষ্টির ও মনোযোগের বিভ্রম ঘটায়। বৈচিত্র্য-প্রয়াসী নূতন লেখকদের ভাবখানা এই যে, আর কোন প্রক্রিয়ায় পাঠকের মন জয় করতে পারি আর না পারি, নতুন নতুন কথার মধ্যে যে অপরিচয়ের চমক আছে সেই চমকের সাহায্যে পাঠকচিত্ত জয় করে নেব। আরও একটি অস্ত্র আছে। অপরিচিত মানুষদের জীবনের ধারা ও দৈনন্দিন জীবনযাপনপ্রণালীর খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত ফলাও করে বর্ণনা করে পাঠকের চমৎকৃত চক্ষুতে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া। তাতে করে নিজেদেরও ব্যাপক জীবন-অভিজ্ঞতার একটা বিজ্ঞাপন হয়। কাহিনীর পরিপাটি বিন্যাস নিটোল রূপায়ণে কী আসে যায়, পাঠকের মনোযোগ ওই খুঁটিনাটিতে আবদ্ধ করে রাখতে পারলেই অর্ধেক কাজ হাসিল। চমকসৃষ্টির এই অনুচিত মনোভাবের দ্বারা কবলিত হয়ে একাধিক লেখক ব্রতচ্যুত হয়েছেন তার নজির আছে।

সত্যের খাতিরে বলতেই হবে, প্রথমে তারাশঙ্কর তাঁর আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিতে এই অভ্যাসের সূত্রপাত করেন। বীরভূমের আভ্যন্তর পল্লীজীবনের এমন সব লৌকিক শব্দ তিনি ব্যবহার করতে শুরু করেন, যেগুলি ব্যবহার না করলেও উপন্যাসের কোন সৌকর্যহানি হত না। তারাশঙ্করের এই অভ্যাস তাঁর পরবর্তীকালীন উপন্যাস 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় সর্বোচ্চ গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়। এখন দেখাদেখি আরও কেউ কেউ এই ধারাটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের বেলায় যা ছিল শক্তিমত্তার সহিত মিশ্রিত অনিষ্ট-সম্ভাবনা-হীন একটি আঞ্চলিক দুর্বলতামাত্র, সেইটে পরবর্তীদের হাতে পাঠকদের ঘায়েল করবার একটা মোক্ষম অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীরা কথায় কথায় অপরিচয়ের চমক সৃষ্টি করে সরলমনা পাঠকদের ঠকাচ্ছেন, বিচক্ষণ পাঠকদের রসোপভোগে বাধা ঘটাচ্ছেন। নাগা কাহিনীতে এত কথায় কথায় নাগা শব্দ যোজনার কী প্রয়োজন, যদি চমক সৃষ্টিই তার উদ্দেশ্য না হয়? মাছ মারার কাহিনীতে জেলে জীবনের এতশত খুঁটিনাটি শব্দ-ব্যবহারেরই বা কী প্রয়োজন, যদি পাঠকের মনে ধাঁধা লাগানোই লেখকের অভিপ্রায় না হয়? কাহিনীর integration-এর দিকে ঝোঁক নেই, শুধুই অজানা কথার ছড়াছড়ি। দেখা যাচ্ছে, এখন থেকে নোট-বইয়ে-টুকে-রাখা শব্দ উপন্যাসের পরিধির মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দিতে পারলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি, কাহিনীর বিন্যাসপারিপাট্য তথা শিল্পসৌন্দর্যের দিকে না তাকালেও চলতে পারে।

যদি বলেন কাহিনীতে আঞ্চলিকতার আমেজ ঘরোয়া আমেজ (local colour) সৃষ্টির জন্য এই প্রক্রিয়ার দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে বলব, আঞ্চলিকতার আমেজ সৃষ্টির জন্য পদে পদে অপরিচিত শব্দের ঠোক্কর সৃষ্টির দরকার হয় না, জায়গা বুঝে দুই-চারিটি লাগসই শব্দের ব্যবহারই যথেষ্ট। কথায় কথায় অনভ্যস্ত শব্দের ধূম্রজাল তাঁরাই সৃষ্টি করেন যাঁরা ওই দিয়েই যুদ্ধজয় করতে চান, অন্য-কোন প্রকরণের প্রয়োগ যাঁদের সহজায়ত্ত নয়।

সবচেয়ে অবাক্ হয়েছি সমরেশ বসুর ন্যায় শক্তিশালী নবীন লেখককে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা কবলিত হতে দেখে। তাঁর বহুল-প্রচারিত 'গঙ্গা' উপন্যাসটি খুঁটিনাটিপনায় ভরা। জেলে জীবনের অতি-তুচ্ছ খুঁটিনাটি, অতি-তুচ্ছ দৈনন্দিন ব্যবহারের কথা এমন সোৎসাহ প্রচণ্ডতার সহিত বইটিতে ঠেসে দেওয়া হয়েছে যে ওই খুঁটিনাটিপরায়ণতার তলায় বইটির শিল্প-সৌন্দর্য চাপা পড়ে গেছে। ফলতঃ, শিল্প-সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বইটি সম্বন্ধে তেমন উল্লসিত হওয়া যায় না। এ বইয়ের বাঁধুনি আমার কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে, ঘটনাচিত্রণ ততোধিক। হিমি ও বিলাসের মন-দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারটিতে রোমান্টিক ন্যাকামির চূড়ান্ত করে ছাড়া হয়েছে। অমর্ত্যের বউয়ের সঙ্গে বিলাসের সম্পর্কের চিত্রণাংশটি রীতিমত অশালীন। বইয়ের ভাষা ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্করহিত এবং একালের অতি-বাস্তব-ধর্মী আটপৌরে ভাষারীতির স্বগোত্র। বঙ্কিম-রবীন্দ্র-নাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকলে ভাষার আদল এমন হত না। এ বইয়ের একমাত্র প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য জেলে জীবনের সাংগ্রামিকতার চিত্র। সমস্ত বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে জীবনসংগ্রামের দৃঢ়তা উপন্যাসটিতে উচ্চকণ্ঠ ভাষা পেয়েছে। তমিস্রার সমুদ্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য আলোকস্তম্ভের মত ফুটে আছে। এই আলো আরও দূরবিস্তারী ও প্রখর হতে পারত যদি খুঁটিনাটির কুয়াশা তাতে আড়াল না সৃষ্টি করত। কিন্তু এ যুগ কুয়াশারই যুগ। এ কুয়াশা কাটতে আরও অনেক বিলম্ব।

অটোমেটিক

জীবন ও সমাজ

বিনয় ঘোষ

পাতলুন আঁটলুম, বড়লোক চাটলুম, তারপর কী? কী? কী? জিজ্ঞাসা করেছেন আধুনিক কবি।

কিছুই না। জীবনটা খাড়া-বড়ি-থোড়! খাড়া-বড়ি-থোড়! খাড়া-বড়ি, খাড়া-বড়ি, থোড়-থোড়-থোড় !!

হয়তো তাই। হয়তো কেন, সত্যিই তাই। পৃথিবীতে যত সমুদ্র, তত বালুতট এবং সমস্ত বালুতটে যত বালুকণা আছে তার একটিমাত্র বালুকণা—মানুষ। সেই বালুকণার জীবন নিয়ে এত প্রশ্ন কেন? জীবনটা যদি সত্যিই খাড়া-বড়ি-থোড় হয়, জেম্‌স্ জয়সের (James Joyce) ভাষায়—"their weatherings and their marryings and their buryings and their natural selections"—"a human pest cycling (pist!) and recycling (past!)"—তা হলে এত প্রশ্ন কেন? যেহেতু বালুকণাগুলো বালু নয়, মানুষ—এবং বালুতটে আমরা বাস করি না, বাস করি জীবনের তটে—সমাজে।

থোড়-বড়ি-খাড়া ছন্দ চক্রবৎ ঘূর্ণনের ছন্দ, পিস্টনের ছন্দ, বৈদ্যুতিক হাতুড়ির ছন্দ। যন্ত্রযুগের সমাজের যান্ত্রিক ছন্দ। যন্ত্রের প্রথম আবির্ভাবকালে সত্যদর্শী অনেক কবি তাকে কাব্যে রূপায়িত করতে চান নি। ওয়াল্ট হুইটম্যান বা টেনিসন সকলে নন এবং প্রবল উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে তাঁরা হুইটম্যানের মতো 'হু-র্-রে' বলে বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে অভিনন্দন জানান নি :

Hurrah for positive science!
long live exact demonstration!

এডগার অ্যালান পো-র (Edgar Allan Poe) মতে কেউ কেউ বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কুৎসিত রূপ প্রত্যক্ষ করে তাকে—'Vulture whose wings are dull realities'—বলে বর্ণনা করেছিলেন। যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগে যন্ত্রবাগীশ জীবনের কথা ভেবে ম্যাথু আর্নল্ডের মত কেউ কেউ বলেছিলেন :

this strange disease of modern life
With its sick hurrry, its divided aims—

তাঁদের কথা সত্য হয়েছে কি মিথ্যা হয়েছে, তা নিয়ে তর্কের অবতারণা করে লাভ নেই, কারণ তর্কে সব 'বস্তু' মেলে না। বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে কোন কবি ও শিল্পী উপেক্ষা করেন নি। মানুষের জীবন ও সমাজকে অনেক সংকীর্ণতা থেকে বিজ্ঞান যে মুক্তি দিয়েছে, এ কথা উনিশ শতকের শিল্পী ও দার্শনিকরা জানতেন, এবং আজকের বিশ শতকের শিশুরাও তা জানে। সমস্যাটা বিজ্ঞান বা যন্ত্র নিয়ে নয়, যন্ত্রের ক্রীতদাস মানুষকে নিয়ে। বহু যুগের শিশু-মানুষ বিজ্ঞানের প্রচণ্ড শক্তি আয়ত্ত করে হঠাৎ যেদিন যৌবনে পদার্পণ করল, সেদিন সেই শক্তির দাসত্বের কথা তার সুদূর কল্পনাতেও স্থান পায় নি। কিন্তু যন্ত্রযুগের অগ্রগতি যত দ্রুত হতে থাকল তত গোলামের প্রভাব বাড়তে লাগল প্রভুর উপর। বিজ্ঞান ও যন্ত্রের যত উন্নতি হল, মানুষের তত উন্নতি হল না। বৈজ্ঞানিক শক্তি বিকাশের তালে তালে মানবিক শক্তির অবনতি ঘটতে থাকল। দুর্বৃত্তের হাতে ধারাল অস্ত্র দিলে যা হয়, অথবা দুষ্টবুদ্ধি বালকের হাতে আগুন, মানুষের হাতে বিজ্ঞানেরও অবস্থা হল তাই। সুতরাং অপরাধটা বিজ্ঞানের নয়, বিজ্ঞানীর নয়, যন্ত্রের নয়, যন্ত্রীরও নয়—অপরাধ মানুষের স্বভাবের ও প্রবৃত্তির। সমস্যাও বিজ্ঞান বা যন্ত্রের নয়—সনাতন মানুষের।

দেখা গেল, মানুষের জীবনের নিভৃততম কোণটিতে পর্যন্ত যন্ত্র চুপিসাড়ে প্রবেশ করেছে। যন্ত্রের মত মানুষও হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। সম্প্রতি এই যন্ত্রের জীবনেও যুগান্তকারী সব ঘটনা ঘটছে। অনেক বিস্ময়কর যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এতদিন, অনেক অসাধ্যসাধনও তারা করেছে, কিন্তু পদে পদে তাদের কর্মশক্তি নিয়ন্ত্রণ করেছে যন্ত্রকুশলী শ্রমিক, টেকনিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়াররা। যন্ত্র এবারে নিজেই সাবালক হয়ে উঠছে। বিংশ শতাব্দীর

বিগ্রহরে যন্ত্র পর-নির্ভর না হয়ে ক্রমেই আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে। বর্তমান যুগ স্বয়ংক্রিয় আত্মনির্ভর যন্ত্রের যুগ অর্থাৎ অটোমেটিক যন্ত্রের যুগ। যন্ত্রের স্বয়ংক্রিয়তা (Automation) যত দ্রুত বাড়ছে, তত যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ সম্পর্কটুকু দিন দিন ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রের উপর মানুষের যেটুকু 'কণ্ট্রোল' ছিল, তাও আর থাকছে না। মানুষের মত যন্ত্রও আজ তার স্বাতন্ত্র্য অর্জন করছে। কিন্তু মানুষ যখন তার স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হচ্ছে, তখনই ঠিক যন্ত্র হয়ে উঠছে আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রতিষ্ঠ। এই দুটি ঘটনার সমাবেশ—মানুষের স্বতন্ত্রতা বর্জন এবং যন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য অর্জন—সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে বোধ হয় সবচেয়ে বড় বৈপ্লবিক ঘটনা। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে মানুষ এখনও সচেতন নয়, কারণ পরিবর্তনের দ্রুততা এত ক্ষিপ্র ও অপ্রত্যাশিত যে চেতনাস্তরে তা সহজে দাগ কাটতে পারছে না। তা না পারলেও, যান্ত্রিক অটোমেশনের প্রবল সামাজিক প্রতিক্রিয়া তার জন্য বন্ধ হয়ে থাকবে না। দ্রুত পরিবর্তনের সময় সামাজিক চেতনার প্রবাহ সহজে তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে না। ধীরেসুস্থে চেতনার তরঙ্গ সৃষ্টি হতে থাকে, এবং যখন বাইরের পরিবর্তনের আঘাতে তাতে ঢেউ ওঠে, তখন চোখ মেলে সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় যে তার বাহির তো বটেই, পুরনো অন্তরটা পর্যন্ত ক্ষয়ে ক্ষয়ে একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। বলা যায় না, আমাদের আধুনিক যুগের সেই উনিশ-শতকী পুরনো অন্তরটা এরই মধ্যে অন্তঃসারশূন্য হয়ে গেছে কিনা! অনুভূতিতে মনে হয়, সেই সব সুন্দর সুন্দর নিটোল আদর্শ, ভাব-অনুভাব, ধ্যান-ধারণা, যা দিয়ে শতবর্ষ আগে বিজ্ঞানের শৈশবকালে মানুষ তার মানসলোকে স্বর্গ-রচনা করেছিল, আজ বিজ্ঞানেরই অভিশাপে সেই স্বর্গ থেকে সে নির্বাসিত হয়েছে। অনেক সোনার স্বপ্ন, অনেক হীরের টুকরো সব ধারণা, অনেক নীলকান্তের মত নীতিকথা, অনেক গিরিশৃঙ্গের মত উত্তুঙ্গ সব মানবিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আদর্শ—সব একে-একে যন্ত্রের নির্মম ঘর্ঘর শব্দে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। কবি টি. এস. এলিয়টের কাল-যন্ত্রের (Time-Machine) চেয়ে কঠোর এই যন্ত্র, কারণ আধ্যাত্মিক কবি-কল্পনা-মণ্ডিত নয় তার রূপ। এ যেন কতকটা জেম্স জয়সের "হোলমোল মিলহুইলিং ভিকো-সাইক্লোমিটার" ('Wholemole Millwheeling Vicociclometer")—যে ভিকোসাইক্লোমিটার যন্ত্রের খাঁজকাটা চক্রে বিদ্ধ হয়ে আমরা—সমাজের সোনারচাঁদ ছেলেরা থেকে আরম্ভ করে বাতিল বাউণ্ডুলেরা পর্যন্ত—সতত ঘুরপাক খাচ্ছি, এবং জীবনের চারিদিকে একটি 'বিষাক্ত বৃত্ত' (vicious circle) রচনা করে, তারি মধ্যে বন্দী হয়ে পরম আত্মতৃপ্তি লাভ করছি।

চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান ভিকোসাইক্লোমিটারের যুগে আমরা পৌঁছে গেছি বললেও ভুল হয় না। আজকের যুগকে কেবল যন্ত্রযুগ বললে সবটুকু বলা হয় না, বলা উচিত 'অটোমেটিক যন্ত্রের যুগ' বা 'অটোমেশনের যুগ'। এর মধ্যে যান্ত্রিক অটোমেশন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রবিদ, টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পপতি, শ্রমিক প্রভৃতি সমাজের প্রায় সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। অটোমেশনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া যদি একমুখী বা দ্বিমুখী হত, তা হলে এত বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি হয়তো হত না। এ কেবল বিস্ময়ের উত্তেজনা বা চাঞ্চল্য নয়, মানুষের বুদ্ধির চরম বিকাশকালে তার ভিত পর্যন্ত কাঁপিয়ে তোলার উত্তেজনা। মনে হয় যেন, মানুষের পর্বতপ্রমাণ বুদ্ধির গলায় পিছন থেকে কে অজ্ঞাতসারে দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিয়েছে। বুদ্ধি যখন স্পুটনিকের দম নিয়ে আকাশ ফুঁড়ে উড়তে চাইছে, তখনই আবার ডানাকাটা বলাকার মতো মাটিতেই আছড়ে পড়তে চাইছে সে, এবং বুদ্ধিবিভ্রম ঘটছে পদে পদে। যান্ত্রিক অটোমেশন যে মানুষের ক্ষুরধার বুদ্ধির বিজয় অভিযানের অকাট্য প্রমাণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন্ রাজ্য এবং কার রাজ্য জয়ের অভিযান এই অনন্যমেয় অটোমেশন? কার জন্য অটোমেশন, কিসের জন্য অটোমেশন?

এ-প্রশ্ন আজ মানুষের মনে জেগেছে এবং যত দিন যাচ্ছে তত প্রশ্নটি একটি সমস্যার আকার নিয়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। সমাজে যখন কোন সমস্যা দেখা দেয় তখন সমাজের নানাশ্রেণীর লোক নানা দিক থেকে সেই সমস্যার ব্যাখ্যা-বিচার করতে চেষ্টা করেন।

অটোমেশনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নানাশ্রেণীর লোকের নানা মতের কলরব শোনা যাচ্ছে অটোমেশন কেন্দ্র করে। কয়েকটির পরিচয় দিচ্ছি। প্রথমে ধনিকশ্রেণীর কথা বলব। আজকের টেকনোলজিক্যাল অগ্রগতি প্রধানত ধনিকদের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পোষকতার জন্যই যে সম্ভব হয়েছে, এ কথা বোধ হয় গরীবরাও অস্বীকার করবেন না। ধনিকশ্রেষ্ঠ আমেরিকার শিল্পপতিরা অটোমেশনকে সানন্দে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন :[১]

> We stand on the threshold of a golden future. The worker should await it with hope ; not fear. Automation is the magic key to the creation of wealth, and not a crude instrument of destruction ; the worker's talent and knowledge will continue to be rewarded in the coming fabulous earthly paradise···Served by the infallible, tireless activity of automation, guided by electronic instruments, the magic carpet of our free economy is advancing towards horizons of which we have never even dreamed.

আমেরিকার শিল্পপতিদের বক্তব্য হল: আমরা এক স্বর্ণযুগের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। অটোমেশন সেই স্বর্ণযুগের অগ্রদূত। শ্রমিকদেরও তার প্রতীক্ষায় থাকা উচিত—আশান্বিত হয়ে, সন্ত্রস্ত হয়ে নয়। অটোমেশন হল সেই সোনার চাবিকাঠি যার স্পর্শে অফুরন্ত সম্পদ উৎপন্ন হবে, কোন কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে না। ভবিষ্যতের অটোমেশনের যুগের ভূস্বর্গে দক্ষ শ্রমিকদের জ্ঞানবিদ্যার ও প্রতিভার কদর বাড়বে ছাড়া কমবে না। অটোমেশনের অভ্রান্ত ও অক্লান্ত কর্মকুশলতায়, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, আমাদের অবাধ অর্থনীতির 'ম্যাজিক কার্পেট' এমন এক নূতন দিগন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে, আগে যার স্বপ্নেও আমরা নাগাল পাই নি কোনদিন।

মার্কিন শিল্পপতি-সমিতির অটোমেশনের ভূস্বর্গের এই ব্লুপ্রিন্টে 'শ্রমিকদের' লক্ষ্য করে অনেক আশার বাণী শোনানো হয়েছে। ধান ভানতে শিবের গীত নিশ্চয়ই তাঁরা গান নি, শোনানোর 'উদ্দেশ্য' একটা কিছু আছে। মুনাফা-প্রণোদিত ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অটোমেশন আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হতে পারে। যে-যন্ত্র মানুষ চালাত, সেই যন্ত্র কেবল সুইচ টিপে দিলে যখন নিজেই চলতে থাকবে, তখন মানুষ অচল হয়ে যাবে। এই অচল মানুষরাই হল কলকারখানার শ্রমিকরা। যে শিল্প-কারখানায় আগে দশ হাজার শ্রমিক কাজ করত এবং প্রত্যেকে আট ঘণ্টা করে কাজ করে যা উৎপাদন করত, সেই কারখানায় যখন সব অটোমেটিক যন্ত্র চলতে থাকবে, তখন হয়তো এক হাজার দক্ষ শ্রমিক তার দ্বিগুণ পণ্য উৎপাদন করবে। সুতরাং অটোমেশনের ফলে ধনপতি মুনাফাখোরেরা এক ভয়ংকর উভয়সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। একদিকে বিকট বেকার-সমস্যা প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসারের মতো হাঁ করে তাঁদের গিলতে আসছে। অন্য দিকে উৎপন্ন পণ্যপ্রাচুর্যের ফলে বাজারে তার আমদানি চাহিদা ছাড়িয়ে উপচে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। মুনাফার অঙ্ক ঠিক রাখার জন্য তৈরী বাজারদরের কৃত্রিম বাঁধও সেই প্রাচুর্যের আঘাতে ভেঙে পড়ছে। উৎপাদনের প্রাচুর্যের ফলে মূল্য-হ্রাস এবং যান্ত্রিক স্বয়ংক্রিয়তার ফলে কর্মী-ছাঁটাই বা বেকার-সমস্যা, এই দুই সংকটের সাঁড়াশি আক্রমণে ধনিক প্রভুরা আজ উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। শিল্পপতিদের ব্লুপ্রিন্টে তাই বলা হয়েছে, শ্রমিকদের আহ্বান করে: "অটোমেশনের জন্য তোমরা ভয় পেয়ো না, আমরা তাই দিয়ে ভূস্বর্গ রচনা করব।"

অটোমেশন-ভূস্বর্গের খবর এর মধ্যেই কিছু পাওয়া গেছে। আমেরিকার ট্রেড ইউনিয়নের (A. F. L.) আন্তর্জাতিক সেক্রেটারী ডেলানে (Delaney) বলেছেন :[২]

> The new machinery can free man from routine and the monotony of labour, but it can also deprive him of work and wages. It can substantially improve living standards and create general abundance, but it can also be the cause of growing surpluses which cannot be utilised because the consumer will not have the necessary purchasing power. It is at present impossible to say whether

১ **Calling all Jobs : Introduction to the Automatic Machine Age : New York, November 1954.**

২ *International Labour Organisation* : 39 Session Report,, 1956.

automation will lead to abundance, or on the contrary, to poverty.

নূতন অটোমেটিক যন্ত্র মানুষকে মেহনতের রুটিন ও একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দিতে পারে যেমন, তেমনি তাকে কর্ম ও মজুরি থেকে বঞ্চিতও করতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রার স্তরের উন্নতি ও প্রাচুর্যের সৃষ্টি হতে পারে যেমন, তেমনি আবার প্রাচুর্যের মধ্যেও মানুষের আর্থিক অনটনের জন্য তা ভোগে না লাগতে পারে। এইজন্য এখনই ঠিক বলা যায় না যে অটোমেশনের সামাজিক ফলাফল কী হবে না-হবে।

আমেরিকার বিখ্যাত গণিতবিদ্, মানসযন্ত্রবিদ্যার (Cybernetics) অন্যতম প্রবর্তক, অধ্যাপক নর্বার্ট ওয়াইনার (Narbert Weiner) অটোমেশনের ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করে বলেছেন:[৩] "It is perfectly clear that *this* (অর্থাৎ অটোমেশন) will produce an unemployment situation with which... even the depression of the 1930's will seem a pleasant joke". অটোমেশন অদূর ভবিষ্যতে এমন ভীষণ বেকারসমস্যার সৃষ্টি করবে, যার কাছে ১৯৩০এর ঐতিহাসিক সংকটের কথা মনে হবে একটা মনোরম মস্করার মতো।

মজুরনেতা ও ম্যাথামেটিসিয়ান, কারও ভবিষ্যদ্বাণী হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ১৯৫৫ সালে আমেরিকার ক্লীভল্যাণ্ডের একটি আধা-অটোমাইজ্‌ড কারখানায় ২০০ শ্রমিক প্রতিদিন খেটে ১০০০ রেডিও-সেট তৈরি করত। ১৯৫৮ সনের মধ্যে কারখানাটি পুরো-অটোমাইজ্‌ড হবার ফলে মাত্র চারজন ইঞ্জিনিয়ার গোটা কারখানার কাজ চালাচ্ছে। ১৯৫৩ সনের শেষে আমেরিকায় মন্দা-বাজারের ভাঁটার টানে পিট্‌সবার্গের লোহা-ইস্পাতের কারখানায় প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। কারখানা, বলা বাহুল্য, অনেকখানি অটোমাইজ্‌ড, তাই পরে ১৯৫৫ সনেই দেখা যায় যে কারখানার উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু ১৪,০০০ বেকার শ্রমিককে কাজে পুনর্নিয়োগ করা হয় নি।[৪] আমেরিকার তৈল-পরিশোধন কারখানায় অটোমেশনের ফলে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সনের মধ্যে, কর্মীর সংখ্যা ১৪৭,০০০ জন থেকে ১৩৭,০০০ জন হয়েছে, অর্থাৎ দশ হাজার কর্মী বেকার হয়েছে, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে উৎপাদন বেড়েছে আগের তুলনায় শতকরা ২২ ভাগ, প্রায় এক-চতুর্থাংশ। তা ছাড়া, বিশেষজ্ঞরা হিসেব করে দেখেছেন যে অদূর ভবিষ্যতেই, অটোমেশন-ইলেকট্রনিক-সাইবারনেটিক্স ইত্যাদির অগ্রগতির ফলে, বর্তমানে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কার্যপরিচালনার জন্য সেক্রেটারী, ডেপুটি-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, স্টেনো-টাইপিস্ট-ক্লার্ক, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, অডিটার, বুককিপার প্রভৃতির যে বিপুল কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে, তার শতকরা ৮০ ভাগ, অর্থাৎ পাঁচভাগের চারভাগ ছাঁটাই করে দিলেও কাজকর্ম স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, আটকাবে না।[৫] অটোমেশনের জন্য কেবল মজুর-টেকনিসিয়ান-ইঞ্জিনিয়াররা নয়, আপিসের ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবীরা পর্যন্ত কর্মচ্যুত হবে। আধুনিক অর্থনীতির অন্তঃসারশূন্য বাক্‌চাতুরীতে এই বেকারসমস্যাকে বলা হয় 'technological unemployment', কিন্তু বেকার যে সে বেকারই, তাকে বিকৃত করে যাই বলা হোক না কেন। বিখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত ম্যাগনাস পাইক (Magnus Pyke) বলেছেন:[৬] "In the United States, where the progress towards 'automation' is further advanced than it is in Great Britain, the gradually increasing freedom from the need to do paid work is being called 'technological unemployment." বিখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী ফন্স ও সেপার্ড পরিষ্কার করে বলেছেন যে "the rational meaning of the introduction of automatic machines in industry is that they lead to very substantial reductions in wages expenditure per unit of production."[৭] অটোমেশনের

---

৩ Norbert Weiner: *The Human Use of Human Beings*: London 1954: p. 162

৪ S. Lilley: *Automation and Social Progress*: London 1957: p. 117

৫ *The Challenge of Automation*: Paper delivered at the National Conference on Automation: Washington, 1955

৬ Magnus Pyke: *Automation, its Purpose and Future*: London, 1956: p. 179

৭ W. A. Faunce and H. L. Sheppard: *Automation—Some Implications for Industrial Relations*: Transaction of the Third World Congress of Sociology, Vol I, Part I 1956; p. 167

ফলে উৎপাদনের প্রত্যেক ইউনিটের মজুরি-খরচ যথেষ্ট কমে যায়। তাই যদি হয়, তা হলে কারখানা অটোমাইজড (automised) হলে কর্মীদের মজুরিও কমিয়ে দিতে হয়, অথবা তাদের কর্মচ্যুত করতে হয়। অটোমেশনের ফলে তাই হচ্ছে। ভূস্বর্গের বদলে ভূ-নরকের কুৎসিত পরিবেশে ক্রমে বেকার-জীবনের বিভীষিকা বাড়ছে এবং দুঃস্বপ্নের এক দৈত্যপুরী রচনা করছে অটোমেশন।[৮]

অতঃপর তা হলে উপায় কি? ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ পল আইনজিগ বলেন যে অটোমেশন-জনিত বেকার-সমস্যা একেবারে সমাধান করা সম্ভব হবে না, কারণ অটোমেশনের ফলে যে সংখ্যক লোক বেকার হবে, অটোমেটিক যন্ত্র নির্মাণের কারখানায় তাদের সকলকে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হবে না—"it would be unwise to over-emphasize the employment potentials in these new industries and assume that their growth will be sufficient to take care of displacements in the older industries."[৯] সুতরাং বেকারদের জন্য আইনজিগ বিকল্পকর্মের যে প্রস্তাব করেছেন তা এই :

(১) সব রকমের শিল্পীর কাজকর্মের চাহিদা বাড়বে। মানুষ শ্রমশিল্পের অপ্রীতিকর মেহনত থেকে মুক্তি পেয়ে কলাশিল্পের নিরলস চর্চায় আত্মনিয়োগ করবে।

(২) শ্রমশিল্পের কলকারখানা থেকে যারা মুক্তি পাবে তারা কৃষিকর্ম করবে।

(৩) মেয়েরা বাইরের কাজকর্মের গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়ে গৃহকর্মে মনোনিবেশ করতে পারবে।

আইনজিগের এই বিকল্প সমাধান অনেকেরই হয়তো হাসির উদ্রেক করবে, কিন্তু সমাধানের আর উপায়ই বা কি? আইনজিগের প্রস্তাব শুনে মনে হয়, ভবিষ্যতে আবার আমরা গরু চরাব, লাঙল চষব, মেয়েরা রান্নাবান্না করবে, এবং সকলে ছবি আঁকবে। সব কাজকর্মই হবে শখের ব্যাপার, প্রয়োজনের তাগিদে কেউ কিছু করবে না। কিন্তু সমাধান কি তাতেও হবে? সমাধানের সত্যিকার উপায় অবশ্যই সোশ্যালিজম, কিন্তু সে তো এখনও বুদ্ধিমান মানুষের কাছে আকাশকুসুম হয়ে আছে। সোশ্যালিজমের পরীক্ষা যেসব দেশে আরম্ভ হয়েছে সেখানে যান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরীক্ষার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আটপৌরে জীবনের অর্থনৈতিক সমাধান হলেই মানুষের চিরকালের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, এ রকম ধারণা সোশ্যালিস্ট 'lotus-eater'-দের মধ্যে আজও অনেকের থাকলেও, ধারণাটা যে সত্য নয় তা যেসব দেশে কিছুকাল ধরে সোশ্যালিজমের পরীক্ষা চলছে, সেই সব দেশের রাষ্ট্রিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের স্বরূপ বিচার করলে পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশ্য বিচারটা খোলা চোখে করতে হবে, অন্ধ আদর্শবাদের ঠুলি পরে নয়। সোশ্যালিজমের লক্ষ্য হল, নূতন মানুষ ও নূতন সভ্যতা গড়ে তোলা। তার ভিত্তি আর্থিক, না, মানবিক, তা আজ প্রত্যেক সোশ্যালিস্ট আদর্শবাদীর গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সোশ্যালিজম মানুষের সামনে এক নূতন সভ্যতার স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল। সেই সভ্যতায়, মানুষ আশা করেছিল, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক উৎপীড়ন, রাষ্ট্রিক একনায়কত্ব—এসব তো থাকবেই না, মানবিক সদ্‌গুণের পূর্ণ বিকাশ হবে, লোভ-হিংসা-বিদ্বেষ ক্ষমতা-লোলুপতা ইত্যাদি মানব-সমাজ থেকে ধীরে ধীরে নির্মূল হয়ে যাবে এবং মানুষের স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার বিকাশের পথে কোথাও কোন অন্তরায় থাকবে না। কিন্তু মানুষের এই স্বপ্ন ও প্রত্যাশা সার্থক হয়েছে কি? তার চেয়েও বড় কথা, সার্থক হবে কি কোনদিন?

এত বড় প্রশ্নের উত্তর দেবার সাধ্য আমাদের নেই। আমরা দেখছি, সোশ্যালিজমের সংগ্রাম যান্ত্রিক টেকনোলজির সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। প্রতিযোগিতা চলেছে—শ্রেষ্ঠ ধনতান্ত্রিক দেশের টেকনোলজির সঙ্গে, শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দেশের টেকনোলজির। অর্থাৎ নিছক যন্ত্রের প্রতিযোগিতা। কিন্তু কথাটা তা ছিল না, অন্তত যখন সমাজতন্ত্রের রঙিন [illegible]

[৮] *Automation and Technological Change*: Hearings before the Sub-Committee on Economic Stabilisation etc., Washington 1955

[৯] Paul Einzig: *The Economic Consequences of Automation*, London 1957 : p. 58-60

মানুষের সামনে ওড়ানো হয়েছিল। যন্ত্রের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন যে নেই তা নয়, যথেষ্ট আছে। ধনতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদনে প্রতিযোগিতা করতে হলে, এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য আনতে হলে যন্ত্র ও টেকনিকের দিক থেকে পিছিয়ে থাকলে চলে না। তাদের সমকক্ষ তো হতেই হয়, ছাড়িয়ে যেতে পারলে আরও ভাল হয়। সোশ্যালিস্ট দেশের এ উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু সোশ্যালিজমের মতো অত বড় একটা আদর্শ যদি কেবল যান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, পণ্যময়তা ও যন্ত্রময়তাই যদি তার ধর্ম হয়ে ওঠে, এবং সেই প্রচুর পণ্য ও বিরাট বিরাট সব যন্ত্রের তলা দিয়ে যদি আসল মানুষ ড্রেনের আবর্জনার মতো ভেসে যায়, অথবা যদি তারা সেই সব 'ভিকোসাইক্লোমিটার' যন্ত্রের নাটবল্টু, স্থাফট-হুইল কলকব্জায় পরিণত হয়, তা হলে ইতিহাসের অন্য সব বড় বড় আদর্শের মতো, বাস্তব আচরণকালে সোশ্যালিজমেরও চরম বিকৃতি ঘটেছে বলে মনে করতে হবে।

কথা ছিল, ক্যাপিটালিজম-সোশ্যালিজমের সংগ্রাম হবে আদর্শের সংগ্রাম, নীতির সংগ্রাম, মানবতার সংগ্রাম, নূতন সমাজ-সভ্যতা গড়ার সংগ্রাম। কথা ছিল, সাধারণ মানুষ অকুতোভয়ে তাদের জীবন বলিদান দেবে সেই মহান আদর্শের জন্য। তারপর যখন বাস্তবে রূপায়িত হবে সেই আদর্শ তখন মানুষের জীবনধারণের গ্লানি আর থাকবে না, মানুষকে মানুষ শোষণ করবে না, ক্রীতদাসযুগের স্বেচ্ছাচারী প্রভুর মতো চাবুক মেরে শাসন করবে না, মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক ও সৌহার্দ স্থাপিত হবে, যুগ-যুগান্তের পরাধীন মানুষ স্বাধীন হবে, মুষ্টিমেয় একদল মানুষ 'রাষ্ট্র' (State) নামক বিকট ভিকোসাইক্লোমিটার যন্ত্রের স্টীমরোলার সাধারণের বুকের উপর দিয়ে নির্বিবাদে চালাবে না, অর্থের পদমর্যাদার ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের লোভ মোহ মানুষের থাকবে না, মানুষের সমাজ থেকে হিংসা-বিদ্বেষের বিষ ধুয়ে-মুছে যাবে, এবং প্রেম-ভালবাসা মমতা-মানবতা ইত্যাদি যা ধনতান্ত্রিক সমাজের cash-nexusএ আবদ্ধ হয়ে প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় পরিণত হয়েছে, সমাজতন্ত্রের সোনার কাঠির স্পর্শে তা প্রাণময় ও মানবিক হয়ে উঠবে। কিন্তু এত কথার একটি কথাও কি সত্য হয়েছে? প্রায় অর্ধশতাব্দীর সোশ্যালিজমের পরীক্ষার পরে যে সমাজ ও সভ্যতার চেহারা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তার নূতনত্ব কোথায়? আকাশ বিদীর্ণ করে মানুষের কত 'স্লোগান', কত লড়াইয়ের আওয়াজ, বুকফাটা আর্তনাদের মতো শহর-গ্রামের পথে পথে ধ্বনিত হয়েছে, হাজার হাজার 'মাইকে' প্রতিধ্বনিত হয়ে কত ছোট-বড়-মাঝারি নেতার কত কোটি কোটি গালভরা কথা ঘুম-পাড়ানি গানের মতো সাধারণ মানুষকে স্বপ্নের কোলে ঘুম পাড়িয়েছে, উৎসাহিত করেছে তাদের দলে দলে মৃত্যু বরণ করতে, কিন্তু তার বিনিময়ে তারা পেয়েছে কী? তারা পেয়েছে এমন একটা সমাজ যেখানে বড় বড় যন্ত্র চলছে, বিকটাকার সব মহাযন্ত্র, অটোমেটিক যন্ত্র, যেখানে স্পুটনিক উড়ছে চন্দ্রলোকে—কিন্তু যেখানে মানুষের সনাতন শঠতা দীনতা ও ক্ষমতালোলুপতার খেলা শেষ হয় নি, যেখানে নিষ্ঠুরতা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে স্পুটনিকের মতো, যেখানে অটোমেটিক যন্ত্রের মতো দেবতুল্য নেতারা রাতারাতি দানবতুল্য হয়ে যায় এবং কালকের নরকের কীট আজকেই চতুর্দোলায় চড়ে লক্ষ লক্ষ লোকের শোভাযাত্রার ঢেউয়ে হেলে-দুলে চলে বেড়ায়, যেখানে বন্দী মানুষের লক্ষ বছরের স্বপ্ন, স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তি স্ফূর্তির স্বপ্ন—ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে, এবং যেখানে ধনতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে সর্বাত্মক মারণাস্ত্রের ও অটোমেটিক যন্ত্রের প্রতিযোগিতা চলছে সমাজতন্ত্রের নামে। জীবনের কি আছে সেখানে? ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর, পিতার সঙ্গে পুত্রের, প্রেমিকের সঙ্গে প্রেমিকার, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সমস্ত স্বাভাবিক ও মানবিক সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে সেখানে, এবং সকলেই রাষ্ট্রযন্ত্র ও পার্টিযন্ত্রের গুপ্তচর হয়ে এক অভিশপ্ত চক্রান্তের পাতালপুরীতে বাস করছে। শিল্পী পাস্তারনাক (Boris Pasternak) তাই ডক্টর শিভাগো উপন্যাসে লারার মুখ দিয়ে বলেছেন:[১০] "The whole human way of life has been destroyed and ruined. All that's left is the naked human soul stripped to the last shred...You and I are like Adam and Eve, the first two people who

[১০] Boris Pasternak: *Dr. Zhivago*, translated by Max Hayward and Manya Harari: N. Y. 1958: p. 402-3.

at the beginning of the world had nothing to cover themselves with...and now at the end of it we are just as naked and homeless."

এত স্লোগান, এত মেঠো বক্তৃতা, এত বেতার-প্রেসের প্রচার ও পোস্টার, গোল-গাল নাদুসনুদুস মোলায়েম বুলির এত বিপুল বন্যা, এত শহীদের শোণিতসমুদ্র, এত স্ট্যাটিস্‌টিক্সের ভেল্‌কি, এত 'ইডিওলজির' অ্যালকোহল পানের পর, রাম-রাবণের এত প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের শেষে —অবসন্ন মানুষ চোখ মেলে দেখছে যে আজও সে সোনালী আদর্শের স্বর্ণযুগের পশ্চাদ্ধাবন করছে, সমাজের দুশমন রাবণদের বধ করা সম্ভব হয় নি, এবং সাম্যের রামরাজ্যও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তার সমস্যা আদিকালে যা ছিল, আজও তাই আছে; কেবল তার বাইরের আবরণটা বদলেছে মাত্র। সোশ্যালিস্ট দেশেও আমরা অটোমেটিক যন্ত্রপুরী প্রতিষ্ঠা করেছি, ঠিক ধনতান্ত্রিক দেশের মতো। মানুষের মন এক ইঞ্চিও উন্নত হয় নি; মানুষের বোধশক্তি এককাচ্চাও বাড়ে নি; মানুষের 'মনুষ্যত্ব' চূর্ণ করে দিয়েছে অটোমেটিক যন্ত্র এবং তার প্রতিরূপ পলিটিকাল পার্টি। আমরা সব 'ফাঁপা মানুষ'—'hollow men'—

Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
(T. S. Eliot)

আমরা সব ধুঁকছি, আর বেঁচে আছি, মরতে মরতেও বলছি বাঁচতে চাই, কিন্তু বাঁচছি কই! মরছি ক্যান্সারে আর কার্ডিয়াক হেমারেজে—স্লোগানের ক্যাপসুলে মোড়া বড় বড় সব আদর্শ চর্বিতচর্বণ করছি—আর ধুঁকছি। ডক্টর শিভাগোর সমস্ত উক্তির মধ্যে, আমার মনে হয় সবচেয়ে স্মরণীয় হল এইটি :

> Microscopic forms of cardiac hemorrhages have become very frequent in recent years. They are not always fatal. Some people get over them. It's a typical modern disease. I think its causes are of a moral order. The great majority of us are required to lead a life of constant, systematic duplicity. Your health is bound to be affected if, day after day, you say the opposite of what you feel, if you grovel before what you dislike and rejoice at what brings you nothing but misfortune. Our nervous system isn't just a fiction, it's part of our physical body; and our soul exists in space and is inside us, like the teeth in our mouth. It can't be violated with impunity.
> (Dr. Zhivago; p. 483)

"সম্প্রতি 'কার্ডিয়াক হেমারেজ' মানুষের একটা সাধারণ ব্যাধি হয়েছে। সব সময় তা হয়তো ভয়াবহ হয় না, অনেকে তার আঘাত এক-আধবার সামলেও ওঠে। এটি একটি টিপিক্যাল আধুনিক ব্যাধি। কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাধির কারণ হল নৈতিক কারণ। আজকাল সর্বদাই আমরা একটা কৃত্রিম দ্বৈত-জীবন যাপন করতে বাধ্য হই। সমাজের অবস্থা যদি এ রকম হয় যে দিনের পর দিন আমরা যা অনুভব করি ঠিক তার বিপরীত কাজ করতে বাধ্য হই; যদি আমাদের ঘৃণ্য বস্তুর সামনে প্রতিদিন নতজানু হয়ে চলতে আমরা বাধ্য হই, এবং যা নিশ্চিত আমাদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে তার সামনে আনন্দ প্রকাশ করি, তা হলে আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য কখনই ঠিক থাকতে পারে না। দেহের খাঁচার মধ্যেই মনের বসতি, এবং আমাদের স্নায়ুতন্ত্রটা একটা কাল্পনিক পদার্থ নয়। মুখের ভিতরে যেমন দাঁত থাকে, দেহের ভিতরে তেমনি থাকে আত্মা। খুশীমত কারও ওপর নির্যাতন করা যায় না।"

শিল্পী পাস্তারনাকের এই উক্তির মধ্যে অটোমেটিক যান্ত্রিক সমাজের শোচনীয় পরিণতির করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। বর্তমান সমাজে মানুষের সতত দ্বৈত-জীবন যাপনের যন্ত্রণার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এই দ্বিখণ্ডিত সত্তার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের দেহ ও মন দুইই তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। তবু মানবের ছদ্মবেশী যন্ত্র-যুগের সর্বশক্তিমান দানবরা সাধারণ মানুষকে অনবরত ঘুমপাড়ানি গান শোনাচ্ছে—স্বর্ণকান্তি সামাজিক আদর্শের ঘুমপাড়ানি গান। তা হলে আমরা চলেছি কোথায় এবং অটোমেশনের যুগের শেষই বা কোথায়?

ধনতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র কিছুই নয়, রাজনৈতিক মন্ত্রে কোন রামতন্ত্রই ভূমিষ্ঠ হবে না। যা হবে এবং যেটুকু হবে যন্ত্রের কৃপায়, বিশেষ করে অটোমেটিক যন্ত্রের অনিরুদ্ধ অভিযানের ফলে। অটোমেশন আর যাই-করুক বা না-করুক, ধনতন্ত্রের বিশাল

স্বাইক্লোপার নিশ্চিত ধূলিসাৎ করে দেবে। অটোমেশনের ধ্বংসাভিযান কোন মন্ত্রের বলে ধনতন্ত্র প্রতিরোধ করতে পারবে না। অটোমেটিক যন্ত্রের জয় ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ক্ষয়ে পরিণত হবে। কিন্তু ধনতন্ত্রের সেই ধ্বংসস্তূপের উপর নূতন কোন 'তন্ত্র' গড়ে উঠবে ? আপাতত তো মনে হয় 'যন্ত্রতন্ত্র' বা অটোমেটিজম্। সাম্য ও সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন মানুষ চিরকাল দেখবে, কিন্তু আজকের রঙ্গমঞ্চে তার ব্যঙ্গাভিনয় দেখে মনে হয়, স্বপ্ন সহজে বাস্তবে পরিণত হবে না।

এর মধ্যে যন্ত্রতন্ত্রেরই জয় হবে। অটোমেটিক যন্ত্র প্রচুর পরিমাণে চাহিদাতিরিক্ত পণ্য উৎপন্ন করবে ; অটোমেটিক যন্ত্রের মতো মানুষও ভোজন-রমণ-মরণের চক্রে ঘুরপাক খেতে খেতে প্রয়োজনাতিরিক্ত সন্তান উৎপাদন করবে ; যন্ত্রের বন্যায় অনর্গল জনসংখ্যা বাড়বে, যন্ত্র বাড়বে, পণ্য বাড়বে,এবং সমাজবিজ্ঞানের নিয়মে সমাজ হবে যন্ত্রের প্রতিবিম্ব। প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ-মায়া-মমতা-দয়া-উদারতা-ক্ষমা-করুণা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলি অটোমেটিক ভোজন-রমণ যন্ত্রের চক্রে চূর্ণ হয়ে যাবে। অটোমেশনের যুগে মানুষ হবে 'outsider'—নিজের সমাজে, নিজের পরিবারে ও জীবনে অজ্ঞাতকুলশীলের মতো। অলব্যেয়র ক্যেমুর (Albert Camus) বিখ্যাত নায়ক মঁওরসল্টের (Meursault) মতো মায়ের মৃত্যুর কথা সে যন্ত্রের মতো বর্ণনা করবে : 'Mother died today. Or may be Yesterday. I can't be sure.' ঠিক যন্ত্রের মতোই নির্মম উদাসীন উক্তি—'মা আজ মারা গেছেন। কালও হতে পারে। ঠিক জানি না।' হেমিঙওয়ের (Ernest Hemingway) একটি গল্পের নায়ক (Soldiers Home) ক্রেবস-এর সঙ্গে তার মায়ের কথোপকথন হচ্ছে এইভাবে :

মা। "তুই কি আমাকে একটুও ভালবাসিস না ক্রেবস ?"

ক্রেবস। "না।"

মা একবার টেবিলের ওপারে ছেলের মুখের দিকে চাইলেন। চোখ দিয়ে তাঁর জল ঝরতে লাগল। ক্রেবস বলল : "শুধু তোমাকে নয়, আমি তো কাউকেই ভালবাসি না মা !"

মা যখন কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আমি তোর মা, তোকে পেটে ধরেছি, বুকে করে মানুষ করেছি—" ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন তিনি।

ক্রেবস অস্বস্তিবোধ করতে লাগল, মায়ের কান্না দেখে তার মনে হল যেন তার গা বমি-বমি করছে। ক্রেবস ও মঁওরসল্ট অটোমেটিক সমাজের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। অবশেষে খুনী মঁওরসল্টের বিচার হচ্ছে যখন আদালতে তখন প্রসিকিউটর জুরীদের আহ্বান করে বললেন : "Gentlemen of the jury, I would have you note that, on the day after his mother's funeral, that man was visiting a swimming pool, starting a liason with a girl and going to see a comic film." জুরীর বেঞ্চে আমরা ক্যাপিটালিস্ট ও সোশ্যালিস্ট উভয় দেশের সমাজনেতাদের বসিয়ে, মানুষ সম্বন্ধে এই অভিযোগ করতে পারি। ট্র্যাজেডি সেইখানে। ধনতান্ত্রিক সমাজের যান্ত্রিকতা ও নির্মম হৃদয়হীনতা সমাজতান্ত্রিক সমাজের পাঁজর পর্যন্ত জর্জরিত করেছে। যন্ত্রের প্রতিযোগিতায় দুই সমাজের মানুষই অমানুষ ও যান্ত্রিক হয়ে গেছে। সবার উপরে অটোমেটিক যন্ত্র, টেকনিক ও চতুর স্ট্যাটিসটিক্স হয়েছে সবচেয়ে বড় সত্য। ছাপাখানা-রেডিও-টেলিভিশনের মহাযন্ত্রের জাদুতে আজকের সত্য কাল মিথ্যা হচ্ছে, কালকের মিথ্যা হচ্ছে পরশুর চরম সত্য।

অটোমেটিক যন্ত্রযুগের জীবনশিল্পীরা তাই বর্তমান সমাজের যান্ত্রিক মানুষের ভয়াবহ চিত্র তাঁদের সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলছেন। অপরাধ শিল্পীদের নয়, এই যান্ত্রিক সমাজ মহা-উৎসাহে যাঁরা গড়ে তুলছেন—সমস্ত মানবিক অনুভূতি, বোধ ও মহৎগুণকে পদদলিত করে—অপরাধ তাঁদের। শিল্পীদের নির্দোষ মাথার ওপর রাজনৈতিক কটূক্তি বর্ষণ করা বৃথা। ভিকোসাইক্লোমিটার যন্ত্রের মতো সমাজে, ভোজন-রমণ-মরণের চক্রে ঘূর্ণায়মান মানুষের অটোমেটিক জীবন যতদিন না শেষ হবে, ততদিন এই অভিসম্পাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই। ততদিন—ততদিন কেবল ওই 'পাতলুন আঁটলুম, বড়লোক চাটলুম', আর মধ্যে মধ্যে নেশাখোরের মতো প্রশ্ন—'জীবনটা কী ?' অটোমেটিক যন্ত্রের ঘূর্ণনের শব্দ, খাড়া-বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি-খাড়া !!!

[পূর্বানুবৃত্তি]
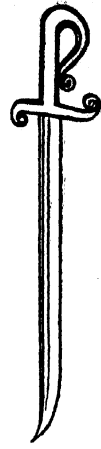
তবে কি সুপ্রিয়র জন্যে ওর লজ্জা হয়, সুপ্রিয়র গম্ভীর মুখ দেখলে ওর কষ্ট হয়? বন্ধুকে এভাবে বঞ্চিত করতে, অপমানিত করতে ও রাজী নয়? কিন্তু সে দায়িত্ব তো বনলতার, যদি বিশ্বাসঘাতকতাই হয় তবে তা তো বনলতার। বনলতা মেয়ে হয়ে যে রূঢ় কদম নিতে পারে, রঞ্জন পুরুষমানুষ হয়ে তা করতে পারে না? এমন কি মুখোমুখী তো ওকে কিছু করতে হচ্ছে না। সমস্ত তো বনলতাকে করতে হচ্ছে।

বনলতা অনেক ভেবেছে, বনলতা অনেক জ্বলেছে, ভেতরটা যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় শেষ হয়ে গিয়েছে। তবু বনলতাকে করতেই হবে। বনলতা দিনের পর দিন লক্ষ্য করেছে, সুপ্রিয়র উজ্জল মুখটি ধীরে ধীরে গম্ভীর হয়ে এসেছে, আর শত চেষ্টা সত্বেও চোখের সেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে কঠিনতা ফুটে উঠেছে। দু-একবার কিছু বলবে বলে উদ্যতও হয়েছে, তারপর কী ভেবে থেমে গিয়েছে। হেসে বলেছে, চল, সিনেমা যাওয়া যাক। সুপ্রিয়র আগে একটা অভ্যেস ছিল চেষ্টা-চরিত্র করে পেছনের সিটের টিকিট কাটবে আর সারাক্ষণ ধরে বনলতার ডান হাতটা নিয়ে খেলবে। সেদিনও অভ্যেসমত শেষ রোতে টিকিট কাটল, কিন্তু সারাক্ষণ হাতটা কঠিন স্থির হয়ে রইল। সিনেমার একবর্ণ বনলতার মাথায় ঢুকল না, একটা বেদনা যেন শ্বাসরুদ্ধ করে রাখল সারাক্ষণ। অন্ধভাবে ভেতরটা কাঁদতে লাগল—তুমি হাতটা একটু বাড়িয়ে দেখ না একবার, আমি এখুনি আমার হাত ফেলে দিয়ে কেঁদে বাঁচি। কিন্তু সুপ্রিয়র হাত কঠিন হয়ে রইল। আর বনলতা মনে মনে জপতেই লাগল, যত কষ্টই হোক একে সইতেই হবে। তুমি আমার ওপর রাগ করে একদিন অন্যদিকে মুখ ফেরাও, তোমার পাশে একটা লক্ষ্মীর মত মেয়েকে দেখে আমি সুখী হই আর দুঃখিত হই। একবার তুমি যদি নিজের মনকে একটু সামলে নিতে পার, সংসারে তোমার ভাবনা নেই। তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট-ক্লাস-ফার্স্ট, তুমি রূপবান, তোমার আর্থিক সামর্থ্য ভাল আর তুমি ধীর, যে কোন মেয়ে তোমার দিকে চাইবে, যে কোন মেয়েকে তুমি সুখী করবে। কিন্তু ও যে পাগল, পরীক্ষা দিতে দিতে ভাল হচ্ছে না বলে একটা প্রশ্ন লিখে উঠে এল, আর পরীক্ষা দেবে না। তখন এই বনলতাকেই জবরদস্তি করতে হয়েছে, তাইতে ও কোন রকমে সেকেণ্ড হয়েছে। ওই যে বাড়ি পেয়েছে একটা, বনলতা নিশ্চয়ই জানে, শাসন না করলে ও বাড়িটাকে উড়িয়ে দেবে একদিন। জোর করে ওর পেছনে না লাগলে একদিন একটা পয়সাও উপায় করবে না। কিন্তু পেছনে থাকবে কে? দাঁড়কাকের মত যার চেহারা, একটু সংসারের হালচাল বুঝেছে এমন কোন মেয়ে তার কাছে সহজে যাবে না বনলতা তা জানে।

যদিই বা কেউ এগোয়, ওই ব্যবহার! না, বনলতার উপায় নেই। বনলতার কপালে এই ছিল!

সুপ্রিয় ঠিক দশটার সময় হাজির হবে, লাইব্রেরি যেতে যেতে বেয়ারা থেকে প্রফেসর যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই ওর সেই নিজস্ব মিষ্টি হাসি দিয়ে আপ্যায়িত করবে, একরাশ বই নিয়ে নিজের টেবিলে ফিরে আসবে, দেড়টা পর্যন্ত একমনে পড়াশুনো করবে। ঠিক দেড়টার সময় উঠবে, রঞ্জন থাকলে তার কাছে গিয়ে বলবে, চল খেয়ে আসি। তারপর বনলতাকে ডেকে নিয়ে মঙ্গলরামের ক্যান্টিনে হাজির হবে। সেখানে মিনিট পঁয়তাল্লিশ খুব হাসি ঠাট্টা করবে। তারপর ফিরে এসে প্রফেসরের ঘরে ঢুকবে। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটানোর পর ল্যাবরেটরিতে আসবে। সেখানে ঘণ্টা দুয়েক। পাঁচটা দশ থেকে পাঁচটা পনেরোর মধ্যে বনলতা তার মিষ্টি গলা শুনবেই, কি, তোমার হল? একমাত্র বনলতা বুঝতে পারে, নইলে তার সে ব্যবহার এতটুকু পালটালো না। ঠিক দেড়টার সময়ে রঞ্জনের পিঠে টোকা মারবে, এই খাবে এস, আর সোয়া পাঁচটার সময় বনলতাকে বলবে, তোমার হল?

বনলতা জানে যদি কোনদিন সুপ্রিয়কে শুনতে হয়, আমার সম্বন্ধে ভাবা তুমি বন্ধ কর, সেদিনও সে রঞ্জনের পিঠে গিয়ে টোকা দেবে—এই খাবে এস, আর সোয়া পাঁচটার সময় বনলতাকে বলবে, তোমার হল? সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে কোথাও এতটুকু বৈলক্ষণ্য না ঘটে, এতটুকু কটুত্বের সৃষ্টি না হয় কোথাও, সংসারটা যেভাবে চলেছে ঠিক সেইভাবে চলুক। মধুরতার আর সৌন্দর্যের হানি কিছুতেই হতে দেবে না সে।

পরীক্ষার আগের ছুটিতে মহাষ্টমীর দিন সন্ধ্যেবেলায় সুপ্রিয় বনলতাদের বাড়ি গিয়েছিল ওর অ্যানাটমি অব দ্য কর্ডেটসটা আনবার জন্যে। তখন বনলতা ছাড়া বাড়ির সবাই ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল। ওরা দুজন ছাদে উঠে গিয়ে বেশ খানিকক্ষণ গল্প করেছিল। ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ওর দু কাঁধে দু হাত দিয়ে নিজের এক হাতের উপর থুতনি রেখে গল্প করছিল সুপ্রিয়।

গায়ে একটা আনন্দের অনুভূতি লাগছিল, উজ্জ্বল ও মিষ্ট অনুভূতি। বনলতার একটু লজ্জা করছিল, কিন্তু কিছু বলে নি, ভাল লাগছে। কিন্তু অনেকক্ষণ। তখন বনলতা হেসে বলল, তুমি তো র‍্যাশনাল।

নিশ্চয়ই।—সুপ্রিয় উত্তর দিল।

সুতরাং তুমি অবজেকটিভলি দেখ।

তা না হয় হল।

মানুষের মন ছাড়া আর সব জিনিসকেই তুমি ডিসেকশন টেবিলে ফেলতে পার। মানে এই হাড় মাংসকে, আর্টারি ভেনকে, আর আর নার্ভকে।

হ্যাঁ পারি।'

নার্ভের আনন্দ মানে তুমি জান।

সুপ্রিয় এক মিনিট ওকে ছেড়ে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল: তার মানে?—তারপর রীতিমত চেঁচিয়ে হেসে ফেলেছিল: ও তুমি দুষ্টু। ও সব চলবে না। এমন রাত সহজে পাওয়া যায় না। আমি বেশ করব, করব। উঃ, মেয়ে আমার পণ্ডিত হয়েছে। মশাই, মানুষের মনটাই বা ছাড়া কেন? ওই যে পার্কে লোকগুলো ভিড় করেছে ঠাকুর দেখতে, ওদের কী হচ্ছে? শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনন্দ। সেগুলো কী? মস্তিষ্কের নানারকম 'কোনেশন' মাত্র। ওরা যদি দিবারাত্র ভাবতে শুরু করে, এই একটা কোনেশন হল, ওই একটা কোনেশন হল, তা হলে সবকিছু মাঠে মারা যাবে, জীবন নরক হয়ে উঠবে। একটি কথা শুনে রাখ গো পণ্ডিতমশাই, ল্যাবরেটরিতে পণ্ডিত হও, র‍্যাশনাল হও, অবজেকটিভ হও, যা খুশী তাই হও। বাড়িতে ওসব হয়ো না, এখানে দেখ কিভাবে সুখী হতে পার আর আনন্দিত হতে পার। র‍্যাশনাল হয়ে তুমি এটুকু হতে পার, অকারণ সংস্কার তুমি রাখবে না। জীবনে তুমি আনন্দের সন্ধান কর—মনে দেহে ঘরে সমাজে, যেখানে যেভাবে হোক।

র‍্যাশনালি অবজেকটিভলি ওইসব বনলতা রঞ্জনের কাছ থেকে নিয়েছে। এই নির্জনতায় বেশী বেসামাল না হয়ে পড়ে কেউ, সেইজন্যে বুদ্ধিমান মন দুটোকে চাগিয়ে তুলতে গিয়েছিল বনলতা। কিন্তু সুপ্রিয় সে রাস্তায় গেল না, নামবার সময় আলিঙ্গনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল বনলতাকে।

সুপ্রিয় অসময়ে তর্ক করে না, তর্কের সময়ে তর্ক করে। কোনদিন হাফ-হলিডে হলে সুপ্রিয় আর এক মুহূর্ত কাজ করবে না। একবার বনলতার টেবিলে যাবে, ওঠ ওঠ; একবার রঞ্জনের টেবিলের কাছে যাবে, ওঠ ওঠ, চল, কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।

সাধারণভাবে রঞ্জন চূড়ান্ত আনপাংচুয়াল। অর্ধেক দিন আসবে না, প্রফেসর তো বকুনি দিয়ে দিয়ে এলিয়ে গেলেন। যেদিন আসবে বারোটার সময় ঘটঘট করতে করতে এল, লাইব্রেরি থেকে দু-চারটে বই নিয়ে ওলটালো পালটালো, তারপর ধ্যেৎ বলে পালাল। বনলতা বলবে, কী হল, চলে যাচ্ছ ?—ধ্যেৎ, রিসার্চ করে কী হবে ? অনেক লোক ভাল বলবে এইমাত্র তো। কতকগুলো হাত-পা-ওলা ভার্টিকাল ব্যাকবোনওয়ালা জীব একটা হাত-পা-ওলা ভার্টিকাল ব্যাকবোনওলা জীবকে দেখে হাতগুলো ঠুকবে আর তাতে খানিকটা মেকানিকাল এনার্জি সাউণ্ড এনার্জিতে কনভার্টেড হবে। তোমার যদি শখ থাকে তুমি কর।—বলে রঞ্জন হাসতে হাসতে বেরিয়ে যাবে। আর এক-একদিন হঠাৎ মন দিয়ে পড়তে বসবে, সেদিন কোনদিকে চাইবে না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে, একটানা পড়তেই থাকবে—পড়তেই থাকবে। বনলতা এসে যদি বলে, ওঠ, তা হলে গম্ভীরভাবে বলবে, বাড়ি যাও। শুধু মাত্র একজনের কথা শোনে, সে সুপ্রিয়। তবে সুপ্রিয় যেদিন দেখে ও মন দিয়ে পড়ছে, কিছু বলে না তাকে। তবে হঠাৎ হাফ-হলিডে হলে সুপ্রিয় ছাড়বে না, এসে বলবে, ওঠ, আজ ছুটির দিন।

রঞ্জন বলবে, উহুঁ, কোথাও বেড়াতে যাব না।

বেশ, তবে আমি বসলুম। তারপর সুপ্রিয় রঞ্জনকে বলবে, আড্ডা হোক।

কিছুক্ষণ পরেই আড্ডা তর্কে এসে দাঁড়াবে। সেই সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গী অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গী ইমোশনাল সিনিকাল-এই সব।

সুপ্রিয় বলবে, জীবনকে অবজেকটিভলি কে না দেখে। একটি পুরুষের সঙ্গে একটি মেয়ের বিয়ে হয় ও তারা সন্তানের জন্মদান করে। সেই ছেলে বা মেয়ে যখন বয়স্ক হল তার তখন বিয়ে হয় আর এক মেয়ে বা ছেলের সঙ্গে এবং তারা আবার নতুন মানুষের জন্মদান করে। এইভাবে জীবনের ধারা বয়ে চলেছে।

রঞ্জন বলবে, এটাকে তোমার হোপলেশলি একঘেয়ে বলে মনে হয় না ? একই জিনিস বার বার হয়ে চলেছে ?

সুপ্রিয়। তা কেন ? প্রত্যেক মানুষ একটি নতুন মানুষ, বাবার থেকে আলাদা, মায়ের থেকে আলাদা।

রঞ্জন। কিন্তু সেই আলাদাটা চরিত্রের আর চেহারার এক পারমুটেশন-কম্বিনেশন মাত্র। ফাণ্ডামেণ্টালি নতুন কিছু নয়।

সুপ্রিয়। কিন্তু হাজার হাজার বছরে তা পালটে যাবে সম্পূর্ণভাবে।

রঞ্জন। আচ্ছা, পাঁচ হাজার বছর পরে না হয় এক-ঘেয়েমি দূর হল। অবশ্য এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়, কিন্তু তর্কের খাতিরে আমি না হয় তা স্বীকারই করে নিলুম। কিন্তু তারপর ? তারপরের চেষ্টাটা কী ?

সুপ্রিয়। আরও একটা জটিলতর ও নতুনতর কিছুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

রঞ্জন। আমাদের বাঁচাটা একঘেয়ে। একঘেয়েমি থেকে নতুনত্বের মধ্যে মুক্তি নিতে গিয়ে হাজার হাজার বছর কষ্ট করলুম। কিন্তু তখন দেখলুম সেটাও কোন প্রাপ্তি নয়, নতুন থেকে আরও নতুনের দিকে ছুটতে হবে। তার মানে হাতে অনেক সময় পেলে শুধু নতুন হয়ে হয়ে যেতে হবে। আরে, তাতে নতুন হওয়াটাই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়াবে।

সুপ্রিয়। বিরক্তি কেন, গতি সব সময়েই তোমাকে আনন্দ দিয়ে চলবে, চলার মধ্যেই মধু মিলবে।

রঞ্জন। কিন্তু সেটা সম্ভব হবে যদি তুমি প্রত্যেক মুহূর্তে শুধু সেই মুহূর্তটার দিকে চেয়ে থাক, ভূত-ভবিষ্যৎ না দেখে। সমস্তটার দিকে চোখ রাখলে তুমি চলার মধ্যে মধু পাবে না, প্রতিপদে তোমার ক্লান্তি আসবে। কি উদ্দেশ্যবিহীনভাবে শুধু নতুন হওয়ার জন্যে ভ্যাজর ভ্যাজর করে এগিয়ে যাওয়া।

সুপ্রিয়। এর অলটারনেটিভ তুমি কী নির্দেশ কর ?

রঞ্জন। দেখ, জগৎ আর জীবনটা ভাল না হতে পারে, কিন্তু একটা জিনিস সত্যি, এটা আমাদের ইণ্ডিভিজুয়াল মস্তিষ্কের থেকে অনেক অনেক গুণ আয়তনে বড়। সুতরাং এর অলটারনেটিভ জগৎ গঠন করা আমাদের পক্ষে ফিজিকালি ইম্‌পসিবল ব্যাপার একটা। অল দ্যাট উই ক্যান আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইজ দ্যাট এটা হওয়া উচিত হয় নি, আর অল উই ক্যান ডু ইজ দ্যাট উই ক্যান লীভ ইট। একটা অর্থহীন পাগলামি থেকে নিজেকে আস্তে আস্তে সরিয়ে নিতে হবে।

সুপ্রিয়। এটা কাপুরুষের কথা হল। চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। যদিও জীবনকে চোরের মত খারাপ আমি মনে করি না, আমার ভালই লাগে।

রঞ্জন হেসে ফেলল। লোকে ফট্ করে কাপুরুষ কথাটা ব্যবহার করে ফেলে বটে। কি আর করা যাবে, তারা তো তলিয়ে ভেবে দেখে না। কিন্তু তুমি ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে দেখ। একেবারে অবজেকটিভলি দেখলে আমাদের ভালমন্দ ভ্যালু-ট্যালু কিছু ভাবা উচিত নয়। আমাদের পিতামাতার সম্মিলনে আমাদের যাত্রা শুরু। সারাজীবন নানা পরিবেশ, নানা ঘটনার সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে চলা, শেষে শ্মশান—গোটা রাস্তাটাই ছকা আছে। অনেকটা জন্তুদের মত। কিন্তু আমাদের সকলের মনেই অল্পবিস্তর একটা পিকিউলিয়ার আত্মসচেতনতা আছে, যাকে আমি একস্ট্রা সেপিয়েনস্ বলি, সেটা নিজেকে ঘটনাবলীর ঊর্ধ্বে রেখে ভাবতে চায়, কী করছি, কেন করছি, কী এর মানে? তার উত্তরে তুমি বলছ তুমি আনন্দ পাও, আমি বলছি আর একটু বেশী ভাবলে আনন্দও পাওয়া যায় না। দেখ, যারা শুধু টাকাকড়ি উপায় নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারা তোমার প্রয়োজনহীন বিশুদ্ধ গবেষণাকে ছেলেমানুষি বলে উড়িয়ে দেবে, তুমি সেই রকম আমার চিন্তাধারাটা অক্ষমের উপায় বলে উড়িয়ে দিচ্ছ। টাকাকড়ি উপায়ের আনন্দ তুমি স্বীকার কর। কিন্তু নিজের মনের প্রসারকে তুমি বৃহত্তর আনন্দ বলে জান। সেই রকম সংসার থেকে আনন্দ পাওয়াটা আমি স্বীকার করি, এককালে আমিও কম মাতামাতি করি নি এ নিয়ে, কিন্তু তার ওপরেও আমি বুঝি সংসারটা হওয়া ঠিক হয় নি, এটা না হলেই ভাল হত। এই অকারণ গতিশীলতা মেনে নেওয়া যায় না।

সুপ্রিয়। আচ্ছা যদি মেনে নিই, এটা অকারণ, কিন্তু তুমি তো বুঝছ, তুমি ছোট, তবে তুমি বাড়াবাড়ি না করে এর মধ্যেই যত পার ভাল করে বাঁচতে চেষ্টা কর। তা হলে আর যাই হোক তোমার আত্মসম্মান বজায় থাকবে, তোমার সাধ্যমত তুমি করেছ।

রঞ্জন। গোড়া থেকেই যেটা ফিউটাইল বলে বুঝতে পারছি, তার জন্যে কাজ করতে হাত ওঠে না।

সুপ্রিয়। ফিউটাইল কেন? একটা সামঞ্জস্য থেকে আর একটা ব্যাপকতর সামঞ্জস্য গড়ে তোলা।

রঞ্জন। হোয়াই? ননসেন্স।

এই তর্ক ওদের একদিনের নয়। ছুটিতে এক জায়গায় বসলেই ঘুরে ফিরে এই তর্ক আসবে। আর উভয়পক্ষই সমান পটু তর্কে। শেষে সুপ্রিয় বনলতাকে সালিস মানবে, তোমার কী মনে হয়? বনলতা বলবে, অত গুছিয়ে আমি ভাবতে পারি নি। কিন্তু আমার বাঁচতে খুব ভাল লাগে। মনে হয়, কী আশ্চর্য, এই সূর্যটা কোথা থেকে এল, কোথা থেকে এল এত তারা? আর কী সুন্দর, রোদে জ্যোৎস্নায় আলোয় ছায়ায়। এত গাছ এত জীবজন্তু। আর মানুষ—এক একটা নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় আর আমার বিস্ময়ের শেষ থাকে না, মনে হয় ভাগ্যিস বেঁচেছিলুম, তাই তো এত দেখলুম। জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞতার আমার অন্ত থাকে না।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করবে, জীবন শুধু তোমাকে ভাল দিয়েছে?

বনলতা বলবে, খারাপগুলো সামান্য, সেগুলো আমি মনেও করি না।

রঞ্জন আর কিছু বলবে না, শুধু হাসবে।

বনলতা আর সুপ্রিয় একসঙ্গে বলবে, তুমি হাসছ কেন? এতে হাসবার কী আছে?

রঞ্জন শুধু হাসবে আর বলবে, না, এমনই।

একদিন রঞ্জন এর স্পষ্ট উত্তর দিয়েছিল। প্রফেসরের টেবিলে জার্মানী থেকে আসা অনেকগুলি ম্যাগাজিন পড়ে ছিল রিসার্চ-সংক্রান্ত। সেগুলো ওলটাতে ওলটাতে একটা ছবির বই বেরিয়ে পড়ল, ট্যুরিস্টদের জন্যে। বনলতা বলল, বইটা দেখব স্যর্?

নিশ্চয়ই, একদিন তো যেতেই হবে, দেখে রাখ।

বনলতা পাশের ঘরে এসে ছবি দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পর রঞ্জন আর সুপ্রিয়ও প্রফেসরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল, বনলতা তখনও ছবি দেখছে। সে ওদের ডাকল, দেখবে এস, কী অপূর্ব জায়গা।

ওরা দুজনেই এসে ওর দু পাশে দাঁড়িয়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে দেখতে লাগল। সুপ্রিয় আর বনলতা মাঝে মাঝে সোচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে ওঠে, এই জায়গাটা অপূর্ব। এখানে না গেলে জীবন বৃথা।

রঞ্জন চুপ করে ছবি দেখে যেতে লাগল।

সুপ্রিয় কিছুক্ষণ পরে বলল, কী হল, তুমি কোন কথা বলছ না যে, তোমার ভাল লাগছে না?

রঞ্জন বলল, হ্যাঁ, বেশ সুন্দর সুন্দর জায়গা।

শুধু বেশ সুন্দর নয়, ওয়াণ্ডারফুল।—বনলতা বলল, ওখানে যেতেই হবে, না গেলে জীবনের কোন মানে হয় না।

এটা অবশ্য লোভের কথা হয়ে গেল। আমাকে কোনদিন যদি ওখানে যেতে হয় আমি যাব আর দেখে আসব, বেশ সুন্দর বলে আসব। কিন্তু যেতেই হবে বলে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ব না।

সুপ্রিয় বলল, এটা অত্যন্ত কুনো লোকের কথা হয়ে গেল। তুমি দিন দিন কী হয়ে পড়ছ। সৌন্দর্য অনুভব করার ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলছ, তুমি দিন দিন মরে যাচ্ছ।

না—রঞ্জন বলল, দিন দিন আমার লোভ কমে আসছে।

বনলতা উত্তেজিত ভাবে বই বন্ধ করে বলল, তুমি কি বলতে চাও আমরা লোভী?

রঞ্জন বলল, এটা একটা সত্যি কথা।

না, লোভ নয়।—ওরা দুজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

দেখ।—রঞ্জন খুব স্থির হয়ে যায়: মানুষের সবচেয়ে বড় ইনষ্টিংক্ট কি জান—নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার। সাধারণ অবস্থায় আমরা মনে করি ইংরেজিতে যাকে বলে কিকিং, সেইটাই বেঁচে থাকা, সেইটাই জীবন। আসলে সেটা জীবন থেকে কিছুটা এগিয়ে, সেটা একজিউবারেণ্ট জীবন। জীবনের মিনিমাম লেভেল হচ্ছে কোনমতে অস্তিত্ব বজায় রাখার, রুগ্ন হয়ে হোক, পঙ্গু হয়ে হোক, অপমানিত হয়ে হোক, লাথি খেয়ে হোক, যেভাবে হোক 'আমি বেঁচে আছি' এইটা অনুভব করা। এই জিনিসটার জন্যে যে মানুষের কী ভয়ানক লোভ! বুদ্ধি দিয়ে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি, ব্যক্তিরূপে আমাদের কারুর এতটুকু মূল্য নেই সংসারে, আমি না জন্মালে জগৎটা—তা সে ভালই হোক মন্দই হোক—অনায়াসে চলে যেত। কিন্তু সেটা মন দিয়ে আমরা কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না, নিজের অনস্তিত্ব কিছুতেই সহ্য করতে পারি না, তাই করি কি, জীবনকে ভাল বলে জীবনের তোষামোদ করি, মিথ্যে মিথ্যে জীবনের মধ্যে হ্যানো ইনট্রিনজিক ভ্যালু আছে ত্যানো ইনট্রিনজিক ভ্যালু আছে বলে বানিয়ে বানিয়ে কর্তব্য তৈরি করি আর বলি, অমুক কর্তব্যের জন্য বাঁচছি কিংবা আমি না দেখলে সংসারের অমুক সৌন্দর্যটা দেখবে কে! আসলে লোভ, অস্তিত্বের লোভ।

সুপ্রিয় বলল, এটা লোভ বলে ভাবা ভুল। আমি সেদিনও বলেছিলুম আজও বলছি, ভাল করে বাঁচার চেষ্টায় আত্মসম্মান বাঁচে।

রঞ্জন বলল, নিজেকে হাস্যকরভাবে ক্ষুদ্র জেনেও ভালভাবে বাঁচবার চেষ্টা করার মধ্যে আত্মসম্মান নেই, জীবনের পা-চাটা আছে।

সুপ্রিয় বলল, কিন্তু এত অহঙ্কারই বা কিসের? আমার ভাল লাগল না বলে এত বড় বিরাট জিনিসটাকে অস্বীকার করা!

রঞ্জন বলল, আমি কেন বেঁচে আছি এই প্রশ্ন তোলাই তো অহঙ্কার, কিন্তু সেটা মানুষেরই হয়, জন্তুর নয়। কিন্তু মানুষ যখনই দেখে এ প্রশ্ন তার অস্তিত্বকে বিপজ্জনক করে তুলছে তখনই সে সন্ধি করে, তখন সে আনন্দ চায়, সত্য চায় না। জেনে রেখ, আনন্দ জীবনেরই একটা অঙ্গ। সুতরাং আনন্দ চাও মানে জীবন চাও, আর জীবন চাওয়া মানে জীবনের অধীনতা ও আনন্দের উলটো পিঠ অনিবার্য দুঃখ ও বিরক্তি। যখন প্রশ্নই তুলেছ, তখন শেষ পর্যন্ত দেখ। তুমি কেন বাঁচবে? জিনিসটা বিরাট বলে তুমি বাঁচবে, সে যুক্তি হাস্যকর।

বনলতা বলল, আমি অতশত বুঝি না, আমি স্পষ্ট অনুভব করি, আমি জীবনকে ভালবাসি।

রঞ্জন বলল, দেখ, এ কথা আমি বারে বারে বলছি, জীবনটা আয়তনে খুব বড় আর আমরা ইণ্ডিভিজুয়ালি ছোট। ভালবাসা সমানে সমানে হয়। সুতরাং তোমার এটা অধীনতাই, ভালবাসা নয়। শুধু তুমি বুঝতে পারছ না। তুমি লোভের ঊর্ধ্বে উঠতে পার নি। বাকি থাকে দুটি পথ, হয় তুমি জীবনকে জয় কর সম্পূর্ণভাবে—যেটা অসম্ভব, কারণ তোমার ইচ্ছায় এটা শুরু হয় নি, তুমি ঘুরে-ফিরে যাই কর না কেন দেখবে ওরই ফাঁদে পড়ে যাচ্ছ। আর দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ অস্বীকার কর।

বনলতা বলল, না, জীবনও আমাদের ভালবাসে, দুঃখটা স্কীমের মধ্যে ইনহেরেণ্ট বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য দেওয়ার দিকেই জীবনের ঝোঁক বেশী।

রঞ্জন বলল, লোভ তোমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে।

সুপ্রিয় বলল, না, আমিও বিশ্বাস করি জীবন আমাদের ঐশ্বর্যই দেয়।

রঞ্জন বলল, যতদিন না তোমাদের দিয়ে তার সেই পুরনো বাজে স্কীমের কাজগুলো করিয়ে নেয়, ততদিন সে তোমাদের তার ঐশ্বর্যের ম্যাজিকে ভুলিয়ে রাখবে। তারপর কাজ ফুরোলে সে একদিন নিজে এসে হাজির হবে তোমাদের কাছে, তখন কোথায় সে ম্যাজিক, কঠিন রূঢ় পরুষহস্তে তোমাদের ফেলে দেবে তার পশ্চাতের আবর্জনাকুণ্ডে। সেদিন তোমার লক্ষ ভালবাসার কথা শুধু তার অট্টহাসির খোরাক হবে। সেদিন তোমার আত্মসম্মান ধূলোয় লুটোবে।

সুপ্রিয়। তোমার আত্মসম্মান থাকবে কী করে?

রঞ্জন। আমি জীবনের কাছে কিছু চাই না। তাই তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এখন আমি চেষ্টা করছি তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে, কিন্তু রক্তমাংসের তৈরি তো, বড় লাগছে। যেদিন বেরিয়ে আসব, সেদিন মজা করে জীবনকে জিজ্ঞেস করব, আর কতদিন এ রকম করে চালাবে বাছা। তারপর নিশ্চিন্দি।

বনলতা। নিশ্চিন্দি মানে?

সেদিন আসুক, তুমি নিজেই দেখবে।

বনলতার কষ্টের শেষ নেই। আরও দু-একবার সে রঞ্জনের সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলেছে। রঞ্জন তাকে নিশ্চিন্দি হবার কথাই শুনিয়েছে কিন্তু বনলতা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। নিশ্চিন্দি হওয়ার কথা বলা এক কথা, আর জীবনে সেটা প্রয়োগ করার চেষ্টা করা আর এক কথা; হলেই বা রঞ্জন, মানুষ তো। বুদ্ধি দিয়ে তো অনেক কিছু বোঝা যায়, তা বলে সেটা কাজে করতে হবে এমন কোন কথা নেই।

রঞ্জন এত বোঝে, এটুকু বোঝে না কেন, বনলতার দাম অনেক। যেখানে সে যাবে সেখানেই তার জন্যে সম্মানের ও আদরের আসন পাতা রয়েছে। আর যেতেই বা হবে কেন। এই সামনেই, রঞ্জনের সামনেই একজন মানুষ রয়েছে, সে এখুনি বনলতার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে নেবে। আর মানুষ হিসেবে এ মানুষটির তুলনা মেলে অল্প তা রঞ্জনও স্বীকার করবে।

রঞ্জন এত বোঝে, এটুকু বোঝে না কেন, ওর এই অসাধারণ বুদ্ধি, যেটা প্রতিভাবলে স্বীকৃতি পাবে বলে বনলতার দৃঢ় প্রত্যয়, তার পেছনে বনলতার একটি শ্রীমণ্ডিত সংসার থাকলে তা একটা পরমতম ঐশ্বর্যময় জীবন হয়ে উঠবে। সমস্ত মানুষের আদর্শের সামগ্রী হয়ে উঠবে। আর চেষ্টা করলে রঞ্জন পরিপাটি মানুষ হয়ে উঠতে পারে, বনলতার কাজ কতদূর এগোল সেদিকে তার পুরো নজর, বনলতার শরীর কেমন আছে সেদিকেও নজর, এমন কি আগেকার মত এ মন্তব্যও সে আজও করে—এই শাড়িটাতে তোমাকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে।

কিন্তু দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে।

একদিন সুপ্রিয়র সঙ্গে সেইদিনকার তর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সুপ্রিয় বলেছিল, ও যা ভাল বোঝে। শুধু শেষে একটা মন্তব্য করেছিল, বলেছিল, আমার মনে হয় ওটা কেমন অহঙ্কারীর দৃষ্টিভঙ্গী। অহঙ্কারী কথাটা বনলতার মাথায় লাগল।

রঞ্জন বোধ হয় সচেতন, ভবিষ্যতে ওর বিশাল খ্যাতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। আর সেই ঐতিহাসিক বিপুলত্বের পটভূমিকায় অন্য সব মানুষকেই ওর নিজের কাছে ছোট লাগে। কিন্তু আজ হোক কাল হোক ওকে বুঝতেই হবে, শুধু বিপুল খ্যাতিই জীবন নয়, সেটা জীবনের একটা দিক। জীবনের আর একটা দিক আছে সেটা ভালবাসার—কোন মেয়ের ভালবাসার, মায়ের ভালবাসার, বন্ধুর ভালবাসার, সন্তানের ভালবাসার। বরং দ্বিতীয়টাই আরও গূঢ় শক্তি জীবনের, ঐতিহাসিক মানুষ কজন হয়েছে। সুখী মানুষ অনেক হয়েছে।

রঞ্জন হয়তো বিপুল, কিন্তু বনলতাও ছোট নয়। মনে একটা অভিমানের মত হয় বনলতার, পঁচিশ বছর বয়স রঞ্জনের, এই বয়সের কোন ছেলে যদি চোখ ফিরিয়ে নেয় তা হলে তা কী যে অপমানের একটি মেয়ের পক্ষে! শুধু রঞ্জন বলে অনেক সয়েছে বনলতা। কিন্তু বনলতাও মেয়ে।

সেদিন দুপুরে, সেই ছুটির দিনে, বিছানায় গড়িয়ে গড়িয়ে অস্থির হয়ে গেল বনলতা, কিন্তু ঘুম আর এল না। আগে ওই রকম দিনে সুপ্রিয় আসত, সারা দুপুর ধরে 'মনোপলি' খেলা চলত, বনলতা, ওর ভাই রজত, রজতের বন্ধু শ্যামল আর সুপ্রিয়, আর যাকে জোর করে ব্যাঙ্কার করা হত।

খেলার চেয়ে হৈ হৈ বেশী হত, কিন্তু দুপুরটা কাটত বেশ। কলেজে সুপ্রিয় সেই একই ব্যবহার করে, কিন্তু ভেতরকার সুতোগুলো সব কেটে গেছে, সুপ্রিয় আর আসে না। ঘুমোবার চেষ্টা করে মাথা ধরে গেল বনলতার। তখন উঠে দাঁড়াল : দূর, সিনেমা-টিনেমা কোথাও যাওয়া যাক্।

সাজগোজ করছে, মা ঘরে ঢুকলেন : কি রে বেরুচ্ছিস কোথা?

সিনেমা যাব।

ও।—মা পাশের ঘরে শুতে গেলেন,দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ফিরে বললেন, সুপ্রিয়কে বিকেলে আসতে বলিস না, আজ ভাল চিংড়িমাছ এসেছে বাজার থেকে, কাটলেট করব।

হ্যাঁ-না মিশিয়ে একটা অস্পষ্ট জড়িত উত্তর দিয়ে বনলতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুপ্রিয় এ বাড়িতে বাড়ির লোক হয়ে গেছে। সবাইকার কেমন ধারণা, ও শীগগিরই এ বাড়ির লোক হয়ে যাবে আইনসঙ্গতভাবে। আর তাতে কারও আপত্তি নেই। বাবা-মা তো খুব খুশী, তাঁরা মেয়েকে ভাল করে মানুষ করেছেন, তার যোগ্য লোকও কপালগুণে জুটে গিয়েছে।

আর খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করে শেষ পর্যন্ত বনলতা যে বাড়িতে গিয়ে পৌছল, সেখানে বাড়ির লোকের অন্য রকম ধারণা।

রঞ্জনের মা ভয়ানক চটে গেলেন : এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই কাঠফাটা রোদ, এতটা রাস্তা বাসে আসে? একটা ট্যাক্সি করতে কী হয়েছিল?—তারপর বুকে জড়িয়ে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, শুধু ফ্যানটা চালিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। বনলতার সমস্ত বলা উপেক্ষা করে নিজে আবার একটা হাতপাখা চালাতে লাগলেন।

বনলতা ঠাণ্ডা হলে দই খাওয়ালেন আম খাওয়ালেন। তারপর বললেন, তুমি এখানে বস মা, আমি তোমাকে খুব ভাল ভাল রান্না শিখিয়ে দেব। রোজ তো কলেজে পণ্ডিতী কর, আজকে ছুটির দিনটাও ওই পাগলের সঙ্গে পণ্ডিতী করে নষ্ট ক'রো না।

কিছুক্ষণ পর বনলতা উসখুস করে। তখন রঞ্জনের মা হাসলেন : আচ্ছা, আজকের দিনটা ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু এর পরের দিনটি আমার।

রঞ্জনের ঘরে ঢুকে দেখে সমস্ত জানলা বন্ধ করে আলো জালিয়ে ফ্যান চালিয়ে ও লিখছে একমনে। বনলতার পায়ের শব্দে ও মুখ তুলে চাইল : আরে, এস এস।

ওর সামনের চেয়ারটায় বসে বনলতা বলল, কী লিখছ?

গত মাসের কাজটা লিখে ফেলছি। ভাবছি আগামী সপ্তাহেই পাঠিয়ে দেব আমেরিকান জার্নাল অব জুওলজিতে।

তোমার আগেকার পেপারটা ছেপেছ?

হ্যাঁ। কলেজ-লাইব্রেরিতে আছে, দেখ নি?

না, তুমি তো বল নি।

গত মাসেই বেরিয়ে গেছে।

ছাপতে অনেকদিন সময় নিল, না?

হ্যাঁ, মাস পাঁচেক।

এই পেপারটায় কী লিখছ?

প্র্যাকটিকালি ওইটারই কন্টিনিউয়েশন।

বনলতা বলল, দেখি।—তারপর কাগজগুলো নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, বাবা, এই এত ডেটা অ্যানালাইজ করেছ। দৈত্যের মত খাটুনি।

গত দিন পনেরো কলেজে তো দেখেছ মুখ তুলি নি। বাড়িতেও দিবারাত্র পরিশ্রম করেছি।

উঃ, খাটতে পার বটে।—বনলতা সপ্রশংস মুখে রঞ্জনের দিকে চাইল।

রঞ্জন বিষণ্ণ হাসল : আর ভাল লাগছে না।

হ্যাঁ, ক্লান্তি তো আসবেই। এইটা শেষ করে এক সপ্তাহ কিছু করবে না, শুধু খাবে দাবে আর গল্পের বই পড়বে।

না ক্লান্তি নয়।—রঞ্জনের মুখ গম্ভীর : আমার আর এমনই ভাল লাগছে না। হাঁপ ধরছে, কবে যে ছুটি পাব।

ছি।—বনলতা বলল, তোমার মত ইয়ংম্যানের মুখে এ কথা শোভা পায় না। তোমার সামনে এখন গোটা জীবন পড়ে রয়েছে। তুমি কত সাফল্যলাভ করবে। সেই দিনগুলোর জন্য আমি যে হাঁ করে তাকিয়ে আছি।—আর অস্পষ্টতা নয়, বনলতা সোজা দুটো চোখ তুলে তাকাল রঞ্জনের দিকে : কেন, কেন তুমি কষ্ট দাও, কেন, কেন তুমি অপমান কর?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রঞ্জন। তার একটা হাতের

আঙুলের মধ্যে অন্য হাতের আঙুলগুলো গোঁজা ছিল, শুধু সেইগুলো মোচড়াতে লাগল অস্থিরভাবে, মট করে একটা আঙুল মটকানোর আওয়াজ হল। তারপর হাতটা স্থির হয়ে গেল, রঞ্জন আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকাল বনলতার দিকে। চোখগুলো আস্তে আস্তে নরম কোমল হয়ে গেল, তারপর করুণ হয়ে এল, তারপর শান্ত হয়ে গেল। রঞ্জন বলল, কী করে যে বোঝাই, আমি কাকেও অপমান করতে চাই না। আমি শুধু আমার রাস্তায় চলতে চাই।

তোমার সেই চলাটা যে আমাদের সবাইকার অপমান। আমার, তোমার মায়ের, আর সমস্ত লোক যারা সুখে বেঁচে আছে তাদের।

আমি সবিনয়ে বলছি, আমি কী করতে পারি?

তুমি আমার দিকে চেয়ে সুখে হাসতে পার।

রঞ্জন বলল, দেখ, সাংসারিক অর্থে তোমার মত মেয়ের মূল্য কী তা আমি জানি। আমি অনেক ভেবেছি এ নিয়ে। এমন কি আমি অনেক সময়েই খুশী হয়েছি আগে আগে, এ কথা স্বীকার না করলে মিথ্যে কথা বলা হবে। কিন্তু তার সঙ্গে একটা কথা সত্যি, যে মুহূর্তে আমি খুশী হয়েছি সেই খুশীর সঙ্গে সঙ্গে আমার স্পষ্ট মনে হয়েছে, এ আনন্দ আমার নয়, এটা মাত্র এনডোক্রিন সিস্টেমের কাজকর্ম। বিশ্বাস কর, চোখের সামনে শুধু স্টেরলগপের ফর্মুলা ভেসে উঠেছে; ঘুরেফিরে মনে হয়েছে সাইক্লোপেণ্টানো পার হাইড্রোক্সিল-ফেনানথ্রিন। এর পরে আমার পক্ষে আর এগোন কোনক্রমেই সম্ভব হয় নি।

তুমি বিয়ে করবে না?

না।

কিন্তু তোমার মা? ওঁর যে মেয়ে নেই। একটি মেয়ের জন্যে উনি যে পাগল। এইমাত্র তোমার কাছে আসার আগে আমাকে নিয়ে উনি যে কাণ্ড করছিলেন, তাতে আমার চোখে জল আসছিল।

হ্যাঁ, মাকে আমি জানি; বউদিকে নিয়ে এরকম পাগলামিই মা করেন।

মাকে কষ্ট দিতে তোমার কষ্ট হয় না?

এখনও কষ্ট হয়। তাই নিয়ে বিপদে পড়েছি। আমি খুব চেষ্টা করছি, আশা করি শীগগিরই ওইটাকে ছাড়িয়ে উঠব।

বনলতা হতাশ হয়ে চেয়ারে ঠেস দিল। তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে বলল, কিন্তু লাভ হবে কী?

রঞ্জন বলল, গোড়ায় গোড়ায় লাভক্ষতির কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পরে দেখলুম ওটা জীবনের। তাই ওটা ছেড়ে দিয়েছি এখন।

কিন্তু সত্যিই কি জীবন খারাপ? কই, আমার তো আজ পর্যন্ত জীবনকে খারাপ লাগল না।

খারাপ লাগা থেকে শুরু। আজকাল আমার আর খারাপও লাগে না ভালও লাগে না। তুমি খারাপ লাগানোই শুরু করতে পার নি, তার কারণ তুমি মেয়ে। মেয়ে-মন শুধু কুড়োতে চায় শুধু গোছাতে চায়, ছেড়ে চলে যাওয়া সইতে পারে না। এটা ছাড়াতে হবে, তারপর জীবনের ওপর লোভ ছাড়তে হবে, তারপর সত্য দেখার চোখ তোমার হবে। তারও পর—

কিন্তু সুপ্রিয়? সে কি লোভ ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি?

না। যেদিন ও লোভ ছাড়িয়ে উঠবে, সেদিন ও বুঝতে পারবে ওকে নিয়ে পুতুল নাচ খেলানো হচ্ছে। কিন্তু ও পুতুল নাচ নাচতেই থাকবে, কষ্ট হবে, পারবে না, বুঝতে পারবে ওর বিরক্তি লাগছে, কিন্তু ছাড়তে পারবে না। ছাড়বার সাহস নেই।

কেন?

এক ধরনের মারাত্মক অহংকার। এভোল্যুশনের মধ্যেই নিত্য নতুন বিকাশের বন্দোবস্ত রয়েছে। তার ফলে প্রত্যহই নিত্য নতুন ক্ষমতা কোন না কোন মানুষের আয়ত্ত হবে, আর সে শতমুখে জীবনের জয়গান করবে। আর কোটি কোটি লোক যারা ক্ষুদ্র যারা ভীরু, যারা মারাত্মক রকমের জীবনলোভী, তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রত্ব নীচত্ব অশালীনত্ব ও মৃদু আত্মহত্যাকে ঢাকা দিয়ে এসে চেঁচাবে, জয় জীবনের জয়। যার যত গলদ আর যে যত লোভী সে তত চেঁচাবে। তখন যদি কোনও লোক বলতে আসে, গৌরবই বাঁচাকে জাস্টিফাই করে না, তখন সবাই বলবে, না পেরে তুমি এ রকম বলছ। তখনই তার অহংকারে লাগবে; সে করতে যাবে, আর তখনই সে ফাঁদে পড়বে, কারণ করার শেষ নেই। এভোল্যু-শনের আরও বিপদ। কেউ হয়তো বর্তমানের বিরুদ্ধে

বলতে সাহস করল খুব জোর। কিন্তু ভবিষ্যৎ? ভবিষ্যতে হয়তো কোন লোক সত্যি করেই জীবনের একটা সার্থক অর্থ বের করে ফেলবেন। তখন ভবিষ্যতের কাছে বোকা বনে যাওয়ার ভয়ে অনেকে জীবনের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। নিজের জীবনে মিথ্যের বেসাতি করবে।

বনলতা চুপ করে রইল।

রঞ্জন হেসে বলল, সেইজন্যে একজন শিশু দরকার যে বলবে রাজা উলঙ্গ। সেই পোশাক-পাগল রাজার গল্প মনে আছে তো? যে কিছু না পরে রাস্তায় বেরিয়েছিল, আর সবাই ভাবছিল, রাজা মশাই নিশ্চয় পোশাক পরেছেন, আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি না, আর সবাই দেখতে পাচ্ছে। আর বোকা বনে যাবার ভয়ে সবাই রাজার পোশাকের প্রশংসা করেছিল। জীবনের এত ঢাকঢোল চারধারে বাজে যে কেউই বলতে সাহস করে না, এটার কোন অর্থ নেই। কিন্তু একদিন না একদিন সবাইকেই একলা রাজার মুখোমুখি হতে হবে, তখন শাস্ত্রীদের ভয় থাকবে না, পাখি পড়াবার লোক থাকবে না, সেদিন সে নিজের চোখে রাজাকে দেখবে, তখন তাকে বলতে হবে রাজা উলঙ্গ।

রঞ্জন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মুখ গম্ভীর ও দৃঢ়, বনলতার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না।

বনলতার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। সমস্ত মনটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। কলেজে আসে, এলোমেলোভাবে বইপত্তর উলটোয়, বাড়ি চলে যায়। সুপ্রিয় নিয়মিত দেড়টার সময় খেতে ডাকবে, বনলতা উঠবে, অন্যমনস্কভাবে খাবে আর চলে আসবে। সুপ্রিয়র মুখের দিকে বনলতা চাইতে পারে না। চাইবার আর মুখ নেই। কী করে বলবে, তোমার যদি আমার জন্যে এক কণা ভালবাসাও অবশিষ্ট থাকে, আমাকে দয়া করে তুলে নাও। আমি জীবনেও নেই, জীবন ছাড়িয়েও নেই, এই নারকীয় ত্রিশঙ্কু অবস্থা থেকে তুমি কি আমাকে উদ্ধার করতে পার না?

রঞ্জন একেবারে ডুবে আছে। খেতে পর্যন্ত আসে না। সেই যে এগারোটার সময় চেয়ারে এসে বসবে পাঁচটার সময় বনলতা দেখে ভঙ্গী পরিবর্তন করে নি পর্যন্ত। বেয়ারা বলল, ও নাকি সাতটা পর্যন্ত ওরকম থাকে। এ ধরনের অমানুষিক মনোযোগ বনলতা জীবনে এই প্রথম দেখছে। আর একটা আশ্চর্য জিনিস, বনলতা বুঝতে পারছে না, সে ভুল দেখছে কিনা। সুপ্রিয়কেও জিজ্ঞেস করা যায় না। একদিন হঠাৎ বনলতা চমকে উঠল, রঞ্জনের টেবিলে রঞ্জন কি! খানিকক্ষণ লক্ষ্য করে দেখে, রঞ্জনই তো! তার পরের দিন লক্ষ্য করল, তারও পরের দিন। রঞ্জনের মুখটা একটু পাল্টে গিয়েছে যেন, মনে হচ্ছে ও যেন একটু সুন্দর হয়ে গেছে। কে জানে হয়তো মনের ভুল।

তারপর একদিন রঞ্জন এল না। তারও পরের দিন এল না। তারও পরের দিন না। বনলতা মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল, আমার সঙ্গে ওর তো সম্পর্ক নেই। কিন্তু অস্থির হয়ে উঠতে লাগল সে। তারও পরের দিন যখন রঞ্জন এল না, তখন বনলতা বইটই গুছিয়ে উঠে পড়ল, রাস্তায় একটা ট্যাক্সি ধরে বলল, টালিগঞ্জ। সেদিনের পর থেকে মনটায় কোন সাড় ছিল না। ট্যাক্সিতে উঠে একে একে সব কথা মনে পড়ে গেল, আর একটা প্রবল আক্রোশে গোটা মনটা কষকষ করে উঠল, ও নিজে তো নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, কী নিশ্চিহ্ন হচ্ছে কে জানে, কিন্তু বনলতাকে সব দিক থেকে মেরে গেল।

রঞ্জনদের বাড়িতে গিয়ে ওর মাকে খুঁজল আগে। তাঁকে বলা দরকার, রঞ্জনের ব্যবহার আর সাধারণের মত নেই, তাঁর সাবধান হওয়া দরকার। কিন্তু তিনি বাড়ি নেই, চাকরটাও নেই। তা হলে চাকরকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর দিদির বাড়িটাড়ি গেছেন বোধ হয়। আজ একটু অপেক্ষা করবে বনলতা; উনি এলে ওঁকে বলতেই হবে।

রঞ্জনের ঘরের সমস্ত জানলা বন্ধ। আজ আলোও জ্বলছে না, কাজও করছে না রঞ্জন, অস্পষ্ট আলোয় বনলতা দেখল সে বিছানায় শুয়ে আছে।

কী হল?—বনলতা সামনের চেয়ারটায় এসে বসল।

রঞ্জন উঠে বসল। বলল, এমনি, কাজ নেই তাই শুয়েছিলুম। তারপর তুমি হঠাৎ?

কলেজে যাও নি কেন?

আর ভাল লাগছে না।

বনলতা হঠাৎ তীব্রস্বরে বলল, তোমার খেয়াল আর পাগলামি ক্রমশই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জনের গলার স্বর অত্যন্ত গম্ভীর শোনাল: বিদুষী

পাগলামি নয়, অত্যন্ত স্থিরমস্তিকে চিন্তা করা; কাজ আর আমার সত্যিই ভাল লাগছে না। সাবুকে বলেছিলুম এই পেপারটা শেষ করে দেব, দিয়েছি। তারপর আমার ছুটি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু যে চারটে পেপার হয়েছে সেগুলো জুড়ে দিলেই তো এখনই ডক্টরেট হয়ে যাবে।

সাবুও তাই বলেন। ডক্টরেটের জন্য আমার ইচ্ছে নেই।

কেন, কেন থাকবে না, হাজার হাজার মানুষের যা আছে তোমার তা থাকবে না কেন? তুমি কি তাদের থেকে মূলতঃ নতুন কিছু একটা?

তা তো আমি জানি না। আমি আমার কাজের মানে খুঁজেছিলুম, মানের জন্যে আমি অনেক খেটেছি। আমি পাই নি, সুতরাং আমি আর খাটতে চাই না।

মানে না ছাই। তুমি ভেবেছিলে, সর্বত্র তোমার একাধিপত্য করবে, কিন্তু বুঝেছ তা তুমি পারবে না, অনেক জিনিস তোমার নেই, তাই পালিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছ।

রঞ্জন মধুর হাসল: অকারণে উত্তেজিত হয়ো না। আমি স্বীকার করছি আমার চেহারাটা অত্যন্তই খারাপ, কিন্তু বিশ্বাস কর তা আমার চূড়ান্ত মতামতকে বিন্দুমাত্র অ্যাফেক্ট করে নি।

আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি, রমলা তোমাকে ঘা দিয়েছে, আর তাই থেকে তুমি অত্যন্ত যন্ত্রণা পেয়েছ। সেইটাই তোমাকে এই উদ্ভট রাস্তায় ভাবিয়েছে। না হলে কোন সুস্থ লোক এইভাবে চিন্তা করে না। তোমার শারীরিক বিকৃতি তোমার মনের বিকৃতি এনেছে।

রমলা আমাকে ঘা দেয় নি। তার সঙ্গে যে বয়সে আমার আলাপ সে বয়সে ছেলেমেয়ে সবাই এমনি ভালবাসে। লাভ-ক্ষতির চুলচেরা বিচার করে নয়। অবশ্য আমার শরীরই আমাকে ইনট্রোভার্ট করেছে। একবার একটা ডিবেটে আমি যখন উত্তেজিত ভাবে একটা সমস্যা বোঝাতে চেষ্টা করছিলুম, তখন অঙ্গভঙ্গীতে আমাকে এত জঘন্য দেখাচ্ছিল যে হলশুদ্ধ মেয়েপুরুষ হাসিতে ফেটে পড়েছিল। বলা বাহুল্য, আমি এত মর্মাহত হয়েছিলুম যে বহুদিন বাড়ি থেকে বেরুতে পারি নি। আর সেইটাই আমাকে আমার জীবনের মানে খোঁজাতে শুরু করায়। কিন্তু আমি জানি, স্পষ্ট জানি, এটা আমাকে জীবনবিমুখী করে নি, কারণ আমার জন্যে আরও অনেক রাস্তা খোলা ছিল, লোকে যাকে সাফল্য বলে তা আমি একটু চেষ্টা করলেই পেতে পারি। টেবিলে একটা চিঠি আছে, দেখ।

বনলতা টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালল। চিঠিটা খুলে মন দিয়ে পড়ল। অ্যামেরিকান একজন জগৎ-বিখ্যাত জেনেটিকসবিদ লিখেছেন। রঞ্জনের আগের পেপারটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, তিনি এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, তিনি পরের পেপারটার জন্যে উদগ্রীব হয়ে বসে আছেন, কারণ এই দুটো পেপার চিন্তাধারার একটা নতুন সাম্রাজ্য খুলে দেবে। যে সব বিশেষণ প্রয়োগ করা আছে তা শুনলে লোকে সত্তর বছরের খাটুনিকেও সার্থক মনে করে। টেবিল-ল্যাম্প নিভিয়ে বনলতা চুপ করে বসে রইল।

রঞ্জন ধীর গলায় বলল, তোমাদের একটা ভুল ধারণা আছে, পরাজয়ই মানুষকে জীবনকে নেগেট করতে শেখায়। সুতরাং ওটা আসলে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স। আসলে হারগুলো জানলা, যা দিয়ে মানুষের জীবনের কদর্য দিকটা দেখতে পায় আর তারপর ভালমন্দ ভাবতে শুরু করে। কিন্তু একটা হারের পর হার জিত দুই রাস্তাই মানুষের খোলা থাকে। যারা দুর্বল তারা হয়তো হারে, আবার তাদের ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থাকে, কিন্তু জীবনের বিরোধিতা করার সাহস থাকে না। যারা মোটামুটি সবল, তারা আবার জয়ী হবার চেষ্টা করে। আর যারা শক্তিমান ও আত্মসচেতন তারা স্থির হয়ে ভাবে তারপর হার-জিত দুটোকেই ফেলে দেয়। তার জীবন-মুগ্ধতা কেটে যায়। সে জীবনকে তার স্ব-স্ব রূপে দেখতে পায় নিরঞ্জন চোখে। সে আর কিছু চায় না। যে রাজা উলঙ্গ তার কাছ থেকে চাইব কী?

জীবনের উর্ধ্বে সে উঠতে পারে কি? জীবনের সমস্ত কামনার ওপরে?

রঞ্জন অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, মৃত্যুর আগে সম্পূর্ণ পারে না। যতক্ষণ শরীর আছে সে তো জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চাইবে প্রাকৃতিক নিয়মেই। কিন্তু অনেকখানি পারে।

তুমি এ কথা বললে কী করে? তুমি কি জান জীবনের কত অজস্র শেকড় আছে তোমার দেহে মনে? সময় হলেই

ারা তাদের পাওনা নেবে। তখন তোমার এই মস্তিষ্ক-
ালনা হাস্যকর হয়ে উঠবে। রঞ্জন, এখনও বলছি,
ফিরে এস। কী হবে ওই অনন্ত শূন্যতা নিয়ে?

আমিও ভেবেছিলুম শূন্যতা। আমি তার জন্যেই
প্রস্তুত ছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি শূন্যতা নয়, অনন্ত
প্রশান্তি। প্রশান্তি—জীবনকে ছাপিয়ে মৃত্যুকে ছাপিয়ে।

তুমি জীবনকে জানলে কই, জীবনকে ছাপিয়ে বলছ?
তুমি তো শুধু মস্তিষ্ক চালিয়েছ। কোনদিন জেনেছ
জীবনের আনন্দ কাকে বলে? যাও, সুপ্রিয়ার কাছে যাও।

সব জানা একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে
মোটা লাইনগুলো জানি।

না, তুমি জান না, বনলতা রঞ্জনের দুটো হাত ধরল:
না তুমি জান না।—বনলতা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে
রঞ্জনের উরুতে আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগল।
রঞ্জনের পাটা চমকে চমকে উঠতে লাগল। বনলতা
হাসল।

রঞ্জন সরে বসল, তারপর বলল, জান, এখানে ভর্তি
হবার ঠিক আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। আমি আমার
ক্লাসের বন্ধু রাজিন্দর চোপরার সঙ্গে মহাবালেশ্বরে বেড়াতে
গিয়েছিলুম ওদের বাগানবাড়িতে। সেবার সেই ছুটি
পড়েছে, ওদের বাড়ির লোক কেউ গিয়ে পৌঁছয় নি।
শুধু ওর দিদি ছাড়া। ওর দিদির বয়স বত্রিশ-তেত্রিশ
হবে; পাথরে খোদা মুখ চোখ, গম রঙ। বিয়ে হয়েছিল
প্রায় বছর দশেক, আমেদাবাদের এক মিলমালিকের
সঙ্গে। কিন্তু কোন ছেলেপিলে হয় নি। যাই হোক
ভদ্রমহিলা আমাকে ভারী আদর-যত্ন করতেন। শুধু
একটা মারাত্মক ঠাট্টা করতেন, আমাকে 'জাঙ্গল ক্রট'
বলে ডাকতেন। মাত্র বছর আড়াই আগে তো, তখন
আমার ভাবনা-চিন্তা যা করবার কথা, তা করা হয়ে
গিয়েছে। আমি কিছু মনে করতুম না, হাসতুম। তাঁকে
আমার ভাল লাগত—শুধু একটি জিনিস ছাড়া—তিনি বড়
হঠাৎ গায়ে হাত দেন। তখন মাথায় ফ্রয়েড-আডলার
গজগজ করত, আমার মনে হত ভদ্রমহিলা সেক্সি আছেন
বোধ হয়।

আমি ওদের বাড়ির গেস্ট-হাউসে শুতুম। রাজিন্দর
বাড়ির তেতলায় আর ওর দিদি একতলায়। রাজিন্দর
খেয়েদেয়েই শুতে যেত, আমি কিছুক্ষণ ওর দিদির সঙ্গে
গল্প করে গেস্ট-হাউসে চলে আসতুম। একদিন তিনি
জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কত? আমি বললুম,
তেইশ। তিনি বললেন, তেইশ? এর মধ্যে তুমি
কাউকে ভালবেসেছ? আমি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে
মেলার কথা বললুম। উনি বললেন, তাকে ভালবাসা
বলে না। তারপর বললেন, কী করে ভালবাসতে হয়
আমি তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারি।

পরদিন ভোররাত্রে যখন তাঁর ঘর থেকে বেরলুম,
তখন আমি লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছি। সেদিন আমি পালিয়ে
আসতে গেলুম কিন্তু পারলুম না। একটা প্রবল শক্তি
টেনে রাখল আমাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সেদিন রাত্রেও
গেলুম। তিনি শুধু মুচড়ে আঃ আঃ করেন আর
স্বগতোক্তি করেন, এ কুইয়ার লুকিং জাংগল ক্রট ইজ
স্ট্রেনজলি নিউ অ্যাণ্ড অকুলি স্যাটিসফাইং। আমার
তখন শুধু পাগল হতে বাকি আছে। সেদিন বিকেলেও
কিছুতেই পারলুম না। আমার মনে হচ্ছিল, আমি
কোনদিন পালাতে পারব না। সেদিন রাত্রে তারপর যেই
সাময়িক নির্লিপ্তি এল আমি সোজা সেই ঘর থেকেই
স্টেশনের রাস্তা ধরলুম। তারপরই তো কলকাতা আসবার
জন্যে উঠে-পড়ে লাগলুম।

রঞ্জন হাসল: জীবনে আনন্দ আছে আমি জানি কিন্তু
তার সঙ্গে কী ভয়ানক যে ক্লান্তি আর অবসাদ আছে তাও
আমি জানি।

বনলতা বিশ্বাস করল না, ওর একটা হাত তখনও
রঞ্জনের উরুতে পড়ে আছে। বনলতা স্পষ্ট বুঝতে পারছে
সেখানটা অল্প কাঁপছে। নার্ভাস হয়ে গেছে। এড়াবার
জন্যে গল্প তৈরি করছে। আধা-অন্ধকারে বনলতার চোখ
শিকারী বেড়ালের মত হয়ে গিয়েছে। আজ শেষ। হার
কি জিত। বনলতাকে সবদিক থেকে মেরে দিয়ে ও
প্রশান্তির ঢঙ করে বেড়াবে। তা চলবে না। বনলতার
তো যন্ত্রণার শেষ থাকবে না, তার সঙ্গে রঞ্জনও ডুবুক,
বুঝুক দূর থেকে দেখাটাই যন্ত্রণা নয়, সত্যিকারের ভেতরে
ভেতরে পোড়া কাকে বলে।

বনলতা হাই তুলে বলল, বড় ঘুম পাচ্ছে। তারপর
রঞ্জনের বিছানায় শুয়ে পড়ল। রঞ্জনের বাঁ হাতটি টেনে
নিল বুকের মধ্যে।

তখন ডান হাতটি এসে পড়ল বনলতার পেটে।
তারপর নিস্তব্ধ দুপুরে একটি নির্জন ঘরের মধ্যে আলো-
আঁধারিতে একটি পুরুষ-মনের দেশকালপাত্রের বিস্মরণ
ঘটল। একটি পুরুষ-হাত তার লক্ষ বৎসরের অভ্যাসে
এগিয়ে গেল একটি রমণীর লজ্জার আবরণ ছাড়িয়ে তাকে
ভালবাসতে। একটি নারী শিথিল হয়ে চোখ বুজল।
তারপর হঠাৎ একটি শীতল নির্লিপ্ত মন চেঁচিয়ে উঠল,
কী আশ্চর্য, এ যে হোমো সেপিয়েনের ফিমেল স্পেসিমেন।

রঞ্জন ঝাঁকানি দিয়ে উঠে পড়ে সবকটা দরজা জানলা
খুলে দিল। বনলতা ধড়মড় করে উঠে বসল, তারপর হুহু
করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

রঞ্জন ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ দুবার পায়চারি
করল। জানলায় গিয়ে বসল শেষে। অস্ফুট স্বরে
আপন মনেই বলল, বাঁচা আর মরা, মরা আর বাঁচা দুই-ই
এক। "কী আশ্চর্য, কোন তফাত নেই, নায়নাইড আর

বনলতা, না না কোনও তফাত নেই। শিথিল হয়ে ঠেস দিল জানলার গরাদে।

বনলতা কান্নায় জড়ানো চোখ তুলে দেখে আবার সেই মনের ভুল, রঞ্জনকে সুন্দর দেখাতে শুরু করেছে। রঞ্জনের মুখের কোন রঙ নেই, জলের মত। যে মনটা মুখের নানা রেখায় বিকশিত হয়ে থাকে সেই মনটা গেল কোথায়? মন না থাকলে মুখ ওই রকম সুন্দর হয়ে ওঠে। না, সুন্দর নয়, ওই তো রঞ্জনের গালের কাছটা তোবড়ানো, সুন্দর নয় কিন্তু মুগ্ধ করে রাখে।

হঠাৎ বনলতার মনে হল, তার আর কিছু করবার নেই, এমন কি সে যা করেছে তাও মনে রাখার দরকার নেই। সে উঠে দাঁড়াল, কাপড়-চোপড় ঠিক করে নিল, তারপর র‍্যাক টেবিল ড্রয়ার হাতড়ে তার নিজের যে সব কাগজপত্র রয়েছে সেগুলো বের করে নিতে লাগল।

রঞ্জন শান্ত গলায় বলল, হ্যাঁ, কাল বিকেলে আমি সেই কথাই ভাবছিলুম। রামুকে বলতে তোমার বইপত্তরগুলো ফেরত দিতে হবে।

এতক্ষণ ধরে বনলতার মনে এসেও কিছুতেই মনে আসছিল না। সে অবচেতনে ভেবেই চলেছিল। এই কথাটায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ফিডো, আই ও এ কক টু অ্যাসক্লিপিয়াস। বনলতা কলেজে পড়বার সময় ওদের ইংরেজি টেক্সট-বুকে একটা প্রবন্ধ ছিল, সক্রেটিসের বিষ পান। ওই নামেই একটা ছবি ছিল, সেই ছবিটা। সে ছবিতে যিনি বিষ খাচ্ছেন, তাঁর মুখটা জলের মত স্ফটিকের মত। কোন রঙ নেই, স্বচ্ছ।

বনলতার কিছু বলবার নেই, কিছু করবার নেই। যদি সত্য কেউ বুঝে থাকে বুঝুক। কিন্তু বনলতা তা সইতে পারবে না। বাঁ হাতের ড্রয়ারটা খুলতে খুলতে বনলতা সোজা হয়ে দাঁড়াল, উদ্দেশ্যহীনতার অর্থহীনতার কষ্ট আমি সইব কেমন করে।

রঞ্জনের ঠাণ্ডা গলা: কষ্টের চেয়ে সত্য বড়।

বনলতা প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল: শীতল সত্যের চেয়ে ঐশ্বর্য বড়। জীবন সত্যিকারের রাজা।

রঞ্জন হেসে উঠে দাঁড়াল: জাঁকজমক ঐশ্বর্য নিতান্ত নিষ্ফল। রাজাকে একলা যেদিন দেখবে সেদিন বুঝতে পারবে। কী ভাবে সে দিন আসবে তা আমি জানি না। কিন্তু আসবেই তা আমি জানি। সে যদি শেষ মৃত্যু হয়ে আসে, তা হলেও অসুবিধে। জীবনের মত যমের উলঙ্গতাটা দেখা যাবে না। সে যদি অসহ্য ক্লান্তি হয়ে রোগ হয়ে পরাজয় হয়ে আসে তা হলে তোমাকে অকারণে অনুশোচনার অনেকখানি পথ পেরুতে হবে। সে যদি অতিরিক্ত সাফল্য হয়ে আসে তা হলে তোমাকে অকারণে নিজের ছেলেমানুষির প্রতি কোমল ভালবাসার আরও দীর্ঘ পথ পেরুতে হবে। কিন্তু সে যদি স্বচ্ছ বুদ্ধির রাস্তায় আসে তা হলে আজই সমস্ত নিষ্ফলতা সমস্ত অর্থহীনতার থেকে তোমার মুক্তি।

ড্রয়ার আধখোলা রেখে রঞ্জনের কথা হাঁ করে শুনছিল বনলতা। এবারে ড্রয়ারের দিকে চেয়েই চমকে উঠল: এটা কী?

রঞ্জন টেবিলটা ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, সায়নাইড।

সে কী!—বনলতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হ্যাঁ, কাল সন্ধ্যেবেলা ওটা গুছিয়ে রেখেছিলুম রাত্রে খাব বলে।—রঞ্জন অত্যন্ত শিশুর মত সরল ভঙ্গীতে বলল, আর রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছি।—তারপর নিশ্চিন্ত গলায় বলল, যাক আজ খেয়ে নিলেই হবে।

কিছুক্ষণ কথা বেরুল না বনলতার মুখ দিয়ে, তারপর একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল। কিছু বলবার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছে, রঞ্জন বলে যাকে সে চিনত, সে আর এখানকার মাটির নেই। মরাটা নিয়ে সে পুতুল খেলে। যখন হোক খেললেই হল, বাঁচাটা নিয়ে সে পুতুল খেলে, আধখানা খেলে খেলা ফেলে দেয়।

রঞ্জন ওর পেছনে পেছনে বাইরে আসছিল। বনলতা শুধু একবার জিজ্ঞেস করল, তোমার মায়ের কথা তুমি ভেবেছ, আর আমাদের কথা?

ইদানীং হাসি ছাড়া কথা কয় না রঞ্জন, বলল, সাময়িক বিক্ষোভ হবে, তারপর সব মুছে যাবে।

তারপর আর কোন কথা হল না। বনলতা একবার ভাবতে চেষ্টা করল, এই পাশের লোকটা কাল আর থাকবে না, কোনদিন আর এর সঙ্গে দেখা হবে না, কিন্তু ভাবতে পারল না, কোন লোভ নেই কোন ক্ষোভ নেই কোন ভয় নেই। সে নিজে কি বেঁচে আছে, সে নিজে কি বাঁচবে? বাঁচাটা কী, মরার সঙ্গে তার কোন তফাত আছে?

রক্তকরবীর সারির মধ্যের লাল সুরকির রাস্তাটা ধরে দুজনে গেট পর্যন্ত এল। বনলতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, আসি।

রঞ্জন নিস্তব্ধ স্থির শান্ত মুখে মধুর হেসে মধুময় চোখে তার দিকে চাইল একবার। একটু গিয়েই বনলতা পেছনে ফিরে চাইল। দেখল, রঞ্জন নির্লিপ্তভাবে আকাশের দিকে চাইল একবার, তারপর ওপারের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে, তারপর রাস্তার দিকে, তারপর বাড়ির দিকে আস্তে আস্তে এগোল। [ক্রমশ]

সিদ্ধান্ত

শীতাংশু মৈত্র

পিতা এবং পুত্র মুখোমুখী বসে। ঘর স্তব্ধ।

পূর্বকথা—[যে কথাটা পরস্পরকে তাঁরা বলতে চান তা যেন এঁদের গলায় আটকে গিয়েছে। এমন কথা কি কোনও বাপ কোনদিন কোনও ছেলেকে বলেছে, না, বলতে পারে? কিন্তু কেন পারবে না? সেইটাই আজ প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সমস্যা। একটি ছেলে প্রতুল ওই সামনে বসে, আর একটি মেয়ে শ্যামা—ওই পাশের ঘরে বসে ছবি আঁকছে। এই দুটি সন্তান প্রফুল্ল আর তাঁর স্ত্রী অমিয়ার। অমিয়া প্রফুল্লের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তারা কিন্তু কেউ জানে না দ্বিতীয় পক্ষের কথা। প্রথম পক্ষের স্ত্রী শ্যামলী বিবাহের ছ মাস পরেই মারা যায়, তার এক বছর পরে প্রফুল্ল আবার বিয়ে করেন অমিয়াকে। সে আজ পঁচিশ বছর হয়ে গেল। যে কথা প্রথমে মনে প্রতি-মুহূর্তে জাগত, যে কথা বলার লোক না পেয়ে প্রফুল্ল আগে অস্থির হয়ে উঠতেন, আজ সে কথা অন্ধকারে দূর পরপারের ঝাউগাছের মত অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে ভুলে অমিয়াকে শ্যামা বলে ডেকে ফেলতেন বলেই বোধ হয় অমিয়া মেয়ের নাম রেখেছে শ্যামা। মৃতাকে হিংসা না করে সম্মান করেছে বলে প্রফুল্ল অমিয়ার কাছে কৃতজ্ঞ। আজকে তাঁর বয়স পঞ্চাশ, অমিয়ার চুয়াল্লিশ। জীবনে এখন আর নূতন করে শুরু করবার কিছু নেই; এখন শুধু এক এক করে ছেড়ে দেবার পালা। তবু ছেলে আর মেয়েকে তিনি সুখী দেখতে চান—চান নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করতে। অনেক সময় দ্বিধা আসে, লজ্জা লাগে; মনে হয় তিনি নিজেও যেমন ঠেকে শিখেছেন, ছেলেমেয়েরাও তেমনি শিখুক। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবেন যে, পিতা হয়ে সন্তানকে জীবনে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা শুধু উচিত নয়, একান্ত বাঞ্ছনীয়। তিনি যে কষ্ট পেয়েছেন, শিক্ষানবিসিতে যত সময় নষ্ট হয়েছে, পথ না জানায় শুধু পথ করে নিতেই যত সময় অপচিত হয়েছে, না জানার জন্যে যত ভুল জীবনে করেছেন—এ সবের থেকে সন্তানকে বাঁচিয়ে সার্থকতার সোজা সড়কে তুলে দেওয়াই তো তাঁর কর্তব্য। জীবনে অহেতুক কষ্ট যেন প্রতুল আর শ্যামা না পায়।

সেই উদ্দেশ্যেই ছেলেমেয়ের সঙ্গে শাসক-শাসিত, পালক-পালিত এবং বড় হলে অহি-নকুল সম্পর্ক তিনি গড়ে তোলেন নি; প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন তাদের বোঝবার, তাদের বন্ধু হবার, তাদের জীবনের সমস্ত স্বপ্নের অংশভাগী হবার।

অদ্ভুত লাগে ভাবতে গেলে সব কথা। অমিয়াকে তিনি ভালবাসেন নি অথচ অমিয়ার দেওয়া সন্তানদের এমন করে ভালবাসলেন কী করে। অমিয়াকে যে ভালবাসেন নি এ কথাটা আজ এই পঁচিশ বছরের বিবাহিত জীবনের পর অর্থহীন, বাজে বলে মনে হয়। কষ্ট হয়েছিল বিবাহের পরেই যেদিন অমিয়া একান্ত বিনয়ে বলেছিল, দিদিকে তুমি যে ভালবাসতে তাতে আমার দুঃখু নয়। দুঃখু এই যে তুমি আবার বিয়ে করলে কেন? প্রফুল্ল কোন উত্তর দিতে পারেন নি। কাঠ হয়ে পড়ে ছিলেন বিছানায়—লজ্জায়, ক্ষোভে। নিজেকে একান্ত হীন জুয়াচোর বলে মনে হয়েছিল। হঠাৎ তিনি উঠে বসে অমিয়ার পা ধরে ক্ষমা চেয়েছিলেন। অমিয়া বিস্ময়ে প্রথমটা হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। পরক্ষণেই পা সরিয়ে নিয়ে ধরেছিলেন প্রফুল্লের হাত দুটি অপরিসীম দীনতায়। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বল, কী হলে তুমি সুখী হও। অমিয়া বলেছিলেন, তা জানি না। তবে আর আমি কখনও তোমাকে এমন করে কষ্ট দেব না।

তারপর থেকে এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের মধ্যে আর একদিনও সে কথা অমিয়া জিজ্ঞাসা করেন নি। কী করে তিনি সহ্য করেছেন ভেবে মাঝে মাঝে অন্তর্জ্বালায় প্রফুল্ল দগ্ধ হতেন। সেদিন দেখলেন উনুনে তরকারি চাপিয়ে অমিয়া গালে হাত দিয়ে বসে আছেন—তরকারি পুড়ে গন্ধ বেরুচ্ছে, তাঁর খেয়াল নেই। প্রফুল্ল সেখান থেকে সরে গিয়ে আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন।

অমিয়ার গাল বেয়ে জল পড়তে লাগল। তাও তাঁর খেয়াল নেই। এমন সময় শ্যামলী কোথা থেকে এসে 'মা মা' বলে ডেকে কাছে গিয়ে ওই কাণ্ড দেখে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অমিয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছে কড়া নামিয়ে ফেললেন। মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, মা, তোমার রাঁধতে কষ্ট হয় এ কথা কেন আমাকে বল না। যাও, তুমি ওঠ। আমি রাঁধব আজ।

অমিয়া। না রে, ও কিছু নয়। চোখে বড্ড ধোঁয়া লেগেছিল।

শ্যামলী হেসে বলল, চোখে ধোঁয়া লাগলে লোকে বুঝি গালে হাত দিয়ে কাঁদে?

অমিয়া। হাত-মুখ ধুয়ে জল খেতে বস।

চলে গেল শ্যামলী। বুঝল না কিছুই।

পরে প্রফুল্ল বলেছিলেন, তোমার চোখে জল দেখে আজ শ্যামা কী ভাবল?

অমিয়া কোনও উত্তর না দেওয়ায় তিনি আবার বলেছিলেন, ভেবেছে সে ঠিকই। বুঝেছে সে ঠিকই। এখন তার কাছে আমার জবাবদিহি করতে হবে। কেমন করে যে করব তাই ভাবছি।

অমিয়া হাত ধরে বলেছিলেন, প্রথম জীবনে তোমার কাছে যে অভিযোগ করেছিলাম সে অভিযোগ আজকে আমার আর নেই। তুমি আমার ছেলেমেয়েদের ভালবেসেছ। আর সত্যি বল তো, আমাকেও কি বাস নি?

আজ আর ঠিক বলতে পারি না তোমাকে। আজকে আমাদের জীবনে ভালবাসার কি কোন প্রয়োজন আছে? ও-কথা নিয়ে ভাববারই বা কি কোনও দরকার আছে?

তবে আমার আজ কান্না পেয়েছিল কেন?

তুমি ক্ষণেকের জন্য আবার সেই সতের বছরের অমিয়া হয়ে গিয়েছিলে বলে। আমার কি মনে হয় জান, জীবনে সতের বছরও মিথ্যে নয়, পঞ্চাশ বছরও মিথ্যে নয়। কিন্তু দুটো আলাদা। সতের বছরে যা চেয়েছিলাম আজ তা চাই না। আবার এখন যা চাই তা সতের বছরে কল্পনাও করি নি।

কথা চাপতে চাও চাপ। কিন্তু তোমার কথা সত্যি হলে জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু থাকত না আর আমারও...]

* * *

প্রফুল্ল প্রতুলের পিঠে হাত রেখে অতি ধীরে বললেন, ভুল করলে সে দুঃখ কিন্তু কোনদিন যাবে না প্রতুল।

প্রতুল মুখ নীচু করেই ক্ষোভের সঙ্গে উত্তর দিল, ভুল যে করছি তা বুঝব কী করে বাবা?

তুমি স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলার আগে আমার মত নেওয়াটাও দরকার বোধ করলে না কেন?

প্রফুল্ল নিরুত্তর। সত্যিই তো। এ প্রশ্নের সে কী উত্তর দেবে? কেন মত নেয় নি? অবশ্য তর্ক করে বলা যায়, মত নেবার কী দরকার? আমার বয়েস হয়েছে নিজের ভালমন্দ বিচার করবার। আমার অধিকার আছে নিজের পথ বেছে নেবার। কিন্তু সে তো হল ছেঁদো কথা। [বাপের সঙ্গে ছেলের যে দ্বন্দ্ব হবেই এমন কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তা ছাড়া তার ন্যায়সঙ্গত অধিকারে প্রফুল্ল তো কোনদিন হস্তক্ষেপ করেন নি। বরং সে যখন কোন কোন দিন গভীর রাতে বাড়ি ফিরে অস্বস্তি বোধ করেছে, বাবা কী ভাববেন মনে করে সকালে মুখ তুলে চাইতে পারে নি, তখন তিনিই তো যেচে বলেছিলেন, তুমি যদি নিরাপদ বোধ কর, কলকাতা শহরে রাত্তির বারোটার নিঝুম পথে, তবে আমি মিথ্যে ভয় পেতে যাব কেন? হ্যাঁ, ভাবনা হয়। সেটা প্রত্যেক বাপেরই হয়। কিন্তু সে ভাবনার প্রকৃতি তুমি এখন বুঝবে না প্রতুল। সে ভাবনা আমার হবেই। তোমার গায়ে কোথাও ছড়ে গেলে আমি চিন্তিত হয়ে উঠি, ভাবি ওই থেকেই গুরুতর কিছু হয়ে পড়ে বুঝি। মনের মধ্যে এরিসিপেলাস, টিটেনাস সব কিছুই উঁকি মেরে যায়। বাপ-মায়ের ধারাই ওই। আবার এও জানি যে আমাদের ক্ষণে ক্ষণে ওই আশঙ্কার জন্যে তোমাকে ধরে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখার কোন মানেই হয় না। হয়তো বিপদ আসবে কোনদিন কিন্তু সেই বিপদকে এড়াতে গিয়ে নিজেকে পঙ্গু করতে আমি তোমাকে বলি না। বিপদ যদি আসেই কষ্ট আমাদের সইতে হবে। এ কথা প্রতুল বাপের কাছে শুনেছিল আঠারো বছর বয়েসে। আজ তার বয়স পঁচিশ। অতএব আজ তার কাজে বাবা বাধা দিতে যাবেন তা সে ভাবল কী করে? কেন ভাবল? কেন গোপন করেছিল? লজ্জায়?]

প্রফুল্ল। তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমাকে অহেতুক বাধা দেব?

প্রতুল। ঠিক তা নয় বাবা; কেন বলি নি আমি নিজেই এখন বুঝতে পারছি না। দ্বিধা তো এখনও কাটছে না। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি অমত করবে না এই ধারণা ছিল বলেই হয়তো বলি নি।

প্রফুল্ল। তোমার মাকে বলেছ? তাঁর মত নিয়েছ?

প্রতুল। তাঁকে শুমি বলেছে।

প্রফুল্ল। শুমি আমাকে কেন বলল না?

[কেন এই দ্বিধা আসে ছেলেমেয়েদের মনে? তিনি তো শৈশব থেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করে এসেছেন যাতে এই ব্যবধান তাঁর আর ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে না ওঠে। তবে তাদের এ অস্বস্তি, এই লুকোচুরি কেন? প্রতুল সামনে বসে রয়েছে কিন্তু যেন উঠে যেতে পারলেই বাঁচে। অথচ অমিয়ার আর শ্যামার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কী করে? এই তো নিজেই বলছে যে মায়ের মত তার নেওয়া হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর মত সে নেবার দরকার বোধ করে নি। ছেলে এবং তাঁর মধ্যে এই প্রাচীর কী করে উঠল? নাকি, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠলে, ব্যক্তিত্বের সংঘাত বা বিকর্ষণ অবশ্যম্ভাবী?

তবু কষ্ট হয়। যার কাছ থেকে আশা করা যায় একান্ত আত্মীয়তা, সহানুভূতি, নির্বাধ হৃদ্যতা সেই যদি এমনি করে পরের মত থাকে—যেন পাড়ার কোন অপরিচিত ছেলে, তা হলে এই পারিবারিক জীবন এমন করে গড়ে তোলার অর্থ কী? কেন এই পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে, একে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর এমন প্রাণপণ প্রচেষ্টা?

এই পারিবারিক জীবন কী সুখ দিয়েছে তাঁকে; শুধু নিয়েছে খাটিয়ে, নিয়েছে দায়িত্ব পালন করিয়ে সকাল থেকে রাত্রি, আর ভাবিয়ে ভাবিয়ে চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে রাত্রি থেকে সকাল পর্যন্ত। সেই দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন এই আশায় যে অমিয়া তাঁর কাছ থেকে যত দূরবর্তীই হন না কেন, বড় হলে ছেলেমেয়ে তাঁর এই একাকিত্ব দূর করে দেবে, দেবে স্নেহে সান্ত্বনা, নীরব শুভেচ্ছা। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই এই দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অপরিসীম একাকিত্ব তিনি মুখ বুজে সহ্য করে এসেছেন—অমিয়ার কাছে অপরাধী হয়ে থেকেছেন।

তবু কি তাঁর অন্যায়? শ্যামলী চলে যাবার পরে এক দুর্বল মুহূর্তে, একান্ত অসহায়তার মধ্যে তিনি অমিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। পরে বুঝেছিলেন তাঁর হৃদয়ের ভার আর একজন এসেই বহন করতে শুরু করে দেবে, এ কথা ভাবাই তাঁর ভুল হয়েছিল। তা হয় না। তখন তিনি অমিয়ার কাছে সন্তর্পণে প্রস্তাব করেছিলেন আলাদা থাকবার। কিন্তু অমিয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন; বলেন, তোমার কোন ভয় নেই। আমি কিছু চাইব না তোমার কাছে।

জীবনে সব ভুলেরই সংশোধন আছে আর এই একটা ভুলের কেন সংশোধন থাকবে না? এই একটা কাজকে এমন অপ্রতিবেধ্য করে রাখা হয়েছে কেন? কেনই বা অমিয়া রাজী হলেন না? সামাজিক অবমাননার ভয়ে? সে ভয় তাঁর নিজেরও ছিল; নইলে নিজেই বা সহ্য করলেন কেন? সেই ভয়ের মূল্য আজকে কড়ায়-গণ্ডায় তাঁকে দিতে হচ্ছে।

ছেলে পর হয়েছে। মেয়ে পর হয়েছে। স্ত্রীও পর।

ছেলেমেয়ে কেমন করে যেন বুঝে নিয়েছে তাঁদের জীবনের এই ফাঁকি—বুঝেছে যে তিনি তাদের সত্যিকারের আপনজন নন, তিনি শুধু প্রতিপালক।

কিন্তু সে কথা কি সত্যি? কিছুতেই না। তাঁর সন্তান-বাৎসল্যে কোন ফাঁকি নেই, কোন ফাঁকি নেই। এ কথা তারা বুঝল না। শুধু মায়ের কাছ থেকে আভাসে ইঙ্গিতে উল্টোটাই বুঝে তাঁর প্রতি এই চূড়ান্ত অবিচার করল।]

প্রফুল্ল। আচ্ছা, মাকে যখন বলা হয়েছে, তখন আমাকে আর নাই বললে।

তিনি চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রতুল উঠে জিজ্ঞাসা করল, মা তোমায় কিছুই বলে নি বাবা? আমি কিন্তু মনে মনে তাই আশা করেছিলাম।

হয়তো তিনি মনে করেছিলেন তুমি নিজেই বলবে।

প্রতুল সোজা জিজ্ঞাসা করে বসে, তোমার কি তা হলে মত নেই?

এতদূর এগিয়ে এখন এ প্রশ্ন অবান্তর, পতু। তা ছাড়া দেখ, নাম-ধাম, কুল-শীল জেনেই বা কী হবে। ওতে কিছুই বোঝা যায় না। তুমি বিয়ে করবে; তোমার পছন্দ যখন হয়েছে তখন তার ওপর কথা নেই। আমি তোমাকে কতটুকু জানি পতু যে, তোমার হয়ে পছন্দ করতে যাব কিংবা তোমার পছন্দকে বাতিল করব। আমি তোমাকে কেন, তুমিই বা আমাকে কতটুকু চেন? বাপ আর ছেলের মধ্যে এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক পতু। তুমি আমার ছেলে, অথচ তোমাকে যেটুকু চিনি তার চেয়ে বেশী চিনি আমি আমার আপিসের কণ্ট্রাক্টরকে, আমার পিওনকে বেয়ারাকে। তোমার দেহের অণুতে অণুতে আমি আছি কিন্তু মনে কোথাও নেই—কোথাও না। এই পুঞ্জীভূত অপরিচয়ের চাপে তুমি আমি এত দূরে সরে গিয়েছি যে এখন আমার ভাবতে কেমন বিস্ময় লাগছে যে তুমি আমার ছেলে, শুমি আমার মেয়ে।...

প্রতুল। বাবা!

প্রফুল্ল। এই সত্যি কথা পতু। আমি যদি আজ এ কথা চেপে যেতাম তা হলেও এর সত্যতা তো কমত না। বরং তোমাকে বলে আজ এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করছি যে তুমি যেন তোমার ভাবী জীবনের এই অভিশাপের মধ্যে পড়ো না—যেন ভুল করো না।

প্রতুল। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

[হঠাৎ প্রফুল্লর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল শ্যামলীর মূর্তি —সেই শেষ মুহূর্তের বিষণ্ণ দুঃসহ হাসি—যেন সে বলে গেল : আমার সারা হল কিন্তু তোমার ?]

প্রফুল্ল। যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তাকে যে তুমি ভালবাস তা কী করে বুঝলে ? ধর, এখনি যদি খবর পাও সে আর নেই, তা হলে তুমি একবছর পরে, অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করবে না ? বল, উত্তর দাও।

প্রতুলের আনতমুখ হাত দিয়ে তুলে ধরে বললেন, বড় অন্যায় করে ফেলেছি পতু, বড় অন্যায় করে ফেলেছি। ও-কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া উচিত হয় নি। ছি ছি, এত বড় অসংযম ছিল আমার মধ্যে!

সরে গেলেন ঘরের এক কোণে জানলার পাশে যেখানে টেবিলের ওপর শুমি এক গোছা মাটির ঘটে নানা ছবি এঁকে সাজিয়ে রেখেছে। তার পাশে এক টিপয়ের ওপর এক ঝাড় সোঁদাল ফুল।

প্রফুল্ল। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, প্রতুল। আমি নিজের ক্ষোভে তোমাকে অহেতুক কষ্ট দিয়েছি।

প্রতুল এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে চেয়ারে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে, অতি ধীরে অতি কোমল কণ্ঠে বলল, তুমি আমাকে কী একটা বলতে চাও, কিন্তু কিছুতেই বলে উঠতে পারছ না। যদি তুমি মনে কর বাবা, সে কথা আমার শোনা দরকার, আমার নিজের জীবন গড়বার জন্যেই সে কথা জানা দরকার, তা হলে তুমি বল। হাজার কষ্ট হলেও সে কথা আমি শুনব।

প্রফুল্ল দীর্ঘক্ষণ চুপ করে থেকে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শুনে আমাকে ঘৃণা করবে না ?

প্রতুল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

কিন্তু বললেই কি তুমি বুঝবে ? তুমি জীবনের জান কতটুকু ? হয়তো এই প্রথম কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মনে করছ এই বুঝি প্রেম।

* * * *

বলতে আমার সাহস হচ্ছে না পতু। মনে হচ্ছে সব ভেঙে যাবে। যা নিয়ে এতদিন আমি ভুলে আছি সব ভেঙে-চুরে যাবে। তবু এও ভাবছি যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতার কথা যদি আমার আত্মজ-ই না জানল তা হলে আর কে জানবে ? কিন্তু ভয় হয়, তুই আমাকে ঘৃণা করবি সে কথা শুনলে।

তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে প্রতুলের মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মত ডাকতে লাগলেন, শুমি, শুমি!

শ্যামা ছুটে এল পাশের ঘর থেকে : কি বাবা ?

তাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

শ্যামা বসে তাকাল দাদার মুখের দিকে, বাবার মুখের দিকে। থমথমে ভাবে কেমন ভয় পেয়ে গেল।

প্রফুল্ল। আচ্ছা মা শুমি, তোদের কি ধারণা আমি তোদের মাকে কোনদিন কষ্ট দিয়েছি, অযত্ন করেছি ?

শ্যামা হতচকিত হয়ে উঠল। প্রতুল বলে উঠল, কী তুমি বলছ বাবা ? এসব কথা কেন উঠছে ? আমি তো—

প্রফুল্ল। তা হলে মাকে তোরা সব বলিস, তিনি সবই জানতে পারেন আর, আমি কিছুই জানতে পারি নে, আমাকে তোরা একপাশে ঠেলে রাখিস পরিবারের অন্তেবাসীর মত এ কেন হয় ? মা-ই আপন, আমি কেউ নই ? তোরা কী ভাবিস আমাকে, আমার সম্পর্কে ?

শ্যামা উঠে বাবার মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালনা করতে থাকে। [বাবা কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন সেদিন মা-ও ঠিক এই কথাই তাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন। কী আছে এঁদের জীবনের মাঝখানে—কী রহস্য ? যার জন্যে সংসারে এত শান্তি থাকা সত্ত্বেও, এঁরা দুজনে এত অসুখী। ছেলেমেয়েদের কাছেও যেন অপরাধী। জানতে চান, কী তারা ভাবছে, কী মনে করছে।]

প্রফুল্ল। তোমার মা সেদিন নিজের অজ্ঞাতেই কাঁদছিলেন, কেন জান ?

দুজনেই আগ্রহে কৌতুহলে তাকিয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে।

প্রফুল্ল। তোমাদের আগের এক মা ছিলেন।

দুজনেই। আগের এক মা! সে কি!

প্রফুল্ল। তাঁর নাম শ্যামলী ছিল বলে আমি শুমির নাম রেখেছি শ্যামা।

শ্যামা। কোনদিন তো কেউ বলেন নি বাবা!

প্রফুল্ল। তোমার নাম শ্যামা রাখায় তোমার মা মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন; কিন্তু আমাকে কিছু বলেন নি। তোমাদের মায়ের সবচেয়ে দুঃখ এই। তিনি নিজেকে বঞ্চিতা, অপমানিতা মনে করেন। তিনি ভাবেন তাঁকে আমি এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে ফাঁকি দিয়ে আসছি।

আর—আর সে কথা তো মিথ্যে নয়।

দুই হাতে তিনি মুখ ঢেকে বসলেন। প্রতুল সামনে থেকে উঠে ঘরের এক প্রান্তে চলে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। শুমির হাত থেকে গেল প্রফুল্লের চুলের মধ্যে।

একটু পরে তিনি ডেকে উঠলেন, শুমি!

শ্যামা। এই যে বাবা, আমি তোমার কাছেই রয়েছি।

ফিসফিস করে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন, পতু কোথায় ? সে কি চলে গিয়েছে ?

শ্যামা। হ্যাঁ!

তাকিয়ে দেখে বলল, চলে গিয়েছে। প্রফুল্ল যেন চিৎকার করে উঠতে চাইলেন : চলে গিয়েছে!

তারপরেই শ্যামাকে বুকে চেপে ধরলেন। চোখ বোজা। গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে টপ টপ করে।

লেখকের স্বাধীনতা

অচ্যুত গোস্বামী

সাহিত্যিক হিসাবে পাস্তেরনাকের মূল্য যাই থাক্, শুধু সেইজন্যই তাঁকে নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত করা হয় নি। পিছনে অন্য শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। আর সোভিয়েট-মহিষ সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জালের মধ্যে খুব সহজে নিজের শিঙ বাড়িয়ে দিয়েছে। পাস্তেরনাককে নিয়ে একটা বিশ্রী হট্টগোল করে পাশ্চাত্ত্য জগতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে রাশিয়া নিজেই সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে।

আরও অন্যান্য ব্যাপারে লক্ষ্য করা গিয়েছে, কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাশিয়া যা করেছে ঠিক সেই উদ্দেশ্যের জন্য ভারতবর্ষ বা আমেরিকার মত সুসভ্য দেশগুলি তা করত না। হাঙ্গেরীর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল; সেই একই প্রয়োজনে ভারতবর্ষ শেখ আবদুল্লাকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে কড়া পুলিস প্রহরায় স্বগৃহে অন্তরীণ করে রেখেছে। সুসভ্য নামের মহিমাই আলাদা! আমেরিকার ম্যাকার্থি তো নিজের গোদা পায়ের জোরে ও-দেশের বেচারা কম্যুনিস্টদের পিলে অবধি চটকিয়ে দিয়েছিলেন, তবু এ কথা কি কেউ কখনও বলবে যে সে সোনার তৈরি দেশে স্বাধীনতার কোন অভাব আছে?

পাস্তেরনাকের কথা ভেবে এবং আলোচনা করে আমরা বাঙালীরা অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে সোভিয়েটের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের গর্বে ডগমগ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু বাস্তবিকই কি সোভিয়েটের তুলনায় বাঙালী লেখকেরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন? তুলনামূলক আলোচনায় যাওয়া নিরর্থক, কিন্তু প্রশ্নটা বাস্তবিকই ভেবে দেখবার মত।

আপাততঃ মনে হতে পারে, বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের তেমন একটা স্বাধীনতার অভাব নেই। চলচ্চিত্রের মত সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেন্সর-ব্যবস্থা অত কড়া নয়। সরকার-বিরোধী সমালোচনামূলক লেখা লিখতে গেলে আমরা আজকাল যে তেমন একটা আইন-গত বাধার সম্মুখীন হই তা নয়। কিন্তু তবু একটা আশ্চর্য তথ্য এই যে, আমাদের দেশে সম্প্রতি প্রকাশিত শত শত গল্প-উপন্যাস-কবিতার মধ্যে সমাজের জীবন্ত সমস্যামূলক বা সরকারের সমালোচনামূলক লেখার সংখ্যা খুব কম। এত কম যে শতকরা হিসাবের মধ্যে তাকে ফেলা যায় না, এমন কি আজকালকার বামপন্থী লেখকরা পর্যন্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রে material বিষয়বস্তু ছেড়ে spiritual বিষয়বস্তুর পক্ষপাতী হয়ে উঠেছেন। Spiritual-এ আমার আপত্তি নেই, কিন্তু শুধুই যদি spiritual হয় তবে সেটা একটু সন্দেহের ব্যাপার নয় কি?

রুশ দেশে লেখকদের স্বাধীনতা নেই এ সন্দেহ আমরা করি কেন? প্রধানতঃ এইজন্য যে কতকগুলো নির্দিষ্ট সামাজিক সমস্যামূলক বিষয়বস্তু ছাড়া আর কোন বিষয়বস্তু তাঁদের সাহিত্যে কদাচিৎই দেখা যায়। যদি দেখা যায় যে বাংলাদেশের সাহিত্যও একটা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তবে বিদেশের কোন ব্যক্তি কি এমন সন্দেহ করতে পারেন না যে আমাদের দেশের সাহিত্যের উপরও কোন বিশেষ প্রভাব কার্যকরী রয়েছে?

আমাদের সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রকৃতিকে যদি কেউ নিছক যুগোচিত পরিণতি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান তো তাতে আপত্তি করছি না। কিন্তু যদি কেউ আর একটু সন্দিগ্ধমনা হয়ে কারণ অনুসন্ধানে অগ্রসর হন, তবে আমার মনে হয় তিনি যথেষ্ট অনুসন্ধানের সূত্র দেখতে পাবেন।

কিছুদিন ধরে ভারত-সরকার দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপর নজর দিতে শুরু করেছেন। কিছু কিছু বাছাই করা শিল্পী-সাহিত্যিকের উপর বৎসরান্তিক উপাধি বর্ষণ করা হচ্ছে। শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতি-পুরস্কার এবং সাহিত্যের জন্য রবীন্দ্র-পুরস্কার ও সাহিত্য-আকাদেমির পুরস্কারের ব্যবস্থা হয়েছে। সাহিত্য-

আকাদেমির হুনজয়ের মূল্য এখন অনেক। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ভারতীয় বইয়ের ভাষান্তর করবার দায়িত্ব নেওয়ার ফলে ভাগ্যবান লেখকদের সামনে এর দিগন্ত উন্মোচিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

সাধারণভাবে দেখতে গেলে সরকারের এই জাতীয় প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে দোষের কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং অবহেলিত সাহিত্যিকদের যদি সরকারী আনুকূল্যে কিছু সম্মান এবং অর্থ-প্রাপ্তি ঘটে তবে নিতান্ত মাৎসর্য-দুষ্ট ব্যক্তিরাই তাতে আপত্তির কারণ দেখতে পাবেন। কিন্তু ব্যাপারটাকে আমি আর একটু তলিয়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

সরকারের পক্ষপাতের একটা বিশিষ্ট চরিত্র আছে। আজ পর্যন্ত শুধু সেই সমস্ত শিল্পী-সাহিত্যিকরাই সরকারের আনুকূল্য পেয়ে কৃতার্থ হয়েছেন যাঁরা দেশের ঐতিহ্যের নামে গদগদ ভক্তিতে অশ্রু বিসর্জন করতে পারেন অথবা যাঁরা বিমূর্ত কল্পনাপ্রধান মানবতাবাদের জয়গানে মুখর। সম্মান-প্রাপ্ত শিল্পী-সাহিত্যিকেরা যে যথেষ্ট শক্তির অধিকারী আমি সে কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তাঁরা ছাড়া আর যে-সব শিল্পী-সাহিত্যক আছেন, যাঁরা বাস্তববাদী বা যাঁরা সাম্প্রতিক মানুষের আবেগ-অনুভূতি বা সমস্যার কথা লেখেন বা যাঁরা কোন নতুন আদর্শের উদ্বোধনের পক্ষপাতী, সরকারী আনুকূল্যের দরজা তাঁদের কাছে রুদ্ধ।

এই পক্ষপাতমূলক আচরণের ফল খুব সুদূরপ্রসারী। আজ পর্যন্ত কজন বিশিষ্ট লেখক সরকার কর্তৃক ক্রীত হয়েছেন তার তালিকা আমি দিতে চাই না। কিন্তু দেশবাসীর বিচার-বুদ্ধিকে বিস্মিত করে দিয়ে যে-সব লেখক বিহার-বঙ্গ সংযুক্তির পক্ষে স্বাক্ষর দান করেছিলেন তাঁদের সবাই স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাঁদের সিদ্ধান্তে এসেছিলেন এমন অনুমান করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আজকাল কয়েকটি খুব বড় বড় সাহিত্য-সম্মেলন সরকার-কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত, এবং সেই সব সম্মেলনে কোন্ কোন্ সাহিত্যিকরা বিশেষ সম্মানের আসনগুলি অলঙ্কৃত করার জন্য আমন্ত্রিত হন তা হয়তো অনেকেই লক্ষ্য করেছেন।

বিপদ শুধু এইখানেই নয়। দৈবাৎ আমার একদিন কয়েকজন চলচ্চিত্র-পরিচালকের আলোচনা শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। কোন্ কোন্ গুণ থাকার ফলে কোন্ ছবি রাষ্ট্রপতি-পুরস্কারের সম্মান লাভ করে, খুব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে সেইটেই আলোচনা করা হচ্ছিল। আমি অনুভব করতে পেরেছিলাম, আজকাল অনেক সময় যখনই কোন পরিচালক কোন ছবি তৈরির কাজে হাত দেন, সরকারী সম্মান-লাভের সম্ভাবনাটাকে তিনি চোখের সামনে স্পষ্ট করে রাখতে চেষ্টা করেন। প্রতিশ্রুতিবান নাম-করা লেখকেরাও যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-কর্মে হাত দেন তখন তাঁদের মানসনেত্রের সামনেও যে সরকারের মসলা-মাখানো বঁড়শিটি দুলতে থাকে এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এবং কোন্ ধরনের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে লিখলে, কোন্ কোন্ লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে, ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়, সে সম্পর্কে তাঁরাও গবেষণা করে থাকেন।

পাঠকদের প্রতিক্রিয়ার কথাটাও ভাবা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণদের তালিকায় যে ছেলের নাম প্রথমে থাকে তাকে যেমন আমরা বছরের সেরা ছেলে বলে ভাবতে কখনই ইতস্তত: করি না, ঠিক তেমনই পুরস্কারপ্রাপ্ত বই-ই যে শ্রেষ্ঠ বই এ বিশ্বাসও পাঠক-মানসে ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতই অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ পুরস্কারপ্রাপ্ত বইগুলিই পাঠকের কাছে সাহিত্য-মূল্যের মান-নির্ধারক। কাজেই এই বইগুলি পাঠক-মানসে প্রয়োজনীয় রুচির পরিবর্তন সাধন করছে। আর পাঠকদের রুচিই শেষ পর্যন্ত লেখকদের সাহিত্য রচনার চরম নিয়ামক শক্তি। বামপন্থী লেখকেরা পর্যন্ত যে আজকাল লেখার ধাঁচ বদলাতে প্রয়াসী হচ্ছেন, তার পশ্চাদ্বর্তী অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই পাঠকদের রুচিতে তৈল-মর্দন করবার সচেতন বা অচেতন তাগিদ।

এই যুক্তি-পারম্পর্য একটু দীর্ঘ বলে হয়তো এর সত্যতা সম্পর্কে কারও কারও মনে সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু এটা যে অপরিহার্য সত্য তা বাংলা দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্য-ফসলের দিকে যাঁরাই দৃষ্টিপাত করবেন তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।

সরকার কোন আইন প্রণয়ন করেন নি। কোন সময়েই রাষ্ট্রের স্বার্থ বিপন্ন এই ধুয়া তোলার প্রয়োজন

বোধ করেন নি। কিন্তু এই সামান্ত কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের উপর সরকারের প্রভাব বেশ অনুভব করতে পারা যাচ্ছে। অবশ্য এ কথা ঠিক, সরকারের কিছু কিছু বিশ্বস্ত অনুচরও আছে, কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়েছে এমন কিছু কিছু পত্র-পত্রিকাদির মধ্যে। আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সামান্য দু-চারটি খুব বড় পত্রিকা এবং প্রকাশালয় লেখকদের নিরঙ্কুশ ভাগ্য বিধাতা। কাজেই সে-সব দেশের সরকারেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত আছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় লেখকদের স্বাধীনতা যে অপহরণ করা হয়েছে তাও মূলতঃ এই একই উপায়ে। শুধু সোভিয়েট রাষ্ট্র অনেক বেশী সংগঠিত এবং বিচক্ষণ বলে তার প্রভাবটাও সেই পরিমাণে বেশী। কিন্তু তাই বলে সে দেশেও লেখককে কী লিখতে হবে না হবে তার নির্দেশ-সূচক কোন আইন তৈরি করতে হয় নি। অবশ্য সে দেশে একটি লেখক-সংস্থা আছে, সেখানে লেখকেরা মাঝে মাঝে বসে স্বাধীন মতের আদান-প্রদানের ভিতর দিয়ে অধিকাংশের সমর্থন অনুযায়ী লেখকদের জন্য কতকগুলি যথা-কর্তব্য স্থির করেন। কিন্তু majority-rule স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পন্থা, দোষ ধরার কিছু নেই। এমন কি পাস্তেরনাকের বিরুদ্ধেও সোভিয়েট-সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি, যা করার তা লেখক-সংস্থা অধিকাংশ লেখকের সমর্থন অনুযায়ী করেছে।

আমরা, বাঙালী লেখকেরা, যেমন আমাদের স্বাধীনভাবে লেখার ব্যাপারে খুব বেশী সরকারের বিধি-নিষেধ আছে এ কথা অনুভব করি না, তেমনই সোভিয়েটের লেখকরাও খুব কদাচিৎই অনুভব করেন তাঁদের স্বাধীনভাবে লেখনী পরিচালনার ব্যাপারে সরকার কোনও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছেন। অথচ আমার বিশ্বাস, বর্তমানের এই অভিশপ্ত কালে লেখকের স্বাধীনতা কোথাও নেই—না বাংলা দেশে, না রাশিয়ায়, না আমেরিকায়।

নিছক আইনগত স্বাধীনতাই আসলে স্বাধীনতা নয়। আমার অকুণ্ঠ স্বাধীনতা আছে এই চৈতন্য, সেই স্বাধীনতাকে যথাসাধ্য সমস্ত রকম প্রভাবের থেকে বিমুক্ত হয়ে, যথাসাধ্য নিজের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে, নিজের দেশের এবং সত্যের স্বার্থে, সমস্ত কর্ম এবং চিন্তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা আমার পবিত্রতম দায়িত্ব—এই বোধকেই স্বাধীনতা বলা চলতে পারে। কোন দেশ বা লোকগোষ্ঠীর মধ্যে এই বোধ আপনা-আপনি জন্মাতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়েই এই বোধের জন্ম এবং পরিবৃদ্ধি সম্ভবপর।

উপরে স্বাধীনতা-চেতনার আমি যে সংজ্ঞা দিয়েছি তাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বিচ্যুতি বলে অনেকেই হয়তো সনাক্ত করতে পারবেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথিবীতে আজ কোথাও নেই। সমাজবাদী দেশগুলির কথা ছেড়েই দিলাম, অন্যান্য দেশেও আজকাল যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো তৈরি হচ্ছে তার নাম—ওয়েলফেয়ার স্টেট। রাষ্ট্র সেখানে সমাজের যে-কোন রকম কর্মকাণ্ডের মধ্যে তার দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করছে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক সংস্থাগুলি, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশালয়গুলি, রাজনৈতিক দলগুলি আজকাল এমন বিপুলায়তন হয়ে উঠেছে যেগুলির সামনে ব্যক্তির অস্তিত্ব একটি বৃহৎ চারতলা বাড়ির মধ্যে একটি লাল পিঁপড়ের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবু, এমন কি সমাজতান্ত্রিক চিন্তানায়কেরাও ব্যক্তি এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সীমাবদ্ধ গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি। সোভিয়েট রাশিয়াতেও ব্যক্তিগত উদ্যমকে উৎসাহিত করার জন্য নানাবিধ আয়োজনের অভাব নেই।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কথাটির প্রসঙ্গে বিরাট প্রতিভাধর পুরুষদের নাম আমাদের মনে পড়ে—বঙ্কিম, মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তির নাম। তাঁদেরও অবশ্য স্বয়ম্ভূ বলে মনে করার কোন কারণ নেই। বিশেষ সামাজিক পরিবেশে, সমাজ-মানসের অনুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা বা অপরিস্ফুট চিন্তাকেই তাঁরা রূপ দিয়েছেন। তাঁদের স্বাতন্ত্র্য-চৈতন্য একদিন আমাদের সমাজে নবজীবনের জোয়ার সঞ্চার করেছিল। সমাজে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হলেই যে ঈপ্সিত পরিবর্তনের কাজ শুরু হয় এ কথা ঠিক নয়। অভ্যাস এবং চিন্তার জড়ত্বকে ভাঙার জন্য সমাজ-মানসের উপর যে বিপুল শক্তির আঘাত দরকার তার জন্য প্রয়োজন বিরাট প্রতিভাধরের আবির্ভাবের। এই আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী এ কথা বোধ হয় ইতিহাসের নজির থেকে প্রমাণ করা যায় না। কোন বিশেষ প্রতিভার

আবির্ভাবের জন্ম বিশেষ সামাজিক পরিবেশের প্রয়োজন; তাই বলে কোন বিশেষ সামাজিক পরিবেশ দাবি করলেই যে প্রতিভার আবির্ভাব হবে এমন কোন কথা নেই। এমন কি মার্ক্সীয়-determinismও বোধ করি এ কথা বলে না। তা হলে মানসিক প্রস্তুতি বা সক্রিয়তার উপর মার্ক্স এত জোর দিতেন না। ভারতবর্ষীয় সমাজে অত্যাচার এবং শোষণ একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছেছিল বলেই বুদ্ধের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। তাই বলে বুদ্ধের আবির্ভাব এবং যে-সব যোগাযোগের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সারা এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছিল তা ওই সময়কার সামাজিক অবস্থার অপরিহার্য পরিণতি এ কথা বিশ্বাস করতে গেলে সেটা অত্যন্ত সরল বিশ্বাস হয়ে দাঁড়াবে। অত্যাচার, ভোগ-বিলাস এবং রীতি-সর্বস্বতার দরুন ব্যাবিলনীয় রোমান প্রভৃতি সভ্যতা ডুবে গিয়েছে; কিন্তু পরিত্রাণের জন্ম সে-সব জায়গায় সে-সব সময়ে কোন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নি।

কাজেই বিশ্ব-সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের active role বা সক্রিয়তার ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী নয় বলেই অতীত যুগসমূহে ব্যক্তির গুরুত্ব খুব বেশী বলে প্রতীয়মান হবে। মানুষ অত্যন্ত বেশী রকম অভ্যাসের দাস বলেই প্রয়োজন দেখা দিলেও অভ্যাস বদলানো সহজ হয় না। সমাজ-মানস সর্বদাই অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত, কখনোই তা কাউকে স্বেচ্ছায় ভিন্নভাবে চিন্তা করতে দেয় না। কাজেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মহামানব মাত্রেই সমাজ-মানস থেকে নিজের বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন; এবং তার ফলেই গতানুগতিক চিন্তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন। গোষ্ঠী-মানুষদের মধ্যে (tribal society) যে ব্যক্তি-সত্তা আর সমাজ-সত্তার অভিন্নতা ছিল সেই অভিন্নতার অবস্থায় কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ কথাটা অল্পদিনের, কিন্তু বহু প্রাচীনকাল থেকেই সামাজিক পরিবর্তন সাধনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তাদের মধ্যেই স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনা ছিল এ কথা ধরে নেওয়া চলে। বুদ্ধ নিজেকে সমাজের অপরিহার্য অংশ বলে মনে করলে কখনই সমাজ ত্যাগ করে বেরিয়ে আসতে পারতেন না।

বর্তমানে পৃথিবীতে সর্বত্রই রাষ্ট্রীয় সংগঠন এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সব দেশেই কম-বেশী বিপন্ন। কিন্তু এমন কি সমাজতান্ত্রিক দেশকেও যদি অগ্রগমনের পথে যেতে হয় তবে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-চেতনাকে খানিকটা প্রশ্রয় দিতেই হবে।

অবশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রূপ বদলাতে বাধ্য। অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন পৃথিবীতে মহাপুরুষদের যুগ একরকম শেষ হয়েছে। এ যুগ মাঝারিদের যুগ। তার মানে এই নয় যে আগের মত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ এখন আর জন্মাচ্ছে না। বরং আধুনিক মানুষ কোন মানুষের অসাধারণত্বে আস্থা হারিয়ে ফেলছে। এর কারণ খুব সহজ। পূর্ববর্তী যুগসমূহে প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী পুরুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এবং প্রতিভা বিশ্লেষণ করলে আমরা মানসিক শক্তি এবং দৈবানুকূল্যের (দৈব= chance) সমন্বয় দেখতে পাব। এই দৈবানুকূল্যের ফলেই মহাপুরুষেরা সমাজের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন। এই প্রভাব প্রধানতঃ যুক্তি-নির্ভর নয় বলে দৈবানুকূল্য ব্যক্তির চারপাশে একটি অসাধারণত্বের ধূম্রজাল সৃষ্টি করতে পারলে তবেই তাঁর প্রভাব ব্যাপকভাবে কার্যকরী হয়েছে। এই ব্যক্তি-মোহ সৃষ্টি এ যুগে একটু দুষ্কর, কারণ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা অনেক বেশী বিস্তার লাভ করায় অনেকেই ব্যক্তি-প্রভাবমুক্ত হয়ে চিন্তা করতে চেষ্টা করে। প্রকৃত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যক্তি-প্রাধান্যের প্রতিবন্ধক।

অনেক মানুষ যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শুরু করে, তখন কোন একজনের পক্ষে সম্পূর্ণ মৌলিক একটি চিন্তার জনক হওয়া ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ একই সঙ্গে অনেকের মনেই সেই চিন্তাটি উদিত হওয়া সম্ভবপর। তখন সমবেত চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে একটি চিন্তাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্রবাদীরা সমবেত চিন্তার উপর খুব জোর দেন। কিন্তু সমবেত চিন্তার সাফল্য যে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য-চেতনার উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্যই হাজার মানুষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একজন মানুষের দাঁড়ানোর অধিকার এবং গুরুত্ব স্বীকার্য, এ-কথার উপর কম জোর দেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাকলে সমবেত চিন্তা আসলে ব্যক্তি-প্রাধান্যের অদৃশ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকবে।

কথাটা খুব ভাল করে ভেবে দেখবার মত। যদি সমবেত চিন্তাকে প্রকৃত অর্থে সার্থক হতে হয় তা হলে প্রত্যেককেই সেই চিন্তাকে নিজের চিন্তা বলে গ্রহণ করতে পারা চাই। সেই চিন্তার সার্থকতার উপর তার নিজের স্বার্থ সম্মান ও সন্তুষ্টি জড়িত আছে এই বোধ থাকা চাই। এই মমত্ব-বোধ যদি না থাকে, যদি সবাই মনে করে অমুক আছেন মস্ত বড় নেতা, তিনি যা বলবেন তার উপর আর কার কী বলার থাকতে পারে, তবে ব্যক্তি-প্রাধান্যই বিস্তার লাভ করবে।

কাজেই আমি মনে করছি প্রকৃত স্বাধীনতার আমি যে সংজ্ঞা দিয়েছি তা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যগন্ধী হলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও তার গুরুত্ব আছে।

এইবারে প্রদত্ত সংজ্ঞাটির বিভিন্ন অংশগুলো পরীক্ষা করে দেখা চলতে পারে। সংজ্ঞাটির শুরুতে আছে, "আমার অকুণ্ঠ স্বাধীনতা আছে এই চৈতন্য।" এখানেই একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে: স্বাধীনতা কী বা কাকে বলে?

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সংবিধানে ব্যক্তির কতকগুলো মৌলিক অধিকারের কথা উল্লেখ করা থাকে। সাধারণতঃ আমরা এই মৌলিক অধিকারগুলোকেই স্বাধীনতার নামান্তর বলে গণ্য করে থাকি। এই মৌলিক অধিকারগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে সমষ্টির স্বার্থ আর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে ব্যক্তিকে কর্মে, চিন্তায়, মতপ্রকাশে, ধর্ম-জীবনে, রাজনৈতিক মতবাদে, যা খুশী তাই করার অধিকার দান করা।

কিন্তু এঙ্গেলস স্বাধীনতার আর একটি সংজ্ঞা উপস্থিত করেছিলেন freedom is the recognition of necessity। Necessity কথাটাকে দার্শনিক অর্থে নিতে হবে, এবং তাতে কথাটা প্রায় law-এর অর্থের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বস্তু-জগতে এবং সমাজের গতি-প্রকৃতিতে যে-সব অপরিহার্য নিয়ম আছে তাকে জানতে পারা, স্বীকার করতে পারা এবং সেই অনুযায়ী চলতে পারার নামই স্বাধীনতা। কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যা খুশী তাই করার অধিকার আছে বলেই যদি কেউ আগুনে হাত দিয়ে তার অধিকার প্রতিপন্ন করতে চায়, তবে আমরা তাকে স্বাধীনতা-প্রিয় বলব না, পাগল বলব। কাজেই বস্তু-জগতের অমোঘ নিয়মগুলি জানা এবং মেনে চলাটাই আমাদের নিরাপত্তা এবং সুখের জন্য দরকার, এবং সেইটেই স্বাধীনতা। কিন্তু নিয়ম যে শুধু জড়-জগতের ক্ষেত্রেই আছে তা তো নয়, মানব-দেহ, মানব-মন, মানবেতিহাস এবং মানব-সমাজও কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। এই নিয়মগুলিকে লঙ্ঘন করলে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ার মত প্রত্যক্ষ ফল হয়তো চোখে না পড়তে পারে, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি এবং দূরদর্শিতা প্রয়োগ করে তার সুদূরপ্রসারী ফল লক্ষ্য করা কঠিন নয়। কাজেই আমরা যে পরিমাণে জীবনের নিয়মগুলি জানতে এবং মানতে পারব সেই পরিমাণে নিজেদের স্বাধীন বলে গণ্য করতে পারব। সেই পরিমাণে আমরা অন্ধ ভাগ্যের ক্রীড়নক হিসাবে ছুটোছুটি করার হাত থেকে অব্যাহতি পাব।

স্বাধীনতার গণতান্ত্রিক সংজ্ঞা স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়। স্বাধীনতা অন্ধত্ব থেকে মুক্তি, অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি। স্বাধীনতার একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে—ব্যক্তির সুখ এবং সমাজের অগ্রগতি। কাজেই এঙ্গেলসের সংজ্ঞাটি একটি আপাত-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার অধিকতর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারছে।

কিন্তু এঙ্গেলসের সংজ্ঞাটিকে মূলধন করে যদি কোন রাষ্ট্রশক্তি বা কোন রাজনৈতিক দল এই কথা ঘোষণা করতে শুরু করে যে তার বক্তব্যটিই ঈশ্বরের বাণীর মত অমোঘ সত্য, কাজেই সে বক্তব্য নিয়ে বাদানুবাদ করা বা বিরুদ্ধতা করা স্বাধীনতা নয়, তবে খুব অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আজ পর্যন্ত কোন বিষয়েই শেষ সত্য আবিষ্কৃত হয় নি এবং যে-কোন সত্য অধিকতর যথাযথ সত্যের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হবার জন্য অপেক্ষা করছে। তা ছাড়া কোন ব্যক্তি বা সংস্থা যত বুদ্ধিমানই হোক, তার ভুল করার সম্ভাব্যতা সব সময়েই স্বীকার্য।

ভুল করার সম্ভাবনাটা অবশ্য কম্যুনিস্ট দুনিয়াতে একেবারেই অবজ্ঞাত। সেইজন্য যখনই তাদের নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয় তখনই তারা পূর্ববর্তী নীতির জনকদের বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক, জনসাধারণের শত্রু প্রভৃতি আখ্যায় বিশেষিত করে। তারা যে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আদর্শনিষ্ঠার খাতিরেই ভুল করতে পারে এ কথা কোথাও স্বীকৃত হয় না।

সত্য কথাটা বড় গোলমেলে। কাজেই সত্য বলতে আপেক্ষিক সত্যের কথা বলা হচ্ছে এই কথা ধরে নেওয়াই নিরাপদ। এই আপেক্ষিক সত্য স্থান এবং কাল-ভেদে বিভিন্ন হতে পারে; এক ব্যক্তির কাছে যা সত্য আর এক ব্যক্তির কাছে তা সত্য নাও হতে পারে; আন্তর সত্য (subjective truth) এবং বহিঃসত্য (objective truth)-এর মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে। তবু এই আপেক্ষিক সত্যের গুরুত্ব কম নয়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে নিউটনের তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে কম সাহায্য করে নি।

এঙ্গেলসের সংজ্ঞাটিকে তা হলে ঘুরিয়ে বলা চলে, স্বাধীনতার প্রধানতম উদ্দেশ্য হল সত্য আবিষ্কার। কোন সত্যের ক্ষেত্রেই পূর্ণচ্ছেদ টানা যায় না। একটা ধাপে পৌঁছেই আমরা পরবর্তী ধাপের জন্য প্রস্তুত হব। কোন ধাপে পৌঁছে আমরা সে ধাপের যাথার্থ্য সম্বন্ধে আবার যাচাই করব।

পরবর্তী ধাপের সত্যকে জানার উপায় হল অনুমান। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় hypothesis। সাহিত্য বা দর্শন বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-সব প্রচলিত মত বা পথ বা পদ্ধতি আছে সেগুলোর কোন বিকল্প অনুমান করতে পারার গুরুত্ব খুব বেশী। অনেক বিচার-বিবেচনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে অবশ্য আমাদের জানতে হবে যে কোন একটি বিশেষ অনুমান সত্যের মর্যাদা পেতে পারে কি না।

মার্ক্সের মতে মানুষ যে যা-খুশী-তাই অনুমান করতে পারে তা নয়। তার অর্থনৈতিক পরিবেশের দ্বারা তার অনুমান-ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু অনুমানের একটা নির্দিষ্ট চৌহদ্দি থাকলেও সেই চৌহদ্দির মধ্যে অনেক রকমের বিকল্প অনুমান সম্ভবপর। যেমন ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভাববাদ, দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, বস্তুতন্ত্রবাদ (realism) প্রভৃতি নানা রকমের দার্শনিক মতবাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অনুমান-ক্ষমতা আরও বিস্তৃত হবে না এ কথা কি বলা যায়? অন্ততঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চূড়ান্ত পরীক্ষা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা যায় না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা যাই অনুমান করি না কেন, প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে আমরা সংশয়াতীত বলে ধরে নিতে পারি না। যে পর্যন্ত না আমরা নির্বিকল্প সত্য বা absolute truth-কে জানতে পারছি, সে পর্যন্ত নিশ্চয়ই প্রচলিত সত্যসমূহের বিকল্প অনুমান সম্ভব। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও এই বিকল্প অনুমান করার পথ খোলা থাকা দরকার।

কিন্তু তার জন্য গণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি প্রয়োজন। স্বাধীনতা সম্পর্কে এঙ্গেলসের সংজ্ঞা মৌলিক অধিকারগুলোর প্রয়োজনকে বাতিল করে দিচ্ছে না। বরং একটি অন্যটির পরিপূরক।

সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রচলিত মত পথ চিন্তা বা পদ্ধতির মধ্যে নতুনতর বিকল্প অনুমান উপস্থাপিত হচ্ছে কিনা সেইটেই স্বাধীনতার অস্তিত্বের নির্দেশক। কোন্ দেশের আইনে কী আছে সেইটেই বড় কথা নয়; কোন দেশে এই ঘটনাটি ঘটে কিনা সেইটে দেখে বোঝা যায় সে দেশে স্বাধীনতা আছে কিনা, বা কী পরিমাণে আছে।

আমি বলেছি, যথাসাধ্য সরকারী বা অন্যবিধ প্রভাব-মুক্ত হওয়া স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে, মানব-মনের কি আদৌ প্রভাবমুক্ত হওয়া সম্ভব? অথবা ভাষান্তর করে বলা যায়, মানব-মনের কি আদৌ স্বাধীন হওয়া সম্ভব?

জড়বাদী দর্শন এবং দ্বান্দ্বিক জড়বাদ দুই-ই deterministic। অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতি একটা সুনির্দিষ্ট কার্য-কারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ফ্রয়েডীয় এবং প্যাভ্‌লভীয় মনোবিজ্ঞান ও মানব-মন যন্ত্রের মতই কার্যকারণের নিয়মে বাঁধা এই মতে বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা স্বাধীন কর্ম বলে কিছু নেই।

এই determinist-দের হাত থেকে মানব-মনকে বাঁচাবার জন্যই existentialist-দের জন্ম। তাঁদের মতে, গতানুগতিক জীবনের মধ্যে মানুষের মনে এক এক বিশেষ মুহূর্তে এমন একটি বিশেষ উপলব্ধি আসে যার কোন ইতিহাস নেই, পূর্বতন কার্যকারণের সূত্র ধরে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানেই মানব-মনের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার এটা একটা নতুন ব্যাখ্যা। এবং বৈজ্ঞানিক-ভাবে এটাকে প্রমাণ করা খুব শক্ত।

পক্ষান্তরে জীববিজ্ঞানীরা মানুষকে ঐচ্ছিক (voli-

tional) প্রাণী বলেন। নিম্নতর সহজাত প্রবণতা-পরিচালিত (instinctive) প্রাণীদের থেকে এইখানেই তার তফাত। মানুষ সমাজের বা কোন খুব শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অনুশাসনে এমন কি তার জৈবিক প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধেও যেতে পারে। নিম্নতর প্রাণীগুলির এই ক্ষমতা নেই। দেহের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যেতে পারে বলেই মানুষের সমাজের একনায়কত্বের খপ্পরে পড়ার ভয়। তার মানে অবশ্য এই নয় যে সহজাত প্রবৃত্তি-গুলিকে মানুষ জয় করতে পেরেছে বা পারবে। সমাজ প্রবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি-মানুষদের সমষ্টি বলে তা-ও সম্ভব নয়। বস্তুতঃ সহজাত প্রবৃত্তি আর সমাজ এই দুইয়ের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই মনের জন্ম আর পরিপুষ্টি হয়। সমাজের প্রভাবের ফলেই মনের উৎপত্তি হলে প্রভাব-মুক্তি কথাটার তাৎপর্য কোথায় ?

একটু তাৎপর্য আছে। আগেই বলেছি, মানুষের মন ঐচ্ছিকশক্তির অধিকারী, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বিকল্পের মধ্যে কোন একটিকে সে গ্রহণ করতে পারে। এই নির্বাচনের কাজকে সাহায্য করার জন্য মানুষের মনের দুটো বৃত্তি আছে—যুক্তি আর অনুভূতি। এই দুটো বৃত্তিকে আমরা আগে যতটা পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে করতাম এখন তা করি না। কিন্তু এই দুটো বৃত্তির কোনটাই আজ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ বা perfect হয়ে উঠতে পারে নি। Perfect যদি হত তা হলে কোন ব্যাপারে যুক্তি প্রয়োগ করে সব মানুষ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারত এবং সে সিদ্ধান্ত সত্যের নির্দেশক হত। দুঃখের বিষয় যুক্তি এক দ্বিমুখী অস্ত্র ; বিভিন্ন স্বতঃসিদ্ধের উপর দাঁড়িয়ে একই যুক্তির নিয়ম প্রয়োগ করে আমরা পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি। মনের অগোচরে থেকে আমাদের প্রবৃত্তি বা কোন সামাজিকশক্তির প্রভাব যুক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

অস্তিত্ববাদীরা অবশ্য যুক্তির প্রভাবকেও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। কিন্তু সে বিতর্কে আমরা আপাততঃ যাচ্ছি না। আমার বক্তব্য এই যে যুক্তি যত অক্ষম অস্ত্রই হোক, আপাততঃ এর চেয়ে ভাল অস্ত্র আর আমাদের জানা নেই। আমরা সত্যকে জানার জন্য, সমাজ এবং ব্যক্তির কল্যাণের জন্য যুক্তি প্রয়োগ করে অনেকগুলি বিকল্পের মধ্যে যে-কোন একটিকে গ্রহণ করতে পারি, এইখানে আমাদের স্বাধীনতা। হাজার হাজার বছরের সাংস্কৃতিক প্রগতি আমাদের যুক্তিকে যথেষ্ট শানিত করেছে। কিন্তু এখনও এর দুর্বলতা ঘোচে নি বলে বিভিন্ন মানুষের নির্বাচন বিভিন্ন হবে। কাজের ব্যাপারে অধিকাংশের মতটা মান্য করে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই বটে, কিন্তু minorityর ভিন্ন মত পোষণের এবং প্রকাশের অধিকারকে মান্য করতে হবে। Majority-rule-এর প্রতি সত্যের কোন পক্ষপাত আছে বলে জানা নেই। নিরানব্বই জনের সিদ্ধান্ত ভুল হয়ে অবশিষ্ট একজনের সিদ্ধান্ত ঠিক হতে পারে।

যুক্তি যেখানে খেই হারিয়ে ফেলবে সেখানে অনুভূতির সাহায্য নেওয়া চলতে পারে। দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের কাজ যেখানে শেষ হয়, সাহিত্যিকের কাজ সেখান থেকে শুরু।

মানুষের পক্ষে তখনই যুক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব যখন তার সামনে একাধিক বিকল্প উপস্থিত থাকে। তখনই তার স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে। যখন আমরা বলি মধ্যযুগে স্বাধীনতা ছিল না, তখন তার অর্থ এই নয় যে সে সময় সব কিছুই মানুষকে সঙীনের সামনে দাঁড়িয়ে করতে হত। আসল কথা তখন মানুষের সামনে কোন বিকল্প উপস্থিত ছিল না, তাই স্বেচ্ছাক্রমেই সে একটি মাত্র পথ—সামাজিক প্রথাকে অনুসরণ করার পথ—গ্রহণ করত।

কোন একটি প্রভাব যদি নিরঙ্কুশ আধিপত্য লাভ করে তবে মানুষের সামনে বিকল্পগুলো কার্যতঃ অর্থহীন হয়ে পড়ে। মানুষ বড় সহজে প্রভাবিত হয়ে পড়ে ; নিজের বিচার-বুদ্ধিকে অন্যের কাছে গচ্ছিত রাখতে পারলে অধিকাংশ মানুষই পরম স্বস্তি অনুভব করে—যেমন আমরা ব্যাঙ্কে টাকা রেখে স্বস্তি পাই। ইংলণ্ড বা আমেরিকার কয়েকটি পত্রিকার মালিকের কাছে অধিকাংশ মানুষের বিচার-বুদ্ধি গচ্ছিত রয়েছে। রাশিয়ায় একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সিন্দুকে সে দেশের মানুষের সমস্ত মন সুরক্ষিত আছে।

আমি যখন প্রভাব-মুক্তির কথা বলছি তখন কোন একটি প্রভাবের নিরঙ্কুশ আধিপত্য থেকে মুক্তির কথা বলছি। কথাটাকে ঘুরিয়ে এ ভাবেও বলা চলে যে

সমাজের সমস্ত রকমের প্রভাব যখন সমানভাবে কোন ব্যক্তির উপর পড়ে তখনই সে প্রভাবমুক্ত। তখন সে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করে অনেকগুলি বিকল্পের থেকে একটিকে গ্রহণ করার সুযোগ পায়।

আমি ইতিপূর্বে বলেছি স্বাধীনতার কাজ হল সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য প্রচলিত মত-পথের ক্ষেত্রে বিকল্পের অনুসন্ধান করা। স্বাধীনতার পরবর্তী কাজ হচ্ছে বিকল্পগুলির মধ্যে একটিকে নির্বাচন করা। পরবর্তী বলা বোধ করি ভুল। দুটো কাজই এক সঙ্গে চলে। আমরা যখন কোন মতকে গ্রহণ করে কাজ করে চলি, তখন সেই মতের প্রতি যত দৃঢ় আস্থাই আমাদের থাকুক, মনের কোণে একটু 'কিন্তু' রেখে দেওয়া ভাল। সেই 'কিন্তু'টুকু দিয়ে অন্য বিকল্পগুলোকে বার বার পরীক্ষা করা, এবং নতুন বিকল্পের অনুসন্ধান করার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অন্য বিকল্প বেশী যুক্তিসঙ্গত হলে মত পরিবর্তন দোষের নয়। কোন একটি মত আমাদের যতই প্রিয় হোক, সত্য তার চেয়ে প্রিয়তর।

এ-সব কথা কম-বেশী সকলেরই জানা। তবু এ-সব কথার আবার পুনরাবৃত্তি করছি এইজন্য যে আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা। স্বাধীনতার জন্য আইনের রক্ষাকবচই যথেষ্ট নয়। স্বাধীনতার জন্য মানুষের সামনে অনেক বিকল্প উপস্থিত থাকা দরকার; এবং তার মন কোন একটি প্রভাবের একাধিপত্য থেকে মুক্ত থাকা দরকার। কিন্তু অর্থ এবং ক্ষমতার শক্তি খুব বেশী। আইনের সাহায্য না নিয়েই দেশের সরকার কী ভাবে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন প্রবন্ধের শুরুতেই আমি তা আলোচনা করেছি। যে কোন রাজনৈতিক দলই মানুষের মনের উপর ন্যায় বা অন্যায়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে অপরিহার্য মনস্তাত্ত্বিক কারণে। ক্ষমতা-দখলের লড়াইয়ের কথা ছেড়ে দিলেও, নিতান্ত আদর্শ-নিষ্ঠার খাতিরেই তাঁরা একান্তভাবে মানুষের কল্যাণের জন্যই মানুষের মনের উপর সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন।

তা ছাড়া, আমার মনে হয়, কিছুদিন রাজনীতি চর্চা করার পর রাজনৈতিক নেতাদের যুক্তি এবং অনুভূতি একটু ভোঁতা হয়ে যায়। তাঁদের কর্মব্যস্ত মন সব-কিছুকেই একটা নির্দিষ্ট ছকে ফেলে এক মিনেটের মধ্যে বিচার করে ফেলে। তাঁরা যদি সাংস্কৃতিক জগতের উপর মোড়লী করাকে তাঁদের পবিত্র কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করতে শুরু করেন তবে সেটা খুব বিপদের কথা।

কাজেই আমার প্রস্তাব হল, সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। কোন রাজনৈতিক দলই—ক্ষমতায় আসীন বা ক্ষমতা-প্রার্থী—সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোন অংশের উপরই প্রভুত্ব বিস্তারে বিরত থাকবেন। সরকার অবশ্যই সংস্কৃতিকে অর্থ সাহায্য করবেন, সমাজতান্ত্রিক সরকারকে তো ষোল-আনা মূলধনই জোগাতে হবে। কিন্তু সে-অর্থ ব্যয় করার ভার সংস্কৃতি-জগতের লোকদের উপর থাকবে। পুরস্কারাদি সম্পর্কেও সেই কথা।

এর জন্য কোন্ ধরনের সাংগঠনিক পরিকল্পনা প্রয়োজন সেটা পরবর্তী আলোচনার বিষয়। সকলের আগে প্রয়োজন মূল নীতি নির্ধারণ।

এ কথা ঠিক রাজনীতির ক্ষেত্রে বা সাহিত্য-দর্শনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে একই চিন্তা কার্যকরী থাকে। কোন রাজনৈতিক নেতা সাহিত্যিকও হতে পারেন, বা পক্ষান্তরে কোন সাহিত্যিক রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত থাকতে পারেন। তাতে আপত্তির কোন কারণ নেই। আমাদের জীবনের বিভিন্ন বিভাগগুলি কতকগুলো বিভিন্ন বায়ু-নিরোধক কক্ষে আবদ্ধ এ কথা স্বীকার করার কোন কারণ নেই। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে মুক্ত বায়ু সঞ্চালন নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা বিস্তারের অনুকূল। কিন্তু অর্থ এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করে যখন কোন রাজনৈতিক দল সাহিত্য বা দর্শনের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করেন জিনিসটা তখনই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।

ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় মূলধনের কবল থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রস্তাব আনতে পারলেও আমি খুশী হতাম, কিন্তু সেটার কোন সম্ভাব্যতা দেখতে পাচ্ছি না বলে তার আলোচনায় বিরত রইলাম।

কলকাতা ও কফিহাউস

পবিত্রকুমার ঘোষ

কফিহাউস আধুনিক জীবনের একটি বিশেষ উপাদান। এরই সগোত্র চায়ের দোকান। আধুনিক সমাজের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থাকে, যদি কফিহাউস প্রসঙ্গ বাদ পড়ে। এই বিশ্বাসে বর্তমান আলোচনাটির অবতারণা। কোন একটি বিশেষ কফিহাউসের কথা এখানে বলা হয় নি। সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলা হয় "ফিচার রচনা," ঠিক সে পর্যায়ের আলোচনাও এটা নয়।

॥ ১ ॥

নাগরিক মানুষদের মন মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে ওঠে। চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইত্যাদি যাবতীয় দর্শনীয় জিনিস তাদের দেখা হয়ে গেছে। শহরে যারা নতুন আগন্তুক অথবা যারা মাত্র শিশু, ওসব এখন তাদের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। অফিসে কলেজে বাড়িতে বৈচিত্র্যহীন জীবন যখন আর ভাল লাগে না, ইট-কাঠ-দেয়ালের হিজিবিজি যখন অসহ্য হয়, এমন কি সিনেমা বা নানা রকমের উৎসব-অনুষ্ঠান পর্যন্ত যখন রুটিনাশ্রিত জিনিস বলে মনে হতে থাকে তখন মধ্যবিত্ত মানুষের মন ছুটে যায় শহরের বাইরে কোন নিকট বা দূর স্থানে। হয় নতুন কোন শহর নতুবা প্রকৃতির শ্যামশোভা আকর্ষণ করতে থাকে, এবং তখন একা একা বা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ার সুযোগ খুঁজতে হয়। কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের জন্য অভ্যস্ত নাগরিক জীবনচর্যা থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন প্রাণকে আবার তাজা করে তোলে, কর্মে নতুন উৎসাহ পাওয়া যায়, সবকিছু ভাল লাগতে থাকে।

কিন্তু এ রকম ভ্রমণ সপ্তাহের সাতদিনই সম্ভব হয় না। সপ্তাহে একদিনও যে হবে তেমন নিশ্চয়তাও নেই। কেন না সাপ্তাহিক ছুটির দিনটাতেই দেখা যায় নিজের কাজ সব ভীড় করে আসে। সিনেমা দেখা বা আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার পক্ষেও ছুটির দিনটা দরকারী। কাজেই নগরের বৃত্তের বাইরে নেহাতই জীবনটাকে উপভোগ করার উদ্দেশ্যে যাওয়া ঘটে থাকে কদাচিৎ। অথচ জল হাওয়া খাদ্যের মত রুটিন-বাঁধা কাজ ও আনন্দের বাইরে অতিরিক্ত বেহিসেবী কিছু আনন্দের আয়োজন নেহাত টিকে থাকার জন্যই দরকার। সপ্তাহের সাতদিনে একদিন নয়—সাতটি দিনই দরকার।

আনন্দেরও রূপভেদ ঘটে। বনে-জঙ্গলে-কাদায় ঘুরে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা বা পশুপাখি শিকার করায় এক ধরনের আনন্দ আছে, অনাত্মীয় পরিবেশে দায়িত্বহীন জীবনযাপনেও এক রকম আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু নাগরিক মানুষের মন তাতে পুরোপুরি তৃপ্তি পায় না। সংঘর্ষ সে খুবই পছন্দ করে, কিন্তু তা জান্তব হলে চলবে না; সে চায় মনের সংঘর্ষ। হারিয়ে যেতে সে চায়, কিন্তু গহন অরণ্যে নয়—মতবাদ ও ভাবাদর্শের জটিল জালে। পরাজিত করতে পারলে সে খুশীই হয়, কিন্তু পশুপাখিকে নয়—বিরুদ্ধবাদী বন্ধুকে। তাই রোজ সে যেখানে আসে বা আসতে চায় তা নিবিড় বন বা শ্যামল গ্রাম নয়, তা একটি অতি নিরীহ স্থান—কফিহাউস। এখানেও শ্যামলিমার ছোঁয়া যে একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়। টেবিলের কাচের নীচে সবুজ একটি আস্তরণ চোখ জুড়িয়ে দেয়। টবে ফুল বা চারাগাছ টেবিলের মাঝে মাঝে সাজিয়ে রাখার রীতিও দিনে দিনে বাড়বে।

কফিহাউসে যে ব্যবসা-বাণিজ্য বা স্রেফ সাংসারিক প্রয়োজনের কথা আদৌ আলোচনা হয় না তা নয়। অনেক বড় বড় চুক্তি বা লেনদেনও যে ভীড়ের নির্জনতায় সঙ্গোপনে সম্পন্ন হয় না তা-ই বা কে বলবে। হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সে হচ্ছে মামুলী ব্যাপার, তাতে অফিস বা ঘরকে কফিহাউসে টেনে আনা হয় মাত্র। তাতে চুক্তিকারী পক্ষদের সুবিধা যতই হোক, কফি-হাউসের বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক গুরুত্ব তাতে নয়। সে কারণ সম্পূর্ণ অন্য।

॥ ২ ॥

কফিহাউসের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কফি নয়। পানীয় বা খাদ্যের প্রয়োজনে এখানে কেউ আসে না। ওগুলো

নিতে হয় এখানে আসার কর হিসেবে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিল আঁকড়ে থাকার সুযোগ এখানে দেয়—ওটা তারই পুরস্কার। বসে বসে প্রচুর কথা বলতে পারা যায় বলেই লোকে এখানে আসে। কফিহাউসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটাই।

আধুনিক সমাজে ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা বেড়ে গেছে। সমাজের সঙ্গে নাড়ির যোগ তার ছিন্ন হয়েছে। মধ্যযুগে সমাজ তাকে গ্রাস করেছিল, সমাজের দ্বারা আরোপিত সম্পর্কজাল মেনে নিয়ে তাকে খুশী থাকতে হয়েছিল। তার ফলে ব্যক্তিরূপে মানুষ সার্থক হয় নি ঠিকই কিন্তু নিজের জীবনের সমস্যা নিয়ে তাকে বিব্রতও হতে হয় নি। কেন না নতুন কোন সমস্যা নতুন কোন প্রশ্নের মুখোমুখী হবার অবকাশই তখন ছিল না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোন সমস্যাই দেখা দিক তা সমাজকর্তৃক নির্দিষ্ট সমস্যার গণ্ডীর বাইরে পড়ত না এবং সমাধানও সমাজই স্থির করে দিত। এই আরাম ও সুখশয়নের দিন কিন্তু মানুষের নিজের পক্ষেই গ্লানিকর মনে হল এবং সমাজের আরোপিত বন্ধনজাল ছিন্ন করে বিদ্রোহী মানুষ ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চাইল। তারই ফলে গ্রামীণ সমাজের বক্ষপঞ্জর ভেদ করে নাগরিক সমাজের উদ্ভব হয়েছে। গ্রাম মানুষকে শান্তি দিতে পারত, নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় জীবনকে টেনে চলার সুযোগ দিতে পারত, কিন্তু স্বাধীনতা দিতে পারত না। নগর আনল মুক্তির স্বাদ, নগর হয়ে উঠল মানুষের নিজেকে বিস্তৃত ও বিকশিত করার সাধনার সাধনপীঠ। নবযুগের কেন্দ্র হল তাই গ্রাম নয়—নগর।

কিন্তু নগর গড়ে ওঠে নি শুধু মানুষের ইচ্ছার জোরে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক প্রকরণ ও কলা-কৌশলের সমুন্নতিই নগরের শ্রীবৃদ্ধির মূলে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পূর্ণ সুযোগ নিতে এগিয়ে এসেছিল একদল অতি যোগ্য লোক—মুনাফা অর্জন ও সেই মুনাফাকে মূলধনে রূপান্তরিত করে নতুন শিল্প প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হতে এদের সমকক্ষ ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। সমাজের অর্থশক্তি এদের করায়ত্ত হল এবং তার বলে রাষ্ট্রশক্তিও তারাই দখল করে বসল। পুরনো সামন্তপ্রভুরা উদ্বিগ্ন হয়ে এদের বাধা দেয় বটে কিন্তু নতুন বুর্জোয়ারা সে বাধা চূর্ণ করতে এমন কি সৈন্যবল পর্যন্ত ব্যবহার করে। সামন্তপ্রভুদের সহায় ছিল পদাতিক বাহিনী, টাকার জোর তাদের কমে যাওয়ায় অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ত্যাগ করে যায়। তা ছাড়া নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের আবির্ভাব বুর্জোয়াদের অজেয় করে তুলল। যুদ্ধ করাও এ সময় একটা ব্যবসা হয়ে উঠেছিল এবং যুদ্ধ-ব্যবসায়ীরা যেদিকে টাকা বেশী সেদিকেই যোগ দিত। এরকম শক্তি-সজ্জার বলেই বুর্জোয়ারা সেদিন সামন্তপ্রভুদের পরাজিত করে নিজেরাই সামাজিক শক্তির চূড়ায় গিয়ে বসল। গ্রামের ওপর নগরের বিজয়-পতাকা তারাই আকাশে উড়িয়ে দিল।

নগর বুর্জোয়াদেরই সৃষ্টি। সোরোকিন[১] যেমন বলেছেন বুর্জোয়ারা আবার নবোদিত বস্তুবাদের স্রষ্টা। বস্তুবাদের আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে বস্তুগত বা বৈষয়িক লাভালাভের বিচারই এ যুগে চূড়ান্ত মর্যাদা লাভ করে। বুর্জোয়ারা তাই ব্যবসা-বাণিজ্যের মত নগরেও যখন অর্থলগ্নী করল তখন তাদের বিবেচ্য বিষয় হল নগর থেকে কত বেশী মুনাফা তারা অর্জন করতে পারবে। পরবর্তী কালে বুর্জোয়ারা যাঁদের পরম শত্রু বলে মনে করেছে সেই কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস তাঁদের কমিউনিস্ট ইস্তাহারে লিখেছেন: বুর্জোয়ারাই প্রথম দেখিয়েছে যে মানুষের কর্মশক্তি কী অসাধ্য সাধন করতে পারে। "It has accomplished wonders for surpassing Egyptian pyramids, Roman aqueducts, and Gothic cathedrals; it has conducted expeditions that put in the shade all former Exoduses of nations and crusades।"[২] বুর্জোয়া-যুগের সন্তান মার্ক্স এঙ্গেলস ছাড়া এমন প্রশস্তি কে রচনা করতে পারত! কিন্তু বুর্জোয়ারা যে এত সব বিস্ময়কর জিনিস করেছে তার কারণ এই নয় যে সভ্যতার জয়যাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তারা উদ্বিগ্ন ছিল। তার কারণ এই যে তারা কী করে ক্রমেই বেশী মুনাফা আসতে পারে এ বিষয়ে অতি সচেতন ছিল। লাভের পাহাড়ই তারা জমাতে চেয়েছে, আর কিছু নয়। তাদের

১ Pitirim A. Sorokin: The Social and Cultural Dynamics (4 Vols.)

২ K. Marx and F. Engels: Manifesto of the Communist Praty (Moscow 1953) p. 50.

এই ইচ্ছাটি এত প্রবল ছিল যে মধ্যযুগের সামন্তপ্রভুদের মত কোন একটা সীমায় তৃপ্ত হয়ে বসে থাকতে পারে নি তারা। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন নতুন উপকরণ, উপায়, বাজার এসব তারা সৃষ্টি করেছে এবং ব্যবহারও করেছে। এইভাবে জন্ম ও প্রসার ঘটেছে নতুন শহর-নগরের।

অনেকের মনে হতে পারে শহরের এই বৃত্তান্ত আমাদের দেশের শহর-সংস্কৃতির বেলা কতখানি প্রযোজ্য। আমি অবশ্য স্পষ্টতই রেনেসাঁস-যুগের ইতালির ও য়ুরোপের নানা দেশের শহরের আদর্শ সামনে রেখেই ওপরের কথাগুলি লিখেছি। কিন্তু এদেশে নবযুগের শহর-সংস্কৃতির সূত্রপাত যে কলকাতা শহর দিয়ে, তার ইতিহাস সম্পর্কে ওই কথাগুলি হুবহু খেটে যায়। শুধু সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে বুর্জোয়াদের সংঘর্ষের রূপটা আলাদা হয়েছে হয়তো, কিন্তু সংঘর্ষ অবশ্যই বেধেছিল। সে সংঘর্ষের একপক্ষে ছিল দেশীয় বুর্জোয়ার বদলে নবাগত ইংরেজ বণিক ও তার দেশীয় সঙ্গীরা আর একদিকে ছিল নবাবের শক্তি—যার ভিত্তি ছিল সামন্ততন্ত্র। সংঘর্ষের প্রকৃতিতেই এই পার্থক্যটুকু ছিল বলেই আমাদের দেশের শহর-সংস্কৃতি প্রথম যুগে খাঁটি বুর্জোয়া-সংস্কৃতি হতে পারে নি, ইংরেজের পক্ষ নিয়ে যে সব সামন্তপ্রভুদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছিল তারা ওই সংস্কৃতিতে মিশিয়ে দিয়েছিল সামন্তপ্রভুদের বহু উপাদান-প্রকরণ। বাংলা সাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার পথ যাঁর একক প্রচেষ্টায় সুগম হয়েছে—তিনি বিনয় ঘোষ—তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাবে। তিনি লিখছেন: "বাংলাদেশে নতুন যুগের তখন "নবমুন্সী" হলেন "মহারাজ নবকৃষ্ণ" এবং কলকাতা শহরের শ্রেষ্ঠ জমিদার। অর্থাৎ এ যুগের "বুর্জোয়া" না হয়ে তিনি হলেন একজন সে যুগের "ফিউডাল লর্ড"। তাঁর হাতে তাই "কলকাতা কালচার" নতুন ফিউডাল রূপ ধারণ করল। নবকৃষ্ণ কলকাতা শহরে সেকেলে জমিদারী-তালুকদারী কালচারটাকেই আবার নতুন করে প্রবর্তন করলেন। শান্তিপুর, ভাটপাড়া নবদ্বীপের ভট্টাচার্য-গোঁসাই-বৈরাগীর কালচার কলকাতা শহরের গঙ্গাসাগরে মিলিত হল। এই মহামিলনের প্রধান ভগীরথ হলেন নবকৃষ্ণ। পণ্ডিতেরা সমাহৃত হয়ে এলেন ভাগীরথীর পূর্বতীরে সুতানুটীতে এবং কবিগান, পাঁচালি ও হাফ-আখড়াইয়ের অন্যতম কেন্দ্র হল সুতানুটি বা উত্তর কলকাতা। উত্তর থেকে দক্ষিণে ভবানীপুর কালীঘাট পর্যন্ত এই নব্য-তালুকদারী কালচারের স্রোত বয়ে গেল। প্রথম পর্বের এই তালুকদারী কালচারের সঙ্গে পরবর্তী পর্বের "বাবু কালচার" ও "এজু কালচারের" ('এজু' শব্দ ইংরেজী 'এজুকেটেড' শব্দের তাৎকালিক অপভ্রংশ) উদ্বাহবন্ধনে এক বিচিত্র "কলকাতা কালচারের" সৃষ্টি হল।"[৩] কিন্তু কেন এমনটি হল, এ রকম হবার পিছনে বাস্তব সামাজিক কারণ কী ছিল? বিনয় ঘোষ লিখেছেন: "নবকৃষ্ণের আমলের ক্যালকাটা কালচারের সেই তালুকদারী—তথা—ফিউডাল বৈশিষ্ট্য আজও অনেকটা বজায় আছে। পরাধীন দেশের কালচারে তাই থাকবার কথা, কারণ নতুন যুগে এদেশী বণিকরা বাণিজ্য-প্রসার বা পণ্য-উৎপাদনের সুযোগ পান নি, ইংরেজরা তাতে বাধা দিয়েছিলেন। তাই আধা-মার্কাণ্টাইল, আধা-ক্যাপিটালিস্ট ও আধা-ফিউডাল উপাদান নিয়ে এক বিচিত্র কলকাতা-কালচারের সৃষ্টি হয়েছে।"[৪]

কলকাতা শহর যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের পরিচয় পেলাম। কলকাতার পত্তন থেকে এখন পর্যন্ত ইংরেজ বণিকদের প্রভাব এখানে অপরিসীম। দেশীয় বণিকরাও একে একে এসে যোগ দিয়েছে, এবং ইদানীং এদের ক্ষমতাই অপ্রতিহত। এঁরা সবাই মিলে যে কলকাতা শহরের পত্তন করলেন (নবকৃষ্ণের মত সামন্তপ্রভুদের কথা বাদ দিলে) তার পিছনে মুনাফা অর্জনই ছিল একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু কী আদর্শ ছিল তাঁদের? জব চার্নক কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা হলেও কলকাতার প্রকৃত সমৃদ্ধি শুরু হয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে। তখন ইংলণ্ডে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিল যান্ত্রিকতার আদর্শ। যান্ত্রিকতার জয়গানে তখন আকাশ-বাতাস মুখরিত ছিল, নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার রাজ্যজয়ের গৌরবকেও ম্লান করে দিত তখন। যন্ত্রযুগের পূর্ববর্তী সমস্ত যুগকেই তখন মানব-ইতিহাসের বর্বর অধ্যায় বলে মনে করা হত এবং যন্ত্রের বিজয় যে মানবসভ্যতাকে অসম্ভব প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এ বিশ্বাস ছিল সর্বজনীন। ফরাসী

৩ বিনয় ঘোষ: কলকাতা কালচার (দ্বিতীয় সংস্করণ) পৃ. ৩৪।
৪ ঐ পৃ. ৩২।

দেশের এক জেলে বসে কঁদর্সে এয়কম একখানা প্রগতির চিত্রই এঁকে বসলেন।

আঠারো শতকের 'বর্বর' বস্তুবাদের যুগে (কথাটি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের) এই যান্ত্রিকতার আদর্শ ই এ দেশে নিয়ে এল ইংরেজরা। এ দেশে যে সব ইংরেজ এসেছিল তারাও ছিল অতি অল্প শিক্ষিত, নীচু পরিবারের ছেলে। বিচারশীল পরিণত মন এদের ছিল না। তবু এরাই আমাদের দেশে রাজা হয়ে বসল এবং আমরা রাজার জাতি বলে প্রতি পদে এদেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। আঠারো-উনিশ শতকে যান্ত্রিকতার আদর্শ য়ুরোপে ব্যাপক হয়েছিল, আমরা তারও একটা বিকৃত নেহাতই অর্থকরী রূপ এদেশে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছি। এই আদর্শ ছিল মানব-জীবনের সম্পূর্ণ বিরোধী। মানুষকে যন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া, নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্পের একটা উপাদান মাত্রে মানুষকে পরিণত করা, আর্থিক লাভ-লোকসানের দৃষ্টি দিয়ে শুধু মানুষের মূল্য বিচার করা—এই আদর্শের পরিণতি। আঠারো-উনিশ শতকের য়ুরোপে মানুষকে ধ্বংস করে শিল্পের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে, তাই নতুন শহর-নগরে বিরাট বিরাট কারখানা ও বাণিজ্য-কেন্দ্র গড়ে উঠলেও এবং মুনাফার পাহাড় সেখানে জমা হলেও একটি পূর্ণ মানুষের স্থান সেখানে হয় নি, খণ্ডিত বিকৃত মানুষ শহরের ছোট ছোট খুপরিমার্কা ঘরে ভীড় জমিয়েছে। এই অবস্থার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদও তাই সারা পাশ্চাত্যে এক একটি রূপ নিয়ে ফেটে পড়েছে। উইলিয়াম মরিস, রুশো, থুরো এই নগর-সভ্যতার বিরুদ্ধে লিখে গিয়েছেন। আমাদের দেশে যে ইংরেজরা মানব-বিরোধী যান্ত্রিকতার আদর্শ নিয়ে এল তাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল না, সংবেদনশীল মন ছিল না, তারা দেশ থেকে গরিব নীচুতলার লোক হিসেবে এসেছিল ভারতের স্বর্ণখনি লুটতে, ভাল করেই তা তারা লুটে গিয়েছে। এদেশে নতুন শহর-সংস্কৃতি গড়ার সময় এইভাবে একটি উৎকট মানবতা-বিরোধী আদর্শ আর সব আদর্শকে ছাপিয়ে উঠল।

এসব শক্তি এ রকম আদর্শের আওতায় যে শহর সৃষ্টি করল সে কোন্ শহর? তার রূপ কী? অনুভূমিকরূপে বা horizontally দেখলে এ শহরের উত্তর-দক্ষিণ-পূব-পশ্চিমে সীমারেখা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু খাড়াইরূপে বা vertically দেখলে কোথাও কোন সীমা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সেরকম ভাবে দেখলে মনে হবে এই কলকাতা শহরের মধ্যে কয়েক শো শহর লুকিয়ে আছে। সাহেব পাড়া, চীনে পাড়া, মুসলমান পাড়া, বেনে পাড়া তাঁতি পাড়া, কলু পাড়া, এ রকম অনেক পাড়াই কলকাতায় আছে এবং এক একটি পাড়াকে স্বতন্ত্র শহর বলে মনে করার রেওয়াজও আছে। কিন্তু আমি তাই বলছি না। আমার মনে হয় ওপর থেকে ডাইভ দিয়ে সমুদ্রের জলে ক্রমেই ডুবে যাবার চেষ্টা করলে যেমন আর তল পাওয়া যায় না, কলকাতা শহরের জীবনসমুদ্রেও যদি ওপর থেকে নীচে নামার চেষ্টা হয় তবে ক্রমে তলিয়েই যেতে হবে, শেষ পর্যন্ত কোন সীমায় এসে পা ঠেকবে না। কলকাতার এমন একটি স্তর আছে যে স্তরের কোন দ্বারকানাথ ঠাকুর রোডের কোন সাতমহলা বাড়ির প্রশস্ত বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক রাজপুত্র নিখিল বিশ্বের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে মিলনের সুর বাজছে তার অনুরণন নিজের শিরায় শিরায় উপলব্ধি করেছেন, আবার ওই দ্বারকানাথ ঠাকুর রোড বেয়েই এমন স্তরেও এসে পৌছনো যায় যেখানে স্বয়ং আকবর বাদশাহ হরিপদ কেরানীতে পর্যবসিত হয়েছেন—কেন না উপায় নেই। কলকাতায় এমন স্তর আছে যেখানে এলে রৌদ্রকরোজ্জ্বল ধরণীর উত্তপ্ত স্পর্শ পাওয়া যাবে, কিন্তু তারই তলে আছে এমন সব স্তর যেখানে গাঢ় তমসায় সমস্তই আবৃত, যেখানে মানুষ কাঁই-কুঁই কাঁই-কুঁই করে কোনমতে বেঁচে থাকে, অথবা বেঁচে থাকা ও মরে যাওয়া যেখানে শুধু ডিগ্রীর প্রভেদ, প্রকৃতির নয়। আর এই স্তরই তো বেশী।

এই কালো অতিশীতল কলকাতায় যারা জন্মেছে, বড় হয়েছে বা নতুন এসে বাসা বেঁধেছে তাদের জীবনের সার-বস্তু কলকাতাই শুকিয়ে নিয়েছে। কলকাতার জীবনে অজস্র বৈচিত্র্য আছে, কাজ-কর্ম ব্যবসা-বাণিজ্য জীবিকার্জনের সহস্র উপায় নয়াদিল্লী বা চিত্তরঞ্জনের মত নতুন শহরগুলির একঘেয়ে একরঙা জীবনধারা এখানে গড়ে উঠতে দেয় নি, রঙ্গ-তামাশা বিচিত্র আশা-আকাঙ্খার সংঘাত কলকাতার সমাজকে একটি বাঁধাধরা ছকের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়া থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু এ সমস্ত বৈচিত্র্যের অন্তরালে ক্রুর নিয়তির মত দাঁত মেলে হাসছে

কলকাতার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য : ৩০ স্কয়ার ফুট লাইফ। এই হিসাবও কিছুকাল আগের। সাম্প্রতিক যে সব অনুসন্ধান হয়েছে তাতে দেখছি একজন মানুষ কলকাতায় তার বাসের জন্য ৩০ স্কয়ার ফুটের চেয়ে কম জায়গা পায়, অথচ প্রত্যেক লোকের গড় দৈহিক এরিয়া ২০ স্কয়ার ফুটের কম নয়। ভাল করে হিসেব করলে দেখা যায়, কলকাতার লোক বস্তি দুতলা তিনতলা বা পাঁচ-সাততলা যেখানেই থাকুক গড়ে ২০ স্কয়ার ফুটও পায় না নিজের বাসের জন্য। কলকাতার রঙ্গ ও নাট্যে ভরা জীবনের শত রঙের পিছনে অতি নির্মম সত্য : কালো কুৎসিত অতি অন্ধ অন্ধকার। শহরের ঝকমকে বাড়ি ও গাড়িগুলির যারা মালিক, রোজ সকালে সূর্য যাদের জন্য বয়ে আনে রঙীন দিন, তাদের পাতাবাহার জীবনের ভিত্তিটাই দাঁড়িয়ে আছে কালো পথে অর্জিত কালো মুনাফার ওপর। আর এদের এই বাহারটুকু ফোটানোর জন্য বাকী জনসমাজ নিয়ত এক অতি কালো মধুবংশীর গলির মৃত্যু-আলিঙ্গনে ধুঁকতে বাধ্য। জানি এরই মধ্যে মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত কিছু কিছু লোক আছে যারা টাকা থাকলেও বা না থাকলেও সংস্কৃতিবান্ মানুষের জীবনের জন্য উৎসুক, বাড়ি বা গাড়ি থাকলেও কিংবা না থাকলেও যাদের একটি সাধারণীকৃত মন্তব্যে ছোট করে দেওয়া যায় না। কিন্তু আঠারো শতকের সমাজে যেমন রামপ্রসাদ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত ব্যক্তি থাকলেও সে সমাজের পচন-গলন আটকায় নি, কলকাতার জনসমাজের মাথায় কয়েকটি পদ্মফুল থাকলেও এই সমাজের কর্দমময়তা অস্বীকার করা অসম্ভব।

এইভাবে এমন রূপ নিয়ে যে কলকাতা শহর গড়ে উঠেছে, যেখানে স্থাপত্যশিল্পের দিক থেকে দেখলে প্রতিটি প্রাসাদও মানবজীবনকে ধ্বংস করে দেবার মত করেই নির্মিত হয়েছে এবং যেখানে তিন ভাগের দু ভাগ লোক বাস করে ওই প্রাসাদেও নয়, শ্বাসরোধকর কুশ্রী দরিদ্র বস্তিতে, সেখানে যদি জীবনের জয়গান কারও মুখে উচ্চারিত হয় তবে বুঝতে হবে যে সে নেহাতই মুখের কথা, তার পিছনের সত্য হল—লুইস মামফোর্ড যেমন বলেন, cult of death। কলকাতা মহানগরী আজ সেই অবস্থায় পৌঁছেছে যখন মামফোর্ডের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায় :

"It subordinates life to organized destruction, and it must therefore regiment, limit, and constrict every exhibition of real life and culture. Result: the paralysis of all the higher activities of society: truth shorn or debased to fit the needs of propaganda: the organs of co-operation stiffened into a reflex system of obedience: the order of the drill sergeant and the bureaucrat. Such a regime may reach unheard of heights in external co-ordination and discipline, and those who endure it may make superb soldiers and juicy cannonfolder; but it is for the same reason deeply antagonistic to every valuable manifestation of life."*

এমন আজব শহর কলকাতায় প্রতিকূল অবস্থার বুক চিরে জীবন মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করতে চায়। ওটাই জীবনের স্বভাবধর্ম। কিন্তু এই আত্মপ্রকাশের চেষ্টা অবস্থার চাপে বাঁকা পথ না ধরে পারে না। সহজ স্বাভাবিক সুস্থ বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ ঘটা সম্ভব নয়, তাই আপাতদৃষ্টিতে যা নিন্দার যোগ্য তেমন উপায়েই অবদমিত জীবনশক্তি আপন স্ফুরণ ঘটায়। নিত্যদিনের একঘেয়েমি যখন আর বরদাস্ত করা যায় না, হিসাব এবং বাঁধা পথ যখন আর তৃপ্তি দেয় না তখন কলকাতার মানুষ উল্লাসের উপকরণ খোঁজে, মরিয়া হয়ে খোঁজে; পায়ও। অবিশ্বাস্য উদ্ভট ব্যাপারের খবর হয়তো কখনও গুজবের আকারে ছড়িয়ে পড়ল, লোকে তাই নিয়ে মাতাল হয়ে উঠল। কখনও এল একটা ফ্যাসানের ঢেউ, লোকে তাতে ভেসে গেল। এই ভেসে যাওয়া, মাতাল হয়ে ওঠাটাই তাদের কাছে বড় কথা, কী প্রসঙ্গ বা কী উপকরণ নিয়ে মাতাল হল তা একেবারেই গৌণ প্রশ্ন। কখনও তারা পাগল হয়েছে গান্ধী-সুভাষের বিরোধ উপলক্ষে, কখনও তারা শরম ছেড়ে রাজপথে বেরিয়েছে ছায়াচিত্রের নট-নটী দর্শনে। যে বটতলায় 'রুচিতে অরুচি' 'ঠকাঠকি তরজা' 'প্রেমের লুকোচুরি' এমন কি 'মাগসর্বস্ব' 'পাশ-করা মাগ' ছাপা হয় সেখানেই আবার যদি 'শ্রীমদ্‌ভাগবত', 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' ছাপা হয়ে বেরোয় তাতে যেমন অবাক হবার কিছু নেই তেমনই আজ কলকাতার যে জনসমাজ বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের অভ্যর্থনায় ঘরদোর ফেলে বেরিয়ে পড়ল কাল তারাই যদি পর্দায় কামাতুর দৃশ্য দেখতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে; আজ যে জনতা বিধানসভা ভবনে ভোট গণনা শেষ হবার পর সিদ্ধার্থ রায়কে সামনে রেখে উল্লাসে ফেটে পড়ল কাল তারাই যদি ভাঁড়ের তামাশা দেখতে সার্কাসের তাঁবু ভেঙে ফেলতে উদ্যত হয়; তবে আমি অবাক হব না। শুধু এই বেদনা অনুভব করি যে, অবরুদ্ধ জীবনের ক্ষণিক আত্মপ্রকাশও উজ্জ্বল উচ্ছল হয়ে উঠতে পারছে না, তা নিতান্ত ম্লান, বিবর্ণ—তার স্বাদ অতি পানসে, এতটুকু গৌরবদীপ্তি পর্যন্ত তাতে লাগে না।

এ যেমন মানুষের প্রাণশক্তির প্রকাশচেষ্টা, আধুনিক মানুষের আরও এক রকমের প্রকাশকামনা আছে। আধুনিক মানুষ, বিস্ময়ের বিষয়, আবার মননবিলাসী। জীবনে শতভাবে পর্যুদস্ত হয়েও মনের ক্ষুধা তার একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যায় নি। জানতে চায়, বুঝতে চায়, নেহাতই দৈনন্দিন জীবনের পীড়ন থেকে একটু ওপরে উঠে সে এই জীবনধারার দিকে দৃষ্টিপাত করতে চায়। খবরের

* Lewis Mumford: The Culture of cities, p. 278.

কাগজের নেশা, মাসিক পত্র-পত্রিকা, বইয়ের নেশা—পৃথিবী ও মানুষের অতীত ইতিহাস ও আজকের অবস্থা জানবার ইচ্ছা আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্য। আধুনিক চিত্রকলা-সৃষ্টি নিকেতনের পাশেই তাই এ যুগে স্থাপিত হয় প্রাচীন জিনিসের সঞ্চয়ে-ভরা জাদুঘর, জীবজন্তুর নিদর্শন চিড়িয়াখানায় দেখেই সে ছুটে যায় জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর জানতে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। আজকের মানুষের মনের ক্ষুধা যে কী অপরিসীম, তার কৌতূহল যে কতদূর দিগন্তবিসারী তা এর চেয়ে ভাল আর কোন্ প্রতীক দিয়ে বোঝানো যেত ?

আধুনিক মানুষের এই যে দু দিক—একদিকে তার প্রাণের ক্ষুধা, আর একদিকে মনের—তা দুটি আলাদা প্রকৃতির সংগঠন মারফত প্রকাশ পেয়েছে। তার প্রাণের ক্ষুধা তৃপ্ত করে রাজপথ, মিছিল, জনসভা, রাজনৈতিক পার্টি। আর তার মনের ক্ষুধা, তার সংস্কৃতি-সৃষ্টির বাসনা তৃপ্তির দাবী নিয়ে এসেছে কফিহাউস। তাই কফিহাউসে যারা আসে তারা কফি পান করতে আসে না, মন্ত্রণা-পরামর্শ করতেও নয়। আসে প্রকাশ্যে চিন্তা করতে। তারা এসে তাই এক একটি টেবিল নিয়ে চক্রাকারে বসে কথা বলে, আলাপ করে। আলাপ করতে করতে তারা চিন্তা করে, চিন্তা করতে করতে কথার পিঠোপিঠি কথা গাঁথে। টেবিল চাপড়ে উত্তেজিত আলোচনা এখানেও হয়, কিন্তু খুব কম—ওটা চায়ের দোকানের বৈশিষ্ট্য। কফিহাউসে সস্তা রাজনীতি-চর্চার স্থান সঙ্কীর্ণ, সাহিত্য সমাজ এবং বিশ্বের চিন্তানায়কদের লেখা নিয়েই এখানে আলোচনা জমে বেশী। সে আলোচনায় উত্তাপ আছে, উত্তেজনা নেই ; একটি জিনিসকে বোঝবার এবং বোঝাবার চেষ্টা আছে কিন্তু একটি মতকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। এমন হবার কারণ এই যে কফিহাউসে যে-কোনও লোকের সঙ্গে অন্য যে-কোনও জনের আলাপ হয় না। পরিচিত অল্প কয়েকজন সমধর্মী ব্যক্তির চক্র রচনা করে প্রতিদিন আলোচনায় বসা কফিহাউসের রেওয়াজ। মতের অমিলের চেয়ে মতের মিলই তাই বেশী দেখা যায়—অন্ততঃ পরস্পরের মতের প্রতি আস্থা রাখা এখানে স্বাভাবিক। তা ছাড়া এখানে যারা আসে তারা মনে করে যে একটা কালচারড আবহাওয়ায় তারা এসেছে, এই বোধ তাদের অহংকেও বেশ তৃপ্তি দেয়। বহুজনের নিবিড় আলোচনায় কফিহাউস তাই সর্বদা গমগম করতে থাকলেও কখনও হট্টগোল কোলাহল কেউ সৃষ্টি করে না। জনসভায় আলোচনার বদলে আছে বক্তৃতা, গগনভেদী স্লোগান-ধ্বনি তার একটি অঙ্গ। কফিহাউসে ঠিক তার উলটো। উদ্দেশ্যহীন আড্ডা ও আলাপচারিতা দিয়ে কফিহাউসের বৈঠকের শুরু, স্লোগান তোলার বদলে প্রচলিত সব রকম স্লোগান-বিশ্লেষণে তার সমাপ্তি।

তাই কলকাতার মত মহানগরীতে প্রতিমুহূর্তে যে নামহীন গোত্রহীন ফ্যাকাশে জনতার জীবন মানুষকে যাপন করতেই হয় তার থেকে মুক্তির আশ্বাস আছে কফিহাউসে। 'জনসাধারণ' এই সর্বব্যাপী একটি নামের তলায় ব্যক্তিমানুষের সকল পরিচয় যে নগরীতে হারিয়ে গেছে ব্যক্তির সেই লুপ্ত পরিচয় পুনরুদ্ধারের আশা দিয়েছে কফিহাউস। মাথার উপরে কারখানার ধোঁয়ায় কালো আকাশ আর পায়ের নীচে কালো কালো দুর্গন্ধে বিষাক্ত নর্দমা—এর মাঝখানে কলকাতার মানুষের যে গ্লানিময় জীবন তাকে অস্বীকার করার স্পর্ধা এনে দিয়েছে কফিহাউস। কে জানে ভাগ্যের হাতে পরাজিত আধুনিক মানুষের অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক লুকিয়ে আছে কিনা কফি-হাউসেই! শহুরে জীবনের সমাজতত্ত্বে কফিহাউস নগণ্য উপাদান যে নয় অন্ততঃ এটুকু তো জানি।

॥ ৩ ॥

কালপেঁচা বলছেন : "কলকাতায় এখন কফিহাউসের যুগ। পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছেলেমেয়েদের ভ্যানিটিতে বাধে সেকেলে কোন "কেবিন" বা "রেস্টুরেন্টে" বসতে, ইন্টিলেকচুয়ালদের মস্তিষ্কের ঘিলু নিঃসরণ নাকি কফির গন্ধ ছাড়া হয় না এবং পোলিটিকাল কমরেডদের চায়ের বদলে কফির কাপে চুমুক না দিলে নাকি 'সেরিয়াস' আলোচনাই জমে না। কলকাতার সাম্প্রতিক কালচার এখন ক্রমেই কফিহাউস কেন্দ্র করে 'গ্রো' করছে। শহরের ইউথের ক্রীম যদি দেখতে চান, তা হলে কফি-হাউসে যান। কেবিনে রেস্টুরেন্টে যাদের দেখবেন তারা সব 'ঘোল' হয়ে গেছে, 'ক্রীম' নেই। আইডিয়াল ক্রীম দেখবেন কফিহাউসে চাপ বেঁধে চক্রাকারে বসে আছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হট্ কফি খেয়েও একটুও গলছে না, অথবা কোল্ড কফি খেয়ে রেফ্রিজারেটরের সলিড বাটারে পরিণত হচ্ছে না।"*

কালপেঁচার এই ব্যঙ্গোক্তি উদ্ধার করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি। অনেকে লক্ষ্য করবেন এই প্রবন্ধে কলকাতার জীবনযাত্রার রূপ আমি তুলে ধরতে চেয়েছি, সেই প্রসঙ্গে কলকাতা শহরের উদ্ভব-বৃত্তান্ত পর্যন্ত বিশদ ভাবে উল্লেখ করেছি। তার কারণ যে কফিহাউসের কথা আমি বলছি পৃথিবীর যে-কোন শহরের যে-কোন কফিহাউস সে নয়—সে শুধু কলকাতার কফিহাউস। আমি বলেছি, কলকাতা শহরের অবরুদ্ধ জীবনের একটি প্রকাশ-চেষ্টা কফিহাউস, আর তাতেই তার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব। কিন্তু আর একটি দিক আছে কফিহাউসের। তারও উদ্ভব কলকাতারই জীবন-পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের দরুনই। কফিহাউসের চারদিকে ঘিরে আছে কলকাতা

* বিনয় ঘোষ : কালপেঁচার নকশা, পৃ. ৬১।

শহর। যে কলকাতার সর্বনাশা গ্রাস থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জন্মেছে কফিহাউস, সে কলকাতা অত সহজে কফিহাউসের অভিযান সার্থক হতে দেবে না। মাটি থেকে উঁচুতে লাফ দিয়ে উঠলেই পৃথিবীর আকর্ষণ কেটে যায় না, মাটিতেই ফিরে পড়তে হয়। কলকাতা মহানগরীর আবেষ্টনকে অস্বীকার করার বাসনায় যারা জমেছিল কফিহাউসে তারা শেষ পর্যন্ত কী করছে? কলকাতার সেই চির-পরিচিত অন্ধকারময় জনতার জীবনকেই আরও ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে তুলছে। কলকাতার কাছে কফিহাউসের পরাজয় হয়েছে। তাই গোড়াতেই কলকাতার বর্ণনা না করে উপায় ছিল না।

আজকের দিনে জনতার সঙ্গে মিলে মিশে নিজেকে সব কিছুর সঙ্গে পোষ মানিয়ে ওই জনতার জীবনের সঙ্গে নিজেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে যদি চলা যায় তবে এক রকম নিরুদ্বেগে দিন কাটানো যায়। কিন্তু আধুনিক যুগের সূত্রপাতেই যাতে জনতার জীবন ও সমাজ-নির্দিষ্ট জীবনের ছক না মেনে চলতে হয়, যাতে মানুষ ব্যক্তিরূপে নিজেকে আস্বাদন করতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। যদি কেউ এই ঐতিহ্যটুকুর কথা মনে রাখেন, যদি কেউ নিজেকে জনতার জীবনের অণুমাত্র রূপে নয়, নিজের আদত ব্যক্তিস্বরূপকে উপলব্ধি করতে চান তবে তিনি দেখবেন সমাজ থেকে জনতা থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তিনি একা, তিনি মিছিলের বাইরের একজন অতি অসহায় দর্শক। এই অসীম নিঃসঙ্গতাবোধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার, সমাজের সঙ্গে একটি নতুন প্রাণদ সম্পর্কজালে আবদ্ধ হওয়া দরকার। তিনি ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবেন, আবার সমাজের সঙ্গে এক নিয়ত সৃজনশীল যোগে আবদ্ধ হবেন—নিঃসঙ্গ ব্যক্তির এই কামনা থেকেই face-to face society-র কল্পনা জেগে উঠেছে।[১] একটি মুখোমুখী সমাজ যেখানে আমি সবাইকে চিনি, সবাই আমাকে চেনে, যেখানে জনতার ভীড়ে আমি হারিয়ে যাই না নামগোত্র-পরিচয়হীন অস্তিত্বের অন্তরালে, যেখানে আমি একক, আমার সদৃশ কেউ নেই, আর সেইজন্যই আমি মহিমময়, আবার অন্য দিকে আমার এই পূর্ণ প্রস্ফুটিত ব্যক্তিরূপ নিয়েই আমি সমাজের সঙ্গে গভীর মধুর বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি—তেমন একটি সমাজ রচনার আগ্রহ আধুনিক মানুষের মনে জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু বিরাট সমাজদেহকে এই নতুন কল্পনার ভিত্তিতে গড়া সহজ নয়, কোন্ দূর ভবিষ্যতে যে তা সম্ভব হবে তা বলাও যায় না। কাজেই দুধ না পেলে তার আস্বাদ ঘোলে মেটাবার মতন মননবিলাসী নিঃসঙ্গ ব্যক্তিদের আর একটি মাত্র পথ খোলা রইল—সমধর্মী কয়েকজন মিলে ছোট ছোট গোষ্ঠী রচনা করা, যেখানে সবাই সবাইকে চেনে ও ব্যক্তিরূপে স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী রূপে প্রত্যেকে প্রত্যেকের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়, অথচ বিচ্ছিন্নতাবোধের বেদনাকর চাপ থেকে প্রত্যেকে মুক্তি পায়—তেমন গোষ্ঠী। কফিহাউসের নির্জন জনতার মাঝে এক একটি কোণ বা এমন কি এক একটি টেবিলকে কেন্দ্র করে এমনই এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, এখনও ওঠে। নতুন জীবনের স্বাদ, মুক্তির স্বাদ ওই সব গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীভুক্ত লোকেরা পেয়েছে বইকি। কফিহাউসে—বিশেষতঃ কফিহাউসের আপার চেম্বার বা হাউস অব লর্ডসে গেলে দেখা যায় এ রকম এক একটি গোষ্ঠীর জন্য এক একটি কোণ বা এক একটি টেবিল যেন নির্দিষ্টই করা থাকে, সেখানে ছাড়া তারা অন্যত্র বসে না। তারা একটি বিশিষ্ট কফিহাউস বা চায়ের দোকান ছাড়া অন্য কোথাও যায়ও না। এক একটি গোষ্ঠীতে কেউ কেউ জীবনের নতুন স্বাদ এমন গভীর ভাবে পেয়েছে যে তারা, বলতে গেলে, কফিহাউসে তাদের নির্দিষ্ট কোণটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে। এমনও কেউ কেউ আছে যারা সকালবেলা কফিহাউস খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঢোকে আর রাতে যখন বন্ধ হয় তখন বাড়ি ফেরে। সারাদিন—এবং প্রতিদিন ওই একইভাবে কফিহাউসেই কাটে তাদের। মাঝে শুধু একবার দুপুরের খাওয়াটা বাইরের থেকে বা বাড়ি থেকে সেরে আসে। এদের সংখ্যা কম হলেও যারা বাড়িতে পরিবারের মধ্যে সময় কাটাতে অস্বস্তি বোধ করে অথচ প্রতিদিন কফিহাউসে পাঁচ-সাত ঘণ্টা আড্ডা দেয় তাদের সংখ্যা কম নয়। বাড়ির চেয়ে কফিহাউস তাদের অনেক নিকট-আত্মীয়। তার কারণ কিন্তু কফিহাউস নয়, কারণ ওই face-to-face societyর আকর্ষণ।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যারা এ রকম গোষ্ঠী গড়ে ও নিয়ত তাতে যোগ দেয় তারা কলকাতারই লোক। যতই তারা নিজেদের ক্ষেত্রে কলকাতাসম্পর্ক জনতা-জীবনকে অস্বীকার করতে চেষ্টা করুক কলকাতার জীবনধারায় তারা আপাদমস্তক ডুবে আছে। কলকাতাতেই তাদের বাস, এখানেই তাদের জীবনের সমস্ত নির্ভর করে, আলো হাওয়া ও খাদ্য এখানেই তারা সংগ্রহ করে। কালো কলকাতার কালো আদমি তারা।

কফিহাউসে কলকাতা-জীবনসুলভ স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়েই তারা আসে। আসলে তারা সম্পূর্ণ ই জনতাধর্মী মানুষ। ওর্টেগা গ্যাসেট যেমন বলেছেন, এরা জ্ঞানের অন্বেষু নয়, শিল্পসৃষ্টি এদের পক্ষে সম্ভব নয়, কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার চিন্তাই এদের নেই—অথচ সব বিষয়েই এরা মতামত জাহির করতে চায়, এবং নিজেদের মতামতের সত্যতা সম্পর্কে এরা এতই নিঃসন্দেহ যে সামান্য প্রতিবাদও এরা ক্ষমা করে না; অতি আত্মতুষ্ট

১। Peter Laslett: Philosophy, Politics and Soeicty (1956) গ্রন্থে র উপরোক্ত বাণীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

মানুষ এরা। এরা ভাবে না কিছুই, কোন কিছু একটা ইঙ্গিত বা নির্দেশ (suggestion) কেউ দিলে তবে তাই নিয়ে মেতে ওঠে এরা, স্লোগানই এদের পাগল করার পক্ষে যথেষ্ট। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে একটি প্রদর্শনী-বিতর্ক হচ্ছিল, বিষয়—কমিউনিজম ভারতে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রস্তাবের পক্ষে অম্লান দত্ত এবং অন্যান্য নামী বিতর্ককারীরা ছিলেন, বিপক্ষে হীরেন মুখার্জি এবং আরও নামীরা। পক্ষের একজন যখন বললেন লাল চীনের ওপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব পড়ছে তখন একজন শিস দিয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সারা হল নানা চিৎকারে বক্তার এই অবিশ্বাস্য কথার প্রতিবাদ করল। এক টাকা দিয়ে টিকিট কিনে ওই বিতর্ক শুনতে যারা গিয়েছিল তারা অশিক্ষিতের দল নয়, অতি উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ই। কিন্তু এই উক্তির প্রমাণে বক্তার যে সব তথ্য বলার ছিল তা কেউ বলতেই দিল না, কেন না শ্রোতা নামক জনতার ধারণা যে যেহেতু তাদের মতের বিপরীত কথা বলা হয়েছে অতএব তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই হচ্ছে জনতা আর এই হচ্ছে জনতার ধর্ম।

কফিহাউসে যারা আসে তারা এই ধর্ম নিয়েই আসে। তাই এখানকার গোষ্ঠীগুলির নায়ক ও সদস্যরা যে পিপাসা তৃপ্ত করার আশা নিয়ে আসে তা জ্ঞান স্বাধীনতা ও সৃষ্টির পিপাসা নয়, প্রশংসিত হবার পিপাসা। পরস্পর পরস্পরকে প্রশংসা করুক এতেই এরা খুশী। কিন্তু প্রশংসা এমন জিনিস রোজই যার হার বাড়িয়ে চলতে হয়, কাজেই মিথ্যা প্রহসনের অভিনয় বাড়ানো ছাড়া উপায় থাকে না। তা ছাড়া, প্রশংসা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ঈর্ষা-নিন্দার পটভূমিকায়। তাই দেখা যাবে কফিহাউসে প্রত্যেক গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীর সদস্যরা দেবতা, আর এই বৃত্তের বাইরের সারা দুনিয়াটা কালো কুৎসিত হতশ্রী। এরা নিজেরা অতি আত্মসন্তুষ্ট, আর অন্য যে কারও সম্পর্কে এদের ধারণা অত্যন্ত খারাপ।

নিন্দা প্রশংসা ছাড়াও একটি কথা আছে, তা এই : আধুনিক যুগে কলকাতা মহানগরীর কফিহাউস হতে পারত নতুন চিন্তা ভাবাদর্শ নতুন জীবনকল্পনার কেন্দ্র, হতে পারত স্বাধীন বুদ্ধির বিকাশক্ষেত্র। জনতার নগরীতে হতে পারত ব্যক্তির প্রতিষ্ঠাভূমি, দুর্গও। জনসভা রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্র যখন সংগঠিত অন্ধকারের শক্তির পুতুলে আজ পরিণত, তখন এই কফিহাউসের পক্ষেই সম্ভাবনা ছিল যুক্তিবাদী মুক্তিকামী মানুষের মুক্ত আকাশে পক্ষ-বিহারের প্রতিজ্ঞাক্ষেত্র হয়ে ওঠবার। কিন্তু সে সব কিছুই হয় নি। আজকের কফি-হাউস হতে চাইছে জনসভার ক্ষুদ্র সংস্করণ, রাজনৈতিক দলের মন্ত্রণাক্ষেত্র এবং অমুদ্রিত অলিখিত একখানি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা মাত্র। জীবনের অনেক ক্ষেত্রের অনেক উদ্দেশ্যের মত কফিহাউসের মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়।

কারও মনে হতে পারে এতে কার কী ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতি যে হয়েছেই তা আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি না। তবে যে কারণে মহানগরীতে কফিহাউসের উদ্ভব তা যদি ব্যর্থ হয় তবে এই দানবাকৃতি মহানগরীর মানুষের জীবন বিপন্ন হবে বলে আমার ধারণা, স্বাধীনতার শেষ দুর্গ চূর্ণ ও জনতার দ্বারা অধিকৃত হয়েছে বলে আমি মনে করব। মানুষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু এই জনতা; তার এই শেষ বিজয়ে আমি ভবিষ্যতের ভয়ে উদ্বিগ্ন হব। যে পাখি উড়তে চেয়েছিল পাখা মেলে, তার পতনে আমি বিষণ্ণ হব, যে নতুন জলতরঙ্গের সুর আমাকে একদা আশা দিয়েছিল তার অকাল সমাপ্তিতে আমি বেদনা অনুভব করব।

॥ ৪ ॥

কলকাতা শহর এবং কফিহাউসের মধ্যে একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে : নিয়তি উভয়ের প্রতিই সমান পরিহাস করেছে। অথবা বলা যায় এই পরিহাস মহানগরী এবং তার অন্তর্গত একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়, যে জনসমাজ এই উভয়ের পৃষ্ঠপোষক তাদের প্রতিই নিয়তির এটা একটা করুণ ঠাট্টা। কলকাতা শহরের উদ্ভব প্রসঙ্গে দেখেছি, মানুষের মুক্তিবাসনাই শহর সৃষ্টির মূলে। মধ্যযুগীয় সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের সাধনার সাধনপীঠ হবে শহর—এই আশা নিয়ে শহর গড়েছে মানুষ। এই নতুন আশার পক্ষ নিয়ে বুর্জোয়ারা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার ধারক সামন্তপ্রভুদের সঙ্গে লড়াই করেছে, মানুষের সমর্থন এই সংঘাতের কালে বুর্জোয়ারাই পেয়েছে। কলকাতার বেলা দেখা গেছে, অনেক সামন্তপ্রভুই বুর্জোয়া বণিক ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়েছে। অথচ শেষ পর্যন্ত যে শহর গড়ে উঠেছে তাতে মানুষের পরাজয় হয়েছে, তার ব্যক্তিত্ব-সাধনা ব্যর্থ হয়েছে এবং সেই শহরে জনতা ভিন্ন আর কারও স্থান নেই।

এই পরিণতি থেকে পরিত্রাণের আশা নিয়ে কফি-হাউসে এসে কেউ কেউ জমায়েত হয়েছিল। তারা ভেবেছিল এই কফিহাউসে এসে অন্ততঃ কলকাতার বাস্তব জীবন থেকে তারা মুক্তি পাবে এবং হয়তো কলকাতার জীবনই নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার স্বপ্ন দেখতে পারবে। কিন্তু এভাবে পালিয়ে এসে মুক্তি পাওয়া যায় না, কেন না আসার সময় তারাই নিয়ে এল জনতার স্বভাব। কফি-হাউসে আজ এই জনতাধর্মী মানুষরাই আসে বসে আড্ডা দেয়। তাই কফিহাউসমুখো হবার ইচ্ছা আমার অন্ততঃ আর নেই।
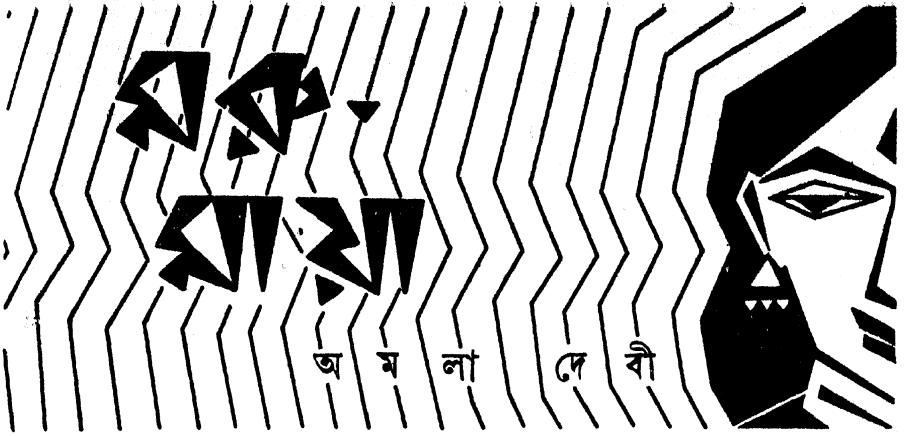
[পূর্বানুবৃত্তি]

গৌরদাসের বাবা ও ঠাকুরদার আমলে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমায় সারাদিনব্যাপী উৎসব হত। এ তল্লাটের বৈষ্ণবেরা নিমন্ত্রিত হতেন। ষোড়শোপচারে রাধামাধবের ভোগ, কীর্তন ও বৈষ্ণব-ভোজন হত। পাড়ার সকলে নিমন্ত্রিত হত। গৌরদাসের আমলে তা সম্ভব হয় নি, সঙ্গতিতে কুলোয় নি। কাঁচামাটিতেও প্রেমদাস বাবাজীর আমলে রাসপূর্ণিমায় সমারোহে উৎসব হত। তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বৎসর মামীমা ঝোঁক ধরলেন মেয়ে জামাইয়ের কাছে, আমার শরীরের যা অবস্থা, এ বৎসর কাটবে না বোধ হয়। রাসপূর্ণিমায় ঠাকুরের আমলে যেমন উৎসব হত তেমনই কর। যাবার আগে দেখে যেতে চাই। রতন তাই ধুমধাম করে উৎসবের আয়োজন করল।

রতন আগেই তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল। গৌরদাসের যাওয়া হল না। উৎসবের দিন তাদের নিয়ে যাবার জন্য গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিল। গৌরদাস যেতে পারবে না জানাল। বলল, রাধামাধবের কাজ ফেলে যাই কী করে?

সে বলল, ভোগ সেরে তো যেতে পার। আগে তো তাই যেতে—

গৌরদাস জবাব দিল না। সে খোকাকে নিয়ে চলে গেল।

তিন দিন ধরে মহা সমারোহে উৎসব হল। নাম্‌-করা কীর্তনীয়াদের কীর্তন হল। বৈষ্ণব-ভোজন হল। গৌরদাস একটি দিনও এসে দেখে গেল না। তিনদিন ধরে চন্দ্রা কত ছটফট করল। তার এক-চোখ এক কান গৌরদাসের আসার প্রতীক্ষায় পেতে রাখল। কতবার কত লোকের গলা শুনে চমকে উঠল চন্দ্রা, গৌরদা এল বোধ হয়, না দিদি! আসে নি শুনে মুখখানি শুকিয়ে গেল তার। কতবার বলল, গৌরদা না এলে উৎসব মানায় না, ভালও লাগে না। কীর্তন শুনতে শুনতে বলল, যত বড় কার্তনীয়া হোক, গৌরদার মত গলা কারও নেই। এ সব দেখে শুনে রাগ হচ্ছিল তার। মনে মনে বলছিল এত ছটফটানি কেন রে বাপু! তোর বর তো নয়। মুখে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, কোণ-পেঁচা মানুষ! এত লোকের সঙ্গ ভাল লাগবে কেন তার? সেই ভাঙা ঘরটিতে একা একা থাকতেই ভালবাসে—

রতন খুঁতখুঁত করল বার কয়েক: এ তল্লাটের কেউ আসতে বাকী রইল না। কেবল গৌরদা শুধু এল না। খোকাকে দুজনেই খুব আদরকরল। চন্দ্রার অত মন খারাপ, তবু খোকার আদর-যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করল না।

রতন বারকয়েকই শোনাল, প্রায় হাজার টাকা খরচ হল। তবু মায়ের সাধ মেটাতে পারলাম। এতেই আমার এত খরচ সার্থক মনে হচ্ছে।

একবার তাকে একান্তে পেয়ে চন্দ্রা বলল, যাদের ভালবাসি তাদের জন্যে প্রাণটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে আমার কুণ্ঠা নেই, জান দিদি! সে বলেছিল, মানুষের মত মানুষরা তো তাই করে ভাই।

কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমল: কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদা: (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়: সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদা: সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরে সুস্থে চলেছো কি কুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমলা তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমল: ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায়। খ্যাচ খ্যাচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্রাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদা: আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমল: মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদা: যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়: বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদা: (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর
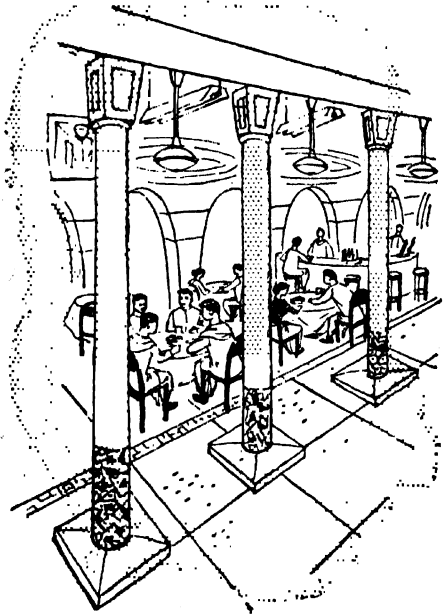
বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদা: সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

এ ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে।

ভুতোদা: কাল বাজারে গিয়ে ছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা ফলটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।

বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি যে ছাড়েন।

বিনয়: কি ব্যাপার?

ভুতোদা: এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলে! হোত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।
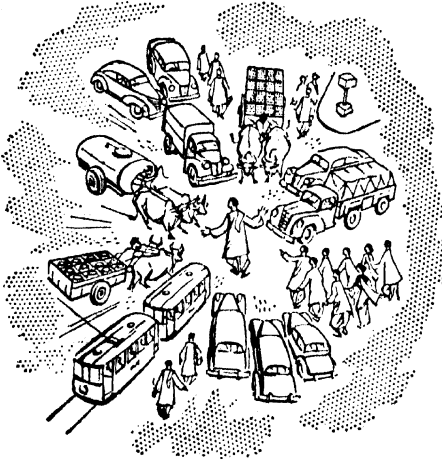
বিমল: বলুনই না কি করলে?

ভুতোদা: খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী যেই 'ডালডার' টিনে হাতাটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায়?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়: আপনি কি বললেন ভুতোদা?

ভুতোদা: আমি তো হেসেই অস্থির। ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার এ সহরের হালচালই আলাদা। মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডাই' তো আমরা কিনে থাকি।" ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে। বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু। কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি বসে" বলে গট্‌গট্ করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি) বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা।

বিমল: খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা কি ডায়েট—হাঃ হাঃ

ভুতোদা: হাসির কি হোল?

বিনয়: ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলেছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই? বিনয়: ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদা: দ্যাখ! বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস? বিমল: আপনি এই রেষ্টুরেন্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাস করুন। বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদা: হাঁ, ওরা ঠিকই বলছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়: শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমল: একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা মিস্‌ফায়ার হয়ে গেল।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই।
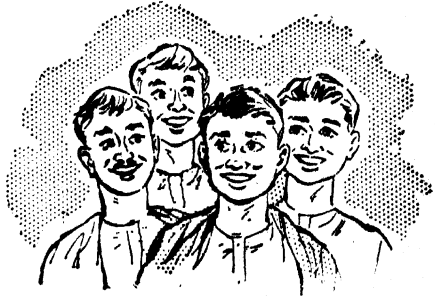
দু সপ্তাহ পরে ফিরল তারা। চন্দ্রা আসবার সময়ে কুড়িটা টাকা হাতে দিয়ে বলল, খোকার দুধ আর ঘরের চালটা সারিয়ে নিবি। পরে আরও পাঠিয়ে দেব। রতন বলল, গৌরদাকে বলবে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি ও না আসাতে। ঘরটা মেরামতের ব্যবস্থা যত শীঘ্র পারি করছি—'

বাড়িতে ফিরে গৌরদাসকে দেখে চমকে উঠল। এই কদিনে আধখানা হয়ে গিছল। কণ্ঠার হাড় বার করা, মুখ চোখ ফ্যাকাশে। সে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, জ্বর হয়েছিল বুঝি?

খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে গৌরদাস বলল, হ্যাঁ, প্রতিপদের দিন থেকেই—

প্রশ্ন করল, খবর দাও নি কেন?

গৌরদাস বলল, সেখানে এত উৎসব! খবর দিয়ে ব্যস্ত করি নি তাই—

সে ধারাল কণ্ঠে বলল, যদি বাড়াবাড়ি হত, তা হলেও খবর দিতে না?

গৌরদাস জবাব না দিয়ে খোকাকে আদর করতে লাগল। চন্দ্রার কথা মনে হল—সে নিজে থেকে কিছু চাইবে না, সত্যি তাই! উদ্ভট মানুষ! ক্ষীণ হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

কার্তিকের শেষের দিকে মামীমা অসুখে পড়লেন। চন্দ্রা খবর দিতেই সে খোকাকে নিয়ে চলে গেল। অগ্রহায়ণের প্রথমেই মামীমা মারা গেলেন। রতন মামীমার শেষ কাজ যতদূর সম্ভব ভাল ভাবেই করল। গৌরদাসও গিয়ে হাজির হয়েছিল। সব কাজ চুকে যাবার পর, তাদের ফেরবার কথা হতেই চন্দ্রা কাঁদতে লাগল। বলল, মা চলে গেল। আমি একা থাকতে পারব না এখানে। আমাকে নিয়ে চল্‌ তোরা—

রতনকে বলতেই বলল, একা থাকতে হবে কেন? আমার পিসতুতো বোন আর ভাগনে ওর কাছে এসে থাকবে। তা ছাড়া আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে দিনরাত আর ওখানে থাকতে হবে না। বাড়ি থেকেই এর পর সাইকেলে যাওয়া আসা করব।

সে বলল, তবু মনটা এখন খারাপ, চলুক আমাদের সঙ্গে। একটু সামলে ফিরে আসবে।

চন্দ্রা তাদের সঙ্গে এল। খোকার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে তুলে নিল। খোকাকে বুকে করে ও মাতৃশোক ভোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আসবার দু দিন পরেই ও একদিন খোকাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, হ্যাঁ দিদি, রোজ এতটুকু করে দুধ খেয়ে খোকার কি পেট ভরে?

সে বলল, ওইটুকুই তো খায় বরাবর, তা ছাড়া ভাত মুড়ি খাওয়াই একটু করে।

চন্দ্রা বলল, ওখানে তো এক সের করে রোজ দুধ খাচ্ছিল। হজমও করছিল।—সে বলল, ওখানে জুটছিল, তাই খাচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, পাড়ায় কারও বাড়িতে এমন দুধ হয় না যে বিক্রি করতে পারে। গাঁয়ের এক গয়লা ওই জোলো দুধটুকু দিয়ে যায়, তাও টাকায় মাত্র দু সের—

চন্দ্রা বলল, বেশ তো ওই দুধই বেশী করে নাও খোকার জন্যে।—একটু চুপ করে বলল, গৌরদার যা শরীরের অবস্থা ওরও একটু করে দুধ খাওয়া উচিত।

সে বলল, সবই তো বুঝি চন্দ্রা! কিন্তু হাতে পয়সা কই? এ বছর একটি কণা ধানও আসবে না ঘরে। সব ধান নষ্ট হয়ে গেছে। দুদিন পরে রোজ এক মুঠো করে ভাত জুটবে না, আমাদের রাধামাধবের ভোগ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

চন্দ্রা বলল, আমাদের একটা গরুর বাছুর হয়েছে। সেটাকে পাঠাতে বলে দিলে হয় না?

সে বলল, ছি, তা কি হয়!—অনুনয়ের স্বরে বলল, ও নিয়ে কিছু বলাবলি করিস নে চন্দ্রা। এখনই হয়তো রতন পাঠিয়ে বসবে। সে ভারী লজ্জার কথা হবে।

একদিন বিকেল থেকে খোকা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিছুতেই তার কোল ছাড়তে চাইল না। মুখ থমথম করতে লাগল। খোকার বুকে গাল রেখে তার মনে হল, গাটা একটু গরম। আবার জ্বর হল নাকি! বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল তার। চন্দ্রাকে বলল, আবার জ্বর হবে বোধ হয়। চন্দ্রা খোকার গায়ে হাত দিয়ে বলল, গাটা একটু ছ্যাকছ্যাক করছে। তাতে ভয় কী? তুই খোকাকে নিয়ে শুয়ে থাক্, আমি কাজ সারছি।—খোকাকে চাপাচুপি দিয়ে শুইয়ে সে তার পাশে শুয়ে রইল।

রাত্রে জ্বর বাড়ল। সকালে খোকা জ্বরে অঘোর। গৌর রাধামাধবের পুজো সেরে এসে স্নান-জল মাথায় ছড়াল। রাধা বলল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না। ডাক্তার ডাকতে হবে।—গৌর মুখ চুন করে বলল, আজকের দিনটা দেখি।

পরদিন কবরেজকে ডেকে নিয়ে এল গৌরদাস। কবিরাজকে ফী দিতে হত না। ওষুধের দামও লাগত না। গৌরদাসের বাবার সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল। কবরেজ মশায় ভাল করে দেখে বললেন, খারাপ জ্বর। সময় নেবে। ওষুধ দিলেন। দিন কয়েক ওষুধ খাওয়া হল। জ্বর ছাড়ল না। খোকা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

খোকা সেরে উঠবে না। ভাবতেই বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল। সারা চৈতন্য যেন অসাড় হয়ে আসত। একদিন কাঁদতে কাঁদতে গৌরদাসকে বলল, খোকাকে কি মেরে ফেলবে? যেমন করে হোক ভাল চিকিৎছে করাও।

গৌরদাস চুপ করে রইল। চন্দ্রা বলল, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। ভাল ডাক্তারকে ডাক।

ডাক্তার এলেন। দেখলেন খোকাকে। বললেন খারাপ ম্যালেরিয়া। ছুঁচ ফুটিয়ে দেহে ওষুধ ঢোকাতে হবে। রাধা তো ভয়ে অস্থির। চন্দ্রা সাহস দিল: কিসের ভয়। তাদের গাঁয়ে কত ছেলেকে ছুঁচ ফুটিয়ে ওষুধ দিয়েছে। ওষুধ দেওয়ার সময় চন্দ্রা খোকাকে কোলে নিয়ে রইল। সে ও দৃশ্য চোখে দেখতে পারল না।

জ্বর কমল না। খবর পেয়ে রতন এল। অনেক টাকা খরচ করে জেলা-শহর থেকে বড় ডাক্তার আনল। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করবার জন্য ভাগনেকে এনে রাখল। রোজ নিজে এসে খবর নিয়ে যেতে লাগল।

সারা দিনরাত সে খোকার মাথার কাছটিতে বসে, খোকার মুখের দিকে তার সমস্ত দৃষ্টিশক্তি, তার সমস্ত চেতনা, একাগ্র করে, তাকিয়ে থাকত। স্বামী ও সংসারের কথা, তাদের প্রতি তার কর্তব্য, কিছুই তার মনে রইল না। জগতের পরিসীমাকে সঙ্কীর্ণ করে শুধু খোকাকে ও নিজেকে ঘিরে রাখল, আর তার বাইরে যারা রইল তাদের সঙ্গে যোগসূত্র সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নিল। সংসারের সব ভার তুলে নিল চন্দ্রা। রান্নাবান্না, পুজোর আয়োজন, গৌরদাসকে দেখা-শুনা, খোকার পথ্যের ব্যবস্থা আর সংসারের যাবতীয় কর্তব্য সব। অবসরের ফাঁকে ফাঁকে খোকার কাছে এসে খবর নিয়ে যেত, পথ্য নিয়ে এসে খোকাকে খাওয়াত, জোর করে তাকে খেতে পাঠিয়ে দিয়ে খোকার কাছে বসত, রাত্রে জোর করে তাকে শুইয়ে নিজে সারারাত খোকার পাশে বসে থাকত।

খোকার জীবনদীপ দিনদিন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। হাসত না, কাঁদত না, কোন কিছুর জন্যই ঝোঁক করত না। শুধু নির্জীবের মত চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ত। যেন নিঃশ্বাসের সঞ্চয় নিঃশেষ-প্রায় হয়ে আসছিল। যেন এই জীবন থেকে সে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু যতই সে দূরে সরে যেতে লাগল, তার মাতৃহৃদয় সহস্র বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তার খোকা, যাকে সে একদিন কল্পনায় গড়েছে, দেহে ধারণ করেছে, অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে পৃথিবীতে এনেছে, হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে পালন করেছে, সহস্র তন্তু দিয়ে যাকে নিজের সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে, সেই একান্তভাবে তার খোকা, তাকে ছেড়ে চলে যাবে, তার মন তা বিশ্বাস করতে চাইত না।

সে রাত্রির স্মৃতি তার মনের গায়ে গভীর ভাবে আঁকা আছে। সেদিন সকাল থেকেই খোকার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সে কিছুই বুঝতে পারে নি। কিন্তু অন্য সকলে বুঝতে পেরেছিল। রতন সকালে এসেছিল। এসেই শহর থেকে ডাক্তার আনবার জন্য গিয়েছিল। ডাক্তার নিয়ে এল সন্ধ্যের কিছু আগে। তিনি খোকাকে দেখলেন, ইনজেকশন দিলেন। তারপর চলে গেলেন। যাবার আগে ওদের নাকি বলে গিয়েছিলেন, কোন আশা নেই। রাত্রি কাটবে না। তাকে এ কথা কেউ জানায় নি। ডাক্তার যাবার পর ওরা কেউ খোকার কাছে এল না। অনেকক্ষণ পর চন্দ্রা একবার এল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবু কী বললেন? খোকা আমার ভাল হবে তো? চন্দ্রা ঘাড় নেড়ে জানাল, ভাল হবে। চন্দ্রার ফোলা ফোলা চোখ দেখে সে বলে উঠল, তুই কাঁদছিস কেন? চন্দ্রা বলল, না, কাঁদি নি তো! সে বলল, কাঁদিস নে। খোকা আমার নিশ্চয় ভাল হবে। রাত্রি বাড়তে লাগল। বাইরে বাকী সকলে যখন চরম বিদায়

মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করছিল, সে নিঃশঙ্কচিত্তে নিশ্চিত বিশ্বাসে খোকার পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে খোকার কপালের, দেহের ঘাম মুছিয়ে দিতে লাগল। গালের উপর গাল রেখে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করতে লাগল। খোকা যেদিন সুস্থ হয়ে উঠে আবার মা বলে ডাকবে, জল খাব মা বলে ঝোঁক ধরবে, হেসে দুটি ছোট ছোট হাতে তালি দেবে, ছোট ছোট দাঁত কটি বার করে হাসবে, নানা বায়না নিয়ে নানা দুষ্টামি করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে দেবে, সেই আনন্দময় দিনগুলি স্বপ্ন দেখতে লাগল। চন্দ্রা যে বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল, লক্ষ্যও করল না।

গৌরদাস এল একবার। বলল, রাধামাধবের চরণামৃত খাইয়ে দিই একটু। সে বলল, না থাক্ ঘুমোচ্ছে খোকা। কত ঘাম হচ্ছে দেখছ? আজ বোধ হয় জরটা ছেড়ে যাবে।—আবার আঁচল দিয়ে খোকার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিল।

গৌরদাস কিছুই বলল না। চলে গেল বাইরে।

মধ্যরাত্রে সব শেষ হয়ে গেল। যে ক্ষীণ নিঃশ্বাস প্রবাহের সূত্রটুকু জীবনের সঙ্গে খোকাকে বেঁধে রেখেছিল সহসা তীব্র আক্ষেপে তা ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যুর অতল অন্ধকারে খোকার শিশু-আত্মা কোথায় গেল। সে চিৎকার করে উঠল, খোকা, খোকা! কী হল গো! চন্দ্রাও চিৎকার করে কেঁদে উঠল, খোকা চলে গেল, দিদি!

খোকার শীর্ণ দেহ সবলে বুকে চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠল সে, খোকা, খোকনধন! ফিরে আয়, বাবা! রাধামাধবের মন্দিরে গৌরদাস পড়েছিল। ধূলি-ধূসর দেহে টলতে টলতে এসে মাটিতে বসে পড়ে দু হাতে মাথা গুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে কান্না চাপতে লাগল।

পাড়ার সকলে এসে হাজির হল একে একে। রতনই সব ব্যবস্থা করল।

সে খোকাকে কোলে নিয়ে প্রস্তর-মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল। দু চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াচ্ছিল, কিন্তু কণ্ঠে আর ভাষা ছিল না। পুত্র-শোকের উত্তুঙ্গ বিপুলতার সামনে ভাষা মূক হয়ে গিয়েছিল; আঘাতের প্রচণ্ডতা অনুভূতির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রা এসে ধীরে ধীরে ডাকল, দিদি, দিদি!—মুখের দিকে তাকাতেই বলল, খোকাকে যে রওনা হতে হবে। বলেই কান্না চাপবার জন্যে আঁচল দিয়ে মুখ চাপল। সে ধীরে ধীরে খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, খোকাকে পোশাকটা পরিয়ে দে। চন্দ্রা রতনের দেওয়া পোশাকটি এনে খোকাকে ধীরে ধীরে পরাল। সে বসে বসে দেখছিল। বলল, কত শান্ত হয়ে গেছে দেখেছিস? আগে কিছুতে পরতে চাইত না। হাত পা ছুঁড়ে নাস্তানাবুদ করত, এখন একেবারে চুপচাপ নিরীহ ঠাণ্ডা ছেলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাকে ভাল লাগে না, তাই চলে গেল। এবার ভাল মা পাবে, বড়লোক বাবা পাবে, কত আদর-যত্ন, গয়না-গাঁটি ভাল ভাল পোশাক পাবে। আমরা তো কিছুই দিতে পারি নি। ভাল করে দুধ খাওয়াতে পারি নি, এক ফোঁটা জোলো দুধ খাইয়ে রেখেছিলাম।

চন্দ্রা কাঁদতে কাঁদতে খোকাকে জামা পরিয়ে দিল, মুখ মুছিয়ে দিল, চোখে কাজল দিয়ে, কপালে টিপ এঁকে দিল। সে বসে বসে দেখছিল। বলল, আমার কোলে দে। কোলে দিতেই ওকে বুকে তুলে ধরে বলল, চল্ যাই। চন্দ্রা বলল, তোকে যেতে হবে না, আমার কোলে দে।

সে বলল, পাগল! আমি যাব বইকি! ভাল করে বিছানা পেতে শুইয়ে দেব, যেন কোন কষ্ট না হয়। তারপর কাছটিতে বসে থাকব, সারাদিন সারারাত। খোকা যদি আবার জেগে উঠে আমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদে। চল্ যাই। বলে উঠে দাঁড়াল। রতন এসে বলল, কেন এমন করছ দিদি, তুমি বুদ্ধিমতী সবই বোঝ—

সে বিহ্বল-চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। কথা বোধগম্য হচ্ছিল না তার। তার খোকার সঙ্গে সে যাবে, এতে চন্দ্রা বা রতনের আপত্তি কিসের? আর আপত্তি থাকলেই বা সে শুনবে কেন?

রতন বলল, খোকা তোমার রাধামাধবের কাছে চলে গেছে। মন্দিরেই তাকে পাবে। ওই দেহটার উপরে আর মায়া রেখে লাভ নেই দিদি! ওটা দাও আমাকে।—বলে এগিয়ে এসে খোকাকে তার বুক থেকে

ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। রাগে তার সর্বদেহ দাউ দাউ করে জলে উঠল। তার বুক থেকে তার খোকাকে ছিনিয়ে নেবে! চিৎকার করে বলল সে, কেড়ে নিয়ে যেতে চাও! খবরদার বলছি! চন্দ্রা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ও কী করছিস দিদি! ছেড়ে দে খোকাকে। ও যে আর আমাদের নেই রে। রতন খোকাকে ছাড়িয়ে নিতেই চিৎকার করে উঠল, ওগো শুনছ, খোকাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে! ও মা গো!—বলে তীব্র ক্রন্দনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সারারাত্রি তার কোন চেতনা ছিল না। পরদিন সকালে চেতনা হবামাত্র সে পাশে তাকিয়ে দেখল, খোকা নেই। বুকটা ধড়াস করে উঠল—কোথায় গেল খোকা!

ডাকল, খোকা! খোকা!

চন্দ্রা শিয়রে বসেছিল। কেঁদে উঠে বলল, খোকা যে চিরদিনের জন্যে চলে গেছে দিদি!—বাস্তবের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বিস্মৃতির মায়াজাল এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। যে দুঃখস্রোত জমাট বেঁধে ছিল, তা গলে গলে চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ক্রন্দনের বেগ একটু শান্ত হলে জিজ্ঞাসা করল, ও কোথায়!

চন্দ্রা বলল, রাধামাধবের মন্দিরে।

সে বলল, রাস-পূর্ণিমায় খোকাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেই পাপে কি আমার বুকের ধনকে নিয়ে গেলেন তিনি! কিন্তু খোকা তো শুধু আমার ছিল না। খোকা তো ওরও। ও তো কোন অপরাধ করে নি! ওর এ শাস্তি হল কেন?

চন্দ্রা বলল, সেই কথাই তো রাধামাধবকে গৌরদা কাল থেকে জিজ্ঞাসা করছে, ওঁর সামনে পড়ে পড়ে, মাথা ঠুকে ঠুকে। খোকা যাবার সময়ে একবার উঠে এসেছিল। ওকে বলল, একবারটি আমার কোলে দাও। খোকাকে কোলে নিয়ে বলল, যাও বাবা! ভারী কষ্ট পেলে আমার কাছে। রাধামাধব যেন এর পর দয়া করেন, খোকাকে ফিরিয়ে দিয়ে তারপর মন্দিরে ঢুকল। আর বেরোয় নি।

[ক্রমশ]

বাংলা স্যাটায়ার

সন্তোষকুমার দে

বিখ্যাত ফরাসী নাট্যকার পরিহাস-রসিক মলিয়ের (Moliere)-এর জীবনবৃত্ত নিয়ে রচিত নাটকের একটি দৃশ্যে দেখা যায় নিতান্ত প্রিয়জনের নিষ্ঠুর ও নির্বোধ দুর্ব্যবহারে পীড়িত হয়ে তিনি অন্য প্রতীকার না পেয়ে একান্তে বসে অশ্রুপাত করছেন। মলিয়ের-এর শিক্ষাগুরু ও বন্ধু ইতালীয় অভিনেতা স্কারামুশ (Scaramouche) তাঁকে সেই অবস্থায় দেখে বলে উঠলেন—ওরে, কে কোথায় আছিস দেখে যা। সারা জগৎকে যে হাসাচ্ছে সেই মলিয়ের নিজের দুঃখে একা বসে কাঁদছে।

এই গল্পটির ভিতর একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। দুঃখের নিবিড় অন্ধকারেই বুঝি রঙ্গব্যঙ্গের জন্ম হয়। ব্যক্তি-জীবনে যা সত্য, জাতীয়-জীবনেও তা প্রযোজ্য। বহু সমস্যাপীড়িত বাঙালীর জীবনেই বুঝি তাই রঙ্গব্যঙ্গের এত ছড়াছড়ি। ভারতের অন্যান্য জাতির অপেক্ষা বাঙালীর রসচেতনা সূক্ষ্ম এবং আশ্চর্যভাবে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত। বাংলা সাহিত্যও তাই ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিখ্যাত উক্তি—"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা" আমাদের এই ধারণাকেই সমর্থন করে।

প্রাক্‌চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী জাতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। তবু "রুখের তেন্তলী কুম্ভীরে খায়" কিংবা "বলদ বিআঅল গবিআ বাঁঝে" ইত্যাদি উক্তিতে পরোক্ষেও কোন রসিকতা প্রচ্ছন্ন আছে কিনা বলা শক্ত। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় থেকে বাংলা সাহিত্যে মাঝে মাঝে হাসির রোল শোনা যায়। চৈতন্যদেব নিজেও সুরসিক ছিলেন। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে আছে—

> "সভার সহিত প্রভু হাস্য কথা রঙ্গে
> কহিলেন যেন-মত আছিলেন বঙ্গে।
> বঙ্গদেশি বাক্য অনুসরণ করিয়া
> বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া…(১।১০)

তারপর

> বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া
> কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া।

অবশ্য এ নির্মল হাস্যরস প্রসঙ্গ। স্যাটায়ার জিনিসটা আরও কিছু গভীর উদ্দেশ্যমূলক, বিশেষ ব্যঞ্জনা-দ্যোতক এবং সম্ভবতঃ অনেকখানি তীব্র, তীক্ষ্ণ, শাণিত, দ্যুতিময় এবং কখনও কখনও জ্বালাকর।

ইংরেজি অভিধানে স্যাটায়ার শব্দের অর্থ বলা হয়েছে "Composition in which vice or folly or person as guilty of it, is held up to ridicule অথবা use of ridicule or sarcasm or irony to expose and discourage vice and folly, এবং thing that serves to expose false pretensions। বাংলায় ব্যঙ্গ, শ্লেষ বা বিদ্রূপাত্মক রচনাকে কিছুটা উক্ত গুণসম্পন্ন মনে করা যায়—যদিও স্যাটায়ার কথাটার সমার্থক কোনও বাংলা প্রতিশব্দ দেখি না।

আমার বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের একটি গণ্ডগ্রামে। সেখানে গ্রামের কালীবাড়ির পূজারী ঠাকুর অবসর সময়ে স্থানীয় ঘটনা, গ্রামবাসীর অভাব অভিযোগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নানা বিদ্রূপাত্মক ছড়া তৈরি করতেন, মুখে মুখে সে ছড়া ছড়াত। সে ছড়া গেয়ে শোনানোও হত। গ্রামবাসী ছেলে বুড়ো সে ছড়া ও গানের রস বিশেষ ভাবে উপভোগ করত। মালদহের গম্ভীরা গান, বাঁকুড়ার ভাদু গান, মানভূমের টুসু গান এবং কলকাতার জেলেপাড়ার সঙ-ও এই শ্রেণীর প্রচেষ্টা এবং বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের পরিচায়ক। মুকুন্দ দাসের অনেক গানও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। প্রবাদে রূপান্তরিত রসিকপুরুষ গোপাল ভাঁড়ের উক্তিতে wit-এর প্রাধান্য থাকলেও স্যাটায়ারও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

লিখিত সাহিত্য হিসাবে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, টেকচাঁদ ঠাকুর, হুতোম প্যাঁচা, মাইকেল মধুসূদন, হুতোম প্যাঁচার গানের হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সে যুগের অনেক রথীমহারথী সাহিত্যসাধক ব্যঙ্গ রচনাতেও হাত দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকে বৈষ্ণব সাহিত্যের ভক্তি উন্মাদনার পরে প্রথম সুস্থ সাহিত্য

প্রচেষ্টা বলা চলে এবং এই কাব্যটিও রাধাকৃষ্ণের বিষয়ে প্রচ্ছন্ন স্যাটায়ার মাত্র। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি ছাড়াও ছিলেন সাংবাদিক; এই উভয় আসনের অধিকারে তাঁর লেখনী নানা রস, ব্যঙ্গ ও স্যাটায়ার রচনা করেছে।

তাঁর স্যাটায়ারের নমুনা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্তুতি উপলক্ষে রাজনৈতিক কর্মীদের প্রতি উপহাস—

"তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস—
যেমন রাজা আমলা তুলে মামলা গামলা ভাঙে না
আমরা ভুষি পেলেই খুশি রবো, ঘুসি খেলে বাঁচব না।"

টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' স্যাটায়ার বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিকে পরিণত হয়েছে। মাইকেলের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ,' 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রভৃতিও তাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে নববাবু বলছেন—

"জেণ্টেলমেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিস্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি।"

বলাবাহুল্য এই তীব্র ব্যঙ্গের হুল থেকে মধুসূদন নিজেও রেহাই পান নি। হাসির গানের রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাতেও এই ধর্ম লক্ষ্য করা যায়। তাঁর 'আমরা বিলাত ফেরতা ক ভাই' এর প্রমাণ। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানে অজস্র ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা আছে। তাঁর 'আনন্দ বিদায়' নাটকটি তীব্র শ্লেষাত্মক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' বাংলা রসসাহিত্যের কালজয়ী পুরুষ। তার প্রসঙ্গ পরে বলব।

দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল এমন কি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও প্রহসন রচনা করেছেন। নাটকে তীব্র ব্যঙ্গ আরও ফলপ্রদ হয়। যেমন শচীন সেনগুপ্তের নাটকে সিরাজদ্দৌলার ভাষণে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার ও দেশদ্রোহিতার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। তবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে ভাল প্রহসনের সংখ্যা বেশী নেই। গুরু গম্ভীর নাটকেও বিদূষক প্রভৃতির ভূমিকায় অনেক ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও শ্লেষ বর্ষিত হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন দিক্‌পাল ব্যঙ্গরসিক জন্মগ্রহণ করেন। একজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১), আর একজন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)। এঁরা দুজনে সমসাময়িক হলেও দুজনের রচনার পদ্ধতি পৃথক ছিল। ইন্দ্রনাথ ছিলেন সাংবাদিক এবং সমাজ-সংস্কারক। তাঁর রচনায় সাময়িক ঘটনার এবং বাঙালীর চারিত্রিক দুর্বলতার উপর কশাঘাত ছিল প্রখর। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় শিল্পী হিসাবে আরও গভীরতার দাবি করতে পারেন এবং তাঁর রচনার উদ্দেশ্য ছিল আরও মানবিক গুণসম্পন্ন। তবে উভয়েই দেশহিতৈষী এবং সমাজসেবী ছিলেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চানন্দ বা পাঁচুঠাকুর নামেই খ্যাত ছিলেন এবং তিনি গদ্য এবং পদ্য উভয়ের মাধ্যমেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বিতরণ করতেন। তাঁর 'ভারত উদ্ধার' কাব্য স্যাটায়ার কাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ভারত উদ্ধার কাব্যের নায়ক-নায়িকারা বিপিন, কামিনী, সুরেশ, বসন্ত প্রভৃতি আর্যকার্যকরী সভার সদস্যবৃন্দ পরামর্শ করেছিল—লক্ষ লক্ষ মণ ছাতু ছড়িয়ে সুয়েজখালের জল শুকিয়ে ইংরেজদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করতে হবে। দেশের সব বাঁশ দিয়ে পিচকারি তৈরি করা হবে—যা দিয়ে বালি আর জল ছুঁড়ে ইংরেজ সৈন্যদের অন্ধ করবে; লঙ্কা পোড়ানো গন্ধে উৎকট কাশি ধরিয়ে ইংরেজ সৈন্য কাবু করবার ফন্দীও এঁটেছিল তারা। তারপর যুদ্ধের সময়—

"সুড়ঙ্গের মুখে সলতে ছিল সুরক্ষিত।
অনল সংযোগ তাহে হইল এখন
চটপট ভিন্ন শব্দে গড়ের ভিতর
গড়ের বাহিরে তথা, যথায় ইংরেজ
সৈন্য শ্রেণী দৌড়াইয়া ক্ষিতি বিদারিয়া
গর্জিয়া উঠিল ধূম লঙ্কা দগ্ধ করি
ধূমে ধূমে সমাচ্ছন্ন হইল দশ দিক
প্রবল লঙ্কার ধূমে প্রবেশি অরাতি
নাসারন্ধ্রে গলে হায় খক খক খকে
কাশাইল শত্রুদলে, ফ্যাচ ফ্যাচ ফ্যাচে
হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।"

এই লঙ্কা দহনের সঙ্গে স্বর্ণলঙ্কা দহনের সূত্র আবিষ্কারও দুরূহ নয়।

আমাদের সমাজের শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎকট

সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী কি ক্ষুরধার মন্তব্য করেছে তার দুটি নিদর্শন শোনাই :

একটি গান—

"দে গো তোরা দে, আমায় দে বিলাত পাঠায়ে
কালো কোটে অঙ্গ ঢাকি
কালো বরণ লুকিয়ে রাখি
এই কালোমুখে সাবান মাখি,
কালো জনম ভুলিয়ে।
নেগো ঢিলে ধুতি খুলে
নেটিব আর যবনা মুলে
আমি ভার্নাকুলার যাব ভুলে
চেয়ারে পা ঝুলিয়ে
মিসেস পাঁচি গাউন পরা
ধরাকে দেখিবে সরা
ও যে—হলো হলো উক্তি পরা
নেবে তো বিবি হয়ে॥"

আর একখানি চিঠি—

ইংরেজীনবিস পুত্র বন্যায় গৃহহারা পিতার পত্র পেয়ে উত্তর লিখছেন, (পত্রের ভাব ব্যতীত ইংরেজিপ্রভাবিত বাংলা রচনারীতিও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়)।

"আমার প্রিয় বাবা,

তোমার পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করিবার সম্মান আমি রাখি। বন্যাতে তোমাদের ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে এবং তুমি ও তোমার পরিবার এক্ষণে গাছের তলায় বাস করিতেছ, এ জন্য ভারি দুঃখিত হইলাম। কিন্তু ইহাতে তোমাদের একটা কুসংস্কার নষ্ট হইবে, তজ্জন্য আমি অন্তঃকরণের সঙ্গে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। শূদ্র দেখিলে ব্রাহ্মণের ভোজন হয় না, একথা অতঃপর ভরসা করি, আর তুমি বলিবে না।"...ইত্যাদি

"তথাপি কিছুতেই আমার তত আনন্দ হইত না, যত এক্ষণ যাইতে পারিলে তোমাদের নিকট, তোমাদের সান্ত্বনা করিতে, এবং আমি ইহা গুরুতর আনন্দের সহিত করিতাম যদি আমার এখন যাইবার সুবিধা ঘটিত। প্রায় আগামী সপ্তাহ ভরিয়া আমাদের সভার উপবেশন হইবার কথা আছে; তদ্ভিন্ন শ্রীমতী কুমারী লাঞ্ছনা ঘোষাল, যাহার সহিত আমি আলাপভগিনি করিবার আনন্দ এবং ইজ্জৎ উপভোগ করিতেছি, তিনি তোমার পত্র শুনিয়া আমার যাওয়ার আশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন এবং আমার নিকট গত কল্যই মাথা ধরিবার অভিযোগ করিতেছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে অসহায় রাখিয়া আমি কি প্রকারে যাইতে পারি।"...ইত্যাদি

"আমি আশা করি যে, এক্ষণ তোমাদের অঞ্চলে বন্যা হওয়াতে খুব মনোহর দৃশ্য হইয়া থাকিবে যাহা তোমরা অবশ্যই খুব আনন্দের সহিত উপভোগ করিতেছ এবং বিশ্বরাজ্যের বিশাল ভাব উপলব্ধি করিতেছ। যদ্যপিস্যাৎ তোমাদের অঞ্চলে এক্ষণ জলচর পক্ষী অধিক হইয়া থাকে, যাহা হওয়াই সম্ভব, এবং এখান হইতে বরাবর ছোট কলের নৌকা যাইতে পারে, তাহা হইলে ফেরত ডাকে আমাকে চিঠি লিখিবে, আমি শ্রীমতী লাঞ্ছনাকে সম্মত করাইতে পারিলে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শিকারের ছলে তোমাদের সাক্ষাৎকারের সুখ অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে পারি।

তোমার গৃহিণীকে আমার সম্ভাষণ জানাইবে।..." ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ারিস্ট বলা চলে। কিছু ইংরেজি অর্থনৈতিক প্রবন্ধ ও বাংলা স্কুল-পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত তাঁর সমগ্র বাংলা রচনাই স্যাটায়ার-রসাশ্রিত। এমন নিছক ও বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ সাহিত্যিক আমাদের দেশে আর কেউ ছিলেন বা আছেন মনে হয় না। ব্যঙ্গরসিকের দৃষ্টি দিয়েই তিনি যাবতীয় বিষয় দেখতেন এবং তাঁর রচনাশৈলীতেও স্বকীয়তা ছিল। তাঁর গল্পগুলি অনেকটা আরব্য উপন্যাসের অফুরন্ত গল্প-শৃঙ্খলের মত। তাঁর কঙ্কাবতী (১৮৯২), পাপের পরিণাম (১৯০৮), ফোকলা দিগম্বর (১৯০১) ও বাঙাল নিধিরাম ব্যতীত আর সব রচনাই গল্পের মালা। ডমরু চরিত (১৯২৩), মজার গল্প (১৯০৬), মুক্তামালা (১৯০২) এবং ভূত ও মানুষ গ্রন্থের লুল্লু সবই গল্প-সমষ্টি। তার অধিকাংশ গল্পে ভূত প্রেত দৈত্য দানব একটি প্রধান অংশ জুড়ে আছে। কিন্তু তাই বলে গল্পগুলি নিতান্ত ভূতুড়ে নয়। যে উদ্দেশ্যে জোনাথান সুইফট গালিভারকে লিলিপুট বা ব্রবডিংনাগের দেশে ভ্রমণ করিয়েছেন, সেই মানবচরিত্রের অসংগতি দেখাবার জন্যই ত্রৈলোক্যনাথ ভূত প্রেত দৈত্য দানবদের ডেকেছেন। বাস্তববস্তুবর্জিত

স্বপ্নরাজ্যই মানুষের খেয়ালখুশী আর কল্পনাকে অবাধ উদ্দাম গতিতে ছোটাবার প্রশস্ত ক্ষেত্র।

খবরের কাগজ বিষয়ে ত্রৈলোক্যনাথের 'লুল্লু'তে আছে: আমীর 'গোর্গা' নামক একটি ভূতকে খবরের কাগজের সম্পাদক করবার লোভ দেখিয়ে বশ করে। তারপর যথাসময়ে আমীর কি বললে শুনুন—

"গোর্গা! আমি তোমার কাছে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা করিব। একখানি খবরের কাগজ খুলিব, তাহার সম্পাদক হইবে তুমি।"

"যথাসময়ে আমীর একখানি খবরের কাগজ বাহির করিলেন। একে ভূত সম্পাদক, তাতে আবার চণ্ডুখোর ভূত—গুলির চৌদ্দপুরুষ। সে সংবাদপত্রের সুখ্যাতি রাখিতে পৃথিবীতে আর স্থান রহিল না। সংবাদপত্রখানি উত্তমরূপে চলিতে লাগিল, তাহা হইতেও আমীরের বিলক্ষণ দু'পয়সা লাভ হইল।"

"গোর্গা যে কেবল আপনার সংবাদপত্রটি লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা নহে। সকল সংবাদপত্র অফিসেই তাঁর অদৃশ্যভাবে গতায়াত আছে। অন্যান্য কাগজের লেখকেরা যখন প্রবন্ধ লিখিতে বসেন, তখন ইচ্ছা হইলে কখনও কখনও গোর্গা তাহাদিগের ঘাড়ে চাপেন। ভূতগ্রস্ত হইয়া লেখকরা কত কি যে লিখিয়া ফেলেন তাহার কথা আর কি বলিব। তাই বলি লেখকদল সাবধান।"

ত্রৈলোক্যনাথের রচনার অসংখ্য চরিত্র থেকে দু-একটি উদ্ধার না করে সমগ্রভাবে ত্রৈলোক্য-সাহিত্যকেই আমরা বাংলা স্যাটায়ারের এক উজ্জ্বল উদাহরণ বলতে পারি।

রসময় লাহা, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক প্রভৃতির ব্যঙ্গরসাত্মক অনেক রচনা একসময় বিশেষ সমাদৃত হয়েছিল। অধ্যাপক বিশপতি চৌধুরীর 'রসচক্র' নামে একখানি চমৎকার বই ছিল। প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গরসিক ছিলেন। তাঁর 'চারইয়ারি কথা', 'বীরবলের হালখাতা' প্রভৃতি বাংলা রসসাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। একসময় ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং তদীয় অনুজ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও (বিপ্রমুখ) অনেক ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা লিখেছেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় pun-এর প্রাবল্য থাকলেও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনাও আছে। আর ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে সুকুমার রায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর রচনায় বিশুদ্ধ স্যাটায়ার তত বেশী না থাকলেও তাঁর দৃষ্টি যে ব্যঙ্গরসিকের দৃষ্টি ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতিও অনেক ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা লিখেছিলেন। কান্তকবি রজনীকান্ত সেন অনেক ব্যঙ্গরসাত্মক গান লিখেছিলেন।

২

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছে বাংলা সাহিত্য নানাভাবে অনেক কিছু পেয়েছে, ব্যঙ্গরচনাও নিতান্ত কম পায় নি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনেকবার রবীন্দ্রনাথ তীব্র শ্লেষের কশাঘাত করতেও পিছপা হন নি। তবে সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশুদ্ধ স্যাটায়ারের স্থান কিছুটা গৌণ। শরৎচন্দ্রও তাঁর কোন কোন চরিত্রে বিদ্রূপ-ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণ আঘাত করেছেন। "নতুন দাদা"র চরিত্রটি স্মরণীয়। কিন্তু এই মহারথীদের প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যাঁর নাম বলা দরকার তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমের কমলাকান্ত কালজয়ী পুরুষ, সেকথা আগেই বলেছি। এখানে সেবিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বলি।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বৈঠকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম কমলাকান্তকে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় কমলাকান্ত—স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মসীযুদ্ধে নেমেছিলেন। ১২৯০ সালে শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁর নবধর্মতত্ত্ব প্রচার করেন এবং তার ফলে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকা দুটির মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আক্রমণ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে এই দলাদলির মধ্যে আসেন নি। কিন্তু ক্রমে তিনিও কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' এবং অন্যান্য কয়েকটি পত্রিকায় তীব্র আক্রমণ চালান। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশিত হয়—'দামু ও চামু,' ('কড়ি ও কোমল')। বিপক্ষ দলের পত্রিকা ও সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"দামু বোসে চামু বোসে
কাগজ বেরিয়েছে,
বিজ্ঞেখানা বড়ই ফেনিয়েছে,
—আমার দামু আমার চামু।
গায়ে পড়ে গাল পাড়ছে
বাজার সরগরম
মেছুনি-সংহিতায় ব্যাখ্যা
হিন্দুর ধরম।
লিখছে দোঁহে হিন্দুশাস্ত্র
এডিটোরিয়াল
দামু বলছে মিথ্যে কথা,
চামু দিচ্ছে গাল।"

রবীন্দ্রনাথের আর একটি শ্লেষাত্মক কবিতা—('কড়ি ও কোমল' গ্রন্থ থেকে)

"ক্ষুদে ক্ষুদে আর্যগুলো ঘাসের মতো গজিয়ে ওঠে
ছুঁচোলো সব জিভের ডগা কাঁটার মত পায়ে ফোটে।
তারা বলে—'আমি কল্কি',—গাঁজার কল্কি হবে বুঝি,
অবতারে ভরে গেল যত রাজ্যের গলিগুজি।
পাড়ায় এমন কত আছে কত কব তার
বঙ্গদেশে মেলাই এলো বরা অবতার।
দাঁতের জোরে তুলবে তারা হিন্দুশাস্ত্র পাঁকের থেকে
দাঁতকপাটি লাগে তাদের দাঁত খিঁচুনীর ভঙ্গী দেখে।
আগাগোড়া মিথ্যে কথা, মিথ্যাবাদীর কোলাহল,
জিভ্ নাচিয়ে বেড়ায় যত জিহ্বাওয়ালা সঙের দল।"

রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্গবীর' ('মানসী') কবিতাটির ব্যঙ্গ সবাই জানেন—

"কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর
প্রমাণ তাহার রয়েছে গভীর
পূর্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর—
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর কিছু তাই নাহি প্রয়োজন
সবতমে মিলে বারো জেরোজন
শুধু তরজন আর গরজন
এই করো অভ্যাস।"

অথবা,

"মোক্ষমূলার বলেছে আর্য
সেই সব শুনে ছেড়েছি কার্য
মোরা বড় বলে করেছি ধার্য
আরামে পড়েছি শুয়ে।"

এবং

"চারটি করে অন্ন খেয়ো
দুপুর বেলা অফিস যেয়ো
তাহার পরে সভায় যেয়ো
বাক্যানল জ্বালি।
কাঁদিয়া লয়ে দেশের দুখে
সন্ধ্যে বেলা বাসায় ঢুকে
শ্যালীর সাথে হাস্যমুখে
করিয়ো চতুরালী।"

কিন্তু বহু আলোচিত রবীন্দ্রকাব্যের কথা বিস্তৃতভাবে আ না বলে আমরা পূর্বের আলোচনায় ফিরে যাই।

প্রথম মূল কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় কমলাকান্ত চন্দ্রনাথ বসু, তৃতীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চতুর্থ 'প্রবাসী'র প্রথম বৎসরে (১৩০৮) কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন, পঞ্চম চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায় আর ষষ্ঠ আনন্দবাজার পত্রিকায় কমলাকান্তের আসরের লেখক প্র. না. বি. বা প্রমথনাথ বিশী (শনিবারের চিঠি—শ্রাবণ, ১৩৬১)।

কমলাকান্তের এই অক্ষুণ্ণ ধারাবাহিকতার মধ্যে বাঙালী-রসপিপাসু চিত্তের একটি শাশ্বত পরিচয়ও পাওয়া যায়।

দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় বৎসরের পর বৎসর নিয়মিতভাবে সপ্তাহে দুইদিন কমলাকান্তের আসরে এই ষষ্ঠ কমলাকান্ত যে অক্ষয় সাহিত্য-উপচার বাঙালী পাঠক-সমাজকে উপহার দিয়ে চলেছেন তার মূল্য অপরিমেয়। তার মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যও যেমন থাকে—তেমনি থাকে অপরূপ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপরসাত্মক পদাবলী, শব্দার্থ এবং টিপ্পনি। এইভাবে প্রচারিত একটি অত্যাধুনিক অভিধান পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে তার কিয়দংশ তুলে দিলে আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

শব্দার্থ

হিন্দু—যে লোক নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করে নাই।

হাতের পাঁচ—ধর্মঘট।

সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড—যে বোর্ড বা সংস্থাতে এডুকেশন বা শিক্ষা ব্যাপারটা সেকেণ্ডারী বা গৌণস্থানীয়।

রাজনীতি—রাজাও নাই, নীতিও নাই এমন এক-প্রকার বিনা মূলধনের ব্যবসায়।

রোগ—পুরুষের ছুটি লইবার, স্ত্রীলোকের সিনেমা দেখিবার, চাকরের বিশ্রামের এবং চিকিৎসকের অর্থাগমের উপলক্ষ্য বিশেষ।

সত্য—যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

তথ্য—যাহা ঘটে।

জন—দক্ষিণপন্থিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত মানুষের প্রতিশব্দ।

গণ—বামপন্থিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত মানুষের প্রতিশব্দ।

পীপল (People)—বিদ্রোহিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত মানুষের প্রতিশব্দ।

ছত্র—অবাঞ্ছিত লোকের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার আচ্ছাদন বিশেষ।

ছাত্র—ছাত্র-আন্দোলনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য যাহারা স্কুলে নাম লিখাইয়া থাকে।

ঘুঘু—পাখী রূপে নিরীহ, মানুষরূপে অত্যন্ত ভয়াবহ এমন জীববিশেষ।

কান—প্রবলের দ্বারা মর্দিত হইবার উদ্দেশ্যে বিধি কর্তৃক প্রদত্ত মস্তকের দুই পার্শ্বে অবস্থিত মাংসপত্রাকাদ্বয়।

কমলাকান্তের কাব্যের নমুনা—

ভারতবর্ষ

রুশ মার্কিন দুই হাত দিয়ে দুই দিকে মারে চাঁটি
ভারতের ঢোল তুলিতেছে বোল, বাজিতেছে পরিপাটি।
(রুশ বলে) লাল হবি আর লাল হবি
(মার্কিন বলে) ও দিক্ গেলে খাল হবি
দুজনেরই দাবি স্বর্গের চাবি পাইয়াছে তারা খাঁটি
ভারতের ঢোল বাজায় তাহারা সজোরে মারিয়া চাঁটি।
ইত্যাদি

কিংবা

যুদ্ধ ও শান্তি

শান্তি আর যুদ্ধ দোঁহে (অদৃষ্টের ভুলে)
এ ওর গায়ের জামা নিল গায়ে তুলে।
তাই তো এখন আর নাহি যায় বোঝা
কে বা শান্তি কে বা যুদ্ধ, মিছামিছি খোঁজা!
যুদ্ধেরে হঠাৎ দেখি মনে হয় শান্তি
শান্তি লাগে যুদ্ধসম কি দৈবের ভ্রান্তি!
আপনার মৃত্যুবাণ কার হাতে দিস্
ওর নয় চিরমূঢ় বারেক ভাবিস ?
হয়-শান্তি—নয়-যুদ্ধ সে শান্তি তো গল্প।
শান্তির বিকল্প নাই, সে যে নির্বিকল্প॥

কিন্তু কমলাকান্তের আসরে বা কমলাকান্তের পরিচয়েই প্রমথনাথের সমগ্র পরিচয় নয়। কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, নাট্যকার ব্যতীত প্র. না. বি. যে বাংলা দেশের বার্নার্ড শ' সে কথা নিঃসংশয়ে তিনি প্রমাণিত করেছেন। হাল আমলে 'মৌচাকে ঢিল', 'ঋণং কৃত্বা', 'ঘৃতং পিবেৎ', 'ভূতপূর্ব স্বামী' প্রভৃতির মত ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনাও নিতান্ত বিরল। বস্তুতঃ প্রমথনাথের কাব্যসুলভ কল্পনাশ্রয়ী মন তাঁকে উঁচুদরের ব্যঙ্গশিল্পী হতে সহায়তা করেছে।

[ক্রমশ]

মাটি আর পাথরের গল্প

সমীর মুখোপাধ্যায়

কালিতে চোপসানো ব্লটিং কাগজকে দেখলে ভয়েতে চোপসানো নন্দকে বোঝা যাবে। পৃথিবীতে যে এত রকমের ভয় আছে, ভয়ে মাতোয়ারা নন্দকে না দেখলে তা অনুমান করা যাবে না। ভয়ের মলাটে ঢাকা নন্দর জীবন।

নন্দর ছেলেবেলার চেহারাটা আমার কাছে আজও স্পষ্ট।

হাড়বেদে, বেঢপ একটা ছেলে। মাথায় এলোমেলো টেরি। গায়ে হলহলে উড়নচণ্ডে একটা পাঞ্জাবী। পরনে কোঁচার পাটে ধুলো জমা অতি বিব্রত মোটা তাঁতের কাপড়।

চোখ দুটো ছোট। কেমন দিশেহারা, খেইহারানো চোখ। নাকটা উজবুকের মত। কপালটা গড়ানে। মাছি পেছলানো গাল। টোলপরা চিবুক। হাতের তেলো দুটো অসম্ভব রকম পেছল। গলার স্বরে নন্দ না মেয়ে না পুরুষ।

ভাল করে চোখের দিকে তাকাতে পারে না নন্দ। কেবল ঘামে। আর ভয় খায়। ওই বয়েসেই বারবার রুমাল দিয়ে ঘাড় মোছে। মাথা চুলকোয়।

এই নন্দকেই আমরা বলতাম, নন্দ, শক্ত হও। এত নরম ভাল না।

আমাদের কথা শুনে নন্দ বলত, মাটি নরম হওয়াই দরকার। না হলে আবাদ হবে না।

আমরা তখন বলতাম, মাটি ভাল জিনিস নন্দ। পাথর আরও ভাল। নন্দ সত্যি মাটির মতনই ছিল। কেউ ওকে মানত না। নীচু ক্লাসের ছেলেরা ওকে আমল দিত না। বিচ্ছিরি একটা নাম দিয়ে ওর সামনেই ওকে খেপাত। টিটকিরি দিত।

ওর ভাই পরেশ ওর চেয়ে প্রায় বছর পাঁচেকের ছোট। তার কপালে যে একজোড়া ভুরু ছিল, সেটা কোঁচকাবার জন্যেই। বিশেষ করে নন্দ সম্বন্ধে।

আমরা ওকে ডাকতে গেলে পরেশ ভুরু কুঁচকে বলত, দাদাকে? সে তো নেই। বাড়িতে থাকে কতক্ষণ। কাজ তো নেই কিছু। ভাঙা একটা সাইকেল আছে। ওটা নিয়েই হয়তো এখানে সেখানে হিল্লী দিল্লী করছে।

নন্দকে কথাগুলো জানালে নন্দ লাজুকের মত হাসত। সঙ্গে সঙ্গে কৈফিয়ত দিত নন্দ। নন্দর এটা একটা প্রায় পেশার মত। এই কৈফিয়ত দেওয়া। কথা বলতে জানত। সুন্দর সব সাজানো কথা। আকাশে ঘুড়ির মতন উড়িয়ে দিত।

নন্দ বলত, আমাদের বাড়ি অন্য বাড়ির মতন নয়। সকলকেই আমরা সমান ভাবি। বয়সে ছোট বলে সে যে সমালোচনা করতে পারবে না এটা আমরা মনে করি না। আমার দিক থেকে আমি যা করি তা ঠিকই করি। পরেশের দিক থেকে পরেশ যা করে তা ঠিকই করে।

বলেই নন্দ ঘামতে থাকত। রুমাল দিয়ে ঘাড়টা মুছত। মাথাটা একবার চুলকে নিত। তারপর কি মনে করে চলে যেতে চেষ্টা করত।

সব শুনে আমরা তবু বলতাম, নন্দ, শক্ত হও। এত নরম ভাল না।

নন্দ জবাব ঠিকই দিত। বলত, শক্ত হয়ে লাভ নেই। ওতে রস থাকে না।—আমরা তীব্র হেসে বলতাম, কিন্তু জোর থাকে।

হ্যাঁ, জোর। আমরা মারামারি করতাম। ষাঁড়ের মতন গুঁতোগুঁতি করতাম। টিটকিরি দিতাম। হৈ হল্লা করতাম। ছ্যাবলামোর নালায় ভেসে ভেসে বেড়াতাম। হুঙ্কার দিতাম।

আর নন্দ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের জীবনের গভীর কল্লোল শুনত। কখনও কখনও উধাও হয়ে যেত নন্দ ছিপ কাঁধে। কোন ফাঁকা মাঠে গিয়ে ঘুড়ি ওড়াত। গরুর বোকা বোকা অসহায় চোখদুটোর মধ্যে ওই বয়েসেই জীবনের মানে খুঁজত।

হ্যাঁ—নন্দর পড়াশুনা ছিল। সেটাও ওই ভয় থেকে। মাস্টারমশাইয়ের ভয়। ভাল ছেলে থেকে পিছলে খারাপ ছেলে হয়ে যাবার ভয়।

পড়ত খুব নন্দ। গোগ্রাসে গিলত। কারুর হাতে নতুন বই দেখলে সেটা গেলবার জন্তে জিভ দিয়ে লালা ঝরত।

মাস্টারমশাইরা বলতেন, নন্দ একটা প্রতিভা। তোরা দেখিস নন্দ কত বড় হয়। মাস্টারমশাইদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল করবার জন্তেই বোধ হয় আমরা বয়েসের বেড়াগুলো টপকে টপকে গেলাম।

দেখলাম, মাস্টারমশাইদের ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যরকম সফল।

নন্দ সত্যিই প্রতিভাবান। ভূতপূর্ব মাস্টারমশাইদের প্রতিভা অধিকারের ভারটা নেবার জন্তেই শেষ পর্যন্ত নন্দকে মাস্টার হতে হল। প্রতিভাবান ছাড়া প্রতিভা আবিষ্কারের ভারটা আর কে নেবে!

আমরাও হলাম একটা কিছু। কিন্তু মাস্টার হলাম না।

মাঝে মাঝে দেখা হলে বলতাম, কেমন জমছে হে মাস্টারী?

নন্দ হেসে বলত, ভালই। তবে ছেলেগুলো বড় বেয়াদপ।

বলতাম, কশাও না—ঠেঙাও। রদ্দা আর গাঁট্টার মধ্যে তোমার কোন্‌টা বেশী আসে?

নন্দ বলত, ভবেশ, ডানলপের রবারই চিনলে, মানুষের মনটা জানলে না। মারে হয় না। তা ছাড়া ওরা আমাকে ভালবাসে।

আমি বলতাম, ভালবাসে, কিন্তু ভয় খায় না। শক্ত হও নন্দ, এইবেলা শক্ত হও।

নন্দ উত্তর একটা দেবেই। যেন আগে থেকে তৈরিই আছে। কথাগুলো এমন সাজানো গোছানো। নন্দ বলত, শক্ত হতে তো আমি চাই না। শক্তি চাই না। শক্তি থেকেই আসবে অশান্তি। আমি চাই নরম হতে। আরও নরম। আমি নুয়ে থাকতে চাই। দেখ না, গাছপালা তখনই নুয়ে পড়ে যখন তাতে ফল ধরে। তোমার কিছুদিন মাস্টারী করা উচিত ভবেশ।

আমি তীব্রতার সঙ্গে বলতাম, চেষ্টা করলে আমি হয়তো মাস্টারী করলেও করতে পারি। চেষ্টা করলে তুমি কিন্তু ডানলপের রবার চিনতে পারবে না। তোমার ওই ড্যাদবেদে চেহারায় হবে না। আমার হাত দুখানা দেখেছ?

নন্দ খানিকক্ষণ সব ভুলে আমার আস্তিন গোটানো হাত দুখানার দিকে তাকাত। তারপর লাজুকের মত হেসে বলত, ও হাতে হাতুড়িই মানায়। তুলি বা কলম মানায় না।

আমি বলতাম, তুলি আর কলম ভাল জিনিস। হাতুড়ি কিন্তু আরও ভাল। তুলি আর কলমে কাজ হয় বটে। তবে বড় সময় লাগে। হাতুড়িতে অত বেশী সময় লাগে না। ঠিকমত কশাতে পারলে এক ঘায়েই কাজ হয়। শক্ত হও, নন্দ। পাথর হও। মাটি হয়ো না।

নন্দ আর দাঁড়াত না সামনে বেশীক্ষণ।

বন্ধুদের মধ্যে নন্দ আমাকেই কম সহ্য করতে পারে।

তার কারণ আছে। ব্যায়াম করে করে চেহারাটাকে চূড়ান্ত চোয়াড়ে করে ফেলেছি। চেহারাটা দেখলেই মনে হবে যেন গাঁক করে লাফ দিয়ে ঘাড় মটকাবার জন্তেই তৈরী। গলার স্বরটা আশ্চর্যরকম ভরাট আর কর্কশ।

এমন সাংঘাতিক যে অচেনা লোক 'কে রে' বলে চমকে ঘাড় ফেরাবে। মেজাজটাও সুবিধের নয়। কেমন কড়াপড়া। তোয়াক্কাও করি না বড় একটা। পাড়ার প্রত্যেকটি দাঙ্গাবাজি আমাকে বাদ দিলে পানসে।

আঁটসাঁট করে ট্রাউজার পরে আমি যখন ছুটো হাতের শক্ত থাবায় মোটর সাইকেল বাগিয়ে ধরে ধুলোর ভেতর দিয়ে মাথার রাশিকৃত চুল ওড়াতে ওড়াতে যাই তখন নিজেকে সম্রাট বলে মনে করি।

কারখানার ফোরম্যান আমাকে রীতিমত সমীহ করে। আর এর জন্তে আমি গর্বিত।

একদিন ঐভাবেই মোটর সাইকেল চালিয়ে সাহাগঞ্জের দিকে যাচ্ছি, হঠাৎ নন্দর সঙ্গে দেখা। কোন একটা বাড়ির আলসে থেকে নন্দ আমাকে ডাকছিল।

নন্দকে দেখে আমি তো অবাক।

এ কি, নন্দ! তোমার গলায় একরাশ মাদুলি, তাবিজ! এসব কী হে?

নন্দ খালি গায়ে ছিল। তাড়াতাড়ি কি একটা গায়ে

জড়িয়ে নিল। ঘাড়টাও অনাবশ্যক দ্রুততার সঙ্গে চুলকে নিল কয়েকবার।

তারপর বলল, এদিকে কি রকম মহামারী আরম্ভ হয়েছে জান তো! তা ছাড়া গ্রহ-ট্রহও আমার খুব সুবিধের নয় ভবেশ।

আমি বললাম, দূর, যত সব বুজরুকি গলায় ঝুলিয়ে—ছ্যাঃ! মনে জোর করো নন্দ। দেখছ তো আমার জোর।

এই প্রথম নন্দ কোন কৈফিয়ত দিল না। আমার জোরটা নন্দ মেনেই নিল। তার যে জোর নেই এটাও সে যেন সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করল। ঘাড় মুছল রুমালে বার কতক। মাথা চুলকোল।

লাজুক লাজুক চোখে তারপর বলল, জোর কিসে হয়?

আমি তীব্র স্বরে বললাম, তোমার ওই তুলি কলম মাস্টারীতে হয় না। কলাইয়ের ডাল খাওয়া ছেড়ে দাও। মাংস খাও কব্জি ডুবিয়ে। আর হ্যাঁ, কারখানায় এস একদিন। সেখানে এক শো সতের ডিগ্রী গরমে ফিট হয়ে যেতে যেতেও গনগনে ফারনেসের সামনে দাঁড়িয়ে রবার গলাচ্ছি। এতদিন এখানে আছ, একদিনও তো যাও নি।

নন্দ অন্যমনস্ক হয়ে বলল, যাব। তোমাদের কারখানায় যেতে হবে একদিন।

ছুটো-দশটায় ডিউটি। কারখানায় যাবার জন্যে বেরিয়েছি। গলির মোড়েই দেখি একটা তালিমারা ছাতা বগলে করে অবিকল একজন মাস্টারের মতন নন্দ ঘাড় নীচু করে হন্ হন্ করে আমার দিকেই যেন আসছে।

আমি বললাম, এই যে, মাস্টার মশাই যে। তারপর, কোথায় চললেন?

নন্দ বড় বিব্রত হয়ে পড়ল। রুমাল দিয়ে ঘাড়টা মুছল। মাথাটাও চুলকোল কয়েকবার। তারপর ভারি রহস্যময় ভঙ্গিতে গলাটা নামিয়ে চুপি চুপি বলল, ভীষণ বিপদে পড়েছি ভাই। তাই তোমার কাছে এলাম।

বিপদ!

বড় ভয় করছে আমার।

ভয়!

তুমি আমায় বাঁচাও ভাই।

যথেষ্ট হয়েছে। বিপদটা কী?

নন্দ পর পর অনেকগুলো ঢোক কোঁৎ কোঁৎ করে গিলে ফেলল। চোখমুখ দিশেহারা করে বলল, আমাকে একটা মেয়েকে পড়াতে বলছে।

আমি শুনে হো হো করে হেসে উঠলাম।

পড়াতে বলছে তো পড়াও না। এই তোমার বিপদ?

আমার বড্ড ভয় করছে।

আমি তেমনি হেসে বললাম, ভয় কি হে? একটা মেয়েকে পড়াবে তাতে আবার ভয় কি?

নন্দ সে কথার কোন জবাব দিল না। ও শুধু বিড় বিড় করে বলল, আমাকে পাথর হতে হবে ভবেশ, আমাকে শক্ত হতে হবে।

এদিকে আমিও বসে নেই। হৃদয়চর্চা কখনও করি নি। সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমার আসে না। মোটামুটি সুন্দরী একটি শরীরসর্বস্বা মেয়েকে আমার ভাল লাগে। জাত-গোত্র না মেনে বেমালুম তার কাছে বিয়ের কথাটা পাড়লাম। আমি জানতাম মেয়েটা আমাকে 'না' করতে পারবে না। ভালবাসুক ছাই না বাসুক মেয়েটা আমাকে ভয় খায় আর আমি ভয়ের শক্তিতে বিশ্বাস রাখি। সুতরাং একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমি জানি, ভয় দেখিয়ে যে কোন লোককে দিয়ে যে কোন নীচ কাজ পৃথিবীতে এখনও হাসতে হাসতে করানো চলে। তাই বলে মেয়েটা আমাকে বিয়ে করে যে কোন নীচ কাজ করেছে আমি তা মনে করি না।

সিনেমা দেখে ফিরছি। বাসের মধ্যে দেখা।

নন্দ চুপি চুপি বলল, মেয়েটা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করে দিয়েছে ভাই।

বললাম, কি রকম? কার কথা বলছ?

নন্দ বলল, সেই যে মেয়েটা, যাকে আমি পড়াই।

হ্যাঁ। কী হয়েছে?

বড্ড নষ্টামি শুরু করে দিয়েছে আমার সঙ্গে।

নষ্টামি?

নন্দ মাথা চুলকে নিয়ে বলল, ও তো সিনেমায় নিয়ে যেতে বলছে।

সশব্দে আমি হেসে উঠলাম, বললাম, তা যাও না নিয়ে। সিনেমা দেখাবে তার জন্যে অত ভাবাভাবি কি? আমার বউ সিনেমায় নিয়ে যেতে বলে না। আমিই জোর করে ধরে নিয়ে যাই।

তারপর ইশারায় নন্দকে কাছে ডাকলাম।

নন্দ কাছে এল। আমি ওর গাটা টিপে টিপে দেখতে লাগলাম। নন্দ বেজায় ঘাবড়ে গেল। বলল, টিপছ যে?

দেখছি, একটু শক্ত হয়েছ কিনা।

কি দেখলে ভবেশ?

এখনও নরম, এখনও মাটির মতন।

মর্নিং ডিউটি সেরে সাহাগঞ্জের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছি। সামনে দাঁড়াল একটা গরু আর নন্দ। আমি যোগাযোগে বিশ্বাস করি। সঙ্গে সঙ্গে গরু আর নন্দর মুখ মিলিয়ে নিলাম। দেখলাম নন্দর মুখে গরুর মুখের, গরুর মুখে নন্দর মুখের ছায়া পড়েছে।

কি নন্দ, কী ব্যাপার? সিনেমা-টিনেমা চলছে কেমন?

নন্দর মুখে দুশ্চিন্তার কালি: ওর বাবা-মা বড় গণ্ডগোল করছেন।

কেন? তোমায় গালমন্দ পাড়ছেন নাকি?

না না। ওঁরা বড় সজ্জন।

তবে?

বাড়িতে খেতে বলছেন।

আমি হেসে বললাম, তা খাও না। খাওয়া তো খারাপ নয় নন্দ।

নন্দ একটা অদ্ভুত ধরনের ঢেঁকুর তুলে বলল, আমার বড় ভয় করছে ভাই।

ভয় করছে? নন্দ, এদিকে এস।

নন্দ আমার কাছে এল। আমি নন্দর ডান হাতখানি নিজের হাতে তুলে নিলাম। নন্দ বেজায় ঘাবড়ে গেল। বলল, কী হচ্ছে?

খানিকক্ষণ হাতখানা ধরে রেখে গম্ভীর হয়ে বললাম, যাও। আর ভয় নেই। খানিকটা শক্তি দিয়ে দিলাম।

নন্দ তাই বিশ্বাস করল।

কিন্তু এর পরেও নন্দকে আসতে হল আমার কাছে।

হন্তদন্ত হয়ে নন্দ আমার বাড়ি চড়াও হল। মুখে দাড়ি। চুল উস্কখুস্ক। জামার বোতাম খোলা।

কী ব্যাপার নন্দ?

নন্দ বলল, সব্বোনাশ হয়েছে।

সব্বোনাশ! মেয়েটা তোমার কান মলে দিয়েছে নাকি?

দূর, তুমি মোটেই গম্ভীর হচ্ছ না।

আচ্ছা, এই গম্ভীর হলাম।

বলে মুখটায় বেশ একটা জমকালো গম্ভীর ভাব নিয়ে এলাম।

নন্দ তখন বলল, বুঝলে ভবেশ, ওদের বাড়িতে আর একজন ছোকরা যেতে আরম্ভ করেছে।

তাতে কী হয়েছে?

আমার বড় ভয় করছে। কখন কী হয়।

কী হবে?

মানে মেয়েটা তো এইবার আমায় সন্দেহ করবে।

আমি হেসে বললাম, তা করুক না। সেটা তো মন্দ নয়।

নন্দ খানিক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু ওই ছেলেটাও তো আমায় সন্দেহ করবে।

আমি হেসে বললাম, সন্দেহ করা তো দরকার।

নন্দ চুপ করে খানিকক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, তুমি বলছ?

হ্যাঁ।

একটা হপ্তা পুরোয় নি। নন্দ এসে হাজির। এসে মেঝেতে ধপাস করে বসে পড়ল। আমি বললাম, ভয় বাড়ল, না কমল?

কমবে কি ভবেশ, বেড়েছে।

কেন?

মেয়েটা যে ভারি সুন্দরী দেখতে।

আমি বললাম, সেটা তো খারাপ না।

এইবার নন্দ বেজায় বিব্রত হয়ে পড়ল। ঘাড় মাথা চুলকে একশা করে ফেলল। আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু—কিন্তু আমি যে দেখতে খারাপ। তুমি একদিন গরুর মুখের সঙ্গে আমার মুখ মিলিয়ে দেখছিলে।

তা দেখেছি বটে, কিন্তু বিপদটা কোথায়?

আমি যে দেখতে খারাপ আর ও যে দেখতে খুব ভাল।

আমি এইবার একটু কঠিন হয়ে গেলাম। একটু শক্ত হয়ে বললাম, এটা কোন কথা নয় নন্দ। নন্দ, একটু শক্ত হও।

নন্দ খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর বিড়বিড় করে বলল, শক্তই হব আমি। আমি পাথর হব।

নন্দ আর দাঁড়াল না। হন্ হন্ করে সামনে দিয়ে চলে গেল।

আমি স্পষ্টই বুঝলাম, নন্দর এই ভয়টাই সবচেয়ে মারাত্মক। এতদিন এত রকমের ভয় পেয়ে এসেছে নন্দ। কিন্তু এই ভয়ের সঙ্গে তাদের যেন কোন তুলনাই চলে না।

নন্দকে দেখতে খারাপ। মেয়েটাকে দেখতে ভাল। মেয়েটাকে না পাবার ভয়, পেয়ে হারানোর ভয়—নন্দর কাছে মূর্তিমান শয়তান। এই ভয়টা, এই শয়তানটাই নন্দকে অতিষ্ঠ করে তুলল।

অস্থির হয়ে গেল নন্দ। পাগল হয়ে গেল।

নন্দ দেখতে খারাপ, বড় খারাপ। মেয়েটা সুন্দরী, বড় সুন্দরী—এ যে সেই ভয়। বার বার নন্দ ভয়টাকে দাঁত খিঁচল, ঢিল ছুঁড়ল শয়তানটার গায়ে, থুথু দিল, টিটকিরি ছুঁড়ল। কিন্তু পারল না। মেয়েটা যে বড় সুন্দরী, সে যে বড় খারাপ দেখতে।

মনটা যদি পাথর হত! কিন্তু মনটা যে মাটির মতন!

অনেকদিন নন্দর কোন খোঁজ রাখি নি। নানা উটকো ঝঞ্ঝাটে, রুক্ষ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। তা ছাড়া আমার সময় কই? একটা নপুংসক, কাপুরুষের পেছনে এতদিন অনেক ঘুরেছি। আর না। যথেষ্ট হয়েছে। মরুক গে নন্দ। মরুক গে বোকাটা।

ইতিমধ্যে কিছু কিছু কথা আমার কানে গেছে। নন্দ বিয়ে করেছে। সেই মেয়েটাকে নয়। ওকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে উড়ুক্কু ছেলেটা। এ অন্য মেয়ে। নন্দ নেমন্তন্ন করে নি। কেন তা জানি না। একদিন কিন্তু জানবার বাসনা হল। আমি নিজেই গেলাম। তা ছাড়া মেয়েটাকে দেখবার একটা কৌতূহল ছিল।

নন্দ আমাকে ভেতরে ডেকে নিয়ে গেল। বউ সুপুরি কাটছিল।

আমি বললাম, তুমি কিন্তু আমাকে নেমন্তন্ন কর নি।

করি নি। করতে ভাল লাগে নি।

আমি বিস্মিত হয়ে নন্দর মুখের দিকে তাকালাম। নন্দ যে এ ভাবে কথা বলতে পারে, এতখানি জোর তার জিভে থাকতে পারে, এত সহজ কথা এত অকপটে নন্দ বলতে পারে—এ আমার একটা অভিজ্ঞতা। এ কোন্ নন্দ? আমার চেনা নন্দর সঙ্গে তো এর কোন মিল নেই। এ কে!

নন্দ একটুও ঘামছে না। ঘাড় রুমাল দিয়ে মুছল না। মাথা চুলকোল না। চোখ নীচু করল না। কে এ!

আমি বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। এত জোর নন্দ কোথায় পেল?

হঠাৎ নন্দ বউয়ের দিকে তাকিয়ে তীব্র কর্কশ গলায় বলল, ভবেশ, চিনিস?

কাকে?

নন্দ নিষ্ঠুর আঙুলটা বউয়ের দিকে বাড়িয়ে দিল জলন্ত একটা প্রশ্নের মত। তেমনি কর্কশ ঝাঁঝালো স্বরে বলল, বাপকে খেয়েছে, মাকেও। মামার গলগ্রহ হয়ে ঘাড়ে বসেছিল। এক পয়সার মুরোদ নেই—এদিকে ফুটুনি কত মামার। কী চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি।

তারপর একটু থেমে, অদ্ভুত এক হিংস্র উল্লাসের সঙ্গে নন্দ বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, আর রূপ তো দেখতেই পাচ্ছ চোখে! আমার চেয়েও এক কাঠি সরেস!

আমি পরম বিস্ময়ে নন্দর দিকে তাকালাম।

নন্দর শুধু মেজাজটাই পাল্টায় নি, গলার স্বরই বদলে যায় নি, চেহারাটাও যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।

ঠোঁটের একপাশ কুঁচকে গেছে। নাকটা ওপর দিকে একটু তোলা। চোখ দুটো থেকে পিঙ্গল একটা আভা নিষ্ঠুর দীপ্তিতে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। যেন ধারালো একটা ছুরি দাঁতে করে নিয়ে প্রচণ্ড হাসছে নন্দ নিঃশব্দে।

হ্যাঁ। এতদিনে সব সংশয়, সব আশঙ্কা, সব ভয় নন্দ কাটিয়ে উঠেছে। নন্দ মাটি নয় এখন, নন্দ পাথর।

শক্ত হয়েছে নন্দ, আমরা ঠিক যা চেয়েছিলাম। পুরুষ হয়েছে। প্রচণ্ড ও প্রবল পুরুষ।

কিন্তু আমার মনে হল কোথায় যেন কী গোলমাল হয়ে গেছে। জট পাকিয়ে গেছে যেন। গিঁট পড়ে গেছে।

নন্দ হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে তার চেয়েও অসহায়,

হিমলক্ষ্মী

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

এলে কুয়াশার অবগুণ্ঠনে শিশিরচরণে আজ ;
ছিলেন নির্জ তুষার প্রাসাদে, তাই বুঝি এত লাজ ?
কেন হেন কুণ্ঠিত,
অবোধ হৃদয় করেছ নীরবে হেলাভরে লুণ্ঠিত।
এখন তপন অলস স্বপনবিলাসী নীলের মনে,
বাজাও বেদনা কোমল নিখাদে, উদাস হতাশ বনে
হানি উত্তর বায়ে,
পাণ্ডুর পীত কাতর পাতারে বিছায়ে মরণছায়ে।
দুধের দানায় বেঁধেছ ধানের টলমল টিয়া-খুশী,
খেলাও প্রদোষে কাপাসী-চাঁদেই আকাশে কপিশ পুষি ;
খেজুরের রসে মজি
ঘর ভোলে যত দরবেশ পাখি সুর সহজিয়া ভজি।
চমকি চাহিছে কুমারী কুন্দ, মল্লিকা সাজে বধূ,
গেরুয়া বসনে কমলা পেয়েছে পরমানন্দ মধু
সারা অন্তর ভরি,
সূচিত তোমার সুচির রচনা জোনাকিতে জাদুকরী।
নাই বা তোমার পাগল পলাশ, বহ্নি-ফেনিল বীথি,
পালক ঝরায় রাজহংসেরা, সেই তো শুভ্র সিঁথি।
দেখি সারসের সাজে,
এলে পঙ্কিল শৈবালদলে শঙ্খের কারুকাজে।
এখনো যে রূপে ডোবে নি নয়ন, এনেছ তাহারি ডাকে,
এখনো যে গান মেলে নাই ডানা, রচো সেই মৌচাকে।
হে ধূসর যবনিকা !
অতি একান্ত প্রান্তে পেতেছ বাসন্তিকার শিখা।
অবসান হোক যত ম্লান শোক হত-মান ঝাউশাখে,
বিস্মরণের পথ বেয়ে যেন রঙের গাগরি কাঁখে
আসে প্রজাপতি মেয়ে,
নটনারায়ণ নাটে কুহুতান ফোটে ইঙ্গিত পেয়ে।

তার চেয়েও দুর্বল, তার চেয়েও কুরূপ আর একজনকে। নন্দর আর কোন ভয় নেই। এবার সমস্ত ভয়ের পরীক্ষায় সে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ।

এই কি আমি চাই নি ? নন্দ উত্তীর্ণ হোক, উত্তিষ্ঠিত হোক নন্দ ? আমরা চাই নি ?

কিন্তু আমার যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারছি না। নন্দ তো খুশী হয়ে উঠেছে। সে যে নিষ্ঠুর হতে পেরেছে, প্রবল হতে পেরেছে, প্রচণ্ড হতে পেরেছে—এই অত্যন্ত ন্যায্য গর্বে সে এখন সম্রাটের মতন।

ঠিক বুঝতে পারছি না। কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এই কি আমি চাই নি ? আমরা চাই নি ?

কিন্তু আমি আর পারলাম না, আমি দিশেহারা হয়ে বললাম, সত্যি বলছি নন্দ, এ আমি চাই নি। সত্যি বলছি।

সে কথা শুনে নন্দ হঠাৎ চমকে গেল। যেন চোখে পড়েছে, যেন বুঝতে পেরেছে কিছু। সে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে নন্দর চেহারাটা আবার পাল্টে যাচ্ছে। মেজাজটা বদলে যাচ্ছে। এমন কি গলার স্বরটা পর্যন্ত অন্যরকম হয়ে গেল।

একটা কাচের গেলাস হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলে যেমন শব্দ হয় নন্দর গলাটা তেমনি ভেঙে গেল।

অতি অবাধ্য লুকনো বোবা একটা ব্যথাকে গলা টিপে ধরে নন্দ বলল, আমি কি পাথর হই নি ভবেশ ? আমি কি শক্ত হই নি ? তুমি আমায় প্রশংসা করছ না কেন ?

সে কথা শুনে পাথরের মতন আমি মাটির মতন হয়ে গেলাম।

মুক্ত বিদ্যুৎ-কণা

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

জন্ম নিতে বাধ্য হল জ্যোতির্ময়।

অবশ্য অনায়াসে হয় নি, ডাক্তার এবং ধাত্রীকে রাত জেগে হাঙ্গামা করতে হল অনেক। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ আপত্তির সুরে কিছুক্ষণ কাঁদল জ্যোতির্ময়। কিন্তু কান্না শুনে উপস্থিত সকলেই আরও খুশী হয়ে উঠল।

জ্যোতির্ময় চতুর্থ সন্তান। তবু আদর কম নয়। কোলে কোলেই মানুষ হতে পারত। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে আহাম্মক ছেলেটা নিজেই কোল ছেড়ে শক্ত মেঝে বেশী পছন্দ করতে আরম্ভ করল। ক্রমে দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার আর হাঁটবার প্রয়াসে অনবরত আছাড় খেতে খেতে কদিন মাথা ফাটল, কান কাটল, নাক থুবড়ে ছেঁচে গেল। কিন্তু থামতে পারল না।

হাঁটা শিখতে হল জ্যোতির্ময়কে।

চটপট হাঁটতে আর কথা বলতে শিখে নতুন এক বিপত্তির মধ্যে পড়ে গেল আবার। পিতা অনাদি বই কিনে আনল, আর মাতা সুমতি সেই বই আর জ্যোতির্ময়কে নিয়ে লেখাপড়া শেখানোর নামে ভয়ানক একটা গোলমাল সৃষ্টি করতে আরম্ভ করল। এবং ভীতি, উপহার, কৌশল ইত্যাদি ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে জ্যোতির্ময়ের না পড়ে আর গত্যন্তর রইল না।

জ্যোতির্ময়ের কাজ অনেক বেড়ে গেল। পড়তে হয়, খেলতে হয়, খেলতে খেলতে মারামারি করতে হয় এবং কাঁদতে হয়।

পাঠশালায় ভর্তি হবার পরে কাঁদবার কাজটা আরও বাড়ল। আবার ভীতি, উপহার, কৌশল ইত্যাদি প্যাঁচে পড়ে ঢিট হয়ে গেল জ্যোতির্ময়। এবং ক্রমাগত ঢিট হতে হতে ওর বদ্ধমূল একটা ধারণা জন্মাল যে পৃথিবী-শুদ্ধ মানুষের প্রধান কাজ হল জ্যোতির্ময়কে ঢিট করা।

নইলে লিচু গাছে লিচু পেকে থোকে থোকে ঝুলে আছে, স্কুল থেকে ফেরবার পথে গাছে উঠে পেড়ে খেতে কোনই অসুবিধে নেই। কিন্তু জ্যোতির্ময় গাছে উঠে দু-একটা মুখে দিতেই কোথা থেকে রে রে করে লাঠি হাতে লোক ছুটে আসে।

ভাল ফুলের বাগান দেখলে কিছু অনিষ্ট করবার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। একটু তছনছ করতে আরাম লাগে। রাস্তায় ইঁট পাথর রেখে গাড়ি ওলটাতে মজা লাগে। কিন্তু নির্বিবাদে কিছুই করবার উপায় নেই। ভয়ানক গোলমাল বেধে যায়।

জ্যোতির্ময় লক্ষ্য করল টাকা-পয়সা নামীয় বস্তু হাতে দিলেই ফিরিওলা বা দোকানদারের কাছে পছন্দমত জিনিস পেতে একটুও বিলম্ব হয় না। মায়ের কাছে একদিন পয়সা চাইল, মা গ্রাহ্য করল না। অনাদির কাছে চাইল, সে একটা ধমক দিয়ে বিদায় দিল। অগত্যা জ্যোতির্ময় বিছানার নীচে একটা চকচকে সিকি পেয়ে হৃষ্টমনে সেটা ফিরিওলাকে দিয়ে চীনেবাদাম নিয়ে এল।

বাড়িশুদ্ধ লোক একসঙ্গে ঘিরে ধরল জ্যোতির্ময়কে।

পয়সা পেলি কোথায় হতভাগা, বল্?

বাক্স খুলে নিয়েছিস?

ওইটুকু ছেলে, এখনই চুরি করতে শিখলে পরে তো ডাকাত হবে!

আচ্ছা করে শাসন করে দাও, আর কোনদিন সাহস না পায়।

সুমতি আচ্ছা করে শাসন করে দিল।

রাগে দুঃখে মাঝে মাঝে মরতে ইচ্ছে হয় জ্যোতির্ময়ের। যে সব কাজে ওর মজা লাগে প্রায় সবগুলোতেই মানুষের আপত্তি। অথবা সব আপত্তিকর কাজেই ওর মজা লাগে। কিন্তু তাতে ওর দোষটা কোথায়? মজা লাগা না লাগার মধ্যে ওর কি কোন হাত আছে? বেচারা ভেবে পায় না। কাজেই মরে ভূত হয়ে শত্রুদের ঘাড় মটকাবার স্বপ্ন দেখে।

এত হাঙ্গামা সত্ত্বেও যৌবনে পা দিল জ্যোতির্ময়।

গোঁফের রেখা তার অজ্ঞাতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাড়া-সম্পর্কের এক বউদি একদিন সহাস্তে এ বিষয়ে তাকে সচেতন করে দিল।

আরে, ঠাকুরপোর যে সুন্দর গোঁফ উঠেছে দেখছি। ওমা, এই যে দাড়িও কয়েকগাছা উঠেছে!—বলে জ্যোতির্ময়ের থুতনিতে হাত দিল মহিলাটি।

রোমাঞ্চ হল জ্যোতির্ময়ের।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কৈশোরের কৌতূহল ক্রমে উদগ্র কামনায় পরিণত হল। এখন আবার স্ত্রীলোকের পেছনে ঘুরতে হয় জ্যোতির্ময়কে। কখনও সাইকেলে ছুটতে হয়, কখনও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কখনও পায়ে হেঁটে অনুসরণ করতে হয় অনেক দূর। এবং এই সব কাজের অছিলা খুঁজতে খুঁজতে গলদঘর্ম হয়ে যেতে হয়।

কিরে, এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে? ক্লাস নেই?

চোরের মত চমকে ওঠে জ্যোতির্ময়: না, এমনই। বলে এক পা অগ্রসর হতেই বিলম্বে বুদ্ধি জোগায়। বলে, ওই ইয়ের—আসবার কথা আছে। তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

কিয়ের আসবার কথা?

আমাদের সঙ্গে পড়ে, একটি ছেলে।

এমনই অনেকবার অনেকের কাছে জব্দ হয়েছে। কিন্তু থামতে পারে না। মেয়েমানুষ বড় ভাল লাগে জ্যোতির্ময়ের।

তবু কথা বলতে বুক ঢিব ঢিব করে, মুখ লাল হয়, কান গরম হয়ে ওঠে। ফলে কোন ঘটনা এখনও ঘটে নি।

একদিন দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি মেয়ের অনুসরণ করছিল জ্যোতির্ময়। রাস্তায় লোকজন কম। হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হল সে। দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে মেয়েটির গায়ে একটু ধাক্কা দিয়ে পার হয়ে গেল। ভাবল কেউ দেখে নি।

দেখেছিল। জন দুই লোক ছুটে এসে ধরে ফেলল জ্যোতির্ময়কে। সঙ্গে সঙ্গে আরও লোক জমে গেল। জ্যোতির্ময় কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমি দেখতে পাই নি। হঠাৎ লেগেছে—

কিন্তু নারীর অঙ্গে অন্য পুরুষের হস্তক্ষেপ পুরুষেরা কোনদিনই সহ্য করে না। গোটা কতক কিল চড় ঘুষির সঙ্গে তারা বলে দিল, দেখতে পাও না—অ্যাঁ? এর পর দেখতে পাবে। আর কোনদিন হঠাৎ লাগবে না—বুঝলে।

বুঝে ঘাড় গুঁজে পালিয়ে গেল জ্যোতির্ময়। প্রতিজ্ঞা করল, আর নয়।

প্রতিজ্ঞার পরে ছ মাসের মধ্যে বিয়ে করতে বাধ্য হল জ্যোতির্ময়।

কারণটা ঘটেছিল বিয়ের মাস তিনেক আগে।

সেদিন বিকেলে বন্ধু অনিলের বাড়ি গিয়েছিল। অনিলের বোন সাবিত্রী তখন একা ছিল বাড়িতে।

দাদা নেই বাসায়।—সাবিত্রী বলল। মুহূর্ত পরে যোগ করে দিল, কেউ নেই।

জ্যোতির্ময় জিজ্ঞেস করল, অনিল কখন বেরিয়েছে?

অনেকক্ষণ।

এখন ফিরবে?

সাবিত্রী একটু যেন চিন্তা করে বলল, কী জানি, ফিরতেও পারে।

জ্যোতির্ময় ক্ষণকাল ইতস্তত: করে শেষে ফিরতে উদ্যত হল। সাবিত্রী হঠাৎ উজ্জ্বল হাসিমুখ করে বলল, দাদা কাল একটা কবিতা লিখেছে, দেখেছেন?

না, দেখি নি তো!—উৎসুক কণ্ঠে বলে থামল জ্যোতির্ময়।

সাবিত্রী বলল, দেখবেন? ততক্ষণে আসতে পারে দাদা। কাউকে দেখতে দেয় না, জানেন? আমি চুরি করে দেখেছি।

কই, দেখি।

আসুন না।—বলে সাবিত্রী ঘরে ঢুকে গেল। জ্যোতির্ময় অনুসরণ করে ঘরে গিয়ে বসল।

কবিতাটা খুঁজে বার করতে করতেই মেঘের ডাক শোনা গেল। পড়া শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে সাবিত্রী আর জ্যোতির্ময় একসঙ্গে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল।

ক্ষণপরে আনমনে উঠে দাঁড়াল জ্যোতির্ময়। সাবিত্রীও উঠল।

শিগগীর থামবে না মনে হচ্ছে।—বলতে গিয়ে স্বর কেঁপে গেল জ্যোতির্ময়ের। আবার দৃষ্টি ফেলল সাবিত্রীর

চোখে। উভয়ের অপলক চক্ষুর মধ্যে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঘটে গেল যেন। পরের অংশ সুইচ্ টেপার পরে বৈদ্যুতিক আলোর মত অবশ্যম্ভাবীরূপে জ্বলে উঠল।

মাস তিনেক পরে সাবিত্রীর বিধবা মাতা জ্যোতির্ময়ের পিতা অনাদির সঙ্গে দেখা করে গোপনে রুদ্ধ চাপাকণ্ঠে অনেকক্ষণ আলাপ করায় কয়েকদিন পরেই সাবিত্রীর সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের বিবাহ হয়ে গেল।

অপ্রস্তুত জ্যোতির্ময় প্রথম ধাক্কায় হকচকিয়ে গেল। পরে একটা গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, বেশ। এবার ?

আরও মাস কয়েক পরে বি. এ. পরীক্ষায় ফেল করল জ্যোতির্ময়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি পুত্রসন্তানের পিতৃত্ব লাভ করল।

বন্ধুদের সকৌতুক বিদ্রূপের জবাবে ম্লান হাস্যে বলল, তোরা তো হাসতেই পারিস।

সে কিরে, তোর কান্না পাচ্ছে নাকি ?

অপ্রস্তুত বোধ করল জ্যোতির্ময়। কারণ কথাটা শুনে মনে হল তার সত্যিই কান্না পাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বলল, যা, কান্না পাবে কেন। ছেলে হলে ফুর্তি না হয় কার। কিন্তু—

কিন্তু কি রে ?

চুপ করে গেল জ্যোতির্ময়। মুহূর্ত পরে অনেকটা আপন মনে বলল, না, মানে—পর পর কি সব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেল। কি রকম যেন জোর করে সব—

জোর করে ?

মানে—কেমন যেন ব্যাপারগুলো আগাগোড়া সবই চেপে পড়ছে। জীবনটাই—

ইঃ—ন্যাকা!—বন্ধুরা আবার বিদ্রূপধ্বনি করে উঠল : ন্যাকা কিছু জানে না, লোকে চাপিয়ে দিচ্ছে!

যাঃ, লোকের কথা বলছি নাকি ? তোদের বোঝাতে পারব না।—বলে থেমে গেল জ্যোতির্ময়। নিজের কাছেও আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠল বক্তব্যটা।

আর একবার পরীক্ষা দেওয়া উচিত হবে কিনা এ বিষয়ে নিজেই চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে বলে কিছুদিন যাবৎ ভাবছিল জ্যোতির্ময়। কিন্তু আর একটি ঘটনায় তার ভাবনার বিলাস-সুখ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল।

হার্টফেল করে হঠাৎ মারা গেল অনাদি। এবং কিছুদিন পরেই জ্যোতির্ময় জানতে পারল যে বড় দুই ভাই চাকরি করে বটে, কিন্তু জ্যোতির্ময়ের জন্য করে না।

আর স্ত্রী—সাবিত্রী। অভাব আর সাবিত্রী মিলে কৃষকের আলযুক্ত নড়ির মত খুঁচিয়ে তাড়াতে লাগল জ্যোতির্ময়কে। চাকরির জন্যে মানুষটা পাগলের মত ছুটে বেড়াতে লাগল।

চাকরি একটা পাওয়া গেল। মাস্টারি।

শুনে সাবিত্রী ঠোঁট ওলটাল। বন্ধুদের কেউ কেউ উৎসাহ দিয়ে বলল, খুব ভাল কাজ। জাতিগঠনের কাজ। এক সঙ্গে চাকরি আর দেশের কাজ দুটো হবে।

কিন্তু চাকরিতে যোগ দিয়ে অল্পদিনেই জ্যোতির্ময় টের পেল যে কাজ একটা হচ্ছে, আর একটা হচ্ছে না। জাতিগঠন হচ্ছে, কিন্তু সস্ত্রীক নিজের ও শিশুটির শরীর গঠন মোটেই হচ্ছে না। আরও ক্ষয় হচ্ছে।

নতুন পাস করা ডাক্তার বন্ধু হিমাংশুকে একদিন বাড়িতে নিয়ে এল জ্যোতির্ময়। ডাক্তার তিনজনকেই ভাল করে দেখল। শেষে একটু হেসে বলল, অসুখ-বিসুখ বিশেষ কিছু হয় নি এখনও। তবে হবে।

তার মানে কি!—জ্যোতির্ময় যেন অবাক হল।

মানে খুব সোজা। বাচ্চাটা শরীর গঠনের মাল-মসলা বিশেষ পাচ্ছে না। মানে দিনে অন্ততঃ সেরখানেক দুধ ওর দরকার। বোধ করি পাচ্ছে না।

না। তা পাবে কী করে ? মোট পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই। তোমার কি মাথা খারাপ ?

আমার মাথা সম্বন্ধে গবেষণা করবার মত শরীরের অবস্থা তোমার নেই। তোমার শরীর সত্যিই খুব খারাপ। ভাত ডাল তরকারির সঙ্গে দৈনিক অন্ততঃ পোটাক মাছ মাংস তোমার খাওয়া দরকার। আর এক-আধটা ডিম। বোধ হয় খাচ্ছ না।

চোখ আরও কপালে তুলল জ্যোতির্ময়। শেষে

বিষণ্ণ কণ্ঠে আবৃত্তির মত বলে গেল, পোটাক মাছ মাংস আর এক-আধটা ডিম!

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছ মনে হচ্ছে। আর তেল-ঘিয়ে ছটাক খানেক জনকে।

জনকে!

হ্যাঁ। শরীরটার সঙ্গে কোন ইয়ার্কি চলে না। কয়লা না দিলে ইঞ্জিন চলে না জান তো? শরীরও তাই। তবে শরীরটা দিন কয়েক চলে নিজের মাংস পুড়িয়ে।

ভারি চমৎকার ইঞ্জিন তো আমাদের?

এর চেয়ে ভাল ইঞ্জিন কিছু কল্পনা করা যায় না।

জ্যোতির্ময় বলে উঠল, আমার ঘাড়ে তা হলে আমাকে নিয়ে ভাল ইঞ্জিন তিনটে।

টাকার জন্যে আবার যেন ক্ষেপে গেল জ্যোতির্ময়। সকালে বিকেলে বাড়তি কোন কাজ অথবা একটা ভাল চাকরীর চেষ্টায় পাগলা কুকুরের মত ছুটে বেড়াতে লাগল।

ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত দেহে হাতে পয়সা থাকলে মাঝে মাঝে চায়ের দোকানে ঢুকে চা খায়, পয়সা না থাকলে দোকানের ছায়ায় দাঁড়িয়েই বিশ্রাম করে।

একদিন রবিবারের দুপুর বেলায় ছুটতে ছুটতে জ্যোতির্ময় একটা মিষ্টির দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েই হঠাৎ লক্ষ্য করল একটা কুকুরও তখনই এসে থামল সেখানে এবং সাজানো খাদ্যবস্তুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে মুখ ফাঁক করে জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল।

জ্যোতির্ময়ের ঠোঁট দুটি ঈষৎ হাস্যের ভঙ্গীতে একটু প্রসারিত হয়ে আবার কুঞ্চিত হয়ে গেল। লজ্জা পেল যেন। তাড়াতাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে দোকানে ঢুকে গেল সে। বসে মনে হল তার জিভটাও যেন খানিকটা বেরিয়ে ওই কুকুরটার মতই ধুঁকছে।

হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল জ্যোতির্ময়। এবার ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে গেল। বিকেলে আর বার হল না।

অবাক হয়ে সাবিত্রী জিজ্ঞেস করল, কী হল, আজ কি শুয়েই থাকবে নাকি? বেরুতে হবে না?

না।—ক্ষণেক বিলম্বে দৃঢ় সংক্ষিপ্ত জবাব দিল জ্যোতির্ময়।

শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

না—

তবে?

বেরুব না, যাও।—হঠাৎ চিৎকার করে উঠল জ্যোতির্ময়।

সাবিত্রী একটু ভড়কে গেল। সরে গেল তখনকার মত।

বেরুব না বলতে পেরে জ্যোতির্ময়ের শরীরে মনে অকস্মাৎ যেন আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শুয়েছিল, উঠে বসল। মুক্তির আবেগে দু হাত ছড়িয়ে বলে উঠল, আঃ!

বেরুব না, আমার ইচ্ছে। আমার ইচ্ছে।—আবার বলে পুলকিত হয়ে উঠল জ্যোতির্ময়। সারা জীবন—সারাটা জীবনই ঘানি টেনেছি—চোখ বুজে কলুর বলদের মত। এবার—এবার আমার ইচ্ছে।

জ্যোতির্ময় শিস দিয়ে গান করতে শুরু করে দিল।

সাবিত্রী চা এনে দিল।

মুক্ত স্বাধীন জ্যোতির্ময় পরম আনন্দে চায়ের বাটিতে বার দুই চুমুক দিয়েই তৎক্ষণাৎ রেখে দিল আবার। বলল, চা খাব না।

কেন?—ভীতকণ্ঠে সাবিত্রী জিজ্ঞেস করল।

এবার গম্ভীর সৌম্যকণ্ঠে স্থিতপ্রজ্ঞের মত জ্যোতির্ময় জবাব দিল, আমার ইচ্ছে।

বহির্বিশ্ব

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

জেমস্ জয়স্ থেকে বিশ্বের উপন্যাস-সাহিত্যে নতুন যে ধারাটি প্রবাহিত হল, আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সাহিত্যচর্চা তারই অন্তর্গত। অথচ এ ধারাতে তিনি সম্পূর্ণ একক, এবং এক হিসেবে অদ্বিতীয়। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মধ্যে যে ব্যবধান সেটাকে লুপ্ত করে দেওয়াতেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর রচনা অত্যন্ত সুস্পষ্টরূপে বহির্মুখী। ঘটনাপ্রধান ও বিবরণপূর্ণ। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির কোনও অন্তর্জগৎ নেই, কোনও অতীত নেই। এটা বোধ হয় কিঞ্চিৎ কৌতুকপ্রদ যে একমাত্র "দি স্নোজ অব কিলিমাঞ্জারো" ব্যতীত আর কোন কাহিনীর কোন চরিত্র কখনও চিন্তা করে না, এমন কি তারা স্মৃতিচারণাও করে না। তাদের মন যেমন অসাড়, মনন তেমনই রিক্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে বিভিন্ন ঘটনাতে ওই সব চরিত্রের অংশ গ্রহণ তথা আচার-আচরণে প্রবৃত্তিই প্রধান। পক্ষান্তরে জয়সের চরিত্রগুলি সর্বদাই স্মৃতি-ভারাক্রান্ত, প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করার ক্রমাগত গুরু প্রয়াসে ক্লান্ত। এই প্রসঙ্গে জয়সের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় উইলিয়ম ফকনরের; তাঁর চরিত্রগুলির বাসনা ও ভাবনার উপর বংশধারা ও অতীত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব প্রবল এবং তাদের মনোরাজ্য আরও নানা বিষয়ের সংস্পর্শে ও সে সবের প্রতিক্রিয়াতে একাধারে জটিল ও সমৃদ্ধ। কিন্তু হেমিংওয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে উলটো। ব্যক্তি তাঁর কাছে স্বাধীন ও পরম। একমাত্র "দি সান্ অলসো রাইজেস্" উপন্যাসে তিনি কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। সেখানে এমন দুটি জীবনধারার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে যা আসলে বিশেষ জাতিচেতনা ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব।

অর্থাৎ হেমিংওয়ের প্রায় সকল চরিত্র নির্বিশেষ। তাদের যথার্থতা মানুষের যৌন প্রবৃত্তিনির্ভর এবং তাই বিশেষ আবহাওয়া ও পরিপ্রেক্ষিত-নিরপেক্ষ। তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাগতিক কোনও ঘটনায় বা ভাবধারায় তাদের চরিত্র সাড়া দেয় না, অপরিবর্তিতই থেকে যায়। অবশ্য নির্বিশেষ চরিত্র নির্মাণের যে বিপদ তার থেকে স্বীয় রচনাবলীকে তিনি সর্বদা দূরে রাখতে পারেন নি। ফলে "ফর্ হুম্ দি বেল্ টোল্স"-এর নায়িকা মারিয়ার অনেক কার্যকলাপ ওই পরিবেশে অবাস্তব হয়ে পড়েছে এবং তার চরিত্র তাই স্পেনীয় জীবন সম্বন্ধে যাদের ধারণা আছে তাদের হতবুদ্ধি করেছে। নিজস্ব পরিবেশে ব্যক্তির একটা বিশেষ রূপ নিশ্চয়ই থাকে। কিন্তু হেমিংওয়ে সেই রূপকে ফুটিয়ে তোলেন না। কেবল যে তাঁর চরিত্রগুলোই নির্বিশেষ তা নয়, কাহিনীও বহুলাংশে পরিবেশ ও পরিস্থিতি-নিরপেক্ষ। "অ্যাক্রস্ দি রিভার অ্যাণ্ড ইন্টু দি ট্রীস"-এর ঘটনাস্থল ভেনিস, যে শহরের সুপ্রাচীন আভিজাত্য সুবিদিত। উপন্যাসটির কাহিনী ঘটেছে এক আধুনিক হোটেলে এবং কাহিনীটিকে আধুনিক হোটেলে ঘটানোর ফলে লেখক ভেনিসীয় আভিজাত্যের পরিচয় দেবার ও তদ্দেশীয় পরিবেশে প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করবার দায় এড়িয়ে গেছেন অতি সহজে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ করে ভেনিসকে এ-কাহিনীর ঘটনাস্থল নির্বাচন করবার কোনও যুক্তিই খুঁজে পাওয়া যায় না। এ কাহিনী তো পৃথিবীর যে কোন কোণে যে কোন আধুনিক হোটেলেই ঘটতে পারত এবং তাতে কাহিনী বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হত না। হেমিংওয়ের চরিত্রগুলি তো বটেই, কাহিনীও অনেক সময় স্রোতের শেওলার মত—সেগুলির মূল কোথাও প্রোথিত নয়।

শিল্পী একটা ঘটনাকে অন্যান্য অনেক ঘটনার থেকে আলাদা করে তুলে ধরেন এ জন্যে যে তার একটা বিশেষ মূল্য তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। আরও অনেক ঘটনার থেকে তা তার অনন্যতায়, তার অপূর্বতায় স্বতন্ত্র। যেমন সেই ঘটনা তেমনই সেই ঘটনাতে অংশগ্রহণকারী

চরিত্রগুলি যথার্থতা লাভ করে তাদের আপন দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। সেজন্যে সেই ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েও তিনি অতৃপ্ত, নিজেকে সেই ঘটনাতে জড়িয়ে নেন কল্পনার সাহায্যে, সেই ঘটনার মর্মমূলে নিজে প্রবেশ করেন—যেন নিজেই তিনি সেই ঘটনাতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন চরিত্র। কিন্তু হেমিংওয়ে সমস্ত ঘটনাকে দেখতে চান সম্পূর্ণ নিস্পৃহভাবে, দূরে দাঁড়িয়ে থেকে। সেজন্যেই ষণ্ডযুদ্ধের "দুর্দান্ত মৃত্যু" তাঁকে সবচেয়ে বেশী টানে। সেই মৃত্যু যেমন তার সারল্যে স্বাভাবিক তেমনই সত্য হিসাবে নিতান্ত প্রাথমিক। রোগে মৃত্যু অথবা যাকে ভালবাসা বা ঘৃণা করা যায় তার মৃত্যু দর্শকের চিত্তে আবেগ জাগায়। কিন্তু ষণ্ডযুদ্ধে যে যায় সে যায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে। পূর্বের প্রস্তুতিবশে ওই "দুর্দান্ত মৃত্যু" দর্শকের চিত্তে অমন কোনও আবেগের জটিলতা জাগায় না, তাই সে মৃত্যুকে অস্ত্রোপচারকালে একজন অস্ত্রবিদ্যার ছাত্রের মত অবিচলিত শান্ত হৃদয়ে গ্রহণ করা সম্ভব।

হেমিংওয়ে চান যে মৃত্যুর মুহূর্তগুলি তাঁর বর্ণনাতে বন্দী হবে, মৃত্যু হুবহু যা ঠিক সেইরূপে, লেখকের আবেগের দ্বারা পরিবর্তিত না হয়ে—এক কথায় সম্পূর্ণ যথাযথভাবে। তাই "দি আনডিফিটেড" গল্পে মাহুয়েলের মৃত্যু লেখক বা পাঠক কাউকেই শোকে অভিভূত করে না। সে যে মারা যাবে এ কথাটা তার অন্তিম মুহূর্তের বহু পূর্বেই আমরা বুঝতে পারি। এবং গল্পটি শেষ করে পাঠকের মনে যে অনুভূতি জাগে সেটা তৃপ্তির। মাহুয়েল যে যোদ্ধা হিসেবে সার্থক, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রামে সে যে দৃঢ় ও অটুট থেকেছে, তৃপ্তিটা এজন্যেই। মৃত্যুর দিকে তার ধীর ও নিশ্চিত অগ্রগতিকে পাঠক সারাক্ষণ তারিফ করে। হেমিংওয়ের মৃত্যু-বর্ণনা একজন প্রথমশ্রেণী সংবাদদাতা-পরিবেশিত কোন উত্তেজনাময় ফুটবল খেলার নিখুঁত বিবরণ। "দুর্দান্ত মৃত্যু" সম্বন্ধে হেমিংওয়ে যে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন তার কারণ ওই প্রসঙ্গেই তাঁর লেখনী স্ফূর্তি পায়, মুক্তি পায়। যেহেতু চোখের উপর যা ঘটছে সেদিকেই তাঁর মন ও লেখনী নিবিষ্ট, তাই সাক্ষাৎ ঘটনার পূর্বে যা ঘটেছে বা পরে যা ঘটবে সে সম্বন্ধে হেমিংওয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। আর এজন্যে তাঁর চরিত্রগুলিও ঐতিহ্যশূন্য এবং ভবিষ্যৎশূন্য। সক্ষমের প্রতি অক্ষমের রোষে বিনষ্ট যুগের সন্তান জয়স্ ভুলতে চেয়েছিলেন তাঁর অতীতকে। কিন্তু ভুলতে পারেন নি। কেন না তিনি বাস করতেন চিরকালের জগতে। পক্ষান্তরে বর্তমানসর্বস্ব হেমিংওয়ে অত্যন্ত অনায়াসেই বলতে পেরেছেন, "মেমারি, অফ্ কোর্স, ইস্ নেভার ট্রু।"

আর তাই বর্তমানকে যথাযথরূপে বন্দী করার জন্যে তিনি যতখানি আগ্রহী, ঘটনার প্রস্তুতিসৃজনে ঠিক ততখানি তাঁর অনীহা। যে কোন জায়গা থেকেই তাঁর গল্প শুরু হতে পারে আবার যে কোন জায়গাতেই তাঁর গল্প সারা হতে পারে। গল্পের যেমন প্রস্তুতি নেই তেমনই পরিণতিও নেই। চোখের উপরে যা-যা ঘটল, যেটুকু ঘটল, তার বাইরে কিছু নেই, রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে কোন নেপথ্যজগৎ অনুপস্থিত। হেমিংওয়ে জানেন, মৃত্যু সর্বদাই আকস্মিক, তার আগমনে কোনও কার্য-কারণ নেই, জীবন অতি স্বল্পস্থায়ী, অপচয় করবার মত সময়ের সম্পূর্ণ অভাব। তাই, যত সংক্ষেপে সম্ভব, ঘটনাবলীর বিবরণটুকু পেশ করলেই লেখকের কর্তব্য সমাধা হয় অর্থাৎ ওইসব সংবাদের পটভূমি নির্মাণ ও পরিণাম প্রদর্শন করা, তাঁর কাছে নিছক সময়ক্ষেপ, নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। সত্য কেবল বর্তমানই, ক্ষণস্থায়ী জীবনে সেই বর্তমানের মধ্যে নিজেকে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে মানুষের সার্থকতা। নষ্ট করবার মত সময় নেই বলে হেমিংওয়ের উপন্যাসে ঘটনাকালও নিতান্ত সীমাবদ্ধ। ব্যতিক্রম কেবল "এ ফেয়ারওয়েল্ টু আর্মস্।" কিন্তু অন্যান্য প্রধান রচনার মধ্যে "ফর্ হুম্ দি বেল্ টোল্‌স্" প্রায় সাড়ে তিন দিনের ঘটনা; "টু হ্যাভ্ অ্যাণ্ড হ্যাভ্ নট্"-এর কাহিনী দুই দিনেই সম্পূর্ণ; প্রায় ওই একই ঘটনাকাল "দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী"-এরও; "অ্যাক্রস্ দি রিভার অ্যাণ্ড ইন্টু দি ট্রীস্" পুরো একদিনেরও নয়, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ঘটনা।

প্রবৃত্তিশাসিত চরিত্রসৃষ্টি, দেশ-কালের প্রভাবমুক্ত ছিন্নমূল কাহিনী, স্বল্পকালীন ঘটনা ও সেই ঘটনার প্রতি নিরাবেগ নিস্পৃহ দৃষ্টি এবং পরিশেষে অতীত সম্বন্ধে অস্বীকৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা তথা

বর্তমান-সর্বস্বতা, এ সমস্তই হেমিংওয়ের রচনাবলীকে সাংবাদিকতার লক্ষণাক্রান্ত করেছে। বাস্তবক্ষেত্রেও তিনি জীবনের প্রথম দিকে কিছুকাল সাংবাদিকের কাজ করেছিলেন। তাঁর শিল্পতত্ত্বের ভিত্তি হল সাংবাদিকতা। একজন সাংবাদিক বিভিন্ন ঘটনার সংবাদ সরবরাহ করে যান পরম্পরাক্রমে। তার ফলে অতীতের কোনও বিশেষ ঘটনার দ্বারা অভিভূত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জানেন আজ এখানে যা ঘটল কাল তা অন্যত্র ঘটতে পারে। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং সমস্তই ক্ষণিক, ঐহিক। সর্বক্ষণ তাঁকে কেবল বর্তমানের মুহূর্তগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও হেমিংওয়ের রচনা এক সময় সাংবাদিকতার সীমা অতিক্রম করে সাহিত্যের নিগূঢ় জগতে প্রবেশ করে। এখানেই তাঁর রচনার অনন্যতা।

জয়স্ কিংবা নিদেন টমাস মানের মত কোন ভূয়োদর্শন হতে তিনি বঞ্চিত, কিন্তু হেমিংওয়ে এক অনাবিল সহজিয়া দৃষ্টির অধিকারী, যার অনুগ্রহে জীবনের গভীর তলদেশ তাঁর কাছে সপ্রকাশ। সাংবাদিকতার লক্ষণে তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে প্রবল বিরোধ জয়সের, কিন্তু শিল্পতত্ত্বে উভয়ের বিরোধ যাই থাকুক না কেন, জীবনজিজ্ঞাসাতে তিনি জয়সেরই উত্তরসূরী। অবশ্যই উভয়ের ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসার রূপভেদ বর্তমান। হেমিংওয়ের কাছে জীবন এক প্রচণ্ড উত্তেজনাময় নাটক আর এই নাটকের প্রধান দুটি চরিত্রের একটি হল বাঁচা আর একটি মরা। তিনি কিছুই করেন না, এই দুটি চরিত্রের বিচিত্র টানাপোড়েনে কেমন করে জীবনের মহান্ নাটক বোনা হচ্ছে শুধু সেটাকেই ধীরে ধীরে পাঠকের সামনে খুলে ধরেন। ষণ্ডযুদ্ধে তাঁর আগ্রহ তাই অর্থ বদলে হয়ে ওঠে জীবনের স্বরূপ-সন্ধান। ওই ষাঁড়, যাকে স্পেনীয় ভাষাতে বলে "ফেনা," হল মৃত্যুশক্তি আর ষণ্ডযোদ্ধা বা "ম্যাটাডোর" হল জিজীবিষা, বাঁচার বাসনা, মৃত্যুর উপরে অধিকার বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা। এই বাঁচা আর এই মরা বিভিন্ন রচনাতে বিভিন্ন সাজে উপস্থিত, সর্বদা "ফেনা" ও "ম্যাটাডোর" রূপে আসে না। তাই তাঁর রচনাতে যখন কোন চরিত্রের মৃত্যু হয় তখন তা কেবল একটা মৃত্যু নয়, কেবল হৃদ্‌স্পন্দনের বিরাম নয়, কেবল অন্তিম শ্বাসপতন নয়, সে মৃত্যু একটা অপূর্ব মহিমা, তার দ্বারাই বিকশিত হয় চরিত্র, পরিপূর্ণতা লাভ করে। সেই মৃত্যুই অসামান্য করে তোলে একজন সামান্য মানুষকে। "এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্" এবং "ফর্ হুম্ দি বেল্ টোল্‌স্"-ই তাঁর সর্বাপেক্ষা খ্যাতিসম্পন্ন উপন্যাস অথচ তাঁর সমগ্র রচনাবলীতে "এ ফেয়ারওয়েল্ টু আর্মস্"-এর নায়িকা ক্যাথারিনের মৃত্যুই বোধ হয় একমাত্র সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও অর্থহীন মৃত্যু। পক্ষান্তরে অপর উপন্যাসটির নায়ক জর্ডনের মৃত্যু পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে, প্রেরণা দেয়। জর্ডনই ওই উপন্যাসে "ম্যাটাডোরে"র ভূমিকাতে অবতীর্ণ। আর "ম্যাটাডোরে"র মৃত্যু তার সাহস ও বীরত্ব সব সময়েই আমাদের পৌঁছে দেয় এক গৌরবময় উপলব্ধিতে।

অর্থাৎ আমার বক্তব্য এই যে, হেমিংওয়ের মহত্ত্ব নিহিত আছে মানুষের গৌরব উদ্ধারের জন্যে তাঁর আন্তরিকতায়। ষণ্ডযুদ্ধে তাঁর আগ্রহের কারণ তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন: "সরলতম আর সবচেয়ে প্রাথমিক সত্য হল দুর্দান্ত মৃত্যু।" এই মৃত্যুকে যখন তিনি প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁর মনে হয় যেন সময়ের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। কেন না সেই মুহূর্তটি বাঁচা এবং মরার অতীত একটা লগ্ন। তখন অনন্ত হয়ে ওঠে সেই একটি মুহূর্তই। কলি ফুল হচ্ছে, ফুল ফল হচ্ছে, আবার ফল হচ্ছে বীজ, এই পরিবর্তনগুলো দেখেই আমরা বলি যে সময় বয়ে চলেছে। সময় মানুষের মননগ্রাহ্য একটা সত্য, যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় একমাত্র বাহ্য পরিবর্তনেই। বাঁচা ও মরার অন্তর্বর্তী সেই অনন্ত মুহূর্ত চলে যায় পরিবর্তমানতার উর্ধ্বে। অবশ্য এই অপরিবর্তমানতা বা এই অমরতা, সময়ের সম্বন্ধে মানুষের কল্পনার মতই, হেমিংওয়ের আপন চিত্তপ্রসূত। কেবল "দুর্দান্ত মৃত্যু"র মুখোমুখি হলেই তাঁর চিত্তে কল্পনার পাখা জাগে, তখন তিনি সাহিত্যের আকাশে উড়ে যান—নীচে পড়ে থাকে সাংবাদিকতার মাটি। কিন্তু ওই "দুর্দান্ত মৃত্যু" যে কিঞ্চিৎ বর্বরোচিত ও স্থূল, এমন সন্দেহ সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক নয়।

"দি স্নোজ অব কিলিমাঞ্জারো"র নায়ক "যুদ্ধ ও শিকারে"র মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে না পেলেও সে কোন গভীর জীবনদর্শনে উপনীত হতে পারে নি।

হেমিংওয়েও পারেন নি। তাঁর জিজ্ঞাসা আছে, জীবনের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আছে। কিন্তু কোনও ফলশ্রুতি পাঠক তাঁর রচনা থেকে সংগ্রহ করে নিতে পারে না। "ফর্ হুম দি বেল টোল্‌স" ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে প্রচুর ইন্ধন যুগিয়েছে বটে, কিন্তু ওই বিরোধিতাতে উপন্যাসটি যে পরিমাণে আবেগমূলক সেই পরিমাণে বিবেচনাপ্রসূত নয়। বরং ওই উপন্যাসের একমাত্র বিবেচক চরিত্র পাবলোকে লেখক এঁকেছেন ভীরুতার রঙে, ফলে এ কথা বইটি পড়লে মনে হবেই যে ভীরুতা হল বিবেচনার রূপান্তর। তদুপরি ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রেরণা দিলেও কেন এ যুদ্ধ করা উচিত তার সদুত্তর লেখক দেন নি। হেমিংওয়ে আমাদের যুদ্ধে আহ্বান করেন অথচ কেন এই যুদ্ধ অথবা যার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ তার স্বরূপ কী, তা তিনি পাঠককে জানাতে নারাজ।

অবশ্য এটা আমরা টের পাই যে ওই সংগ্রাম জীবনেরই আনন্দিত স্বীকৃতি : আত্মপ্রসারণ—যেমন ভাবে সূর্যের পানে বৃক্ষ আপনাকে মেলে দেয়। "দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দি সী" হল এই স্বীকৃতিরই কাহিনী। বিশাল অপার সমুদ্রে ওই নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ যখন মাছটার প্রতি এক দুর্জ্ঞেয় দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেছে তখনই সেই প্রেমোপলব্ধিতে শিকারী এবং শিকার একসত্তা হয়ে গেছে। কিন্তু বৃদ্ধের ট্র্যাজেডি এই যে, যাকে সে ভালবাসে তাকেই সে হত্যা করে। এটা যেন তার অনতিক্রম্য অমোঘ নিয়তি। বৃদ্ধের সমস্ত সৎপ্রয়াস ও অনবদ্য বীরত্ব এই নিয়তির প্রতিই একান্ত অনুগত। এখানে "ফেনা" এবং "ম্যাটাডোর" একই সত্তার দুটি দিক, দুটি শক্তি। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু সে পরাজয় পাঠকের চিত্তে করুণা জাগালেও নিরাশা জাগায় না। বরং আমরা সারাক্ষণ বৃদ্ধের একাকী মরিয়া সংগ্রামে মুগ্ধ হয়ে থাকি এবং সে যখন ঘরে ফিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সিংহের স্বপ্ন দেখে তখন আবার ফিরে পাই উৎসাহ ও উদ্যম।

হেমিংওয়ের রচনার গুণ এই যে, তা সর্বদা পাঠকের চিত্তে নতুন সাহস সঞ্চার করে, প্রয়াসে প্রণোদিত করে। যেমন করে আঁদ্রে মালরো বা আলবের কামুর রচনা। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, হেমিংওয়ের রচনা আমাদের যুক্তিবোধ ও বিচার-চেতনাকে পরিপুষ্ট করে না। নিছক বীরত্বের জন্যে বীরত্ব অর্থহীন। তার সঙ্গে কিছু মহৎ উদ্দেশ্য, অন্ততঃ কিছু মানবিক ভাবনা-চিন্তা থাকা উচিত। জর্ডনের সাহস ও কর্তব্যপরায়ণতা আমাদের শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে। কিন্তু সে তো বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একজন। অথচ তার চরিত্রে শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য কোথাও পরিস্ফুট হয় নি। বরং তার সমস্ত কার্যকলাপ, আচার ও আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এক মূঢ় একগুঁয়েমি। তাকে কখনও বুদ্ধিজীবী বলে মনে হয় না। হেমিংওয়ের সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে এই একটি চরিত্রেও যদি কিছুটা মননশক্তি সক্রিয় হত তা হলে তাঁর রচনার স্থূলতা সম্বন্ধে অভিযোগকে খাটো করে আনার একটা সুযোগ পাওয়া যেত। শুধু বীরত্বের জন্যে হেমিংওয়ের ওকালতিতে কান দিলে ফ্যাসিস্টদেরও তাদের বীরত্বের জন্যে মর্যাদা দেওয়া উচিত। কিন্তু হেমিংওয়ে তাদের সেই মর্যাদামণ্ডিত করতে নারাজ।

প্রকৃতপক্ষে হেমিংওয়ের প্রায় প্রতিটি চরিত্রই চিন্তাশক্তি থেকে শোচনীয়ভাবে বঞ্চিত, এমন কি বুদ্ধিজীবী জর্ডনও, তারা স্থূল ও প্রবৃত্তিবশ। তবুও তারা যখন বিপদের সামনে বুক ঠেলে এগিয়ে যায়, তারা যখন যুদ্ধ করে, মৃত্যুর চোখে চোখে তাকায়, তখন তারা প্রত্যেকেই অসামান্য, প্রত্যেকেই অসাধারণ। সেই মুহূর্তে চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ অবয়ব পায়, তারা পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়। তাদের কাছে ওই পরম মুহূর্তে সামাজিক আচরণ, পূর্বতন সংস্কার, সভ্যতার রীতিনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই অনর্থক অবান্তর হয়ে যায়। হেমিংওয়ের প্রাতিস্বিকতাবাদ সার্থক। তাই তাঁর নায়কেরা নাস্তিক ও নিঃসঙ্গ। আর এটাও কৌতুককর যে তাঁর নায়কেরা সকলেই মার্কিন হলেও বোধ হয় একজন নায়িকাও মার্কিন নয়।

প্রথম মহাসমরের ফলে পশ্চিমী মানসে মূল্যবোধের সার্বিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং তৎকালে সচেতন তথা সংবেদনশীল মানুষদের আর্তি সাহিত্যে প্রথম সার্থক রূপ পেয়েছিল জয়সের উপন্যাসে এবং এলিয়টের কাব্যে। বলা চলে আধুনিক সাহিত্যের এঁরাই কুলগুরু। এঁদের অনুভূতি উত্তরাধিকার করেছেন হেমিংওয়ে। একালের প্রধান লক্ষণ অবিশ্বাস ও অসহায়তার দ্বারাও তিনি আক্রান্ত। তাই জর্ডনকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে একজন সৈনিকরূপে খাড়া করলেও এটা বোঝাতে পারেন নি যে সে কিসে বিশ্বাসী। আর সেই বৃদ্ধ অন্তহীন সমুদ্রে আক্ষরিক অর্থেই অসহায়। হেমিংওয়ের আদর্শ চরিত্র বা নায়ক কখনই যথেষ্ট বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন নয়, তাদের দুঃসাহসিকতার পেছনে আদিম অজ্ঞানতার অভাবও নেই, এই সমস্ত স্থূলতার সঙ্গে একালের নাস্তিকতা ও নিঃসঙ্গতাকে হেমিংওয়ে মিলিয়ে দিয়েছেন অপূর্ব নৈপুণ্যে। এবং তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সম্বন্ধে এটাই সবচেয়ে বড় কথা যে তিনি সকলকেই দুর্লভ অনন্ত মহত্ব দান করেছেন, তারা সকলেই প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামে মহৎ।

গ্রন্থ-পরিচয়

কবি শান্তি পালের পল্লীকাব্য : পল্লী-পাঁচালি, গাঁয়ের মাটির গান, চলতি পথের গান ইত্যাদি : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা-৩৭।

বাংলা কাব্যের দ্রুত প্রগতির যুগে পেছনে দৃষ্টি ফিরিয়ে পল্লীকাব্য সম্বন্ধে কিছু বলাটা কেউ কেউ হয়তো সাহসের কথা বলে মনে করবেন। কাব্য সম্বন্ধে এ কথা প্রযোজ্য হলেও গল্প-উপন্যাস-সাহিত্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাংলার গল্প-উপন্যাস-সাহিত্য আজও অতিমাত্রায় পল্লীকেন্দ্রিক। এর কারণ কাব্য-সৃষ্টি করে যে মন সে মন আজ নগরকেন্দ্রিক ও হৃদয়বিলাসী এবং অনেক ক্ষেত্রে মননশীল। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে পল্লীপ্রাণকে স্পন্দিত দেখতে আমরা আজও বেশী ভালবাসি।

বাংলার পল্লী আজ শ্রীহীন—অনেকদিনই শ্রীহীন। তার দীঘিতে পচা পানা, জমিতে কচুবন আর আগাছার জঙ্গল, বাতাসে রোগের বীজাণু, সন্ধ্যায় ম্যালেরিয়ার মশার ঐকতান। প্রকৃতি সেখানে বিপথগামিনী কুলকন্যার মতন প্রতিষ্ঠাহীনা।

পল্লীসমাজও শ্রীহীন। দারিদ্র্য, নীচতা, হতাশা, ব্যাধি ও ঈর্ষায় জীবন সেখানে জর্জরিত। সাহিত্যে পল্লীসমাজের যে চিত্র পাই তাতেও এই দিকগুলি যেমন করে ফলিয়ে দেখানো হয় জীবনের সুন্দর দিকটি তেমন ভাবে দেখানো হয় না। ভীরুতা ও কুসংস্কার যেখানে মনুষ্যত্বকে অনেকাংশেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেখানকার প্রত্যক্ষচিত্রণ যতই বাস্তব ও নিখুঁত হোক না কেন—মনের অনেকটাই ফাঁক থেকে যায়।

প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যে জগৎ ও জীবনের বাস্তব রূপায়ণই যথেষ্ট নয়। ঐ সঙ্গে আদর্শ-রূপায়ণের ইঙ্গিত যদি না থাকে, যদি না থাকে বাস্তবের সোপানে পা রেখেও তাকে উত্তীর্ণ-হওয়া অন্য এক সাক্ষাৎকারের স্তর, যদি না থাকে বাস্তব প্রতীতি থেকে প্রতীয়মানান্তরের ব্যঞ্জনা তা হলে সে সাহিত্য সম্পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। এ কথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বহু মনীষী বলে গেছেন, প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য ভারাক্রান্ত করতে চাই নে। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে সাহিত্যিক আদর্শের সম্পূর্ণাঙ্গ রূপটি চোখের সামনে রেখে হৃদয়ে উপলব্ধির সত্যতায় প্রতিষ্ঠিত রেখে বাস্তবের অনুচিত্রণ করণীয়। পল্লীসাহিত্যই হোক আর নগরসাহিত্যই হোক—পল্লীজীবনের রূপায়ণই হোক আর নগরজীবনের রূপায়ণই হোক—সব কিছুরই সাহিত্যক উৎকর্ষ-অপকর্ষের মানদণ্ডরূপে বাস্তব ও আদর্শের সুসমঞ্জস রূপটিকে মেনে নিতেই হবে।

কবি বা সাহিত্যিকের মানসপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে এই আদর্শরূপায়ণ। অনেকে অতীত কালের ইতিহাসের আশ্রয়ে গড়ে তোলেন জীবনের সম্পূর্ণ রূপটি—বর্তমানের ধূলিমলিন পরিবেশ থেকে সরে যান কালের সম্মার্জনী-বিধৌত ঐতিহ্যের পরিস্কৃত অঙ্গনে যেখানে সুদূরের মোহ হয়ে ওঠে দৃষ্টিদীপের জ্যোতি। কেউ বা মরমীচেতনার সন্ধ্যালোকে রঙের ছোঁয়া লাগিয়ে যান সমস্ত বাস্তব অভিজ্ঞতার কঠিন রুক্ষতায়। কেউ বা আশার শুক-তারাটিকে অনাগত প্রভাতের আমন্ত্রণ-লিপিরূপে অঙ্গীকার করে যান। কেউ বা জীবনের সহজ সরল রূপটিকে সমস্ত দার্শনিকতার কিংবা তীক্ষ্ণ বাস্তবিকতার মোহজাল থেকে উদ্ধার করে সুস্থ জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। পল্লীকাব্য লিখে যাঁরা যশস্বী হয়েছেন তাঁরা এই পথেরই পথিক। পল্লীজীবনের সহজ সরল রূপটিকে এবং পল্লীপ্রকৃতির অজস্র উদার সৌন্দর্যকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন এবং প্রত্যক্ষ করান। কবি শান্তি পালও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বলা বাহুল্য, বিশেষ একটি দেশের বিশেষ একটি অংশকে বেছে নেওয়ায় বেশ খানিকটা সীমাবদ্ধতা এসে পড়েই এবং যে একতারা বাউলের হাতে মানায়, সে একতারা ঐকতানের নায়কের হাতে মানায় না, এটুকু স্বীকার করে নিয়েই পল্লীকাব্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করতে হবে। বাংলা দেশের প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপটিই পল্লীকবির কথায় তুলিকাপাতে জীবন্ত হয়ে উঠবে, এই-ই স্বাভাবিক।

এখানে প্রকৃতিকে আস্বাদন করা হয়েছে কোন গভীর বা নিবিড় ঐক্যানুভূতির দ্যোতক হিসাবে নয়। এখানে প্রকৃতিচিত্রণের মধ্যে আমরা খুঁজব না কোন রহস্যময় লোকের আনন্দিত অবস্থান, কিংবা কোন শিক্ষাদাত্রী জননী বা ধাত্রীমূর্তিকে। বাংলার প্রকৃতি তার ঋতুসম্ভার নিয়ে, তার বর্ষাঋতুর সৌন্দর্যাবলীকে বিশেষ ভাবে নিয়ে, তার ফুলের বৈচিত্র্য, ফলের রসাঢ্যতা, নদী-দীঘির নীরের স্বাদুতা নিয়ে এবং তার পাখিডাকা ছায়াঢাকা গ্রামগুলিকে নিয়ে যেখানে শান্তভাবে কালহরণ করছে সেইখানে পল্লী-কবি তাঁর চারণগান গেয়েছেন। তার যে বর্ষার প্রচণ্ডতা সে শুধুই মাটিকে উর্বরা করে তোলবার জন্য। তার কালবৈশাখীর প্রচণ্ডতা কোন সর্বাঙ্গীন জীবন-চেতনায় উন্নীত না হয়েও গ্রাম্যজীবনের বৈচিত্র্যবিধায়ক একটি সুন্দর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

শ্রীশান্তি পালের পল্লীসমাজও সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ নয়। সেখানে চাষী ভাগচাষী কিষাণ, ছুতোর তাঁতি গাড়োয়ান, জেলে ধোপা নাপিত, কামার কুমোর ঘরামী, মাল মালী মালাকর ইত্যাদি কেউই অসুস্থ মনোবৃত্তিসম্পন্ন নয়, প্রত্যেকেই আপন জীবিকার বিশেষ ধারাটিকে গ্রহণ করেছে গৌরবের সঙ্গে, উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ বৃত্তিকে হেয় জ্ঞান করে নি। এই প্রসঙ্গে 'গাঁয়ের মাটির গান' কাব্যে সংকলিত কবিতাগুলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করছি। কবি নিজে তাদের সঙ্গে এমন একটি ঐকাত্ম্য অনুভব করেছেন যা তথাকথিত পল্লীকবিতায় দুর্লভ। একদা রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ঐকতান" কবিতায় আক্ষেপোক্তি করেছিলেন যে তিনি তাঁর জীবনযাত্রার বেড়াগুলি ডিঙিয়ে কিষাণমজুরের সঙ্গে অন্তর মেলাতে পারেন নি এবং সে জন্য তাঁর কাব্যে সুরলক্ষ্মীর যে অপূর্ণতা হয়েছে তার জন্য তিনি সঙ্কোচ বোধ করেছেন—বলেছেন যে তাঁর কবিতা বিচিত্রগামিনী হয়েও সর্বত্রগামিনী হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে কাব্যের পসরা ভরিয়ে তোলার মধ্যে ফাঁকি আছে। ভঙ্গিসর্বস্ব সাহিত্যের ভণ্ডামি বা চুরিকরা খ্যাতির লোভ যেন সাহিত্যসৃষ্টিকে আবিল করে না তোলে। শহরে বসে যাঁরা পল্লীলক্ষ্মীর রূপধ্যান করেন পল্লী-পাঁচালির কবি তাঁদের দলের নন। তিনি চাষী মজুরদের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের সুখ-দুঃখে সমব্যথী হয়েছেন এবং তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিচিত আছেন। এ কথা 'গাঁয়ের মাটির গান' তথা 'পল্লী-পাঁচালি'র কবিতার ছত্রে ছত্রে সুস্পষ্ট। কবি এমন একটি পল্লীপরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যেখানে দাঁড়িয়ে মাটির সুঘ্রাণ বুক ভরে গ্রহণ করতে দেরি হয় না এবং যেখানকার লোকেদের মুহূর্তে আপনার দেশের লোক বলে চিনে নিতে দেরি হয় না।

তাঁর কাব্যে পল্লীর এই জীবনচিত্রণের বাস্তবিকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনকালের গ্রামের জীবনাদর্শের ভাবসম্মিলন পাঠকমাত্রকেই তৃপ্তি দেবে এ কথা নিঃসন্দেহ। শুধু তার পূর্বে মেনে নিতে হবে পল্লীকবিতার প্রয়োগ-সীমাকে এবং পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীসমাজের বিশিষ্ট রূপটিকে।

সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার যে আনন্দ একদা গ্রাম্য-জীবনে পরিস্ফুট ছিল, কোনও বড় বড় বুলিচাল নয়, কোনও অহেতুক অথচ তীব্র মানস-বিলাস নয় কিংবা ঈশ্বর প্রেম ও প্রাচীন সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে অবিশ্বাস, পরিহাস ও ঘৃণাসংশয় নয়—শুধু মাত্র খাঁটি খাবার, মুক্ত আকাশ, স্বাদু নীর ও গাছের শীতল ছায়া দিয়ে যে জীবন শান্ত পরিবেশে ক্রমশ পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েছে তারই একটি চিত্তাকর্ষক ও ভাবগ্রাহী প্রত্যক্ষ চিত্রণ এই কবিতাগুলিকে সুন্দর করে তুলেছে। বাংলা প্রকৃতির যে রূপ ভীষণে ও মধুরে, প্রেমে ও প্রতীক্ষায়, আত্মমর্যাদা ও গৌরবে বাংলার লোকজীবনকে দৃঢ় ও সুসম্বদ্ধ করে তুলেছিল তারই ওজস্বিতাপূর্ণ প্রকাশ 'পল্লী-পাঁচালি'র কয়েকটি কবিতাকে চিরদিনই রসিকজনের গ্রাহ্য করে রাখবে।

ভাষার বলিষ্ঠতায়, ছন্দের যথোপযোগী স্পষ্টতায় ও নূতনত্বে কবি স্বপ্রতিষ্ঠ। পল্লীজীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবির জীবনাদর্শ এবং এই আদর্শ তাঁর কবিতাগুলিতে খুব বলিষ্ঠ ভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাগুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(১) বাংলার ঋতুরঙ্গ
(২) বাংলার উৎসব
(৩) বাংলার নিম্নবৃত্তি সমাজ

(৪) বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

(৫) বাংলার মেয়ে—একাধারে ওজস্বিনী ও সুললিতা

(৬) বাংলার বাচখেলা, লাঠি-ছুরি-অসিখেলা প্রভৃতি শিক্ষামূলক সামাজিক প্রথা

(৭) প্রেমের কবিতা

(৮) দেশপ্রেমের কবিতা

(৯) শিশুকবিতা

কবির মানসপ্রকৃতির অনুকূল বলে এগুলির মধ্যে বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন বিষয়ক কবিতাগুলি স্বকীয় বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল ও কাব্যসৃষ্টি হিসাবে সার্থক।

কবিতাগুলি পড়তে পড়তে কয়েকটি স্থলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাষার দিক দিয়ে বলতে গেলে একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে 'পল্লী-পাঁচালি'র কবির রচনা-শৈলীর উপর সত্যেন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তবে এ কথা ঠিক যে, এই প্রভাব বাইরে থেকে আরোপিত নয়। কবি শান্তি পাল কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে বহুকাল কাটিয়েছেন এবং সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষ ভাবেই তাঁর কাব্যের রসগ্রহণ করবার সুযোগও পেয়েছেন। তাই কবির মানসসংস্কার যদি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভাবিত করে থাকেন তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এ কথা বলাতে হানিকর কিছু নেই। সত্যিকারের কবি যিনি তিনি যেমন দান করতে পারেন তেমনই গ্রহণও করতে পারেন। স্বকৃত প্রশস্তিজাতীয় কবিতার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ যেমন তত্ত্বরসিক ও তথ্যবিলাসী ছিলেন, তাঁর থেকে 'পল্লী-পাঁচালি'র কবি মুক্ত। সাহিত্যের ভাষা ইচ্ছে করে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। প্রাণের যে আবেগে রসের প্রবাহ বহে যায়, সেই আবেগই ভাষার রূপটিই ঠিক করে দেয়। ভাষা ব্যবহারের এই বিশিষ্ট শৈলী বাইরে থেকে আরোপিত কিংবা ভিতর থেকে উৎসারিত তার প্রমাণ কবিতার থেকেই মেলে। বলা বাহুল্য 'পল্লী-পাঁচালি'র কবির ভাষা তাঁর প্রাণের আবেগেই স্বকীয় রূপটি গ্রহণ করেছে। তাঁর "ফুল-মুলুকের গান" কবিতায় এর যথেষ্ট প্রমাণ মিলবে।

পরিশেষে তাঁর ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। কবি গদ্যছন্দে কোন কবিতা রচনা করেন নি। অধুনা গদ্যছন্দের জয়যাত্রার তালে তালে সমানে পা ফেলে চলেন নি বলে তাঁকে কৃষ্ণবর্ণে চিহ্নিত করবার কোনও হেতু নেই। গদ্যছন্দ ও পদ্যছন্দের প্রধান পার্থক্য অন্তঃস্পন্দ বা রিদম্-এর অনিয়মিত বা সুনিয়মিত পরিবেশনের মধ্যে নিহিত। মিলের কথা বাদ দিলেও চলে কারণ প্রাচীন কালের আলঙ্কারিকেরা ওটিকে তো অনুপ্রাসের রকমফের বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অন্তঃস্পন্দের সুনিয়ন্ত্রিত, পরিমিত এবং সদৃশ পরিবেশনকে আমরা পর্বপর্বাঙ্গগত পদ্যছন্দ বা মিটার বলতে পারি। কোন্ কবি তাঁর কোন্ কবিতায় ছন্দের বা অন্তঃস্পন্দের কোন্ রূপটি গ্রহণ করবেন সেটি তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ভাষা সম্বন্ধে যে কথা প্রযোজ্য ছন্দ সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। প্রাণের যে আবেগ রসের প্রবাহকে ও শব্দের নির্বাচনকে বিশিষ্টতা দান করে, ছন্দের রূপটিকেও সে-ই নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং তিনি ছন্দান্তরের সাহায্য নিলেন না কেন এ কথা বলা হাস্যকর। "পল্লী-পাঁচালি"র কবি যদি তাঁর সমস্ত অন্তর্বেদনাকে ও মর্মরিত আনন্দকে সুনিয়ন্ত্রিত পর্বপর্বাঙ্গ-পরিমিত ছন্দে প্রকাশ করে থাকেন তা হলে তার অর্থ এই যে এ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারত না। যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা প্রত্যেকেই জানেন যে কবিতা লেখবার মুহূর্তে তাঁরা যন্ত্র ছাড়া কিছুই নন, রসাবেগ, শব্দনির্বাচন ও ছন্দোনির্ণয়—কিছুই তাঁদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। একটি আবেগময় মুহূর্তে তা স্বতঃই আপন সৌন্দর্য-সম্ভার নিয়ে উপস্থিত হয়।

শ্রীউমা দেবী

সাগরে হাওরে : শেফালি নন্দী। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা পঞ্চাশ ন. প.।

'সাগরে হাওরে' একটি উপন্যাস। গ্রন্থের লেখিকা শ্রীযুক্তা শেফালি নন্দী কয়েকটি অনুবাদ-গ্রন্থ ও ভ্রমণ-কাহিনী রচনা করে সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচিতি লাভ করেছেন। এটি তাঁর প্রথম মৌলিক সৃষ্টিধর্মী রচনা বলে মনে হয়। উপন্যাসের কাহিনী পূর্ববঙ্গের এক শহর (কাল্পনিক নাম রাজপুর), কলিকাতা ও পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ইংলণ্ডের এক শিক্ষা-শহরকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের হাওরে (সুবিস্তৃত জলময় নিম্নভূমি) যে উপন্যাসের শুরু তা শেষ হয়েছে সমুদ্রের দূর-বিসর্পিত বিস্তারের মধ্যে। একটি মেয়ের (কমল) নানা বাধা-বিপত্তি আর অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে,

আত্ম-আবিষ্কার আর আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী এই 'সাগরে-হাওয়ে' উপন্যাসখানি।

কমলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখিকা অতি সুকৌশলে বর্তমান যুগোচিত স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার তত্ত্ব ও নারীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকৃতিদান করেছেন। কমল লেখা-পড়া জানা মেয়ে। তার ছেলেবেলার সাথী অরুণ তাকে ভালবাসে ও তাকে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পেতে চায়। কিন্তু কমল আর পঞ্চাশটি বাঙালী পরিবার যে জীবনপ্রণালীতে অভ্যস্ত তাতে আস্থাশীল নয়; সে স্বামী-স্ত্রীর তুল্য মর্যাদায় বিশ্বাস করে এবং অরুণকেও ওই আদর্শের সহযাত্রীরূপে দেখতে চায়। অরুণের আজন্ম-লালিত সংস্কারে ঘা লাগে, কমল অরুণকে আপন জীবন-নিয়তির বেষ্টনী থেকে মুক্তি দেয়। উচ্চশিক্ষিতা কমল স্কলারশিপ নিয়ে বিলাতে পড়তে যায়, সেখানে জার্মান ছাত্র ফ্রেডারিক কাউয়েনের সঙ্গে তার হৃদয়-বিনিময় হয়। এই প্রেম বিবাহে পর্যবসিত হতে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু কমল তার অন্তর্তাগিদের বশে সেই মধুর পরিণতি-সম্ভাবনা থেকেও নিজেকে মুক্ত করে নিল। ভারতবর্ষের প্রতি কঠোর কর্তব্য ও তার সুনামের প্রতি মমত্ব বশতঃ কমল কাউয়েনকে ভালবেসেও তার জীবনপথ থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে নিল। অতিশয় বেদনাদায়ক ওই বিচ্ছেদ, তবু তা আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় দৃপ্ত বলে গভীর সান্ত্বনারও উৎস।

লেখিকার ভাষা ঝরঝরে, পরিপাটি, সংযত। বেশ একটা আন্তরিকতা আছে বর্ণনা-ভঙ্গীর মধ্যে। হয়তো উপন্যাসের বাঁধুনি কিঞ্চিৎ শিথিল, ঘটনার ধারা সরল, তা হলেও পড়তে কোথাও উৎসাহ মন্দীভূত হয় না। বইটি পড়ে পাঠক-সাধারণ আনন্দ পাবেন এই নিশ্চয়তা দিতে পারি। ন. চ.

উছল সবুজ—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা ৩৭, দুই টাকা।

অনেকগুলি বলিষ্ঠ এবং সহজবোধ্য কবিতার সংকলন এই "উছল সবুজ"।

বর্তমান বাংলা কবিতার মধ্যে দুটি জিনিসের অভাব প্রায়ই পীড়া দেয়—সমাজসচেতনতা এবং প্রকৃতিপ্রেম। এই দুটি বিষয় অবলম্বন করেই আলোচ্য গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচিত। প্রথম শুরু হয়েছে আগামী কালের প্রভাতের প্রত্যাশা নিয়ে—

"যে নতুন জন্ম নেবে ধরণীর ঘরে ঘরে
আগামী প্রভাতে
আকাশে বাতাসে তারি কানাকানি চলে আজি
চৈত্রশেষ রাতে।"

এবং এই শেষ রাত—

"যুগে যুগে ফেলে যায়
নতুন প্রভাত,
শতাব্দীর পুরাতন চলে যায়—রেখে যায়
নূতন সাক্ষাৎ।" (শেষ রাত)

এই বলিষ্ঠ প্রত্যাশা বহু কবিতায় প্রকাশিত।

উৎপীড়িত মানুষের কাছে কবির প্রশ্ন—"তোরা কি সইবি আজো ওদের নির্যাতন?"

প্রকৃতি-প্রেমের কবিতাগুলির আংশিক উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

"আলোয় আলো! এই আলোকে আজ আমাদের শরৎরাণী
ধুইয়ে দিল ধরার আলো, মুছিয়ে দিল মনের গ্লানি।"
(শারদশ্রী)

অথবা—

"শাল পিয়াল ও তালী-বীথির কুঞ্জে ছাওয়া সকল গাঁ,
সন্ধ্যারাতে শুনছি কত দূর অদূরের মাদল-ঘা।
ঝাউ-জারুলের ঝোপের নীচে আঁধার আলোর চলছে নাচ
প্রান্তরে ঐ শ্যামল শোভায় দাঁড়িয়ে আছে ভুট্টাগাছ।
(রাঙামাটির দেশ)

উদ্ধৃতিগুলি থেকে একটি প্রকৃত কবিমনের স্পর্শ পাওয়া যায়। কবিতার ক্ষেত্রে এই স্পর্শটুকুই মোট লাভ।

"উছল সবুজ"-এর বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। কবির দুটি মূল সুরকে পাঠকের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করলাম শুধু।

কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ ভাল লেগেছে। প্রচ্ছদ ও ছাপা সুন্দর। সত্যিকার কাব্যরসিকদের কাছে "উছল সবুজ" সমাদৃত হবে বলেই ধারণা।

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৫-২৮৩৬

৩১শ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

ফাল্গুন
১৩৬৫

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদা টলস্টয়-বুনিন-সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে তাঁহার শেষ চিঠির শেষে যেরূপ বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলাম তিনি আবার কিছুকাল গা-ঢাকা দিবেন। তাই অদ্য (২২.৩.৫৯) এই মাত্র তাঁহার এক দীর্ঘ পত্র পাইয়া চমকিত হইতে হইল। দেখিতেছি তিনি সংবাদ-মন্দিরের অভ্রচুম্বী পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া "লালাচ্ছন্ন" দালাই লামার লাসায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রাসাদ পোটালার ঠিকানা হইতে পত্র প্রেরিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :

"ভায়া হে, হিমালয়-বেষ্টিত এই যক্ষপুরীতে পলিটিক্সের সঙ্গে ধর্মের কী নিগূঢ় সম্পর্ক তাহা আমার বর্তমান ঠিকানা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। সম্প্রতি দিল্লীতে প্রদত্ত শ্রীনেহরুর ভাষণে এবং দৈনিকে প্রকাশিত টুকরা টুকরা খবর পাঠে নিশ্চয়ই আন্দাজ করিয়াছ, তিব্বতের শান্তি বিঘ্নিত, প্রাচীন পর্বত বিচলিত হইয়াছে। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে মাস কয়েক পূর্বেই (আশ্বিন, ১৩৬৫) আমি 'আরব্য-উপন্যাসের দেশ' প্রসঙ্গে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, যে-বৃদ্ধ-চীন সিন্দবাদ-তিব্বতের ঘাড়ে চাপিয়া পায়ের চাপে তাহার দম বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছে সেই 'বুড়াকে নেশায় বেহুঁশ করিয়া মাটিতে ফেলিতে ও পাথরের ঘায়ে তাহার মাথা ভাঙিতে সিন্দবাদের বেশীদিন লাগিবে না।' আসলে তিব্বতীদের মধ্যে অশান্তি ধূমায়িত হইতেছে, লালাচ্ছন্ন দালাই লামার অসহায় আত্মনিবেদনে লোকে বিহ্বল ও ব্যথিত। তাহারাই সংবাদ হইতে আমাকে ধরিয়া আনিয়া মুখপাত্রস্বরূপ দিল্লীতে শ্রীনেহরুর পরামর্শ লইতে পাঠাইয়াছিল। যেদিন ভোরে যাত্রা করি সেই দিনই আমি দিল্লী পৌঁছি এবং দিল্লীর কাজ সমাপনান্তে সেই দিনই বেলা দেড়টা নাগাদ বাংলাদেশে আমার একমাত্র উপাস্য পুরুষ—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্তিকে প্রণাম নিবেদন করিতে কলিকাতার গোলদীঘিতে উপস্থিত হই। এই দীর্ঘ দুর্গম পথ এই স্বল্পকালে অতিক্রম করা সম্ভব কি না সে প্রশ্ন যদি তোমাদের মনে জাগে, নিম্নলিখিত বই দুইখানি একটু নাড়াচাড়া করিয়া দেখিয়ো, জবাব পাইবে।

১। Tibets' Great Yogi / Milarepa / A Biography from the Tibetan / being the / Jetsun-Kahbum / or Biographical History of Jetsun. / Milarepa,...... / Edited with Introduction and Annotations by / W. Y. Evans-Wentz / M.A., D.Litt., B.Sc. / Oxford University Press / 1958

২। With Mystics and Magicians in Tibet / by / Alexandra David-Neel. John Lane The Bodley Head Ltd. London, 1931.

যাহা হউক, পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাপুরুষকে আভূমি প্রণত হইয়া স্মরণ করিতেছি, হঠাৎ উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে তুমুল কোলাহল উঠিয়া আমার ধ্যান ভঙ্গ করিল। তোমাদের শহর কলিকাতার হালচাল ভুলিয়া দীর্ঘকাল নিরুপদ্রব শান্তিভোগে অভ্যস্ত ছিলাম। তাই ভয়ে ও বিস্ময়ে দু'পা আগাইয়া গিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলাম ব্যাপারখানা কি। দিনটা ১৮ই মার্চ বুধবার অপরাহ্ন, বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। পুরাতন অ্যালবার্ট হলের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিন্ন খাতা, বস্ত-

নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র-সোডার বোতল ও উৎক্ষিপ্ত পতাকাদৃষ্টে ও বিবিধ বিকৃত ভঙ্গিতে উচ্চারিত ধ্বনি শ্রবণে হৃদয়ঙ্গম হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট কেমিস্ট্রির দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র কোনও কোনও পরীক্ষার্থীর মনঃপূত হয় নাই এবং তাহারাই শেষ পর্যন্ত বাহিরের সমাজ-বিরোধী 'এলিমেণ্টে'র সঙ্গে ঘোঁট পাকাইয়া 'আপার হাণ্ড' লইয়াছে। স্মরণ হইল, পূর্ববৎসর স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষার সময়েও অনুরূপ কাণ্ড ঘটিয়াছিল। অর্থাৎ, এইরূপ হওয়াই কলিকাতার ফ্যাশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজব শহর কলিকাতার এক এক যুগে এক এক রূপ। কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের জন্ম ১৮১২ সনে; তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে অর্থাৎ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার বৎসরে কলিকাতার বাহিরের রূপটাই দেখিয়াছিলেন, কাজেই বলিয়াছিলেন—

'রেতে মশা, দিনে মাছি।
এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি॥'

তার পরের দশকের কলিকাতা শহরের চেহারা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা-কমলালয়', 'নববাবু-বিলাস' ও 'নববিবিবিলাসে' যেরূপ ফুটিয়াছে তাহাতে ছড়া কাটিয়া বলা যায়—

ঘুড়ি, জুড়ি, বিদ্যেধরী।
নব-বাবুর বড়াই করি॥
কবি, পায়রা, মুরগি-লড়াই।
নইলে কিসে বাবুর বড়াই॥

তার পরেই কলিকাতায় হাফ-এজু আলালের ঘরের দুলালদের এবং হুতোমী আসমানিদের আমল। তখনকার বুলি হইল—

'ষাঁড় ভাঁড় মিথ্যাকথা
তিন লয়ে কলকাতা।'

ইহা ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত একখানি বইয়েরও নাম। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান জে. এফ. ব্লুমহার্ট অনুবাদ করিয়াছেন (১৮৮৬)—

'Courtesans, Buffoonery and Lying
make up Calcutta.'

তাহার পর আমাদের পূর্ববর্তীয়েরা কলিকাতার আরও অনেক রূপ দেখিয়াছিলেন এবং আমাদের কালেও আমরা দেখিয়াছি। খানিকক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে সমস্ত 'পরিস্থিতি' নিরীক্ষণ করিয়া আমার মনে হইল

গুণ্ডা গাধা গণনেতা।
এই তিন নিয়ে কলকেত্তা॥

অন্ততঃ কলকাতার ছাত্রসমাজ তাই। মুষ্টিমেয় কয়েকজন গুণ্ডা হুমকি দিয়া এবং গণনেতা স্লোগান দিয়া কলিকাতার যাবতীয় ছাত্রকে পরিচালিত করিতেছে। গাধার গড্ডলিকা-প্রবাহ হয় বলিয়া শাস্ত্রে লেখে না কিন্তু কলিকাতার গাধারা ভেড়ার মত গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া দিয়াছে।

ভায়া হে, ভালবাসার দ্বারা শাসনের দায়িত্ব যাহারা ছাড়িয়া দিয়াছে, গা বাঁচাইয়া আত্মস্বার্থসিদ্ধিই যে শিক্ষা-ব্যবস্থাপকদের একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহারা 'এলোমেলো ক'রে দে মা লুটে পুটে খাই'দের দলে নাম লিখাইয়াছেন বলিয়াই এই পরীক্ষার প্রহসন বৎসরে বৎসরে ঘটিতে দিতেছেন। ক্লাসে ও ল্যাবরেটরিতে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পরীক্ষার দ্বারা প্রত্যেক ছাত্রের ক্রমোন্নতির বা ক্রমাবনতির একটা হিসাব রাখিলেই তো বৎসরান্তে একুন ফল দেখিয়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীর পাস-ফেল এমন কি পাসের শ্রেণীবিভাগ পর্যন্ত নির্ধারণ করা যাইতে পারে। সর্বোৎকৃষ্টদের বৃত্তি, পুরস্কার বা চাকুরি-মর্যাদা স্থির করিবার জন্য প্রত্যেক স্কুল বা কলেজের শ্রেষ্ঠ দশজনদের একত্র করিয়া পরীক্ষা করাও যাইতে পারে। তাহার হাঙ্গামা কম ও তাহাতে প্রথম দ্বিতীয় স্থানও সঠিক নির্ধারিত করা চলে। আমি একটা মোটা খসড়া মাত্র দিলাম। পাঁচ-দশটা পাকা মাথা একত্র হইয়া বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আইন-কানুন ইত্যাদির ব্যবস্থা হইতে পারে। অনেক অবাঞ্ছিত হাঙ্গামা ও অনিশ্চিত হামলা হইতে বাঁচিয়া জাতীয় যুবশক্তির অনেকখানি ক্ষয় এই পদ্ধতি প্রয়োগে নিবারণ করা যায়।

দেখ, আমরা স্বাধীন হইয়াছি। অধীনতা-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া যে বপ্রক্রীড়া জাতিগতভাবে আমরা করিয়াছি, তাণ্ডবের নামে যে নর্তন-কুর্দন-আত্মঘাত বেমানান হয় নাই, আজ আর তাহা করিবার অবসর নাই, করা শোভনও নয়। এখন প্রয়োজন জাতির, বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির আত্মস্থ হইয়া আত্মশুদ্ধি—বাতিল পুরাতন কৃষ্টি নয়, রবীন্দ্রনাথের নয়া সংস্কৃতি নয়, চাই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ও চিত্তোৎকর্ষবিধান। তরুণ সমাজকে আজ সেই সংগঠনের পথই দেখাইতে হইবে।

আমার বয়স হইয়াছে। এককালে যাহা দেখিয়া শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বদ্‌জোবান ছুটাইতাম আজ তাহা দেখিলে শুনিলে বেদনা বোধ করি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তে'র "বুড়া বয়সের কথা" মনে পড়ে। মনে পড়ে—

[এখন] 'তোমার মিল, কোম্‌ত, স্পেন্সর, ফ্‌য়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে—আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,—এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,—আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরণীর আবর্ত্তভীষণ উপকূলে—এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে—অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?'

আমিও সেই অজ্ঞাত প্রভুর দিকে অন্ধ দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া আছি। কাতরস্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া বলিতেছি:

হে গভীর, কতকাল আপনারে রাখিবে লুকায়ে
সীমাহীন মায়ার আড়ালে?
ব'সে আছি জীবনের জটিলতা সকলি চুকায়ে—
তুমি কই চরণ বাড়ালে!
পথে পথে উড়ে ধূলি তীব্র তপ্ত মধ্যাহ্ন-তপনে,
ঝড়ো হাওয়া ছিঁড়ে যায় প্রভাতের সোনার স্বপনে,
দূর চক্রবাল 'পরে মরীচিকা ধূ ধূ করে
আমি যে কামনা করি তারো পরে সজল বর্ষণ—
হে গভীর, দিনশেষে এলে না তো ভালবেসে
এ ব্যর্থ প্রতীক্ষা মাঝে কী বিচিত্র তব আকর্ষণ!

জীবন-জাহ্নবী মোর আবর্তে আবর্তে দিশাহারা,
বাহিরিয়া সাগর-সন্ধানে
বারিধির কাছে আসি গোমুখীর খুঁজিছে কিনারা,
বন্ধ, দুই বিপরীত টানে।
অতীত সুখের স্মৃতি ভেঙে যায় তটের প্রাচীরে,
শেষ আত্মনিবেদন ঢেউয়ে জাগে বুক চিরে চিরে;
প'ড়ে দোটানার টানে কেঁদে মরে কলগানে
যে পথ তাহার নয় তাহারেই বিচিত্র বন্দনা—
কী লাভের প্রলোভনে হে গভীর, এ বাঁধনে
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে তুমি ছাড়া জানে কোন্ জনা!

বর্তমান পৃথিবীর ভয়ঙ্কর যুদ্ধপ্রস্তুতির সঙ্কট আমার আত্মসমাধি মুহুর্মুহু ভঙ্গ করিতেছে। গভীরের প্রতি আস্থা অবিচল থাকা সত্বেও আমার অন্তরাত্মা মথিত করিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা বাহির হইতেছে—

আঘাত-সংঘাত মাঝে এই সত্য জেনেছি চরম—
তুমি সেথা প্রেম যেথা রয়।
বিজ্ঞানে দাম্ভিক নর হারাল সে সম্পদ পরম,
বিশ্বজোড়া সন্দেহ-সংশয়।
প্রলয়-পরীক্ষামুখে সে সংশয় কর প্রভু, দূর
ধৈর্য দাও, বীর্য দাও, চিত্ত কর শৌর্যে পরিপূর—
প্রীতিহীন অবিশ্বাস এনেছে এ সর্বনাশ,
জীবনে ভাবিছে জড়—মানুষের তাই এ দুর্গতি।
দাও দাও প্রেম-সুধা, পূত কর এ বসুধা,
ভাঙো অন্ধ অহঙ্কার জ্ঞানালোকে, হে ব্রহ্মাণ্ডজ্যোতি!

মহামানবের প্রেমে তুমি ব্যক্ত হয়েছ ঈশ্বর,
বার বার পেয়েছ প্রকাশ।
দানবের নভস্পর্শী দম্ভ করি ধূলায় ধূসর
মহাকাল করিয়াছে গ্রাস।
তৃণাদপি সুনীচেরা বহে আজো তোমারি মহিমা,
মানুষের ভালবাসা বেঁধে দেয় অসীমের সীমা—
সে কথা থাকে না মনে, ভয়ে কাঁপে ভক্তজনে
এসো না প্রত্যয় তার মহাপ্রলয়ের রূপ ধরি।
ভয়ঙ্করী প্রতিভায় আত্মঘাত যারা চায়
তাদেরে আশ্বস্ত কর, শান্ত কর প্রেমে শুভঙ্করী॥"

—

সাংবাদিকদের নিকটে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সাময়িক বিবৃতি ও লোকসভা-বিধানসভার বিবরণীতে পাকিস্তান-ভারত সম্পর্কের যে ক্রমাবনতি প্রকট হইতেছে তাহাতে মনে হয় ভারতের গৌরবের ধন পঞ্চশীল বিলকুল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পাকিস্তানী নোড়া ভারতীয় শিলকেই ছেঁচিয়া ছাতু করিয়া দিতেছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর পরম

বৈষ্ণব শিশু ভুজঙ্গ মহারাজকে যে অবস্থায় কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি কৌপ করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন ভারতের অবস্থা তদপেক্ষাও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। শুধু বেরুবাড়ি, করিমগঞ্জ নয়, সমগ্র পূর্ব সীমান্ত জুড়িয়াই ঠাকুমার ঠুকঠাক লাগিয়াই আছে। ইহার একমাত্র প্রতিকার কামারের এক ঘা। কিন্তু কামার যদি হাতুড়ি ফেলিয়া কবিরাজী খলে প্রেম-মকরধ্বজ মাড়াই করিতে বসে তাহা হইলে তাহার দুর্দশার অন্ত থাকে না। যথার্থ কামার বল্লভভাই শক্ত হাতে হাতুড়ি ধরিয়াছিলেন বলিয়াই হায়দারাবাদে অনুরূপ ছুঁচোবাজি বন্ধ হইয়াছিল।

পাকিস্তান-ভারতবর্ষ নাটকে আমেরিকার ভূমিকা প্রশংসনীয় নয়, 'Othello' নাটকে Iago-র ভূমিকা যেমন প্রশংসনীয় ছিল না। এক পক্ষকে নেশা জমাইবার গুলি ও অপর পক্ষকে নেশা কাটাইবার তেঁতুল সরবরাহ করাকে আমরা নিষ্ঠুরতাই বলি; আমেরিকা সগর্বে ঘোষণা করিলেও ইহা খ্রীষ্টীয় প্রেমধর্ম নয়। আমেরিকাকে সর্বপ্রথম Uncle বা চাচা কে বলিয়াছিল জানি না, আমাদের কিন্তু শ্যাম-চাচার চাচামি দেখিয়া 'আলালের ঘরের দুলালে'র বিখ্যাত ঠকচাচাকেই মনে পড়ে। ঠকচাচা ঠকচাচীর মুখ-ঝামটা খাইয়া একদিন বড়াই করিয়া বলিয়াছিল,

"আমি যে কোশেশ করি তা কি বলব, মোর কেত্‌না ফিকির—কেত্‌না ফন্দি—কেত্‌না প্যাঁচ—কেত্‌না শেস্ত তা জবানিতে বলা যায় না, শিকার দস্তে এল এল হয় আবার পেলিয়ে যায়।"

নানা ফাউণ্ডেশনের নামে শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার ছলে শিকার ধরিবার "কেত্‌না ফিকির, কেত্‌না ফন্দি" চাচা করিয়া চলিয়াছে কিন্তু দেখিতেছি "দস্তে এল এল" হইয়াও তাহারা শেষ পর্যন্ত "পেলিয়ে" যাইতেছে। কিন্তু এইসব ছলা কলা-চার ফেলার অন্তরালে চাচার ঠগী মনোবৃত্তি উন্তত্তই হইয়া আছে। ঠকচাচার ভাষায় সেই মনোবৃত্তিটা হইতেছে এই:

"মুই বুকঠুকে বলছি যেত্‌না মামলা মোর মারফতে হচ্ছে সে সব বিলকুল ফতে হবে—আফদ বেলকুল মুই কেটিয়ে দিব—মরদ হইলে লড়াই চাই—তাতে ডর কি!"

পাকিস্তানের প্রতি ইহাই হইল শ্যাম-চাচার নিগূঢ় বাণী এবং এই বাণী কোটি-কোটি ডলার ডুবে এক কৌটা গোমূত্রের মত নিক্ষিপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে সংশয়াপন্ন করিতেছে।

—

বিগত ৮ই মার্চ 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা'র খ-পৃষ্ঠায় দেখিলাম, রামায়ণ-মহাভারত এবং কালিদাস-ভবভূতির কাব্য-নাটককে ক্লাসিক্‌স-অর্থে "ধ্রুপদী সাহিত্য" বলা হইয়াছে। আমরা সাহিত্যিক হিসাবে আধুনিক গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনা প্রভৃতিকে এইরূপে সঙ্গীতের পর্যায়ে ফেলিয়া ঠুংরি-গজল-টপ্পা-ঢপ-কবি-খেউড়-হাফ-আখড়াই ইত্যাদি অভিধা দিতে প্রস্তুত নই বলিয়া এই নামকরণে আপত্তি জানাইতেছি। গানের পর্যায়ে নাম যদি দিতেই হয় আমরা ক্লাসিক্‌স-গুলিকে খানদানী-সাহিত্য বলিব। তখন বাল্মীকি-বেদব্যাস-কালিদাস-ভবভূতি-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ঘরানাও বলা চলিবে।

—

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের দুই ধুরন্ধর তারাশঙ্কর ও বনফুল দক্ষিণে ও উত্তরে প্রবাসী বাঙালীদের সাহিত্য-সভায় একই দিনে (গত ১৫ই মার্চ) সভাপতির আসন হইতে যে ভাষণ দিয়াছেন তাহাকে যথাক্রমে মানব-কেন্দ্রিক ও বাঙালী-কেন্দ্রিক বলিতে পারি। তারাশঙ্কর জামশেদপুর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনে ও বনফুল কানপুর বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে স্ব স্ব সাম্প্রতিক ভাবনা প্রকট করিয়াছেন। দুইজনের ভাবনাই গুরুত্বপূর্ণ। আগে বনফুলের গণ্ডীবদ্ধ আলোচনা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"আমরা স্বাধীনতা নামধেয় একটা কিছু পাইয়াছি বটে। কিন্তু যে বাঙালী তাহার সর্বস্ব পণ করিয়া এই স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছে এই স্বাধীন ভারতে তাহার অবস্থা কি? এক কথায় শোচনীয়। তাহার নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সংহতি বহু পূর্বেই বিনষ্ট হইয়াছিল। ইংরেজের আমোলে দুই পাতা ইংরেজি পড়িয়া সে বহুদিনের উপবাসের পর দুই মুঠা খাইতে পাইতেছিল, স্বাধীনতার জন্য সেটুকু সে বিসর্জন দিয়াছে। এই স্বাধীনতা তাহার বুকের উপর খড়্গাঘাত করিয়া তাহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে, কোটি কোটি শিরামুখ হইতে রক্ত ঝরিতেছে, দেশ ভাসিয়া গেল। ঘরে বাহিরে

কোথাও তাহার স্থান নাই, সে সংখ্যালঘু বলিয়া শাসন-ব্যবস্থায় তাহার বিন্দুমাত্র কর্তৃত্ব নাই। সে খাইতে পায় না, চাকুরি পায় না, ব্যবসা করিবার সুযোগ পায় না। তাহার একদা-জগদ্বিখ্যাত গৃহশিল্পকে সঞ্জীবিত করিবার সক্রিয় চেষ্টা কোথাও নাই, যাহা দেখা যায় বা শোনা যায় তাহা স্তোক মাত্র। যে একদিন সারা ভারতের উপদেষ্টা ছিল, আজ সকলে তাহাকেই উপদেশ দেয়, অনুকম্পা করে, তাহার বাসস্থান কাড়িয়া লইয়া বা বিলাইয়া দিয়া তাহাকে অরণ্যে যাইতে বলে। এমন কি তাহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভাষা ও সাহিত্যও আজ সঙ্কটাপন্ন। আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করিতে পারিব বলিয়াই একদা স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলাম, আজ শুনিতেছি মাতৃভাষায় নয়, হিন্দীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতে বাঙালীদেরও আজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ নাই, বাংলার বাহিরে তো নাইই, বাংলা দেশেও নাই।…

স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য ইংরেজরা যখন হইতে আমাদের উপর অপ্রসন্ন হইয়াছেন তখন হইতেই নানাবিধ আইন করিয়া তাঁহারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও অনেক ক্ষতি করিয়াছেন। ইহার ফল হইয়াছে যে বাঙালী ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বাংলার বাহিরে বাস করেন তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের মর্যাদার সহিত পরিচিত নহেন। সেদিন একজন বি, এ, ক্লাসের ছেলের খবর পাইলাম, সে নাকি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং রজনী সেনের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। বঙ্কিম রবীন্দ্রের নাম অনেকে জানে বটে কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ রচনা কেহ পড়ে নাই। আজকাল প্রায়ই অনেক সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক উৎসব হয়, কিন্তু সেগুলিতে যাহা হয় তাহার সহিত সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নাই, তাহা একটা 'পিক্‌নিক্‌' গোছের ব্যাপার, যাহার উদ্দেশ্য আত্মরতি ও আত্মপ্রচার, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া কোন বিশেষ সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক দল নিজেদের ধার-করা মত আস্ফালন করেন, যাহা অনেকটা সেকালের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপেরই আধুনিক চলন্ত রূপ।…

কথাসাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যভাণ্ডারের পরিচয় বাঙালী ছেলে-মেয়েরা আর রাখে না। তাহাদের সাহিত্যচর্চা এখন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত লালসা-ক্লিন্ন গল্প পাঠে নিবদ্ধ, তাহাদের নাট্যশিল্পী-প্রীতি তৃতীয়-শ্রেণীর সিনেমাতে পরিতৃপ্ত। বাংলায় একটি দৈনিক পত্রিকা নাই যাহা পাঠ করিয়া বাঙালী আত্মগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারে। যে সব পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশের যুবকদের অন্তরে শক্তি ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিত, তাহারাই আজ 'যো হুকুম' পত্রিকায় পরিণত হইয়াছে। যাঁহারা বাঙালীদের হিতৈষী এবং যাঁহারা ইচ্ছা করিলে এই অধঃপতিত জাতিকে প্রেরণা দিয়া এখনও সঞ্জীবিত করিতে পারেন তাঁহারা সরকারের অনুগ্রহলাভের আশায় গা বাঁচাইয়া চলিতেছেন।…

ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইলে দেখা যায়, বাঙালীরা শিল্পী এবং সেই জন্যই তাহারা বিদ্রোহী। বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের মূলে আছে বাঙালী প্রতিভা। এই সেদিনও সে দলে দলে জেলে গিয়াছে, ফাঁসী গিয়াছে, নির্বাসন নির্যাতন বরণ করিয়াছে। প্রয়োজন হইলে আবার তাহাকে বিদ্রোহ করিতে হইবে। এখন আমরা স্বাধীন, কিন্তু এই স্বাধীন রাষ্ট্রেও যে সব অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, পক্ষপাত, চৌর্যবৃত্তির নমুনা দেখিতে পাইতেছি তাহা যদি সীমা ছাড়াইয়া যায় তাহা হইলে বিদ্রোহই অনিবার্য পরিণাম। বাঙালী সংখ্যা-লঘু বলিয়া দেশের শাসন-ব্যবস্থায় তাহার কোন হাত নাই। কিন্তু সংখ্যাধিক্যই সব সময় জয়লাভ করে না, গুণাধিক্য থাকিলে একটি কৃতী পুরুষই অসংখ্য সামান্য ব্যক্তিকে নিষ্প্রভ করিয়া দেদীপ্যমান হইতে পারেন। অসংখ্য নক্ষত্র যে অন্ধকার দূর করিতে পারে না, একটি চন্দ্রই তাহা পারে। সারা দেশ জুড়িয়া আজ যে অনাচার অবিচার অত্যাচারের তাণ্ডব চলিয়াছে বাঙালী যুবক-যুবতীরা তাহাদের প্রতিরোধ-কল্পে যদি প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইতে পারেন তাহা হইলে রাজনীতি-ক্ষেত্রেও উজ্জ্বল মহিমায় আবার তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত হইবেন।"

গণ্ডীমুক্ত তারাশঙ্কর কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব হইতে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন কাজেই আলের বিভেদ তিনি দেখেন নাই। তিনি খুঁজিয়াছেন নিখিল মানবীয়তাকে বা মানব-ধর্মকে। তিনি বলিতেছেন :

"সাহিত্যিক যেদিক থেকেই জীবনকে দেখুক না কেন, পাঠকের কাছে পরিবেশনের আগে তাকে নিজের মনের আগুনে পাক করে দেবে, যে-আলো সমুদ্রে বা মাটিতে নেই, সেই আলোর স্বাদ লাগবে পাঠকের মনে। জীবনের ইন্দ্রিয়গোচর সত্যের সঙ্গে মানবাত্মার নিগূঢ় সত্যের এই যৌগিক সংযোগেই সাহিত্যের সৃষ্টি। সাহিত্যের মধ্যে সাহিত্যিকের মনের এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনস্বীকার্য। শুধু সাহিত্যে কেন, মানুষের জীবনের সর্বত্র মনের এই সহযোগ রয়েছে। আমরা শুধু চোখ দিয়ে দেখি না, মন দিয়ে দেখি, শুধু হাত দিয়ে ছুঁলে আমাদের তৃপ্তি নেই যদি স্পর্শের মধ্যে মনের ছোঁয়াচ না থাকে।...

ঈশ্বর নেই যাঁরা বলছেন, বলুন। ধর্ম গেছে তো যাক্। কিন্তু মানুষ আছে, আর আছে মানুষের ভবিষ্যৎ। তাকে অস্বীকার করবে কে? নিজের যা কিছু ভাল, কামনার, সাধনার বস্তু, মানুষ আগে তা মানসিক করত ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে—সেদিন ঈশ্বরই ছিলেন মানুষের শুভ-বুদ্ধির ভাণ্ডারে ন্যাসরক্ষক, দান-প্রতিগ্রহের বিধাতা। আজ ঈশ্বর যদি বাতিল হন, তার বদলে নতুন ভাণ্ডারী নিশ্চয় বহাল হবে—সেই নতুন ঈশ্বরকে বলা হবে দেশ, জাতি, সমাজ, বিশ্ব-মানব। কিন্তু ত্যাগের, প্রেমের কর আদায় অব্যাহত থাকবে।"

বনফুল সাময়িক প্রতিকার খুঁজিয়াছেন, তারাশঙ্কর চিরন্তনের সন্ধানী। আমরা বর্তমানের সাধারণ মানুষ, আমাদিগকে সর্বদাই দুই কূল মিলাইয়া চলিতে হয়। সার্কাসে তারের উপর যাঁহারা খেলা দেখান কেবল তাঁহারাই আমাদের সঙ্কট উপলব্ধি করিবেন।

* * *

তারাশঙ্করের মানুষ-প্রসঙ্গসম্পর্কিত কর্তাভজাদের একটি পুরাতন গান হঠাৎ পাইয়াছি। কিছুদিন হইতে বাংলা দেশে বাউল, কবিগান, লোকসাহিত্য ও কবিদের ইতিহাস পুনঃপ্রকাশের হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। মূল ঘেঁষিয়া অনুসন্ধানের জন্য আমরাও 'সংবাদ প্রভাকর' ঘাঁটিতেছিলাম। ১৮৫৩ সনের ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবারের 'প্রভাকরে' গুপ্তকবির একটি মন্তব্য হঠাৎ নজরে পড়িল:

গুপ্ত কবি লিখিয়াছেন:

"এই সঙ্গে কর্তাভজা অথবা বাউলদিগের একটী গীত প্রণ হইল। যথা।

মানুষ মানুষ সবাই বলে, কেমন মানুষ কৈ মেলে,
তা কৈ মেলে।
সরাগ স্বভাবের মানুষ সবাই সহজ উজলে,
তা কৈ মেলে।
কলঙ্ক সাগরের মাঝে নিষ্কলঙ্ক সলিলে।
আর, মানুষ যারা, জীয়ন্তে মরা, রাসরতি উজান চলে।
তা কৈ মেলে, তা কৈ মেলে।"

আশ্চর্যের বিষয় এই চমৎকার গানটি কোনও সংগীত-সংগ্রহে এমন কি শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে'ও খুঁজিয়া পাইলাম না।

—

১৯৫৭ সনের স্বাধীনতা-সপ্তাহে (১৫ই আগস্ট—২২ আগস্ট) পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস-অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনাসভায় শিল্পী অতুল বসু তাঁহার প্রত্যুত্তর-ভাষণে অধুনা-বিস্মৃত বিপ্লবী শিল্পী রণদা গুপ্তকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিয়াছিলেন। দেশের মহৎদের স্মরণ আমাদের জাতীয় কর্তব্য। রণদা গুপ্তেরও পূর্বগামী আর একজন মহৎ চিত্রশিল্পীকে বিস্মরণের কূলে ঠেলিয়া দিয়া আমরা কর্তব্যে অবহেলা করিয়াছি। ইঁহার নাম অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। জন্ম ১২৫৫ বঙ্গাব্দের ১০ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৮৪৯ সনের ২২এ মার্চ। পিতা কলিকাতার পাথুরেঘাটার নূতন বাজারের "ঠাকুর সরকার" পরিবারের চন্দ্রকান্ত বাগচী, মাতা বারুইপুর সন্নিহিত শিখরবালি গ্রামের বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কন্যা মৃন্ময়ী দেবী। শিখরবালিতে মাতামহাশ্রমে বাগচী মহাশয় ভূমিষ্ঠ হন। অদ্য বাইশে মার্চ তাঁহার একশত দশ বার্ষিক জন্মদিবস। ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় প্রথম শিল্পীদের অন্যতম এই অন্নদাপ্রসাদ বাগচী। ইঁহার জীবন বিচিত্র এবং জীবনী বিশেষ তথ্যপূর্ণ। ১৯০৭ সনে ১৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল হইতে 'অন্নদা-জীবনী' নামে উহা প্রকাশিত হয়। তাহাতে এদেশে শিল্পবিদ্যা প্রতিষ্ঠার যে ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে তাহা এই:—

"বাগচী মহাশয়ের শৈশব সময়ে যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, এবং যে সকল শুভকার্য্যের সূচনা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কলিকাতার শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন একটি। এই শিল্পবিদ্যালয়ের সহিত আমাদের শিল্পগুরুর

জীবনী সুপ্রথিত, এইজন্য আমরা এই স্থলে সেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

যে বৎসর বাগচী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন, সেই বৎসরের শেষেই মুসে রিগো (M. Regaud) নামে একজন ইতালীয় শিল্পী এদেশে আগমন করেন। শিল্পদ্রব্য বিক্রয় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহাকেই বঙ্গের এই শুভকার্য্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রবর্ত্তক রূপে কার্য্য করিতে হইবে।

রিগো সাহেবের হস্তরচিত কারুকার্য্য কলিকাতার ধনীগণের মন হরণ করিল। তাঁহারা বুঝিলেন, এরূপ সুন্দর শিল্পকার্য্য যাহাতে এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

তদনুসারে খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে (যখন আমাদের শিল্পগুরু পল্লীস্থ পাঠশালায় বিদ্যার্থী হইয়া উপস্থিত) সেই সময়ে তাঁহার ভবিষ্যৎ লীলাক্ষেত্র স্থাপনের সূচনা হইল। ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে মহাত্মা হজ্‌সন প্রাট মহোদয়ের ভবনে "সোসাইটি ফর দি প্রমোসন অব্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্টস্" নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারী সার্ সিসিল্ বিডন ঐ সভার সভাপতি হইলেন, এবং রেভরেণ্ড জে, লং, উইলিয়ম মনি, কিশোরিচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি ইংরাজ ও বাঙ্গালী বিদ্যামোদিগণ সেই সভায় সদস্য হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। "কলিকাতা ব্যবহারিক শিল্পবিদ্যালয়ে"র প্রতিষ্ঠা হইল। মুসে রিগো মাসিক তিন শত টাকা বেতনে উহার অধ্যক্ষ হইলেন। বিদ্যালয়ে ড্রয়িং, মডেলিং, এচিং ও পটারি শিক্ষা দিবার আয়োজন হইল।...

সভাপতি মহাত্মা সার সিসিল্ বিডন, খ্রীঃ ১৮৬২ অব্দে বঙ্গের লেপটেন্যাণ্ট-গভর্ণর হইয়া, বিদ্যালয়টি গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিলেন। খ্রীঃ ১৮৬৩-৪ অব্দ হইতে ঐ বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হইতে লাগিল, এবং উহাতে যথারীতি, সর্ববিধ ড্রয়িং, ডিজাইনিং, মডেলিং, সর্ববিধ লিথোগ্রাফি, এনগ্রেভিং প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত সময় সময়ে, ফটোগ্রাফি, কলপ চার, উড্ কার্ভিং, মেটালচেজিং প্রভৃতি শিক্ষা দানেরও চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রথম প্রথম মডেলিং ও মোল্ডিং ক্লাসে ১।০ দেড় টাকা, এনগ্রেভিং ক্লাসে ৮০ বার আনা, ড্রয়িং ক্লাসে ৮০ বার আনা, ও ফটোগ্রাফি ক্লাসে ১।০ দেড় টাকা, বেতন ধার্য্য হয়। ঐ সময়ে পটলডাঙ্গায় বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। পরে বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতেই ১৲ এক টাকা বেতন ধার্য্য হয়। এই সময়ে মহাত্মা এচ. এচ. লক্ আসিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আন্তরিক যত্নে ও গবর্ণমেণ্টের সদয় দৃষ্টিতে, বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খ্রীঃ ১৮৭৬ অব্দে বহুবাজার ষ্ট্রীটে তিনটি প্রশস্ত বাটী ও তাহার সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গন একত্রিত করিয়া বিদ্যালয়ের জন্য ভাড়া লওয়া হইল, এবং বেতন তিন টাকা ধার্য্য হইল। মহাত্মা লকের তত্ত্বাবধানেই বাগচী মহাশয় সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার অধীনে, ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিয়া ইহার যথোচিত উন্নতি করিয়াছিলেন।...

লেপ্‌টেন্যাণ্ট-গবর্ণর হইয়াই তিনি [বিডন] ভারত গবর্ণমেণ্টকে শিল্পবিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এরূপ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত স্থায়ী হইতে পারে না। তাঁহার চেষ্টায় খ্রীঃ ১৮৬৩-৪ অব্দে গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, ইহাকে গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয় রূপে স্বীকার করিয়া, ইহাতে একজন উপযুক্ত প্রিন্সিপ্যাল নিয়োগ প্রয়োজন বোধ করিলেন। তদনুসারে বিলাতের কেন্‌সিংটন কালেজে একজন উপযুক্ত লোক প্রার্থনা করা হয়; সেখানকার অধ্যক্ষগণ মহাত্মা লক্‌কে ঐ পদের উপযুক্ত বোধ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তিনি যখন অধ্যক্ষ হইয়া বিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করেন, তখন ছাত্রসংখ্যা ৩৫টি মাত্র ছিল। তাহাদের অধিকাংশই কামার কুমার প্রভৃতি শ্রমজীবী জাতির। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের ছাত্র তখন প্রায় এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইত না। বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা-শিক্ষার্থী প্রায় দেখা যাইত না। হুইট্‌লি সাহেব যদিও ল্যাণ্ডস্কেপ ও পরিপ্রেক্ষিত-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্রসংখ্যা দশটির অধিক প্রায়ই হইত না। অবশিষ্ট ছাত্রগণ মোল্ডিং ও মডেলিং শিখিত, কেন না তখন উহাই উপার্জ্জনের দ্বার ছিল।

বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইলে বিদ্যালয়ের প্রতি

সাধারণের দৃষ্টি পড়িল। লক্ সাহেব আসিবার পর হইতেই দিন দিন বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালীর সুব্যবস্থা ও সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

সুতরাং খ্রীঃ ১৮৬৪ অব্দ হইতেই এই দেশে শিল্পশিক্ষা দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হয়। এই সময়েই বাগচী মহাশয়ের এই বিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে।"

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি প্রমোসন অব ফাইন আর্টস-স্থাপন বিষয়ে ইহাতে লেখা হইয়াছে—

"খ্রীঃ ১৮৯০ অব্দের শেষভাগে স্বর্গীয় প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে "Indian Association for the promotion of Fine Arts" নামে একটি শিল্পসভা স্থাপিত হয়। ভারত-সভাগৃহে উহার প্রথম অধিবেশন হয়, উহাতে প্রসিদ্ধ চিত্রকর স্বর্গীয় গঙ্গাধর দে মহাশয় (তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্যানুকরণে শিল্প-শিক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।) সভাপতি এবং বাগচী মহাশয় সহকারী সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্রমথনাথ সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী সহকারী সম্পাদক হন। রবি বর্ম্মা প্রমুখ ভারতের সকল শিল্পীই ইহার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে বাগচী মহাশয় সভাপতির কার্য্য করেন। কিন্তু সভা দুই বৎসর মাত্র জীবিত থাকিয়া লুপ্ত হয়।

তৎপরে ১৬ই সেপ্টেম্বর [১৯০৫] বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে "বঙ্গীয় কলা সংসদে"র প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহু শিল্পী ও শিল্প-শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় প্রসিদ্ধ শিল্পী বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ, সভাপতি হন। স্থির হয়—

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয় উহার স্থায়ী সভাপতি হইবেন, বাবু জলধিকুমার মুখোপাধ্যায় হইবেন সহকারী সভাপতি, বাবু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক, সহযোগী ও সহকারী সম্পাদক যথাক্রমে বাবু মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ও বাবু কুঞ্জদাপ্রসাদ গুপ্ত এবং বাবু বরদাপ্রসাদ দত্ত, বাবু বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যামিনীপ্রকাশ গাঙ্গুলী, বাবু রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, বাবু নবীগোপাল গোস্বামী, বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বাবু হরিনারায়ণ বসু ও বাবু পরেশনাথ সেন কার্য্যনির্ব্বাহক সভ্য। কিন্তু বাগচী মহাশয়কে আর সভাপতিত্ব করিতে হয় নাই।"

কারণ, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর ১৭ই আশ্বিন ১৩১২ মঙ্গলবার শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর মৃত্যু হয়।

—

গত সংখ্যার "সংবাদ-সাহিত্যে" বর্ধমানের জসকরা থানার অন্তর্গত 'রামচন্দ্রপুর নামক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের কাব্যচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। সে চিত্র বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে অঙ্কিত হইয়াছিল। প্রতিবেশী গ্রামের একজন অধিবাসীর নিকট সংবাদ পাইলাম রামচন্দ্রপুরের পূর্ব গৌরব প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে। শুনিয়া আনন্দ হইল। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ স্বয়ংসম্পূর্ণ সুন্দর আর কতগুলি গ্রাম আছে জানি না। আছে যে আভাসে-ইঙ্গিতে তাহার প্রমাণ পাই। কিন্তু পূর্ববঙ্গে এরূপ গ্রাম যে অনেক ছিল তাহার পরিচয় পাইয়াছিলাম কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসুর 'ছেড়ে আসা গ্রামে'র প্রথম খণ্ড পাঠে। স্মৃতি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছিল। সম্প্রতি 'ছেড়ে আসা গ্রামে'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ হওয়াতে নূতন করিয়া পূর্ববঙ্গের কয়েকটি মনোহর গ্রামের গৌরব উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু হায়, সেই গ্রামগুলি এখনও সেইভাবে আছে কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ লেখকের 'ছেড়ে আসা গ্রাম' অতীতের স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। লেখকবিধৃত কাহিনী শুধু এই মাত্র আশ্বাস বহন করিতেছে যে পূর্বাঞ্চলে যাহা সত্য ও বাস্তব ছিল, কিছু কায়িক পরিশ্রম ও আন্তরিক যত্ন করিলে পশ্চিমাঞ্চলেও তাহা পুনর্গঠিত হইতে পারে। তাহা যখন হইবে, 'ছেড়ে আসা গ্রাম' তখনই সার্থক হইবে।

—

গত ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিতব্য চিন্তানায়ক বিপিনচন্দ্র পালের শতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ 'Studies in the Bengal Renaissance' বিষয়গৌরবে এবং মুদ্রণ-গ্রন্থন-সৌন্দর্যে আমাদিগকে আনন্দ দিয়াছে। এই জন্য শতবার্ষিক সমিতি ও দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন, বেঙ্গল (যাদবপুর) বাঙালী জাতির ধন্যবাদার্হ হইলেন। এই গ্রন্থে বাংলাদেশের গত শতাব্দীর শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান, রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীত, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কৃতী লেখকদের

চল্লিশটি সুলিখিত প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থশেষে শ্রীপুলিন সেন সঙ্কলিত বিপিনচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জীটি গবেষণাকারীর বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। যাদবপুরের দি স্কুল অব প্রিন্টিং টেকনলজির ছাত্রেরা এই গ্রন্থের মুদ্রণ-ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া ইহার মর্যাদা বাড়াইয়াছেন। মোটের উপর প্রায় সাড়ে ছয় শো পৃষ্ঠার এই বইখানি বহু মূল্যবান তথ্যের আকর হিসাবে সর্বজনসমাদৃত হইবে আশা করি।

—

সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল হইতে প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা সম্প্রতি 'ভগিনী নিবেদিতা' নামে যে জীবনী গ্রন্থটি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বাংলাভাষায় রচিত জীবনী-সাহিত্যে তাহা একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এমন নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে উপকরণ সংগ্রহ এবং এমন যুক্তি ও শ্রদ্ধার একত্র সমাবেশে গ্রন্থ রচনা বাংলা দেশের অলস ও শিথিল পরিবেশে খুব বেশি হয় নাই। কোনও উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া এই আলেখ্যে কোনও বিশেষ রঙ চড়ানো হয় নাই, সহজ সুন্দর অথচ দৃপ্তস্বভাবের মানুষটিকে যথাযথ আঁকা হইয়াছে ইহাও বইখানির কম গুণ নয়। উপকরণ ও বর্ণনার এমন চমৎকার সামঞ্জস্য আমরা কদাচিৎ দেখিয়াছি। একচল্লিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত মোট প্রায় পাঁচশত পৃষ্ঠার এই জীবনীখানি সুলিখিত এবং বাহুল্যবর্জিত। চিত্র সম্বলিত করিয়া ও গ্রন্থের উপাদান-নির্দেশিকা দেওয়াতে বইটির মূল্য বাড়িয়াছে। আমরা বাংলাদেশের পঠনক্ষম সকলকেই বিশেষ করিয়া মেয়েদের প্রত্যেককেই এই বইখানি পড়িতে অনুরোধ জানাইতেছি। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে নিবেদিতপ্রাণ ভারতমাতার দত্তক-কন্যা এই কোমলপ্রাণা মহীয়সী মহিলার জ্ঞানদৃপ্ত তেজস্বী মৌলিক রূপটি কি ছিল না জানিলে তাঁহার মহত্ব আমরা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিব না। এই গ্রন্থে সেই রূপটি উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

—

কবি কালিদাস রায়ের সর্বশেষ কাব্যসংগ্রহ 'সন্ধ্যামণি' এবং কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'কাব্যসঞ্চয়' নূতন করিয়া এই দুই প্রথিতযশা কবির কাব্য উপভোগের সুযোগ আমাদিগকে দিয়াছে। শ্রীনারায়ণ চৌধুরী 'সন্ধ্যামণি'র ও ডক্টর অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'কাব্যসঞ্চয়ে'র কাব্যরত্নভাণ্ডার কুঞ্চিকা ভূমিকাস্বরূপ পাঠকের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন। যখন পথেঘাটে সভায়-সমিতিতে আড্ডায়-বৈঠকখানায় নিত্যনিয়মিত কাব্যপাঠের রেওয়াজ ছিল তখন পাঠকে-কবিতে একটা গূঢ় সংযোগ ছিল। আজ নানা কারণে সে সংযোগ ছিন্ন হইয়াছে, কাজেই আধুনিক যুগের কবিরা পথে পথে কবিতাকর্ণার খুলিয়া তারস্বরে স্বরচিত কাব্যপাঠ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। কালিদাস ও সাবিত্রীপ্রসন্ন কবিতায় এই লাঞ্ছনার আগের যুগের কবি। তাঁহারা উভয়েই সুপঠিত এবং সুআবৃত্তিত। তাঁহাদের কবিতার এই সুনির্বাচিত সঙ্কলন ভক্ত পাঠকের স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য প্রয়োজন ছিল। আধুনিক কবি ও কাব্য-রসিক সম্প্রদায় এই কবিতাগুলি একটু নাড়াচাড়া করিলে অন্ততঃ ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবেন।

—

একখণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ গল্পগুচ্ছের প্রকাশ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ের সর্বশেষ কীর্তি। রবীন্দ্রনাথ জীবনে যে চুরাশিটি নিঃসঙ্কোচে-সাধারণ্যে-প্রকাশিতব্য (রবীন্দ্রনাথের মতে) গল্প লিখিয়াছিলেন, সেগুলির একত্র সমাবেশে শুধু সাহিত্য নয় রবীন্দ্রজীবনের ইতিহাসও সমৃদ্ধ হইবে। এই গল্পগুলি ১২৯১ বঙ্গাব্দের কার্তিক হইতে ১৩৪০ বঙ্গাব্দের কার্তিক পর্যন্ত দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া রচিত। এইকালে তিনি সাধারণ ও অসাধারণ মানুষের যে সব ছোট সুখ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা করিয়াছেন, যে অশ্রুজল কপোল বাহিয়া ঝরিতে দেখিয়াছেন অথবা যাহা বেদনার আতিশয্যে উদ্গতই হইতে পারে নাই, যে সহজ সরল জীবনের জটিলতা শুধু কবিরই অনুমেয়—এই চুরাশিটি গল্পে কবি রবীন্দ্রনাথের সেই পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা, বেদনা ও সহানুভূতি এবং তৎসহ কৌতুক ও হাসি বিধৃত হইয়া আছে। এই গ্রন্থখানি শুধু গল্পরসিকের নয়, মনস্তাত্ত্বিকেরও কাজে লাগিবে। খণ্ড খণ্ডকে অখণ্ড ভাবে দেখারও প্রয়োজন আছে, অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তো আছেই।

—

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

॥ 'কবির অন্তরে তুমি কবি' ॥

যাঁকে অবলম্বন করে তরুণ কবির সুকুমার চিত্তবৃত্তি আশৈশব বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁরই মৃত্যু কবির অন্তর্জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মৃত্যুর কষ্টিপাথরে নিকষিত হয়েই কবির গভীরতম হৃদয়ানুরাগের চূড়ান্ত পরীক্ষা হল। মৃত্যুশোক তাঁর চিত্তাকাশকে শুধু অশ্রুবাষ্পেই আচ্ছন্ন করে রাখল না, রুদ্রতেজে উদ্দীপ্ত হয়ে সেই পরম বেদনা তাঁর সমস্ত সত্তায় আলো হয়ে তাপ হয়ে গতি হয়ে প্রাণ হয়ে নব নব শক্তিতে বিচ্ছুরিত হতে লাগল। তার ফলে শুধু যে কবির প্রেম-চেতনা ও সৌন্দর্যচেতনাই নব নব রূপে রূপান্বিত হয়ে উঠল এমন নয়, কবির গভীরতম জীবনবোধও তারই আলোকে নির্ণীত ও নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইতিহাসের অপ্রকাশিত লিখন যদি বের করা যেত তাহলে দেখতে পেতেম নারীর প্রেমের প্রেরণা মানুষের সমাজে কী কাজ করেছে। শক্তির যে-ক্রিয়া উদ্যত চেষ্টারূপে চঞ্চল আমরা তাকেই শক্তির প্রকাশরূপে দেখি, কিন্তু যে-ক্রিয়া গূঢ় উদ্দীপনারূপে পরিব্যাপ্ত তার কথা মনেই আনি নে।'' কবিজীবনে কাদম্বরী দেবীর সতেরো বৎসরব্যাপী অনুক্ষণ প্রেরণার অপরূপ রূপটি আমরা দেখেছি, কিন্তু মৃত্যুর পরে সেই অলোকসামান্যা নারীলক্ষ্মীর প্রভাব কবির সমগ্র সত্তায় "গূঢ় উদ্দীপনারূপে" কি ভাবে পরিব্যাপ্ত ছিল সে রহস্য দুর্জ্ঞেয় এবং দুর্নিরীক্ষ্য। রবীন্দ্রজীবনে কবিমানসীর সেই নিগূঢ় সঞ্চরণলীলা এর পর থেকে দ্বিধা-বিভক্ত করেই দেখতে হবে। কবির ব্যক্তিজীবনে স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারি লীলায় তিনি কি ভাবে সেই বিদেহিনীর অস্তিত্ব ও প্রেরণাকে আজীবন অন্তর্লোকে অনুভব করেছেন[1]; আর তাঁর কবিমানসে প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনায় নব নব সুরে সেই মানসলক্ষ্মীর লীলারস কি ভাবে কাব্যের হিরণ্ময় পাত্রে বার বার উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। একটি ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে প্রাকৃত জীবনে আস্বাদ্য চিরপুরাতন বিরহমিলন লীলা, আর একটি ব্যক্তি-পরিচ্ছেদ-বিগলিত অসীমের দিকে তাকিয়ে কবিপ্রজাপতির নব নব সৃষ্টিরহস্যের সূত্রসন্ধান। একটি কবিপ্রেমিকের মর্ত্যলীলার প্রাকৃত জগৎ; আর একটি কবিশিল্পীর অমর্ত্যলীলার অপ্রাকৃত স্বপ্নের ভুবন। শিল্পীর সেই স্বপ্নের ভুবনে কবির মানসপ্রতিমাগুলি নব নব রসের তুলিতে যে সৌন্দর্যমূর্তি লাভ করেছে স্বভাবতঃই তার রসতত্ত্বের রূপ ও রীতি স্বতন্ত্র হবে। 'জীবনস্মৃতি'র উপান্ত্য বাক্যে কবি সত্যই বলেছেন, 'মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না।' কবিমানসে অধিবাসিত শিল্পীর আনন্দ দিয়ে গড়া সেই সৌন্দর্যমূর্তিগুলির বিচার-বিশ্লেষণকে তাই স্বতন্ত্র আলোচনার জন্যে তুলে রেখে আমরা আপাততঃ কবির ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে তাঁর মানসলোকের গোপনচারিণীর সঞ্চরণলীলাকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করব।

২

কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী দুখানি কাব্যগ্রন্থ হল 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'। স্বভাবতঃই এ দুখানি কাব্যে করুণ-বিপ্রলম্ভের সুর ব্যক্তিসীমার জগতেই নিখাদে ঝংকৃত হয়েছে। কিন্তু 'সোনার তরী' থেকেই কবির প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনা ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, এবং সীমা থেকে অসীমের অভিমুখে ক্রমপ্রসারিত। 'চিত্রা'র যুগে জীবনপাত্রে উচ্ছলিত মাধুর্যলীলা জীবনদেবতাতত্ত্বের আলোকে এক অভিনব রসমূর্তি লাভ করেছে। কিন্তু 'চিত্রা'তেও ব্যক্তিসীমার জগৎ একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যায় নি। কাদম্বরী দেবী লোকান্তরিত হয়েছিলেন ১২৯১ সালের ৮ই বৈশাখ। এর পর থেকে বৈশাখের এই দিনগুলি প্রতি বৎসর কবিচিত্তের হাহাকারে ভরে উঠত। অতীতের নানা স্মৃতি উদ্দীপনবিভাব-রূপে কবিচিত্তে ক্রিয়াশীল হত। তাই কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরেও 'চিত্রা' কাব্যে "স্নেহস্মৃতি" (বর্ষশেষ, ১৩০০), "নববর্ষে" (নববর্ষ, ১৩০১), "দুঃসময়" (৫ই বৈশাখ, ১৩০১) এবং "মৃত্যুর পরে" (৫ই বৈশাখ, ১৩০১)—এই কটি কবিতা কবির বিরহীচিত্তের করুণ সংগীতে ভরে উঠেছে। "স্নেহস্মৃতি" কবিতায় কবি বলেছেন :

সেই চাঁপা, সেই বেলফুল,
কে তোরা আজি এ প্রাতে এনে দিলি মোর হাতে
জল আসে আঁখিপাতে, হৃদয় আকুল।
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

*   *   *

বড়ো বেসেছিনু ভালো এই শোভা, এই আলো,
এ আকাশ, এ বাতাস, এই ধরাতল ;
কতোদিন বসি তীরে শুনেছি নদীর নীরে
নিশীথের সমীরণে সংগীত তরল ;
কতোদিন পরিয়াছি সন্ধ্যাবেলা মালাগাছি
স্নেহের হস্তের গাঁথা বকুল-মুকুল ;
বড়ো ভালো লেগেছিল যেদিন এ হাতে দিল
সেই চাঁপা, সেই বেলফুল!

নোতুন-বৌঠানের প্রয়াণতিথির কাছাকাছি দিন-গুলিতে জোড়াসাঁকোর সেই অসংখ্য স্মৃতিবিজড়িত পরিবেশে তাঁরই পুনরাবির্ভাব কল্পনা করে কবি "দুঃসময়" কবিতায় আক্ষেপভরে বলছেন :

বিলম্বে এসেছ, রুদ্ধ এবে দ্বার,
জনশূন্য পথ, রাত্রি অন্ধকার,
গৃহহারা বায়ু করি হাহাকার
ফিরিয়া মরে।
তোমারে আজিকে ভুলিয়াছে সবে,
শুধাইলে কেহ কথা নাহি কবে,
এ হেন নিশীথে আসিয়াছ তবে
কি মনে করে।

"মৃত্যুর পরে" কবিতায় এই আক্ষেপ শোক ও সান্ত্বনা, হতাশা ও প্রত্যাশার মিশ্র সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। কখনও হতাশায় ভেঙে পড়ে কবি বলছেন :

হায় রে নির্বোধ নর কোথা তোর আছে ঘর
কোথা তোর স্থান।
শুধু তোর ওইটুক অতিশয় ক্ষুদ্র বুক
ভয়ে কম্পমান।
ঊর্ধ্বে ওই দেখো চেয়ে সমস্ত আকাশ ছেয়ে
অনন্তের দেশ।
সে যখন একধারে লুকায়ে রাখিবে তারে
পাবি কি উদ্দেশ ?

যে অনন্তের মধ্যে মিশে গেছে তার উদ্দেশ হয়তো আর কিছুতেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু বিরহী-চিত্তে পুনর্মিলনের আকাঙ্ক্ষা যে চিরদিনই জেগে থাকে। তাই কবির জিজ্ঞাসা :

ওই হেরো সীমাহারা গগনেতে গ্রহতারা
অসংখ্য জগৎ,
ওরি মাঝে পরিভ্রান্ত হয়তো সে একা পান্থ
খুঁজিতেছে পথ।
ওই দূর দূরান্তরে অজ্ঞাত ভুবন 'পরে
কভু কোনোখানে
আর কি গো দেখা হবে, আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।

এসব কবিতা ব্যক্তিসীমার প্রাকৃত জগতে থেকে কবির নিঃসঙ্গ মুহূর্তের স্বগতোক্তির মতই উচ্চারিত। এসব কবিতার পাশেই রয়েছে অসীমের কোটিতে উত্তীর্ণ হয়ে

মানসসুন্দরী-অন্তর্যামী-জীবনদেবতার স্তবগান। রবীন্দ্র-জীবনে তাঁর ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তার এই দু-ধারার লীলাও কম বিস্ময়কর নয়!

৩

'চিত্রা'র যুগ পেরিয়ে 'চৈতালি'র "গীতহীন", "স্বপ্ন" প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও কবির ব্যক্তিসত্তার অনুভূত করুণ-বিপ্রলম্ভের সুর শুনতে পাওয়া যাবে। কিন্তু তার পরবর্তী সতেরো-আঠারো বৎসর যেন কবির ব্যক্তিজীবন থেকে কাদম্বরী দেবী নির্বাসিতা হলেন। সেই যুগটিকেই কবি তাঁর 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি'তে [৫ই অক্টোবর ১৯২৪] বলেছেন 'জীবনের খাসমহল'। 'সে সময়ে অনেক বড় বড় সংকল্প, অনেক কঠিন সাধনা, অনেক মস্ত লাভ, অনেক মস্ত লোকসান এসে জমেছিল।' সব জড়িয়ে কবি ভেবেছেন, 'এবার আসা গেল পাকা পরিচয়ের কিনারাটাতে।' সেদিন জীবনের তৃণবিছানো বীথিকা পৌঁছল এসে পাথরে-বাঁধানো রাজপথে। তাঁর ডাক পড়ল বন্ধুর পথ দিয়ে তরঙ্গমন্দ্রিত জনসমুদ্রতীরে। সেদিন তমালতরুতলের বংশীবাদক হয়ে উঠলেন মহাকুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্যনাদী পার্থসারথি। মথুরার ঐশ্বর্যলীলার নব নব বিভূতিতে ঢাকা পড়ল বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরী-লীলার মধুস্মৃতি।

পঞ্চাশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে 'জীবনস্মৃতি' লিখতে বসে ['প্রবাসী', ১৩১৮ সালের ভাদ্র থেকে ১৩১৯ সালের শ্রাবণ] স্মৃতির পটে জীবনের ছবির দিকে তাকিয়ে কবির চিত্তে আবার ফিরে এল তাঁর শৈশব-কৈশোর-যৌবনের দিনগুলি। কবি লিখছেন, 'আমাদের ভিতরের এই চিত্র-পটের দিকে ভালো করিয়া তাকাইবার আমাদের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক-একটা অংশের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধকারে অগোচরে পড়িয়া থাকে।'[২]

অন্ধকারে অগোচরে পড়ে-থাকা এই স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারি লীলার দিকে তাকাতে গিয়ে কবি তাঁর চেতনার মধ্যে আবার ফিরে পেলেন তাঁর নোতুন-বৌঠানকে। মনে পড়ল সতেরো বৎসর ব্যাপী তাঁর নব সান্নিধ্য ও প্রেরণার কথা। বিস্মৃতির অতল সমুদ্র থেকে ভেসে উঠল তাঁর মূর্তিখানি। চব্বিশ বৎসর বয়সের "মৃত্যুশোক" পুনরুজ্জীবিত হল কবিমানসে। তার বৎসর তিনেক পরে, ১৩২১ সালের ৩রা কার্তিক এলাহাবাদে বসে কবি তাঁর নোতুন-বৌঠানের নববন্দনা রচনা করলেন "ছবি" কবিতায়। কবির হৃৎশতদলে তাঁর মানসলক্ষ্মীর কমলাসন নূতন করে রচিত হল। অন্তরে সেই মানসপ্রতিমাকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করে কবিজীবনের বাকি দিনগুলি এক অপূর্ব জাগর-স্বপ্নে অতিবাহিত হয়েছে।

'বলাকা'র "ছবি" কবিতার আলম্বনস্বরূপিণী এই নারী-মূর্তিটি কার—এ সম্পর্কে মতভেদ থাকা অস্বাভাবিক নয়। 'রবিরশ্মি'-প্রণেতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা'-কার আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে কবিজায়া মৃণালিনী দেবীর ছবি দেখেই কবি এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন :

'১৩২১ সালে কার্তিক মাসে কবি কিছুদিন এলাহাবাদে তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলীর বাড়িতে বাস করেছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির নতুন-বৌঠানের একখানা পুরানো ফটো তাঁর চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার 'ছবি'-নামে কবিতাটি লেখেন।'[৩]

মহলানবিশ মহাশয় দীর্ঘদিন বিশ্বভারতীর প্রকাশ-বিভাগের সম্পাদকরূপে কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে-ছিলেন। কবির কাছে তাঁর শোনা এই কাহিনী সম্পর্কে সংশয় প্রকাশের অবকাশ নেই। তা ছাড়া কবিতাটির ছন্দ সম্পর্কে একটি অভ্রান্ত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ মহলানবিশ মহাশয়ের বক্তব্যকেই সমর্থন করছে। আমরা যাকে "বলাকার ছন্দ" বলি সেই তানপ্রধান মুক্তবন্ধ বা মুক্তক-ছন্দের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে "ছবি" কবিতায়। 'বলাকা'র এই ছন্দে লেখা অন্যান্য কবিতাগুলি "ছবি"র পরে লেখা হয়েছে। 'বলাকা'-পরবর্তী সমগ্র রবীন্দ্রজীবনে এই তানপ্রধান মুক্তবন্ধ ছন্দই কবির অনায়াস বাণীপ্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত বাহন হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'বলাকা'র পূর্বে একবার মাত্র এই মুক্তবন্ধ ছন্দটি কবির লেখনীতে ধরা দিয়েছিল। "ছবি" কবিতা রচনার ৩৪ বৎসর পূর্বে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ অগ্রহায়ণ কবি এই ছন্দে

লেখেন "নিষ্ফল কামনা" কবিতাটি। ৭১ পংক্তির অমিল মুক্তবন্ধ তানপ্রধান ছন্দে কবিতাটি রচিত। "নিষ্ফল কামনা" প্রেমের কবিতা। নোতুন-বৌঠানের মৃত্যুর পরে প্রেম সম্পর্কে একটি দার্শনিক মনোভাব এই কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রমানসে প্রেমচেতনার স্বরূপ নির্ণয়ে এই কবিতাটির গুরুত্ব অপরিসীম। "নিষ্ফল কামনা" রচনার চৌত্রিশ বৎসর পরে নোতুন-বৌঠানের ছবি দেখে কবির পুনরুজ্জীবিত হৃদয়ানুরাগ ওই ভুলে-যাওয়া অনাদৃত ছন্দরূপটিকে আশ্রয় করেই বাণীমূর্তি লাভ করেছে। "নিষ্ফল কামনা"র অমিল মুক্তক-রূপটি "ছবি"তে সমিল-মুক্তকরূপ পরিগ্রহ করে পুনর্মিলনের প্রত্যাশাকেই বহুগুণিত করে তুলেছে। এ দিক দিয়ে "ছবি" কবিতা কাকে নিয়ে লেখা তার একটি শিল্পসৃষ্টিগত উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং আমরা এই আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যকে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে করি। "ছবি" কবিতায় কবি বলছেন :

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে।
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।
সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে
এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

তারপর জীবনের চলার পথে একসঙ্গে যেতে যেতে রজনীর আড়ালেতে তোমার চলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাকে তো পথের প্রেমে যেতে দূর হতে দূরে অনুক্ষণ চলতে হয়েছে! তাই তোমাকে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন সেই ভুল? তারই উত্তরে কবি বলছেন :

তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।

* * *

ভুলে-থাকা নয় সে তো ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।

* * *

নাহি জানি কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারায়েছি রাতে।
তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

উদ্ধৃত অংশের 'সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী'—এই বাক্যের 'সে-প্রভাতে' কথাটি আমাদের সিদ্ধান্তেরই অনুকূলে আরেকটি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। কবিজীবনের প্রভাতলগ্ন উত্তীর্ণ হবার পরই তাঁর জীবনে এসেছিলেন কবিজায়া মৃণালিনী দেবী। কাজেই কবিজীবনের 'সে-প্রভাতে' এ বিশ্বের মূর্তিমতী বাণী রূপে কাদম্বরী দেবীরই কল্পনা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

উদ্ধৃত অংশের 'কবির অন্তরে তুমি কবি'—এই পরিচয় জীবনদেবতারই ভাবানুষঙ্গ বহন করে আনে। জীবন-দেবতাকেও রবীন্দ্রনাথ কবি-রূপে বিশেষিত করে লিখেছেন, 'এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি।'* কিন্তু এ প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনার 'কাব্য-ভাষ্য' খণ্ডে বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

৪

"ছবি" রচনার পাঁচ বৎসর পরে ১৩২৬ সালের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে 'সবুজপত্র', 'প্রবাসী', 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় "কথিকা" ও অন্যান্য স্বতন্ত্র নামে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোট ছোট গীতিগন্ধ বা কাব্যসুরভিত গদ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। শিল্পরূপের দিক দিয়ে এই রচনাগুলিকে কবির গদ্যকবিতা রচনার পূর্বাভাস বলা যেতে পারে। এই রচনাগুলি বৎসর তিনেক পরে 'লিপিকা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কাকে লক্ষ্য করে এই ছোট-ছোট গদ্যকাব্য কবি রচনা করেছিলেন তার আভাস 'লিপিকা' নামকরণের মধ্যেই

নিহিত রয়েছে। 'লিপিকা'র প্রথম খণ্ডের "পায়ে চলার পথ", "মেঘলা দিনে", "বাণী", "মেঘদূত", "বাঁশি", "সন্ধ্যা ও প্রভাত", "পুরানো বাড়ি", "গলি", "একটি চাউনি", "একটি দিন", "কৃতঘ্ন শোক", "সতেরো বছর", "প্রথম শোক", "প্রশ্ন"—এই চোদ্দটি রচনা কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পরে লেখা 'পুষ্পাঞ্জলি'-'বিবিধ প্রসঙ্গ'-'রুদ্ধগৃহ'-'পথপ্রান্তে'-'শিউলিফুলের গাছ'—এই রচনাপঞ্চকেরই নবীভূত রূপ। "বাঁশি", "সন্ধ্যা ও প্রভাত" এবং "সতেরো বছর"কে 'পুষ্পাঞ্জলি'র তিনটি অনুচ্ছেদেরই পুনর্লিখিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। "পায়ে চলার পথ" 'পথপ্রান্তে'রই নবরূপায়ণ, আর 'রুদ্ধগৃহে'র ভাব নিয়েই লেখা দিয়েছে "পুরানো বাড়ি"। ভাব ও সুরের দিক দিয়ে এসব রচনায় কালের ব্যবধান ক্রিয়াশীল হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার দ্বারা মৌলিক কোন পার্থক্য রচিত হয় নি। দু-একটি উদাহরণের সাহায্যেই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। 'রুদ্ধগৃহ' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, 'বৃহৎ বাড়ির কেবল একটি ঘর বন্ধ।... দুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে।...এ-ঘর বিধবা। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দ্বার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেহ আসেও না, এখান হইতে আর কেহ যায়ও না।'

"পুরানো বাড়ি"তে বলা হয়েছে, 'অনেক কালের ধনী গরীব হয়ে গেছে, তাদেরই ঐ বাড়ি।...

'উত্তর দিকের এক পাল্লা দরজা কবে ভেঙে পড়েছে কেউ খবর নিলে না। বাকি দরজাটা, শোকাতুরা বিধবার মতো, বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ে—কেউ তাকিয়ে দেখে না।'

এই বর্ণনা দুটি পড়লেই বুঝতে পারা যায়, একই বিষয়কে অবলম্বন করে দুটি রচনা গড়ে উঠেছে। কেবল প্রথমোক্ত রচনায় যে গৃহ রুদ্ধ ছিল দ্বিতীয়টিতে কালের অভিঘাতে তার দরজার একটি পাল্লা ভেঙে পড়েছে, সেদিকে কারোরই নজর নেই। প্রথমটিতে কল্পিত রুদ্ধগৃহের বৈধব্যদশা দ্বিতীয়টিতে যেন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। দরজার একটি পাল্লা শোকাতুরা বিধবার মত বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে আছাড় খেয়ে পড়ছে, এ ছবি বিলাপচারী শোকের আছড়ে-পড়া আর্তনাদকে যেন জীবন্ত করে তুলেছে।

"পথপ্রান্তে" এবং "পায়ে চলার পথে"র মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথম রচনায় কবির স্থান ছিল পথের পাশের একটি আসনে; কিন্তু দ্বিতীয়টিতে কবি নিজেই পথিক। "পায়ে চলার পথ" 'লিপিকা'র আলোচ্য রচনাগুচ্ছের শুধু প্রথমেই বসে নি, ওটিই এই লেখাগুলির ভূমিকা। কবি বলছেন:

'এই তো পায়ে চলার পথ।

* * *

'এই পথে কত মানুষ কেউ বা আমার পাশ দিয়ে চলে গেছে, কেউ বা সঙ্গ নিয়েছে, কাউকে বা দূর থেকে দেখা গেল; কারো বা ঘোমটা আছে, কারো বা নেই; কেউ বা জল ভরতে চলেছে, কেউ বা জল নিয়ে ফিরে এল।

* * *

'একদিন এই পথকে মনে হয়েছিল আমারই পথ, একান্তই আমার; এখন দেখছি, কেবল একটিবার মাত্র এই পথ দিয়ে চলার হুকুম নিয়ে এসেছি, আর নয়।

* * *

'আজ ধূসর সন্ধ্যায় একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখলুম, এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী, ভৈরবীর সুরে বাঁধা।

'যত কাল যত পথিক চলে গেছে তাদের জীবনের সমস্ত কথাকেই এই পথ আপনার একটিমাত্র ধূলিরেখায় সংক্ষিপ্ত ক'রে এঁকেছে; সেই একটি রেখা চলেছে সূর্যোদয়ের দিক থেকে সূর্যাস্তের দিকে এক সোনার সিংহদ্বার থেকে আর এক সোনার সিংহদ্বারে।'

এই রচনাটি যে সবকটি রচনার ভূমিকা "প্রথম শোকে"র সঙ্গে একে মিলিয়ে পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। "প্রথম শোকে"র আরম্ভে আছে:

বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, "আমাকে চিনতে পার না?"

কবি তার দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁকে স্বীকার করতে হল, চিনেও তাকে তিনি ঠিক চিনতে পারছেন না।

সে বললে, "আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।"

তার চোখের কোণে একটু ছলছলে আভা দেখা দিলে, যেন দিঘির জলে চাঁদের রেখা।

অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। বললেম, "সেদিন তোমাকে শ্রাবণের মেঘের মতো কালো দেখেছি, আজ যে দেখি আশ্বিনের সোনার প্রতিমা। সেদিনকার চোখের জল কি হারিয়ে ফেলেছ।"

কোনো কথাটি না বলে সে একটু হাসলে; বুঝলেম, সবটুকু রয়ে গেছে ঐ হাসিতে। বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

কবি জানতে চাইলেন, তাঁর সেই পঁচিশ বছরের যৌবনকে কি আজও সে তার কাছে রেখে দিয়েছে? বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন, তার গলায় সেদিনকার বসন্তের মালার একটি পাপড়িও খসে নি। কবি বুঝলেন, তাঁর আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু তার গলায় তাঁর সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি। তারপর:

আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলে। বললে, "মনে আছে? যেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককেই চাও।"

লজ্জিত হয়ে বললেম, "বলেছিলেম। কিন্তু তার পরে অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।"

সে বললে, "যে অন্তর্যামীর বর, তিনি তো ভোলেন নি। আমি সেই অবধি ছায়াতলে গোপনে বসে আছি। আমাকে বরণ করে নাও।"

আমি তার হাতখানি আমার হাতে তুলে নিয়ে বললেম, "এ কী তোমার অপরূপ মূর্তি।"

সে বললে, "যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।"

শেষ বাক্যটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। 'যা ছিল শোক আজ তাই হয়েছে শান্তি'। কিন্তু প্রাপ্তির দিক থেকে কমতি কিছুই পড়ে নি। আটাত্তর বছর বয়স পেরিয়ে সেদিনকার পঁচিশ বছরের বসন্তের মালাটি গলায় পরে পুনর্মিলনের এ এক অভিনব আস্বাদন। অন্তরের দিক থেকে প্রাণের মধ্যে ফিরে পেয়ে বাইরের দিক থেকে দেহরূপকে হারানোর ব্যথা তোলবার এ এক অপূর্ব হরণপূরণলীলা। ভৎর্সনাচ্ছলে এই প্রতিশ্রুতিই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে "কৃতঘ্ন শোক" রচনায়।

ভোরবেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বসল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বললেম, "এই তো টেবিলে সেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নামলেখা হাতপাখাখানি—সবই তো সত্য।"

মন বললে, "তবু ভেবে দেখো—"

আমি বললেম, "থামো তুমি। ঐ দেখো-না গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা; সবটা পড়া শেষ হয় নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশী মায়া হল কেন।"

* * * *

ছোটো ছেলে যেমন রাগ করে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগলেম। বললেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চমকে উঠলেম। মনে হল কে বললে, "অকৃতজ্ঞ!"

জানলার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠছে, যে গেছে যেন তারই হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভৎর্সনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

এ প্রতীতি দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ ও স্বতঃস্ফূর্ত। সামান্যতম টীকাভাষ্যের ভারও যেন এর সইবে না। কিন্তু শুধু 'ধরা দেওয়া'ই নয়, সাত বছর বয়স থেকে চব্বিশ বছর পর্যন্ত কবির সমগ্র জীবনটাই যে তাঁর রচনা এ কথাও আটাত্তর বছর বয়সে কবি পুনরায় স্বীকার করে বলছেন:

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা-যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি; তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান,

কত ইশারা ; তারই সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের জাগা ঘুমে শুকতারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের জলসন্ধ্যায় চামেলিফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলুবারোয়াঁ ; সতেরো বছর ধরে এই-সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাকত। ঐ নামে যে মানুষ সাড়া দিত সে তো একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া ; কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সামনে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

এখানেও আমার 'জীবনদেবতা'র কথা মনে পড়ছে। 'কেবল একটি লোকের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ!' সে তো একা বিধাতার রচনা হতেই পারে না! তবু কবির জীবন-রচয়িত্রী তাঁর জীবনদেবতার স্বরূপ-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করব না। কেবল কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর ৩৫ বৎসর পরে ব্যক্তিসীমার জগতে দাঁড়িয়ে কবির এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতির গুরুত্ব কী ও কতটা সে সম্পর্কে সহৃদয় পাঠক-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই 'লিপিকা'র সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করব।

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৫ ; যাত্রী, পৃ. ১৩১।
২ জীবনস্মৃতি, রচনাবলী-১৭, পৃ. ২৬৪।
৩ কবিকথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫৩ পৃ. ১৪৭-৪৮।
৪। আত্মপরিচয়, পৃ. ৭।

শীতের বৃষ্টি

সন্তোষকুমার অধিকারী

এখনই তো ছিল ছায়া আলো।
কৃষ্ণচূড়ার মত লাল হয়ে সে চাওয়ার মায়া
ভরে ছিল নীল মেঘে মেঘে।
ভীরু পাখিদের দলে উড়ে যাওয়া অনেক আশায়
ছোট ছোট স্বপ্ন জেগে ছিল ;
ছিল সকালের মায়া, রাগরক্ত
বর্ণালীর ছবি,
জলে ভেজা একটু আকাশ।

কেঁদে গেল তবু মেঘমেয়ে।
হয়তো একটু কিছু খুঁটিনাটি বেধেছে কোথাও
একটু হতাশ হয়ে শিশুটির মত
অবোধ অহেতু কান্না ;
তবু সেই স্যাঁতসেঁতে ভিজে চোখে কি কাঁপন ছিল
কেন যে হারালো আলো, ফুরালো হৃদয়
মুছে গেল কুয়াশায় রঙ…
কেন যে কেঁদেছে সেই মেয়ে!

এখন তো ছায়া ছায়া শুধু।
জলে লেখা আঁধারের রেশ ধরে কাঁপা
এখন তো বিধুর দুপুর।
মন নেই, মুছে যাওয়া ধোওয়া আশা
সবুজ আকাশে
কি শীতের কেবল ধূসর!
কেন যে কেঁদেছে সেই মেয়ে?

প্রেম

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

প্রেম—
লোকে বলে নিকষিত হেম !
আমার অন্তরে তার
স্থান খুঁজি ফিরি বারে বার।
সে কি শুধু কবির কল্পনা,
সে কি ভরা-বরষার সলিল-জল্পনা,
কামনার চির-স্বপ্নলোক ?
প্রত্যক্ষ মানসপটে জ্বালে না আলোক ?

স্মরণের সিন্ধুনীরে অকস্মাৎ কেন কলরোল ?
বসন্তের রক্তিমায় কেন দোলে মদির হিল্লোল ?
পুষ্পে পুষ্পে সুরভির উচ্ছ্বসিত নিমন্ত্রণে বুঝি
আশামুগ্ধ ভ্রমরের লুব্ধ হিয়া নিত্য পায় খুঁজি
প্রেমের আরতি ?
যেন কোন মায়াবী মিনতি,
মৃদু মন্দ মদির পবনে,
প্রভাতের আলোর স্বপনে,
নিরন্তর গন্ধ বয়ে আনে
প্রস্ফুটিত প্রসূনের প্রাণে !
পরাগে পরাগে তার মিশে আছে স্পর্শব্যাকুলতা—
উচ্ছ্বসিত যৌবন-বারতা !
কামনারে পান করি কোরক-ভৃঙ্গারে
উল্লসিত মধুকর মাধবী শৃঙ্গারে !
সে কী প্রেম তার ?
আসঙ্গ-আনন্দলোকে অমৃত সঞ্চার !

দিগন্তে ভাঙিয়া পড়ে বৈশাখের ঝড়,
হিমালয় শৃঙ্গ তবু অচল অনড়,
এলাইয়া জটাজাল যেন কী আশ্বাসে,
অশনির ঘোর অট্টহাসে
ভুবন ভরিয়া তোলে—
প্রাবৃটে সন্ধ্যার কোলে
দীর্ণা এই ধরণীর বিশীর্ণ অন্তর
কান পেতে শোনে শুধু কোন বার্তা আনিয়াছে ঝড় !
একবিন্দু স্নেহ নাই, একবিন্দু নাই বারিকণা,—
প্রহেলিকাময়ী শুধু বৈশাখীর প্রমূর্ত বঞ্চনা !
তবু তার চিত্ততলে দীর্ঘশ্বাস ওঠে প্রমথিয়া,
বিদীর্ণ প্রান্তরে শ্যাম-স্বপ্ন বিরচিয়া।
বাসনার শূন্যপাত্রে ভিখারীর অমূল্য সঞ্চয়,
মুমূর্ষু মনের মাঝে আশামুগ্ধ সতৃষ্ণ প্রণয়
মুহূর্তে মূরছি পড়ে—
বিরহের অশ্রু-বাষ্পে হৃদয় গুমরে !

সেও কি প্রেমের ছবি ?
তারি লাগি' পৃথিবীর কবি
বর্ণে রূপে কল্পনার উৎসব বাসরে
তুলিকার আলিম্পনে অনুরাগ ভরে
সাজায় যতনে ?
দূরে ওই শ্রাবণ গগনে
ঘন কৃষ্ণ মেঘমালা পুঞ্জে পুঞ্জে আসি'
কহে, ভালবাসি
ধরণীর এই ধূলি-লাঞ্ছিত অঞ্চল,
ভালবাসি তৃণাঙ্কুরে, আবেগ-চঞ্চল
রজনীগন্ধার বুকে আকুল সৌরভে
মত্তভৃঙ্গগুঞ্জনের আকুতি-গৌরবে
উৎসবের রসাভাস উন্মুখ যৌবনে,
ধারাসার অঝোর বর্ষণে
পত্রপুঞ্জে, নবকলিকায়,
দুর্মদ আবেগভরে থরো থরো স্বর্ণলতিকায়
জাগে সাড়া নূতন প্রাণের—
সিক্ত স্নেহ বিলসিত রূপ সন্ধানের
প্রথম আরতি !
গোধূলিরে করিয়া সারথি
রাত্রির আঁধার নামে কুহক বিথারি'—
যেন এক নারী
আঁখি দুটি সুরঞ্জিয়া কালোর কাজলে,
চরণের চারুছন্দে অভিসারে চলে !
আকাশের তারকার মেলা
যেন তার সাথী হয়ে নিত্য করে খেলা

কৌতুক রভসে,
রজনীর আঁখিপাতে অজানার স্বপন পরশে !

সেও কি প্রেমের ছবি ?
তারি লাগি পৃথিবীর কবি
নব নব স্তবগান চলেছে গাহিয়া ?
মেঘাচ্ছন্ন দিগন্তে চাহিয়া,
কোথা কোন বিরহীর মর্মস্থল হ'তে,
একটি দীর্ঘশ্বাস কল্পনার রথে
ছুটে চলে দয়িতার সন্ধানে ব্যাকুল,
হিমগিরি-কাননের কুঞ্জে কোথা কামনার ফুল
উঠেছে ফুটিয়া—
সমুদ্গত গন্ধ তার পড়িছে লুটিয়া
ধরণীর শ্যামাঞ্চলে সবি,
সেও কি প্রেমের ছবি ?
প্রেয়সীরে পেয়ে হারা, না পেয়ে নির্ভর,
প্রেমের বিচিত্র গতি ব্যাপ্ত চরাচর !

ভাদরের ভরানদী অবাধ উল্লাসে ছুটে চলে
সাগরসঙ্গমপানে, অনন্তে চাহিয়া কুতূহলে !
আজি তাই শরতের সোনালী গগনে
যেন কার বার্তা জাগে উৎসব-লগনে
মিলনের প্রকাশ-মধুর !
দূর হ'তে অতি বহু দূর
নিত্য তারি আমন্ত্রণ বাতাসের পাথায় পাথায়—
হৃদয়ের বেদীমূলে যেন কে মাথায়
অনুরাগ চন্দনের স্নিগ্ধ অনুলেপ !
বৃথা কালক্ষেপ,
বৃথা এই কল্পনার পূজা সঙ্গোপনে,
আলসে বসিয়া থাকা মনের গহনে।
দিক হতে দিগন্তরে আজ শুধু উদার আহ্বান,
পৃথিবীর বুকে জাগে হেমন্তের গান !
আপনারে রিক্ত করি, তিলে তিলে করি সমর্পণ,
নিঃসীম বিশ্বের মাঝে চিত্তে আজি হোক বিসর্জন
চিহ্নিত সীমার !
নিজেরে নৈবেদ্য করি' পূজারিণী এই বসুধার
অর্ঘ্য মাঝে সঁপে দাও প্রাণ,—
শুনি সে আহ্বান,
এই যে ছুটিয়া চলা অনির্দেশ সুমুখের পানে,
নিখিলের প্রাণরসে উচ্ছলিত সাগর-সন্ধানে,
সেও কি প্রেমের ছবি ?
তারি লাগি' জয়গান নিত্য গাহে কবি—
কণ্ঠে তার অনন্তের সুর,
উদাত্ত মধুর ?

কামনার বহ্নি-স্রোতে জাগে যেন শান্তির বারতা—
নিঃশব্দ শীতের রাতে মৌন গভীরতা
বুঝি কোন বৈরাগ্য-লীলায়
নিঃসঙ্গ তাপস সম অন্তরের গহন দিশায়
মগ্ন হয়ে রয় !
যেন তারি পরিচয়
দিগন্ত প্রাকারে রচি' ঘন কুজ্ঝটিকা
আপনারে রুদ্ধ করি' বীজ-মন্ত্রে আঁকে রাজটিকা !
নিস্তরঙ্গ প্রাণের সাগরে—
নিত্য অবগাহনের তীর্থশিলা নিত্য নিজে গড়ে।
সেও কি প্রেমের ছবি ?
জীবনের রূপাঙ্গনে বাজে তারি রাগিণী পূরবী ?
যেন সেই রুদ্ধ রাত্রি অবসান কালে,
কোন এক নব সূর্য আকাশের ভালে
বসন্তের মহিমায় উঠিবে ফুটিয়া—
বীজ-তন্ত্রে লক্ষ প্রাণ আসিবে ছুটিয়া
আবেদন নিবেদনে উন্মুখ সহাস—
নূতনের ছন্দ রচি' শতবর্ণে করিবে প্রকাশ
অন্তরের আকুল সুরভি !
সেও কি প্রেমের ছবি ?

যে প্রেম মিলন মাঝে পরিপূর্ণতায়—
যে প্রেম বিরহী-বুকে বঁধুরে কাঁদায়—
যে প্রেম জানায় শুধু রিক্তের বেদন,
যে প্রেম অসীমে করে আপনার জন,
যে প্রেম ধ্যানের মণি অন্তর গহনে,
যে প্রেম বসন্ত-সাথী পূর্ণিমা-লগনে,
সে প্রেম আমারও বুকে জাগে নিশিদিন,
সে প্রেম ধরার ছবি আবাস্তে রঙীন।

প্রসঙ্গ কথা

বিশ্বাস ও সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

কিছুদিন আগে কলকাতায় শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে একটি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান হয়েছিল। আলোচনার বিষয় ছিল 'বিশ্বাস ও সাহিত্য'। 'বিশ্বাস' বলতে এখানে ভগবদ্‌বিশ্বাস বা আধ্যাত্মিক অভীপ্সা বা ওই-জাতীয় কিছু বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে যে-কোন রকমের গভীর প্রত্যয়ের কথা—সে প্রত্যয় দর্শন-সংশ্লিষ্ট হতে পারে, নীতি-সংশ্লিষ্ট হতে পারে, এমন কি রাজনীতি-সংশ্লিষ্টও হতে পারে। প্রশ্ন হল, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই সকল প্রত্যয়গত মানদণ্ড প্রয়োগের কোন সার্থকতা আছে কি না, না কি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের মূল্যবিচার প্রসঙ্গে এ সকল একেবারেই অবান্তর? আলোচনা-চক্রে বিচার্য বিষয়টিকে ইংরেজীতে উপস্থাপিত করা হয়েছিল এইভাবে—The Relevance or Irrelevance of Philosophical, Moral and Political Considerations in the evaluation of Creative Literature.

এই বিষয়টির উপর আমরা আমাদের মনোযোগ বিশেষভাবে স্থাপন করেছি তার কারণ, যে-কোন প্রকারের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের বিচারক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হয়ে সাহিত্য-সমালোচক কোন-না-কোন সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির সম্মুখীন হন। সাহিত্য-সমালোচকের নিকট এ এক কঠিন সমস্যা—তিনি কি সাহিত্যসৃষ্টিকে বিশুদ্ধ শিল্পের দৃষ্টিতে বিচার করবেন, না, ওই বিচারক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যস্রষ্টার দার্শনিক নৈতিক কিংবা তাৎকালিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী যদি কিছু থেকে থাকে তাকেও গণনীয় বিষয় বলে মনে করবেন? অথবা প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে এইভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে—সাহিত্যসৃষ্টি কি বিশুদ্ধ শিল্পকর্ম হিসাবেই বিচার্য? না, সাহিত্যসৃষ্টির মূল্যায়নের বেলায় যুগপৎ সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্গত দার্শনিক নৈতিক রাজনৈতিক প্রশ্নের মূল্যায়নও অপরিহার্য? সেই সঙ্গে সমালোচকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্নটিও উপেক্ষণীয় নয়। সমালোচকের নিজস্ব দার্শনিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে। তাঁর বিশেষ একটি রাজনৈতিক মত থাকাও বিচিত্র নয়। এখন, সাহিত্য-কর্মের মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি কি উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গী-গুলিকে সাময়িকভাবে শিকায় তুলে রাখবেন? অথবা, ওইগুলিকে নিয়েই, ওইগুলির সঙ্গে জড়িয়ে-মিশিয়েই সাহিত্য-বিচারক্রিয়ার ফলাফল উপস্থাপিত করবেন? সমালোচকের সমক্ষে এও বড় কম সমস্যা নয়। সুতরাং প্রশ্নটি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে আর এই প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্য থেকেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

এইখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল। আলোচ্য প্রশ্নটিকে যেমন সমালোচকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় তেমনই শিল্পীর অর্থাৎ যিনি সাহিত্যসৃষ্টি করছেন তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেও বিচার করা যায়। শিল্পীর সমক্ষে প্রশ্নটি সচরাচর এইভাবে এসে দেখা দেয়—আমি কি শুধুই সৌন্দর্যের দাবী পরিপূরণের উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টিতে অগ্রসর হব, না, সৌন্দর্যের দাবীর প্রতি অবহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ-ভাবনার দ্বারাও ভাবিত হব? সমাজ-কল্যাণ-ভাবনার দ্বারা ভাবিত হওয়া যদি শিল্পীর পক্ষে দোষের কিছু না হয়, বরং শিল্পীর একটি অতিরিক্ত গুণরূপে স্বীকৃত হয়, তা হলে স্বতঃই শিল্পকর্মের ভিতর দার্শনিক নৈতিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কেন না, সমাজ-কল্যাণের প্রশ্নের সঙ্গে এ সকল প্রশ্নের যোগ অতি নিগূঢ়, প্রায়-অচ্ছেদ্য বললেও চলে। নীতি বাদ দিয়ে সমাজ-কল্যাণ হয় না, এমন কি কোন কোন সময় রাজনীতি বাদ দিয়েও সমাজ-

কল্যাণ হয় না। যেমন পরাধীন জাতির বেলায়, জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন রূপ রাজনৈতিক আন্দোলন সেই জাতির সমাজ-কল্যাণের একটি অপরিহার্য শর্ত বললেও চলে। রাজনীতি বর্তমান কালে যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং যে আকারে তার চর্চা হচ্ছে তাতে রাজনীতি জাতির জীবনে প্রায়শঃ অনর্থের সূত্রপাত করে, কিন্তু বিশেষ অবস্থায় রাজনীতিচর্চা অকল্যাণকর বলা চলে না। অধীন বা অনুন্নত দেশের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়, বরং সর্বতঃ চর্চাযোগ্য। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অধ্যায় ভারতের বৃহত্তর সমাজ-কল্যাণের একটি অপরিহার্য পটভূমিস্বরূপ। বহু বহু সাহিত্যস্রষ্টা জাতীয়তাবাদী মনোভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের সে সৃষ্টির মাহাত্ম্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, এমন সাহিত্যিক দিক্‌পালও আছেন, যিনি সাহিত্য-সৌন্দর্যেরই মাত্র স্রষ্টা নন, একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী অভীপ্সারও জনক। যেমন আমাদের সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্যে যে ভাবধারার সূত্রপাত করলেন তা-ই ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে কালক্রমে সমগ্র দেশকে পরিপ্লাবিত করল, ভারতবর্ষে এক মহিমময় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করল। বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচিত 'বন্দে মাতরম্' গান সেই আন্দোলনের বীজমন্ত্রস্বরূপ হল। সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতি সাহিত্যে অনাচরণীয় নয়, উল্টো, সাহিত্যে অনুশীলনযোগ্য বিষয়। এরকম ক্ষেত্রে রাজনীতি সাহিত্যের বলবর্ধক। আর, সবশেষে, দর্শনকে বাদ দিয়ে বোধ হয় সৎ সাহিত্য মহৎ সাহিত্য কল্পনাই করা যায় না। যে-কোন বড় সাহিত্যসৃষ্টির পশ্চাতে দর্শনের পটভূমি বিলম্বিত থাকে—তা সে প্রত্যক্ষতঃই হোক আর প্রচ্ছন্নভাবেই হোক। দর্শন বলতে এখানে অ্যাকাডেমিক দর্শনের কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে জীবনদর্শনের কথা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা বিশেষ প্রজ্ঞাশীল দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। এ দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে বোধ হয় সাহিত্যসৃষ্টিকে উচ্চতর মহিমায় মণ্ডিত করা যায় না। মোহিতলাল একে নাম দিয়েছেন 'জীবন-জিজ্ঞাসা', কেউ বলেন 'জীবনবোধ' বা 'জীবনানুভূতি'। কিন্তু যিনি যে নামেই এই দৃষ্টিভঙ্গীকে অভিহিত করুন না কেন, এটি না হলে সাহিত্যসৃষ্টির একটি মূল উপাদানেই ঘাটতি থেকে যায়।

সুতরাং শিল্পী এবং সমালোচক উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রশ্নটি গভীরভাবে বিচারণীয়। উভয়ের কর্মের সঙ্গেই এর সম্পর্ক রয়েছে, কাজেই প্রশ্নটিকে যুক্তভাবে বিচার করাই সঙ্গত হবে।

সাহিত্যবিচারের নানা পদ্ধতি প্রচলিত, তবে এর মধ্যে দুটি পদ্ধতি বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে দুটি পদ্ধতি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিরোধী, সেই কারণেই সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশী বিজ্ঞাপিত। এর একটির নাম বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শ, অপরটির নাম সমাজ-কল্যাণাশ্রিত সাহিত্যাদর্শ। বিশুদ্ধ সাহিত্যাদর্শ রসবাদী দৃষ্টিকোণ-প্রসূত, সৌন্দর্যকেই সে সাহিত্যসৃষ্টির চরম পরম ও একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করে। অন্যপক্ষে সমাজ-কল্যাণাশ্রয়ী সাহিত্যাদর্শের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা বলেন, সমাজহিত সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অভিপ্রায় না হলেও উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির দ্বারা সব সময়েই সমাজের হিত সাধিত হয়। সর্বোচ্চপর্যায়ের লেখকমাত্রের মন সমাজভাবনার দ্বারা পরিপূরিত থাকে এবং তাঁদের লেখায় সে ভাবনার ছাপ পড়ে। তাঁরা হয়তো লেখার মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে সমাজহিতের আদর্শ প্রচার করেন না, কিন্তু তাঁদের মনের পটে সর্বদা সমাজহিতের লক্ষ্য সুমুদ্রিত থাকে। সমাজহিতের অভিপ্রায় ও অভীপ্সা তাঁরা তাঁদের শিল্পীমনে সহজাত মানবতাবাদী প্রত্যয় থেকে আহরণের চেষ্টা করেন। তাঁদের এই সমাজ-কল্যাণেচ্ছা তাঁদের দার্শনিক ও নৈতিক ধ্যান-ধারণার দ্বারা আরও পুষ্ট হয়। কখনও কখনও রাজনৈতিক বিশ্বাসের দ্বারাও ইচ্ছাটি পুষ্ট হতে দেখা যায়, যদি অবশ্য সাহিত্যের স্বধর্ম থেকে স্খলিত হওয়ার কোন কারণ না ঘটে। কিন্তু মুশকিল হয় এই যে, রাজনৈতিক দলীয় মতের প্রতি আনুগত্যের আতিশয্য বশতঃ প্রায়ই লেখকমনে সাহিত্যের স্বধর্মের বোধ নিষ্প্রভ হয়ে আসে আর তাইতেই ঘটে যত বিপত্তি। এমনতর বিরূপ সংঘটনের নজির স্বরূপ বর্তমানের রাজনৈতিক সাহিত্যিকদের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। সাম্প্রতিক-কালের যেসব লেখক প্রকাশ্যতঃ বামপন্থী রাজনৈতিক চিন্তাদর্শের অনুগত হয়ে লেখনী চালনা করেন তাঁরা তাঁদের লেখায় কিছুপরিমাণে সমাজ-কল্যাণের অভীপ্সা সকারে যে সমর্থ না হন এমন নয়, কিন্তু প্রায়শঃ তাঁদের রচনায় রাজ্য

রক্ষিত হয় না। রাজনৈতিক মতাদর্শগতের উগ্রতার অন্তরালে সাহিত্য চাপা পড়ে যায়। সাহিত্যের স্বধর্মের হানি না ঘটিয়ে যে লেখক সমাজ-কল্যাণের আদর্শ অনুসরণে সফলকাম হন তাঁর লেখা যে বিশেষ সবলতাপ্রাপ্ত হয় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

দার্শনিক-নৈতিক-রাজনৈতিক ভাবনা ছাড়াও আর একপ্রকার মৌল ভাবনার দ্বারা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা যায়। তা হল ধর্মভাবনা। কিন্তু ইদানীং বস্তুতন্ত্রী মানবতাবাদী প্রত্যয়ের সমধিক প্রভাবের ফলে ধর্মচিন্তা সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বহু দূরে সরে গেছে বলে মনে হয়। ধর্মচিন্তা ছিল মধ্যযুগীয় সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। বস্তুতঃ সেইটিই তদানীন্তন সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল। তারপর ক্রমে ক্রমে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে ধর্মচিন্তার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাব ক্রমবিস্তৃত হওয়ার ফলে যতই পৃথিবীতে আধুনিক যুগ এগিয়ে এসেছে ততই ধর্ম সাহিত্য থেকে ক্রমশঃ দূরবর্তী হয়ে পড়েছে। ধর্মের এই দূরাপসরণে সাহিত্যের ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সঠিক নির্ণয় করা মুশকিল, তবে এ কথা বিনা দ্বিধায়ই একপ্রকার বলা চলে যে প্রত্যেক মহৎ সাহিত্যিকের মধ্যেই একটা মৌলিক ধর্মানুভূতি তাঁর মনের তলায় প্রচ্ছন্ন থাকে। তা যদি না হত তা হলে সাহিত্যের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের প্রেরণাই বোধ করি তিনি অনুভব করতেন না। কোন মহৎ সাহিত্যিক তাঁর রচনাবলীর মধ্য দিয়ে অধর্ম প্রচার করেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বের সাহিত্যের ইতিহাসে কুত্রাপি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ধর্মকে আমরা বাক্যতঃ স্বীকার করি আর না করি, ধর্ম সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে।

সাহিত্যকে ধর্ম দর্শন নীতি ও রাজনীতি ভাবনার দ্বারা অন্বিত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতদ্বৈত থাকতে পারে, থাকাই স্বাভাবিক এবং আছেও, কিন্তু ওই বিশেষ দৃষ্টিকোণটিকে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু গোল বাধে সাহিত্যের রসভাষ্য নিয়ে, বহুকথিত সৌন্দর্যসৃষ্টির আদর্শ নিয়ে। 'সৌন্দর্য' কথাটি শুনতে মধুর শোনালেও সাহিত্যে কাকে সুন্দর বলব সে বিষয়ে চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো বড় সহজ ব্যাপার নয়। গোলাপফুল তার বর্ণালীর অনন্যতায় আর পাপড়ির কমনীয়তায় ও বিন্যাসবৈশিষ্ট্যে চকিতে আমাদের মনোহরণ করে; সুতরাং গোলাপফুলকে সুন্দর বলতে আমাদের মুহূর্তেকেরও দ্বিধা হয় না। সুন্দরী নারীর মুখের ডৌলে আর দেহযষ্টির ভঙ্গিমায় এমন একটা শ্রীছাঁদ সৌষ্ঠব আর গঠনপারিপাট্য আছে যে ওই পরিমিতির সুষমা আমাদের চিত্তকে অবলীলাক্রমে মুগ্ধ করে এবং মনের ভিতর একটা বিমল আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। কিন্তু সাহিত্যের সৌন্দর্য কী বস্তু? তার কী মানদণ্ড কী সংজ্ঞা কী উপাদান? কোন্ লেখাকে আমরা সুন্দর বলব? কোন্ লেখা আমাদের মনে রসানুভূতি জাগায় বলে আমাদের বিশ্বাস? ধরুন একটি ছোটগল্প বা উপন্যাস। সেটি যদি সুছাঁদ ভাষায় পরিপাটি আঙ্গিকের আশ্রয়ে আদ্যন্তমধ্যসুগ্রথিত আকারে সুরচিত হয়ে পাঠকসাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করে তা হলেই কি তাকে আমরা সুন্দর আখ্যা দেব? না কি, সেই সঙ্গে রচনার মধ্যে বিষয়ের মহিমাও দাবী করব? এমনও তো হতে পারে একটি উপন্যাস পরিপাটি ভাবে রচিত হয়েছে অথচ তার বিষয়বস্তু নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর? তার ভাষায় খুঁত নেই আঙ্গিকে খুঁত নেই কাহিনীসজ্জায় খুঁত নেই, অথচ এত যে পারিপাট্য এত যে আয়োজন এত যে তোড়জোড় সে সবই একটি তুচ্ছ কাহিনীকে অবলম্বন করে দাঁড়িয়ে আছে। এরকম ক্ষেত্রে আমরা সংশ্লিষ্ট রচনাকে সুন্দর বলব কি না সেই হল প্রশ্ন।

যাঁরা মুখ্যতঃ সৌন্দর্যবাদী তাঁরা বলবেন, ওইতেই রচনাটি সুন্দর হয়েছে এমন রায় দেওয়া যেতে পারে। কেন না বিষয়মহিমার দিক থেকে রচনাটির মূল্য যতই লঘু হোক তার বিন্যাসপারিপাট্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। মানুষের মনে যে সহজাত শৃঙ্খলাবোধ রয়েছে পরিমিতির ক্ষুধা রয়েছে তা এই পারিপাট্যের দ্বারা তৃপ্ত হয় এবং তার ফলে তার মনে একটা আনন্দের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে। এই আনন্দ শিল্পের আনন্দ, সৌন্দর্যের আনন্দ—এর সঙ্গে সমাজকল্যাণ জাতিকল্যাণ ইত্যাদির কোন সম্পর্ক নেই। সৌন্দর্যবাদীদের মতে সৌন্দর্যসৃষ্টি নিজেই একটা চূড়ান্ত লক্ষ্য, তার মধ্যে সমাজকল্যাণ মানবতাবাদী প্রত্যয় দার্শনিক বিশ্বাস ইত্যাদি নানা অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করে মূল লক্ষ্যটিকে গুলিয়ে

কেজোর কোন অর্থ হয় না। শুধু তাই নয়, সৌন্দর্যবাদীদের মধ্যে যাঁরা চরমপন্থী তাঁরা এমন পর্যন্ত বলেন যে, সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রয়োজনের পার্শ্বে আর সব প্রয়োজন নিতান্ত নিষ্প্রভ। একটি ভাল কবিতা পড়বার পর মনে যে গভীর রসানুভূতির উদ্রেক হয় সেই তন্ময়তার পাশে আর সব ভাবনা আপনা থেকেই ফিকে হয়ে আসে। আলোচ্য দৃষ্টিভঙ্গীর মানদণ্ডে সৌন্দর্য বা রস নিজেই একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য (end), তাকে অন্য কোন লক্ষ্যের অনুগত বা অধীন মনে করবার কারণ নেই। শিল্পকে সমাজ-কল্যাণের উপায় মনে না করে সমাজকল্যাণকে শিল্পের উপায় বলে মনে করলে সভ্যতার হিত বই অহিত হবে না।

উপরি-উল্লিখিত মতবাদের মধ্যে সত্য আছে কিন্তু সে সত্য খুব বড় দরের সত্য নয় বলেই আমাদের ধারণা। যাঁরা রচনার ভাষা লিপিভঙ্গী আর আঙ্গিকের মধ্যে সকল সৌন্দর্য খোঁজেন, ব্যঞ্জনাপ্রধান বাক্য ও ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে সাহিত্যশিল্পের সকল রস নিহিত রয়েছে বলে মনে করেন, তাঁরা যদি কিছুকাল গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এ-জাতীয় অনুসন্ধানক্রিয়ায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন এবং এই দিকেই বিশেষ ভাবে চোখ রেখে অনুশীলন চালিয়ে যান তা হলে তাঁরা দেখতে পাবেন, অনেক সুন্দর বলে কথিত রচনাই তাঁদের চোখে আর সুন্দর ঠেকছে না, অনেক তথাকথিত স্মার্ট চটপটে চতুর রচনাভঙ্গীই তাঁদের পরিমার্জিত রুচিতে নিতান্ত জোলো ঠেকছে। যে রচনার বিন্যাসপারিপাট্য দেখে এক সময়ে তাঁরা "আহা, কী সুন্দর!" বলে উল্লসিত হয়ে উঠেছেন, সেই রচনার আবেদন ইতোমধ্যে তাঁদের নিকট বিস্বাদ হয়ে গেছে। এই ভাবে 'এহো বাহ্য, এহো বাহ্য' করে নেতি-নেতির পথে যদি তাঁরা অনেক দূর অগ্রসর হন, সে ক্ষেত্রে তাঁরা সচকিত হয়ে লক্ষ্য করবেন যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ লেখকদের রচনা ছাড়া আর-কিছুই তাঁদের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারছে না। তাঁদের অনুসন্ধানস্পৃহা যদি খাঁটি হয়, সন্ধান যদি যথেষ্ট তৎপরতার সহিত চালিত হয়, তা হলে ওই আন্তরিকতাই তাঁদের একদিন গ্রহণ-বর্জন-নির্বাচনপন্থী সাহিত্যসত্যের একেবারে চরম পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে।

কেন এমন হয়? হয় এই কারণে যে, নিছক বাক্‌ভঙ্গীর সৌন্দর্য ও চারুতা খুব একটা উঁচু দরের সৌন্দর্য নয়। এ-জাতীয় সৌন্দর্যের দ্বারা রাতারাতি মন অভিভূত হতে পারে, কিন্তু যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তথাকথিত সৌন্দর্য-চারুতার অতিরিক্ত মূল্যবোধ কিছু খোঁজেন, কল্যাণ-ভাবনার দ্বারা যাঁদের মন বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত, সত্য-জিজ্ঞাসায় যাঁদের মন পরিপূরিত, তাঁরা আর ওতে বিশেষ কোন আস্বাদ পান না। তাঁদের অনুশীলিত রুচিবোধের নিকট সেই সমস্ত রচনাই গ্রহণীয় বলে মনে হয়, যে রচনা লিপিভঙ্গীর উৎকর্ষের দাবীর প্রতি যেমন সচেতন তেমনই শেষোক্ত মহৎ ভাবনাগুলিকেও তাঁদের রচনাদেহে সুগ্রথিত করতে সমান যত্নপর। এ-জাতীয় সাহিত্যশিল্পী হলেন কালিদাস রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়র গ্যেটে, উপন্যাসশিল্পে পাশ্চাত্যে ডস্টয়েভস্কি টলস্টয়, এ দেশে বঙ্কিমচন্দ্র। এঁদের রচনা নিছক সৌন্দর্যবাদী রচনা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী-কিছু। যদি বলেন কালিদাস আর শেক্সপীয়রের রচনা নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের সার, তাঁদের রচনার সঙ্গে সমাজ-ভাবনার সাক্ষাৎ-সম্পর্ক কিছু আছে বলে মনে হয় না, সেক্ষেত্রে বলব, এই-জাতীয় বিশ্লেষণ কালিদাস-শেক্সপীয়রের সাহিত্যের ভাসা-ভাসা বিশ্লেষণ মাত্র, ওর দ্বারা ওই দুই শ্রেষ্ঠ কবির রচনার গহনে প্রবেশ কোনমতেই বোঝায় না। এমনতর পল্লবগ্রাহী আর বহিঃসৌন্দর্যে মুগ্ধ পাঠককে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' নামক গ্রন্থখানা নাড়াচাড়া করে দেখতে বলি। কালিদাস আর শেক্সপীয়রের আপাত-সৌন্দর্যবাদ আর রচনোৎকর্ষের পিছনে কী গভীর সমাজকল্যাণ-ভাবনা সত্য আর জীবনজিজ্ঞাসা নিহিত আছে, তা একটু চিন্তা করলেই আমরা তখন বুঝতে পারব।

যে রচনার পিছনে প্রজ্ঞার দ্যোতনা নেই দার্শনিক ভাবনার পটভূমি বিলম্বিত নেই, সে রচনা বিচক্ষণ পাঠকের উৎসাহ উদ্রেকে সমর্থ হয় না। অনেকে নীতির নামোল্লেখমাত্রে আঁতকে ওঠেন, যেন 'নীতিবাদী' কথাটার মধ্যেই একটা দোষাবহ কিছু আছে। কেউ কেউ নীতিকে 'স্কুলমাস্টারী মনোভাব' আখ্যা দিয়ে আত্মসন্তোষ লাভ করবারও চেষ্টা করে থাকেন। ভাবখানা এই যে, নীতির কারবার করবে শুধু নীতিপন্থী স্কুলমাস্টার বর্গের লেখক ও সমালোচকেরা। প্রতিভাবান শক্তিমান লেখকের মনোজীবনের সঙ্গে নীতির কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা

সর্বপ্রকার নীতির হয় উর্ধ্বে বিরাজ করেন নয় নিম্নে অবস্থান করেন। নিম্নে অবস্থান করাটাই বোধ হয় সাধারণ রেওয়াজ। কিন্তু এঁরা জানেন না যে সকল মহৎ সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেই বৃহত্তর অর্থে নীতি ওতপ্রোত হয়ে থাকে। যে রচনা একান্তভাবেই didactic, নীতি প্রচার ছাড়া যে রচনার অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই, সে রচনা সাহিত্য-বিচারে গ্রাহ্য না হতে পারে, কিন্তু যে রচনা বৃহৎ নীতির পোষকতা করে, বৃহৎ নীতির পোষকতার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে পাঠকমনে ধর্মভাবের উজ্জীবন ঘটায়, সে রচনার মূল্য ও মর্যাদা অস্বীকার করবার শক্তি কোন পাঠকেরই নেই, তা তিনি যত বড় সৌন্দর্যবাদী পাঠকই হোন না কেন। শেক্সপীয়রের 'ওথেলো,' 'ম্যাকবেথ,' এমন কি 'হ্যামলেট' বৃহত্তর অর্থে নীতিবাদী রচনা। প্রথম নাটকে ঈর্ষা ও অতিরিক্ত সরল বিশ্বাসের পরিণাম, দ্বিতীয় নাটকে আত্যন্তিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিণাম, তৃতীয় নাটকে দাম্পত্য-বিশ্বাসহীনতার পরিণাম বর্ণিত হয়েছে। তাই বলে এই নাটকত্রয়ের সুগভীর শিল্পসৌন্দর্য কে অস্বীকার করবে? বরং এই তিন বিয়োগান্ত নাটকে যে সুউচ্চ নীতির ঘোষণা আছে তাইতেই ওই রচনাত্রয় শিল্পসৌন্দর্যের এক সমুন্নত ভূমিতে স্বতঃই উত্তীর্ণ হয়েছে। আলোচ্য নাটকত্রয়ের নীতিগত বক্তব্য প্রত্যেকটি রচনার একটি অতিরিক্ত সম্পদ। এদিকে বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' দুটি প্রসিদ্ধ নীতিমুখী উপন্যাস। এ দুটি বই বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ শিল্পপ্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে। শুধু নীতিগত উপন্যাস বললে এ দুটি বইয়ের সামান্যই পরিচয় দেওয়া হয়। বাংলা সাহিত্যের দুই শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। এ দুটি বইয়ের স্বীকৃত শিল্পোৎকর্ষ অগ্রাহ্য করে নীতিবাদী রচনার অজুহাতে বই দুটিকে কিছু নয় বলে একপাশে সরিয়ে রাখতে যথেষ্ট স্থূলবুদ্ধির বাহ্বাস্ফোট প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র এ দুটি উপন্যাসের মাধ্যমে যে নীতিগত বক্তব্য প্রচার করতে চেয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের মতের বিভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু ওই নীতিগত বক্তব্যের জন্যেই বই দুটি শিল্পবিচারে অকুলীন হয়ে গেছে এমন যুক্তি সম্যক্দর্শী কোন মনই মানতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজকল্যাণ-ভাবনা আর নীতি-মুখীনতা তাঁর সাহিত্যের উদ্বৃত্ত সম্পদ। সাহিত্যসেবাকে তিনি জাতিসেবার অঙ্গে অন্বিত করে দেখেছেন বলেই তাঁর রচনায় এত জোর। নিছক শিল্পমনস্ক সাহিত্যিক তিনি ছিলেন না, তিনি যুগপৎ শিল্প ও সমাজমনস্ক লেখক ছিলেন।

গত এক শো বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এ সাহিত্যে শিল্পবিচারের দুটি সুস্পষ্ট ধারা ক্রিয়াশীল রয়েছে—ধারা দুটি পরস্পরের বিরোধী। এক ধারার প্রবক্তারূপে রয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর উত্তর-সাধকগণ, অন্য ধারায় আছেন বিশেষ করে আধুনিক কালের লেখকগণ। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পাদর্শ সম্পর্কে পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ জাতিগঠন দেশসেবা প্রভৃতি মহত্তর অভীপ্সা বাদ দিয়ে সাহিত্যানুশীলন তাঁর নিকট অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু আধুনিককালীন লেখকগণ তদ্বিপরীত মতাদর্শেরই সমধিক অনুরাগী বলে মনে হয়। তাঁরা মুখে সমাজতন্ত্র প্রগতিশীলতার বুলি আওড়ালেও কার্যতঃ কলা-কৈবল্যবাদী ঘরানার লেখক। যে 'Art for Art's sake' আন্দোলন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হয়ে ওই শতকেই বাসী হয়ে গেছে, সেই আন্দোলনের ভাববস্তুকে এখনও তাঁরা আঁকড়ে ধরে আছেন। শরৎচন্দ্রকে পুরঃসর করে এই সব আধুনিক লেখক বাংলা কথাসাহিত্যে ও কাব্যে এক অদ্ভুত সহজিয়া তন্ত্রের সূচনা করেছেন। এঁদের সাহিত্যে ধর্ম নেই দর্শন নেই নীতি নেই রাজনীতি নেই, শুধু আছে একটানা কাহিনীসর্বস্বতা, নিছক পর্যবেক্ষণ-নির্ভর জীবনের রূপায়ণ। এঁরা মনীষা বৈদগ্ধ্য চিন্তাশীলতা নিয়ে মাথা ঘামান না, তাঁদের মাথা ঘামে শুধু ভাষা-চাতুর্য আঙ্গিকপারিপাট্য আর কাহিনী-বয়নের নানাবিধ প্যাঁচ কষা নিয়ে। তাঁরা সকলেই বিষয়ী লোক, কিন্তু সাহিত্যে বিষয়ের মর্যাদা বড়-একটা দেন না। বিষয়ের মহিমার অভাব তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটির বর্ণনায় ভরিয়ে তুলতে তাঁরা খুবই দড়। সরলমনা পাঠকের চোখ ভঙ্গি দিয়ে ভোলানোর প্রক্রিয়া তাঁরা বিলক্ষণই জানেন। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের রীতি-কানুনই আলাদা। এখনকার অধিকাংশ লেখক এ যুগের প্রবহমান

ভাবাদর্শ অনুযায়ী আপনাদের সমাজ-সচেতন বলে দাবী করেন, অথচ এঁদের লেখায়ই তথাকথিত সৌন্দর্য-বাদের সমধিক আধিক্য। না জীবনে না শিল্পচর্চায় এঁরা সমাজ-কল্যাণের আদর্শকে মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আসলে 'সমাজ-সচেতন' কথাটা এ যুগের একটা ফ্যাসনেবল্ বুকনি মাত্র। সত্যিকার সমাজ-সচেতনতার বাষ্পও খুঁজে পাওয়া যায় না এ যুগের অধিকাংশ লেখকের লেখায়। এঁরা সমাজ-সচেতনতা নিয়ে লেখা-লেখা খেলা করেন, ওটি একটি আধুনিক ব্যসন। এই নর্মক্রীড়ার সঙ্গে যথার্থ সমাজ-ভাবনার কোন সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগত চারিত্রগঠন ও সামষ্টিক জাতিগঠন বাদ দিয়ে সমাজ-চৈতন্য কথাটির কোন মানে হয় না। অথচ এই খাতেই আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে বড় ঘাটতি। যে যা ভাবছেন বা লিখছেন তা দৃশ্যত: সমষ্টির কল্যাণের জন্য, অথচ ব্যক্তিশুদ্ধিকে বাদ দিয়ে যে সমষ্টির কল্যাণ সাধন করা যায় না, করতে গেলে হিতে বিপরীত ফলোদয় হবার সম্ভাবনা—এই বোধটুকু আধুনিক সাহিত্য থেকে একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আমরা সাহিত্যের আঙিনা থেকে আগাছা বিবেচনায় নীতির মূল শুদ্ধ উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করছি। সাহিত্যে ধর্মের পাট কবেই চুকিয়ে ফেলা হয়েছে, দর্শনচিন্তার রোগ যেসব লেখকের আছে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের হালচাল দেখে দর্শনের বালাই নিয়ে দূরে সরে যেতে পারলে বাঁচেন, নীতির তো ওই অবস্থা, বাকী রইল রাজনীতি, তাতেও বাগড়া দেবার লোকের অভাব নেই। আমাদের সাহিত্যে একাধিক গোবেচারা গোছের ভালমানুষ লেখক আছেন যাঁরা রাজনীতির উল্লেখমাত্রে মূর্ছা যাবার অবস্থাপ্রাপ্ত হন। রাজনীতি সম্বন্ধে এঁদের খুঁতখুঁতেপনা বিধবার শুচিবাইকেও হার মানায়। কিন্তু আমার কথা হল, দৈনন্দিন রাজনীতি মেঠো রাজনীতি হাট-বাজারের রাজনীতি সাহিত্যে অপাংক্তেয় হতে পারে, তা বলে রাজনীতি-বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা সাহিত্যে অপাংক্তেয় হতে যাবে কেন। রাজনীতি-বিজ্ঞান ব্যাপক সংজ্ঞার্থে দর্শনেরই একটি শাখা। দর্শন-ভাবনা যদি সাহিত্যে অস্পৃশ্য না হয় তা হলে রাজনীতি-ভাবনাকেও সাহিত্যে অস্পৃশ্য মনে করবার কোন যুক্তি নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এরকম ব্যাপক অর্থেই সাহিত্যকে গ্রহণ করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে স্বল্পসংখ্যক বঙ্কিমানুসারী লেখক ভিন্ন আর বিশেষ কেউ এই বিশিষ্ট ঘরানার শিল্পাদর্শের অনুবর্তী হন নি। বাংলা সাহিত্যের পক্ষে এ এক চরম দুর্ভাগ্য। এখনকার সাহিত্য একান্তভাবেই শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত রেখাচিহ্ন অনুসরণ করে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়। শরৎচন্দ্র প্রথম শ্রেণীর লিখনশিল্পী, কিন্তু তাদনুপাতিক মননশিল্পী নন। বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে লিখন-শিল্পেরই জয়জয়কার।

এখানে যে দুই প্রান্তীয়, বিপরীত কোটির শিল্পাদর্শের কথা বলা হল তার মাঝপথে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাব-প্রবণতা অনুসরণ করে সৌন্দর্যবাদ আর সমাজকল্যাণের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সাধন করেছিলেন, তবে তাঁর মূল ঝোঁকটি যে ছিল সৌন্দর্যবাদের অভিমুখী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। যুগন্ধর শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সর্বাত্মক প্রতিভায় গভীর সৌন্দর্যচেতনার পাশে পাশে মননশীলতার উপাদানও প্রভূত পরিমাণে ছিল বলে তাঁর পক্ষে দুই ধারার মধ্যে সমন্বয় বিধান সম্ভব হয়েছিল; তবে তাঁর ভাবশিষ্যদের সম্পর্কে সে কথা বলা যায় কিনা সন্দেহ। তাঁরা যুক্তিচর্চার পথে না গিয়ে মননের পথে না গিয়ে রোমান্টিসিজমেরই সমধিক অনুশীলন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুরধার মনীষাপ্রসূত র‍্যাশনাল সাধনার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে যেমন ব্যর্থ হয়েছে তেমনি, এক হিসাবে দেখতে গেলে, রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়সাধনাও পরবর্তী-কালীন লেখকদের মনোজীবনের উপর অফলপ্রসূ হয়েছে। এখন আমরা চুটিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখছি, দাঁত-ভাঙা কবিতা মক্‌শ করছি আর 'জর্ণালিষ্টিক' প্রবন্ধ-নিবন্ধ-রম্য রচনায় অবিরত কলম শানাচ্ছি। সংবাদের আধারস্থল দৈনিক পত্র সাহিত্যের প্রধান অধিষ্ঠানস্থল তথা আশ্রয়-ভূমি হয়ে উঠেছে। সাহিত্য আজ আমাদের নিকট আর পাঁচটা অর্থকরী বৃত্তির মত জীবিকার উপায় মাত্র, জীবনের সাধনা নয়। সাহিত্য থেকে জীবনকে আমরা বর্জন করেছি। আমাদের পক্ষে সাহিত্য যদি জীবনের সাধনা হত, শিল্প আর জীবনের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের বোধ যদি আমাদের মনে স্পষ্ট হত, তা হলে সাহিত্যকে কখনই পর্যবেক্ষণের ফলাফলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে আমরা তৃপ্ত থাকতাম না, পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মননেরও যুগপৎ চর্চা করতাম, কাহিনীর রসের উপর এবং কাহিনীর রসের থেকে কিছু বেশী—জীবনরহস্যের অনুভূতি পরিবেশনেও সমান সচেষ্ট থাকতাম। দার্শনিক নৈতিক রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে তা হলে এমন সযত্নে পাশ কাটিয়ে চলবার প্রয়োজন হত না।

কবি শ্রীসজনীকান্ত দাস

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে একাধিক শিল্পী আছেন যাঁদের কবি-পরিচয় অপর পরিচয়ে ঢাকা পড়েছে। দর্শনের রাজনীতির নাটকের ব্যঙ্গের প্রবন্ধের রাজ্যে তাঁদের দিগ্বিজয় কাব্যজীবনকে রাহুগ্রস্ত করেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মোহিতলাল মজুমদার, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ সাহিত্যশিল্পীরা কাব্যেতর কীর্তির মহিমায় অধিকতর পরিচিত। আর এই পরিচয় তাঁদের কবিমানসের সার্থক পরিচয়ের পথে বাধা উপস্থিত করেছে, এ কথাও অজ্ঞাত নয়। দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, প্রাবন্ধিক মোহিতলাল, ব্যঙ্গশিল্পী নাট্যকার প্র. না. বি., কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, মোহিতলাল ও প্রমথনাথের পরিচয়পথে যে বাধা স্থাপন করেছে তা পাঠক-সমাজ উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। এর ফলে এঁদের কবি-পরিচয়ের সম্যক্ বিচার ও আলোচনা হয় নি। এই শ্রেণীর লেখক-তালিকায় আর একটি নাম যুক্ত করতে পারি: সজনীকান্ত দাস। ব্যঙ্গশিল্পী সম্পাদক প্রবন্ধকার গল্পকার সাহিত্য-গবেষক সজনীকান্ত কবি সজনীকান্তের উপযুক্ত পরিচয় গ্রহণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন পাঠক-সমাজের কাছে। অথচ এই পরিচয়ের মাধ্যমে যে কবিমানসের সাক্ষাৎ পাই, সে কবিমানস পাঠকমনকে উদ্বেজিত করে না, কাব্য-সুধাসত্রে আমন্ত্রণ জানায়।

কবি সজনীকান্ত দাসের কাব্যজীবন ত্রিশ বৎসর কাল ধরে প্রসারিত। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যৌবনের প্রথম উত্তেজক লগ্নে যে যৌবনবন্দনা রচনা করেন, সেখানেই তাঁর কাব্যজীবনের যাত্রা শুরু। সেদিনের আতিশয্য পরে তীব্র ব্যঙ্গে পরিণত হয়েছে, অত্যন্ত দুঃসময়ে প্রায় আত্মঘাতী মুহূর্তে ব্যঙ্গ-খাতে কাব্যানুভূতি আত্মপ্রকাশ করেছে, অবসাদ ও সংশয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কখনও রবীন্দ্রাশ্রয়ে, কখনও বা জীবনের অন্তহীন পথে, কখনও বা যৌবনের উন্মাদনায় কবিমানস নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করেছে এবং এরই মধ্য দিয়ে আজ দীর্ঘ ত্রিশ বছর পরে প্রৌঢ়ির বিষণ্ণ সন্ধ্যার মানবপ্রেমের তীর্থে উপনীত হয়েছে। কবি সজনীকান্তের কাব্য-পরিক্রমা অন্তে আমরা এই ধ্যানগম্ভীর প্রসন্ন বেদনামুক্ত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হই। বর্তমান প্রবন্ধে কাব্যপথ-পরিক্রমার ফলশ্রুতি সেই আনন্দলোকে উত্তরণ।

বর্তমান শতকের প্রথম পাদে রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন মধ্যাহ্ন-গগনে, তখন যে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ কাব্য-যাত্রায় বেরিয়েছিলেন, কবি সজনীকান্ত তাঁদেরই একজন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাছে আনুগত্য স্বীকার করে তাঁকে কেন্দ্র করে যে কবি-পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছিল, তাঁদেরই বলি রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ। এই কবিদের মধ্যে কয়েকটি সামান্য লক্ষণ আবিষ্কার করা যায় যা তাঁদের এক সূত্রে বেঁধে রেখেছিল। এঁদের কাব্য-পরিচয় দেওয়া যেতে পারে এইভাবে: প্রাচীন কাব্যধারার মধ্যে নবীনত্বের উদ্ঘাটন, প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপন, সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তন ধারাকে বহনোপযোগী সংবেদনশীলতা ও চারিত্রদান এবং গ্রামজীবনের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ। এঁদের কবিতায় লক্ষ্য করি রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শে অবিচল নিষ্ঠা, সৃষ্টি ও মঙ্গলে গভীর আস্থা, শান্তির শেষ বিজয়ে বিশ্বাস। ঐতিহ্যপ্রীতি ও নিসর্গপ্রেম, গ্রামজীবনানুরাগ ও গার্হস্থ্য জীবনাসক্তি, অমৃততৃষা ও আস্তিকতা, জীবনের গভীরতর রহস্যের ভারতীয় দর্শনালোকে প্রেক্ষণ ও ভারতীয় জীবনের মজ্জাগত বৈরাগ্যপ্রীতি, গভীর জীবনপ্রেম ও রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের বাতাবরণ গড়ে তুলেছে।

সজনীকান্ত এই কবিগোষ্ঠীরই অন্যতম কবি। প্রকাশিতব্য তৃতীয় খণ্ড 'আত্মস্মৃতি'র পঞ্চম তরঙ্গে [শনিবারের চিঠি ১৩৬২ সালের সংখ্যাগুলি দ্রষ্টব্য] সজনীকান্তের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গেই উদ্ধারযোগ্য; এখানে তিনি রবীন্দ্রানুসারিতার নিঃসংশয় স্বীকৃতি জানিয়েছেন: "সত্য কথা বলিতে গেলে রবীন্দ্র-পরবর্তী বাঙালী কবিদের প্রায় সকলেই আমরা যেন মূল

গানের রবীন্দ্রনাথের দোহাই করিয়াই সার্থক হইয়াছি; দুই চারিজন একটু দূরে সরিয়া বেসুরা গাহিবার চেষ্টা করিয়াছি বটে, কিন্তু শেষাশেষি ওই রবীন্দ্র-রূপ-সাগরেই ডুব দিতে হইয়াছে, আন-ঘাটে তরী বাঁধা আর হয় নাই।” তার প্রমাণ সজনীকান্তের কাব্যে ছড়িয়ে আছে; ‘পঁচিশে বৈশাখ’ কাব্যে তার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ সানুরাগ স্বীকৃতি। আর এই স্বীকৃতিই নানা ভাবে সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, কালিদাস, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, পরিমলকুমার, কিরণধন, সাবিত্রীপ্রসন্ন এমন কি যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, ও নজরুলের কাব্যে বিধৃত হয়েছে। এঁরা সবাই রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে বিশ্বাসী, প্রকৃতিপ্রেমী, শান্তিপ্রত্যাশী, ঐতিহ্যানুসারী কবি। শেষোক্ত তিনজনের আপাত-রবীন্দ্রবিরোধিতা ও ঐতিহ্যচ্যুতি শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণে পরিণত হয়েছে তা এঁদের কাব্য থেকে প্রমাণ করা যায়।

কবি সজনীকান্তের অদ্যাবধি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা দশ; রচনাকাল: ১৯২৮ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ। সেগুলি হল: ‘পথ চলতে ঘাসের ফুল’ (১৯২৯), ‘বঙ্গরণভূমে’ (১৯৩১), ‘মনোদর্পণ’ (১৯৩১), ‘অঙ্গুষ্ঠ’ (১৯৩১), ‘রাজহংস’ (১৯৩৬), ‘আলো-আঁধারি’ (১৯৩৬), ‘কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডাল’ (১৯৪০), ‘পঁচিশে বৈশাখ’ (১৯৪২), ‘মানস-সরোবর’ (১৯৪২), ‘ভাব ও ছন্দ’ (১৯৫৩, ‘পথ চলতে ঘাসের ফুল’ ও ‘মাইকেল বধ কাব্যে’র একত্র প্রকাশ)। ১৯৪৩ থেকে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সতের বৎসরে রচিত ও প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা কম নয়; সেগুলির একত্র সংকলন এবং সমগ্র কবিতাবলীর একটি নির্বাচিত সংকলনের প্রকাশ আশু প্রয়োজন। ১৯২৮-১৯৫৯ এই ত্রিশ বৎসরের কবিতার একটি সামগ্রিক আলোচনার প্রয়াস এখানে করা হল।

॥ ২ ॥

সজনীকান্তের ত্রিশ বৎসরের কাব্যজীবন (১৯২৮-১৯৫৯) সংশয় বেদনা, আনন্দ নৈরাশ্য, দুঃখ সুখে পরিপূর্ণ। কাব্যের সমতলভূমিতে তিনি বিচরণ করেন নি। যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি ও আতিশয্যে তাঁর কাব্যের সূচনা। বর্তমানে তিনি যে পরিণতিতে উপনীত হয়েছেন তা প্রৌঢ়ির গম্ভীর জীবনধ্যানের শান্তিমণ্ডিত। কবি নিজেই বলেছেন: “সৌভাগ্যক্রমে কাব্যসরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছেন, ছন্দের বন্ধনে অগোচর ও অধরা ক্ষণে ক্ষণে বাঁধা পড়িয়াছেন—মহাজীবন-জলতরঙ্গে আমার নগণ্য জীবনও ঢেউয়ের শীর্ষে উঠিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে” (আত্মস্মৃতি, প্রথম খণ্ড)। সজনীকান্তের কাব্যের গভীর পর্যালোচনায় এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

সজনীকান্তের কাব্য আলোচনায় দুটি সত্য আমাদের স্মরণ রাখতে হয়। কাব্যজীবনে বারবার নৈরাশ্য, সংশয় ও বেদনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বারবারই সে আঁধার উত্তীর্ণ হবার জন্য কবির অন্তর্জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এইখানেই সজনীকান্ত অন্যান্য রবীন্দ্রানুসারী কবিদের পথ থেকে দূরে সরে গেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ কুমুদরঞ্জন করুণানিধান কালিদাস প্রমুখ কবিদের কাব্যজীবনে কখনও সংকট দেখা দেয় নি, সজনীকান্তের কাব্যজীবনে বারবার সংকট দেখা দিয়েছে। মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের মত তিনিও সেই সংকটের আবর্তে পড়ে হাহাকার করেছেন, সংকটমুক্তির জন্য প্রাণ পণ করেছেন। এখানেই কবি সজনীকান্তের আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কবির জীবনে প্রকৃতির প্রভাব—আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, নদীর প্রভাব। সাম্প্রতিক বাঙালী কবিদের জীবনে গ্রামপ্রকৃতি বা নদীর প্রভাব নেই বললেই হয়। আধুনিক কবিরা নগরকেন্দ্রিক জীবনের কবি; যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর হতাশা ও বেদনা, রিক্তবিশ্বাস ও ধর্মচ্যুত নগরজীবনের পরিবেশে তাঁদের কবিকণ্ঠে গান উচ্চারিত হয়েছে। অবশ্য জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ কয়েকজন কবি বিরল ব্যতিক্রম। সজনীকান্তের কবিজীবনে নদীর ও গ্রামের প্রভাব সুমুদ্রিত হয়ে আছে। এখানেই তিনি রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজেরই একজন। তিনি স্বীকার করেছেন, “কয়েকটি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর সঙ্গে আমার মনের ক্রম-পরিণতির ইতিহাস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে।” আরও বলেছেন, “এই নদী, তটভূমি ও বালুবেলাগুলি আমার অন্তর্জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে” (আত্মস্মৃতি, প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই নদীগুলি হল: বীরভূম-বর্ধমানের অজয়, মালদহের

মহানন্দা, বাঁকুড়ার দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, পাবনার পদ্মা, দিনাজপুরের কাঞ্চন। কবির বাল্য কৈশোর কৌমার ও প্রথম যৌবন এই নদীগুলির সাহচর্যে ও সান্নিধ্যে কাটে এবং তাদের প্রভাব তাঁর অন্তর্জীবনে মুদ্রিত হয়ে গেছে। কবির জন্ম বর্ধমানের বুদবুদ থানার বেতালবন গ্রামে, ৯ই ভাদ্র, ১৩০৭ বঙ্গাব্দে, ২৫শে আগস্ট ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।

জীবনের প্রথম কুড়িটি বৎসর কলকাতা থেকে দূরে মফস্বলে নদীর সান্নিধ্যে কবি কাটিয়েছেন। গণিতশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ নিয়ে কবি বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। তিনি বিজ্ঞানেরই ছাত্র ছিলেন। ফলে তাঁর রচনায় দেখা দিয়েছে যুক্তি ও নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য, বাস্তবপ্রীতি। আবার শৈশবে মালদহের গম্ভীরাগানের পরিবেশে এবং কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'সরল কৃত্তিবাস,' কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' এবং রবীন্দ্রনাথের 'শিশু' ও 'কথা ও কাহিনী'র কাব্য-বাতাবরণে তাঁর মনোজীবন গঠিত হয়। এই গণিতপ্রীতি ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন, এবং কাব্যপ্রীতি ও নদীসাহচর্য সজনীকান্তের কবিজীবনকে যুগপৎ বাস্তবানুরাগী ও রোমান্টিক নিসর্গপ্রেমী করে তুলেছিল। বাস্তবানুরাগের ফল ব্যঙ্গকবিতা, রোমান্টিক কাব্য ও নিসর্গ-সাহচর্যের ফল কবিতায় অমৃতের জন্য হাহাকার। সজনীকান্তের কাব্যজীবনে এ দুই-ই সত্য। শৈশবের আর একটি প্রভাব মহৎ চরিত্রের সাহচর্যের ফলে দেখা দিয়েছে; তা হল জীবনে নীতির মূল্য স্বীকার। এর মূলে আছেন দিনাজপুরে (১৯১৪-১৮) ঋষিপ্রতিম চিকিৎসক মহর্ষি ভুবনমোহনের অসাধারণ চরিত্র।

কবির সাহিত্যজীবনে বাঁকুড়ার কলেজ হস্টেল (১৯১৮-২০) ও কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজের অগিল্‌ভি হস্টেলের (১৯২০-২১) স্থান আছে। প্রথমটিতে কলমনবিশী, দ্বিতীয়টিতে সিদ্ধিপ্রাপ্তি। এরই মাঝে দিনাজপুরে যৌবনের প্রথম লগ্নে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও 'ছিন্নপত্রে'র এবং কাঞ্চন নদীর সাহচর্যে যাপিত কয়েকটি মাস (১৯২০)। এখানেই তাঁর প্রথম সিরিয়াস্ কাব্যচর্চার প্রয়াস লক্ষ্য করি। সে কবিতাটির নাম "বকুলবনের পথে"—প্রথম যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি, আতিশয্য ও উচ্ছ্বাসে জড়িত এই কবিতাটির কাব্যমূল্য খুব বেশী নয়, কিন্তু কবির নিভৃত হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষা এখানেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। এর কয়েকটি চরণ কবি তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র প্রথম খণ্ডে উদ্ধার করেছেন। এটি আদিরসাশ্রিত যৌবনবন্দনা—আতিশয্যে ভারাক্রান্ত; কবিতা হিসেবে নীচুদরের:

> কলস কাঁখে বকুল বীথির পথে
> বধূ যেথায় আনতে চলে জল,
> সাঁঝের কোলে রয় না কেহ সেথা,
> আঁধার বিজন বকুল গাছের তল।

এই ব্যর্থতা পরবর্তী সফলতার বিচারে মার্জনীয়। অগিল্‌ভি হস্টেল-পত্রিকায় সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ প্রকাশিত পাঁচটি কবিতাই তাঁর কাব্যজীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। সুখের বিষয়, এখানে তিনি পূর্বের উদ্‌ভ্রান্তি ও আতিশয্য থেকে মুক্তিলাভ করে আত্মস্থ হয়েছেন। এই পাঁচটির দুটি হল "রবীন্দ্রনাথ" ও "গান্ধী"। এখানেই তিনি জীবনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র সেদিন শ্রেষ্ঠ বাণীসাধকের চরণে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে, তা যে কেবল ভক্তি-উচ্ছ্বাস নয়, পরবর্তী জীবনের ইঙ্গিতবাহী, সে-কারণেই এর গুরুত্ব। "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় সজনীকান্ত সেদিন এই কথাই বলেছিলেন:

> ওগো আঁধারের রবি
> ওগো মরতের কবি,
> স্বরগে মরতে ঘটালে মিলন
> দেবতার কৃপা লভি।
> আকাশে মাটিতে তৃণে ফুলে ফলে
> প্রতি গৃহকোণে প্রতি হৃদিতলে
> চিরবিচিত্র যে সুর উথলে
> আঁকিছ তাহারি ছবি।

কবি সজনীকান্ত সেদিন ধরণীর বিচিত্র ছবির শিল্পী রবীন্দ্রনাথের পন্থা গ্রহণ করলেন—তাঁর ভবিষ্য জীবনপথ নির্ধারিত হয়ে গেল। এর পরই সজনীকান্ত বিজ্ঞানের মায়া কাটিয়ে অনিশ্চিত সাহিত্যজীবনে ঝাঁপ দিলেন।

॥ ৩ ॥

সজনীকান্তের ত্রিশ বৎসরের কাব্যজীবনে চারটি পর্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম পর্ব: 'পথ চলতে ঘাসের ফুল', 'বঙ্গরণভূমে', 'মনোদর্পণ', 'অঙ্গুষ্ঠ': ব্যঙ্গ কবিতার পর্ব

(১৯২৮-৩১)। দ্বিতীয় পর্ব: 'রাজহংস', 'আলো-আঁধারি': আত্মরূপ চিত্রণের পর্ব (১৯৩২-৪০)। পূর্ববর্তী পর্বের জের 'মাইকেলবধ কাব্য' এবং 'কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডাল' (হাসির কবিতা সংকলন) এই পর্বে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় পর্ব: 'পঁচিশে বৈশাখ', 'মানস-সরোবর': রবীন্দ্রাশ্রয়িতার পর্ব (১৯৪১-৪২)। চতুর্থ পর্ব: গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী: আত্মরূপ বিশ্লেষণের পর্ব (১৯৪৩-৫২)।

প্রথম পর্বে সজনীকান্ত 'প্রবাসী' ও 'শনিবারের চিঠি'তে অজস্র ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন, 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের তারুণ্যকে উপহাস করে কবিতা রচনা করেছেন এবং নিজের পথাবিষ্কারে রত ছিলেন। এই পর্বে দেখা যায়, কবিত্ব উৎসারের জন্য কোন বহির্ঘটনার প্রয়োজন ঘটেছে। আক্রমণ প্রতিবাদ আঘাতের উপলক্ষ্য যখনই দেখা গেছে, তখনই সময়ের দাবি মেটাতে কবি অগ্রসর হয়েছেন। মানবসমাজের নানা বিচিত্র প্রেমচিত্র 'পথ চলতে ঘাসের ফুলে' অঙ্কিত হয়েছে। একটি নমুনা এখানে দেওয়া যেতে পারে:

আজ রাতে চাঁদ সই উঠ্‌ল বনের ফাঁকে
ধবধবে পথঘাট জোছনায়…
তুমি এস বনপথে ছোঁয়াও সোনার কাঠি ঝুরু ঝুরু বয়ে যাক্ ঝরণা,
ডাক্‌ছে পাহাড় বন ডাক্‌ছে এ দেহ-মন, ফেলে দিয়ে এস ঘর-করণা।
… … … …

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বঙ্গরণভূমে' জাতীয়তামূলক ব্যঙ্গকবিতার সঙ্কলন। এ-সকল কবিতার উপলক্ষ্য সাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা। এগুলি উপলক্ষ্যকে অতিক্রম করে স্থায়ী আবেদনের স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। ব্যঙ্গক্ষেত্রে সজনীকান্তের কবিপ্রতিভার অনুকূল বিকাশ ঘটে, এ সত্যটি এ দুটি কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। তবু এরই মাঝে কয়েকটি দেশাত্মবোধক কবিতার দেখা পাই যেগুলির স্থায়ী আবেদন আছে। 'বঙ্গরণভূমে' কাব্যের "এ মৃত্যু ছেদিতে হবে", "শ্মশানে", "যুগবাণী", "দুদিন" প্রমুখ কবিতা দেশাত্মবোধের মহৎ প্রেরণায় রচিত। ১৯২৪-৩০ সনের বাংলাদেশে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, সাবিত্রীপ্রসন্নের দেশপ্রেমের কবিতার সঙ্গে এই কবিতাগুলি তুলনীয়। দেশপ্রেমকে যে জলন্ত প্রেরণা ও তীব্র অনুভূতির আগুনে গলিয়ে কাব্য-উপাদানে পরিণত করা হয় এবং যে কাব্য-প্রসাধনকৌশলে তা হৃদয়ে আসন পায়, তা কবি সজনীকান্তের করায়ত্ত ছিল, তার পরিচয়স্থল এই শ্রেণীর কবিতা। ব্যঙ্গবিদ্রূপের আঘাত নয়, মহত্তর প্রেরণার সুরে কাব্যবীণার তার বেঁধে নেবার ক্ষমতা যে তাঁর আছে, সে পরিচয় সজনীকান্ত এখানেই দিলেন। যখন তিনি আহ্বান জানালেন:

তুমি আমি কারাগারে দেখিতেছি মৃত্যু-বিভীষিকা,
কে মুছিবে এ জাতির ললাটের কলঙ্কের লিখা।…
বিবাদের বাণী নহে, জাতি মুক্তিবাণী আজ চাহি,
বিকৃত জীবন নহে, চাহি সত্য মৃত্যুর সাধনা;
ছুটেছে নিখিল বিশ্ব নূতন আলোকে অবগাহি,
কারাগারে রুদ্ধ হয়ে করিব কি আত্ম-আরাধনা?
ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হবে এ পাষাণ কারার প্রাচীর—
বাহিরে খুঁড়িছে মাথা মুক্তির আলোক সুবিপুল,
কাঁদিতেছে অন্ধকারে ভারতের বাণী সুগভীর—
কারাগার ব্যবধান, মিলাইতে হবে দুই কূল।
এ মিলন-সাধনায় প্রচারিতে নব যুগবাণী—
আমাদের যাত্রা সুরু, যাত্রা শেষ কবে নাহি জানি।
(যুগবাণী, 'বঙ্গরণভূমে')

তখন পাঠক কবিকণ্ঠে সুর মেলাতে দ্বিধা বোধ করেন না।

এর আগেই ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় সিরিয়স কবিতা লিখে সজনীকান্ত খ্যাতিলাভ করেছেন। এ সময়ে রচিত কবিতাগুচ্ছের একটি কবিতা বিশেষ উল্লেখ দাবি করে। 'প্রবাসী'র ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত "অগ্নিদূত" কবিতাটি ('আলো-আঁধারি' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত) সজনীকান্তের সিরিয়স কবিতা রচনার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে' এটিকে স্থান দিয়েছিলেন। এই পর্বে কবি সজনীকান্ত একবার হালকা চটুল কবিতা, একবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা, আবার সিরিয়স আত্মবিশ্লেষণধর্মী কবিতা রচনা করেছেন। কবি এ পর্বে আত্মস্থ হন নি; পথের অনুসন্ধান চলেছে; হতাশা ও ব্যর্থতার বেদনা কখনও বা কবিকে গ্রাস করছে, কখনও বা কবি তা থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। এর সুন্দর পরিচয় পাই "অসহায়" ('আলো-আঁধারি') কবিতাটিতে। অমৃতসন্ধানপথে হলাহলের অঞ্জলি কবি হাত পেতে নিয়েছেন, আবার নতুন পথে চলেছেন। মানবজীবনের বিভ্রান্তি ও ব্যর্থতার মাঝেই কবি অমৃতসন্ধান করেছেন এই বলে:

বাসনা-বহ্নি জ্বলুক জ্বলিতে দাও,
দেহ-অজায় পাবক-পরশকামী,
মৃতার বক্ষে কেহ না বসন টানে
শবের ললাটে সাজে না খয়েরী টিপ !
জীবনে বাঁচিবে, তবু করিবে না ভুল,
কে তুমি পাষাণ, কে তুমি অহঙ্কারী ?
চিরকাল যারে চলিতে হইবে পথে
বিপথে যাবে না, তাও সম্ভব কভু !

'অঙ্গুষ্ঠ' ও 'মনোদর্পণ' কাব্যে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পথানুসন্ধান-বিভ্রান্তি ও কবিমনের অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যঙ্গকবিতায় কবিপ্রাণ যে তৃপ্তিলাভ করছে না তার প্রমাণ বারেবারেই পাওয়া যায় এই পর্বে।

কল্লোল-কালিকলম-গোষ্ঠীর তারুণ্যকে ব্যঙ্গ করে কবি যখন লিখছেন :

ও পাড়ার ওই পটলির মুখে পাণ্ডু-পাটল হাসি
ফাটা ফুস্‌ফুসে আমি আর হতো চোপসান-কাশি কাশি।

তখনই অন্যদিকে কবিকণ্ঠে শুনি অমৃতের জন্য হাহাকার :

যোগী নীলকণ্ঠ সম মহোল্লাসে করি আত্মসাৎ বিশ্বহলাহল,
আমার বক্ষের মাঝে নবজন্ম লভে অকস্মাৎ শুষ্ক তৃণদল।
[স্বপ্ন-সহচরী, 'আলো-আঁধারি']

পরবর্তী পর্ব এই নবজন্মের কাহিনী।

প্রথম পর্বের শেষ ভাগে কবির জীবনে নিষ্ঠুর মৃত্যুর আঘাত এসে পড়ল। জননীর মৃত্যুতে কবিচেতনা বিবশ হয়ে গেল ; এ আঘাত থেকে কবি মুক্তি পেতে চাইলেন ব্যঙ্গকবিতায়। কেবল 'অঙ্গুষ্ঠ' ও 'মনোদর্পণে'র কবিতাগুলি নয়, 'কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডালে'র ব্যঙ্গকবিতাগুলিও এই মানসিক পটভূমিতে রচিত। নিদারুণ দুঃখাঘাতে বা দুঃসময়ে কবি ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেছেন। একদিকে পিতৃআশ্রয় ত্যাগের ফলে অন্নচিন্তা, অপরদিকে জননীর মৃত্যুজনিত শোকাঘাতে মনের অস্থিরতা—এই অন্তর ও বহির্জীবনের বিচলিত অবস্থাতেই কবি ব্যঙ্গকবিতা রচনা করেন। কবি নিজেই স্বীকার করেছেন, "অত্যন্ত দুঃসময়ে প্রায় আত্মঘাতী মুহূর্তে ব্যঙ্গ-খাতেই আমার চিত্তবৃত্তির বিকাশ হয়। মায়ের প্রায় মৃত্যুশয্যায় বসিয়া 'হসন্ত তরফদারে'র প্রথম খসড়া ফাঁদিয়াছিলাম, আজ ৭ই অক্টোবরে 'অন্নচিন্তার চেয়ে বড়' যখন কিছুই নহে, তখন 'বিবাহের চেয়ে বড়' লিখিলাম। কিন্তু হাসি দীর্ঘস্থায়ী হইল না, অপরূপ 'মৃত্যু-মাধুরী' সঙ্গে সঙ্গে আমার চিত্ত অধিকার করিল" (আত্মস্মৃতি, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ১৫৬)।

১৯২৪-এ পিতৃআশ্রয় ত্যাগ করে এসে কবি লিখলেন বিখ্যাত "ব্যাঙ" কবিতা নজরুলকে ব্যঙ্গ করে, ১৯২৬-এ দিনাজপুরে মায়ের নিদারুণ রোগশয্যার পর 'হসন্ত তরফদারে'র খসড়া রচনা করলেন আর ১৯৩১-এর উপরোক্ত ৭ই অক্টোবরে 'প্রবাসী'-প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ-পদে ইস্তফা দিয়ে লিখলেন নির্দোষ ব্যঙ্গের কবিতা "বিবাহের চেয়ে বড়" ('কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডাল' কাব্য)।

বোধ করি রূঢ় বাস্তবের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাস্তব থেকেই কবি প্রেরণা পেয়ে লিখলেন :

একা বসে জলভরা নদীতীরে
কেন ভাসি আমি নয়নের নীরে,
কেন এ অভাগা সন্ধ্যা গোঙাল
চেয়ে চেয়ে অনিমিখ
আধ পর্দায় ঘেরা বাতায়নে
যেথা বসে পুঁটি কড়াকিয়া গনে,
তারি অবসরে ডাঁশা পেয়ারায়
কষিয়া বসায় দাঁত।
পুঁটি কে, জান না ? বোসেদের খুকী,
মাখম-কোমল, প্রস্তর-বুকী—
ভিতরে তাহার শয়তান হায়
আমারই ভেঙেছে দাঁত।...
আমারে দেখিলে হয়ে চঞ্চলা
পুঁটি হেঁকে পড়ে, 'প'য়েতে 'র'-ফলা,
'এ'-কার তাহাতে, পিছনে 'ম' যোগ
করিলে কি হয় কহ।
শুনিয়া যদিবা প্রেম-ইশারায়
জানাইতে তারে কিছু প্রাণ চায়,
পুঁটি না তাকায় ; হেন দুর-ভোগ
ক্রমে হয় দুঃসহ।
[বিবাহের চেয়ে বড়ো, 'কেড্‌স্‌ ও স্যাণ্ডাল']

রোমান্টিক প্রেমের এই তরল ব্যঙ্গকবিতা রচনার পরমুহূর্তেই কবিকণ্ঠে জেগে ওঠে হাহাকার :

উঠ হিমাদ্রি-প্রায়,
দুঃখসিন্ধু হের গরজিছে
ব্যথাবেদনার লোনাজল উথলায়।
ক্রূর নিপীড়নে কম্পিত আজি
ক্ষুব্ধ সাগর-তল,
ধাতব পৃথ্বী বাষ্প-বিকারে
মথিছে সিন্ধু-জল।...
বিষ্ণুচক্রে হের বরাভয়,
বিদরে অন্ধকার,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত-মাধুরী
নেহারো চমৎকার!

[মৃত্যু-মাধুরী, 'আলো-আঁধারি']

সমকালে রচিত কবিতার মধ্যে এই মেরু-প্রমাণ ব্যবধান কবিমানসের অস্থিরতা, বিপরীত প্রতিক্রিয়া ও অপ্রত্যাশিত অনুভূতির পরিচয়স্থল। শোক ও হাসি, মৃত্যু ও জীবনচাঞ্চল্য, বেদনা ও আনন্দের টানাপোড়েনে কবিমানসের যে বিচিত্র আলো-আঁধারের ধূপছায়া-পটভূমি রচিত হয়েছে প্রথম পর্বের শেষভাগে, তা দ্বিতীয় পর্বে এসে একটি নিশ্চিত প্রত্যয়ভূমিতে অধিষ্ঠিত হল "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায়; এখানেই সজনীকান্তের কবিমানস আত্মস্থ হল।

॥ ৪ ॥

প্রথম পর্বে কবিমানসের যে অস্থিরতা ও সংশয়, তার সমাধান হল দ্বিতীয় পর্বের 'রাজহংস' কাব্যের প্রথম কবিতা "রবীন্দ্রনাথে"। কবিতাটি 'রাজহংস' কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেওয়া হয় ও 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই বর্জন ঠিক হয় নি এই জন্য যে কবিমানসের শান্তি ও প্রত্যয়ের অধিষ্ঠানভূমি এই কবিতাটি। তাই এর আলোচনা দ্বিতীয় পর্বের সূচনাতেই করণীয়।

রবীন্দ্রনাথের সত্তর-পূর্তিতে দেশব্যাপী যে রবীন্দ্র-জয়ন্তী সমারোহ অনুষ্ঠিত হল ১৯৩১-এর শেষে, সে-উপলক্ষ্যে "রবীন্দ্রনাথ" কবিতাটি রচিত। অগিলভি-হস্টেল-পত্রিকায় কবির যে রবি-প্রণাম, তা থেকে কবি অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৯২১ আর ডিসেম্বর ১৯৩১—ঠিক দশ বৎসরের ব্যবধান। এই সময়ে কবি অভিজ্ঞতার বিচিত্র জগৎ পরিভ্রমণান্তে সেই রবি-তীর্থেই ফিরে এলেন। এই প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্যটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সজনীকান্ত যে ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবি নন, তিনি যে প্রত্যয়সিদ্ধ রবীন্দ্রানুসারী কবি, তার প্রমাণ এই প্রত্যাবর্তন। দুঃখ শোক ব্যঙ্গ আঘাত সংশয় ও বেদনার মূল্যে ক্রীত এই প্রত্যাবর্তন। তাই সজনীকান্তের কাব্যসাধনার মহত্তর পর্যায়ের সূচনা এই কবিতাতেই হল। এই পর্বটিকে সাধারণভাবে আত্মরূপচিত্রণের পর্ব বলে অভিহিত করতে পারি। ব্যঙ্গের পালা শেষ হল। ১৩৩৮ কার্তিকে 'প্রবাসী' ত্যাগ ও ১৩৩৯ অগ্রহায়ণে 'বঙ্গশ্রী'তে যোগদান—এর মাঝে চোদ্দ মাস 'শনিবারের চিঠি'তে বেপরোয়া ব্যঙ্গ ও তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার আক্রমণের আত্মঘাতী শ্মশান-সাধনা-অন্তে কবি আত্মস্থ হলেন। ব্যঙ্গ-কবিতা ছেড়ে "টুকরি" কবিতা রচনা শুরু করলেন। কেবল বিষয় নয়, সুরেরও পরিবর্তন হল। এ-সবেরই সূচনা হল ওই "রবীন্দ্রনাথ" কবিতাটিতে।

এই কবিতায় কবির কাছে রবীন্দ্র-প্রতিভা হিমালয় রূপে প্রতিভাত হয়েছে এবং হিমালয়ের চিত্রাঙ্কনেই কবি জীবনের সার্থকতা লাভ করেছেন :

হিমালয়—
তুমি হিমে ঢাকা থাক, নদীরে করো না হিম।
আমার কুটির-আঙিনা ছুঁইয়া তোমার চপল মেয়ে
সবুজ করিয়া যুগে যুগে মোর ছোট সে সবজি ক্ষেত
বহিয়া চলুক, তুমি থাক, নাহি থাক—
হিসাব তাহার আমি তো রাখিব নাকো;
আমি ছুটিব না বিস্ময়ে ভয়ে তোমার পরশ খুঁজি,
যুগে যুগে আমি স্নান সমাপন করিব ও নদীজলে—
কোথায় উৎস, কোন্ সমুদ্রে লীন,
ইতিকথা তার যে পারে রাখুক লিখে।
নদীজলে আমি স্নান করি আর তরণী বাহিয়া চলি—
যত ভালবাসি তত কাছে পাই, পুলকে ফিরিয়া আসি।

(মাঘ, ১৩৩৮)

রবীন্দ্র-উৎসসন্ধানে সজনীকান্ত যাত্রা করেন নি, রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহে ডুব দিয়েই তিনি অমৃতের আস্বাদ পেতে চেয়েছেন। এ-সময়ের লেখা আর একটি রবি-বন্দনা "শ্রীচরণেষু" (আষাঢ় ১৩৩৬) কবিতায় সজনীকান্ত প্রণতি জানিয়েছেন এই কথা বলে :

আসিয়াছ এ ধরায়—ললাটে স্বর্গের দ্যুতি,
তুমি কেহ নহ মৃত্তিকার।
ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বলোকে আপনার সঙ্গীতে বিহ্বল—
একেলা ছুটিয়া চল, ধূলি-পঙ্ক-ম্লান ধরাতল।

রবীন্দ্র-বন্দনায় কবি সজনীকান্তের নবজন্ম হল। দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হল 'রাজহংস' কাব্যে। এই কাব্য মাতৃনামে উৎসর্গীকৃত। মায়ের রোগশয্যায় বসে ব্যঙ্গকাহিনীর খসড়া রচনা করে কবি আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিলেন। শোকের প্রথম আঘাত উত্তীর্ণ হবার পর আজ তিনি মৃত্যুর মহত্তর রূপটিকে দেখেছেন। একদিকে রবি-প্রণতি, অপরদিকে মাতৃবন্দনা—এই দুই মহৎ আকর্ষণের ফলে কবি ব্যঙ্গবিদ্রূপের সমতলভূমি ছেড়ে কাব্যের নিশ্চিত প্রত্যয়ের উপত্যকাভূমিতে উপনীত হলেন। 'রাজহংসে'র উৎসর্গ-পত্র তারই পরিচায়ক। জীবন ও মৃত্যুর যে রহস্যের সন্ধান কবিরা বারবার করেছেন, তার ব্যাকুল জিজ্ঞাসা সজনীকান্তের কবিমানসকেও আলোড়িত করেছে, তার প্রথম পরিচয় এখানেই পাই। উৎসর্গপত্রের বিষণ্ণ গম্ভীর জীবনজিজ্ঞাসার আন্তরিকতা তাই পাঠকমনকে অভিভূত করে:

যে চপল নদী পার হয়ে এল গিরি-বন-প্রান্তর,
কখনো আলোকে, কখনো অন্ধকারে,
থমকি দাঁড়ায়ে সহসা সে যদি চাহিত পিছন ফিরে,
হিমালয়-শিরে পেত কি দেখিতে কোথায় উৎস তার?
এ পারে-ও পারে ব্যবধান-ছেঁড়া গোমুখীর গূঢ় ব্যথা
বুঝিত কি নদী নদীজল-কলকলে?

এই প্রশ্নের সমাধান সহজেই ঘটে নি। জননী-নাম-বন্দনায় কবি আশ্রয় খুঁজেছেন:

জননী, তোমারে স্মরিয়া আমার কাব্যের দীপশিখা,
জ্বালাইয়া রাখি অবোধ অন্ধকারে,
দেখিতে না পাই, বুঝি অনুভবে, তুমি আছ কাছে কাছে;
নিজে এস মাতা, লহ মোর দীপারতি।

জীবন-মৃত্যুর "অবোধ অন্ধকারে" কবির যাত্রা শুরু হল। 'রাজহংসের' সূচনা মাতৃনামের উৎসর্গে, শেষ সহধর্মিণী-বন্দনায়। মাঝে চারিটি ভাগ: "হিমালয়", "নির্ঝরিণী", "অরণ্য-প্রান্তর" ও "আকাশ-সাগর"। আগেই বলেছি, এই দ্বিতীয় পর্ব আত্মরূপচিত্রণের পর্ব। 'রাজহংস' কাব্য তার সার্থক পরিচয়স্থল। এই কাব্যের কয়েকটি কবিতা বাংলা কাব্য-সংসারে স্থায়ী আসন লাভের যোগ্য। "কালকূট", "দুই মেরু", "তিমির-তীর্থ", "পাদ্য-পাদপ", "তমসা-জাহ্নবী", "সরস্বতী", "চিরজয়ী", "আকাশ-সাগর": এই আটটি কবিতা সজনীকান্তের কবিমানসের পরিচয় উদ্ঘাটনে অবশ্য-আলোচ্য।

"কালকূট" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'পত্রপুট'-কাব্য-রচনার অব্যবহিত পূর্বে লিখিত, 'পত্রপুটে'র ১৩-সংখ্যক কবিতার সঙ্গে এর ভাবের সমধর্মিতা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেছেন ওই কাব্যের এবং এর "মর্দানা আওয়াজ" ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সপ্রশংস মন্তব্যে ভূষিত হয়েছে। অসম ও অমিল পদ্যছন্দে সজনীকান্ত "কালকূট" কবিতায় যে পারুষ্যবীর্য গাম্ভীর্যের ধ্বনিরোল এনেছেন, তা কেবল ছন্দের অভিনবত্বে নয়, ভাবের মৌলিকতা ও সাহসে দীপ্যমান। মৃত্যু-মাঝে জীবনের নির্ভয় বন্দনাগানের যে দীপ্র কবিকণ্ঠ এখানে ধ্বনিত হয়েছে, তা স্মরণযোগ্য:

দূর কর মোহ-আবরণ,
বৈশাখের উন্মাদ বাতাসে
ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক যুগান্তের কালো মায়াজাল,
হাসুক শ্যামল কিশলয়।
যে জীবন যুগে যুগে মৃত্যুরে করিল উপহাস,
মৃত্যুরে করিল নমস্কার—
করিল না ভয়—
শ্মশানের ভস্মস্তূপে সে জীবন খুঁজিছে আলোক,
মাটি ফুঁড়ি উঠিবে আকাশে—
মৃত্যুর বন্দনা-গানে
সে জীবনে বারবার জানাই প্রণতি।
মৃত্যুরে করিতে জয়, নির্ভয়ে করিতে হবে পান
জীবনের সেই কালকূট।

আত্মরূপচিত্রের পরিচয় পাই "দুই মেরু" কবিতায়। জীবনের আলো ও আঁধারের বিপরীত আকর্ষণে দোলায়িত কবিমানসের অপরূপ কাব্যচিত্র এই কবিতা। মনের উত্তর-মেরুতে 'ছায়াহীন আলো', 'মৃত্যুহীন গাঢ় শীতলতা', দক্ষিণ-মেরুতে 'বারিধি গর্জন, রৌদ্রকরে নীল জল উঠে ঝলকিয়া'। দক্ষিণ-মেরুতে জীবনের কাকলি, যৌবনের গান, 'তপ্ত ভোগ তপ্ত কান্নাহাসি', উত্তর-মেরুতে

বার্ধক্য-মৃত্যুর কঙ্কাল ছায়া, পূতিগন্ধে আকাশ ভরপুর, জীবনের 'বীভৎস বিকৃতি'। দক্ষিণ-মেরুতে কবি সবার, উত্তরে একাকী। এ দুয়ের বিপরীত আকর্ষণে কবিমন আজ ক্লান্ত, মেলে না সমাধান :

দক্ষিণেরে ভালবাসি, উত্তর আমারে করে প্রেম,
সমাধি-শয়ন রচি মোর লাগি সে জাগে প্রহর,
দক্ষিণে আঁকড়ি লোভে আমিও অনন্তকাল ধরি
রচি উত্তরের ব্যবধান।
জানি না, মৃত্যুর অন্ধকারে
উত্তর দক্ষিণ মোর মিশে গিয়ে এক হবে কি না,
হয়তো প্রতীক্ষা তার করি।

যৌবনের তপ্ত ভালবাসা ও জীবনের মৃত্যুহীন গাঢ় শীতলতা, দক্ষিণ ও উত্তর মেরু—এ দুয়ের মধ্যে কাম্য কে, সে প্রশ্নের স্পষ্ট সমাধান এখানে পাই না। তবে "পান্থ-পাদপ" কবিতাটিতে কবি তাঁর সত্য পরিচয় প্রকাশ করেছেন—জীবনের ঘাটে ঘাটে নানা পরিচয়ের ফুল কুড়িয়ে যে মালা গেঁথেছেন, তাকে অবহেলে ত্যাগ করে চলে গেছেন নবতর পরিচয়ের আশায়। 'অজয়' উপন্যাসের নায়িকারাই এই কবিতার পান্থপাদপ। কবি নিরুদ্দেশের যাত্রী পথিক, সংসারে প্রেম-প্রীতি-স্নেহ তাঁর যাত্রা ভুলিয়েছে, কিন্তু তাঁর গতি ক্ষান্ত হয় নি। নম্র নিবেদনে কবির সত্য পরিচয়টি প্রকাশ পেয়েছে :

চির-পথিকের অজানা যাত্রা পথে
তোমরা, হে সখী, ছায়া-সুশীতল পাদপ হইতে পার,
আঁধার মাটিতে শিকড় গাড়িয়া আছ।
আমার জীবনে শুধু
তোমা সবাকার খণ্ড খণ্ড ছায়াময় ইতিহাস।
এর বেশী কিছু নহে,
আমি তোমাদের নহি—
চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।

কবিজীবনের সত্য পরিচয়টি এখানেই বিধৃত হয়েছে : 'চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি।' কবি নিজেই বলেছেন তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র তৃতীয় খণ্ডে এই পর্বটি—বিশেষ ভাবে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দটি 'আত্মস্থ হইবার বৎসর।' ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, কাব্যগত জীবনেও তেমনই কবি আত্মস্থ হয়েছেন।

"তমসা-জাহ্নবী"তে কবির জীবনে নদীর গূঢ় প্রভাবটির পরিচয় বিধৃত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধের গোড়ায় বলেছি, অজয়, মহানন্দা, দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, পদ্মা, কাঞ্চন প্রমুখ নদী কবির বাল্য কৈশোর কৌমার যৌবনকে এবং অন্তর্জীবনকে প্রভাবিত করেছে। আজ মধ্য-যৌবনে ভাগীরথীতীরে উপনীত হয়ে কবি নদী-ঋণ স্বীকার করেছেন এবং জাহ্নবী-তীরে জীবনমৃত্যুরহস্যের আবরণ উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছেন। এই ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসার গভীরতা ও তীব্রতা এই পর্বের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। আলোক ও তমসার বিপরীত কোটির আকর্ষণে কবিচিত্ত দোলায়িত হয়েছে, "তমসা-জাহ্নবী" তারই কাব্য-পরিচয়।

'রাজহংস' কাব্যের শেষ দুটি কবিতা "চিরজয়ী" ও "আকাশ-সাগর" সহধর্মিণী-বন্দনা। ঠিক তার আগের কবিতাটি "সরস্বতী"। জীবনসাধনার দিক দিয়ে "আকাশ-সাগর" এই কাব্যের শেষ কবিতা, কিন্তু কাব্য-সাধনার দিক দিয়ে "সরস্বতী", 'রাজহংসে'র শেষ কবিতা। "আকাশ-সাগর" কবিতায় শ্রান্ত জীবনপথিকের নম্র নিবেদন :

অবশেষে দেবী, তোমারই চরণতলে
শ্রদ্ধা-প্রেমের অর্ঘ্য আনিনু বহি ;
বিপথে ঘুরিয়া তোমাতে আমার সমাপ্ত পথচলা।

"পান্থ-পাদপে"র বিচিত্র রমণীকুলের সাক্ষাৎ আর পাওয়া যাবে না, কবি-জায়া সুধা দেবীই এখন কাব্যসুধাসত্রের দেবী। হিমালয়-চূড়া থেকে কবি নেমে এসেছেন সন্ধ্যায় গ্রামের পথে—সরোবরের বাঁধাঘাটে। আকাশ-সাগর এখন সরোবর-তীরে বাঁধা পড়েছে, কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীই এখন কবিজীবনের নিয়ন্ত্রী। তাই কবির বিনিঃশেষ আত্মসমর্পণ :

সন্ধ্যা নামিল, স্নান শেষ কর দেবী,
তুলসীমঞ্চে জ্বালিতে হইবে দীপ—
আমি রব পিছে পিছে,
করজোড়ে শুধু রহিব দাঁড়ায়ে উঠানের এক ধারে।
প্রণাম সারিয়া উঠিবে যখন তুমি,
দেখিতে পাইবে, আমার আকাশে সারি সারি দীপ জ্বালা,
তোমার সাগরে যুগ যুগ ধরি কাঁপিবে তাহারি ছায়া।

দেবী ভারতীর অন্বেষণও শেষ পর্যন্ত গৃহাঙ্গনে এসে সমাপ্ত

হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী পর্যটন করে কোথাও দেবীকে কবি পেলেন না, তখন :

ক্লান্ত দেহে ফিরিনু আমি দীর্ঘ পথ ধরি,
শান্ত মনে বসিনু এসে ঘরের বাতায়নে,
ঘুমায়ে পড়িলাম।
জাগিয়া আজ খুঁজিয়া পেনু হারানো আপনারে ;
আমার মন জুড়ে
বসিয়া আছে আমার সরস্বতী।

বাইরে নয়, অন্তরেই কমলাসনার প্রতিষ্ঠা। এই সত্যের উপলব্ধিতে 'রাজহংস' কাব্যের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পর্বের শেষ কাব্য 'আলো-আঁধারি'। আত্মরূপ-চিত্রণের সাধনা এখানে সম্পূর্ণ হয়েছে। 'রাজহংস' মাতৃনামে উৎসর্গীকৃত, 'আলো-আঁধারি' পিতৃনামে উৎসর্গীকৃত। এই কাব্যে "আলো-আঁধারি", "মৃত্যু-মাধুরী", "জড়", "অগ্নিদূত", "অসহায়", "আহ্বান", "ভুল", "ভ্রান্তি", "নিয়তি", "স্বপ্ন-সহচরী", "ব্যর্থতা", "মোহ-মুদগর" প্রভৃতি প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের (১৯২৪-৩৬) নানা বিচিত্র কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাই এগুলিকে 'রাজহংস' কাব্যের পরিণতি না বলে সমকাল ও পূর্বকালে বিচিত্র কাব্য-ভাবনার একত্র সমাহরণ বলাই উচিত। তবু একটি সূত্রে এগুলি গাঁথা আছে—জীবনমৃত্যুর রহস্যসন্ধানের ব্যাকুলতা, আত্মজিজ্ঞাসার তীব্রতা ও পথভ্রান্তির বেদনা এগুলিকে বিশেষ অর্থদান করেছে। ব্যঙ্গ হাসি ও চটুল কবিতার যে পর্ব কবি পিছনে ফেলে এসেছেন, সেখানে আর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন নি। পরন্তু গভীর দর্শনচিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তার পরিচয়স্থল এই কাব্য। সমালোচক মোহিতলালের প্রশংসাধন্য এই কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে সজনীকান্ত 'আত্মস্মৃতি'র তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় তরঙ্গে বলেছেন, "এতদিন ব্যঙ্গ হাস্য ও হালকা কবিতার কবি ছিলাম। এই দুই কাব্য ['রাজহংস' ও 'আলো-আঁধারি'] প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক কবির স্তরে উত্তীর্ণ হইলাম ; কিন্তু সাধারণের দরবারে তাহাতে যে লাভ বিশেষ হইল তাহা মনে হয় না ; শনিবারের চিঠির 'সংবাদ-সাহিত্যে'র লেখক সজনীকান্তকে কবি সজনীকান্ত অতিক্রম করিতে পারিল না। আমার সাহিত্যজীবনের ইহাই সর্বাধিক ট্রাজেডি।" বর্তমান প্রবন্ধের সূচনায় সজনীকান্তের কাব্যপাঠে এই বাধার প্রতি ইঙ্গিত করেছি। এ বাধা উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারলেই পাঠকের পক্ষে কাব্যরস আস্বাদন করা সম্ভবপর হবে।

'আলো-আঁধারি' কাব্যে কয়েকটি সার্থক রোমান্টিক প্রেম-কবিতা আছে। "ছবি", "পরশমণি", "স্মরণ", "তুমি", "জাগরণী", "নিরালি", "অকথিত", "বিচিত্রা", "বর্ষায়" প্রভৃতি কবিতায় প্রেমের যে উল্লাস ও আনন্দ প্রকাশিত হয়েছে, তা স্মরণযোগ্য। ব্যঙ্গবিদ্রূপের কবি ও সম্পাদক-সমালোচক সজনীকান্তের কথা মন থেকে মুছে ফেলে এই দাম্পত্য-রস ও রোমান্টিক প্রেমবিলাসের বর্ণসমৃদ্ধ দৃশ্যগুলি আমাদের উপভোগ করতে হয়। রবীন্দ্রানুসারী কবি-সমাজের একটি সামান্য লক্ষণ—রোমান্টিক প্রেমের বন্দনা। কিরণধন, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, পরিমলকুমার, কালিদাস, সতীশচন্দ্রের মত সজনীকান্তও কাব্যবীণায় রোমান্টিক প্রেমের সূক্ষ্ম তারে ঝঙ্কার তুলেছিলেন, এই কবিতাগুলি তারই প্রমাণ। সজনীকান্তের কাব্যজীবনের তৃতীয় পর্বে উত্তীর্ণ হবার পূর্বলগ্নে এই সুমধুর প্রেমরসের সামান্য পরিচয় গ্রহণ করা যাক—মৃত্যু-রহস্যকে দর্শনচিন্তায় নয়, প্রেমালসেই কবি পরাজিত করে বলেছেন :

বিজয়ী আমি, নহে এ পরাজয়!
বাড়ুক বেলা, পড়ুক বেলা, করি না আর ভয়।
নামে নামুক ম্লান গোধূলি-বেলা,
দিনের পরে গগন 'পরে বসে রঙের মেলা।
গাহিবে গান, কাঁপিবে প্রাণ প্রদীপশিখা সম,
নিবিবে জানি, রশ্মি-শেষ তবুও মনোরম।
মিলনখানি মালার মত দোলে ভুবনময়,
আমার ঠোঁটে মিলালে ঠোঁট, মধুর পরাজয়!

[পরশমণি, 'আলো-আঁধারি']

॥ ৫ ॥

কবিজীবনের সূচনায় অপিলভি হস্টেল পত্রিকায় প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথ" কবিতাটিতে সজনীকান্ত তাঁর কাব্যজীবনের কোষ্ঠীপত্র রচনা করেছিলেন। তারপর যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি ও আতিশয্য, আত্মঘাতী ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও তিক্ততার পথ পেরিয়ে 'রাজহংস' কাব্যের "রবীন্দ্রনাথ" কবিতায় মনজয় লাভ করেছিলেন। এ সবই পূর্বে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্র-সাধনায় মহত্তর পরিণতি

ঘটল তৃতীয় পর্বে—রবীন্দ্রাশ্রয়িতার পর্বে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯৩০-এ যে মনোমালিন্য ঘটেছিল ও যার ফলে সজনীকান্ত 'প্রবাসী' প্রেসের কর্মাধ্যক্ষপদে ইস্তফা দিয়েছিলেন, সে বিচ্ছেদ দূরীভূত হয়ে কবির সঙ্গে তাঁর পুনর্মিলন হয়েছিল ১৯৩৪-এর জুনে খড়দহে গঙ্গাতীরে রবীন্দ্রনাথের সাময়িক আবাসস্থলে। সেইদিনই সজনীকান্তের চোখে রবীন্দ্রনাথের নবপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আমি গঙ্গার সন্তান।" 'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যের "গাঙ্গেয়" কবিতার উৎস সেই স্বীকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে (৭ আগস্ট ১৯৪১) সজনীকান্তের কবিজীবনে তৃতীয় পর্বের সূচনা হল। মহত্তম কবি-প্রতিভার চরণে নম্র প্রণতি নিবেদন করতে গিয়ে সজনীকান্ত তাঁর কাব্যজীবনে নতুন পথ খুঁজে পেলেন। দ্বিতীয় পর্বের সমস্যা-সমাধান এক মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে গেল, নিদারুণ মৃত্যুঘাতে সজনীকান্তের কবিমানসে নবতর সংশয় উপস্থিত হল—'পঁচিশে বৈশাখ' কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে সে সংশয় ধ্বনিত হয়েছে:

জীবনের মাঝে আনন্দ আছে বার্তা পেয়েছি তোমার কাছে,
মৃত্যুর মাঝে অমৃত আছে কি, সেই সন্ধান দিবে কি তুমি?…
বৃথা কবিতার বুনি যে জাল—
তোমার কাব্য পুষ্পিত হয়ে পার হয়ে গেল তুহিন-রেখা!
সেখানে বরফ গলে না হায়,
কার আঁখিজল হিমালয় হল কেহ কি পেয়েছে
ঠিকানা তার?…
গান যে আকাশে ভেসে বেড়ায়,
সুর হয়ে তুমি ধরার বাতাসে ছড়ায়ে গিয়েছ আপনাকেই।
প্রাণের আগুন নেবে যে হায়,
সুরের আগুন জ্বালে যেইজন মরণে তাহার কিসের ভয়!

মৃত্যুত্তীর্ণ সেই কবির বন্দনা রচিত হয়েছে "গাঙ্গেয়" কবিতায়—'গাঙ্গেয়, তব অশীতিবর্ষে তোমায় প্রণাম করি।' "বলাকা" কবিতায় নিখিল মানবের যে চিরন্তন প্রশ্ন ধ্বনিত হয়েছে, সজনীকান্ত তারই সূত্র তুলে গঙ্গার সন্তান রবীন্দ্রনাথের নিখিল বিশ্বপরিক্রমার বিবরণ দিয়ে প্রণতি জানিয়ে বলেছেন:

আজো সন্ধান মেলে নাই কবি, পাও নি জবাব কোন।
মূক প্রত্যাশা বধির আকাশ চেয়ে
খোঁজে উত্তর, মিলায় শঙ্খধ্বনি—
অসীম আকাশে জগতের গতি নীরব অন্ধকারে।
গাঙ্গেয়, পুন গঙ্গোত্রীতে তোমার যাত্রা শুরু।

রবীন্দ্র-জীবনকে অবলম্বন করেই সজনীকান্ত বিশ্বরহস্য-সন্ধানে যাত্রা করে এক নবতর কাব্যপর্বে উপনীত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অশীতিবর্ষপূর্তিতে সজনীকান্তের এই জিজ্ঞাসা পরবর্তী বাইশে শ্রাবণের নিদারুণ মৃত্যুঘাতে খণ্ডিত হল, কবিজীবনের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে উঠল।

এরই প্রতিক্রিয়ায় আমরা পেলাম বিখ্যাত "মর্ত হইতে বিদায়" কবিতাটি। সজনীকান্তের কাব্যভাবনা রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার উপর কতদূর নির্ভরশীল, তার পরিচয় এখানেই পেলাম। সেইসঙ্গে মহৎ শোকের আঘাতে জাগ্রত কবিমনের একটি মহৎ প্রকাশরূপে এই কবিতাটি চিহ্নিত হয়ে গেল। কবিতাটির সূচনায় যে আর্ত হাহাকার, তা গভীর ও আন্তরিক:

বৃহদারণ্য বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?
অরণ্যভূমি আঁধার করিয়া শতেক বর্ষ ধরি
শাখাপ্রশাখায় মেলি সহস্র বাহু
মৃত্তিকারস করিয়া শোষণ শিকড়ের পাকে পাকে
নিয়ে বিরচি বহুবিস্তৃত স্নেহছায়া-আশ্রয়—
অভ্রংলিহ বনস্পতির মৃত্যু দেখেছ কেউ?…
বিফল উপমা, কোথা অরণ্য, কোথায় বনস্পতি,
কোথা কালিদাস, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে কবি—
কোথায় উজ্জয়িনী?
শুধু মেঘদূত গগনে গগনে গুমরিছে গুরু গুরু,
পবনে করিয়া ভর
কালসমুদ্র পার হয়ে এল সহস্র বর্ষের।
শত-পারাবত-কূজন মুখর ভবনবলভি যত
মিশেছে ধূলায়, শুনিতেছি মোরা আজো—
কপোতকাকলি এ কলিকাতায় অলস মধ্যদিনে।

নিদারুণ মৃত্যুঘাতে বিবশ কবিচিত্তের মর্মমথিত ক্রন্দনবাণী মুহূর্তেই পাঠকচিত্তকে স্পর্শ করে—'ভুবন ছাড়িয়া ভুবনের কবি গিয়াছে পরমক্ষণে,' এই শোকের সান্ত্বনা কোথায়? কবি সান্ত্বনা পেয়েছেন গৃহকোণে। ভুবনজোড়া হাহাকার থেকে কবি আত্মাপসরণ করে এলেন:

অন্ধকারেতে সভয় চরণ ফেলিয়া এলাম ঘরে—
আমার রুদ্ধ ঘরে;

সম্বিৎহারা সম্বিৎ পেনু ফিরে—
প্রসন্ন আঁখি মেলি দেখিলাম, আমার ঘরের কোণে
স্নিগ্ধ শিখায় জ্বলিতেছে ঘৃতদীপ ;
চিতার আগুন ঘরের প্রদীপে কখন ছুঁইয়া গেছে—
ছুঁয়েছে পরম স্নেহে।
দ্বিধা-কম্পিত দুই করতল এক হল আশ্বাসে,
বলিতে পারি না কোন্ দেবতারে ঘৃতদীপ-মহিমায়
নিবেদিনু নতি চরম নমস্কারে।

কবিপ্রাণের মত্ত হাহাকার এখানে সান্ত্বনা লাভ করেছে। 'রাজহংস' কাব্যের "পান্থ-পাদপ" কবিতার নায়ক এখন আপন মানস-সরোবরের তীরে আশ্রয় সন্ধান করছেন। 'মানস-সরোবর' কাব্যে সেই আশ্রয়-সন্ধানের কাহিনী বিধৃত হয়েছে।

'মানস-সরোবর' কাব্যের প্রথম কবিতা "মানস-সরোবরে" যে আশ্রয়সন্ধানের কাহিনী, শেষ কবিতা "নচিকেতা"য় তারই মহত্তর ব্যঞ্জনাগর্ভ রূপায়ণ। নচিকেতার প্রতি কবির জিজ্ঞাসা :

নচিকেতা, তব সন্ধান হল শেষ ?
মৃত্যু-আলয়ে আতিথ্য লভি ফিরিলে মর্তভূমে ;···
মিলেছে কি সমাচার ?···
নচিকেতা, তব সাধনা কঠোর কি দিল আমারে আনি ?
একটি কাহিনী—উপলখণ্ড কালবারিধির তটে,
বজ্র-অগ্নি তাহারই একটি নাম।
হায় নচিকেতা, মর্তলোকের জীবন মরণশীল,
ধরার বিরহ-ব্যথায় কাতর শঙ্কিত ভীরু প্রাণ
তোমার কাহিনী মাঝারে তাহারা পেয়েছে কি আশ্বাস
সম্মুখ হতে উঠেছে কি কারো প্রাণমৃত্যুর
রহস্য-যবনিকা,
দৃষ্টি হইতে ছিঁড়িয়া খসেছে কারো সংশয়-জাল ?
হায় নচিকেতা, বিফল সাধনা তব।

মহত্তম কবিপ্রতিভার অন্তর্ধানে সজনীকান্ত যে সান্ত্বনা গৃহপ্রদীপের আলোয় পেতে চেয়েছিলেন, পরবর্তী দিনের ঝোড়ো বাতাসে সে প্রদীপশিখা কেঁপে কেঁপে উঠেছে ; নচিকেতার অমৃত-সাধনায় মৃত্যুগ্রস্ত ধরণীর কবি আশ্বাস লাভ করেন নি, তাই এ কথা বলতে তিনি বাধ্য হয়েছেন :

নচিকেতা, তব প্রাচীন কাহিনী মানি যে অর্থহীন,
মৃত্যুর কালো, আলো তার মাঝে পশিবে না
কোনও দিনও,
নচিকেতা, ছাড়ো পুরাতন প্রতারণা।

"মর্ত হইতে বিদায়" ['পঁচিশে বৈশাখ'] কবিতার রচনা-তারিখ ১৯ ভাদ্র ১৩৪৮, আর "নচিকেতা" ['মানস-সরোবর'] কবিতার তারিখ আশ্বিন, ১৩৪৮। অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে সান্ত্বনালাভ ও সান্ত্বনাচ্যুতির এই নিদারুণ বেদনা কবি সজনীকান্ত বহন করেছেন। আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনে যে আশ্রয় ছিলেন, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে কবি আলোচ্য তৃতীয় পর্বে আর কাব্যজীবনের ভারসাম্য ফিরে পাচ্ছেন না। ঠিক তার পরে রচিত [কার্তিক ১৩৪৮] "মানস-সরোবর" কবিতায় আবার সেই পুরাতন আশ্রয়—কাব্যবিশ্বাস ফিরে পাবার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি—

সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম ;
সকল দিনের শেষে নাহি নামে রাত্রির আঁধার,
সকল রাত্রির শেষে জাগে না প্রভাত।···
এই মৃত্যু, এই পরিণাম।
সব ভুল, সব ভুল, যাহা কিছু জানিয়াছিলাম।
ক্লান্ত পক্ষ বিস্তারিয়া, রাজহংস পঁহুছিল শেষে
হিমাচল-পাদমূলে গাঢ়নীল মানসের তীরে।···
আমারও বিশ্রাম জানি এই নীল মানসের তীরে,
যে মানস আমারই মানসে ;
মোর হিমাচল-মূলে স্তব্ধ শান্ত নীলাম্বু-সায়র—
আমি রচিয়াছি সেথা ক্লান্তপক্ষ বিহঙ্গের অন্তিম বিশ্রাম,
আপনি করেছি সৃষ্টি টলমল নীল নীর স্বচ্ছ সুশীতল,
অগাধ অতল জল, মোর তপ্ত জীবনের জ্বালা-অবসান।

আত্মরূপচিত্রণের পর্ব ও আত্মরূপবিশ্লেষণের পর্ব : এ দুয়ের মাঝে আলোচ্য তৃতীয় পর্ব—রবীন্দ্রাশ্রয়িতার পর্ব। তবে এই মহৎ আশ্রয়ে থেকেও কবি সজনীকান্ত আত্মবিশ্লেষণের হাত এড়াতে পারেন নি। 'রাজহংস' কাব্যের (দ্বিতীয় পর্বে) "দুই মেরু" ও "পান্থ-পাদপ" কবিতায় যে আত্মরূপচিত্রণ, তা আরও গভীর ও বিশ্লেষণ-ধর্মী হয়েছে 'মানস-সরোবর' কাব্যের দুটি কবিতায়—"আমি" ও "স্লেটের লেখা"য়। সজনীকান্তের কবিমানসের

বিশ্লেষণে এ দুটির পরিচয় গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য। "পান্থ-পাদপ" কবিতায় দেখেছি, কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন একটি সুন্দর বর্ণনায়—'চির-রৌদ্রের চির-আলোকের সঙ্গী পথিক আমি'।

"আমি" কবিতাটিতে আত্মবর্ণনা আরও গভীরে পৌঁছেছে। আত্মজিজ্ঞাসায় কবিপ্রাণের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। কবি আত্মানুসন্ধানে বেরিয়েছেন :

কে আমি, কি মোর পরিচয়—
এই চিরন্তন দ্বন্দ্বে বারম্বার পাসরি পাসরি
তালমন্দে গড়া আমি মোর বিশ্বে পেয়েছি প্রকাশ।

বোধ করি প্রত্যেক বিবেকবান্ সৎ কবির মনেই এই জিজ্ঞাসা ওঠে; কেউই এর হাত এড়াতে পারেন নি। সজনীকান্ত এর হাত এড়িয়ে যেতে চান নি, এখানেই তাঁর কাব্যসাধনার আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে খণ্ড জীবনচিত্রগুলি অখণ্ড সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, আপাত-বৈষম্যের অন্তরালে নিগূঢ় ঐক্যদর্শন গড়ে ওঠে। সজনীকান্তের সেই সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচায়ক "আমি" কবিতাটি। কবি সংসারের একজন, ঘৃণা প্রেম তিনি পেয়েছেন, বিলিয়েছেন, তথাপি তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচে নি। আর সৃষ্টিশীল সাহিত্যিকের এই নির্জনতাবোধ কোনদিনই যায় না। তাই কবির স্বীকৃতি :

সেথানে একাকী আমি, সে অসীম একান্ত আমার—
ভাষাহীন সে অসীমে চিরমূক ইতিহাস মোর।

কিন্তু কবি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারান নি। যে মহত্তম কবি তাঁর শেষ testament-এ মানবতার প্রতি মৃত্যুঞ্জয় আস্থা স্থাপন করেছেন, সজনীকান্ত তাঁরই ভাবশিষ্য। তাই সজনীকান্ত ঘোষণা করেছেন :

জীবনের দুঃখ শোক লাঞ্ছনা ও অপমান মাঝে
এই শিক্ষা আমি লভিয়াছি—
মহত্তেরে বৃহত্তেরে প্রতিদিন করিব স্বীকার।…
সমস্ত বেদনা-বিষ এ জীবনে করিয়া মন্থন
মুঠি ভরি যে অমৃত এতদিনে করিয়াছি পান,
সাধ যায় জনে জনে নিজ হাতে দিতে সেই সুধা—
নিজেরে প্রকাশ করি সকলেরে পড়িয়া ভুলিতে;
মুছে-যাওয়া শূন্যতার রূপহীন মানুষের আর কোনও
নাহি পরিচয়।

সজনীকান্ত তাঁর কাব্যপাঠককে নৈরাশ্যের অতল গভীর খাদের সামনে ছেড়ে দেন নি, অমৃত-পথের—মানুষ ও সংসারের প্রতি প্রেমের নির্দেশ দিয়েছেন।

"স্লেটের লেখা" কবিতাটিতেও আত্মরূপচিত্রণের ও আত্মপরিচয়লাভের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবিমানসের সহজাত নিঃসঙ্গতা নিয়ে তিনি এখানেও জীবনপথ-পরিক্রমায় বেরিয়েছেন :

মোর ভালবাসা শিশুকাল হতে ফিরেছে দোসর খুঁজে—
কখনো ভিক্ষা কভু কাতরতা কখনো পরাক্রম।
আজ সে বিবাগী, তবু
অজানা অনাম অনিশ্চিতের খুঁজিতেছে আশ্রয়।

শেষ পর্যন্ত জননী-আশ্রয় লাভ করে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। মানস-সরোবর-পরিক্রমায় এই জননী-আশ্রয় রবীন্দ্রাশ্রয়ের পটভূমিতে মহত্তর ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছে।

॥ ৬ ॥

মানস-সরোবর আশ্রয়েই সজনীকান্তের কাব্যের তৃতীয় পর্বের সমাপ্তি। প্রথম পর্বের উদ্‌ভ্রান্তি ও তিক্ততা এবং দ্বিতীয় পর্বের আত্মরূপচিত্রণ-সাধনা উত্তীর্ণ হয়ে কবি তৃতীয় পর্বে যে রবীন্দ্র-আশ্রয়ে পৌঁছেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারলেন না। আবার নবতর কাব্য-বিশ্বাস ও আশ্রয় সন্ধানে চতুর্থ পর্বে যাত্রা শুরু করলেন। এই শেষ পর্বের (১৯৪৩-৫৭) কবিতা একত্র সঙ্কলিত হয় নি, বিভিন্ন পত্রিকায় তা ছড়িয়ে আছে। এই পর্বের যে বিশিষ্ট লক্ষণ, তাকে বলতে পারি আত্মরূপবিশ্লেষণের পর্ব। প্রৌঢ়ির প্রশান্তি এখন কবিমনে আধিপত্য বিস্তার করেছে। যৌবনের বিক্ষুব্ধ উন্মাদনা এবং অশান্ত আত্ম-জিজ্ঞাসা এখন অপসৃত হয়েছে, তার স্থানে এসেছে প্রশান্ত আত্মবিশ্লেষণ। সকল তিক্ততা ও বেদনা থেকে, সংশয় ও হতাশা থেকে কবি এই পর্বে মুক্ত হয়েছেন। সজনীকান্তের সাম্প্রতিক কবিতাবলী পাঠে অন্ততঃ এই ধারণাই সমর্থিত হয়।

ত্রিশ বৎসরের কাব্যপরিক্রমা অন্তে এ কথাই আমাদের মেনে নিতে হয় রবীন্দ্র-রূপ-সাগরতীর ছেড়ে কবি সজনীকান্ত অন্যত্র যেতে চান নি। তাঁর রবীন্দ্র-বিরোধিতা আপাত, বাহ্যিক ও সাময়িক। কাব্যজীবনে তিনি রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে দীক্ষিত। সমরোত্তর আধুনিক

বাংলা কবিতায় হতাশা ও বেদনাই তাঁর কাব্যজীবনে পরমাপ্রাপ্তি নয়। কল্লোল-কালিকলম-পূর্বাশা-গোষ্ঠী থেকে আজ পর্যন্ত প্রবাহিত যে আধুনিক সংশয়ী অবিশ্বাসী নাগরিক কাব্যধারা, সজনীকান্ত তাকে কোনদিনই সমর্থন করেন নি। 'শনিবারের চিঠি'র তীব্র আধুনিক কাব্য সমালোচনার মূলে আছে সজনীকান্তের এই কাব্যবিশ্বাস। একে অস্বীকার করলে বিদ্রূপ-কটূক্তিটাই প্রাধান্য পায়, প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে বিশ্বাসী আস্তিক সজনীকান্তের কবিমানসের পরিচয়টি অস্বীকৃত হয়। তার ফলে, আর যাই হোক, কবি সজনীকান্তের সাক্ষাৎ মেলে না।

চতুর্থ পর্বটি বলেছি আত্মরূপবিশ্লেষণের পর্ব। এই বিশ্লেষণের পিছনে কোনও তিক্ততা বেদনা বা মর্মান্তিক জ্বালা নেই। আছে প্রৌঢ়ির প্রসন্নতা, বার্ধক্যের গাম্ভীর্য। আস্তিক, সৃষ্টির মঙ্গলে বিশ্বাসী, শান্তিপ্রত্যাশী কবিমানস এই পর্বেই স্পষ্টতর চেহারায় দেখা দিয়েছে।

এ কথা স্মরণযোগ্য যে আলোচ্য পর্বটি আধুনিক ভারতবর্ষের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। ১৯৪৩-এ পঞ্চাশের মন্বন্তর ও যুদ্ধ, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃবলি, ১৯৪৭-এর খণ্ডিত স্বাধীনতা ও দেশভাগ, ১৯৪৮-এ গান্ধী-হত্যা, ১৯৪৮-৫০এ ছিন্নমূল জীবনের আশ্রয়সন্ধান প্রভৃতি বড় বড় ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে, বহু মানবিক মূল্যবোধের অবসান ঘটেছে, দ্রুত পরিবর্তমান সমাজ-জীবনে ভাঙন দেখা দিয়েছে, আণবিক যুগের নবরূপ প্রকাশ পেয়েছে, আত্মঘাতী মারণাস্ত্রের আবিষ্কারে ও মহাবিশ্বজয়ের নেশায় সভ্যতা গভীরতম সংকটলগ্নে উপনীত হয়েছে।

সজনীকান্তের মত সমাজসচেতন সদাজাগ্রত কবি এ-সবের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন না এবং অনুভূতিপ্রবণ কবিমানসে এ-সবের প্রতিক্রিয়াও গভীর-ভাবে মুদ্রিত হয়—এ কথা মনে রেখে শেষ পর্বের কাব্যালোচনায় আমাদের প্রবৃত্ত হতে হয়। আজকের দ্রুতপরিবর্তমান বিশ্বে যখন সার্বিক সংকটলগ্নটি উপস্থিত এবং মানবিক মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, তখন কোনও সৎ কবির পক্ষেই আপন আদর্শে অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন সাধনা। সর্বগ্রাসী হতাশা ও নৈরাশ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নাস্তিক তিক্ত জীবনদর্শনকে সত্য বলে মেনে নিতে হবে, না, একে পেরিয়ে আস্তিক জীবনদর্শনে পৌঁছতে হবে—এই কঠিন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছেন দুনিয়ার সকল সাহিত্যসেবক। এই পর্বে কবি সজনীকান্ত স্বনামে ও 'গোপালদা'র (সংবাদ-সাহিত্য, শনিবারের চিঠি) বেনামে যে-সব কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলি সম্বন্ধে অনুধাবন করলে লক্ষ্য করা যায়, তিনিও এই জিজ্ঞাসার হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। আজকের পরিবর্তমান বিশ্বে কোনও কিছুরই স্থায়ী সমাধান সুলভ নয় এবং কবি সজনীকান্তের কবিতায় আত্মরূপবিশ্লেষণের ও আত্ম-জিজ্ঞাসার যে তীব্রতা ও গভীরতা এই পর্বে লক্ষ্য করি, তা প্রমাণ করে তিনি বিবেকবান্ সৎ কবি—যিনি শান্তির শেষ বিজয়ে, মানবিক মূল্যবোধের মহত্তর সৃষ্টিতে, কল্যাণ ও মঙ্গলের জয়যাত্রায়, আস্থা রাখেন। কিন্তু বস্তুসচেতন কবি এত সহজেই পরিত্রাণ পান না। বাস্তবের কঠিন জিজ্ঞাসা ও তার সামনে আদর্শের অসহায়তা তাঁকে ব্যথিত ও পীড়িত করবেই। সেই বেদনা সজনীকান্তের এই পর্বের কবিতায় লক্ষণীয়। 'গোপালদা'র তিব্বতী গুহায় প্রস্থান, প্রত্যাবর্তন ও পুনঃপ্রস্থানে এই অস্থিরতা ও বেদনারই পরিচয় বিধৃত হয়েছে। তথাপি সজনীকান্তের সাম্প্রতিক কবিতায় দেখি, তিক্ততা নৈরাশ্য হতাশা প্রাধান্য লাভ করে নি, ধরণীর প্রতি গভীর ভালবাসাই জয়লাভ করেছে। 'গোপালদা'-মারফত সেই মৃত্যুঞ্জয় প্রেমবিশ্বাসের বাণী সজনীকান্ত আমাদের শুনিয়েছেন [শনিবারের চিঠি, সংবাদ-সাহিত্য, পৌষ ১৩৬৫]:

> পুরাতন এ ধরণী, তাই তো নবীনা প্রতিদিন,
> ছয়টি ঋতুর রসে সঞ্জীবিয়া রাখে আপনারে
> নিত্য বিবর্তন মাঝে; লক্ষয়ের ব্যর্থ গ্লানিভারে
> স্মরণ করে না কভু অতীত কালের কোন ঋণ।
> মাটির আঁধারে তার প্রাণসুধারস রয় জমা,
> সে রহস্য ফুলে ফলে নিত্য হয় বাহিরে প্রকাশ—
> তারি মাঝে আছে মন্ত্র রুধিবারে মহামৃত্যু-ত্রাস,
> তাই চিরপুরাতন এ ধরণী চিরমনোরমা।
> ওরে মৃত্যুভীত, সেই প্রাণমন্ত্র কবে শিখে নিবি,
> লোভহীন নিবেদনে নিজেরে নিঃশেষে করি দান,
> চলমান কালস্রোতে বার বার করি পুণ্যস্নান

এ চির যৌবন-তীর্থে ধরণীর, হবি চিরজীবী।
অনুখন চলে যেন ভাঙা-গড়া তোমার মাঝারে—
গতিহীন অক্ষয়েরে মহাকাল প্রতিদিন মারে।

আলোচ্য শেষ পর্বে (১৯৫৩-৫৯) কবির ব্যক্তিগত জীবনের দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একটি, তাঁর পঞ্চাশ-পূর্তি উপলক্ষে জন্মোৎসব-অনুষ্ঠান (৯ ভাদ্র ১৩৫৬), অপরটি তাঁর চক্ষু-অপারেশন (১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)। এই দুটি ঘটনাই তাঁর কাব্যজীবনে স্বাক্ষর রেখে গেছে।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আঘাত ও তিক্ততাসৃজন কবি সজনীকান্তের কাম্য নয়, তার প্রমাণ এখানে পাই। পঞ্চাশ-পূর্তি উপলক্ষে সুসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে কবিকে যে সংবর্ধনা সাহিত্যিক-বন্ধুরা জ্ঞাপন করেন, তার উত্তরে সজনীকান্ত যে ছন্দোবদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, তাতে কবিমানসের একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবি বলেছেন—

একদা মোর এই তো ছিল দাবি—
আমার হাতে বিশ্বজোড়া মনের আছে চাবি—
যেখানে যত কুলুপ সেই চাবিতে যাবে খুলে,
পারিব দিতে আশার বাণী নিরাশ হৃদিমূলে ;
সবার বুকে সবার লাগি জাগাব ভালবাসা,
আমার মুখে মুখর হবে মূক মনের ভাষা ;
নূতন সুরে আমি গাহিব গান,
উঠিবে গেয়ে সঞ্জীবিত পুরাতনের প্রাণ।
একদা মোর এই তো ছিল দাবি—
পেয়েছি হাতে সত্য-শিব-সুন্দরের চাবি।

জীবনের মহৎ সাধনার আকাঙ্ক্ষাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। পঁচিশে বৈশাখকে প্রণাম জানিয়ে বলেছেন, 'প্রণাম কবি পঁচিশে বৈশাখে, সারা যুগের সার্থকতা ঘিরিয়া থাক্ তাঁকে।' নৈরাশ্য তাঁর হৃদয়কে অধিকার করে নি, প্রীতির সাধনায় কবি সজনীকান্ত সমস্ত দুঃখবেদনাকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন, তাঁর কাব্যসাধনা সম্পর্কে এটাই বড় কথা।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা : চক্ষু অপারেশন। নবদৃষ্টি-লাভের ফলে গীতিকবিতায় একটি নতুন স্রোতোধারার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সজনীকান্ত একটি নতুন প্রত্যয়ভূমিতে উপনীত হয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতায় মূল রস শান্তরস, একটি প্রীতিপ্রসন্ন উত্তেজনামুক্ত শান্ত ধ্যানদৃষ্টির পরিচয় এখানে বিধৃত হয়েছে। এই নতুন কাব্য-ফসলের প্রথম সাক্ষাৎ পাই ১৫ ও ১৬ জানুয়ারি, ১৯৫৮তে রচিত দুটি সনেটে (শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। অন্যতর সনেট "নবায়ন" এই নতুন প্রত্যয়ের পরিচয় বহন করে, এটি সম্পূর্ণ উদ্ধারযোগ্য :

অন্ধতার আবরণ বিদূরি বিজ্ঞান-শলাকায়
সুনিপুণ হস্ত যাঁর প্রকাশিল নব সূর্যালোক—
লভি নয়নের জ্যোতি তাঁর প্রতি নতি মোর ধায়,
অবারিত দৃষ্টি মোর দিনে দিনে দূরগামী হোক।
তমসা-আচ্ছন্ন আঁখি যা দেখেছে কটু ও কষায়,
চারিদিকে যা দেখিয়া ভেবেছিনু অন্ধ হোক চোখ—
নবীন দর্শন লভি চিত্ত মোর প্রার্থনা জানায়—
সুন্দর হউক ধরা, মানুষেরা হোক বীতশোক।
বহুদিন ভুলেছিনু পৃথিবীতে এত আছে আলো,
যত আলো এ আকাশে এ মাটিতে তত ভালবাসা—
অন্ধত্বের আবরণ মানুষেরে দেবত্ব ভুলালো,
জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় ঘুচুক এ তম সর্বনাশা।
দরদী বিজ্ঞানী এস, এ আঁধারে দৃষ্টি-দীপ জ্বালো,
আনন্দে হাসুক পৃথ্বী, দূর হোক নিষ্ফল হতাশা।

ব্যক্তিগত উপলক্ষ্যকে কাব্যের অমরতা দানের একটি সুন্দর প্রকাশ বলেই এটি অভ্যর্থিত হবে। গীতিকবিতা যে কবির ব্যক্তিজীবনের কাব্যরূপায়ণ, সেটি এখানে পুনর্বার প্রমাণিত হল। পরবর্তী এক বৎসরে সজনীকান্তের কাব্যরচনায় যে জোয়ার লক্ষ্য করা যায়, তার সূচনা এখানেই—অন্ধ তমসায় উপর বিজয়লাভ আলোকের এই বন্দনায়।

কবি সজনীকান্তের কাব্যজীবনের ভিত্তিভূমি যে রবীন্দ্রকাব্য, তার উল্লেখ পূর্বেই করেছি। উপরোক্ত কবিতায় আস্তিক জীবনদর্শনের যে পরিচয় পাই, তা রবীন্দ্রকাব্য-নিষ্ক্রান্ত কবিমানসের আন্তর প্রকাশ। রবীন্দ্র-আনুগত্যের শেষতম পরিচয় পাই একটি 'টুকরি' কবিতায় [ফাল্গুন ১৩৬৪, শনিবারের চিঠি দ্রষ্টব্য]। রবির আলোয় বিশ্বজগৎ ও রবি-প্রতিভালোকে বাংলার কাব্যজগৎ উদ্ভাসিত হয়েছে, এই পুরনো সত্যের নবতম ঘোষণা এই কবিতাটি :

সবাই মিলে তুলেছিলাম ছবি
কেউ বা মোরা গল্প-লেখক
কেউ বা মোরা কবি।
অনেক কালের পর—
রাতের নভে হারিয়ে গেলাম
আমরা পরস্পর।
মহাকালের কালো পাড়ে
তারার ঝিকিমিকি
বাড়িয়ে দিয়ে, আমরা শুধু শিখি—
জগৎ জুড়ে আলো ছড়ায় রবি,
ছবির মতন আমরা শুধু ছবি।

যে শান্তি ও বৈরাগ্যের অধিষ্ঠানভূমিতে কবি উপনীত হয়েছেন, তা একাধিক কারণে আশঙ্কার স্থল বলে প্রতীয়মান হবে। জগৎ ও জীবনের প্রতি কবির অনাসক্তি ঘটতে পারে, অথবা তিনি কাব্যসাধনাকে ধর্মসাধনার তুলনায় নিম্নাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। সুখের বিষয়, সজনীকান্তের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কা অমূলক। প্রখর বাস্তবচেতনা ও কাণ্ডজ্ঞান তাঁকে রক্ষা করেছে। পূর্বে যে মনোবৃত্তি তাঁকে রোমান্টিকতার আতিশয্যকে তীব্র ব্যঙ্গ করতে প্ররোচনা দান করেছিল, আজ তা কবিকে অহংমুক্ত দর্শনচেতনার স্তরে উত্তীর্ণ করেছে। জগৎ ও জীবনকে সত্যরূপে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে সজনীকান্ত দেখেছেন। মূঢ় আত্মরতি ও রোমান্টিক প্রেমসাধনা সাম্প্রতিক বিশ্বাসরিক্ত হৃদয়হীন জগতে কী অভ্যর্থনা পেতে পারে, তার পরিচয় সজনীকান্ত উপস্থিত করেছেন একটি সনেটে। সেটির নাম 'বৃন্দাবনের প্রতি মথুরা' [চৈত্র ১৩৬৪ শনিবারের চিঠি]:

ফরমাশ করেছ বন্ধু, লিখিবারে প্রেমের সনেট—
যে প্রেম সনেট-প্রসূ, রাজপথে শুষ্ক বহুদিন।
তাহারে যতই ডাকি বলে সে যে, "ইট ইজ ট্যু লেট!"
হৃদয়ের পিণ্ড জুড়ে খসিয়াছে লিভার ও প্লীহা।
শূন্য মধু-বৃন্দাবন, ঝোলে সেথা 'টু-লেট'-ট্যাবলেট,
মথুরার কর্ণিকে বেণু ভেঙে হল আলপিন।
রাজাকে করিতে খুশী ভারে ভারে মদ আসে ভেট,—
নিধুবনে কেকাকুহু স্তব্ধ, বাজে ক্যানেস্তারা-টিন।
তাই তো নিবিষ্ট মনে লিখিতেছি ভুয়া আত্মস্মৃতি,
প্রেমের সমাধি 'পরে গড়িতেছি তাসের প্রাসাদ—
স্পেডকে রয়াল ডেকে লভি যে চরম আত্মপ্রীতি,
একমুখী ভালবাসা হয় বহুমুখী সাম্যবাদ।
বাল্যে যাঁর রাসলীলা তাঁরি কণ্ঠে ভগবদ্গীতি,
কুব্জে যে কুজিল প্রাতে, সন্ধ্যায় সে করে আর্তনাদ।

আজকের যে জগৎ-মথুরায় রোমান্টিক ভাবনা-বৃন্দাবনের 'বেণু ভেঙে আলপিন' তৈরি করা হচ্ছে, সেখানে কোন কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপনা করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। ধরণীপ্রীতি ও মানবপ্রেমের সঞ্জীবনী-মন্ত্রে কবি সজনীকান্ত এই বিশ্বাসরিক্ত জগতে রবীন্দ্রকাব্যাদর্শে গঠিত কবিমানসের প্রত্যয়টিকে রক্ষা করেছেন। সরস্বতীর সাধনমন্দিরে এই বাণীসাধক তাঁর 'মূক বন্ধু' 'বাণীহীন মসীপাত্রখানি'র আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনার সারস্বত-বিশ্বাসটিকে ব্যক্ত করেছেন একটি কবিতায় ['বন্ধুর প্রতি', জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫ শনিবারের চিঠি]:

মানি সেই মূক আবেদন
তোমারে স্মরিয়া বন্ধু, খুলিয়াছি মনের ভাণ্ডার।
এ অনিত্য পৃথিবীতে—সত্য যাহা রহে ধ্বনিময়
অতিক্রমি খণ্ডকাল তাই হয় চিরচমৎকার।
সংশয়ের ঊর্ধ্বে উঠি নিত্য হোক ক্ষণ-পরিচয়—
তুমি একা মোরে দিলে, আমি দিব সবার উদ্দেশে—
কে শুনিবে নাহি জানি, না জানি কে নেবে ভালবেসে।
তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য মোর এ বিশ্ব-ভুবন।
ছন্দে সুরে যদি কভু সার্থকতা লভে মোর বাণী
হারাইয়া যাই যদি তুমি আমি এই ভবে
ধন্য হবে মসীপাত্রখানি॥

'রাজহংসে'র কবি সজনীকান্ত তাঁর কাব্য-'মানস-সরোবর'-পরিক্রমা-অন্তে এই নিশ্চিত মৃত্যুঞ্জয় আশ্বাসের প্রত্যয়-ভূমিতে উপনীত হয়েছেন; এখানেই তাঁর কাব্যসাধনা সার্থকতা লাভ করেছে।

"বন্দেমাতরম্"

কবি-ধ্যানলব্ধ এই গান—
কোটি মানুষের বুকে জাগিল আশ্বাস সুখে
দুর্দিনের এল পরিত্রাণ।
হবে মুক্তি জাগে আশা, মূক মুখে ফোটে ভাষা,
ভায়ে ভায়ে ভালবাসা মা'র মুখ চেয়ে—
'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিকে দিকে ওঠে রণি
যেন নব আগমনী কোটি কণ্ঠ ছেয়ে।
মৃত্তিকার অন্ধকারে ছিল ক্ষুদ্র বীজাকারে,
ফোটে আলো-পারাবারে অঙ্কুরের প্রাণ।
এই গান সেই গান আনে মুক্তি আনে ত্রাণ,
গ্লানি-দুঃখ-অপমান করে অবসান—
কবি-ধ্যানলব্ধ মহা গান॥

ছিল যাহা কবির কল্পনা,
নিবিড় তমসাতীরে, বন্দিনী মায়েরে ঘিরে,
বেদনায় রচিত বন্দনা।
সহস্র সন্তান এসে, নিল মন্ত্র ভালবেসে
ছড়াইল দেশে দেশে মন্ত্রের সাধন।
অর্ঘ্য দিল লক্ষ প্রাণ সে কী আত্মবলিদান!
কারাগার খান্ খান্ ছিঁড়িল বাঁধন।
ফাঁসিরজ্জু পরি' গলে ডাক দিল কুতুহলে
ধেয়ে এল দলে দলে মাতৃমুক্তিমনা।
পুণ্য-রক্ত-স্নান করি, মাটি কাঁপে থরথরি—
নব অঙ্কুরের তাই জাগে সম্ভাবনা।
ধন্য হল কবির কল্পনা॥

সেদিনের সে নব অঙ্কুর—
আধো আলো অন্ধকারে জানি তিলে তিলে বাড়ে
ফুল-শোভা তবু বহু দূর।
এখনো সহস্র ভয়, তাহারে ঘিরিয়া রয়,
আছে ক্ষতি আছে ক্ষয় আকাশ-মণ্ডলে—
লোল শিখা লালসার আত্মঘাত মহামার
গতিরোধ করে তার মৃত্তিকার তলে।
তবু জানি ধীরে ধীরে শাখা-পত্রে দেবে ঘিরে
লাগিবে এ তরুশিরে কুসুমের সুর;
দেখা দেবে পুষ্পভার ভরি মন সবাকার
করে দেবে চারিধার গন্ধে ভরপুর।
সেদিনের সে নব অঙ্কুর॥

তার লাগি কর আয়োজন।
মুক্তির আলোক-ধারে চিনে নাও আপনারে,
ভায়ে ভায়ে মৈত্রীর বন্ধন—
হাতে হাতে বাঁধ রাখী জনে জনে কহ ডাকি
রেখো না নিজেরে ঢাকি স্বার্থের গণ্ডীতে;
সন্তানের তপস্যায় মা জাগিবে মহিমায়
বিশ্বধাত্রী যে মাতায় চেয়েছে বন্দিতে
কবির অমর গান; কর তারে রূপ দান
কর শস্যশ্যামলাং এ মরু-ভুবন।
'বন্দেমাতরম্' বলি প্রাণ-বলে হও বলী
হোক এ শ্মশানস্থলী বিশ্ববিমোহন।
সবে কর তারি আয়োজন॥

—'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদ সম্মেলনস্মরণী'
১লা মার্চ, ১৯৫৯
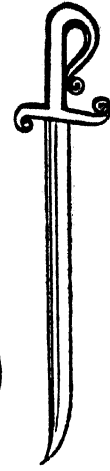
[পূর্বানুবৃত্তি]

সেদিন রাত্রে কিছুতেই ঘুমোতে পারল না বনলতা। কিন্তু কোন কষ্ট নেই। জীবন নেই মৃত্যু নেই তবে দুঃখ নেই কষ্ট নেই। সারারাত খাটে ঠেস দিয়ে হাই তুলে তুলে কাটল বনলতার। পরদিন কলেজে গেল, সারাদিন একমনে কাজ করল, কোনদিকে চাইল না, কাজের বাইরে সমস্ত কিছু সম্বন্ধে কেমন আচ্ছন্ন মনোভাব। তার পরের দিনও আচ্ছন্ন হয়ে কাজ করল, তারও পরের দিন। তার পরের দিন সুপ্রিয় জমাট-লাল মুখ নিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল। কাঁপা গলায় বলল, শুনেছ, রঞ্জন মারা গেছে। বনলতা সুপ্রিয়র মুখের দিকে চাইল, তারপর সেই ঘরের তৃতীয় চেয়ার-টেবিলটির দিকে চেয়ে, থরথর করে তার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল, টেবিলের ওপর ভেঙে পড়ল, ছোট মেয়ের মত হুহু করে কাঁদতে লাগল। এত বুদ্ধি এত বিদ্যে এত ভাল মন, কিছুই ওর মাথার ভূত ছাড়াতে পারল না।

বনলতা কারোর দিকে চায় না, ঘড়ি ধরে আসে, একমনে কাজ করে চলে যায়। সুপ্রিয় অনেক যন্ত্রণার সঙ্গে দেখে, বনলতার কথা বন্ধ হয়ে গেছে, একটা ছাই রঙ আস্তে আস্তে গাল থেকে গোটা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে, চোখের তলায় শুকনো কাজলের রঙ ধরেছে। আর নাকের দু পাশে দুটো রেখা গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। তারপর একদিন সুপ্রিয় মনে মনে ভাবল, এ হতে পারে না, এ অসহ্য। উঠে এসে সে জোর করে হাত ধরে তুলল বনলতাকে, বলল, এ অসহ্য, তুমি আমার সঙ্গে বেড়াতে চল।

বনলতা অসহায় গলায় বলল, আমিও চাই না এ হোক। কিন্তু ও যে ভয়ানক সত্যিবাদী।

সুপ্রিয় বলল, সত্যি বলে কিছু নেই। জোর থাকলে যে কোন সত্যি তৈরি করা যায়।

সুপ্রিয়র বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল বনলতা: তুমি বিশ্বাস কর ওর কথা?

সুপ্রিয় ওর কাঁধে হাত দিয়ে হাসল: কি বল, আমি দুঃখ তো দেখলাম, তোমাকে ছাড়ার দুঃখ। কিন্তু আমি জানি তার শেষ তোমায় ছাড়ায় নয়। আমি কাজ করেছি প্রচুর, তার আনন্দময় ফল পেয়েছি, এমন কি আমার শরীরটা পর্যন্ত বলছে বাঁচ বাঁচ, খাটো, তৈরি কর, ভাল কর আরও ভাল কর। এত রূপ এত রঙ এত শক্তি এত প্রচেষ্টা মিথ্যে হতে পারে না। নিশ্চয়ই এর কোন মূল্য আছে, আমি তা গভীরভাবে বিশ্বাস করি।

সুপ্রিয় বনলতাকে নিয়ে রোজ বিকেলে বেড়াতে শুরু করল।

একদিন বনলতা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শুধু বিশ্বাস নয়, আমাদের দেখাতে হবে আমরা ভুল নয়।

সুপ্রিয় বলল, আমরা তো ভুল নয়।

তারপর একদিন সুপ্রিয় পায়েস খেতে খেতে বনলতার মাকে বলল, বনলতার শরীর বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওর একটু কলকাতার বাইরে যাওয়া দরকার।

বনলতার মা বললেন, সে তো আমিও দেখছি। কিন্তু নিয়ে যাবে কে?

সুপ্রিয় বলল, আমি। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে গঙ্গার ধারে আমাদের একটা বাড়ি আছে।

বনলতার মা তার দিকে তাকালেন।

সুপ্রিয় হেসে তাঁর একটা পা ছুঁলো, তারপর বলল, এসে ও আমাদের বাড়ির লোক হবে।

বনলতার মা বললেন, বেঁচে থাক বাবা।

সেদিন বিকেলে ওরা দুটি বালক-বালিকার মত লাফাতে লাফাতে উচ্ছে-ক্ষেত পেরিয়ে এসে দাঁড়াল গাম্ভীর গাছের তলায়। চড়া রোদ, কিন্তু ভারী মিষ্টি হাওয়া। রোদের তেজ, আকন্দ স্পাসিফ্লোরা আর নানান বুনো আগাছার গন্ধ। উঃ, কতদিন পরে পাওয়া গেল। বনলতার মনের মধ্যে ছুটির নেশা ঝিমঝিম করতে শুরু করেছে।

সুপ্রিয় হাতে টান দিল : এই, এস।

ইটখোলা পেরিয়ে পাড় বেয়ে নেমে একটা নৌকোয় বসে ওরা জলে পা ডোবাল।

সেই গঙ্গা, কি যে ভাল গঙ্গা, এত সুন্দর। মাঠভর্তি নৈঃশব্দ কানের মধ্যে ঝিমঝিম করছে, শুধু একটা নরম আওয়াজ—ছলছল ছপছপ। পাড়ের মাথায় আকাশ ঘন নীল। আর ওপারের আকাশ ঝকঝকে সাদা। অনেকদিন আগে মামার বাড়িতে রেডিয়োতে একটা বিলিতি অর্কেস্ট্রা শুনতে শুনতে এক অপূর্ব সবুজ রঙের ঢেউয়ে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল বনলতা। চরের আশ্চর্য সবুজ রঙ দেখে মাথায় আবার সেই ভুলে যাওয়া সুরের ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল। দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখে, গেরুয়া-নীল জলে অজস্র ঢেউ আর উত্তরে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের মাথায় কাঁচা সোনা। বনলতা মনে মনে খেলতে লাগল, খেলাটা এই দৃশ্যটি বর্ণনা করা। একবার মনে মনে বর্ণনা করল, তারপর চাইল, উহুঁ, বর্ণনা অনেক পেছনে পড়ে আছে। বার বার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই ভাষায় বাঁধা গেল না।

বনলতা নিজের মনকে বলল, মন, তুমি দয়া করে মনে রেখ। যদি কোনদিন পৃথিবী সম্বন্ধে হতাশা জাগে, ব্যর্থতা আসে, আজকের এই গঙ্গার কথা মনে পড়লে ভাবব, একদিন অন্ততঃ পৃথিবী আমার চোখকে আমার মনকে রাঙা করে দিয়েছিল।

বিয়ের দিন সবাই বলল, এতদিন বাইরে থাকার জন্যে বনলতাকে একটু কালো দেখাচ্ছে। বাসরঘরে সুপ্রিয় বলল, বেনা ঘাস পুড়ে গেছে, এবার বরদা, শস্যসম্পদশালিনী।

প্রথম প্রথম বনলতা মাঝে মাঝে বিষণ্ণ হত। কিন্তু কিছুতেই তা থাকতে দিত না সুপ্রিয়। তখনই তাকে নিয়ে চলে যাবে সিনেমায়, জনাকীর্ণ হাস্যমুখর হলে, আনন্দমুখর ছবিতে। সিনেমা হলের ক্যান্টিলিভার ছাদটার সিলিঙে প্রায় শ-পাঁচেক বাল্ব, এদিকে-ওদিকে মার্কারি ল্যাম্পের ছড়াছড়ি। এ-পাশে সিনেমার স্টিল ছবি, ও-পাশে বিজ্ঞাপনে থ্রি-ডাইমেনশনাল এফেক্ট আনা হয়েছে। সামনে ট্যাক্সি এসে থামছে, ট্যাক্সি ছাড়ছে, লোক এসে নামছে, লোক ঢুকছে। লোক বেরুচ্ছে। সুপ্রিয় দেখায় এই লোকটা যে গ্রে রঙের স্যুট পরেছে, ওটা লেটেস্ট ধরনের ছিট, আমিও ভাবছি করাব একটা। আমাকে কেমন দেখাবে বল তো? বনলতা খুশী হয়ে ওঠে, খুব ভাল। কবে ছিট কিনতে যাবে বল। কিংবা অন্য একটি মেয়ের শাড়ি দেখে সুপ্রিয় বলবে, তোমায় ও-রকম একটা না কিনে দিলে আমার ঘুম হবে না। তারপর বলবে, চল রেস্তোরাঁতে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। খাবার সময় কত রকম খুনসুটিই যে করবে সুপ্রিয়! রাত্রে গাড়ির মধ্যেই ঢুলবে বনলতা।

সুপ্রিয়র থিসিস শেষ হয়ে গিয়েছে, সামনের মাসে বিলেত যাবে। বনলতা বলল, দু বছরের বেশী কিছুতেই থাকতে পারবে না কিন্তু।

সুপ্রিয় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল। বনলতার নাক টানল, চুল টানল, গালে কামড় দিয়ে বলল, আমার যাবার ইচ্ছেই নেই। কি করব, না গেলে শুধু প্রফেসরি করে দিন কাটবে। কোন রকমে কষ্ট করে দুটি বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই, বাস্। এক একটা লাফ দেব, দেখ না। দমদমে জুওলজিক্যাল সার্ভের ওই যে নতুন

রিসার্চ ল্যাবরেটরি খুলছে, এসেই যে করে হোক ওখানে ঢুকব। তারপর কয়েক বছর। ইউ নো মাই ক্যারিয়ার, ইউ উইল সি, আই শ্যাল বি দ্য ইয়ংগেস্ট ডিরেক্টর অফ অ্যান ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউট। ইনটেলেকচুয়াল ওয়ার্ল্ড আর মেটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড দুটোতেই আমার ঘোরাফেরা আছে। কী করে বাঁচতে হয় আমি দেখিয়ে দেব।

সুপ্রিয়র বাবা বলেছিলেন, বনলতাও ওর সঙ্গে যাক না। খরচ তিনি বইবেন।

সুপ্রিয়র মা বললেন, তুমি খেপেছ নাকি। বাড়ির প্রথম ছেলে বিদেশে জন্মাবে? তা ছাড়া এই প্রথম। বিদেশে বিভুঁয়ে ওর ভয় করবে না? কেন, ওকে তো আর টাকা উপায়ের জন্যে ছোটাছুটি করতে হবে না। শুধু পড়াশুনো কলকাতাতেও হয়।

বনলতা শাশুড়ীকে বলেই দিল, না, সে যেতে চায় না।

সুপ্রিয় বনলতাকে বলল, সেদিনই টেলিগ্রাম যায় যেন, মাকে বলে রাখবে তুমি। আর সপ্তাহে সপ্তাহে ফোটো পাঠানো চাই।

বনলতার একটি মিষ্টি লজ্জা এসেছে। সুপ্রিয়র কাছেও লজ্জা পায়, হেসে মাথা নীচু করে বলল, হ্যাঁ।

সুপ্রিয় খুব নিমন্ত্রণ পাচ্ছে যাবার আগে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে। সেদিন ক্লাসের বন্ধুরা নেমন্তন্ন করল। বনলতার যাওয়া সম্ভব নয়। সুপ্রিয় একাই গেল।

বেশ রাত হয়ে গেল ফিরতে, হনহন করে সুপ্রিয় দোতলায় উঠে এল। শেষ দিকটা ছটফট করেছে সে, ওখানে এক মিনিট নষ্ট মানে বনলতার সঙ্গে এক মিনিট কম কথা বলা। ঘরের আলো নেভানো। বনলতা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সুপ্রিয় আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করল। জানলার দিকে চোখ পড়তে দেখে বনলতা স্থির হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুপ্রিয় খুব আস্তে ডাকল, বনলতা।

বনলতা প্রায় আঁতকে উঠে পেছন ফিরল: কে?—তারপর সুপ্রিয় কাছে আসতে বলল, ও, তুমি!

সুপ্রিয় দেখল, বনলতা হাঁপাচ্ছে। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কী হয়েছে?

বনলতা ক্লান্ত গলায় বলল, উঃ, যা চমকে গিয়েছি। হঠাৎ আমার কেমন মনে হল, সেই সে।

কে?—বলেই সুপ্রিয়র গলা শীতল হয়ে গেল এবং সুপ্রিয় তাড়াতাড়ি ঘরের দুটো আলোই জালিয়ে দিল, তারপর রেডিয়োটা চালিয়ে দিতে গিয়ে দেখল, এগারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে।

বনলতা হেসে খাটে বসে বলল, না না, তোমার ব্যস্ত হবার দরকার নেই। হঠাৎ কি রকম চমকে গিয়েছিলুম।

সুপ্রিয় এসে ওর পাশে বসল, ওর কাঁধে হাত বোলাতে লাগল। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল।

সুপ্রিয় বলল, কী ভাবছ?

বনলতা বলল, আচ্ছা, রঞ্জনের সেই উলঙ্গ রাজার গল্প মনে আছে তো? ধর, যদি তার সঙ্গে একলা দেখা হয়ে যায়, আমাদের ক্ষেত্রে সেটা কি ভাবে হবে বলতে পার?

সুপ্রিয় বলল, আবার তুমি সেই সমস্ত বাজে ভাবতে শুরু করেছ? তুমি শুয়ে পড়।—জোর করে বনলতাকে শুইয়ে দিল সুপ্রিয়, নিজে হাওয়া করতে লাগল।

পরদিন সবাই শুনল, সুপ্রিয় বিলেত যাওয়া স্থগিত করে দিয়েছে।

একটি বছর সুপ্রিয় কলকাতা থেকে নড়ল না। এটা ওটা করে কাটিয়ে দিল। আর দেবাশীস জন্মাবার পর তো নড়তেই চায় না।

বনলতা বলল, উঃ, ছেলে ছেলে করে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

সুপ্রিয় বলল, সম্ভাবনাটা তোমারই বেশী। পড়াশুনো কাজকর্ম তো সিকেয় তুলেছ। দিন দিন আমাকেও ভুলতে বসেছ।

বনলতা হেসে বলল, উঃ, এর চেয়ে অনেক সোজা থিসিস লেখা। দিনরাত মুখ তোলবার সময় পাই না, বাইরের পৃথিবীতে দিন রাত কী করে হচ্ছে সেটা জানবারও অবকাশ হচ্ছে না।—তারপর দেবাশীসকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, তুমি একটি রাক্ষস, আমায় গিলে বসে আছ।

সুপ্রিয় বাবাকে গিয়ে বলল, এবার আমাকে তাড়াতাড়ি পাসপোর্টের একটা বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

লোকে বলে, বিরহের দিন নাকি দেরি করে কাটে।

কিন্তু কী তাড়াতাড়ি কেটে গেল। সকাল হয় বিকেল হয় রাত্রি হয় আবার সকাল হয়, আবার বিকেল হয়। দিন মাস বছর, আর একটা বছরের মত আর একটা বছর।

তারপরও বছর আসে। সুপ্রিয় ফিরে আসে, দেবাশীস তাকে কথা বলে তাক লাগিয়ে দেয়। বনলতারা একটা নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে সাদার্ণ অ্যাভিনিউতে। নিজেদের শ্যামবাজারের বাড়ি তো রইলই, এখানে আরাম করে থাকা। সুপ্রিয়র যা কথা সেই কাজ, দমদমের রিসার্চ ল্যাবরেটরির সিনিয়র সাইন্টিফিক অফিসার থেকে ধাপে ধাপে ও ঠিক এগিয়ে চলেছে। সুপ্রিয় বলে, আর কয়েকটা বছর দেখ না, আই শ্যাল বি দ্য ইয়ংগেষ্ট ডিরেক্টর। বছর ঘোরে, সুপ্রিয়র খানিকটা করে উন্নতি হয়। আর কয়েকটা বছর।

মাঝে মাঝে ছুটি নেবে সুপ্রিয়। বনলতাকে নিয়ে বাচ্চাকে নিয়ে মোটরে করে সোজা দৌড় ছোটনাগপুরের জঙ্গলে। সুপ্রিয় বলে, শুধু পুতুপুতু বড়লোক হওয়াকে আমি ঘৃণা করি—যারা শুধু কলকাতার গণ্ডিতে ঘুরে বেড়ায়। যখন কলকাতায় থাকব তখন আমার বাড়িতে রেডিয়োগ্রাম থাকবে, আমার সন্ধ্যে মেট্রোতে কাটবে, আমার পরনে দামী স্যুট। আর যখন এখানে আসব তখন আমার থাকি হাফপ্যাণ্ট আর হাতে লাঠি, রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমব ফরেস্ট বাংলোয়, জানলা দিয়ে দেখব সমস্ত আকাশটার তারা ঝকঝক করছে। কোথাও ফাঁক থাকতে দেব না, যেখানে যেভাবে জীবনকে সত্যিকারের সুস্থ উপভোগ করা যায় সেখানে আমি আছি।

সুপ্রিয়র একটা গুণ আছে, ওর সমতাজ্ঞান। সমস্ত কিছু করে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কর্মক্ষেত্রের উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়। বনলতা বলল, আমি কিন্তু কম বয়েসে খুব 'শেকি' ছিলুম, তোমার সঙ্গে থেকে থেকে আমি সব ব্যাপারে কি রকম দৃঢ় হয়ে উঠছি। দেখ, গোড়ার দিকে খোকনকে সামলাতেই অস্থির, আর এখন সংসার করি, তোমার অ্যাসিস্টেণ্টগিরি করি, আবার আত্মীয়স্বজনকে আপনাত্মীয় করতে কী দারুণ শিখেছি আমি। সুপ্রিয় আদর করে বলবে, তুমি ইচ্ছে করলে সব কিছু পার।

বনলতা বলবে, না, তুমি শেখালে তবে পারি। আচ্ছা, তুমি ছেলেবেলা থেকে এত দৃঢ়তা পেলে কী করে?

সুপ্রিয় বলবে, দেখ, মূলতঃ আমি একজন দার্শনিক। ছেলেবেলা থেকে আমি জীবনের সামঞ্জস্য থেকে গভীরতর সামঞ্জস্যে এগিয়ে যাওয়ার নীতিটা ধরতে পেরেছিলুম। তাই আমার জীবনে ছন্দপতন হয় নি কখনও।

দার্শনিক কথাটায় বনলতার অনেক পুরনো দিনের কথা মনে পড়ল। রঞ্জন বলে একটি ছেলে তাদের সঙ্গে পড়ত, সেও নিজেকে দার্শনিক বলত। বেচারি ছেলেটি পাগলামি করে মারা পড়ল।

বনলতা হাসতে হাসতে বলল, তোমার সেই রঞ্জনের কথা মনে আছে?

কে? ও, সেই সিক্সথ ইয়ারের রঞ্জন! হ্যাঁ, মনে পড়ে। যা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল মনে, আমি ভেবেছিলুম, আমার পজিশনটা ফসকাল আর কি।

না।—বনলতা বলল, তোমার সঙ্গে পারত না। কোনদিনই পারত না। ওরকম খেয়ালী হলে কি সংসারে চলে?

ছেলেটি বুদ্ধিমান ছিল স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু মিসডাইরেকটেড।

এখন আমারও তাই মনে হয়।

নিজে যা বুঝিস করগে যা বাপু। কিন্তু অকারণে তোমাকে অ্যাফেক্ট করার চেষ্টা করত। ওই ধরনের ছেলেকে বিশ্লেষণ করলে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের খুব বিচিত্র সূত্র পাওয়া যাবে। বিশেষ করে তোমাকে না-ধরি না-ছাড়ি অবস্থার মধ্যে ফেলাটা। এক ধরনের ভারী বিচিত্র যৌন ব্যবহার। হ্যাঁ, মাঝখানে কিছুদিন বড় কষ্ট দিয়েছে।

তোমাকে অমানুষিক কষ্ট দিয়েছে। কোন মানুষের জীবনে বিশ্বাস ভেঙে দেওয়ার চেয়ে অপরাধ আর নেই। ওইরকম অস্বাভাবিক উপায়ে একটা মেয়েকে কষ্ট দেওয়ায় ওর কী তৃপ্তি হত কে জানে।

ভাগ্যিস তুমি ছিলে!

সাত বছর হয়ে গেল, সুপ্রিয় এখনও সেইরকম আছে। বনলতার নাকটা কামড়ে ধরে বলল, তোমার জন্তেই আমি ছিলুম। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, তুমি বিশ্বাস কর ওর কথা? আমার মনে হল আমি যেন কথা বললুম না, ভেতর থেকে কেউ বলালে, না, আমি বিশ্বাস করি না।

জান, জীবনে আমি বেশ কিছু সাফল্য পেয়েছি, আর আরও পাব আশা করি। কিন্তু তুমি আমার সবচেয়ে বড় সাফল্য।

পরের বছর পারমিতা জন্মাল। সুপ্রিয়র ভারি মেয়ের শখ, ও তো আনন্দে অস্থির। সিনেমা যাওয়াও ছেড়ে দিল সে, সন্ধ্যে থেকে সেই যে মেয়ে নিয়ে বসবে রাত এগারোটার আগে উঠবে না। মেয়ে দিনে দু আউন্স খেতে পারে কিনা সন্দেহ, হর্লিক্স-গ্ল্যাক্সো আপেল হ্যানো-ভ্যানোতে ঘর ভরে গেল। মেয়েকে পাতলা জামাই আলতোভাবে পরাতে হয়, ঘর ভরে গেল সাড়ে পাঁচ হাজার জামা আর ছিটে। মেয়ে ভাল করে চাইতে শেখে নি, ঘরে বাইরে খেলনায় পা রাখার জায়গা রইল না।

আর কিছুদিন পরে অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর সাহেব পারু-মেমসাহেবের ঘোড়া হলেন।

দরজার গোড়া থেকে বনলতা বলল, হ্যাঁ, বাইরের ঘর, হঠাৎ কেউ ঢুকে পড়ুক আর দেখুক, মেজসাহেব হামাগুড়ি দিচ্ছেন।

সুপ্রিয় হেসে বলল, হ্যাঁ তাদের দেখে যাওয়া উচিত। হামাগুড়ি দেওয়ার জন্যেই মেজসাহেব হওয়া।

তারপর কী দারুণ জল্পনা-কল্পনা। পারু আর একটু বড় হলে ওর জন্যে কিরকম গভর্নেস রাখা যায়।

বনলতা বলল, ও সব গভর্নেস-ফভর্নেস রাখা শুধু শুধু পয়সা ওড়ানো। আমাদের তো কিছুই ছিল না, তা বলে আমরা কি মানুষ হই নি।

সুপ্রিয় বলল, সে কি। ও যে আমাদের চেয়েও অনেক বড় হবে। দেখছ না, এখন থেকেই কী বুদ্ধি, আমি যা বলি বুঝতে পারে।—বলে সুপ্রিয় ভাবতে বসল, ও কী হবে—হয় কোন রাষ্ট্রদূত কিংবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। তারপর বলল, তোমার চেয়েও এগিয়ে যাবে ও, ওর আন্তর্জাতিক খ্যাতি হবে।

খোকন ঘরে ঢুকল, ঢুকেই দুষ্টুমি শুরু করল, সুইচটা জ্বালানো-নেভানো করল কয়েকবার, কোথা থেকে হাতুড়ি এনে টেবিলটাতে ঠোকাঠুকি করল, তারপর মেঝে থেকে কার্পেট ওলটাতে লাগল।

বনলতা বকুনি দিল: খোকন, তুমি ভারী দুষ্টু হয়েছ।

বকুনি দিলে সুপ্রিয়র ভারি রাগ হয়; কি আর করছে, টেবিলটা ঠুকছে মাত্র, না হয় একটু ভেঙে যাবে। সারিয়ে নিলেই তো হবে। কিন্তু এই করতে করতে এঞ্জিনিয়ারিং বুদ্ধিও গড়ে উঠতে পারে তো।

বনলতার হাসতে হাসতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে।

সেই দিনগুলিকে ভরা যৌবনের দিন বলা চলে। বনলতার খুব ভাল লাগত, জীবনের কি মসৃণ সমান গতি! কিন্তু জীবনে সে আর সুপ্রিয় একা নেই, চারপাশে অজস্র জীবন আছে, আর তারা কিছুতেই জীবনকে সমগতি রাখতে দেবে না, আরও, আরও জোরে চালিয়ে দেবে তাকে, ত্বরান্বিত—আরও ত্বরান্বিত করে তুলবে।

মাঝে মাঝে বনলতা অস্পষ্টভাবে অনুভব করত, বোধ হয় ভুল হচ্ছে কোথাও। কিন্তু সুপ্রিয় বলত, তুমি কিছু জান না—এই ঠিক, এই ঠিক।

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে নিমন্ত্রণ করে রবিবার। রবিবার বাড়িতে হৈ-চৈ করতে সুপ্রিয়র খুব ভাল লাগত।

সেদিনও সেরকম আসর বসেছিল। সাহিত্য আলোচনা হচ্ছিল। এককালে সুপ্রিয় কিছু কিছু পড়াশুনো করেছিল, সুতরাং অন্য লাইনের লোক হলেও তার কিছু অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু আলোচনা চলতে চলতেই এসে হাজির হলেন শীতেশ রায়। শীতেশ রায় অক্সফোর্ডের এম. এ., আধুনিক ইংরেজি ও ফরাসী সাহিত্যে অনন্যসাধারণ জ্ঞান আছে বলে তাঁর খ্যাতি আছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই তিনি শুনলেন, সুপ্রিয় বলছে, কবিতার ডেভেলপমেণ্ট ও পরিবর্তন এবং তার সমালোচনার প্রকৃতির পরিবর্তন সমস্তই পরিবেশের পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করে।

কী বললে, কী বললে: বলে শীতেশবাবু ঢুকলেন, তারপর বললেন, তুমি তো ভারি বড় কথা বললে হে। কিন্তু তুমি পরিবেশ বলতে কী বোঝ? কবির পরিবেশ আর তার অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক কী?

সুপ্রিয় একটু বেকায়দায় পড়ে গেল। আমতা আমতা করতে লাগল।

শোন শোন, তা হলে গোড়া থেকে শোন।—বলে শীতেশবাবু শুরু করলেন, আর আধ ঘণ্টা পরে সবাইকার মনে হতে লাগল, ছেলেবেলায় তারা কেউ কোনদিন পড়াশুনো করে নি।

বনলতার বেশ ভাল লাগছিল। বেশ নতুন নতুন কথা শোনা গেল। সুপ্রিয় চুপ করে শুনছিল, কিন্তু বনলতার মনে হচ্ছিল সামান্য অপ্রসন্নতার ছাপ রয়েছে সেখানে।

কয়েক দিন পরে বনলতা দেখল সুপ্রিয়র টেবিলে একটি কবিতার বই। আরও কিছু দিন পরে দেখল, আরও নতুন নতুন বই। সুপ্রিয় হেসে বলল, এগুলো সামান্য ঝালিয়ে নিতে হয়, না হলে কালচার্ড সোসাইটিতে বড় ফ্যাসাদে পড়তে হয়।

কিছুদিন পরে বনলতা দেখল সুপ্রিয়র টেবিলে একটা নিমন্ত্রণের চিঠি। খুলে দেখে, কী আশ্চর্য, সুপ্রিয়ই সভাপতি—টোয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবের কলা-বিভাগের উদ্বোধন।

সুপ্রিয় বলল, একটা গোটা মানুষ হতে হলে কলা আর বিজ্ঞানের ভারসাম্য চাই।

বনলতার মন্দ লাগল না। কিন্তু রাত সাড়ে এগারটায় যখন ও ফিরল, বনলতা রাগারাগি করল। কিছুটা তো বয়েস বেড়েছে, তার ওপর ল্যাবরেটরির অত কাজ। ছুটির সময়টা বেশী হৈ-চৈ না করাই ভাল।

সুপ্রিয় বলল, এ আর এমন কি, এটুকু না করলে লাইফ কী?

বনলতার এখন মনে হয়, যদি ভবিষ্যৎটা আগে জানা যেত! তখন কিন্তু খুবই নর্মাল মনে হয়েছিল। সেবার শীতকালে এলাহাবাদে গভর্মেণ্ট স্ট্যাটিষ্টিক্যাল বোর্ডের মীটিং হল, সুপ্রিয়র নিমন্ত্রণ হল জেনেটিকসের লোক বলে। সুপ্রিয় বলল, চল, গাড়ি করে যাব। এক সঙ্গে গয়ার জঙ্গল আর স্ট্যাটিষ্টিকস দুইই হবে।

ওদের যে স্যুভেনির বেরিয়েছিল তাতে সুপ্রিয়র লেখা ছিল। লেখার গোড়াতেই একটা ছবি আর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। কলকাতা ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল রত্ন। আমেরিকার ইলিনয় ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ফেসবাখের কাছে দু বছর কাজ করেন। তাঁর গবেষণা সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্তমানে দমদমের ইণ্ডিয়ান জুওলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের অ্যাসিস্টেণ্ট ডিরেক্টর। কলকাতার বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

দেখে বনলতার বুক ফুলে উঠেছিল। সুপ্রিয় ওখানে বক্তৃতাও দিয়েছিল একটা। আগে ওর অ্যাকসেণ্টে বেশ ভুল থাকত। এবার নিখুঁত হয়েছে।

কয়েক দিন প্রচুর আদর আপ্যায়নে কাটল ভাল।

গয়াতে এসে বনলতা বলল, হাজারীবাগটা ঘুরে গেলে হয় না?

নিশ্চয়। চল।

হাজারীবাগের হোটেলে বনলতার বনবিহারী মামার সঙ্গে দেখা। বনলতারা খাচ্ছে, হঠাৎ দেখে দরজায় একটা বিরাট নতুন মডেলের গাড়ি এসে দাঁড়াল। কে না কে—বনলতা খোকনকে খাওয়াতে ব্যস্ত। হঠাৎ কোটপ্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক এসে বললেন, আরে, আমাদের লতা না?—বনলতা মুখ তুলে দেখে, বনুমামা।

বনুমামা বললেন, চিড়েপাশ কয়লা খনিতে এসেছিলুম, ভাবলুম রাঁচিটা হয়ে যাই।

বনুমামার রাঁচিতে বাড়ি আছে। সে কী পীড়াপীড়ি! শেষ পর্যন্ত ওদের রাঁচি যেতে হল তাঁর সঙ্গে।

গিয়ে দেখে, এলাহী কাণ্ড। বিরাট বাড়ি করেছেন বনুমামা, তার চারপাশে অনেকখানি জায়গা নিয়ে বিরাট বাগান। বনলতা গোলাপ-বাগানটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, সেই ছেলেবেলায় দেখে গেছি তোমার সেই ছোট্ট একতলা বাড়ি, আর এখন কী কাণ্ড!

বনুমামা বললেন, কি আশ্চর্য, একতলা বাড়ি চিরদিন থাকবে নাকি? তা হলে আমি এই জলজ্যান্ত মানুষটা রয়েছি কী করতে?—তারপর বললেন, কলকাতায় আমার বাড়ি আসিস না একবার, নিউ আলিপুরে নতুন বাড়ি করেছি দুটো।

তারপর কথায় কথায় সুপ্রিয়কে বললেন, জামাই, তোমার ওই মান্ধাতার আমলের অষ্টিন চেপে এই এতদূর এসেছ? সাহস আছে বলতে হবে।

সুপ্রিয়র গালে লাল ছোপ লাগল, তাড়াতাড়ি বলল, মানে, মেশিনটা খুব ভাল।

তা হলেও রুচি বলে একটা জিনিস আছে তো। পুরনো জিনিস চড়বে তুমি তা বলে?

বনলতা একবার তাদের গাড়িটার দিকে চাইল। ছোটখাটো সুন্দর গাড়িটা, তার বেশ ভালই লাগে।

সন্ধ্যেবেলা চায়ের আসরে বহুমামা জিজ্ঞেস করলেন, কী করা হচ্ছে জামাই তোমার? সেই প্রফেসরি?

সুপ্রিয় বিনীতভাবে বলল, না, আমি ইণ্ডিয়ান জুওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর।

ও! একই হল, শ তিনেক টাকার এদিক-ওদিক।—বহুমামা হেসে বললেন, সেই ফ্ল্যাটেই আছ?

হ্যাঁ।

ইস, লাইফটা একেবারে স্পয়েল করে ফেললে। তুমি তো ভারি বুদ্ধিমান ছেলে শুনেছিলুম সুলতার কাছে। বহুমামা হতাশ ভঙ্গীতে বললেন।

সুলতা বনলতার মা।

বনলতার ভয়ানক রাগ হল বহুমামার ওপর। আগে যে রকম স্থূল ছিল সেইরকম স্থূলই আছে। চা থেকে মুখ তুলে দেখল, সন্ধ্যার জমাট হলুদ রঙের আলোয় সুপ্রিয়র মুখটা কালো দেখাচ্ছে। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, সেটা কঠিন ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

সুপ্রিয়র মুখের সেই কঠিনতা কলকাতায় ফিরে এসেও গেল না। একদিন নয়, দুদিন নয়, ছটি মাস। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে কারণে অকারণে সুপ্রিয় হাসতে লাগল, ছেলেমেয়েদের লোফালুফি করতে লাগল, বনলতাকে জ্বালাতন করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বনলতা অনেক কষ্টে জানতে পারল, তাদের একটা নতুন গাড়ি হবে। সুপ্রিয়র হাজার চারেক আছে, বাবা হাজার চারেক দিতে রাজী হয়েছেন। বাকীটা ইনস্টলমেণ্টে দিলেই চলবে।

পুরনো গাড়িটা?—বনলতা জিজ্ঞেস করল।

ওটাও থাকবে। ওটা তুমি ব্যবহার করবে। আর এটা আমার নিজস্ব রইল।

এটা সত্যি। আজকাল নিজস্ব একটা গাড়ির ভয়ানক দরকার হয়ে পড়েছে সুপ্রিয়র। বড়ই কাজ বেড়ে গিয়েছে। সকালে ল্যাবরেটরিতে যাবার আগে সান্যালদের ওখানে যায় সুপ্রিয়। মিঃ সান্যাল শেয়ার-মার্কেটের একজন বড় ব্রোকার। সুপ্রিয়র বাবার সঙ্গে ওঁর খুব আলাপ। সুপ্রিয় তাঁকে ধরে পড়েছে, তাকে ওখানে ঢুকিয়ে একটা সুবিধেজনক অবস্থায় এনে দিতে। সুপ্রিয় বিরাট কিছু চায় না, কিন্তু একস্ট্রা বেশ কিছু ইনকাম তার দরকার হয়ে পড়েছে। ল্যাবরেটরিতেও প্রচণ্ড খাটুনি। সুব্রহ্মনিয়ম বলে এক মাদ্রাজী ভয়ানক খাটে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারলে কর্তৃপক্ষের চোখে পড়া যাবে না। শুধু খাটুনিই নয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু দলাদলিও সুপ্রিয়কে করতে হয়। হাতে 'পাওয়ার' না রাখলে সুব্রহ্মনিয়ম ঠিক উলটে দেবে।

সুপ্রিয় বলে, খাটুনি আমার ভালই লাগে। কিন্তু এই দলাদলিটা এত যন্ত্রণাদায়ক। এত মানসিক চাপ লাগে—

বনলতা কী আর বলবে। ল্যাবরেটরিতে সে নিজে আছে। নিজের চোখে দেখছে সব। উপায় নেই, করতেই হবে। না হলে হটে আসতে হবে। বনলতা বলল, তুমি এই মীটিং-টিটিংগুলো ছেড়ে দাও। কী হবে ছাইভস্ম ওইসব সংস্কৃতি-টংস্কৃতি করে?

সে কী করে হয়।—সুপ্রিয় বলল, এতদিন ধরে করে আসছি। গোটা অঞ্চলে আমার কী ভয়ানক ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে! সেটা নষ্ট করে ফেলব?

তা হলে এক কাজ কর। বক্তৃতা-টক্তৃতার জন্যে এত খেটো না। আন্দাজে ভাসা-ভাসা কিছু একটা বলে দিয়ে এস। লোকে তো তাই করে আজকাল।

পাগল!—সুপ্রিয় হাসল: তাতে ইনটিগ্রিটি নষ্ট হবে। দেখ, মূলতঃ আমি একজন দার্শনিক। নীতিভঙ্গ আমার দ্বারা হবে না। সামঞ্জস্য থেকে অধিকতর সামঞ্জস্য।

প্রথম প্রথম বনলতার মনে হত একজন খুব সাহসী লোকের মত কথা বলছে সুপ্রিয়। কিন্তু আজকাল সুপ্রিয়র প্রায়ই ঘুম হয় না। আর তাইতে ভারি ভয় খেয়ে যায় বনলতা।

সুপ্রিয় কিন্তু গ্রাহ্য করে না। ঠাট্টা করে বলবে, বিদুষী স্ত্রীর এই বিপদ। স্বামীর নার্ভাস সিস্টেমটাও জেনে বসে আছে।

জানি বইকি মশাই। অনেক কষ্ট করে কম্পারেটিভ নিউরোলজি পড়তে হয়েছে।

কিন্তু এটা ভুলে যাও কেন, আনন্দের সঙ্গে কাজ করলে নার্ভের ক্ষতির পরিমাণ খুব কম হয়?

যে আনন্দের কথা বলছ সেই খুশী-খুশী ভাব, তা তোমার আসে না। এ হচ্ছে নার্ভ রগড়ে আনন্দ।

মোটেই না, দিস ইজ লাইফ, একজিউবারেণ্ট লাইফ।

বনলতায় মেয়ে-মনটি বলে, না না, এ ঠিক হচ্ছে না। একটা লোক সকাল আটটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াবে কেন? কিন্তু বনলতাও বাধা দিতে পারে না। একটি বুদ্ধিমান মার্জিত শিক্ষিত মন বলল, মানুষের শক্তি মাপবার তো মিটার নেই। সুতরাং এই শক্তি খরচ'ওর যদি স্বাভাবিক হয়, তবে তা জোর করে চেপে আমি সহধর্মিণীর কর্তব্যের হানি করব কেন?

তা ছাড়া লোকেরাও এমন করে এসে ধরে! বনলতা নিজে শুনেছে—স্যর্, আমাদের অনেকদিনের আশা আপনাকে নিয়ে যাই। ফেরাবেন না দয়া করে। কিংবা—আপনি থাকতে আমাদের বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হবে? বনলতাকেও কতজন এসে ধরাধরি করেছে। লোকে ভালবাসে বলেই নিয়ে যায় তো। ভালবাসাটাই তো জীবন, শুকিয়ে বেঁচে থেকে লাভ কি?

মাঝে মাঝে লোকে এমন করে এসে ধরে, বনলতাকেও যেতে হয়, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবের জেনারেল মীটিঙে বনলতাকেও জোর করে ডায়াসে বসাল। সভ্যতার অগ্রগতি নিয়ে একটা সুলিখিত প্রবন্ধ পড়ল সুপ্রিয়: আজ সর্বক্ষেত্রে প্রকৃতি মানুষের হাতে বাঁধা পড়ছে। প্রকৃতি মানুষকে পশু করে জন্ম দিয়েছিল, শুধু মাত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখতেই তার সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হত। সুশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থার সাহায্যে মানুষ অতি অল্প শক্তিতেই সেই সমস্যার সমাধান করে নিল, আর তার বৃহৎ অবকাশকে আনন্দময় করে তুলল জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় ও শিল্পচেতনার বিকাশে।

প্রচুর হাততালি পড়ল।

বাড়ি ফিরে এসে ক্লান্ত শরীরে শুয়েছে সুপ্রিয়, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে ধরল, মিঃ সান্যাল ফোন করছেন। চারবার বলেছেন এর আগে: বিপজ্জনক অবস্থা, ছোটপিয়ালি কয়লাখনির শেয়ারের দর মারাত্মকভাবে পড়তে শুরু করেছে। সেগুলো কি বেচে দেবেন? না, ভবিষ্যতে ওঠবার আশায় রেখে দেবেন?

আপনার কি মনে হয়?

আমি যতদূর খবর পেয়েছি, নামতেই থাকবে। সুতরাং ক্ষতি স্বীকার করেও ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

কিন্তু অলরেডি আমার যে অনেক টাকা যাবে?

উপায় নেই, মারাত্মক ক্ষতির চেয়ে এটা ভাল। পরে চান্স নেওয়া যাবে 'খন আবার।

সুপ্রিয় মাথায় হাত দিয়ে বসল। সে ব্যবসায়ী নয়—বাবার টাকা, আর অনেক কষ্টে জমানো টাকা। সারা রাত পাগলের মত ঘরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ করতে লাগল, মাথার চুল টানতে লাগল। বনলতা গায়ে হাত দিয়ে দেখে, টেম্পারেচার উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি চাকর ডেকে বরফ আনতে পাঠায়, মাথায় বরফ চাপিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

সুপ্রিয়র মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। বলে, কী হবে?

বনলতা বার বার বোঝায়, কিছু হবে না। যা টাকা আছে, লাগালে ও টাকা উঠে আসবে।

পরে বনলতা সুপ্রিয়কে শেয়ার-মার্কেট করতে বারণ করেছিল। বলেছিল, কি হবে, আমরা দুজনেই উপায় করি, আমাদের দুটি মাত্র সন্তান, আমরা তো হেসে-খেলে বাঁচতে পারি।

সুপ্রিয় বলল, তোমার মত একজন মেয়ে এই কথা বলছে? অস্বীকৃত, অজ্ঞানিত, অশ্রুত, অগীত হয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থ আছে নাকি? রেকগনাইজড না হলে বেঁচে থেকে লাভ নেই। তোমার বসুমামা যখন ঠাট্টা করবে, আমি চুপচাপ বসে থাকব, সে হতে পারে না।

বসুমামাকে অস্বীকার কর। সে তো স্থূল।

স্থূল কি মার্জিত সেটা বড় কথা নয়, তাদের সংখ্যা যখন অনেক বেশী, তখন তাদের স্বাদের মধ্যে নিতেই হবে।

কেন, ওরা ছাড়া কি লোক নেই, এই তো টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবে তুমি কত খাতির পাও।

দেখ, এতদিন আমি সেকশনাল প্রেসিডেন্ট ছিলুম। এবার ওদের এক্সকারশনের খরচ দেবার পর আমি জেনারেল প্রেসিডেন্ট হয়েছি। এক্সকারশনের খরচটা দিতে পারলুম তাই, না হলে বল্লিদাস শীল সভাপতি হয়ে যেত।

বনলতা চুপ করে শোবার ঘরে ফিরে গেল। মানুষ সভ্য হয়েছে, তাকে আর উদয়াস্ত পরিশ্রম করে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হয় না।

সুপ্রিয় ঘরে এসে ওকে আদর করল : তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার বরং আমাকে প্রশংসা করা উচিত, এত বড় একটা আঘাত সামলে নিয়ে আমি কী রকম আবার উঠে-পড়ে লেগেছি। আমার প্রাণশক্তিতে আমার নিজেরই আশ্চর্য লাগে।

বনলতা জোর করে হাসবার চেষ্টা করে। প্রাণশক্তির পরিমাণ নিয়ে সে কোনদিন মাথা ঘামায় নি। নিজেকে টিকিয়ে রাখাটা ছোট করে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে বাঁচা আর কাজ করার জন্যে সে এতদিন চেষ্টা করে এসেছে। এই লোকটিও মীটিঙে তাই বলে অনেক হাততালি কুড়িয়ে এনেছে। বিয়ের দীর্ঘ চোদ্দ বছর পরে বনলতার সন্দেহ হয়েছিল তার মত মেয়ের বিয়ে করাটা ঠিক হয়েছে কি? এতদিন ধরে যে মানুষকে সে ভালবেসে এসেছে, যার ছেলেমেয়েদের সে মা, তার মুখের কথা ও কাজের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে না পেয়ে মনটা হঠাৎ তার সম্বন্ধে থমথমে হয়ে উঠল কেন?

এক সপ্তাহ ধরে রগড়ে রগড়ে মনকে সামলেছিল বনলতা—ছি, তার স্বামী। যাই হোক, তাকে সে ভালবাসে। সে বুঝতে পারছে না, তারই উচিত তাকে ফিরিয়ে আনা। পরের বিয়ের বার্ষিকীতে সুপ্রিয় যখন প্রত্যেকবারের মত ওকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেছিল, এবার তুমি কী চাও? বনলতা কান্না-জড়ানো গলায় বলেছিল, বল, তুমি আমাকে ঠিক তা দেবে?

সুপ্রিয় বলেছিল, দেবার ক্ষমতা থাকলে নিশ্চয়ই দেব।

ক্ষমতায় পাওয়া জিনিসের ওপর লোভ আর আমার নেই। তোমার ইচ্ছা—তুমি ইচ্ছা করলেই আমায় দিতে পার। আর তা পেলে আমি জন্মজন্মান্তর খুশী হব।

বলই না।

তোমার আমার দুজনেরই বয়স চল্লিশ বছর হল। কম খাটি নি আমরা। আর সুখও পেয়েছি প্রচুর। প্রায় সর্বত্রই আমরা যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। এবার আমরা একটু বিশ্রাম করতে পারি না?

হা-হা করে প্রবল অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল সুপ্রিয় : হঠাৎ তোমার হল কী? এত সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়লে কেন? আরে, তুমি শেষে চল্লিশ বছর বয়সেই বুড়ো হয়ে পড়লে নাকি?—বনলতাকে দুই হাতে ধরে খানিকটা ছুঁড়ে দিল সুপ্রিয়।

বনলতা বলল, না না, আমি সিরিয়সলি বলছি।

সুপ্রিয় বলল, আরে পাগল, এই তো কলির সন্ধ্যে। এতদিন শুধু বিত্তের খাতির আর ইদানীং অর্থের খাতির। এইবারেই আসল ক্ষমতা।

যত কষ্টই হোক ক্ষমতা পেতেই হবে?

পেতেই হবে। ফর দ্যাট ইজ লাইফ।

বনলতা আর কিছু বলে নি। বলেছিল, তোমার যা ভাল লাগে সেই উপহারই আমাকে দাও। কিন্তু সে স্পষ্ট অনুভব করেছিল, মনের কোন্‌খানটাতে যেন তার ক্লান্তি লাগতে শুরু করেছে। সে কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছে! কে জানে কে বুড়ো হচ্ছে—সে, না, সুপ্রিয়। দেবাশীস বড় হয়েছে, সামনের বারে ওর পরীক্ষা। সুপ্রিয় বলল, টিউটর তো রইলই, আমিও দেখব 'খন খানিকটা। কিন্তু একদিনও দেখবার সময় থাকে না তার—হয় মীটিং থাকে নয় ল্যাবরেটরির একস্ট্রা কাজ থাকে, তাও যদি না থাকে তা হলে মিঃ সান্যালের সঙ্গে কুইজ থাকবেই। যখন মনে হত খুব সুখে দিন চলেছে, তখন কিন্তু সুপ্রিয় রাত্রিবেলা নিজে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলত কিংবা পড়াশুনা করত। সেই ছবিটি বনলতার মনে এখনও ভাসে, সুপ্রিয় দেবাশীসকে অঙ্ক শেখাচ্ছে আর মধ্যে মধ্যে গল্প বলছে। সে পারমিতাকে কোলে নিয়ে ছবির বই দেখাচ্ছে আর মাঝে মাঝে এটা ওটা সংসারের কথা হচ্ছে।

'ফর দ্যাট ইজ লাইফ'—আজ এইটা লাইফ, আজ এইটা না পেলে জন্মানোটা বৃথা, আর যে মুহূর্তে পেলুম, মনে হল এটা তো চাই না, অন্য কিছু চাই। সুপ্রিয় বলবে সেটাই তো চিরন্তন সৌন্দর্য। বনলতারও তাই মনে হত। কিন্তু আজ অন্যরকম মনে হচ্ছে, এটা যদি অবকাশের খেলা হত, তা হলে সত্যিই এটাকে সৌন্দর্য বলা যেত। কিন্তু সেই বিবাহ-বার্ষিকীর দিন বনলতা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে, এটা তা নয়, এটা নিজেকে টিকিয়ে রাখা, বাঁচিয়ে রাখা প্রাণপাত করে বিস্মৃতি থেকে। সে সুপ্রিয়কে ইচ্ছে করতে বলেছিল কিছুটা বিশ্রামের জন্যে। সুপ্রিয় ইচ্ছে করলই না। বনলতার কেমন মনে হতে শুরু করেছে, ইচ্ছে করতে সে পারবে না, সে শক্তি তার নেই।

সুপ্রিয় হাসতে হাসতে বলে, লোকে বলে ছাব্বিশ বছরটাই আসল জীবন। ননসেন্স। ছাব্বিশ বছর বয়সে কি আছে মানুষের জীবনে, শুধু কতকগুলো ইমোশনাল একস্ট্রাভ্যাগান্স। না থাকে নিজের মনের ধারণা কোন স্পষ্ট, না থাকে কর্মক্ষেত্রের স্টেবিলিটি, না থাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। চল্লিশ বছরটাই আসল জীবন—ভরাট, সবদিক থেকে।

বনলতা চমকে উঠল! ষাট বছর বয়সে এ বলবে চল্লিশ বছরটা কি, ষাট বছরই আসল। আর যদি স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে পারে, আশি বছর বয়সে অহংকার করবে আশি বছরের মানসিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে কুড়ি বছরের স্বাস্থ্যকে রেখেছি, জীবনটা কী ভরাট! অর্থাৎ এই মুহূর্তে যা করছে, পরমুহূর্তে তাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে। প্রবল প্রাণশক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন যেমন ও ছাব্বিশ বছর বয়সটাকে দেখছে, তেমন ও ষাট বছরের চোখ নিয়ে যদি আজকেরটাকে দেখে, তা হলে? তা হলে যে এই মুহূর্তটার কোন অর্থ থাকবে না। তারপরই বনলতা

নিজেকে ধমকায়, ছি ছি, এটা যে সীমালঙ্ঘনকারী মস্তিষ্কচালনা হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত মস্তিষ্কচালনা অকারণ নৈরাশ্য আনবেই। ছি ছি, নিরাশাবাদী হবে সে কেন?

দিন কুড়ি ক'ষ্টস্বষ্টে কাটিয়ে বনলতা সুপ্রিয়কে বলল, কলকাতা বড় একঘেয়ে লাগছে। আর একঘেয়েমিটা মনে যত ক্লান্তি ও উদ্ভট চিন্তা জাগাচ্ছে। চল, পাহাড় কিংবা জঙ্গলে। সতেজ হয়ে নিতে হবে।

টেবিল থেকে মুখ তুলে সুপ্রিয় বলল, কিন্তু এবারের এক্সমাসে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া বোধ হয় সম্ভব হবে না। আমেরিকান এম্বাসি থেকে যে নতুন যন্ত্রপাতি দেবে সেগুলো ইনস্টল করতে হবে ল্যাবরেটরিতে। তা ছাড়া সায়েন্টিফিক কোরামের মীটিং আছে, গভর্নমেন্ট পপুলেশন বোর্ডের রিপোর্ট দিতে হবে, ওদিকে টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিকদের একটা সম্মিলিত আলোচনা-চক্র করছে, আর তা ছাড়া শেয়ার-মার্কেটটাও ভাল যাচ্ছে না।

বনলতা মৃদু আপত্তি করল: কিন্তু বছরে একবার, এই সুযোগ তোমার ছাড়া উচিত নয়।

কি করব বল, কর্তব্য বলে তো একটা জিনিস আছে।

বনলতা আস্তে আস্তে শোবার ঘরে ফিরে গেল।

কাজটা শেষ করেই সুপ্রিয় হন হন করে শোবার ঘরে ঢুকল, অভ্যস্ত ভঙ্গীতে কাঁধে হাত দিয়ে আদর করেই বলল, দেখ, আমি শারীরিক ভাবে মানসিক ভাবে সুস্থ আছি, সুতরাং আমার এবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তুমি বোধ হয় একঘেয়ে ঘর আর ল্যাবরেটরি করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার একবার অন্ততঃ কোথাও ঘুরে আসার দরকার। কোথায় যাবে? এদিকে রাঁচি বা ঘাটশীলা কিংবা ওদিকে জব্বলপুর যেতে পার।

বনলতা প্রথমে বলল, না, আমি কোথাও যাব না। তারপর নিজেই ভাবল, অভিমানটা হাস্যকর। তারই হয়তো সতেজ হওয়ার দরকার হয়েছে। এখানে থেকে খিটখিট করলে তারও বিরক্তি, সুপ্রিয়রও কোন কাজ হবে না। সে ভারি বিশ্রী হবে। পরে বলল, দেখ, ওসব জানা জায়গা নয়। আমাকে কোন অখ্যাত শহরে পাঠাও।

কয়েকদিন পরে সুপ্রিয় বলল, বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। পটনায়েক এক্সমাসে দিন পনেরোর জন্যে বাড়ি যাবে সস্ত্রীক। তুমিও ঘুরে এস না ওদের সঙ্গে খোকন আর পাঞ্চকে নিয়ে। বারিপদা তোমার মনের মত হবে।

বারিপদা সত্যি করেই মনের মত হল। ভারী মিষ্টি শহর, একটিমাত্র পাকা রাস্তা, সেইটুকুই যা শহর, বাকিটা পাড়াগাঁ। পটনায়েকদের বাড়িটা কোর্টের কাছে, এখানে রাস্তাটা উঁচু হয়ে এসেছে। চারিদিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। বনলতার সবচেয়ে ভাল লাগে পশ্চিম দিকটা, রাস্তার ওপারেই কাঁটাঝোপ আর ছোট ছোট গাছের বন নেমে গেছে নদীতে আর নদীর ওপারে বন উঠে গেছে পাহাড়ে।

বনলতা একবার বাইরে চায়, একবার ভেতরে। ভেতরে দুটো সোনামুখ। ওরা সারাদিন পড়াশুনো করে, খায়-দায় খেলাধুলো করে, বনলতার মনে হয় এই যেন প্রথম দেখছে ওদের। ওদের দুজনেরই জন্মের ঠিক আগে তার এক অদ্ভুত ধরনের মনোভাব হত, সমস্ত মনটা উৎকর্ণ হয়ে থাকত, ওরা কেমন হবে সেই কথা ভেবে। বনলতার মনে হত তার নামে কোথা থেকে যেন একটা আশ্চর্য পুরস্কার পাঠানো হয়েছে, সে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সেটি কেমন দেখবার জন্যে। এখন সারাদিন মনে মনে রসিয়ে রসিয়ে অনুভব করে। ওরা দুটিতে সারাক্ষণ তার গায়ে লেপটে লেপটে রয়েছে, আর তৃপ্তিতে ভাবে তার মনের মত পুরস্কার সে পেয়েছে। রাত্রে ঘুম ভেঙে দেখে, পাহাড়ের সিরসিরিনি হাওয়ায় কুঁকড়ে পাকু তার বুকের মধ্যে গুঁজে ঢুকে এসেছে। আরও বুকে জড়িয়ে নিয়ে ওদের দুজনের গায়ে চাদর তুলে দিতে দিতে বনলতার কান্না আসে, শুধু সুপ্রিয় যদি থাকত তা হলে এ সুখের ষোলকলা পূর্ণ হত।

বারান্দায় চেয়ারে বসে বনলতা রোজ সূর্যাস্ত দেখে। সূর্য আগেই পাহাড়ে ঢাকা পড়ে। আর একটি মৃদু গোলাপী মেশানো গাঢ় হলুদ রঙ মেঘে প্রতিফলিত হয়ে পাহাড়ের এদিকের নদীতে ও বিস্তীর্ণ বনভূমিতে এক বিরাট সোনালী অস্পষ্টতার সৃষ্টি করে। অনেকক্ষণ থাকে। এবং সেই নির্জন অস্পষ্টতার ইন্দ্রজাল মনকে অবশ আচ্ছন্ন করে রাখে। হঠাৎ পাহাড়ের মাথায় একটা তারা ফোটে। তারপর দুটো, তিনটে। বনলতা চোখ বোজে। মনের ভেতর অনেকদিনকার পুরনো চেতনা জলে ওঠে। একটা কথা, দুটো কথা। একটা ঘটনা। কি নাম ছিল যেন? রঞ্জন। শেষদিকে তার মুখটা কী সুন্দর হয়ে গিয়েছিল— আকাশের মত। স্বচ্ছ স্থির নির্মল। কিছুক্ষণ পরেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে বনলতার, গভীরতম সুখের মত স্নিগ্ধ শীতল ঘুম।

পনের দিন পরে যখন বাড়ি ফিরছে তখন বনলতার গোটা মন সিক্ত হয়ে রয়েছে সেই ঘুমের স্বাদে। গাড়ি থেকে নেমে যেন ঢুলতে ঢুলতে সিঁড়ির তলায় এসে দাঁড়াল। আর সেই সময় একটা ভয়ানক চেঁচামেচিতে মাথায় একটা প্রবল ঝাঁকানি লাগল। দোতলায় ভীষণ হৈচৈ হচ্ছে। ওপরে উঠে দেখে, বসবার ঘরে প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক গাদাগাদি করে আছে, একটা লোক প্রবল জোরে টেবিল চাপড়াতে চাপড়াতে কী বলতে চেষ্টা করছে, তিনজন তার হাত ধরে টানছে; ওপাশে একদল লোক গোল হয়ে কার্পেটের ওপর বসেই হৈ-হল্লা করছে

আর এদিকের কোণে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় তিনটি লোকের সঙ্গে মাথা নাড়তে নাড়তে কী শলাপরামর্শ করছে। সে-ঘরে না ঢুকে বনলতা বারান্দা দিয়ে পড়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

রাত্রে সব খুলে সুপ্রিয় বলল, কি করব বল, ওরা সকলেই আমাকে চায়। আমি গোড়ায় ওদের অনেক বলেছিলুম, আমার এত কাজ। ওরা বললে, এ তো সারু বোঝার ওপর শাকের আঁটি, আপনার পক্ষে কিছুই নয়। সব সময়ে থাকতে হবে না, শুধু রেপ্রেজেনটেটিভ মীটিং-গুলোতে থাকলেই হবে। তখন আমার রাজী না হয়ে উপায় রইল না।

বনলতা বলল, ইলেকশনে অনেক টাকা লাগবে। কে দেবে?

পার্টিই বেশী দেবে। কিছুটা আমাকে দিতে হবে।

বনলতা বলল, চেক তো আমার সইতে কাটা হবে। আমি এক পয়সা দেব না।

বনলতার হাত দুটো জড়িয়ে সুপ্রিয় বলল, প্লীজ বনলতা, ছেলেমানুষি করো না।

বনলতা বলল, ছেলেমানুষি আমি করি নি।

সুপ্রিয়র গলা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে এসেছিল। ইদানীং গম্ভীর গলায় সে বলেছিল, আমি লক্ষ্য করছি, তুমি ভারি স্বার্থপর হয়ে উঠছ। শুধু নিজের ছেলেমেয়ে আর স্বামী ছাড়া কিছু ভাবতে চাইছ না। কিন্তু আগে তো তুমি এ রকম ছিলে না। বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের প্রসার হয় বলে আমার ধারণা ছিল।

বনলতা বলল, এই ইলেকশনে নামাটা কি তোমার মনের প্রসারের লক্ষণ?

কি আশ্চর্য, তা ছাড়া আর কী। নিজের জন্যে তো এত বছর করলুম। এবারে চারপাশের মানুষগুলোর জন্যে কিছু করি। যারা খেয়ে পরে ভাল করে বাঁচতে পারল না কোনদিন: সুপ্রিয়র গলায় আবেগের ছোঁয়া লাগে: শিক্ষা কাকে বলে জানল না, মানুষ বলে নিজেদের কোনদিন চিনল না, তাদের প্রতি আমাদের কোন কর্তব্য নেই?

কর্তব্য নিশ্চয়ই আছে। ডাঃ মৌলিক আসছে মাসেই রিটায়ার করছেন। তোমার ওপরেই ইনস্টিটিউশনের ভার পড়বে। সেটা এফিসিয়েণ্টলি চালাতে পারলেই তাদের প্রতি তোমার কর্তব্য করা হবে।

কিন্তু আমার কেপাসিটি আরও অনেক বেশী। ইনস্টিটিউশন চালিয়েও আমি তাদের কাজ করতে পারব। আ'র প্রত্যক্ষভাবে তাদের সেবা করতে চাই।

বনলতা চুপ করে রইল।

সুপ্রিয় আবেগোত্তেজিত কণ্ঠে বলল, তুমি বুঝতে পারছ না, দেশের এই দুর্দিনে যদি আমার মত একজন শক্ত লোক ওদের পাশে না দাঁড়ায় তা হলে কী করে বাঁচবে বল তো ওরা?

বনলতা কঠিন গলায় বলল, একটা না একটা সমস্যা দেশের লেগে থাকবেই।

ছি, দেশ সম্বন্ধে এ রকম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করো না।

বনলতার স্থির কঠিন কণ্ঠ: তোমাকেই বা যাড়ে সব জোয়াল বইতে হবে কেন? বাঁচবার বেলায় এত লোক আছে, সমস্যা তৈরির বেলায় এত লোক আছে, আর সমস্যা সমাধানের বেলায় সব ঠুঁটো?

কী আর করবে: সুপ্রিয় মহৎ ও উদার গলায় বলে, সবাইকার তো ক্ষমতা সমান নয়। যাদের ক্ষমতা বেশী থাকে, তাদের ও-রকম একটু করতেই হয়। দেশের এই রকম অবস্থা, আর আমি চোখ বুজে থাকব, সে কী করে হয়?

সত্যিই হয় না। তার পরের ছ মাস বনলতার যার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই তাকে বলেছে, আমাদের সকলের সৌভাগ্য, এমন একজন যোগ্য ব্যক্তি পাওয়া গেল। আমাদের দাবি দাওয়া সরকারের কানে এবার নিশ্চয়ই উঠবে।

আশ্চর্য, বনলতা কি সত্যিই স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে! এ কথা শুনে তার আনন্দ হয় নি। বলতে ইচ্ছে হয়েছে, তোমরা যদি মানুষ হও, নিজেদের কথা নিজেরা বলতে পার না কেন, নিজেদের সুবিধে নিজেরা আদায় করে নিতে পার না কেন?

চেক সামনে ধরলেই বনলতা সই করে দিয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিয় যখন বলল, মেয়েদের দিকটা তুমি একটু দেখ না? এই প্রথম বনলতা স্পষ্টাপষ্টি সুপ্রিয়র বিরোধিতা করে বলল, না, আমি পারব না।

এই প্রথম বনলতা সহধর্মিণী হল না।

সুপ্রিয় মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু চিরাচরিত ভাবে মুখে কিছু বলে নি। পার্টির লোকেরাই মেয়েদের ভোটের জন্য নারী কর্মী যোগাড় করেছিল। ছ মাস বাড়িতে যা হল, বনলতার মনে হয়েছিল, তা নারকীয়। কিন্তু সে খুব শান্তচিত্তেই ব্যাপারটা গ্রহণ করল, যখন-তখন লোক এলে বিরক্তি প্রকাশ করত না। স্ত্রী হিসেবে যা করা কর্তব্য তা সে ঠিক করে গেল।

[ক্রমশ]

ভগবদ্গীতার প্রক্ষিপ্তবাদের প্রতিবাদ

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহামহোপাধ্যায়—মহাকবি—ভাগবতাচার্য

ভগবদ্গীতা প্রক্ষিপ্ত নহে, স্বয়ং বেদব্যাসেরই রচিত, এবং মূল মহাভারতেরই অংশ।

ভগবান্ নারায়ণ মর্ত্যলোকে জ্ঞান বিস্তরণের উদ্দেশে মহর্ষি পরাশরের পুত্ররূপে অংশাবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নাম ধারণ করেন এবং যথাসময়ে বেদ বিভাগ করিয়া "বেদব্যাস" উপাধি প্রাপ্ত হন, ইহার বহুকাল পরে ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণ ভূভার হরণ করিবার জন্য ভূতলে বসুদেবের পুত্ররূপে পূর্ণভাবে আবির্ভূত হইয়া 'কৃষ্ণ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে।

সেই কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পূর্বে নিজের পরমভক্ত অর্জুনের সারথি হইয়া অর্জুনকে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে গমন করেন এবং ঘটনাক্রমে অর্জুনের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা বলেন; ইহার বহুকাল পরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস পাণ্ডবগণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া মহাভারত রচনা করিতে থাকিয়া কৃষ্ণকথিত সেই ব্রহ্মবিদ্যাকেই সংস্কৃত ভাষায় নানাচ্ছন্দে রচনা করিয়া "ভগবদ্গীতা" নাম দিয়া উহাকেই মহাভারতের উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া যথাসময়ে মহাভারত সমাপ্ত করেন।

অতএব সাহস করিয়া বলা যায় যে, ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণ কৃষ্ণরূপে মানবমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, ভগবান্ নারায়ণেরই অংশাবতার মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যাহা রচনা করিয়াছেন, এবং মুক্তিদায়িনী ব্রহ্মবিদ্যা যাহার বিষয়, সেই ভগবদ্গীতার তুল্য উপকারক পবিত্র ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ জগতে নাই।

সুতরাং হিন্দুসমাজের মধ্যে শাস্ত্রবিশ্বাসী ও ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ লোকেরা প্রত্যহ সন্ধ্যাপূজা করিবার সময়ে সমগ্র ভগবদ্গীতা বা তাহার কিয়দংশ পাঠ করেন, মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুর পর সদ্গতিলাভের জন্য পাঠ করিয়া যাহা শুনাইয়া থাকেন, পাঠ করিয়া শুনাইবার সময় না পাইলে মুমূর্ষু ব্যক্তির অঙ্গে ভগবদ্গীতা গ্রন্থটির স্পর্শ করাইয়া দেন, শ্রাদ্ধে ভগবদ্গীতা পাঠ করেন, এবং দেবতাবিগ্রহের আসনে ভগবদ্গীতা গ্রন্থ রাখেন; এই ব্যবহার ধার্মিক হিন্দুসমাজে চিরদিন চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক উচ্চশিক্ষিত হিন্দুই অনুসন্ধানের ন্যূনতানিবন্ধন ভগবদ্গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলেন, অর্থাৎ কোন টোলের পণ্ডিত নিজে ভগবদ্গীতা রচনা করিয়া মহাভারতের একটা অনুপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এ কথাও বলেন যে, ভগবদ্গীতা গ্রন্থটি অত্যন্ত উৎকৃষ্টই হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু উহা যদি ওইরূপ অনুপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত না করিয়া শান্তিপর্বে মোক্ষধর্ম প্রকরণের কোন স্থানে কিংবা ওইরূপ অন্য কোন স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে এইরূপ প্রক্ষিপ্তবাদের অবতারণাই হইত না।

এই প্রক্ষিপ্তবাদ শ্রবণ করায় মহামহিমান্বিত ভগবদ্গীতার পরমভক্ত পূর্বোক্ত লোকদিগের মধ্যে গুরুতর দুঃখ, আক্ষেপ এবং সন্দেহের অঙ্কুর উপস্থিত হয়। কারণ, ধর্মানুষ্ঠানপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ নারায়ণজ্ঞানে যে শালগ্রাম পূজা করেন, তাহা দেখিয়া কোন লোক যদি বলে যে একজন শিল্পী একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডকে ঘষিয়া-মাজিয়া ওই সুন্দর নোড়াটি নির্মাণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে, তাহাতে উক্ত পূজক ব্রাহ্মণগণের দুঃখ আক্ষেপ ও সন্দেহ হয় না কি? অতএব এই দুঃখ আক্ষেপ ও সন্দেহ নিবৃত্তির জন্যই আমার এই প্রক্ষিপ্তবাদের প্রতিবাদ লিখিবার প্রবৃত্তি।

প্রক্ষিপ্তবাদিগণের নিকট প্রক্ষেপকারীর নাম প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন—অতি পূর্বকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, সুতরাং প্রক্ষেপকারীর নাম ধাম ও সময় বলিবার কোন উপায় নাই; কিন্তু বহুতর যুক্তির বলে অনুমান হয় যে, ভগবদ্গীতা নিশ্চয়ই প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে সকল যুক্তি এই—

প্রথম যুক্তি: কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্য কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে, সেনাপতির আদেশ পাইলেই যুদ্ধ আরম্ভ করে; এমন

সময়ে পাণ্ডবপক্ষের সর্বপ্রধান যোদ্ধা অর্জুন এবং সর্বপ্রধান সহায় কৃষ্ণ উভয়পক্ষের মধ্যস্থানে যাইয়া ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন। ধান ভানিতে মহীপালের গীত আরম্ভ হইয়া গেল। সুতরাং ওইসময় বা ওইস্থানে ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনার কোন প্রসঙ্গই ছিল না।

দ্বিতীয় যুক্তি: নিশ্চয়ই কৃষ্ণ ও অর্জুন আত্মরক্ষায় অসাবধান থাকিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়াই ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া উঁহারা যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন আলোচনা করিতেছেন ইহা বুঝিয়া এবং আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট ভাবিয়া জিঘাংসাপরায়ণ কৌরবপক্ষের কোন যোদ্ধা কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আহত বা নিহত করিবার জন্য অস্ত্রক্ষেপ করিল না কেন?

তৃতীয় যুক্তি: কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই অস্ত্রশস্ত্র উদ্যত করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, স্ব স্ব সেনাপতির আদেশ হইলেই যুদ্ধ লাগিয়া যায়, এমন সময়ে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান যোদ্ধা ও আশ্বাসের পাত্র অর্জুনের ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা করিবার উপযোগী ধৈর্যই থাকিতে পারে না।

চতুর্থ যুক্তি: জাভাদ্বীপে যে মহাভারত দেখা যায়, তাহাতে ভগবদ্গীতা নাই; ইহাতে ইহা বুঝা যায় যে, সেই দ্বীপবাসীরা মহাভারত লইয়া যাইবার পর এই দেশের মহাভারতে ভগবদ্গীতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্রথম যুক্তি খণ্ডন

মহাভারতেরই আদিপর্বে বিস্তৃত বৃত্তান্তের মধ্যে মূল ঘটনা এই—ধৃতরাষ্ট্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী দুই ভার্যার সহিত মৃগয়া করিবার জন্য, শতশৃঙ্গ পর্বতে গমন করেন, এবং সেই স্থানে দীর্ঘকাল থাকেন, তখন কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব উৎপন্ন হন; ক্রমে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির উপনয়নের পরে পাণ্ডুর মৃত্যু হয় এবং মাদ্রী সহমৃতা হন, সেই সময়ে সন্নিহিত আশ্রমের মুনিগণ শিবিকায় করিয়া পাণ্ডু ও মাদ্রীর শব এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা ও কুন্তীকে হস্তিনানগরে রাজভবনে দিয়া যান।

তৎকালে অর্জুনের চৌদ্দ বৎসর বয়স ছিল; সুতরাং তিনি লোকের সৎ ও অসৎ ব্যবহার বুঝিবার যোগ্য হইয়াছিলেন। অতএব ভীষ্ম প্রভৃতি প্রাচীনগণ যে অত্যন্ত স্নেহ-মমতানুসারে তাঁহাদের লালন-পালন করিতেন, এবং অস্ত্রশিক্ষাদানের কালে দ্রোণাচার্য যে নিজের পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও অর্জুনের উপরে অধিক স্নেহ করিতেন, তাহা অর্জুন যথার্থরূপে বুঝিতেন; ক্রমে সেই অর্জুন বনবাসের সময়ে স্বর্গে যাইয়া পাঁচ বৎসর সেখানে থাকিয়া সমস্ত দেবাস্ত্রও শিখিয়া মহাবীর হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি পাণ্ডবগণের সর্বপ্রধান যোদ্ধা হইয়া রথে আরোহণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ তাহার সারথি হইয়াছেন। এই সময়ে ভীষ্ম প্রভৃতির মমতা ও দ্রোণ প্রভৃতির স্নেহ অর্জুনের মনে পড়িল এবং তাঁহাদিগকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। অথচ দূরত্বনিবন্ধন যথাযথভাবে দেখিতে পারিতেছিলেন না; তারপর উভয়পক্ষের প্রধানগণ মিলিত হইয়া যে 'যুদ্ধে অব্যাপৃত প্রভৃতিকে আক্রমণ করা হইবে না', ইত্যাদি নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাও অর্জুনের মনে ছিল। অতএব অর্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন—"কৃষ্ণ! উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে লইয়া আমার রথ রাখ, আমি দেখিয়া লইব কাঁহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণও উক্ত নিয়মবন্ধনের বিষয় জানিতেন বলিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে, রথ লইয়া উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে রাখিলেন।

অর্জুন দেখিলেন, যিনি বাল্যকালে পিতৃহীন অবস্থায় পরম স্নেহ আদর ও যত্নে লালন-পালন করিতেন, সেই পিতামহ ভীষ্ম কৌরবসৈন্যের সর্বাগ্রে রহিয়াছেন এবং যিনি পরম যত্নে অস্ত্রশিক্ষা দিয়াছেন, নিজ পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষাও আমার উপর অধিক স্নেহ করিতেন, এবং অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি, সেই গুরুদেব দ্রোণাচার্যও কৌরবসৈন্যের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন; তারপর মাতুল মদ্ররাজ শল্য প্রভৃতিকেও কৌরবসৈন্যে দেখা যাইতেছে; ক্রমে ভাবিলেন, ইঁহাদিগকে স্বহস্তে বধ করিতে হইবে। ইহা ভাবিয়া অর্জুন বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, পরে কৃষ্ণকে বলিলেন—"কৃষ্ণ! যাঁহারা নিহত হইলে শোকে জীবন রাখিতে ইচ্ছা হয় না; সেই সকল লোক ধৃতরাষ্ট্র-সৈন্যের সম্মুখে রহিয়াছেন; সুতরাং ত্রিভুবনের রাজত্ব পাইলেও আমি ইঁহাদিগকে বধ করিতে পারিব না, কেবল পৃথিবীর রাজত্বের কথা আর কি বলিব; আমি যুদ্ধ করিব না।" ইহা বলিয়া অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করিয়া রথমধ্যে বসিয়া পড়িলেন।

কৃষ্ণ ভাবিলেন, বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। আমি

(নারায়ণ) ভূভার হরণ করিবার জন্যই ভূতলে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে, বহু লোক মরিবে, ভূভারের অনেক অংশ কমিয়া যাইবে; এখন পাণ্ডবপক্ষের সর্বপ্রধান যোদ্ধা অর্জুন যদি যুদ্ধ না করেন, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করিতে সাহসীই হইবেন না; যুদ্ধ হইবে না, দুরাচার দুর্যোধনই রাজা থাকিবে, যুধিষ্ঠির রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়াও গুরুতর কষ্টে ভ্রাতাদের সহিত দুর্যোধনের রাজ্যে বাস করিবেন, না হয় ভ্রাতাদের সহিত চিরদিনের জন্য বনবাসী হইবেন, তাহা হইলে আমার পরম ভক্ত পাণ্ডবগণের চিরদিন কষ্টই আমায় দেখিতে হইবে; ইহা আমার পক্ষেও অত্যন্ত অন্যায় ও দুঃখের বিষয়। অতএব অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতেই হইবে। কিন্তু আমি পাণ্ডবগণের সেনাপতি নহি, অন্যভাবেও অর্জুনের প্রভু নহি। সুতরাং অর্জুনকে 'তোমার যুদ্ধ করিতেই হইবে' এরূপ আদেশ করিতেই পারি না, সে আদেশ করিলেও অর্জুন তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। অতএব আমি ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া এবং আপন প্রভাব (বিশ্বরূপ) দেখাইয়া অর্জুনকে মোহিত করিয়া যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিব। ইহা ভাবিয়া কৃষ্ণ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন; ব্রহ্মবিদ্যা বলার অবতারণা হইয়া গেল; প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বাক্যে ব্রহ্মবিদ্যার লেশও থাকিল না; সুতরাং প্রথম অধ্যায়টি ভগবদ্গীতারূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্তাবনা হইয়া রহিল। এইজন্যই ব্রহ্মবিদ্যা, উপনিষৎ ও বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় হইতেই ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতি নাটক বা অন্য যে সকল রূপক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রস্তাবনায় মূল বিষয়ের কোন কথা না থাকিলেও মূল বিষয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপক বলিয়াই সেই সকল নাটক বা রূপকের অংশরূপেই চলিয়া আসিতেছে; সেইজন্যই মহাকবি মাঘ তাঁহার রচিত শিশুপালবধ মহাকাব্যের দ্বিতীয় সর্গে বলিয়া গিয়াছেন—"পূর্বরঙ্গঃ প্রসঙ্গায় নাটকীয়স্য বস্তুনঃ" এস্থলেও ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যার কোন কথা না থাকিলেও অর্জুনের বিষাদ এবং সেই বিষাদনিবন্ধন 'আমি যুদ্ধ করিব না' এই কথা বলাই ভগবদ্গীতারূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গ বা উত্থাপক বলিয়াই তাহার প্রথমে উহা যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্জুনের বিষাদ ও তন্নিবন্ধন যুদ্ধ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশই যুদ্ধের উপক্রমে ভগবদ্গীতারূপ ব্রহ্মবিদ্যার প্রসঙ্গ। অতএব ধান ভানিতে মহীপালের গীতের ন্যায় যুদ্ধের উপক্রমে ব্রহ্মবিদ্যা বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে।

পাঠক মহোদয়গণ, এখন দেখুন, প্রক্ষিপ্তবাদিগণ যদি আদিপর্বের উল্লিখিত স্থান বা অন্ততঃ ভগবদ্গীতার প্রথম অধ্যায়টিমাত্রও দেখিয়া লইতেন, তাহা হইলে ভগবদ্গীতাকে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া প্রক্ষিপ্ত বলিতে পারিতেন না।

দ্বিতীয় যুক্তি খণ্ডন

মহাভারতের ভীষ্মপর্বেরই প্রথম অধ্যায়ে এই বৃত্তান্ত লিখিত আছে যে, উভয়পক্ষের যোদ্ধারা মিলিত হইয়া যুদ্ধের পূর্বে এই নিয়ম স্থাপন ও শপথ গ্রহণ করিলেন যে, 'সৈন্যমধ্য হইতে নির্গত লোককে...না বলিয়া কাহাকেও প্রহার করা হইবে না' ইত্যাদি। উভয় পক্ষের সকলেরই ইহা জানা ছিল। সুতরাং কৃষ্ণ ও অর্জুন স্বসৈন্য হইতে নির্গত হইয়া উভয় পক্ষের মধ্যস্থানে থাকিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং কৌরব-পক্ষের যোদ্ধারাও ওই শপথ ও নিয়ম স্মরণ করিয়া, বিশেষতঃ সেনাপতি মহাধার্মিক ভীষ্মের আদেশ না পাইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে প্রহার করিতে পারেন নাই।

ইহা অপেক্ষাও এই শপথ ও নিয়ম স্মরণের বৃহৎ ব্যাপার দ্রোণপর্বে দ্রোণের চতুর্থ দিনের যুদ্ধে ঘটিয়াছিল—উভয় পক্ষ যথাসময়ে যুদ্ধারম্ভ করিয়া তাহা চালাইতেছিল, ক্রমে সন্ধ্যা হইল, তখন দুই পক্ষই অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই অন্য কোন নিশ্চেষ্ট লোককে প্রহার করে নাই।

এখন ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, প্রক্ষিপ্তবাদিগণ যদি ভগবদ্গীতার অনধিক পূর্ববর্তী এই নিয়ম স্থাপন ও শপথ গ্রহণের বৃত্তান্তটি দেখিয়া লইতেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় যুক্তির অবতারণাও করিতে পারিতেন না।

তৃতীয় যুক্তি খণ্ডন

প্রক্ষিপ্তবাদিগণের মধ্যে কেহই যুদ্ধ-ব্যবসায়ী বীর বা মহাবীর ছিলেন না বা এখনও নাই; তাঁহারা সকলেই

আমাদেরই তুল্য বিষয়ান্তর ব্যবসায়ী। সুতরাং তাঁহারা সামান্য বাগ যুদ্ধ উপস্থিত হইলেও অধীর হইয়া পড়েন। অতএব "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" এই নিয়মে প্রক্ষিপ্তবাদিয়া যুদ্ধের উপক্রমেই মহাবীর অর্জুন ও কৃষ্ণের অধৈর্য্যেরই সম্ভাবনা করিয়া তৎকালে তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করা অসম্ভব বলিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধব্যবসায়ী মহাবীরগণের যুদ্ধের উপক্রমে তো অধীরতা হয়ই না, তুমুল যুদ্ধের সময়েও নহে। অর্জুনের বিষয়ে তাহার নিদর্শন উল্লেখ করা যাইতেছে। মহাভারতেরই বনপর্বে আছে—

অর্জুন গুরুতর তপস্যা করিয়া মহাদেবের নিকট পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। পরে ইন্দ্রের প্রেরিত দেববিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে যান। ক্রমে সেস্থানে থাকিয়া পাঁচ বৎসর যাবৎ দেবাস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে তাঁহার অলৌকিক যুদ্ধক্ষমতা হইয়াছে জানিয়া দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের অবধ্য নিবাতকবচ নামক অসুরগণকে বধ করিবার জন্য মাতলিকে সারথি করিয়া রথে অর্জুনকে প্রেরণ করেন; পরে একক অর্জুনের সঙ্গে বহু সহস্র নিবাতকবচ নামক অসুরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ক্রমে তুমুল যুদ্ধ হইতে থাকে; তখন সারথি মাতলি কৌশলে রথ চালনা না করিয়া অর্জুনের দিকে অনিমেষনেত্রে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। সেই সময় অর্জুন বিরক্তি-সহকারে বলিলেন—"আপনি কৌশলে রথ চালনা না করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছেন কেন?" তখন মাতলি বলিলেন—"আমি দেবরাজের সারথি, দেবরাজের সহিত বহু যুদ্ধে গিয়াছি। কিন্তু তাঁহাকেও তুমুল যুদ্ধের সময় আপনার ন্যায় ধীর-স্থির-অচল দেখি নাই" ইত্যাদি। সেই অর্জুন আজ বহু সহায়সম্পন্ন হইয়া মানুষের সহিত যুদ্ধের উপক্রমেই উদ্বেগে ধৈর্য হারাইবেন যে, ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনাও করিতে পারিবেন না, এরূপ সম্ভাবনা করাও অসম্ভব।

তারপর আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি—ফরাসী মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সেনাপতি থাকিয়া যুদ্ধের সময়েই স্বসৈন্যমধ্যে অশ্বপৃষ্ঠে কিছুকাল ঘুমাইয়া লইতেন; তিনি যুদ্ধের সময় ঘুমাইবার উপযোগী ধৈর্য পর্যন্তও রাখিতে পারিতেন, আর মহাবীর অর্জুন যুদ্ধের উপক্রমেই ধৈর্য হারাইবেন!

এখন বলা যাইতে পারে যে, প্রক্ষিপ্তবাদীরা যদি তুমুল যুদ্ধসময়েও অর্জুনের ধৈর্য বিষয়ে বনপর্বোক্ত মাতলিকৃত এই প্রশংসাবাদ দেখিতেন বা নেপোলিয়ান বোনাপার্টের তুমুল যুদ্ধের সময়েও অশ্বপৃষ্ঠে নিদ্রা যাইবার বৃত্তান্তের পর্যালোচনা করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধের উপক্রমেই নিজেদের ন্যায় মহাবীর অর্জুনেরও অধৈর্য্যের সম্ভাবনা করিতেন না।

চতুর্থ যুক্তি খণ্ডন

প্রক্ষিপ্তবাদীরা বলেন, জাভাদ্বীপে যে মহাভারত বা যে সকল মহাভারত দেখা যায়, তাহাতে ভগবদ্গীতা দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এ দেশ হইতে মহাভারতের নকল করিয়া লইয়া যাইবার পরেই মহাভারতে ভগবদ্গীতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, জাভাদ্বীপবাসীরা বৌদ্ধ, বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের মূর্তি স্বীকার করেন না এবং "অহিংসা পরমো ধর্মঃ"—হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম, ইহাই তাঁহাদের মত। অথচ মানুষ-মূর্তি ঈশ্বর কৃষ্ণই ভগবদ্গীতায় বক্তা এবং তিনিই "যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ ভারত!" ইত্যাদি বহুবার বলিয়া পরম ভক্ত অর্জুনকে সেই হিংসার পরাকাষ্ঠা করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং এই অংশ মিথ্যা, ইহা ভাবিয়া ভগবদ্গীতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য অংশ লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

অথবা জাভাদ্বীপবাসী লোক যখন প্রথমে এই দেশ হইতে মহাভারতের নকল করিয়া লইয়া যান, তখন সেই মহাভারতের ভগবদ্গীতার পুস্তকটি তিনি প্রাপ্ত হন নাই; তাহা যে মহাভারতে আছে, তাহাও তাঁহার বুঝিবার সম্ভব ছিল না। সুতরাং তিনি ভগবদ্গীতা ব্যতীত মহাভারতই লিখিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এইরূপ সম্ভাবনা করা অসম্ভব নহে। কারণ, আমিই যে মহাভারত প্রকাশ করিয়াছি, তাহার মূল লেখা এবং নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়া লেখার সময়ে আমার পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের স্বহস্তে লিখিত পুস্তকই আমার প্রধান আদর্শ ছিল। কিন্তু তাঁহার লিখিত বিরাটপর্বটি আমি পাই নাই, অন্য হস্তে লিখিত বিরাটপর্ব আমার আদর্শ করিতে হইয়াছিল।

প্রক্ষিপ্তবাদের বিরুদ্ধে প্রধান কথা

বহু উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য ভগবদ্‌গীতার ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন এবং সাধকশ্রেষ্ঠ শ্রীধরস্বামী ও পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য মধুসূদন সরস্বতী ভগবদ্‌গীতার টীকা করিয়াছেন ; এই মহাপুরুষেরা ভগবদ্‌গীতা কোন প্রাকৃত লোকের রচিত ও প্রক্ষিপ্ত এই-রূপ সন্দেহ করিলে ইহাঁর ভাষ্য বা টীকা রচনার ইচ্ছাই করিতেন না।

বৈষ্ণবীয় তন্ত্রসার গ্রন্থেও গীতামাহাত্ম্য প্রকরণে সুন্দর একটি শ্লোক আছে। যথা—

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥"

প্রক্ষিপ্তবাদ খণ্ডনবিষয়ে অখণ্ডনীয় বহুতর প্রমাণ

মূল মহাভারতেরই আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম 'পর্বসংগ্রহ অধ্যায়', তাহাতে সূচীপত্ররূপে সমগ্র মহাভারতের উপপর্ব অর্থাৎ প্রকরণ বা পরিচ্ছেদের নাম লিখিত আছে ; তাহার মধ্যে ভীষ্মপর্বের উপপর্ব লেখার মধ্যে এইরূপ লিখিত রহিয়াছে—

"পর্বোক্তং ভগবদ্‌গীতা পর্ব ভীষ্মবধস্ততঃ।"

মৎপ্রকাশিত মহাভারত আদিপর্বের ১১৬ পৃষ্ঠা, ৭০ শ্লোক। উক্ত প্রসঙ্গে পরে লিখিত আছে—

"এতৎ পর্বশতং পূর্ণং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা ॥"

মৎপ্রকাশিত মহাভারতের আদিপর্বের ১২০ পৃষ্ঠা, ৮৫ শ্লোক।

মহাত্মা বেদব্যাস সমগ্র মহাভারতে এই পূর্ণ একশত উপপর্ব বলিয়াছেন। ভগবদ্‌গীতাও একটি উপপর্ব বলিয়া তাহাও বেদব্যাসেরই বলা হইল, ইহা জানা গেল।

মৎপ্রকাশিত মহাভারতের শান্তিপর্ব ৪২৯ পৃষ্ঠা, ১০৬ শ্লোক। যথা—

"সারথ্যমর্জুনস্যাজৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ ব্রহ্মাত্মনে নমঃ ॥"

যিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুনের সারথির কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ত্রিভুবনের উপকার করিবার জন্য অর্জুনকে গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছিলেন, সেই পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণকে নমস্কার করি।

আমার প্রকাশিত মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বে ১০১ পৃষ্ঠা হইতে একটি উপপর্ব অর্থাৎ প্রকরণ বা পরিচ্ছেদ আছে, বেদব্যাসই তাহার নাম করিয়াছেন অনুগীতাপর্ব। এই অনুশব্দটির অর্থ—পশ্চাৎ বা সাদৃশ্য। যথা অমরকোষ—"পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরনু"। অতএব স্বয়ং বেদব্যাসই এই 'অনুগীতা' নামটি দ্বারা ইহাই সূচনা করিয়াছেন যে, এই গীতা পূর্বোক্ত ভীষ্মপর্বীয় ভগবদ্‌গীতার পরবর্তিনী গীতা কিংবা তাহার সদৃশী গীতা। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট জানা গেল যে, ভগবদ্‌গীতা বেদব্যাসেরই স্বরচিত ছিল।

"কচ্চিদেতত্ত্বয়া পার্থ! শ্রুতমেকাগ্রচেতসা।
তদাপি হি রথস্থস্ত্বং শ্রুতবানেতদেব হি ॥"

আমার প্রকাশিত মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বের ১৪৪ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় শ্লোক।

অর্জুন! তুমি একাগ্রচিত্তে এই কথাগুলি শুনিয়াছ তো? তখনও (অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্বেও) তুমি রথে থাকিয়া এই সকল কথাই (ভগবদ্‌গীতা) শুনিয়াছিলে। মূল মহাভারতেরই এই শ্লোকটির দ্বারাও ভগবদ্‌গীতারই স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল।

"পূর্বমপ্যেতদেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে।
ময়া তব মহাবাহো! তস্মাদত্র মনঃ কুরু ॥"

আমার প্রকাশিত মহাভারতের আশ্বমেধিক পর্বের ৩৯০ পৃষ্ঠা, ৭ শ্লোক।

মহাবাহু অর্জুন! আমি পূর্বেও কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে তোমার নিকট এই সকল বিষয় (ভগবদ্‌গীতা) বলিয়াছিলাম ; অতএব এই বিষয়ে মন নিবিষ্ট কর।

আমি আমার পিতামহ অদ্বিতীয় পৌরাণিক কাশীচন্দ্র বাচস্পতি মহাশয়ের স্বহস্তলিখিত মহাভারত এবং অন্য অনেক মুদ্রিত মহাভারত মিলাইয়া সমীচীন পাঠ গ্রহণ-পূর্বক মূল লিখিয়া, তাহার প্রত্যেক শ্লোকের ভারত-কৌমুদী নাম্নী নূতন টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করিয়া এক সঙ্গে বঙ্গাক্ষরে যে মহাভারত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা দেখিয়াই এই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম। অতএব প্রক্ষিপ্তবাদিগণ ও নিরপেক্ষ পাঠকগণ, ইচ্ছা হইলে আপনারা অন্যান্য মুদ্রিত ও হস্তলিখিত মহাভারত মিলাইয়া দেখিলে দেখিবেন যে, পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্কের মিল হইবেই না, শ্লোকাঙ্কেরও মিল না হইতে পারে ; কিন্তু প্রক্ষিপ্তবাদের প্রতিবাদে আমার উদ্ধৃত এই মূল শ্লোকগুলির অবশ্যই মিল হইবে ; যদি তাহাই হয় তবে আপনাদের সকলেরই বাধ্য হইয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভগবদ্‌গীতা প্রক্ষিপ্ত নহে, মূল মহাভারতেরই অংশ এবং স্বয়ং বেদব্যাসেরই রচিত।

উত্তরণ

সুভাষ সমাজদার

কাষ্ঠগড়। আত্রাই নদীর বুকে গভীর কাজল-কালো জলের একটি দহ। জেলেদের নৌকোর লগি এখানে থই পায় না। বছরের পর বছর এই কাষ্ঠগড়ের দহের নিকষ-কালো জল কত প্রাণ যে লোলুপ উল্লাসে গ্রাস করে, কত যে হাজারমণী বজরা আজও জলের তলায় পচছে, তার হিসেব কেউ দিতে পারে না।

কাষ্ঠগড়ের দহের কাছেই লালমাটির খাড়া পাড়ের ওপরে ঝাপড়া বুড়ো বটগাছের নীচে মশানকালীর থান। পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আত্রাইয়ের ওপারে চোখ দুটো ছড়িয়ে দিলে দেখা যাবে, চকচকে রূপোর বলয়ের মত সাজা সমকোণে বাঁক খেয়ে পতিরাম পারপতিরাম ছাড়িয়ে কোন নিঃসীম দিগন্তে উধাও হয়ে গেছে নদীটা। খাড়া পাড়ের পরেই ধূ ধূ সাদা বালুচরের ওপরে ইতস্তত: ছড়িয়ে রয়েছে কালো পোড়া কাঠের টুকরো, ছেঁড়া বালিশ আর কাঁথা। কখনও কখনও রাতের কালো অন্ধকারে বালুচরের এখানে ওখানে যেন জলন্ত রক্ত ছিটকে পড়ে। চিতার লেলিহান আগুনের প্রেতচ্ছায়া বুকে নিয়ে দুলতে থাকে কাষ্ঠগড়ের দহের কালো জল।

কাষ্ঠগড়। প্রাণঘাতী সর্বনাশা দহই শুধু নয়। হরিধ্বনি বুকফাটা কান্নার বিলাপ আর ধোঁয়া ছাই ও জলন্ত অঙ্গারের রাজ্য বলেই সবাই কাষ্ঠগড়ের নাম শুনলেই ভয় পায়। দিনের আলোতেও কেউ এদিকে পা মাড়ায় না।

কিন্তু মশানকালীর বটগাছের নীচে নীলাভ ছায়ায় ঘেরা থানের কাছেই শণের খড় দিয়ে ছাওয়া নড়বড়ে একটা কুঁড়েঘর দেখে মনে বিস্ময় জাগে—এই নির্জন, জনমানবহীন শ্মশানে কে থাকে! এই অঞ্চলের লোক বলে, গোকুল জেলে মানুষ নয়, টাকার পিশাচ। তা না হলে বেশী মাছ ধরার লোভে কেউ এখানে রাতে একলা থাকতে পারে?

আত্রাইয়ের বুকে সন্ধ্যা নামছে। গোকুল নৌকো করে চলেছে মাছ মারা 'চটকা'র দিকে। দহের কাছে জলের ভেতরে দুটো মোটা বাঁশ পোঁতা রয়েছে। তার সঙ্গে আড়াআড়ি করে দুটো সরু বাঁশ বাঁধা আছে। এই সরু দুটো বাঁশের সঙ্গে বিশাল একটা জাল খাটানো রয়েছে। স্থানীয় লোক একে 'চটকা' বলে।

গোকুল নিঃশব্দে চটকায় উঠে একটা সরু বাঁশের ওপর পা দিয়ে চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে জলের ভেতরে নেমে গেল জালটা। জলের নীচে জালটাকে অদৃশ্য করে দিয়ে অজস্র তারায় ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মশানকালীর নাম নিতে লাগল গোকুল। কয়েক মুহূর্ত পর বেশী মাছ পাওয়ার আশায় কালীর নাম করা শেষ হল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের নিথর স্তব্ধতাকে চমকে দিয়ে একটা শব্দ বেজে উঠল—খস। দেশলাই জ্বালিয়ে একটা বিড়ি ধরাল গোকুল। বিড়িতে একটা জোর সুখটান দিয়ে ধীরে ধীরে পায়ের চাপ কমিয়ে জালটাকে জলের ওপরে তুলল। অমনই কালো অন্ধকারে বিশাল জালের ওপরে ঝাঁকে ঝাঁকে রূপোলী মাছ ঝকমক করে উঠল। আত্রাই নদীর একান্ত নিজস্ব মাছ—রাইখড় আর ভাঙন। তীব্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে গোকুল বিড়বিড় করে বলল, জয় মা মশানকালী!

গোকুলদা, তোমার মাছ মারা হল?—পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মিষ্টি গলায় ডাকল ফুলজান। কাষ্ঠগড় গ্রামের মোড়ল আমিনুদ্দির মেয়ে।

কেন এসেছিস আবার? বলি নি আমি, তোকে আমার একটুও ভাল লাগে না। তবুও বারবার জ্বালাতে আসিস কেন?—খোঁচা-খাওয়া একটা জন্তুর মত চিৎকার করে বলতে চাইল গোকুল। কিন্তু কোন কথা বলল না। আওয়াজ করলেই মাছের ঝাঁক পালিয়ে যাবে।

গোকুলদা, কথা বলছ না কেন?—অভিমানে ভারী হয়ে ওঠে ফুলজানের গলার স্বর। আবার আর এক ঝাঁক মাছ তুলে নৌকোর খোলের ভেতরে রেখে পাড়ের ওপরে উঠে আসে গোকুল। কঠিন চোখে ফুলজানের দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলে, তোর হাতে বাটিতে ওটা কি?

মা তোমার জন্যে বকুলপিঠে পাঠিয়েছে গোকুলদা।

গোকুলের বুকের কাছে ঘন হয়ে দাঁড়ায় ফুলজান।

রাত্রির অন্ধকারে গোকুলের পুরো চার হাত দীর্ঘ সুগৌর দেহের আভাস ঝিকমিক করে। শিলাফলকের মত তার বিশাল বুকে ফুলজানের অনুরাগের দৃষ্টি খেলা করে। নরম আদুরে গলায় ফুলজান বলে, আমি এলেই তুমি রাগ কর কেন গোকুলদা। আমাকে তোমার ভাল লাগে না?

তোকে কেন, কোন মানুষকেই আমার ভাল লাগে না। কেন তুই জ্বালাতে আসিস আমাকে?—গোকুলের কথাটা যেন শুনতেই পায় না ফুলজান। উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে, চল তোমার ঘরে। থালায় করে পিঠে সাজিয়ে তোমাকে খাওয়াব।

না, পিঠে খাব না, তুই বাড়ি যা।—রাগে ফেটে পড়ে গোকুল।

গোকুলদা, তুমি—

যা, তোর বাপজানকে গিয়ে বল্, পিঠে খাইয়ে আর তোকে পাঠিয়ে আমাকে যেন বশ করার চেষ্টা না করে। আমি তোদের সবাইকেই চিনি।—গোকুলের ঠোঁটের কোণায় কোণায় থুতু জমে ওঠে। পিঠের বাটিটা ফুলজানের হাত থেকে নিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দেয়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, তোরা বাপ-বেটিতে আমার কিছু কাঁচা টাকা দেখেছিস না?—গোকুলের দু চোখে বন্য হিংসা ধূ ধূ করে জলতে থাকে। কয়েক মুহূর্ত গোকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ফুলজান। তারপরে মাথা নীচু করে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। জ্বালা-ধরা দৃষ্টিতে তার অপস্রিয়মান মূর্তির দিকে তাকিয়ে গোকুল ভাবে, বিদ্বেষ-কুটিল সংকীর্ণ মানুষের সংসার থেকে বহুদূরে এই শ্মশানে এসে সে বাসা বেঁধেছে। তবুও আমিরুদ্দির মেয়ে ফুলজান লাল ডুরে শাড়িতে, কালো খোঁপায় টাটকা ফুলের গন্ধে, দু চোখের মোহন লাস্যে একটা ঝিমঝিম নেশা মাখিয়ে কেন—কেন আসে? শুধু কাষ্ঠগড় গ্রামের মোড়ল আমিরুদ্দি নয়, ঘোষপাড়ায় মাতব্বর সুরেনও তার সঙ্গে খাতির করে কথা বলে। স্নানের ঘাটে অল্পবয়সী মেয়ে-বউরাও মোহমাখা চোখে মিষ্টি হাসির ঝিকিমিকি ফুটিয়ে তার দিকে তাকায়। কেন? তার তরুণ দেহের প্রবহমান রক্তে রক্তে যৌবনের তেজ জলজল্ করছে বলে? তার গায়ের রঙে অত্যুজ্জ্বল শুভ্রতা রয়েছে সেই-জন্যই কি! না না।

টাকা—টাকা। সে সারারাত জেগে চটকায় মাছ ধরে। সেই পরিশ্রমের ফসলকে সে বালুরঘাট পতিরামের হাটে নৌকো বেয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসে। মুঠো মুঠো টাকা পায় সে। টাকা নয়—তার মনে হয় যেন, লাল রক্তের রূপোলী ঝলক। ওই টাকার জন্যেই এ তল্লাটের লোক মৌমাছির মত তার চারিদিকে গুন গুন করে।

কিন্তু পয়সা না থাকলে ওরাই তাকে পচা সাঁকোর মত পরিত্যাগ করে চলত। দারিদ্র্যজীর্ণ কাঙাল মানুষের স্থান নেই এই দুনিয়ায়। রক্তাক্ত শিরায় আকীর্ণ গোকুলের খাড়া নাকটা ঘৃণাভরে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

বলো হরি—হরি বোল!—দূরে সৈদপুরের রাস্তায় রাত্রির স্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে উল্লসিত হরিধ্বনি শোনা যায়। হরিধ্বনি শুনলেই বিপুল একটা আনন্দের ঢেউ গোকুলের বুকে আছড়ে পড়ে। তুচ্ছ দুটো পয়সা নিয়ে, সামান্য জমি নিয়ে কী লাঠালাঠিই না করে মানুষ! যেন টাকার সিন্দুক আর জমি ওর সঙ্গে যাবে! এই যে শ্মশানে পুড়ে পুড়ে কালো ছাই হয়ে যেতে এসেছিস, এখন সঙ্গে কত সম্পত্তি আছে শুনি? কিছু টাকা থাকলে সেই দম্ভে ভগবানকে পর্যন্ত স্বীকার করে না মানুষ। মর্মের আনন্দে গলা ছেড়ে দিয়ে গান ধরল গোকুল—

দেহ-কলেবর এ তো পরের ঘর
ভাড়া দিয়ে আছ মন, ভাড়াটিয়া ঘরে
চিত্রগুপ্ত যেদিন খুলিবেন খাতা
সেদিন তোমার (মন) ঘুরে যাবে মাথা।

তার মিষ্টি গলার গানের উদাত্ত স্বর নদীর হু-হু করা হাওয়ায় দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

গোকুলদা, আর মাছ ধরবেন না?—তার নৌকোর ছোকরা মাঝি বলাইয়ের কথায় আচমকা চুপ করে গেল গোকুল।

না রে, আজ আর মাছ ধরতে ভাল লাগছে না।—ছাড়া ছাড়া গলায় বলল গোকুল, তুই ঝাঁকা করে মাছগুলো আমার ঘরে নিয়ে আয়।

ঝাঁক বাঁধে মাছ কিন্তুক আসছিল গোকুলদা।—বলাইয়ের কথায় আক্ষেপ ফুটে ওঠে।

যা বলছি তাই কর্ না বদমাশ।—গর্জে ওঠে গোকুল।

দূরে পত্তিরামের কাছে আত্রাইয়ের ওপরে ব্রাজের গায়ে সারি সারি আলোর ফুলকি দপ দপ করে জ্বলে। ব্রীজের ওপরের কালো চকচকে পীচের রাস্তাটা হেড-লাইটের উগ্র সাদা আলোয় ঝলসে দিয়ে এক একটা যাত্রী-বোঝাই বাস আসছে মালদহ থেকে, আসছে কালিয়াগঞ্জ থেকে। দেশ ভাগ হওয়ার পরই এই রাস্তাটা হয়েছে। বেনোজলের ঢেউয়ের মত শত শত মানুষ নিঃস্ব হয়ে সর্বহারা হয়ে ওই পথ ধরে এই দেশে এসেছে বলেই তো এ তল্লাটের লোকের টুকটাক ব্যবসা জমে-উঠেছে। চড়া দামে জমি বিক্রি করছে। টাকার দেমাকে মাটিতে পা পড়ছে না লোকগুলোর। কাষ্ঠগড়ের নির্জন শ্মশানে একটা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে দূরের আলোকিত রাস্তাটার দিকেই কুটিল চোখে তাকিয়ে থাকে গোকুল।

খাবা আস গোকুলদা।—গোকুলের কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে বলাইয়ের হাঁক ভেসে আসে। বিষণ্ন মন নিয়ে গোকুল তার ঘরে এসে দাঁড়ায়।

ঘর তাকে ঠিক বলা চলে না। মাথার ওপরে শণের খড়ের চাল। তারও জায়গায় জায়গায় খড় সরে গিয়ে তারাজ্বলা নীল আকাশের টুকরো উঁকি দিচ্ছে। চারিদিকে চাটাইয়ের বেড়া। ঘরের মাঝখানে বাঁশের মাচার ওপরে শতছিন্ন ও ময়লা একটা কাঁথা আর মাথার কাছে পুঁটলি করা একটা ইঁদুরে-কাটা গায়ের চাদর। ওটাই হয়তো তার বালিশের কাজ করে। আর ঘরের বাঁশের খুঁটির গায়ে একটা কেরোসিন তেলের বোতল ঝুলছে। এক কোণে একটা তোলা-উনুনে ভাত ফুটছে। সব মিলিয়ে গোকুলের কিন্তু মনে হয় তার প্রয়োজনের অতিরিক্তই রয়েছে তার কাছে। তার মনে হয়, একবেলা ভাত না খেলে কেমন হয়! কেমন হয় বলাই ছোকরাটাকে বিদায় করে দিলে! তা হলে আরও—আরও কিছু টাকা বাঁচানো যায়।

আরও অনেক—আরও অনেক টাকা তাকে জমাতে হবে। তার আকাঙ্খা তাকে হিংস্র করে তুলেছে, স্বার্থপর করে তুলেছে। আজ সে ভুলেই গেছে, একদিন সে ছিল যাত্রাদলের নামকরা গায়ক। টাকাকে সে ঘৃণা করত। নিজেদের জাত-ব্যবসা কখনও করবে না, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা। কিন্তু আজ তাকে সেই মাছের ব্যবসাই করতে হচ্ছে। যে টাকাকে সে মর্মান্তিক ঘৃণা করত, সেই টাকাই তার চাই। কেন? ছোরার ধারের মত হিংস্র একটা ধারালো হাসি বয়ে গেল তার ঠোঁটের কোণায় কোণায়।

গোকুল খেতে বসল। কিন্তু এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, বদমাশ, ভাত একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছিস?

মুই ভাঙা খলুইটা মেরামত করোছিনু গোকুলদা।—ভীত বলাইয়ের গলার স্বর করুণ হয়ে উঠল।

খাওয়া হল না গোকুলের। উঠে পড়ল। সেদিন সন্ধ্যায় যত মাছ ধরা হয়েছিল, সেই সব মাছ নিয়ে নৌকো ভাসিয়ে দিল গোকুল বালুরঘাটের দিকে। তার পেটে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। মুখ হাঁ করে নদীর ঠাণ্ডা বাতাস গিলতে লাগল সে। এত টাকা রোজগার করে, তবুও কোনদিন তৃপ্তি করে পেট ভরে খাওয়া হয় না তার। কিন্তু একটা ছোট সংসারের একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে কোন কল্যাণময়ী হাস্যমুখী নারীর সেবা যত্ন আর ভালবাসা সে পেতে পারত। কেন, কার জন্য, কী পাপে তার এই ছন্নছাড়া একক নিঃসঙ্গ জীবন?

কাষ্ঠগড়ের শ্মশানকে একাকার করে দিয়ে যখন অতিকায় দানবের মত এক একটা রাত্রি নামে, তখন ঘুম আসে না তার। বিনিদ্র জ্বালাধরা চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে একটা আবছায়া মুখচ্ছবি। সুনয়নী।

নদীর ওপারে পারপত্তিরামেরই জলে-বাতাসে সঞ্জীবিত পল্লবিত লতার মত এক আনন্দ-টলোমলো মেয়ে। সুনয়নীর অফুরন্ত প্রাণচঞ্চলতা তার শিল্পীমনকে মুগ্ধ করেছিল। সে সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে ভালবেসেছিল। সুনয়নীরও মনে তখন কত গর্ব! সে যাকে ভালবাসে, তার কণ্ঠের মধুর সঙ্গীতের মূর্ছনা অসংখ্য গ্রামের মানুষের স্নায়ুগুলোর ওপর মধুর আবেশ ছড়িয়ে দেয় আফিমের মৌতাতের মত। কত লোক তাকে চেনে!

পারপত্তিরামের বিন্নাবনের ঝোপের ভেতর প্রতিদিনের

যতই নিস্তব্ধ দুপুরটা তাদের টুকরো-টুকরো কথা আর খুকখুক হাসিতে ছন্দোময়রঙিত হয়ে উঠেছিল; কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সে বলেছিল, দেখ্ সুনো, আমরা এক জাত। কিন্তু তোর বাবা চাষবাস করে বলেই বোধ হয় তোরা কুলে একটু উঁচু আমাদের চেয়ে। তোর বাবা আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে—

বাবা ওসব উঁচু-নীচু কুলটুলের ধার ধারে না। যেখানে টাকা বেশী পাবে, সেখানেই আমার বিয়ে দেবে।

শুধু টাকা হলেই—

নিদারুণ একটা যন্ত্রণায় তার গলার ভেতরে কথা আটকে গিয়েছিল। তীব্র একটা ঘৃণার ধিক্কারে জ্বলছিল তার চোখ দুটো।

কিন্তু সুনয়নীর ভালবাসা তার চেতনাকে কেমন বিশৃঙ্খল করে দিয়েছিল, কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে। সব জেনেশুনেও সুনয়নীর বাবা পূর্ণদাসকে কথাটা বলতেই সে রাগে ফেটে পড়ল। গোকুলের বাবার নাম তুলে পিচ করে একদলা থুতু ফেলে বলেছিল, ব্যাটা জেলের ছেলের সাহস কত! আমার মেয়ের দাম জানিস? হাজার টাকা এক সঙ্গে কখনও দেখেছিস? যা ভাগ্।—একটা ঘেয়ো কুকুরের মত তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পূর্ণদাস।

তাকে ভালবাসে বলেই সুনয়নী তার বাপের পায়ের কাছে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ে নি। না, কিছুই সে করে নি। শুধু তার মার খাওয়া অসহায় জানোয়ারের মত মুখের দিকে নির্বিকার চোখে তাকিয়ে রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। রোষে ক্ষোভে অপমানে তার চোখ ফেটে জল এসেছিল। মাথা নীচু করে চলে আসতে আসতে মনে হয়েছিল, মেয়েরা আশ্চর্য জীব! ওরা চতুর, প্রবঞ্চক। ওদের চোখের কোণায় কোণায় শুধু ছলনার ছায়া। বহুদিন আগে যাত্রার কোন পালার কোন একটা পার্টের মুখস্থ করা ওই কথাকটিই সেদিন মর্মান্তিক সত্য বলে মনে হয়েছিল।

পায়রাপত্তিরামের হাটে গিয়ে সেখানকার লোকের মুখে তার বাবা জানতে পেরেছিল, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে পূর্ণদাসের কাছে তার যাওয়ার কথা। বাড়িতে এসে তার হাত ধরে বলেছিল, দেখ্, গোকলা, মাছের ব্যবসাটাই মন দিয়ে কর্। তুই গাঁয়ে গাঁয়ে যাত্রা করে বেড়াস, ঘুরিস বাউণ্ডুলের মত। তোকে পূর্ণ মেয়ে দেবে কেন?—একটু থেমে ঘৃণায় চোখে গোকুলের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যতই তুমি বড় গায়ক হও না কেন, টাকা না থাকলে কেউ তোমাকে পাত্তা দেবে না।

টা—কা! নৌকোয় বসে গোকুলের চোখ দুটো বাঘের মত কপিশ আলোয় জ্বলজ্বল করতে লাগল। আত্রাইয়ের বুক থেকে আচমকা একটা দমকা হাওয়া এল। সনসন করা হাওয়াটা যেন তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে গেল, মিথ্যা সব মিথ্যা! গরিবের কাছে প্রেম প্রীতি আর অনুরাগে ভরা এই পৃথিবীটার কানাকড়িও মূল্য নেই। গোকুলের কঠিন দুটো চোখও জলে ভিজে উঠল।

দিন কাটে। আশ্বিনের মরসুমে আত্রাই নদীতে আরও ঝাঁক ঝাঁক রাইখড় ভাঙন আর পাবদা মাছ আসে। বালুরঘাটের পাইকাররা চড়া দামে নদীর টাটকা মাছ কিনে নেয়। মুহূর্ত সময় নেই গোকুলের। দিন-রাত চটকার বাঁশের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে আর একটা নিষ্প্রাণ কলের মানুষের মত জাল ফেলে আর তোলে। নৌকোর খোল সেই মাছ দিয়ে বোঝাই করে শেষ রাতের অন্ধকারে বালুরঘাট পাড়ি দেয়। তার চেতনার ভেতরে মাছ ধরা আর বিক্রি করা ছাড়া অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বকে সে সহ্য করতে পারে না। একটা—একটা মাত্র শব্দের পৃথিবীতে সে বাস করছে—সেটা টা—কা!

সেদিনও নৌকো বোঝাই করে মাছ ধরেছিল গোকুল। কাষ্ঠগড়ের পাড়ের ওপরে মশানকালীর থানের ভুতুড়ে অন্ধকারমাখা বটগাছটার দিকে তাকিয়ে দু হাত তুলে প্রণাম করে প্রতিদিনের মত নৌকো ছাড়ছিল গোকুল, হঠাৎ আকাশ কাঁপিয়ে হরিধ্বনির শব্দ ভেসে এল—বলো হরি—হরি বোল! গোকুলের বুকের ভেতরে আনন্দের ঢেউ তোলপাড় করে উঠল। আজ যাত্রা শুভ। এখুনি দাউ দাউ করে চিতা জ্বলে উঠবে। লোকটার অত সাধের দেহটা পুড়ে পুড়ে কালো একটা রবারের বলের মত হয়ে যাবে। ওরই আপনজনেরা নির্মমভাবে বাঁশের বাড়ি দিয়ে মাথার খুলিটা ফাটিয়ে দেবে। খানিকটা তরল ঘিলু ছিটকে পড়বে চারিদিকে। এমন দৃশ্য সে দু চোখ ভরে রোজ দেখে। তবুও তার তৃপ্তি হয় না।

করে—কবে পূর্ণদাস আর তার মেয়ের মরা দেহটা তার এই এলাকায় ভেতরে আসবে? নৌকোটা শক্ত করে বেঁধে রেখে মৃত্যুর গন্ধ পেয়ে যেন একটা জীবন্ত প্রেতের মত উল্লসিত হয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে এল গোকুল।

কিন্তু তখুনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। নারীকণ্ঠের করুণ কান্নার শব্দে শ্মশানের নিথর স্তব্ধতা আড়ষ্ট ব্যথায় চমকে উঠল।

শ্মশানের মাটিতে নামানো মড়ার খাটিয়ার কাছে লুটিয়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে সুনয়নী। ধক করে উঠল গোকুলের বুকের ভেতরটা। মুহূর্তে তার চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেল। সুনয়নীর ভাই নিবারণ গোকুলকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল তার কাছে। গোকুলের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলল, এ কি গোকুলদা, তুমি এখানে!—তার দু চোখ জলে টলমল করছে। ভারী গলায় বলল, দিদির কপাল পুড়ল গোকুলদা! তুমি জান বোধ হয়, বাবাও মারা গেছেন দু বছর আগে। সব জমি সরকার নিয়ে নিয়েছে। আমারই ছেলেপুলে নিয়ে দিন চলে না। এখন ওকে নিয়ে কী করি বল তো?

কেন, সুনয়নীর শ্বশুরবাড়ির অবস্থা তো খুব ভাল শুনেছি।

হ্যাঁ, ওর বিয়ের সময় ভালই ছিল। বাবা টাকার লোভেই বিয়ে দিয়েছিলেন। ছেলেটার খোঁজ-খবর নেন নি। ওর স্বামীটা ছিল মাতাল। মদ খেয়েই সব টাকা উড়িয়েছে। এখন ওর তিনকুলে কেউ নেই। দিদি কাল কী খাবে তারও ঠিক নেই।

তা হলে আপাততঃ ওকে তোমার বাড়িতেই নিয়ে যেতে হবে।

এই দিদি, কাঁদিস না। কেঁদে কি হবে আর? দেখ্‌, কে এসেছে।—সুনয়নীর পিঠে পরম স্নেহে একটা হাত রেখে বলল নিবারণ, চিনতে পারলি না? গোকুলদা রে!

এক মুহূর্তের জন্ম কান্না থামিয়ে গোকুলের দিকে বিচিত্র একটা দৃষ্টিতে তাকাল সুনয়নী।

চার বছর আগে সুনয়নীর সেই নির্বিকার মুখের সামনে যেমন দাঁড়াতে পারে নি আজও তেমনই তার তীব্র শোকাকুল মূর্তির সামনে দাঁড়াতে পারল না গোকুল। সেদিন সুনয়নীর জন্তে অপমানের যে জ্বালাটা তুষের আগুনের মত বুকের ভেতরে ধিকি ধিকি জ্বলছিল, সেই জ্বালাই আজ কান্নার ঢেউ তুলল তার মনের ভেতরে। আশ্চর্য! কত বিনিদ্র রাতে প্রতি-হিংসার জ্বালায় জ্বলেপুড়ে সুনয়নীর চরম সর্বনাশের যে কল্পনা করে সে আনন্দ পেয়েছে, সেই সর্বনাশ দেখে সে আজ দুঃখ পাচ্ছে কেন? তবে কি—তবে কি আজও সুনয়নীকে সে ভালবাসে?

তারপর যা খুব স্বাভাবিক তাই হয়েছিল। পনের দিন পরই নিবারণ এসেছিল তার কাছে। বলেছিল, গোকুলদা তুমি তো একদিন ওকে—

কথা শেষ করতে পারে নি নিবারণ। শুধু তার কাতর দুটো চোখে অনুনয়ের দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল।

কিন্তু গোকুল কোন মতামত না দিতেই একদিন নিবারণকে সঙ্গে করে সুনয়নী চলে এল কাঠগড়ে। গোকুলের ভাবলেশহীন পাথরের মত মুখের দিকে জলভরা দুটো চোখের দৃষ্টি তুলে ধরে সুনয়নী বলল, তাড়িয়ে দিয়ো না গোকুলদা। নিবারণের ওখানে থাকলে না খেয়েই মরে যাব। ওর ছেলেমেয়েরাই ভাল করে খেতে পায় না।

না। তাড়িয়ে দেয় নি তাকে গোকুল। অপমানের সেই প্রতিহিংসার জ্বালায় তার দরদী মন সুনয়নীর ওপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে নি।

এক একটা করে দিন কেটে যায়। গোকুলের চেতনার ওপরে সুনয়নীর অস্তিত্বটা একটা অসহ্য ভারী বোঝার মত চেপে থাকে সব সময়। ভাবে আপদটাকে দূর করে দেবে তার দাদার কাছে।

রাতের খাওয়া শেষ করেই ঘরের বাইরে নদীর ধারে জাল শুকনোর বাঁশের মাচার ওপর শুতে গেল গোকুল। অন্ধকারে একটা কালো ছায়ামূর্তির মত নিঃশব্দে সুনয়নী তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখের কোণায় কোণায় জল চিকচিক করছে। গোকুলের একটা হাত ধরে বলল, তুমি এমন করলে আমি কোথায় যাই বল তো? সারাদিন মুখ ভার করে থাক। একটা কথা বল না। গোকুলদা—

কেন এসেছিস আমার কাছে? যা, ঘরে গিয়ে ঘুমো।— *

কঠিন গোয়াল [গোকুলের গলায় স্বর। হাত ছাড়িয়ে নিল সে।

রাগে দুঃখে অপমানে সুনয়নী যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। ধীর পায়ে ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

কাষ্ঠগড় দহের জল গভীর রাত্রির কালো অন্ধকার বুকে নিয়ে ছলাৎ ছলাৎ করে দুলছে। ঘুম নেই গোকুলের চোখে। সুনয়নীর কান্নাকরুণ মুখখানা বারবার তার মনের ভেতরে ভেসে উঠছে। নিঃশব্দ পায়ে সে তার কুঁড়েঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল। কেরোসিনের কুপির ছায়াকাঁপা আলোয় দেখল ঘুমন্ত সুনয়নীর দুই গালে চোখের জলের জমাট চিহ্ন। ক্ষীণ আলোয় মানুষ যেমন করে পুঁথি পড়ে তেমনই করে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে গোকুল কী যেন দেখতে লাগল। সত্যি সত্যিই কি ওর বুকে তার জন্য কোন মমতা রয়েছে? কেন এমন করে তাকে ভালবাসতে চেষ্টা করছে সুনয়নী! তবে কি সুদূর বাল্যকালের সেই প্রেম আজও ওর মন থেকে নিঃশেষে মুছে যায় নি?

কিন্তু কোথায় ছিল—কোথায় ছিল চার বছর আগে যাত্রাদলের একটা বেকার ছোকরার জন্য তার মনের এই উদগ্র ও অবারিত প্রেম? তার যদি টাকা না থাকত, তা হলে আসত সুনয়নী, এমন করে ভালবাসত! ঘরের বাইরে এল গোকুল। নদীর জলো হাওয়ায় বুক ভরে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সে ভাবে, যে দুনিয়ায় ভালবাসাও টাকার মূল্যে কিনতে হয়, সেই পোড়া দুনিয়ায় এসে সে কাউকে ভালবাসবে না। না, কারো সেবা স্নেহ ও ভালবাসার প্রয়োজন নেই তার জীবনে। দূরে আত্রাইয়ের ওপর ব্রীজের গায়ে মিটিমিটি আলোগুলোকে যেন নিষ্ঠুর এই সংসারের হিংস্র এক একটা ভ্রূকুটির মত মনে হয় তার।

কিন্তু আবার এক এক সময় সুনয়নীর স্বাস্থ্যপুষ্ট শরীরের সমুজ্জ্বল যৌবনশ্রীর দিকে তাকিয়ে তার সব ক্রোধ মুহূর্তে নিভে যায়। কাছে ডেকে আদুরে গলায় বলে, ছেঁড়া থানকাপড় পরেছিস কেন রে সুনো? ঘন রঙের নীলাম্বরী শাড়ি পরতে পারিস না, পরলে কিন্তু তোকে একেবারে সেই নৌকোবিলাস পালার অভিসারিণী শ্রীরাধিকার মত দেখাবে।

আমি যে বিধবা গোকুলদা!

ও!—ব্যথার ছায়া পড়ে গোকুলের সরল মুখখানার ওপরে। আবার বলে, বিধবা হয়েছিস তাতে কি? আমি বলছি তুই পরবি।

তুমি পরতে বলছ?—স্বপ্ন নেমে আসে বৈধব্যের হতাশাভরা দুটো চোখে।

শুধু নীলাম্বরী নয়, স্নো-পাউডার পর্যন্ত কিনে নিয়ে এল গোকুল। সুনয়নীর মুখে স্নিগ্ধ একটা হাসির আভা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

গভীর রাত্রির নিরালায় তন্বী দেহে নীল শাড়ি পেঁচিয়ে বিচিত্র সাজে সেজে গোকুলের কাছে এল সুনয়নী। পানের রসে রাঙা ঠোঁটে ঝিলিমিলি হাসি ফুটিয়ে বলল, ওগো, অমন পাথরের মত বসে আছ কেন? চেয়ে দেখ তো, সত্যিই কি আমাকে নৌকোবিলাসের শ্রীরাধিকার মত দেখতে লাগছে?

কোন কথা বলল না গোকুল। বিচিত্র একটা উদাসীনতায় ছেয়ে গিয়েছে তার মুখখানা। নিরুত্তাপ চোখে সুনয়নীর দিকে তাকিয়ে বলল, তুই ঘুমো সুনো। আমাকে এখুনি একবার চটকায় যেতে হবে।—বলেই সঙ্গে সঙ্গে সে নদীর দিকে চলে গেল।

তীব্র একটা বিস্ময়ের আঘাতে চমকে উঠল সুনয়নী। হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মত তার মনে হল, তাকে শুধু অপমান করার জন্যেই গোকুল এই শাড়ি-স্নো-পাউডার দিয়েছে। তার গায়ে জড়ানো শাড়িতে কে যেন রাশি রাশি আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিয়েছে। অসহ্য যন্ত্রণায় কপালটা টিপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

তারপর আবার দিন, আবার সন্ধ্যা। সুনয়নী লক্ষ্য করল, গোকুল তাকে খাইয়ে-পরিয়ে পরম সুখে রাখছে, কিন্তু তার প্রতিদানে তাকে ভালবাসতে গেলেই গোকুল কেমন নিষ্ঠুর ও নির্মম হয়ে ওঠে। আশ্চর্য! গোকুলকে সে বুঝতে পারে না।

কিন্তু দিনের পর দিন গোকুলের নির্বিকার উদাসীনতা সুনয়নীর অসহ্য হয়ে ওঠে। অপমান! তার যৌবনের অপমান, নারীত্বের অপমান!

কাঠগড়ের অতল কালো জল দুলে দুলে তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। সেই অন্ধ রাক্ষসটা তার বুকের ভেতরে ফুঁসে ওঠে। তবে—তবে কি সে মরবে? কিন্তু—কিন্তু মৃত্যু যে মনের কোথাও বাসা বাঁধে নি!

ইতিমধ্যে একদিন কাঠগড় গ্রামের মাতব্বর সুরেন মণ্ডল গোকুলকে বলে গেল, সোমত্ত বয়েসের বিধবাটাকে কাছে রেখেছ। ওকে নিকে করে ফেল না। তোমার টাকা আছে বলে লোকে ভয়ে কিছু বলছে না। অন্য কেউ হলে এতদিন—

হ্যাঁ মণ্ডলমশাই, নিকেটা সেরে ফেলব।

বারে বারে অপমানিত হলেও সুনয়নীর মনের কোণে একটা রঙিন আশা উকিঝুকি দেয়। একদিন রাত্রে সে লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই বলল, নিকে কর গোকুলদা। আর কতদিন—কতদিন এভাবে থাকব?—তার চোখের কোণায় জল এসে পড়ল।

এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন রে। হবে, সব হবে।—গোকুল বলে।

হবে!—যেন এমন বিচিত্র কথা সুনয়নী জীবনে শোনে নি। তার চোখ দুটো স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। সুনয়নীর করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে গোকুলের মনটা অনুশোচনায় ছেয়ে যায়। বলে, তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি না রে সুনো?—গোকুলের কথায় স্নেহের স্পর্শে হুহু করে উঠল সুনয়নীর বুকের ভেতরটা। সে অঝোর কান্নায় ভেঙে পড়ল গোকুলের বুকের ভেতরে।

কাঁদিস না সুনো। আমি তো বলেছি, নিকে করব। এই কুঁড়েঘরটা ভেঙে একটা ভাল টিনের ঘর বানিয়ে নিই আগে। বর্ষা আসছে। এই ঘরে তো আর থাকা যাবে না।

কথা নয়—সুনয়নীর মনে হল, সে যেন গান শুনছে।

সত্যি সত্যি পরদিন থেকেই গোকুল ঘর তৈরির জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বসন্তাহার গ্রাম থেকে আনে বাঁশ, মাটি কাটতে থাকে কাঠগড়ের ঘাট থেকে। ছোকরা মাঝি বলাই বিস্মিত হয়, চটকার দিকে আর লক্ষ্য নেই গোকুলের। নির্জন এই শ্মশানের ধোঁয়া অন্ধকার আর ছাইয়ের ভেতরেই সুনয়নীকে নিয়ে নতুন একটা জীবনের জয়পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার বাসনা তাকে আকুল করে তুলেছে।

কয়েক দিন পর।

কাঠগড়ের চারিদিকে নিশি রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে। সেদিনও রাত্রে সুনয়নীর উচ্ছ্বসিত ভালবাসার মত্ত আবেগে অবশ হয়ে গিয়েছিল গোকুলের চেতনা। গোকুলের বিশাল বুকে মাথা রেখে ফিসফিস করে বলছিল সুনয়নী, সব সময় বুকের ভেতরটা কেবল কাঁপে, কেমন যেন ভয় ভয় করে। কেন বল তো?

ভয় কিসের? কথা তো দিয়েছি নিকে করব বলে।

ঠিক তো?

ঠিক।

বলো হরি—হরি বোল!—হঠাৎ গভীর রাত্রির স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে একটা উচ্চকিত হরিধ্বনি ভেসে এল। আর শোনা গেল একটা বুকফাটা কান্নার দীর্ঘ করুণ বিলাপ।

থরথর করে কেঁপে উঠল গোকুল। সুনয়নীর নিবিড় কবোষ্ণ প্রেমে অবসন্ন গোকুলের চেতনার ভেতরে যেন তীক্ষ্ণ বিষাক্ত তীরের মত বিঁধে গেল সেই হরিধ্বনি আর কান্নার শব্দটা।

আবার কে সাবাড় হল! আমি একটু দেখে আসি সুনো, তুই ঘুমিয়ে পড়্।—ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল গোকুল।

নদীর ধারে এসে দেখল, শ্মশানে কার একটা চিতা জ্বলছে দাউ দাউ করে। অল্পবয়সী বউ ডুকরে ডুকরে কাঁদছে আর বলছে, ওগো, আমার কী সব্বোনাশ করে গেলে গো! কী নিয়ে বাঁচব—কেমন করে আমার চলবে!

কেমন করে চলবে! বিষণ্ণ একটা হাসির রেখা ফুটল গোকুলের মুখে। স্বামী মরে যাওয়ার জন্য দুঃখ নয় কেমন করে চলবে—সেই আতঙ্কেই ওর কান্না উত্তরোল হয়ে উঠেছে। এই তো সংসার! এখানে নিঃস্বার্থে কেউ কাউকে ভালবাসে না। স্বামী-স্ত্রীর আপাতমধুর সম্বন্ধের আড়ালেও কী নির্মম স্বার্থপরতা লুকিয়ে আছে শানিত হয়ে!

দূরে শ্মশানে চিতার লকলকে আগুন, কালো অন্ধকারে

মোড়া সুদূর দিগন্ত আর মাথার ওপরে রাশি রাশি তারায় ভরা বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য একটা নির্লিপ্ততা অনুভব করল গোকুল। কী হবে, কী লাভ—নিষ্ঠুর স্বার্থ, হিংস্র লোভ আর হিংসা দিয়ে ঘেরা সংসারের মিথ্যা মায়ামমতায় জড়িয়ে গিয়ে? তার চেয়ে বরং সে উদার মুক্ত নিঃসঙ্গ জীবনের আনন্দ-বেদনা নিয়ে পরম সুখে আছে।

কিন্তু সুনয়নীর সুন্দর মুখচ্ছবি চকিতে তার চোখের সামনে ভেসে উঠতেই তীক্ষ্ণ একটা অস্বস্তিতে যেন ছিঁড়ে গেল তার বুকটা। হাস্যে-লাস্যে টলোমলো সুনয়নীর উজ্জ্বল মূর্তিটা তার মনের ভেতরে দাঁড়িয়ে যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। একদিকে ওই যৌবনবতী নারী, আর একদিকে তার বন্ধনহীন একক জীবনের দুর্বার মোহ—দুটো শক্তি যেন তাকে দু দিক থেকে টানতে লাগল। নদীর পাড়ের সেই হুহু করা জলো হাওয়ায় দাঁড়িয়েও ঘেমে উঠল গোকুল।

অনেক—অনেকদিন পার হয়ে গেছে তারপরে। কাষ্ঠগড়ের সেই ভুতুড়ে বটগাছের নীচে গোকুলের কুঁড়েঘর আর নেই। সেখানে সে চকচকে টিনের মস্ত এক বাড়ি তুলেছে। চাকর-বাকর, ছেলেপুলে নিয়ে বিরাট এক সংসারের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী সুনয়নী। অদূরে ঘোষপাড়ার মেয়ে-বউরা তার উপরে হিংসায় জলেপুড়ে মরে। বলে, গোকুলের মত এমন করে বউকে কেউ ভালবাসে না। বাব্বা, বউ যেন আর কারও নেই! গোকুলের বুকের ভেতরে প্রাণের ধুকধুকির চেয়েও প্রিয় তার সুনয়নী। সময় সময় সুনয়নীর নিজেরই খুব আশ্চর্য লাগে তার সৌভাগ্য দেখে। গোকুলের আদরে ভালবাসায় রোমাঞ্চিত হয়ে সে প্রায়ই বলে, তুমি যে কেবলই গয়না গড়িয়ে দিচ্ছ, কিছু নগদ টাকা ঘরে রাখা ভাল নয় কি? আপদে বিপদে—

নগদ টাকার চেয়ে সোনা রাখার অনেক সুবিধে আছে সুনো।

বাইরে মুষলধারে বৃষ্টির একটানা আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সুনয়নীর। ঘরের চাল ফুটো হয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে মেঝেয়। কোথায় তার চকমিলানো টিনের বাড়ি আর কোথায় কি—কিছু না! মুহূর্তে ধক করে উঠল তার বুকের ভেতরটা। কোথায় গেল গোকুল? হয়তো গোকুল বৃষ্টিতে উজিয়ে-ওঠা মাছ ধরতে গেছে, হয়তো তার চটকাতে গেছে। এখুনি নিশ্চয়ই এসে পড়বে। প্রতিটি মুহূর্তকে তার মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘ এক একটা যুগ। আর ধৈর্য রাখতে পারল না সুনয়নী।

ঝাঁপের দরজা খুলে বাইরে এল সে। আকাশ গর্জাচ্ছে। বাতাস গর্জাচ্ছে। একটা বদ্ধ উন্মাদিনীর মত সেই দুর্যোগ মাথায় করে সুনয়নী গেল নদীর দিকে। বিদ্যুতের সাদা আলোয় দেখল, আত্রাইয়ের জল ফুলে ফুলে উঠছে অজগর গর্জনে।

কিন্তু দহের কাছে কাছে চটকার কোন চিহ্ন নেই। তার চারটে বাঁশের ভেতরে একটা বাঁশেরও অস্তিত্ব নেই কোথাও। শুধু তাই নয়, গোকুলের বড় প্রিয় সেই ছিপ নৌকোটাকেও কোথাও দেখতে পেল না সুনয়নী। চিৎকার করে ডাকল সে, গোকুলদা—গোকুলদা। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজটা বিক্ষুব্ধ বাতাসের গর্জনের ভেতরে তলিয়ে গেল।

অসহায় একটা জন্তুর মত বৃষ্টিতে ভিজে সপসপে হয়ে টলতে টলতে সুনয়নী ঘরে এল। কুপিটা জ্বালাতেই তার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেল।

না। গোকুল ফিরে আসে নি। কিন্তু চার বছর ধরে তার একটানা পরিশ্রমের সেই রূপোলী ফসল—যা সে চরম ঘৃণা করত—সেই কাঁচা টাকা আর নোটে ভরা ছোট কলসীটা ঘরের এক কোণে বসানো রয়েছে। সেই সর্বনাশের মুহূর্তেও সুনয়নীর মনে পড়ল, ওই টাকার জন্যই গোকুল একদিন তার বাবার কাছে, তার কাছে অপমানিত হয়েছিল। আবার কপালের সিঁদুর মুছে, একেবারে পথের কাঙাল হয়ে, যে জন্য সে গোকুলের কাছে এসেছিল, সেই টাকাই তো সে তাকে দিয়ে গেছে। বাইরের আকাশের মতই তার মনের ভেতরে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল—না গোকুলকে সে তো চায় নি কোনদিন! টাকার পাত্রটা লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দিয়ে তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়ল সুনয়নী।

বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্য

সন্তোষকুমার দে

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় কুশলী জীবিত শিল্পীদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য 'হাসির ভগীরথ' পরশুরাম। পরশুরামের রচনার বৈশিষ্ট্য নানাভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'পরশুরাম' নামের পশ্চাতের মানুষটি স্বল্পবাক্ স্থিতধী রাজশেখর বসু মূলতঃ রসায়ন-বিজ্ঞানী; বিজ্ঞানচর্চা তাঁর দীর্ঘদিনের কর্মজীবনের সঙ্গে মিশে তাঁকে এক বিরাট কর্মযোগীতে পরিণত করেছিল। তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য এবং বেঙ্গল কেমিক্যালের পরিচালকরূপে আচার্যদেবের সহকর্মী। এই বিরাট কর্মযজ্ঞশালাতেও রাজশেখরের সব কর্মোদ্যম ফুরিয়ে যায় নি। তিনি আভিধানিক; বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিধান 'চলন্তিকা'র সংকলক। তিনি শ্রেষ্ঠ অনুবাদক এবং প্রাবন্ধিক। এত গুণসম্পন্ন কর্মী ব্যক্তিও যখন ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন বুঝতে হবে কর্মের একটা স্বাভাবিক সীমা আছে এবং তাই বিশেষ কর্মপ্রবণ চিত্ত শিল্পের মাধ্যমে আপনাকে প্রকাশ করে। বস্তুতঃ দেখা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিকদের অনেকেই বিশেষ কর্মকুশলী ব্যক্তি ছিলেন। যেমন ভলটেয়ার, সুইফট প্রভৃতি। ভলটেয়ার একজন কৃতী ব্যবসায়ী ছিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যালের মত বৃহৎ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় রাজশেখর যে অতুলনীয় কৃতিত্ব ও কর্মকুশলতা দেখিয়েছেন তাতে তাঁকে কেবল ভলটেয়ারের সঙ্গেই তুলনা করা যায়।

পরশুরামের "শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড", "বিরিঞ্চি বাবা", "স্বয়ম্বরা" প্রভৃতি গল্প, এমন কি তাঁর গ্রন্থের ব্যঙ্গ চিত্রগুলিও চিরপরিচিত। অয়, ঢানতি পার না, ঠোঁটের সিঁদুর, শ্রীশ্রীদুর্গাঅটোগ্রাফ, মাই ঘড্, প্রভৃতি কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। লেখকের জীবিতকালেই তাঁর রচনা ক্লাসিকের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার দৃষ্টান্ত বোধ হয় একমাত্র পরশুরামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর গড্ডলিকা, কজ্জলি, হনুমানের স্বপ্ন, ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প প্রভৃতি রসরচনা গ্রন্থ তাঁর চলন্তিকা অপেক্ষা কোন অংশেই কম মূল্যবান কিংবা কম জনপ্রিয় নয়। তিনি 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' এবং 'আকাদামি পুরস্কার'ও পেয়েছেন তাঁর রসরচনার জন্য। ব্যঙ্গরচনার গৌরব তাতে বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে পাকিস্তান তোষণের বিষময় ফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে পরশুরাম বিদ্রূপ-কুঠার হেনেছেন তাঁর "ভীম গীতা" গল্পে। এর তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ব্যঞ্জনা অন্ধকেও চক্ষুষ্মান্ করে।

পরশুরামের সমসাময়িক আর একজন প্রাচীন ব্যঙ্গ-সাহিত্যিক হলেন নরেন্দ্রনাথ বসু। 'রসরাজ বর্মা' ছদ্মনামে তিনি "খেয়াল খাতা" পর্যায়ে অনেক সাময়িক বিষয়ের উপর চমৎকার টীকা-টিপ্পনী লিখতেন। স্বনামে তাঁর লেখা 'ষড় অবতার' গ্রন্থখানি ১৩২১ সালে, পরশুরামের গড্ডলিকা প্রকাশেরও পাঁচ বৎসর পূর্বে, প্রকাশিত হয়ে জনসমাদৃত হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য, নরেন্দ্রনাথও পরশুরামের বিখ্যাত উৎকেন্দ্র সমিতির একজন সদস্য ছিলেন এবং 'ষড় অবতার' গ্রন্থেই বাংলার সর্বজনপরিচিত শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা ব্যঙ্গচিত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। যতীন্দ্রকুমার 'নারদ' ছদ্মনামে পরে পরশুরামের ব্যঙ্গরচনার চিত্র সম্পাদন করতে শুরু করেন। ষড় অবতার গ্রন্থ থেকে একটি গল্প নিয়ে নির্বাক যুগে একটি হাসির ছবিও তোলা হয়েছিল। সাহিত্যিক-সমাজে নরেন্দ্রনাথ 'রবিবাসরে'র সর্বজনপ্রিয় সম্পাদক হিসাবেই সবিশেষ পরিচিত; তাঁর 'রসরাজ বর্মা' রূপটি লোকে ভুলতে বসেছে। তাঁর ষড় অবতার এখনই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, 'খেয়ালখাতা'র অনেক রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে এখনও সমাদৃত হতে পারে।

আর একজন ব্যঙ্গরসিক বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'সিরাজের পিয়ালা', 'দশচক্র' প্রভৃতি অবিস্মরণীয়। উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিও ব্যঙ্গ-রসের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কাজি নজরুল ইসলামের কাব্যেও অনেক ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতা আছে।

মলিনীকান্ত সরকারের হাসির গান, শরৎচন্দ্র পণ্ডিত বা দাঠাকুরের রঙ্গরসও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শরৎ পণ্ডিতের 'বোতল' পত্রিকাখানি বাংলা সংবাদ-সাহিত্যে অপূর্ব ব্যঙ্গ-রস সৃষ্টি করেছিল।

অতি অল্প সময়ে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন—'অবধূত'। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী ও উপন্যাসের মধ্যে, বিশেষ করে ছোটগল্পে ব্যঙ্গরসের অভাব নেই। তাঁর ভম্বা দা, কৈচরের বামুন পিসী এক-একটি অপূর্ব রসাল চরিত্র।

৩

"সাধারণত দেখা যায়, কোন একটা আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত যুগের অবসান কালেই ব্যঙ্গের প্রাদুর্ভাবের সময়।" যেমন ইউরোপে রেনেসাঁসের ক্ষয়িত প্রভাবের যুগে সুইফট বা ভলটেয়ার, বাংলায় তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রেমোন্মাদনার পর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গশিল্পেও যেন কোটালের বান ডেকেছিল। 'শনিবারের চিঠি', 'রবিবারের লাঠি', 'সচিত্র ভারত' প্রভৃতি ব্যঙ্গরসাত্মক পত্রিকার জন্ম এই সময়ে। 'শনিবারের চিঠি' কালক্রমে বিশুদ্ধ সাহিত্য পত্রিকায় পরিণত হলেও এখনও তার "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগটির তির্যক্ দৃষ্টি ঘোচে নি। 'শনিবারের চিঠি' বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসাত্মক পত্রিকা হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করতেও অকুতোভয় সম্পাদক সজনীকান্ত কসুর করেন নি। সজনীকান্ত কবি, সজনীকান্ত প্রাবন্ধিক, সজনীকান্ত সাংবাদিক, কিন্তু ব্যঙ্গশিল্পী সজনীকান্তই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়। তিনি সব্যসাচীর মত দু হাতে সমান ভাবে অস্ত্র চালনা করেছেন, তার অন্তরঙ্গ পরিচয় জানা যায় তাঁর সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে। 'শনিবারের চিঠি'কে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় তার মধ্যে বোধ হয় একমাত্র পরশুরাম ব্যতীত বর্তমান বাংলার আর প্রায় অধিকাংশ ব্যঙ্গশিল্পীকেই পাওয়া যায়। স্বয়ং সজনীকান্ত মধ্যমণি। পরিমল গোস্বামী, প্রমথনাথ বিশী (প্র. না. বি.) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (চন্দ্রহাস), মধুকর কাঞ্জিলাল (অশোক চট্টোপাধ্যায়), বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অজিতকৃষ্ণ বসু প্রভৃতির নাম এই গোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখ করা যায়। এর প্রায় সবাই ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় প্রসিদ্ধ, তবে বনফুল ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ঔপন্যাসিক পরিচয় অন্য পরিচয় ছাপিয়ে উঠেছে। এই গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিশাল সাহিত্যের মধ্যে ব্যঙ্গরসাশ্রিত রচনাও আছে।

'শনিবারের চিঠি' লেখকদের মধ্যে অসাধুতা পাপ স্খালনের জন্য যে সম্মার্জনী হাতে নিয়েছিলেন তা আজও হাতছাড়া করেন নি।

'শনিবারের চিঠি'র পরে 'বেপরোয়া' 'পাহারা' 'খাপ-ছাড়া' প্রভৃতি আরও দু-একটি ব্যঙ্গরসাশ্রিত পত্রিকা বেরিয়েছে, আবার বন্ধ হয়েছে। এখনও চলছে 'সচিত্র ভারত' আর ভাঙা বাংলার রঙ্গব্যঙ্গের একমাত্র পত্রিকা 'ষষ্টিমধু'। এর সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, অনুবাদক এবং পরিব্রাজক। তাঁর আর একটি পরিচয়—তিনিও ভলটেয়ারের মত ব্যবসায়ী। লোহালক্কড় যন্ত্রপাতির ব্যবসায়ে তিনি স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর সুযোগ্য পুত্র রূপেও আত্মপ্রতিষ্ঠ। এজন্য আশা করা যায়, তিনিও ব্যঙ্গরচনার ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে পারবেন।

কুমারেশ ঘোষ 'ষষ্টিমধু' পত্রিকায় শুধু বহু ব্যঙ্গশিল্পীকে জমায়েত করেই ক্ষান্ত হন নি, সম্প্রতি 'সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা' নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করে ৯৫ জন জীবিত বাঙালী কবির ব্যঙ্গকবিতা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ভারতচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের আমল থেকে শুরু হয়ে ব্যঙ্গকবিতার ধারাটি আজও বঙ্গ সাহিত্যে প্রবহমান আছে এবং এখনও বহু কবি ব্যঙ্গকবিতা লিখে থাকেন—এই গ্রন্থটি তা প্রমাণ করেছে। কবিতায় একটি হালকা চটুল রঙ্গরসের আবহাওয়া এনেছিলেন 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে বিদুষী কবি রাধারাণী দেবী—তাঁর 'বুকের বীণা', 'আঙিনার ফুল' প্রভৃতি কাব্যে। তবে কবিতাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মুখ্য বাহন রূপে গ্রহণ করে এ যুগে যিনি একক প্রচেষ্টা করেছেন তিনি হলেন—অ. কৃ. ব.। ছড়ায় তাঁর অতি মিষ্টি হাত, মেজাজ তাঁর জাত-কবির। নির্ভুল ছন্দে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। তাঁর সঙ্গে মিশেছে তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনায় বিদেশী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা। ফলে তাঁর 'পাগলা-গারদের কবিতা' এবং 'নেতে তেরি তোম' একাধারে কাব্য আবার শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপ। এই ক্ষেত্রে তিনি অনন্যসাধারণ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

'পাগলা-গারদের কবিতা'র একটু নমুনা শোনাই—

খাঁটি কথা
কিংশুক-মঞ্জরী দিয়ে কেমনে করিবি তুই জয়
হিংস্রকের হিংসুটে হৃদয় ?
চন্দন-গন্ধেরে হায় নর্দমা দুর্দম করে ভয়।
"পঙ্কেই পঙ্কজ শোভে" যতই বলিস করে ঘটা,
পঙ্কজের 'পরে তবু পঙ্ক যে রে চিরদিন চটা॥
ইত্যাদি

অথবা

উপদেশামৃত
ঘোড়া ডিঙাইয়া জ্ঞানী ঘাস নাহি খায়
[illegible]।

দধীচি হইতে গেলে পাইবে না বধি
গদা না থাকিলে পিছে মাছি মিলে যদি।
শকুনির শাপে আহা গরু নাহি মরে,
মাঝে মাঝে কাঁপে তবু শকুনির ডরে।
যতই বাহার দিক দেওয়ালির আলো
পিছনে তাহার জেনো অন্ধকার কালো।
জীবন দাবার ছক; তাই কোরো দাবী
"তালা যদি মেলে, সাথে মেলে যেন চাবি॥

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গশিল্পের প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা যায়। বর্তমানের সদাব্যস্ত জীবনে গভীর-গম্ভীর বিষয়ে মন নিবিষ্ট করা অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। সাম্প্রতিক কালে রম্যরচনা নামে যে হালকা রসের ও হালকা মেজাজের রচনার প্রবর্তন হয়েছে তা সহজেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছে। রম্যরচনার এই প্রাদুর্ভাব অনেকটা রেনেসাঁস-পরবর্তী যুগের ভলটেয়ারের আবির্ভাবের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র যে বাংলা গদ্য সৃষ্টি করেছিলেন. রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে কিছুকাল তারই অনুশীলন চলেছিল। অবশ্য 'সবুজ পত্রে'র মাধ্যমে বীরবলের প্রবর্তিত চলতি ভাষায় লেখার পুরোধাও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। গদ্য-কবিতার মত অত্যন্ত বেগবান—শেষের কবিতায় 'ফজলীতরো আম' কিংবা কাব্যে 'ইংরেজিতরো গন্ধ'—

(লোকটি কে ইনি যেন চিনি চিনি
বাঙালি মুখের ছন্দ
ধরণে-ধারণে অতি অকারণে
ইংরেজিতরো গন্ধ।)

ব্যবহার রবীন্দ্রনাথই করে গিয়েছিলেন, তবু রচনায় একটা বাঙ্‌ময় প্রাঞ্জলতা এবং অসঙ্কোচে তাবৎ বিদেশী ভাষার সংমিশ্রণ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের নিকট-সাহচর্যে থেকে মানুষ সৈয়দ মুজতবা আলি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করলেন—বাংলা গদ্যের রচনারীতিতে একটা নতুন গতিময় প্রাণময় বেগ সঞ্চার করলেন তিনি তাঁর 'দেশে বিদেশে' গ্রন্থে। রম্যরচনার শ্রেষ্ঠ শিল্পী মুজতবার হাতে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ভাষাই যেন নিতান্ত আটপৌরে পোশাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হয়ে দেখা দিল। কিন্তু এই সহজ প্রাঞ্জল লেখা পড়বার সময় বোঝাই যায় না, মুজতবাকে কত পরিশ্রম করে কত দেশের কত সাহিত্য কত ইতিহাস কত রাজনীতি পড়তে হয়েছে এবং আরও কত পরিশ্রম করতে হয়েছে সেই গোড়ার পরিশ্রমটা ঢাকবার জন্ত। ভলটেয়ারের সরল স্বচ্ছ রচনাশৈলীর প্রশংসা করলে তিনি নাকি বলেছিলেন, "ফরাসী জাতটা কি আর জানে তাঁদের কষ্ট বাঁচাবার জন্ত আমি নিজে কতটা কষ্ট স্বীকার করি।" কথাটা মুজতবার বিষয়েও প্রযোজ্য এবং বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি না করে বলা চলে—এ কথা বরং মুজতবার পক্ষেও অবশ্য প্রযোজ্য। তাঁর হাতের মিষ্টি বাংলা রচনা সংস্কৃত আরবি ফার্সী জার্মান ফরাসি ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষার আশীর্বাদ বহন করে এনেছে।

মুজতবার রচনায় ব্যঙ্গরস আছেই, শ্লেষও দুর্লভ নয়। তাঁর "মার্জার নিধন কাব্য" (পঞ্চতন্ত্র) এক অপূর্ব সৃষ্টি।

'রূপদর্শী' মুজতবার আশীর্বাদ পেয়ে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন।

Pun-প্রবণ শিবরাম চক্রবর্তীর অধিকাংশ রচনাই ব্যঙ্গরসাশ্রয়ী, তাতেও বিদ্রূপের বিদ্যুৎ-ঝলক ক্ষণে ক্ষণে দেখা যায়। 'নীলকণ্ঠ' এই ক্ষেত্রে অল্পদিনে সুনাম অর্জন করেছেন। 'বিরূপাক্ষ' তাঁর ঝঞ্চাটের কথা শোনাতে শোনাতে অনেক শাণিত বাণও নিক্ষেপ করেন। নন্দগোপাল সেনগুপ্তের ব্যঙ্গরচনা সংখ্যায় কম, কিন্তু চমৎকার।

'আনন্দবাজারে'র কমলাকান্তের মত আর এক অতন্দ্র নিয়মিত ব্যঙ্গরসসাধক হলেন যুগান্তরের 'এক-কলমী'। পরিমল গোস্বামীর পরিশীলিত মনের ব্যঙ্গরসের পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের কাছে 'এক-কলমী'র "ইতস্ততঃ" ভাল লাগবে। তবে তাতে ব্যঙ্গের শান্তরস প্রধান—তীব্রতা কম।

প্র. না. বি. ব্যঙ্গশিল্পের উদ্ভবের কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: সময়ের গুণ ও ব্যক্তির বিশেষ গুণের সমন্বয়ের ফলেই ব্যঙ্গশিল্পের তথা সমস্ত শিল্পেরই উদ্ভব হইয়া থাকে। মানুষের সমাজে এক-একটা যুগ আসে যাহা ব্যঙ্গরচনার অনুকূল। ইউরোপের অষ্টাদশ শতক ছিল এই রকম একটা যুগ। এই যুগাধিনায়ক ভলটেয়ার ও সুইফট। সে যুগে কবির অভাব ছিল না, কিন্তু ব্যঙ্গই ছিল তখনকার প্রধান শিল্প। ব্যঙ্গ এবং ইতিহাস। এ দুই যতই ভিন্ন শাখাশ্রয়ী হোক না কেন, এক জায়গায় মিল আছে। দুইয়েরই অন্যতম মূল উপাদান সংশয় ও নাস্তিক্য। আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ স্যাটায়ার ও শ্রেষ্ঠ ইতিহাস একই শাখার ফল, একই রসে পুষ্ট।

যে সামাজিক অবস্থায় স্যাটায়ার পুষ্ট হয়, বস্তুতঃ সেই সামাজিক অবস্থার ইতিহাসও প্রণিধানযোগ্য হয়। সাম্প্রতিক কালে সুয়েজ খাল ঘটিত ব্যাপারে নাসেরের অনমিত মনোভাব এবং ইংরেজের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ায় যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের প্রয়োজন ঘটে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সকল দেশের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লেখনী ও তুলি এক সঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, ঐতিহাসিকগণও ইতিহাসের একটা সম্পূর্ণ অধ্যায় লিখতে বসলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, ব্যঙ্গরচনার মত শ্লেষাত্মক চিত্রও কম ভাবব্যঞ্জক নয়। সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র

সমূহে যে সব কার্টুন-চিত্র অঙ্কিত হয় তাতেও স্যাটায়ারের লক্ষণ অতি স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। বিশ্ববিখ্যাত কার্টুনিস্ট লো (Low) নিঃসন্দেহে একজন প্রথম শ্রেণীর স্যাটায়ারিস্ট। বাংলা সাংবাদিক জগতে 'কাফী খাঁ' এবং রেবতীভূষণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয়েই সুলেখকও বটে, রেবতী ব্যঙ্গচিত্রের মত রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাণিত ভাষায় ছড়াও লেখেন। ব্যঙ্গচিত্রকার কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ী একাধারে চিত্রশিল্পী এবং সাংবাদিক। ব্যঙ্গরচনার এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য চিত্র ও সাংবাদিকতা পিছিয়ে নেই।

স্যাটায়ার অন্যান্য ব্যঙ্গশিল্পের মতই উদ্দেশ্যমূলক এবং সাহিত্যের উচ্চ কোটির আসনে দাবিদার। কিন্তু স্যাটায়ার কখনই উচ্চতম শ্রেণীর সাহিত্য হিসাবে গণ্য হয় না। স্যাটায়ারিস্ট সাহিত্যিক তাই কোন-দিনই কোন দেশে কোন কালে শেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথের পর্যায়ে উঠতে পারেন না। স্যাটায়ারিস্টের চোখ যেন আজন্ম ট্যারা, তাঁর চোখে জগতের কল্যাণরূপ সহজে ধরা পড়ে না, সবই একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে ও দেখাতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাই সাময়িক প্রচেষ্টায় গোটে বা রবীন্দ্রনাথ স্যাটায়ার রচনা করলেও তাঁরা তেমন সফল হতে পারেন নি, শেলী ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এই কারণেই স্যাটায়ার রচনায় ব্যর্থ হয়েছেন।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, বাংলা সাহিত্যের মেজাজটাই একটু তির্যক্ গতিতে চলেছে মনে হয়। রম্যরচনার আত্যন্তিক সমাদর তার একটা পরিচয়। যে ভাষায় আমাদের লেখকেরা এখন ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন বা উপন্যাস রচনা করেন সেটার সুরেও বুঝি স্যাটায়ারের খাদ মেশানো। উদাহরণস্বরূপ মনোজ বসুর নতুন উপন্যাস 'আমার ফাঁসি হল' থেকে একটু তুলে দিচ্ছি :

"আমার ফাঁসি হল। রাত তিনটে, জীবন-কাহিনী লিখছি। যে দিব্যি করতে বলবেন, রাজি আছি। সত্যি সত্যি ফাঁসিতে ঝুলেছিলাম আমি। সেই থেকে এক মজার অবস্থা। দিনমানে আপনাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াই জীবন্ত নরমূর্তিতে। হাসি পায়, ছদ্মবেশ কেউ কখনও বুঝতে পারেন না। এবং আমি একা নই, আমার মত আরও কতজন আছেন। আপনাদের ভাই ব্রাদার, আত্মীয়বন্ধু। টের পেলে আঁৎকে উঠবেন।..."

উপন্যাসখানির ভিতরের ভাষার মধ্যে "ভাই ব্রাদারের" মত ব্যঙ্গও অবলীলায় গলাগলি হয়ে আছে।

বাংলা শিশুসাহিত্যে ব্যঙ্গরসাত্মক রচনা প্রচুর। চিরস্মরণীয় সুকুমার রায়ের কথা পূর্বেই বলেছি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেন্দ্র দেব, প্রবুদ্ধ, প্রভাতকিরণ বসু, শিবরাম চক্রবর্তী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, আশাপূর্ণা দেবী প্রভৃতির রস-রচনা শিশুদের বিশেষ প্রিয়। এই ব্যঙ্গ যেখানে স্যাটায়ারে পরিণত হয়েছে তার চমৎকার নিদর্শন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদার গল্প'গুলি। ঘনাদা বাঙালী ছেলেমেয়েদের কাছে বিশেষ প্রিয়। তার উদ্ভট বৈজ্ঞানিক কাহিনীগুলিতে পুনঃ পুনঃ শ্লেষাঘাত বয়স্কদেরও চমক লাগায়।

এই প্রবন্ধে অনবধানবশতঃ হয়তো আরও কারও কারও নাম বাদ পড়েছে, কারণ বাংলা ব্যঙ্গসাহিত্যে নিত্য নতুন নতুন শিল্পীর আগমন হচ্ছে। তাঁদের কাছে অজ্ঞতাবশতঃ ত্রুটির জন্য পূর্বেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। যৎসামান্য রসরচনা আমিও লিখতে চেষ্টা করেছি। তাতে এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে বিশুদ্ধ স্যাটায়ার রচনা অত্যন্ত দুরূহ কাজ—যেন চড়া সুরে গান করার মত। বারে বারে তা খাদে নামাতেই হয়, গিটকিরি দিতে হয়, কখনও স্যাটায়ারের সঙ্গে 'উইট' (wit) মেশে, 'হিউমার' (humour) মেশে, 'পান' (pun) মেশে, আজগুবীর আমেজ আসতে চায়। স্যাটায়ারের দীর্ঘ রচনা আরও দুরূহ, আরও দুষ্কর সাধনা-সাপেক্ষ। তীক্ষ্ণধী সমালোচক প্রমথনাথ বিশী স্যাটায়ারিস্ট ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে বিস্মরণের কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেছেন, শরৎ-সাহিত্যের প্রবল জনপ্রিয়তার স্রোতেই ত্রৈলোক্যনাথকে সাময়িকভাবে লোকলোচনের বাইরে নিয়ে ফেলেছে। স্যাটায়ারিস্টকে এই দুর্ভাগ্যের জন্য প্রস্তুত থাকতেই হয়। কোন স্যাটায়ার সমসাময়িক কালে জনতার কাছে যে সম্বর্ধনা পায় পরবর্তীকালেও তা না পেলে আপসোস করে লাভ নেই, কারণ বস্তুতঃ ব্যঙ্গশিল্পটিই উদ্দেশ্যমূলক এবং উদ্দেশ্যের গুরুত্ব হ্রাসের সঙ্গে তদ্বিষয়ক রচনারও গুরুত্ব কমে যায়। চিরন্তন সমস্যা নিয়ে পুনঃ পুনঃ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষ করা সম্ভব নয়। সব জেনেও কি লেখক, কি পাঠক, কোন যুগে কোন দেশে ব্যঙ্গরচনার উপরে বিমুখ হয় না, এই যা ভরসা।

[সমাপ্ত]

[পূর্বানুবৃত্তি]

শোকের তীব্রতা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। কিন্তু তার মন সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে ফিরে আসতে চাইল না। চারপাশে পরম ঔদাস্তের আবরণ রচনা করে সংসার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল। সারাদিন শোবার ঘরটিতে যেখানে খোকা শুয়ে থাকত, চুপ করে সে সেখানে বসে থাকত। সমস্ত চৈতন্যকে বর্তমান থেকে গুটিয়ে নিয়ে অতীতের মধ্যে মেলে দিয়ে পুরনো দিনগুলির স্বপ্ন দেখত। চন্দ্রা মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে গিয়ে কথা বলে গল্প করে তাকে বর্তমানের মধ্যে টেনে নিয়ে আসবার চেষ্টা করত। কিছুক্ষণের জন্য ফিরে আসত, সাংসারিক দু-চারটে কর্তব্য কোনমতে সেরে দিয়ে আবার ধ্যানাবেশের মধ্যে অন্তর্ধান করত।

খোকার মৃত্যুর পরদিন থেকে গৌরদাস তার দৈনন্দিন জীবনে ফিরে গেল। বাইরে তার বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তবে পূজোর সময় দীর্ঘতর হয়ে উঠল, মন্দিরে ঢুকে আর বেরোতে চাইত না। চন্দ্রা জলখাবার সাজিয়ে ঘর-বার করত। গৌরদাস পূজান্তে গদগদকণ্ঠে প্রার্থনার পর প্রার্থনা করত। রাত্রেও ভোগারতির পর অনেক রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন করত। সে শোবার ঘরের বারান্দায় শুয়ে থাকত। চন্দ্রা পাশে বসে থাকত। কীর্তন শেষ হবার উপক্রম হতেই চন্দ্রা খাবার সাজিয়ে গৌরদাসের জন্য অপেক্ষা করত। গৌরদাস ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করত, তোমার দিদিকে খাইয়েছ? চন্দ্রা ঘাড় নেড়ে জানাত হ্যাঁ।

গৌরদাস বলে উঠত, তুমি ভাগ্যি ছিলে চন্দ্রা! তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না।—চন্দ্রা মাথা নীচু করে বসে থাকত।

প্রায় মাসখানেক কাটল। সে ধীরে ধীরে সংসারের মধ্যে ফিরে আসতে লাগল। চন্দ্রার সঙ্গে দু-চারটে কাজ করতে লাগল, পূজোর সময়ে চন্দ্রার সঙ্গে পাশে গিয়ে বসতে লাগল, কীর্তনের সময়ও মন্দিরের রোয়াকে চন্দ্রার পাশে গিয়ে বসতে লাগল। ক্রমে একটি একটি করে চন্দ্রার কাছ থেকে সব কাজই সে নিজের হাতে তুলে নিল। চন্দ্রা কিন্তু রাধামাধবের ও গৌরদাসের সেবার ভারটি তাকে ছাড়ল না।

দিন কয়েক পরে রতন এসে চন্দ্রাকে নিয়ে গেল। বলল, তার পিসিমার খুব অসুখ। বাঁচবেন না বোধ হয়। এই পিসিমার কাছেই মানুষ হয়েছিল সে।

দিন চলতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। অভ্যাস মত কাজ। মনের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। হাত চলতে থাকত, মন থাকত পিছনে পড়ে—অতীতের হারানো দিনগুলির মধ্যে। স্বপনপুরের কথাও খুব মনে পড়ত—বাবার কথা, মাসীমার কথা, দাদার কথা, অচিন্ত্য, অপূর্ব-অনাদিদাদের কথা। বীরেনদার কথাও। ভাবত, তারা কোথায় আছে, কী করছে! সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে-বর্তে আছে, না, তার মত দুঃখের অনলে পুড়ছে? গৌরদাসের কাজ-কর্ম ছিল না। রাধামাধবের মন্দিরে যতক্ষণ পারত কাটাত। বাকী সময়টা রোদে রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত। ধান-কাটা চলছিল মাঠে। দক্ষিণ মাঠে ধান কিছুই হয় নি। তাদের অর্ধেকের বেশী জমি তো বালিতে ঢাকা পড়েছিল। বাকী জমিগুলোতে

ধানে পোকা লেগেছিল। ওই জমিগুলোর ফসলে দু হপ্তাও চলবার আশা ছিল না। বাড়িতে যা চাল ছিল ফুরিয়ে এল। রাধামাধবের পুজো বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা বলল, খাওয়া জুটছে না—লেখাপড়া! তা ছাড়া গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্য জমিদারবাবু একটা পাঠশালা খুলে দিয়েছিলেন। পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসছিল। জমিদারবাবু নাকি পরে বাড়ি তৈরি করিয়ে দেবেন বলেছিলেন। পাড়ার দু-চারজন ছেলে, যারা পড়াটা চালাবে ঠিক করেছিল, ওখানেই পড়তে যেত। জমিদারবাবু কলকাতায় বারো মাস থাকতেন। মাস কয়েক আগে কলকাতায় জাপানী বোমা পড়েছিল। জমিদারবাবু সপরিবারে মানে মেয়েদের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। বড় বড় ছেলেরা অবশ্য কলকাতায় ছিল—কাজকর্ম দেখছিল।

কোনদিক থেকে আয়ের কোন উপায় ছিল না। অথচ রাধামাধবের পুজো না করলে চলবে না। দু বেলা দু মুঠো না খেলেও চলবে না। পুজো বন্ধ ও অনাহারে মৃত্যু দুই-ই আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই অবশ্যম্ভাবী সঙ্কটের কালো মেঘ গৌরদাসের মন থেকে আনন্দের আলো নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল। মুখে দুশ্চিন্তা ও চোখে শঙ্কা বাসা বেঁধেছিল। মাঝে মাঝে তার কাছে কাছে ঘুরত। কিছু বলবার চেষ্টা করত। কিন্তু কিছু না বলেই আবার চলে যেত।

স্বামীর সঙ্গে তার কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দূর থেকে ওর দিকে কখনও কখনও তাকিয়ে থাকত। মনে হত অচেনা লোক। খোকার মৃত্যু ভূমিকম্পের মত তাদের পায়ের তলার মাটি ধসিয়ে দিয়ে, তাদের দুজনের মধ্যে একটি গভীর সুপরিসর ফাটলের সৃষ্টি করেছিল। ফাটলের দু ধারে দুজন ছিল দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি হবার উপায় ছিল না। স্পৃহাও ছিল না। তার মনের মধ্যে গৌরদাসের ওপরে অভিমান জমে উঠছিল। কেন সে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এমনভাবে পড়ে রইল। রতনের মত কেন সে উপার্জনের পথ খুঁজল না। যে দেবতা বিপদে একবিন্দু সাহায্য করতে পারল না, তারই সেবায় কেন সে পড়ে রইল। যদি সে রতনের মত রোজগার করত, তা হলে খোকাকে হয়তো এমন করে হারাতে হত না। যে পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তানকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে পারে না, সে মানুষ নয়—পশুরও অধম।

চালের হাঁড়ি খালি হয়ে এল একদিন। গৌরদাস বাড়িতে ফিরতেই সে হাঁড়িটা তার সামনে নামিয়ে দিল। খালি হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে গৌরদাসের মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুই না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ভাবল, কোথায় গেল? ভিক্ষে করতে নাকি? ওইটুকু করলেই তো পুরুষার্থের চরম!

কিছুক্ষণ পরে গৌরদাস ফিরে এল। একটা বস্তায় দশ-বারো সের চাল। রান্নাঘরের মেঝেতে ঢেলে দিয়ে বলল, রাঙাদিদিমার কাছে ধার নিয়ে এলাম, পরে শোধ দিয়ে দেব।

এবার তাকে বলতে হল, কী করে দেবে?

গৌরদাস বলল, উপায় হয়ে যাবে। অদ্বৈতদাস বাবাজী একদিন জমিদারবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন।

রতন এল একদিন। তার পিসিমা মারা গিয়েছিলেন। তার শেষ-কাজ, নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল। সে বলল, আমাকে আর কোথাও যেতে বলো না ভাই!

রতন বলল, কী করবেন? অদেষ্ট! সহ্য করে নিতেই হবে। চলুন, ঠাঁই নাড়া হলে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে মনটা হয়তো একটু ভাল হবে।

গৌরদাস বাড়িতে ছিল না। রতন জিজ্ঞাসা করল, গৌরদা কোথায় বেরিয়েছে?

সে বলল, ভিক্ষেয় বোধ হয়।

রতন দু চোখ কপালে তুলে বলল, অ্যাঁ! সেকি!

সে বলল, তা ছাড়া চলবে কী করে শুনি? ঘরে একদানা চাল নেই। বাসন-কোসনও এমন কিছু বাড়তি নেই—যা বিক্রি করা চলে।

রতন বলল, সত্যি ভিক্ষে করছে?

সে বলল, ভিক্ষে ছাড়া আর কী? ধার বলে নিয়ে আসছে। শোধ তো কোনদিন হবে না। একে ভিক্ষে ছাড়া কী বলে?

রতন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, একটা কিছু দাও দেখি, ডালা কিংবা বস্তা।—বলেই রান্নাঘরের কোণ থেকে নিজেই একটা ডালা বার করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেকের পর ফিরে এল এক ডালা চাল নিয়ে। গ্রামের দোকান থেকে কিনে নিয়ে এল। নামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও তো গৌরদার এতেই দিনকতক চলে যাবে, তারপর ব্যবস্থা করছি।

সে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যবস্থা?

রতন বলল, ওকে চাকরি করতে টেনে নিয়ে যাব।

রাধামাধবের সেবার কী হবে?

জমিদারবাবু গাঁয়ে এসেছেন শুনলাম। রাধা-মাধবের ভোগ চালাতে পাচ্ছে না খবর পেলেই ওর হাত থেকে ভার কেড়ে নিয়ে ব্যবস্থা করবেন।

কে খবর দেবে?

রতন মুচকি হেসে বলল, খবর দেবার লোকের অভাব হবে না।

রতন কাছে বসে নানা গল্প করতে লাগল। কত গল্প। কত নতুন নতুন জায়গায় যায়, কত রকমের লোকের সঙ্গে মেশে—তার গল্প। যার কাছে চাকরি করে তার গল্প। মস্ত ধনী! কত রকমের ব্যবসা। বাবা মস্ত উকিল ছিলেন। আগের মনিব এর ভাইপো। তিনি কলকাতার কাছে একটা বড় কাজ করছেন। এই নতুন মনিব এঁর উপর ভার দিয়েছেন এখানকার কাজের। এই বয়সেই খুব কাজের লোক। বয়স? কত আর হবে? ত্রিশ-বত্রিশ। চেহারা? চমৎকার! দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। শক্তিমান পুরুষ। কুস্তি করেন রোজ। এইখানেই থাকেন। হাওয়া-জাহাজের নামবার জায়গা হয়েছে। আর সৈন্যদের ছাউনি। আরও অনেক বাঙালী আছেন। ভাল ডাক্তার এসেছেন একজন সম্প্রতি। বাবুর আফিস আছে সেখানে। অনেক বাবু আফিসে কাজ করে। আরও কত লোক কাজ করছে। বাবুকে বলে গৌরদাসকেও কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারবে নিশ্চয়।

সে চুপ করে শুনছিল। রতন সম্প্রতি কলকাতা গিয়েছিল ওর মনিবের সঙ্গে। সেখানকার কত রকম গল্প করতে লাগল। শুনতে শুনতে তার মনে হল, আর গৌরদাস—খুব না হোক কতকটা লেখাপড়া শিখেছে, সেই কুয়োর ব্যাঙ হয়ে বসে আছে। চাষা-ভুষোদের দাঠাকুর হয়ে কেতাথ হয়ে গেছে।

সে একসময়ে বলল, চন্দ্রাকে সেখানে নিয়ে যাও না কেন?

রতন বলল, ও যেতে চায় না। না হলে ওখানে থাকবার বাড়ি পাওয়া যায়। অনেকে পরিবার নিয়ে থাকেও।—একটু চুপ করে থেকে বলল, পিসিমা মারা গেলেন। ওখানকার ওপর টান তার আর রইল না। এখন ওর ওখানে গিয়ে থাকলেই ভাল হয়। তা কিছুতেই যাবে না—দেখবেন। আসল কথা, ভারী কুনো স্বভাবের। কারও সঙ্গে মেশামেশি করতে চায় না। তা ছাড়া যারা বরাবর পাড়াগাঁয়ে মানুষ তাদের শহরের লোকদের সঙ্গে মিশ খায় না।—ক্ষোভের স্বরে বলল, ভগবান মুঠো ভর্তি করে কাউকে কিছু দেন না দিদি! খুঁত থাকেই।

বলেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। ওর চোখের দৃষ্টিটা তার মুখের উপর এঁটে রাখল। চোখে চোখ মিলতেই চোখ নামিয়ে নিতে হল তাকে।

গৌরদাস এল অনেক বেলায়। গামছায় সের কয়েক চাল।

রতনকে দেখে ম্লান হেসে বলল, কখন এলে? পিসিমা কেমন?

রতন বলল, পিসিমার বৃন্দাবন-প্রাপ্তি হয়ে গেছে। শেষ কাজ তো আমাকেই করতে হবে। আমাকেই ছেলের মত মানুষ করেছিলেন। তা তোমরা যাচ্ছ কবে?

গৌরদাস বলল, তোমার দিদিকে নিয়ে যাও। আমার যাওয়া হবে না।

সেকি! যাবে না কেন?—রতন বিস্ময়ের স্বরে বলল।

পরে বলব, চালগুলো রেখে আসি।—বলে গৌরদাস চালগুলো রাখতে রান্নাঘরে ঢুকল।

রতন হাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চালগুলো জোটালে কী করে?

গৌরদাস বলল, জনকয়েক ছেলের মাইনে বাকী ছিল। তাদের কদিন ধরেই তাগিদ দিচ্ছিলাম। আজ চাল দিয়ে শোধ করল।

যাবার আগে গৌরদাস তার কাছে এসে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞাসা করল, যাবে না কেন? রতন এত করছে আমাদের জন্যে—

গৌরদাস বলল, রাধামাধবের একটা ব্যবস্থা না করে নড়ব না কোথাও। যদি করতে পারি, একেবারে চলে যাব এখান থেকে।

সবিস্ময়ে বলে উঠল সে, তার মানে! কোথায় যাবে?

যেখানে চাকরি জুটবে। চাকরি করব স্থির করেছি রতনের মত।

সে আশ্বস্ত হয়ে বলল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। যদি তোমার এমন সুমতি হয় তো রাধামাধবের কাছে হরির লুঠ দেব। তবে কোথাও যদি যাও তো একটা খবর দেবে আশা করি।

গৌরদাস বলল, তোমাদের ওখানেই তো যাব। রতনের মনিবের কাছে চাকরি করব। রতন চাকরি করে দেবে বলেছে।

পিসীমার শেষ কাজ সাধারণ ভাবেই করল রতন। গ্রামের বৈষ্ণবদের খাওয়াল। পরের দিন রতন বাবুকে নিমন্ত্রণ করল রাত্রে খাবার জন্য। হোটেল থেকে ভাল একজন রাঁধুনি নিয়ে এল। হরেকরকম খাবার জিনিস তৈরি হল। ঘরের মধ্যে পুরু কার্পেটের আসন পেতে রূপোর থালাবাটিতে খাবার সাজিয়ে দেওয়া হল। রতন তার পুরনো মনিবের বাড়ি থেকে এসব সংগ্রহ করে এনেছিল। বাবু বাড়ির ভিতরে এলেন। সে ও চন্দ্রা দূরে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল। দেখল বাবুকে। সত্যি রূপবান পুরুষ। দীর্ঘ-দোহারা গঠন। ধবধবে ফরসা রঙ। মুখের পাশটা যতটা দেখতে পেল তাতে মনে হল মুখের গঠনও সুন্দর। সর্বদেহ ঋজু করে মাথা উঁচু করে কোন দিকে না তাকিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। চাল-চলনে ভাব-ভঙ্গীতে দাম্ভিকতা ফেটে পড়ছে মনে হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর রতন এল চন্দ্রাকে ডাকতে। বাবু তার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চান বলল। চন্দ্রা রাজী হল না। বলল, যার-তার সামনে বেরোতে পারব না। রতন বলল, শুনছ দিদি, কী বলছে? যার-তার! যার দয়ায় ডান হাত চলছে সে হল যে-সে! শিবতুল্য লোক। ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। না হলে আমার মত লোকের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন! তাকে বলল, দিদি, তুমি দয়া না করলে মান থাকে না, একজন অন্ততঃ যাওয়া চাই। তাকে রাজী হতে হল।

রতনের পুজোয় দেওয়া শাড়িখানা পরল। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল। তারপর রতনের সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকল। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারে বসে বাবু সিগারেট খাচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করলেন। সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নমস্কার করল। চওড়া কপাল খাড়া নাক সরু সরু ঠোঁটে সৌজন্যের হাসি, চোখে সাপের চোখের মত জলজলে দৃষ্টি। মন বলে উঠল, এ যে চেনা লোক! কোথায় দেখেছি ওঁকে!

বাবু বললেন, খুব খাইয়েছেন। বহু ধন্যবাদ।

কিন্তু কোন কথাই তার কানে ঢুকল না। মন তার স্মৃতিভাণ্ডারের অন্ধকার কোণে পূর্বেকার সঞ্চয়গুলি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছিল তখন।

রতন বলল, আমার স্ত্রীর দিদি। এরই স্বামীর কথা বলেছিলাম আপনাকে। ধান হয় নি মোটেই, বড় কষ্ট ওদের।

বাবু তখনও তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, আপনি কখনও স্বপনপুরে ছিলেন? আমাদের মাস্টারমশায় যতীনবাবুকে—

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে স্মৃতিভাণ্ডারের সবকিছু আলোকিত করে তুলল। চিনতে পারল বাবুকে। বীরেনদা, বীরেন বোস—জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে।

সে ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানাল, হ্যাঁ।

বীরেনদা বলল, তুমি কি রাধা? তুমি এত কাছে আছ, এতদিন এখানে থেকেও জানতে পারি নি। রতন তোমাদের কথা বলে। কিন্তু নাম কোনদিন বলে নি, পূর্ব-ইতিহাসও কিছু বলে নি।

রতন হাতে স্বর্গ পেল। কৃতার্থের ভঙ্গীতে একগাল হেসে বলল, আপনি একে চেনেন, সাবু!

বীরেনদা বলল, চিনব না! ছেলেবেলা থেকে দেখছি। নিজের বোনের মত। যতীনবাবু তো আমাদের একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন, আমাদের বাড়ির কাছেই; যতীনবাবুর ছাত্র ছিলাম, রোজ দুবেলা যেতাম ওদের বাড়ি। মাসীমা কোথায়?

সে বলল, মারা গেছেন। এখানেই।

বীরেনদা বিস্ময়ের স্বরে বলল, এখানে ছিলেন! এখানেই মারা গেছেন! আমি তো শুনি নি!

রতন সবিনয়ে বলল, আপনি এখানে আসবার আগেই মারা গেছেন।

বীরেনদা চলে গেল। রতনকে যাবার সময়ে বলে গেল, গৌরদাসকে আসতে বলো। চাকরি হবে।

[ক্রমশ]

গল্প

তবু ভোর হয়

অমরেন্দ্র ঘোষ

অনেক ক্ষণ ধরেই লড়াই করছে দুটি নারী পুরুষ। নির্জন মেঠো পথে থমথমে অন্ধকার। যেন কালো গরদের চাদর। কখনও মসৃণ, কখনও ঢেউ ঢেউ—কিন্তু মনে হয় যেন শেষ নেই। এই অন্ধকারের সঙ্গেই লড়াই করছে প্রতীতি ও প্রত্যয়।

ভেবেছিল একটু দূরেই ভোর, একটু দূরেই অপূর্ব সূর্যোদয়। পাখিডাকা হ্রদের বুকে পাইনগাছের তটভূমিতে প্রথমতম আলোক সঞ্চার।

দুজনে সাঁতার কাটছে যেন। হাঁটা নয়, সাঁতার কাটার মতই পরিশ্রম।

প্রতীতি একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে, আর কত দূর?

প্রত্যয় জবাব দেয়, জানি নে।

এই যে বললে বেশী দূর নয়। তারপর তো অনেকটা পথ এলাম। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

আমার হাতখানা ধর, দেখবে পরিশ্রম কমে যাবে।

প্রতীতি প্রত্যয়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। কিন্তু কিছুতেই যেন ডান হাতখানা ধরতে পারে না। অন্ধকারে লজ্জার ফাগ কতটা মুখে লেগেছে বোঝা যায় না। বলে, তুমিও তো পরিশ্রান্ত। কিন্তু আর কত দূর?

আমরা বোধ হয় রাত্রির মরীচিকায় পড়েছি। ঠিক বুঝতে পারছি নে, বোধ হয় পথ ভুল করেছি।

বল কি, মরীচিকা! এর মাসুল তো মৃত্যু! তুমি কোথায় নিয়ে এলে আমায়? এই কি সূর্যোদয় দেখা?—প্রতীতির গলার স্বর কেঁপে ওঠে: এখনো ফিরে চল।

একবার সঙ্কল্প নিয়ে বেরিয়ে পড়লে আর ফেরা যায় না প্রতীতি। এগিয়ে গিয়ে ভোর তোমাকে দেখতেই হবে, কারণ ফেরার পথেও তো থাকতে পারে মরীচিকা।

তা হলে কি করব? একটু ভেবে চিন্তে জবাব দাও।—প্রতীতি হতাশায় ভেঙে পড়তে চায়।

ধৈর্য ধরে এগিয়ে চল। সে-সূর্যোদয় দেখলে পরমায়ু বেড়ে যাবে। এ কষ্ট মনে হবে ফুলের কাঁটা।

তুমি বড় আশা দেখাতে পার।

আর তুমি বুঝি কম যাও?

বা রে, আমি আবার কী আশা দেখিয়েছি?

এবারে তুমি ভেবে দেখ।

প্রতীতি হাঁটতে থাকে আর ভাবতে থাকে। কিছুই তো তার মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, মৃত্যু যেন চুম্বকের মত টানছে, পথ দেখাচ্ছে মরীচিকা। সে বারবার প্রত্যয় হারিয়ে ফেলছে পুরুষের ওপর। তবু চলতে হচ্ছে সূর্যোদয়ের দুর্বার টানে।

সেই থমথমে আঁধার। ঝিঁঝি-ডাকা বিরাট নৈসর্গিক মহা মৌনতা। প্রান্তর ছাড়িয়ে ক্রোশের পর ক্রোশ শিলা-পার্বতীদের কুমারীত্বের স্তবক। বিবস্ত্রা—লজ্জা যেন আজও এদের লজ্জা দিতে পারে নি। অথবা এই মৃত্যুর দেশে এখনও ছাড়পত্র পায় নি মানুষের শালীনতাবোধ। কিন্তু এর মধ্যেই সূর্যোদয়।

খানিকটা এগিয়ে প্রত্যয় জিজ্ঞেস করে, কি, জবাব দিলে না যে? কথা বল। যতক্ষণ বেঁচে আছ মুখর করে পথ চল। তোমার নামের অর্থটা ভুলে যেয়ো না প্রতীতি। মরীচিকার ভয়ে কি জ্ঞান আচ্ছন্ন হবে?

আমি তো তোমার চেয়ে বয়সে কত ছোট।—প্রতীতি একটু গলা নামিয়ে বলে, সবে যৌবনে পা দিয়েছি, ফলে মুকুলে আমার পূর্ণতা এখনও অপেক্ষা রাখে।

তবে আমি কি বুড়ো হয়ে গেছি? তোমার ইঙ্গিতটা তো ধারাল?

না না প্রত্যয়, তুমি চিরযৌবন। সেই যখন থেকে যাত্রা শুরু করেছি, এক ভাবেই তো চলেছ। তোমার নামটা যে কি সার্থক!

কিন্তু তোমাকে ছাড়া সবই কি ব্যর্থ নয়? তুমি আশা দিয়েছিলে—

থামলে কেন, বল, স্মরণ করিয়ে দাও।

আমরা দুজনে মিলে তবেই তো সার্থক। তুমি বলেছিলে—

কি বলেছিলাম? উঃ!

একটা হোঁচট খেয়েছে প্রতীতি। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। তবু প্রত্যয় প্রতীতিকে টেনে ধরে। টাল সামলে নেয় প্রতীতি।

খুবই বুঝি লাগল?

না না। এখন হাত ছেড়ে দাও, আমি একাই পথ চলতে পারব। তুমি যে কত ভালবাস!

তুমি যে কত সইতে পার! এমন গুণী মেয়েকে কি না ভালবেসে উপায় আছে।

আমার তো লাগে নি তেমন।

তবে চোখে জল এল কেন?

কী করে দেখলে এই আঁধারে?

তুমি যে বল মানুষের বুকে আরশি আছে।

মরীচিকার কথা ভুলে গিয়ে প্রতীতি হেসে ওঠে: কিন্তু অন্ধকারেই কি আরশিও দেখলে?

ঠাট্টা করছ?

তবে কি মান করব? এ পরিস্থিতিতে তো তা খাপ খাবে না।

ওরা আবার হাঁটতে থাকে। সবদিকেই পথ, তবু দৃঢ় বিশ্বাসে একদিকে এগিয়ে চলে। ঘাসগুল্ম আকাশ অন্ধকারে সবই যেন একাকার—শুধু যেন বিভ্রান্তি! কিন্তু ধ্রুবতারাটাকে খুঁজে নেয় প্রত্যয়। ওটা যখন অস্ত যাবে, তখনই তো সুপ্রভাত।

প্রত্যয় বলে, মনের আয়না সূর্যের জন্য অপেক্ষা করে না, কেবল একটু অনুভূতির ছোঁয়া চাই। সে ছোঁয়া তুমিই তো আমাতে জাগালে!

তাই নাকি!

ওরা লড়াই করে পথ চলে। প্রান্তর আর শেষ হয় না।

তুমি গুণের কথা বললে, রূপ তবে মিথ্যে? এই যে আমার টানা টানা চোখ, পাতলা দুখানা ঠোঁট, নিটোল গড়ন?—প্রতীতি মিষ্টি মিষ্টি হাসে।

মিথ্যে নয় কিছুই, কিন্তু নিজেকে অনেক বাড়িয়ে বলছ নাকি? তুমি আর যা-ই হও, অপ্সরী নও। তোমাদের জাতটা যে কি অহঙ্কারী!

কিন্তু তবুও তো মুগ্ধ হও। সারা জীবন বন্দী করে রাখি!

এ কথার ঠিক জবাব দিতে পারে না প্রত্যয়। এর মধ্যেই সে ব্যথায় ককিয়ে ওঠে। সারা শরীরময় জ্বালা ছড়িয়ে পড়ে।

এ যে বিষাক্ত কাঁটা প্রতীতি। কে এ বিষ নামাবে?

অধীর হয়ো না। আমার কাছে মধু আছে। আমার কোলে মাথা দাও।

কিন্তু বিষেই তো বিষক্ষয়।

আমিই তো বিষহরি। আমার মুখের অমৃত গরল হোক তোমার কল্যাণে।—প্রতীতি ক্ষতস্থানে মুখ লাগিয়ে সেবা করে। ধীরে ধীরে প্রত্যয় সুস্থ হয়ে ওঠে।

আঃ তুমি বাঁচালে! সাধে কি মুগ্ধ হয়ে রয়েছি। ভেবেছিলাম এ যাত্রা রক্ষা নেই। তোমার সেবার তুলনা হয় না প্রতীতি। সত্যিই তুমি গুণী মেয়ে।

বড় আঘাত পেলাম প্রত্যয়, নিজের পায়ে নিজেই মারলাম কুড়ুল। এ বড় নিষ্ঠুর পরাজয়। কিন্তু তোমাকে বাঁচিয়ে যে কী আনন্দ হচ্ছে!

ওরা আবার হেঁটে চলে। সেই দৃঢ় পদক্ষেপ। সেই মরুমায়ার পথ। মাঝে মাঝে জোনাকি।

আমি কি দিতে চেয়েছিলাম তা তো বললে না?

তোমার কি কিছু মনে নেই?

না।

মিথ্যে কথা। চতুরালি করছ।

না গো, না।

তুমি দিতে চেয়েছিলে সংসার-সন্তান, তার আগে একটি—

সবই পাবে।

এখনই।—প্রত্যয় একটু হাতখানায় চাপ দেয় প্রতীতির।

পুরুষজাতটাই বড় ব্যস্তবাগীশ।—প্রতীতি সরে যায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই এসে প্রত্যয়কে জড়িয়ে ধরে: কে যেন আমাদের পিছু নিয়েছে। শিরস্ত্রাণ বর্মে ঢাকা দস্যু।

কেউ নয়, এ তোমার আগের ভয়ের দুর্বল রেশ। তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে এস।

নাগো, ওই—ওই যে তার পায়ের শব্দ। দস্যু!

ওরা কান খাড়া করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। রাত্রি গড়িয়ে চলে শেষ যামের দিকে। প্রত্যয় বলে, কোথায়

লুকোচুরি

শ্রীশান্তি পাল

হরবোলা তুই হরেক বুলি
বলিস নেকো আর।
ও তোর বোল্ শুনে কে গুমরে ম'ল
তালচোঁচ ছাতার।
ওরে গহন বনের পাখি,
ডাকিস কারে লুকিয়ে থাকি ?
দ্যাখ্ সন্ধ্যামণি দাঁড়িয়ে আছে
বাঁশ-বাগানের ধার।
ওরে এই বেলা নে উজোড় করে
বুকের মধু তার ॥

ফুৎকি ফিঙে ভাট-শালিকে,
গাইছে গজল দিকে দিকে ;
হলদেবুড়ি বুড়ি ছুঁয়ে
তান তুলছে বাঁ'রোঁয়ার।
শোন্ ঠুংরিতে আর'কাহারবাতে
রঙ ছোটে 'বেলা'র ॥
গৌরীমদন পাউই টিঁয়ে,
বাঁধছে 'ঠেকা' 'উঠান' দিয়ে,
তুই কেন লো অমন করে
পালাস বারেবার ?
ভয় কি সখি, চোখের আড়ে
খোল্ না গোপন দ্বার।

কে ? সবই তোমার মনের বিকার। আমার হাত ধরে এগিয়ে এস।

ওরা চলতে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝেই চমকে চমকে ওঠে প্রতীতি। প্রত্যয়ও কেমন যেন সময় সময় টালমাটাল হয়ে যায়। সে ভাবে, কী সংক্রামক রোগ! সে পদক্ষেপ আরও বলিষ্ঠ করে।

কথা বল প্রতীতি।

শিশিরে হিমে ভয়ে আড়ষ্ট প্রতীতি জবাব দেয়, কী কথা বলব ?

প্রত্যয় প্রতীতিকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমরা পায়ে চলা পথ পেয়েছি।

তাই নাকি ?—প্রতীতি পায়ের প্রতিটি আঙুল দিয়ে অনুভব করে পথের ধুলো। তবে তো হ্রদ আর দূর নয়। প্রতীতির দেহখানা খুশীতে ফোয়ারা হয়ে ওঠে যেন।

হ্যাঁ, মরীচিকাও নেই আর। আমরা সত্যি পথ ভুল করি নি। ওই যে পাখি ডাকছে।

শুনেছি গো শুনেছি। রাতও প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার যেন ছুটতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু দস্যুটা তো আবার আসবে না ?

না, আর এলেও আমি রয়েছি কেন ?

এবার পথ আরও স্পষ্ট হয়। হালকা হয়ে গেছে রাতের থমথমানি। চারদিকের নৈসর্গিক দৃশ্যপট ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে আসে।

এটা কি মাস ?

বসন্তের প্রথম প্রভাত।

প্রতীতি বলে, কি আনন্দ, বোধ হয় এই আনন্দেই আমি মরে যাব।

আর কথা হয় না। কিন্তু লড়াইয়ের শেষ হয়। একটু চড়াই ভেঙেই হ্রদ।

আকাশে সূর্যোদয়, নীচে নারী-পুরুষের চিরন্তন স্পর্শ-লোলুপ ব্যগ্র ওষ্ঠ সম্প্রসারণ।

হঠাৎ একটা শব্দ—সঙ্গে সঙ্গে দস্যুর হাসি। একটা পাখির রক্তাক্ত আর্তিতে সমস্ত ভোরটা কলুষিত হয়ে যায়।

* * *

তবু সূর্য ওঠে।

প্রতীতি ও প্রত্যয় আজও সারা ছুটিটা মুখর করে ফিরে আসে এই কলকাতায়।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

রণজিৎকুমার সেন

১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর কাব্য-সাধনার মধ্যযুগীয় স্তরের অবসান হল। ভারতচন্দ্রকে মধ্যযুগের সীমান্ত নির্দেশক স্তম্ভ-স্বরূপ বলা চলে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় পরিপুষ্ট ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যসৃষ্টির পূর্ণচ্ছেদ এই সময় থেকেই লক্ষিত হয় এবং ক্রমে ব্যক্তিচেতনার পরিস্ফুরণ দেখা দেয়। নবস্ফুরিত ব্যক্তিচেতনার গৌরব সাহিত্যের স্বত্বাধিকার করতে অগ্রসর হল। ভারতচন্দ্রেই এর কিছুটা লক্ষণ আংশিকভাবে বিকশিত হয়। সীমিত পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও এ সময় থেকে ধর্মীয় আচরণের কাঠিন্যের ফাঁকে ফাঁকে ব্যক্তি-পৌরুষের গৌরব-মহিমা উঁকি-ঝুঁকি মারতে থাকে। এতদ্‌সত্ত্বেও সাহিত্যে সমকালীন জীবনধারা, সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাহিনীর অনুপস্থিতি দেখা গেল না। সেই সঙ্গে কিছু বা রোমান্টিক ব্যক্তিপ্রেমেরও উদ্বোধন হয়। এই ভাবে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের শেষপাদ এগিয়ে আসে এবং তার সন্ধ্যারতির বাদ্য মন্দ্রিত হয়ে উঠল ভারতচন্দ্রের হাতে।

কিন্তু সে বাদ্য মন্দ্রিত হয়ে উঠলেও তখনও পর্যন্ত নতুন যুগের পত্তন হয় নি। সমাজ ও রাষ্ট্রে তখন যে বিশৃঙ্খলতার প্রবাহ বয়ে চলছিল, তা আদৌ সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল ছিল না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদৌল্লার পরাজয় ও পলাশী বিজয়ী ক্লাইভের বিজয়াভিযানে বাঙালীর সামগ্রিক জীবনচেতনায় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কোম্পানির শাসনাধিকার বিস্তারের মধ্য দিয়ে বাঙালীর প্রচলিত জীবনধারার বিভিন্ন দিক ছিন্নভিন্ন হতে আরম্ভ হয়। তার প্রচলিত আর্থিক সংস্থানের অবনতি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কোম্পানির আওতায় ও কোম্পানির লাভানুসন্ধানের প্রচেষ্টায় এক নতুন আর্থিক মান দেখা দিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে এক নতুন ধরনের কৃষিব্যবস্থারও প্রবর্তন হল। ইংরেজ বণিকের আওতায় তার প্রসাদধন্য এক প্রকারের নতুন সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব হল দেশে। পল্লীকেন্দ্রিক সভ্যতার শ্মশানশয্যার পাশে ধীরে ধীরে জেগে উঠল শহর-কলকাতার নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা ও সমাজ-জীবন—যার প্রধান ধারক হল কোম্পানির প্রসাদপুষ্ট নতুন জমিদারশ্রেণী, মুৎসদ্দি, বেনিয়ান প্রভৃতি। দেশে ইংরেজি শিক্ষারও প্রসার ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল এবং প্রচলিত শিক্ষাধারারও আমূল পরিবর্তনের দিন এগিয়ে এল। এক নতুন সমাজ-জীবনের পদধ্বনি শোনা গেল সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রিক সংস্থানের পতন ও নতুনতরের অভ্যুত্থানের মধ্যবর্তী যে স্তর, তা একটা বিশৃঙ্খলার যুগ। এ কালটাও সেই বিশৃঙ্খলা থেকে বাদ গেল না। রাষ্ট্রিক শক্তি হারাবার ক্ষোভে ও হতাশায় এবং প্রচলিত সমাজ-জীবনের ভাঙন ও ধ্বংসের কারণে বাঙালী জীবনেও বিভিন্ন ভাবের লক্ষণ পরিস্ফুট হল। নৈতিক নিম্নগামিতা তার মধ্যে প্রধান। এই নৈতিক নিম্নগামিতা ও হতাশালাঞ্ছিত জীবনবোধ এই যুগসন্ধির বাঙালীকে সর্বরকমের উন্নত-ভাবে উন্নীত হবার পন্থা থেকে পিছনে টেনে রাখল। ফলে বাঙালীর সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দৈন্যের পঙ্কিল স্রোত বইতে শুরু করল।

একালের বাঙালীর যে সাহিত্যসাধনা ও মানসিক বিকাশধারা, তা মূলতঃ প্রাচীনের চর্বিতচর্বন, অন্যথায় এক নতুন ধরনের গ্রাম্যতার আশ্রয় গ্রহণ। পরবর্তী সাহিত্য-সৃষ্টির যে ধারা, তা অবসিত হল ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই। মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি ব্যালাড জাতীয় কথা ও কাহিনী-আশ্রিত কাব্যধারার শেষ হল, বৈষ্ণবগীতি-কবিতার অগ্রগতির স্রোত বহুদিনই রুদ্ধ হয়েছিল, এ যুগে এসে তা আর এক পাও এগোল না; সেখানেও দৈন্য পরিস্ফুট হল। এ সবের পরিবর্তে যা তৎকালীন সাহিত্যধারাকে অধিকার করল, তা হল কবিগান পাঁচালি প্রভৃতি। এর মধ্যে কবিতার টেকনিক বা রচনারীতির কোনও নতুনত্ব রইল না, তেমনই রইল না কোনও কল্পনা-

সৌষ্ঠব। সমকালীন ঘটনা বা ঐতিহাসিক কাহিনী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কিংবা সমকালীন জীবনধারার বিভিন্ন দিককে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের আবরণে পদান্তের মিল রেখে ঢিলে কাঠামোর মধ্যে কাব্য রচনার প্রয়াস দেখা দিল। এগুলো মূলতঃ আসর-সঙ্গীতের জন্যই রচিত হতে শুরু হল। কাব্যিক সৌন্দর্য ও কল্পনার সৌষ্ঠব ও সজ্জার কোনও নিদর্শন এতে মেলে না। সুর করে কথা উচ্চারণ করে শ্রোতাদের তৃপ্ত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য। তা ছাড়া একালে সমকালীন জীবনধারার যে নৈতিক অবনতিধর্মী ঝোঁক, তার ফলে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট রুচিবৈগুণ্যেরও লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

এই পরিবেশেই ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম। তিনিও এই সাহিত্যিক স্থূলতার আবহাওয়াতেই পরিপুষ্ট ও বর্ধিত এবং সমকালীন সাহিত্যসাধকদের দলপতি হিসেবেই তিনি গণ্য হলেন। তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম সূত্রপাত কবিওয়ালাদের দলকে আশ্রয় করে। তাঁদেরই বিভিন্ন দলে কবিগান রচনা করে দিয়ে তিনি তাঁর কবিজীবনের উদ্বোধন করেন। পরবর্তী জীবনেও তিনি এসব কবিওয়ালাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সে সময়েও তিনি পূর্বের মত তাদের দলের জন্য গান লিখে দিয়েছেন। তাঁর কাব্যজীবন এভাবে শুরু হওয়া এবং পরিচালিত হওয়ার ফলে দেখা যায়, সমকালীন সাহিত্যের বৈশ্য ভাবধারা থেকে তিনি খুব বেশী দূরে সরে যেতে পারেন নি। সেই প্রচলিত চক্রে তাঁকেও আবর্তিত হতে হয়েছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর সমন্বয়ধর্মী ও অনুসন্ধিৎসু মন প্রাচীন ও নবীনের যোগসূত্র রক্ষা করে নিজের কালের সেই বৈশ্যভাবধারাকে কৃষ্টিমুখি করে তুলতে যত্নের ত্রুটি রাখেন নি।

ঈশ্বরচন্দ্রের অতি বাল্যেই রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের সূত্রপাত হয়, বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মান্দোলন প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর হৃদয়সাগরেও নতুন ঢেউ ওঠে। ইউরোপীয় যুক্তিবাদের আমদানি করে রামমোহন নতুনভাবে বাঙালীচেতনা গঠন করবার প্রয়াসী হলেন। ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান হতাশালাঞ্ছিত বাঙালীর সামনে নতুন প্রেরণাস্থল হয়ে দেখা দিল। রামমোহন-সমর্থিত ইউরোপীয় তথা প্রতীচ্য ধারায় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টাও এ ক্ষেত্রে বিরাট সহায়ক হয়ে দেখা দেয়। ক্রমে ক্রমে বাঙালী ইউরোপীয় সভ্যতার তৎকালীন বিভিন্ন প্রগতিধর্মী আদর্শ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা প্রভৃতি সব দিকই বাঙালীচেতনাকে আলোড়িত করল। শ্রীরামপুরের মিশনরিদের প্রচেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হল। বাংলা গদ্যেরও অগ্রগতির পদধ্বনি শোনা গেল। বাঙালীর হতাশা-লাঞ্ছিত জীবনে সেদিন থেকে এই ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান যেমন নতুন প্রেরণাস্থল হয়ে দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনই বাংলার প্রচলিত লৌকিক অনুষ্ঠান ও গাথাগুলি বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে নির্দ্বিধায় আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইল। তার মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে বার করা যত কঠিন ছিল, তাকে কেন্দ্র করে সমসাময়িক কালকে ব্যঙ্গাত্মক রূপ দেওয়া তত কঠিন ছিল না। গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র এই শেষোক্ত পন্থাটিকেই তাঁর কাব্যজীবনের সহজতম আধার হিসেবে গ্রহণ করলেন। যুগসন্ধির নির্লিপ্ত চিত্রকর তিনি। দেশের প্রাচীন রীতিনীতি অন্তর্হিত হয়ে নবীন ভাবের উদ্বোধন হচ্ছে, ঠিক এরই মাঝখানে তিনি ছিলেন এই উভয় ভাবধারার যোগসূত্র। তদানীন্তন-কালীন নব্য বাংলার খ্যাতিমান কবি যশস্বী কথাশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু এবং তাঁদের মত আরও অনেকেই গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে শিক্ষানবিসী করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন: 'আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের, আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব তো খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।'

পণ্ডিতপ্রবর সিভিলিয়ান বীম্‌স্ সাহেব গুপ্ত কবিকে ভারতবর্ষের 'Rebelais' নামে অভিহিত করেছেন। জনৈক সমালোচক বলেছেন: 'স্বভাব বর্ণনে যেমন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম, পরমার্থ কালীবিষয়ে যেমন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, আদিরসে যেমন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, হাস্যরসে তেমনই ঈশ্বর গুপ্ত অদ্বিতীয় কবি।'

বাংলার প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে যাঁদের বিন্দুমাত্রও পরিচয় আছে, সমালোচকের এই উক্তিটি তাঁরা অনায়াসেই উপলব্ধি করতে পারবেন। রহস্য কবিতায় গুপ্তকবি তাঁর পূর্বসূরিদের সকলকেই হার মানিয়েছেন। তাঁর স্বভাবগত রহস্যপূর্ণ শব্দযোজনার দ্বারা নিজের সম্পর্কে উল্লেখ করে তিনি লেখেন—

'তুমি হে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃনামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে ব'সেছি।

তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে ভাব গুপ্ত রয় ॥'

কিন্তু জীবনে ভাবকে তিনি কোথাও গুপ্ত রাখেন নি। শিশুকাল থেকেই তাঁর কবিত্বশক্তি ছিল অসাধারণ। জীবনে তিনি বহু সহস্র শ্লোক-কবিতা লিখে গেছেন। তার মধ্যে পারমার্থিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংসারিক প্রভৃতি সব বিষয়েরই সন্দর্ভ রয়েছে। কথিত আছে, মাত্র ছ বছর বয়সেই তিনি তাঁর কলকাতার প্রথম জীবনে রচনা করেন—

'রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকেতায় আছি।'

জীবনের কোনও একটি মুহূর্তের জন্যও গুপ্তকবির এই জাতীয় রস-টিপ্পনী বন্ধ হয় নি। তাঁর উত্তর-জীবনের এই জাতীয় আর একটি বিশেষ পংক্তি—'কত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা।' এই জাতীয় পংক্তিগুলি বাংলার সমাজ-জীবনে প্রবাদের মত চলে আসছে। সুতরাং এ কথা উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে, জনসাধারণের জীবনে রস-সঞ্চারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলার মাটিতে তাঁর পরোক্ষ প্রভাব রেখে গেছেন। সমাজকল্যাণমূলক রচনার দিকেও তাঁর তেমনই সজাগ দৃষ্টি ছিল। যেমন—

'ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।...'

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় যদি ব্যঙ্গের সঙ্গে উষ্মা না থাকত, তবে তৎকালীন বাংলার মরমী কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠ হতে পারত। এ কথা নয় যে, তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়ে যান নি, বরং যুগসন্ধিক্ষণের সেই আলোড়িত ও বিশৃঙ্খল বাঙালী-সমাজে তিনিই ছিলেন একমাত্র সেতুবন্ধন ও নব সেতুরচনার সার্থকতম স্রষ্টা। ভাবে ও ভাষায় শ্রেয়তার অধিকারী না হলেও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল একনিষ্ঠ সেবকের আত্মনিবেদনের শ্রদ্ধা। তাতে খুঁত ছিল না। তিনি লিখলেন—

'যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণগীত
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥'...

সেকালে বাক্যের তরঙ্গই প্রধানতঃ কবিগুণের পরিচায়ক ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রেও তার অভাব ছিল না। যেমন—

'মনের চালে মন ভেঙেছে
ভাঙা মন আর গড়ে নাকো।'...

অথবা—

'বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে।'...

কিংবা—

'কহিতে না পারো কথা কি রাখিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম ॥'

অনেক সমালোচক এই জাতীয় রচনাকে অশিক্ষিত মনের ভাঁড়ামি বা ইয়ার্কি বলে অভিহিত করে থাকেন বটে, তবু খাঁটি বাঙালীয়ানার দিক থেকে এর একটা মিষ্টি স্বাদও সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করেন, যা সহজেই ত্যাগ করা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শিষ্য স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও গুরু সম্পর্কে এই মতই ব্যক্ত করে বলেছেন: 'তিনি সুশিক্ষিত হইলে তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেকদূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জিত রুচির অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি।...ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়ে এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে রাজি নই। কিন্তু দুঃখ এই যে, এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।...ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখনও পূর্ণ ফলপ্রদ হয় না।'

এরূপ না হবার ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা-দোষ ঘটেছে। কিন্তু তা ইন্দ্রিয়সম্পৃক্ত অশ্লীলতা নয়, সমাজ সম্পর্কে ক্রোধ-বশবর্তী অশ্লীলতা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়: 'যিনি রাগের বশবর্তী হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়াস্তরের বশে অশ্লীল, তিনি পাপাত্মা।'—এই দু শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোক ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন: 'যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে।'—ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন এই শেষোক্ত শ্রেণীর কবি।

অশ্লীলতার ন্যায় তাঁর আর একটি দোষ হল ভাষায় অনাবশ্যক শব্দচ্ছটা ও অনুপ্রাস যমকের ঘটা। তাতে

অনেক ক্ষেত্রেই ভাবার্থের অভাব দেখা যায়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বলতে হয় যে, শব্দৈশ্বর্যে তিনি ছিলেন ঐশ্বর্যবান্। সেখানে স্বল্পশিক্ষিত হয়েও তাঁর পরবর্তী-কালের মাইকেল বা অক্ষয়চন্দ্র সরকারের তুলনায় তিনি হীন ছিলেন না।

সংবাদপত্র প্রকাশ তাঁর জীবনের আর একটি অদ্বিতীয় কীর্তি। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' (১২৩৭ সাল, ১৬ই মাঘ) এবং 'পাষণ্ড পীড়ন' (১২৫৩ সাল, আষাঢ়) নামে দুখানি পত্র প্রকাশ করেন। এর আগে মাত্র দুখানি বাংলা সংবাদপত্র ছিল, যেমন—'বাঙ্গালা গেজেট' (১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত), 'সমাচার দর্পণ' (১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনরিগণ কর্তৃক প্রকাশিত), 'সংবাদ কৌমুদী' (১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত), 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১২২৮ সাল), 'সংবাদ তিমিরনাশক' এবং 'বঙ্গদূত' (নীলরতন হালদার কর্তৃক প্রকাশিত)। এর পর নতুন সুরে নতুন উন্মাদনা নিয়ে আসে 'সংবাদ প্রভাকর'। প্রভাকরের কীর্তি সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের কথারই প্রতিধ্বনি করতে হয়। তিনি লিখেছেন : 'বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে, অনেকস্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অগ্রগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল—যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখান। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষ পার্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। ...বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।'

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রভাকরকে আর একটি মহৎ গৌরবের অধিকারী করেছিলেন, তা হচ্ছে প্রাচীন কবিদের জীবনী ও রচনা প্রকাশ। নানা স্থান পর্যটন করে বহু পরিশ্রমে তাঁকে এই কাজকে কৃতকার্য করে তুলতে হয়েছিল। ১২৫৭ সালের ১লা বৈশাখ থেকে অনুষ্ঠিত নববর্ষোৎসব তাঁর আর এক অদ্ভুত সাংস্কৃতিক কর্ম। 'তত্ত্ববোধিনী'র মত দু-একটি সভা ভিন্ন এরকম সাংস্কৃতিক সম্মেলন সে-যুগে একরকম বিরলই ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিরা ঈশ্বরচন্দ্রের এই বর্ষোৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। সেযুগে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্পর্শে বাঙালীর নতুন করে নতুন যুগের পরিবেশে সংস্কৃতি চর্চার নানাদিক খুলে গেল। ড্রিংকওয়াটার বেথুনের অনুরোধে তিনি শিশুসাহিত্য রচনাতেও মনোনিবেশ করেন। উত্তরকালের ব্যক্তি-প্রবর্তিত বাংলা সাহিত্যের স্ফুরণ ঈশ্বরচন্দ্রের সময় থেকেই দেখা দেয়। ঈশ্বরচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্যের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র মহাকাব্য সৃষ্টি করলেন ; সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ও বিহারীলালের হাতে লিরিকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল ; কাব্যে নতুন প্রাণশক্তি আনলেন অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও গোবিন্দ দাস ; উপন্যাস ও নাটকে বিপ্লব আনলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু। অস্থির অব্যবস্থিত অথচ ধর্মান্ধ এই বঙ্গ সমাজের সংস্কারাবদ্ধ অন্ধকারগর্ভে সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দীপ জেলে দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। নিজে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও দেশের মানুষকে তিনি 'মানুষ' করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' লেখেন—

—'যে মনুষ্যের অর্থদ্বারা ক্ষুধাতুরের ক্ষুধা এবং তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণা নিবারণ না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে ; যে মনুষ্য স্বদেশের স্বাধীনতা স্থাপনের প্রতি অনুরাগী ও উৎসাহী না হইল, সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে।...মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি প্রেমরূপ হেম দ্বারা মনের শরীর শোভিত করেন। মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, দয়া যাঁর মনের অলঙ্কার হইয়াছে ; মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বদেশীয় লোকের কল্যাণার্থে অত্যন্ত অনুরাগী ; অপিচ মনুষ্য তাঁহাকেই বলি, যিনি স্বজাতীয় ধর্ম ও শাস্ত্রের উন্নতির জন্য প্রযত্ন করেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।'

এই সমুদয় গুণেরই অধিকারী ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। দুটি যুগের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই তিনি এমনই করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিজয় দুন্দুভি বাজাতে পেরেছিলেন।

'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' সম্পর্কে ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ-সমালোচনা সম্পর্কে ডক্টর জনসনের একটি প্রাজ্ঞোক্তির অনুসরণ করে লেখকমাত্রেই বলতে পারেন—No man *was* ever written down but by himself. বস্তুতঃ, গ্রন্থের মধ্যে গুণের কিছু থাকলে শত নিন্দাতেও তা চিরদিন চাপা থাকবে না, আর গুণের যদি কিছুই না থাকে তা হলে শত প্রশংসাতেও কোনই ফলোদয় হবে না। তা ছাড়া অবিমিশ্র নিন্দা কিংবা অবিমিশ্র প্রশংসা কোন গ্রন্থকারেরই ভাগ্যে জুটতে পারে না। গ্রন্থ প্রকাশিত হলে প্রথমেই প্রীতিবদ্ধ বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা যেমন প্রশংসা করবেন তেমনই প্রীতিলেশহীন শত্রুরা করবেন নিন্দা। তারপর, যদি লেখকের সৌভাগ্য থাকে, তা হলে বিদ্বজ্জনসমাজে তাঁর রচনার দোষগুণের সত্যকার বিচার শুরু হবে; এবং সেক্ষেত্রেও মতভেদ চিরদিনই থাকবে, কেন না 'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।' কাজেই প্রশংসায় উল্লসিত কিংবা নিন্দায় বিচলিত না-হওয়াই লেখকের কর্তব্য। বরং নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে সচেতন থাকলে বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারাই গ্রন্থকার সমধিক উপকৃত হয়ে থাকেন।

আমার লেখা 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানি সম্পর্কে সাময়িক-পত্রিকাদিতে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। নিন্দাপ্রশংসা-নির্বিশেষে সমালোচকগণের অভিমত আমি যথোচিত শ্রদ্ধার সঙ্গেই নীরবে গ্রহণ করেছি। সম্প্রতি, গত মাঘ মাসের 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় (৩৮০-৮৫ পৃষ্ঠায়) ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় গ্রন্থখানির একটি আলোচনা করেছেন। গ্রন্থখানির নাম দেখামাত্রই দাশগুপ্ত মহাশয়ের আশঙ্কা হয়েছিল, এর বক্তব্য "অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন" হবে; পড়ার পর তিনি বুঝেছেন তাঁর সে আশঙ্কা অমূলক হয় নি। তাঁর বিচারে "বইখানির নামের মধ্যেই এক বিভ্রাটের আভাস। ইহা বিষয়-নির্বাচনের বিভ্রাট।" তা ছাড়া "গ্রন্থকারের দায়িত্বজ্ঞানহীন অমনোযোগিতার নিদর্শন প্রতি পৃষ্ঠায়।" 'বিষয়-বিন্যাসের অসংলগ্নতা', 'তথ্যবিন্যাসের ভুলপ্রমাদ' এবং 'স্ববিরোধী উক্তি'তে গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ। গ্রন্থকারের কোন উক্তিতেই "বিশুদ্ধ চিন্তা বা শ্রমশীলতার পরিচয়" নেই। যে পরিশ্রম করলে এ বিষয়ে একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা সম্ভব "সে পরিশ্রম গ্রন্থকারের ধারণার বহির্ভূত"। শুধু "মৌলিকতার গৌরবের উগ্র আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোনো মানসিক অবস্থার পরিচয়" সমালোচক এ গ্রন্থে পান নি। কাজেই দাশগুপ্ত মহাশয়ের সিদ্ধান্ত—বইখানি "অপাঠ্য", বিশেষ করে "ছাত্রদের পক্ষে মারাত্মক।"

অর্থাৎ সমালোচক মহাশয় বলতে কিছুই বাকি রাখেন নি। এমন কি এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, বইখানি পড়ে কোন পাঠক মাইকেল রচিত 'কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া' নামক সনেটটির প্রথম দুই লাইন আবৃত্তি করেছিলেন। ইঙ্গিতে সনেটটির উল্লেখ করেই দাশগুপ্ত মহাশয় ক্ষান্ত হন নি। শেষ পর্যন্ত নিজের হাত দিয়েই গ্রন্থখানির সৎকারের ব্যবস্থা করেছেন!

দাশগুপ্ত মহাশয়ের এ আলোচনা কোন্ স্তরের এবং কী উদ্দেশ্যে লেখা সে বিচার করবেন পাঠকসমাজ। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। সুতরাং দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতামত সম্পর্কে আমি কোনো আলোচনাই এখানে করব না। দাশগুপ্ত মহাশয় সুপণ্ডিত। তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাসের উপর গবেষণা করে ডি. ফিল. উপাধি পেয়েছিলেন। সম্প্রতি বিলেতে গিয়ে মিল্টনের উপর কাজ করে অক্সফোর্ডেরও ডি. ফিল. উপাধি নিয়ে এসেছেন। দাশগুপ্ত মহাশয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রীডার', এবং শোনা যাচ্ছে

শীঘ্রই সেখানকার ইংরেজি-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে বৃত হবেন। সুতরাং তাঁর অভিমতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তা ছাড়া, শুধু অভিমত প্রকাশ করেই দাশগুপ্ত মহাশয় নিবৃত্ত হন নি, তিনি গুরুমহাশয়ের আসনে বসে গ্রন্থকারকে ভাষা সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন, এবং কথায় কথায় এমন সব আপ্তবাক্য উচ্চারণ করেছেন যা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন সাহিত্য-বিচারক্ষেত্রে তিনি সর্বজ্ঞ, অতএব তাঁর উক্তিই অভ্রান্ত প্রামাণ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য। তিনি লিখেছেন, "এ গ্রন্থের রচনায় পঞ্চাশের অধিক পণ্ডিতের উৎসাহ ও সহায়তা লাভ করিয়া লেখক অনুগৃহীত হইয়াছেন। মনে হয় মাত্র দুই-একটি পণ্ডিতকে সমগ্র পাণ্ডুলিপি দেখাইলে গ্রন্থের তথ্যবিন্যাস ও বিষয়-বিস্তারের মারাত্মক অসামঞ্জস্য ও অপ্রাসঙ্গিকতা কিছু দূর হইত।" পাঠকগণ অহংকার-স্ফীত দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্পর্ধিত ভাষণ আশা করি লক্ষ্য করেছেন! "পঞ্চাশের অধিক পণ্ডিত" এবং "দুই-একটি পণ্ডিত" বলেই তিনি বাংলার পণ্ডিতসমাজকে 'অনুগ্রহ' করেছেন, "পণ্ডিতগণ" বা "দুই-একজন পণ্ডিতব্যক্তি" বলার ন্যূনতম সৌজন্যরক্ষারও তিনি প্রয়োজন মনে করেন না! আমার দুর্ভাগ্য, যিনি গ্রন্থের নাম দেখেই বুঝে নিতে পারেন যে লেখকের বক্তব্য অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন হবে এমন একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎ আমি গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে পাই নি। কিন্তু ওই সাড়ে-পাঁচ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের মধ্যেই এই দিগ্‌বিজয়ী বিশ্বপণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবুদ্ধি, সাহিত্য-বিচারশক্তি, ভাষা ও রসবোধ এবং সর্বোপরি তাঁর সাধুতার যে স্বরূপ প্রকট হয়ে উঠেছে তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় বাংলার পাঠকসমাজের কাছে উপস্থাপিত করার প্রয়োজনবোধেই বর্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

১। প্রথমেই দাশগুপ্ত মহাশয়ের সাধুতার পরীক্ষা করা যাক। তিনি লিখেছেন—

> 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' পড়ি 'সনেট কলাকৃতির তাত্ত্বিক বিচার—Philosophy of the Sonnet Form—সম্পর্কে কোন আলোচনা কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।' এবং গ্রন্থকারের মতে সেই বিচার তিনিই প্রথম করিলেন। এ অবিনয় অশোভন। আলোচনার মৌলিকতা বিচারে আলোচকের সাক্ষিণী অগ্রাহ্য। সনেটের জন্ম ইউরোপে, ইউরোপীয় কবি প্রতিভায় ইহার সৌষ্ঠব, অথচ ইউরোপে এই শ্রেণীর কবিতার যথার্থ আলোচনা এই সাত শত বৎসরে হইল না এমন কথা প্রলাপের তুল্য।

আলোচনার শেষেও তিনি পুনরায় লিখেছেন, "সনেট সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ইতিপূর্বে কোথাও হয় নাই গ্রন্থকার বহুবার বলিয়াছেন।" "বহুবার" নয়, যদি সত্যই আমি একবারও এ কথা বলে থাকি যে, সনেট সম্পর্কে "যথার্থ" বা "গভীর" আলোচনা কোথাও হয় নি তা হলে নিশ্চয়ই সে কথা 'প্রলাপের তুল্য'। এখন দেখা যাক, গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমি কী বলেছি। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে'র যে অংশ কৌশলে বাদ দিয়ে শেষটুকু মাত্র দাশগুপ্ত মহাশয় উদ্ধার করেছেন, তাতে আছে—

> "ইংরেজি সাহিত্যে সনেট-সমালোচনা গ্রন্থের অভাব নেই। 'এনসাইক্লপিডিয়া ব্রিটানিকা'র সনেট-প্রবন্ধের শেষে যে গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া আছে তার পরেও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৩৬ সনে মুদ্রিত Enid Hamer-সম্পাদিত The English Sonnet নামক সংকলন-গ্রন্থ এবং ১৯৫৬ সনে মুদ্রিত J. W. Lever-রচিত Elizabethan Love Sonnet নামক সমালোচনা-গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। আমি এই দুখানি গ্রন্থের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছি।
>
> কলাকৃতি হিসাবে ইতালীয় সনেট পেত্রার্কার হাতেই চরমোৎকর্ষ পেয়েছিল। পেত্রার্কার আবির্ভাবের পরে সার্ধ-ষট্‌শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সনেট সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ বিভিন্ন দেশে হয়েছে; কিন্তু 'সনেট-দর্শন' অর্থাৎ সনেট-কলাকৃতির তাত্ত্বিক বিচার—Philosophy of the Sonnet Form-সম্পর্কে কোন আলোচনা কোথাও হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"

'পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণে'র অর্থ ও তাৎপর্য লেখক

বোঝেন না এ কথা অনুমান করলে তাঁকে মূর্খ বলে প্রমাণিত করা হয়। কাজেই ধরে নিতে হবে, তিনি সজ্ঞানেই আমার বক্তব্যকে খণ্ডিত ও বিকৃত করেছেন। আলোচনার প্রথমেই ডক্টর জনসনের একটি প্রাজ্ঞোক্তির উল্লেখ করেছি। প্রতিপক্ষ অনুরূপ অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করলে জনসন কি বলতেন দেখা যাক্। Boswell লিখছেন—

Johnson had accustomed himself to use the word *lie*, to express a mistake or an error in relation; in short, when the *thing was not so as told* though the relater did not *mean* to deceive. When he thought there was intentional falsehood in the relater, his expression was, 'He *lies*, and he *knows he lies*.'

২। আমার উক্তিকে প্রসঙ্গ থেকে বিচ্যুত করে লেখক কিভাবে পাঠককে ভুল বুঝিয়ে নিজের অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছেন তার একটি মাত্র উদাহরণ দেব। তিনি লিখেছেন বিখ্যাত ইংরেজ সমালোচকগণের সুপরিচিত গ্রন্থসমূহ থেকে বহু উক্তি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট! "এবং ইহাদের বিচার-বিশ্লেষণ এই গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, 'ইংরেজ সমালোচকদের এই অন্ধ পুচ্ছানুগ্রাহিতা সত্যই বিস্ময়কর।' যখন স্মরণ করি এই বইখানিতে যে কয়টি যথার্থ কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় তাহা পুরাপুরি ইংরেজ সমালোচকের কথা, তখন মনে হয় বিদেশী পণ্ডিত সম্বন্ধে গ্রন্থকারের এ উক্তি উত্তমর্ণকে তস্কর বলিয়া হঠাইয়া দেওয়ার সামিল।"

আমার গ্রন্থখানি ২৩৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তার প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে 'সনেটের জন্মকথা' আলোচিত হয়েছে, বাকি দুইশতাধিক পৃষ্ঠায় মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সুতরাং সনেট সম্পর্কে ইংরেজ সমালোচকগণের উক্তিসমূহের বিচার-বিশ্লেষণই আমার গ্রন্থের 'প্রধান উপজীব্য' কি না সে বিচার বিদ্বজ্জন করবেন। আমি শুধু কী প্রসঙ্গে "ইংরেজ সমালোচকদের অন্ধ পুচ্ছানুগ্রাহিতার" সমালোচনা করেছি সে কথাই বলব। সনেটের অষ্টকবন্ধ ও ষট্‌কবন্ধের মধ্যে সম্পর্ক কি, এবং আবর্তনসন্ধিতে কি ভাবে ভাবের ভারসাম্য রক্ষিত হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমি বলেছি—

অষ্টক-ষট্‌কের এই সাপেক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্যে ইংরেজি সমালোচনা-সাহিত্যে কবি থিওডোর ওয়াট্‌স-ডানটনের একটি কবিতা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে। ওয়াট্‌স-ডানটন সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনের সঙ্গে অষ্টক-ষট্‌কের তুলনা করে বলেছেন:

A Sonnet is a wave of melody:
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "Octave"; then returning free,
Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of Life's tumultuous sea.

কবিতাটি কাব্য হিসাবে সুন্দর। সমুদ্রতরঙ্গের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সনেটের ছন্দ-সংগীতের উত্থান-পতনের রহস্যটি আশ্চর্য সৌন্দর্যে উপমিত হয়েছে। Impassioned soul থেকে ভাবের তরঙ্গোচ্ছ্বাস উত্থিত হয়ে জীবনের উত্তাল সমুদ্রে আবার বিলীন হয়ে যাবার কল্পনাটিও তাৎপর্যমণ্ডিত। কিন্তু কবির এই সুন্দর উপমাটি পরবর্তী ইংরেজ সমালোচকদের মনে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। 'Voice of the Sonnet'-এর এই উত্তরাংশে কবি অষ্টককে জোয়ারের সঙ্গে এবং ষট্‌ককে ভাঁটার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই কল্পনাকেই অনুসরণ করে উইলিয়াম শার্প পেত্রার্কার অষ্টক ও ষট্‌ককে ঝটিকার আগমন-নির্গমনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন:

The Petrarcan (Sonnet)...is like a wind gathering in volume and dying away again immediately on attaining a culminating force.

ভেরিটি এই একই কথার পুনরুক্তি করে বলেছেন:

The marked pause at the close of this movement necessarily makes a climax: the sonnet reaches its high-water point of thought and rhythm, and then falls gradually away.

এমন কি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, ১৯৩৬ সনে ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত ছান্দসিক Enid Hamer ইংরেজি সনেটের যে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তার ভূমিকাতেও একই বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনিও বলেছেন:

The good Petrarcan sonnet often rises smoothly to a climax at the end of the octave and has a swift, tumultuous, or sinuous cadence in the sestet, which has been compared with the breaking of a wave.

ইংরেজ সমালোচকদের এই অন্ধ পুচ্ছাংশগ্রাহিতা সত্যই বিস্ময়কর।

আমি শুধু এই পুচ্ছাংশগ্রাহিতার কথা উল্লেখ করেই আমার বক্তব্য শেষ করি নি। এই বিভ্রান্তির কৌতুকাবহ হেতুটিরও বিশ্লেষণ করে বলেছি—

> ওয়াট্স-ডানটন বলেছেন, তাঁর মতে অষ্টক-ষট্কের সম্পৃক্তি-রচনার প্রকারভেদে সনেট মুখ্যত চতুর্বিধ। প্রথম জাতের সনেটে ছন্দঃস্পন্দ ও ভাবের বলবত্তর অংশ থাকে ষট্ক-বন্ধে, অর্থাৎ সে পর্যায়ে যেন আগে ভাঁটা, পরে জোয়ার। দ্বিতীয় জাতের সনেট তার বিপরীত। সেখানে অষ্টকে জোয়ার, ষট্কতে ভাঁটা। তৃতীয় জাতের সনেটে ষট্ক-বন্ধ অষ্টক থেকে মোটেই পৃথক নয়, একই ভাবের প্রবাহ শেষ চরণ পর্যন্ত অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহমান। অর্থাৎ সেখানে আবর্তন-সন্ধি অনুপস্থিত। চতুর্থ পর্যায়ে ষট্ক যেন কবিতার শেষে আলাদা জুড়ে দেওয়া। তা যেন কবিতার পুচ্ছাংশ। প্রভাঁসাল বা ফরাসি কাব্যের 'Envoy' বা সংগীতের 'Coda'র মত। বলাই বাহুল্য, তৃতীয় পর্যায়ের সনেট নিকৃষ্ট, চতুর্থ নিকৃষ্টতর।
>
> ওয়াট্স-ডানটন বলেছেন, এই চার পর্যায়ের সনেটের উদাহরণ হিসাবে তিনি চারটি সনেট রচনা করেন—'4 sonnets on the sonnet.' তার মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের উদাহরণটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে Sonnet's Voice শিরোনামায় উদ্ধৃত হয়। তারই উপরে অন্ধ নির্ভরতার ফলে ইংরেজি সমালোচনায় এই *বিস্ময়কর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু সনেট-রচনার সর্বক্ষেত্রেই ছন্দঃস্পন্দ ও ভাবের বলবত্তর অংশ অষ্টক-বন্ধে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন হতেই পারে না।* তা হলে ষট্ক-বন্ধ অপ্রধান ও দুর্বল হয়ে পড়বেই।

এই আলোচনা আমি এখানেই শেষ করি নি; উইলিয়াম শার্প তাঁর ভুল বুঝতে পেরে কি নূতন কথা বলেছেন এবং সে কথা বলতে গিয়ে তিনি আবার কি নূতন ভুল করেছেন তার আলোচনাও এই প্রসঙ্গে করেছি (দ্রষ্টব্য, আমার গ্রন্থ, পৃ. ১২)। এবার পাঠকসমাজ বিচার করুন, আমার এই মন্তব্যটি তীব্র হলেও যথার্থ হয়েছে কি না; এবং আমি পুরোপুরি ইংরেজ সমালোচকদের কথারই কেবল পুনরাবৃত্তি করেছি কিনা।

৩। দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—

"নানা মুনির নানা মত খণ্ডন করিয়া এ গ্রন্থ সনেট সম্বন্ধে যে নূতন 'তত্ত্ব' উপস্থিত করিতেছে তাহার নামকরণ হইয়াছে 'আসক্তি মুক্তি তত্ত্ব'। বহু তৎসম শব্দের সাহায্যে এই নতুন তত্ত্ব বিবৃত। সমুদয় পাঠে অবশ্য মনে হয় ইহা সেই 'যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা'র 'বিবর্তন আবর্তন সংঘর্তন (?) আদি'র ন্যায় কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট। একটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে,—'...সনেটের আসক্তি মুক্তি লীলা শুধু তত্ত্বরূপেই সত্য নয়, শিল্পরূপেও অঙ্গাঙ্গী ভাবে সত্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, সংবৃত চতুষ্কযুগলে দুটি মাত্র মিলের পুনঃ পুনঃ আবর্তনে সনেটের অষ্টকবন্ধে শিল্পদেহে ভাবের গ্রন্থিবন্ধনের যেমন ব্যবস্থা হয় তেমনি ষট্কবন্ধে বিবৃত ত্রিকযুগলের মিলবিন্যাসে সেই সংসক্ত ভাব রসমোক্ষের লীলাতে মুক্তি পেতে থাকে।'

এই উদ্ধৃতির শেষে তিনি টিপ্পনী করেছেন, "এই 'রসমোক্ষের লীলা'তে প্রাপ্তব্য 'মুক্তি' যিনি বুঝিবেন না তিনি Petrarch-এর সনেট আস্বাদনে অক্ষম। তবে সাধারণ পাঠকের কাছে এ তত্ত্ব গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা বলিয়াই মনে হইবে। Petrarch-এর সনেট সম্বন্ধে এ তত্ত্বের অপ্রযোজ্যতা প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন।" শেষবাক্যটি যেন আচার্য দাশগুপ্ত মহাশয়ের নির্দেশনামা! কিন্তু সনেট-শাস্ত্র সম্পর্কে এ জাতীয় শ্রৌতবাক্য উচ্চারণের অধিকার সমালোচক মহাশয় অর্জন করেছেন কিনা তাঁর *সম্পর্কে এই প্রাথমিক জিজ্ঞাসা* এ আলোচনার উপসংহারে করা হবে। টিপ্পনীর উপান্তবাক্যে সমালোচক সাধারণ পাঠকের কথা শ্লেষচ্ছলে উত্থাপন করেছেন। কিন্তু কাব্যের আস্বাদনে কাব্যশাস্ত্রজ্ঞান যে 'সাধারণ পাঠকে'র পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়, এ কথা বলার জন্যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না এবং এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটিই চিরদিন স্মরণীয় :

"রুচির সম্বন্ধে লোকে বেপরোয়া, কেন-না ওদিকে

কোনো শাসন নেই। অশিক্ষিত রুচিও রসের সামগ্রী থেকে যা হোক কোনো একটা আস্বাদন পায়। আর যদি সে মনে করে তারই বোধ রসবোধের চরম আদর্শ, তবে তা নিয়ে তর্ক তুললে ফৌজদারী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। কবিতা গল্প নাটকের বাজারের দিকে যারা সমজদারের রাজপথটা পায়নি, অন্ততঃ তারা আনাড়ি পাড়ার মাঠ দিয়েও চলতে পারে, কোনো মাশুল দিতে হয় না কোথাও।"

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

৪। পূর্বেই বলেছি, দাশগুপ্ত মহাশয় প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করে ডি. ফিল. উপাধি পেয়েছেন। তাঁর সেই গবেষণা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তিনি কোন্ ভাষায় তা লিখেছিলেন তাও আমরা জানি না। কিন্তু তাঁর মাতৃভাষাজ্ঞান ও ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বিদ্যাবুদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় তিনি এই সাড়ে-পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যেই আমাদের দিয়েছেন। আমি 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' অধ্যাপক ফাদার ফালোঁর কাছে আমার ঋণের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলাম, 'বাংলা সাহিত্য-প্রেমী এই বিদেশী বন্ধু প্রভাঁসাল সাহিত্য, ত্রুবাদুর প্রেম এবং ইতালীয় সনেট-সাহিত্যে অনুপ্রবেশে আমাকে প্রতিপদে সাহায্য করেছেন। ইতালীয় ভাষায় আমার অনধিকার সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে আমি ইতালীয় বাক্‌স্পন্দ এবং ছন্দ-সংগীতের আস্বাদন পেয়েছি।'

সমালোচক লিখছেন, "এ আস্বাদন এক্ষেত্রে তেমন ফলপ্রসূ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কাব্যের আত্মা ধ্বনি আনন্দবর্ধনের এই উক্তির মূল্য স্বীকার করিয়াও বলা যায় অপরের কণ্ঠে শুনিয়া বিদেশী কাব্যের ভাষা ও ছন্দের সার্থক বিশ্লেষণের চেষ্টা মারাত্মক।"

একেই বলে, একেবারে 'ক' বলতে 'কৃষ্ণনাম'! আমি শুধু তাঁহার 'বাক্‌স্পন্দ এবং ছন্দসংগীতে'র কথাই বলেছিলাম। বাগর্থসম্পৃক্তির নাম ভাষা, এ কথা সবারই জানা। অর্থসম্পৃক্তিহীন শুদ্ধমাত্র ধ্বনির কথাই আমি বলেছি। কিন্তু যে ভাষা জানি না তার বাক্‌স্পন্দ (sound-vibration) এবং ছন্দসংগীত (music of rhythm)-এর আস্বাদনের উল্লেখ করার তাৎপর্য কি তা দাশগুপ্ত মহাশয়ের বুদ্ধিগ্রাহ্য হয় নি। সেই জন্যেই তিনি একেবারে আনন্দবর্ধনের 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি'কে টেনে এনেছেন। ধ্বনিবাদ সম্পর্কে যাঁর সামান্য ধারণাও আছে তিনিই বুঝবেন বাক্‌স্পন্দ এবং ছন্দসংগীতের প্রসঙ্গে যিনি 'কাব্যের আত্মা ধ্বনি'র কথা চিন্তা করেন ধ্বনিবাদ সম্পর্কে তাঁর কোনই কাণ্ডজ্ঞান নেই। আমার একটি ভুলকে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে ব্যবহার করে দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন, "ইংরাজীতে লেখা একখানা বই যিনি ব্যবহার করিতে জানেন না তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য সম্পর্কে এমন মৌলিক আলোচনা করিলেন কোন্ তপোবলে বুঝিলাম না।" তাঁরই বিদগ্ধ ভাষণের অনুসরণ করে আমাদেরও জিজ্ঞাস্য, ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বে যাঁর প্রাথমিক জ্ঞান পর্যন্ত জন্মায় নি তিনি বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন কোন্ তপোবলে?

৫। আমি 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' বলেছি আমার বিদেশী-বন্ধুর সাহায্যেই আমি পেত্রার্কার একটি সনেট মূল ইতালীয় ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি। দাশগুপ্ত মহাশয়ের মতে অনুবাদটি "মূলানুগ" হয় নি। তিনি বলেছেন, "প্রথম দুই লাইনেই দেখি মূলের সঙ্গে অনুবাদের সম্পর্ক একান্ত ক্ষীণ। অনুবাদকের স্বাধীনতা এ অনুবাদে মাত্রা ছাড়াইয়াছে। অনুবাদে 'বাধাবন্ধহারা' শব্দটির সমার্থক বা দ্যোতক কোন শব্দ মূলে নাই। মনে হয় 'আসক্তি মুক্তি তত্ত্বে'র কল্যাণে এই শব্দটি প্রবেশ করিয়াছে! অথচ মূলের প্রথম দুই লাইনে বিশেষণ পদ bel ও dolce শব্দদুটির বাংলা অভিধা অনুবাদে অনুপস্থিত। Thomas Campbell সম্পাদিত Petrarch-এর কবিতাসংগ্রহে সন্নিবিষ্ট Rev. Dr. Nott কৃত এই সনেটের অনুবাদে jocund, serenely clear বিশেষণ পদের অর্থ রক্ষা করিয়াছে।"

'বাধাবন্ধহারা' নিয়ে দাশগুপ্ত মহাশয় মিথ্যাই ব্যস্ত হবার চেষ্টা করেছেন। কারণ ওই কথাটি আমি রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতা থেকে গ্রহণ করেছি। "বর্ষশেষে"র প্রারম্ভে কথাটি যে অর্থ-ব্যঞ্জনা লাভ করেছে আমি সেই ব্যঞ্জনা-সৃষ্টির প্রয়াসেই এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছি। কাজেই "মনে হয় 'আসক্তি মুক্তি তত্ত্বে'র কল্যাণে এই

শব্দটি প্রবেশ করিয়াছে”—এই উক্তি দ্বারা দাশগুপ্ত মহাশয় [বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়] ‘লোক হাসা’তে গিয়ে যে স্বয়ং ‘হাস্যের পাত্র’ হয়ে উঠেছেন সে রসবোধ তাঁর নেই। তা ছাড়া দাশগুপ্ত মহাশয় বাংলার সমস্ত পাঠকসমাজকেই মূর্খ ভাবলেন কি করে বুঝতে পারি না। স্বীকার করি, আমার কৃত অনুবাদে bel ও dolce শব্দ দুটির বাংলা অভিধা অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর উদাহৃত অনুবাদেই কি তা উপস্থিত? bel মানে beautiful আর dolce মানে sweet। কাজেই আমাদের জিজ্ঞাস্য serenely clear কথার দ্বারা beautiful-এর এবং jocund কথার দ্বারা sweet-এর অভিধাগত অর্থরক্ষা হয়েছে কী?

লজ্জার মাথা খেয়ে দাশগুপ্ত মহাশয়কেও স্বীকার করতে হবে যে, দুটি বিশেষণ পদের অর্থ রক্ষার জন্য Rev. Dr. Nott যে শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন সেগুলিও অভিধা নয়, লক্ষণাশক্তিতেই সিদ্ধ। এখন তাঁকে আমার জিজ্ঞাস্য, serenely clear হলেই যদি beautiful হয় তা হলে দক্ষিণ হাওয়ার পুনরাগমনের পথ ‘বাধাবন্ধহারা’ হলে প্রকৃতি সুন্দর হয় কি না? এবং jocund হলেই যদি sweet হয় তা হলে দক্ষিণ হাওয়ার স্বরগ্রাম পুষ্প আর বৃক্ষপর্ণে গুঞ্জরিত হলে তা সুমধুর হবে না কেন?

দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন কবিতার “প্রথম দুই লাইনেই মূলের সঙ্গে অনুবাদের সম্পর্ক একান্ত ক্ষীণ।” পরীক্ষা করে দেখা যাক, Nott ছাড়া আরও তিনজন কবিতাটির যে অনুবাদ করেছেন তাঁরা মূলের সঙ্গে কতটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতে পেরেছেন। Campbell সাহেব তাঁর গ্রন্থে Nott-এর পাশেই ওই তিনটি অনুবাদও সংগ্রহ করে দিয়েছেন:

The spring returns, with all her smiling train;
The wanton Zephyrs breath along the bowers,

[অনুবাদক Woodhouselee

Returning Zephyr the sweet season brings,
With flowers and herbs his breathing train among.

[অনুবাদক Dacre

Zephyr returns and winter's rage restrains,
With herbs, with flowers, his blooming progeny!

[অনুবাদক Charlemont

দাশগুপ্ত মহাশয় অনুগ্রহ করে বলে দেবেন কি, bel ও dolce শব্দদুটির ইংরেজি অভিধা এই তিনটি অনুবাদে কোন্ কোন্ স্থলে রক্ষিত হয়েছে?

নিজের কাব্যরচনার উৎকর্ষ নিয়ে কুতর্কে যোগদান করতে লেখকমাত্রেরই সংকোচ বোধ হয়। তাই এ বিচারের ভার বাংলার কবি-সমাজের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি। অন্য ভাষার একটি কবিতার কাব্যানুবাদে অনুবাদকের স্বাধীনতা আমার রচনায় মাত্রা ছাড়িয়েছে কি না তার পরীক্ষার জন্যে আমি মূল কবিতাটির একটি আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ, Rev. Dr. Nott-কৃত অনুবাদ এবং আমার অক্ষম বাংলা অনুবাদটি নিয়ে পর পর উদ্ধৃত করলাম:—

The zephyr comes back, and the fair weather it brings back,
And the flowers, and the grass (plants), and its sweet family:
The warbling Progne and the lamenting Philomel,
And spring white and bright-red.
The meadows smile and the sky clears up;
Jupiter rejoices contemplating his daughter:
The air and the water and the earth full of love:
Every living thing feels inclined again to love.
But as for me, alas, come back the more grievous
Sighs which from the depth of my heart she wrests
Who has taken away to Heaven the keys of this heart of mine.
The singing birds and the blooming meadows
And in beautiful ladies of rank the suave gestures
Are a desert, and wild beasts harsh and savage.

ZEPHYR returns; and in his jocund train
Brings verdure, flowers, and days serenely clear;
Brings Progne's twitter, Philomel's lorn strain,
With every bloom that paints the vernal year;
Cloudless the skies, and smiling every plain;
With joyance flush'd, Jove views his daughter dear;
Love's genial power pervades earth, air, and main;
All beings join'd in fond accord appear.
But nought to me returns save sorrowing sighs,
Forced from my inmost heart by her who bore
Those keys which govern'd it unto the skies:
The blossom'd meads, the choristers of air,
Sweet courteous damsels can delight no more;
Each face looks savage, and each prospect drear.

আবার দক্ষিণ হাওয়া ফিরে এল বাধাবন্ধহারা,
পুষ্পে আর বৃক্ষপর্ণে গুঞ্জরিত তারি স্বরগ্রাম;—
বাবুই কি যেন বকে, বুলবুল কেঁদে-কেঁদে সারা,—
শুভ্রতায় স্বর্ণাভায় বসন্ত কি নয়নাভিরাম!
হাসিতে উজ্জ্বল মাঠ, নীলাকাশ স্ফটিকের ধারা,—
কন্যার লাবণ্য দেখে প্রজাপতি পূর্ণ-মনস্কাম;

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে উচ্ছলিত প্রেমের ফোয়ারা,
মধুর মিলনমন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে প্রিয়নাম।

আমার হৃদয়ে হায় দীর্ঘশ্বাস আরো গুরুভার,—
যে-নারী গিয়েছে স্বর্গে হৃদয়ের চাবি ক'রে চুরি
তারি গূঢ় আকর্ষণে কূলপ্লাবী ব্যথার পাথার;—
আমার জীবনে আর ফিরিবে না বসন্ত-মাধুরী!
পাখির কাকলি আর সুন্দরীর লাবণ্য-সম্ভার
শুধু যেন মরুভূমি, আর হিংস্র শ্বাপদ-চাতুরি!!

৬। দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন—

"যে অসতর্কতা এই অনুবাদে সেই অসতর্কতা আবার তথ্য-সংকলনে। যেমন ২২ পৃষ্ঠায় পড়ি, 'Giacomo da Lentino তাদের (সনেটের) আদি রচয়িতা'। গ্রন্থকার ইতালীয় সাহিত্যের যে ইতিহাসখানির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতেই আছে '...there is then some inherent probability that the invention of the sonnet is due to Giacomo. There is of course no certainty as to which of the Frederician sonnets is the earliest. (E. H. Wilkins, A Histroy of Italian Literature, Harvard University Press, 1954, P. 19.) Giacomoই প্রথম সনেটকার ইহার সুনিশ্চিত প্রমাণের অভাবে Wilkins inherent probabilityর কথা বলিয়াছেন এবং দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন অনুসন্ধানীর কথা বলার এইই রীতি।"

দাশগুপ্ত মহাশয়ের এই মন্তব্য পড়ে বুঝতে পারছি, রবীন্দ্রনাথ "যবনপণ্ডিতদের 'গুরুমারা' চেলা"দের সম্পর্কে কতটা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: "ঘুচল না আমাদের নোট-বইয়ের শাসন, আমাদের বিচারবুদ্ধিতে নেই সাহস, আছে নজির মিলিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে চলা।"

দাশগুপ্ত মহাশয় ইতালীয় ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন। তাঁর জানা উচিত ফ্রেড্‌রিকান সনেটকারগণের মধ্যে Giacomoই আদি রচয়িতা কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ আছে। কাজেই এক্ষেত্রে 'পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধি' মূঢ়ের মত একপক্ষের কথাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ না করে মহাকবি-কথিত 'সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে' এই প্রাজ্ঞনীতিই অনুসরণ করা কর্তব্য। Giacomo সম্পর্কে আমি উইলকিন্সের চেয়ে উত্তর-ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Urban Tigner Holmes, Jr.কেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছি। তিনি সনেট সম্পর্কে বলেন—

Apparently this verse form was devised in Italy during the 1220's. Our earliest specimens are hendecasyllables by Giacomo da Lentino of the Sicilian school, usually rhymed abab abab cde cde.

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, Holmes এখানে সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশও রাখেন নি। তাঁর এই লেখা বেরিয়েছে Joseph T. Shipley-সম্পাদিত 'Dictionary of World Literature: Criticism—Forms—Technique' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের (সং ১৯৪৩) ৫২৯ পৃষ্ঠায়। সম্পাদক শিপ্‌লি তাঁর অভিধানে ২৬৩ জন 'Advisers and Contributors'-এর নাম উল্লেখ করে ভূমিকায় বিশেষভাবে যে নয় জনের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন Holmes তাঁদের অন্যতম। তা ছাড়া ভূমিকায় শিপ্‌লি লিখেছেন—

All the material here included has been written specially for this volume. Every item is the product of planning, consultation, and consideration both before and after writing.

আশা করি এবার দাশগুপ্ত মহাশয় বুঝতে পারবেন, 'দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অনুসন্ধানী'র কথা বলার প্রকৃত রীতি কোন্‌টি!

৭। এবার একেবারে পশুরাজের গুহায় প্রবেশ করে জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হবে! দাশগুপ্ত মহাশয় মিলটন-বিশেষজ্ঞ। আমি ইংরেজি সাহিত্যের সনেটকারগণের মধ্যে মিলটনের স্থান কি ও কোথায় এই আলোচনাপ্রসঙ্গে বলেছি, "প্যারাডাইস লস্টে'র মহাকবি আটাশ বৎসরে মাত্র চব্বিশটি সনেট রচনা করেই যশস্বী হয়েছেন; তার কারণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহৎ ভাবের বাহন হিসাবে সনেট তাঁর হাতেই ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম পূর্ণমর্যাদা পেল।'

দাশগুপ্ত মহাশয় এই উক্তির উপর টিপ্পনী করে লিখেছেন, "ইহাতে এমন ধারণা হইতে পারে যে মিলটন কৃত চব্বিশটি সনেটই ইংরাজীতে রচিত। কিন্তু মিলটনের

উনিশটি সনেট ইংরাজীতে এবং বাকী পাঁচটি ইতালীয় ভাষায় লিখিত। ইতালীয় সনেট কটি যখন প্রেমের কবিতা এবং বিষয় ও ভাবে ইংরাজী সনেটগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তখন এ কথাটির উল্লেখ অপরিহার্য। আটাশ বৎসরও বা কি হিসাবে তাহা বুঝিলাম না। মিলটনের প্রথম সনেট রচিত হয় ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে আর শেষটির রচনাকাল ১৬৫৮। যদি সময়ের হিসাব একান্ত প্রয়োজনীয়ই হয় তবে সে হিসাব নির্ভুল হওয়াই উচিত।"

আমি সবিনয়ে পুনরায় নিবেদন করছি, সূত্রাকারে আমার বাক্যটির প্রতিটি পদ সিদ্ধ। ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ রুচি ও বুদ্ধি অনুসারে তাঁদের যেমন-খুশী ব্যাখ্যা করতে অবশ্যই পারেন! কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয় এর অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন। আমার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই বলা যে, মিলটন দীর্ঘকালের ব্যবধানে অল্প কটি সার্থক সনেট লিখেই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন তার কারণও আমি বলেছি। আমি বলেছি, মিলটন চব্বিশটি সনেট লিখেছিলেন। দাশগুপ্ত মহাশয় বলছেন, "উনিশটি সনেট ইংরাজীতে এবং বাকি পাঁচটি ইতালীয় ভাষায় লিখিত।" তাঁর এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হল, দাশগুপ্ত মহাশয় জানেন না যে, মিলটন ইংরেজিতে উনিশটি সনেট লেখেন নি, লিখেছেন আঠারোটি। মার্ক পেটিসন সম্পাদিত মিলটনের সনেট-গ্রন্থের ত্রয়োদশ-সংখ্যক 'সনেট'টি [On the new forcers of conscience,...ইত্যাদি] চৌদ্দ পংক্তির সনেট নয়। ওটি আসলে কুড়ি পংক্তির ; অর্থাৎ চৌদ্দ পংক্তির পরে ওতে ছ' পংক্তির coda জুড়ে দেওয়া হয়েছে। তাই এই সনেটকল্প রচনাটিকে টড (১৮০৯), ম্যাসন (১৮৭৪), এবং ভেরিটি (১৮৯৫) কেউই খাঁটি সনেট বলে স্বীকার করেন নি। শেক্‌স্‌পীয়ারের উপর লেখাটিও, চৌদ্দ পংক্তির হওয়া সত্ত্বেও, আমাদের পয়ারের মত পরপর সমপদী মিত্রাক্ষরে লেখা বলে, সনেট হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি। কাজেই মিলটনের লেখা ইংরেজি সনেটের সংখ্যা উনিশ নয়, আঠারো। আমি মার্ক পেটিসনের যুক্তিকে আংশিকভাবে গ্রহণ করে তাঁর সংকলনের উক্ত ত্রয়োদশ-সংখ্যক রচনাটিও সনেটকল্প কলাকৃতির অন্তর্ভূত করে নিয়েই বলেছি, তাঁর লিখিত সনেটের সংখ্যা চব্বিশ। সূত্রাকারে যা বলা হল তার উপযুক্ত ভাষ্য হবে : পাঁচটি ইতালীয় সনেট, আঠারোটি ইংরেজি সনেট এবং একটি সনেটকল্প রচনা, মোট চব্বিশ। মিলটন উনিশটি ইংরেজি সনেট রচনা করেছিলেন, এ ভুল মিলটন-বিশেষজ্ঞ একজন পণ্ডিত করলে আমরা বলতে বাধ্য, অন্য বিষয় দূরে থাক্‌, মিলটন সম্পর্কেই তাঁর জ্ঞান ও চিন্তা "অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন।"

এহ বাহ্য। দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন "আটাশ বৎসরও বা কি হিসাবে" তা তিনি বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারেন নি তার কারণ, তাঁর মতে মিলটনের প্রথম সনেট রচিত হয় ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে। আমার মতে ১৬২৮ নয়, ১৬৩০। অর্থাৎ মিলটনের সনেট-রচনার কালপরিধি হল ১৬৩০-১৬৫৮। এই জন্যই আটাশ বৎসর বলেছি। টড থেকে ভেরিটি পর্যন্ত গত শতাব্দীতে সবাই এই কথাই বলেছেন। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মিলটনের সনেটের রচনাকাল সম্পর্কে Stevens, Hanford, Grierson নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন এবং Smart প্রমাণ করেছেন যে, মিলটনের পাঁচটি ইতালীয় সনেট তাঁর ইতালী-ভ্রমণের ফসল নয়, এগুলি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দিকের রচনা। এসব আলোচনা হবার পরও এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্দশ সংস্করণের পঞ্চদশ খণ্ডের ৫০৭ পৃষ্ঠায় মিলটনের প্রথম যুগের রচনাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আদি সনেটগুলিকে ১৬৩০ সনেই ফেলা হয়েছে। নূতনলব্ধ তথ্যরাজির আলোকে, সাম্প্রতিক কালে আমাদের রবীন্দ্রকুমারের পরেই মিলটন-বিশেষজ্ঞ বলে যাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়, তাঁদের অন্যতম Tillyard তাঁর 'মিলটন' গ্রন্থের ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণে (ষষ্ঠ মুদ্রণ) ৩৭২ পৃষ্ঠায় লিখছেন—

It may now be taken for granted that these poems are pretty close in date, and that they were written before Milton's Sonnet on reaching the age of twenty three. * * * There is the further question whether they were written before or after the *Nativity Ode*. Hanford puts them between the *Fifth Elegy* (April 1629) and the *Nativity Ode* (December 1629). Grierson.. ...suggests May 1630 for the *May Song*, and some date soon after for the rest. I do not think the matter can be proved either way, but I slightly favour the later date.

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য
ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে
স্নান করেন
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন-এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে টিলিয়ার্ডও ১৬৩০ সনের কথাই বলছেন। মিলটনের শেষ সনেট লেখা তাঁর দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যুর পরে। মৃত্যুকাল ফেব্রুয়ারি ১৬৫৮। যদি হ্যানফোর্ডের যুক্তিই মানা যায় যে প্রথম সনেটগুলি ১৬২৯-এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে লেখা, আর যদি অনুমান করি যে, মিলটনের পত্নীবিয়োগের মাসেক কালের মধ্যে অর্থাৎ মার্চ মাসে তিনি তাঁর শেষ সনেট লিখেছিলেন তা হলেও কালপরিমাণ হয় আটাশ-পূর্ণ কয়েক মাস। অতএব ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রাপ্তব্য প্রামাণিক গ্রন্থের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমার মতই ঠিক।

৮। যে বিষয়ে নিজেরই কোন স্পষ্ট ধারণা নেই সে বিষয়েও পরের ছিদ্রান্বেষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের স্বভাব বলে মনে হল। মধুসূদন-প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলাম—

> মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাসে মধুসূদনের অন্তর্জীবন-কথা সম্পূর্ণভাবে জানবার উপায় নেই। কিন্তু সেখানে তাঁর জীবনের একটি ইঙ্গিত বিশেষ ব্যঞ্জনাময়। সেখানে মধুসূদনের জীবনে এসেছিলেন দুটি নারী। এই দুই নারী যেন প্রেমিক-কবি মধুসূদনের জীবনে দুটি দিব্য সংকেত। ইংরেজ-নন্দিনী রেবেকার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। অল্পদিনের ঘরকন্না। সন্তান সন্ততিও হয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। মধুসূদনের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তারপর এলেন তাঁর জীবনে ফরাসি-দুহিতা আঁরিয়েৎ; তাঁর প্রেমলক্ষ্মী, তাঁর আজীবন সঙ্গিনী, তাঁর কবিজীবনের নিত্যপ্রেরণা। ইংরেজ-নন্দিনীর সঙ্গে এই ডিভোর্স এবং ফরাসি-দুহিতার সঙ্গে এই অবিচ্ছেদ্য রাখীবন্ধন; একজনের সঙ্গে শাস্ত্রসম্মত উদ্বাহ, আর একজনের সঙ্গে প্রাণের আকর্ষণে মর্মের যোগ;—এর মধ্যেই মধুসূদনের অন্তর্জীবনের গূঢ় সত্য লুক্কায়িত।

দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর আলোচনার উপান্ত অনুচ্ছেদে লিখেছেন—

> "সমস্ত পড়িয়া ইংরেজীতে শেক্সপীয়র-কৃত ওয়েবস্টর ডিক্‌শানারি নামক নভেল-পড়া অলীকবাবুর কথা মনে পড়ে। এরূপ অমনোযোগিতায় যে কত ভুল-প্রমাদ গ্রন্থে প্রবেশ করিতে পারে সে বিষয়ে গ্রন্থকারের বিন্দুমাত্র হুঁস আছে বলিয়া মনে হয় না। ৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি মাইকেল সম্বন্ধে লিখিলেন 'ইংরেজ-নন্দিনীর সঙ্গে এই ডিভোর্স' ইত্যাদি। এই ডিভোর্স সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোন প্রমাণ আছে কি? কোথায়, কবে ডিভোর্স হইয়াছে কেহ জানেন কি? বিচ্ছেদ যে হইয়াছিল তাহা সুবিদিত। কিন্তু ইংরাজী ডিভোর্স শব্দের বিশেষ অর্থ জানিয়া গ্রন্থকার সেই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন কিনা বুঝিলাম না।"

নিজের বক্তব্যের অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে যদি দাশগুপ্ত মহাশয় এ সব প্রশ্ন উত্থাপন করেন তা হলে ভদ্রসমাজে তিনি সামাজিক দৌর্জন্যের অপরাধে অপরাধী হবেন। কিন্তু আমি জানি তিনি যা প্রমাণ করতে চাইছেন, তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তাঁর বোধগম্য হয় নি। আইনের চক্ষে রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহবিচ্ছেদ যদি স্বীকৃত না হয় তা হলে আঁরিয়েতের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যজীবন অসিদ্ধ হয়ে যায়, এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের উভয়ের সন্তানেরাও অবৈধ সন্তানের অমর্যাদায় কলঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে মধুসূদন ও আঁরিয়েতের দাম্পত্য-জীবন সম্পর্কে যদি অন্য কোন প্রমাণ নাও থাকে তা হলেও তা "by Habit and Repute" সিদ্ধ। কাজেই তাঁর প্রাক্তন বিবাহবিচ্ছেদ Factum Valid.

কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয় এতেই সন্তুষ্ট হবেন না জানি। আমি 'ডিভোর্স' কথার অর্থ না জেনেই 'শেক্সপীয়র-কৃত ওয়েবস্টর ডিক্‌শানারি নামক নভেল-পড়া অলীকবাবুর মত' মূর্খের ন্যায় কথাটি ব্যবহার করেছি, এই তাঁর ইঙ্গিত। অতএব তাঁর হাত থেকে এত সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না। তিনি বলবেন, ডিভোর্স মানে "Judicial separation", "from the bond of marriage", এবং তা "Court for Divorce and Matrimonial Causes" দ্বারা "by a decree of nullity" "represented" হওয়া চাই।

সবই সত্য, শুধু দাশগুপ্ত মহাশয় জানেন না যে, কবে এই বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে এবং তার পূর্বে ডিভোর্সের অর্থ কি ছিল। বর্তমান ডিভোর্স আইন ইংলণ্ডেই বিধিবদ্ধ হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। তার পূর্বে বিবাহবিচ্ছেদ ছিল "Ecclesiastical Court"-এর এলাকাধীন। আর

এ কথা সবারই জানা আছে যে, খ্রীষ্টীয় ধর্মশাসকগণের মতে বিবাহ ঐশ্বরিক বিধান, সুতরাং ঐশ্বরিক বিধান ছাড়া তার "বিচ্ছেদ" হতে পারে না। অতএব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় বিবাহবিচ্ছেদের মানে ছিল *a mensa et thoro*, অর্থাৎ "পৃথগয় পৃথক্ শয়ন" "from bed and board." মধুসূদনের মাদ্রাজ প্রবাসকাল ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬। অর্থাৎ তাঁর 'বিবাহবিচ্ছেদ' এবং 'পুনর্বিবাহ' নূতন বিবাহবিচ্ছেদ আইন বিধিবদ্ধ হবার পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। তাই তাঁর ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদের অর্থ 'a mensa et thoro.'

এই সম্পর্কে দাশগুপ্ত মহাশয়কে ব্যারিস্টার P. G. Osborn-এর 'A concise Law Dictionary for Students and Practitioners' গ্রন্থখানির ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় সংস্করণের ১১৪ পৃষ্ঠা দেখতে অনুরোধ করব। সেখানে আছে—

Divorce. Dissolution of marriage. This was, Prior to Matrimonial Causes Act, 1857, in the jurisdiction of the Ecclesiastical Courts. Divorce *a mensa et thoro* was "from bed and board" : now represented by a judicial separation, and divorce *a vincula matrimonii* "from the bond of marriage", is now represented by a decree of nullity.

টীকা নিষ্প্রয়োজন। শুধু দাশগুপ্ত মহাশয়কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে, 'শেক্সপীয়র-কৃত ওয়েবস্টর ডিক্‌শানারি নামক নভেল-পড়া অলীকবাবুটি' তা হলে কে? গ্রন্থকার না দাশগুপ্ত মহাশয় স্বয়ং?

৯। পাঠকগণ আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আইনজ্ঞ নই, দাশগুপ্ত মহাশয়ও যে আইনশাস্ত্রে বিশারদ এমন প্রমাণ তিনি দেন নি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে-সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান নেই, সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের মত কথা বলা সমীচীন নয়। তা ছাড়া জ্ঞানের কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হলেই নিজেকে সর্বজ্ঞ মনে করার মত মূঢ়তাও আর কিছু নেই। ডক্টর দাশগুপ্তকে আমি সুপণ্ডিত বলেই জানি। তিনি যে-যে ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন, সে-সে ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য অস্বীকার করার মত নির্বুদ্ধিতা আর হতে পারে না। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত স্বার্থসংঘাতের প্রশ্নই ওঠে না। আমি তাঁকে অল্পই জানি। কিন্তু দূর থেকে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শুনে, এবং তাঁকে সহৃদয় সজ্জন ভেবেই, আমার গ্রন্থখানি তাঁকে স্বহস্তে উপহার দিয়ে তাঁর মতামত চেয়েছিলাম। গ্রন্থের মুদ্রাকরগত কয়েকটি ভ্রমপ্রমাদের কথা তিনি বলেছেন, Thomas Campbell সম্পাদিত বিভিন্ন লেখক কর্তৃক ইংরেজিতে অনূদিত পেত্রার্কার কাব্যসংকলন গ্রন্থখানির নাম আমি উল্লেখ করি নি, এ ত্রুটির কথা তিনি যুক্তিযুক্ত ভাবেই উত্থাপন করেছেন। তা ছাড়া যে-ভুলটিকে তিনি তাঁর ব্যঙ্গের টেক্কা হিসাবে ব্যবহার করেছেন, সে [illegible]

নিচ্ছি। আমার যে অনবধানতার ফলে 'অজ্ঞাতনামা-কৃত অনুবাদে'র স্থলে 'এনন-কৃত অনুবাদ' গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছে সে অনবধানতা অমার্জনীয়, এ কথা আমি অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করছি। গ্রন্থে আরও অনেক মুদ্রণপ্রমাদ এবং কিছু কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে, সেজন্যেও আমি পাঠক-সমাজের কাছে লজ্জিত। সব নিয়ে আমার গ্রন্থখানি দাশগুপ্ত মহাশয়ের ভাল লাগে নি, এবং সে কথা তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন। সেটা আমার পক্ষে যতই বেদনাদায়ক হোক, তিনি যদি তাঁর বিবেকসম্মত ভাবে কর্তব্য পালন করে থাকেন তা হলে আমার বলার কিছুই থাকতে পারে না।

কেবল সর্বশেষে একটি বক্তব্য আছে। দাশগুপ্ত মহাশয় ইংরেজি সাহিত্যের বহুশ্রুত অধ্যাপক। মিলটনের বিশেষ দিকে তিনি বিশেষজ্ঞ। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই অধিকারী-ভেদ স্বীকার্য। সনেটশাস্ত্র সম্পর্কেও তিনি বিশেষজ্ঞের মত কথা বলার অধিকার অর্জন করেছেন কি না, তাই সর্বাগ্রে বিচার্য। ইংরেজি সাহিত্যে গ্রন্থের অভাব নেই, এবং পড়াশোনা করলে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করাও দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু, অন্ততঃ বর্তমান প্রবন্ধে দাশগুপ্ত মহাশয় সনেটশাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর পড়াশোনা ও জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়েছেন, সে বিষয়ে দু-একটি কথা বলেই এই অপ্রিয় প্রসঙ্গের উপসংহার রচনা করব।

আমি 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' বাংলা সাহিত্যে সনেট-আলোচনার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে প্রিয়নাথ সেনের 'সনেট পঞ্চাশৎ' এবং মোহিতলাল মজুমদারের 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে সংকলিত 'সনেট' প্রবন্ধটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছিলাম। দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর আলোচনার অন্তিম অনুচ্ছেদে ব্যঙ্গভরে বলেছেন—

"সনেট সম্বন্ধে গভীর আলোচনা ইতিপূর্বে কোথাও হয় নাই গ্রন্থকার বহুবার বলিয়াছেন। আজ পর্যন্ত ঐ প্রিয়নাথ সেনের সনেট সম্বন্ধে প্রবন্ধটি এ বিষয়ে এক উত্তম আলোচনা। গ্রন্থকার অনুগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থকারের নিবেদনে প্রমথ চৌধুরী লিখিত 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' নামে উৎকৃষ্ট লেখাটির উল্লেখ নাই। নিজের মৌলিকতা দেখাইতে যাইয়া গ্রন্থকার অন্যের মৌলিকতার প্রতি উদাসীন।"

এই মন্তব্যের মধ্যেই দাশগুপ্ত মহাশয়ের সনেট-সম্পর্কিত জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতার সূত্র সন্ধান করা যাবে। তাঁর মতে প্রমথ চৌধুরীর লেখা 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' প্রবন্ধটি "উৎকৃষ্ট" রচনা এবং "মৌলিক" চিন্তার পরিচায়ক। প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধার অভাববশতঃ যে আমি উক্ত প্রবন্ধের উল্লেখ করি নি তা নয়। আমার গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আলোচনা আমি শেষ করেছি চৌধুরী মহাশয়ের "বিদগ্ধ ভাষণ" উদ্ধার

করেই। প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিক্‌পাল—এ কথা নূতন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কাব্য এবং কথাসাহিত্য ছাড়া প্রবন্ধকার হিসাবেও তাঁর বহু অনবদ্য সৃষ্টিতে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ। কিন্তু একদিকে তাঁর যেমন উচ্চকোটির বহু সাহিত্যপ্রবন্ধ রয়েছে, অন্যদিকে আবার তেমনই এমন দু-একটি লেখাও আছে যেগুলি চৌধুরী মহাশয়ের অপেক্ষাকৃত লঘুচপল মুহূর্তের লেখনীকণ্ডূয়ন মাত্র। 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' প্রবন্ধটিও শেষোক্ত পর্যায়ের রচনা। সেজন্যেই আমার কাছে প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য মনে হয় নি।

দাশগুপ্ত মহাশয় প্রমথ-নামমাহাত্ম্যে বিগলিত হয়ে প্রবন্ধটি না পড়েই তার উল্লেখ করেছেন এ কথা তাঁর মত পণ্ডিতজনের সম্পর্কে চিন্তা করাও অন্যায় হবে। কাজেই বিচার করে দেখা প্রয়োজন উক্ত প্রবন্ধে চৌধুরী মহাশয় মৌলিক চিন্তার কী পরিচয় প্রদান করেছেন। লেখাটি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহে'র প্রথম খণ্ডে বিশ্বভারতী সংস্করণে ১৯-২২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। আয়তনে সাড়ে তিন পৃষ্ঠা। সূত্রাকারে প্রবন্ধের বক্তব্য নিয়ে উদ্ধৃত হল :

> "কি কারণে সনেট চতুর্দশপদী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তার সপক্ষে কোনোরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ।...
>
> "চৌদ্দ কেন ?—এ প্রশ্ন সনেটের মত বাংলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটি সমস্যার মীমাংসা করতে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পারব।
>
> "আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ-ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত নয় বিদেশি। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ওই চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ খেয়ে যায়।
>
> * * *
>
> "পয়ারে চতুর্দশ অক্ষরের মত সনেটে চতুর্দশ পদের একত্র সংঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই কারণে একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।
>
> * * *
>
> "ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্ত পদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্ত পদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দশ পদ লাভ করেছে।"

'সনেট কেন চতুর্দশপদী' প্রবন্ধে এই হল প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যের মূলকথা। চৌধুরী মহাশয় নিজেই বলছেন, তাঁর মতটি "কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত" এবং "তার সপক্ষে কোনোরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে" তিনি "অপারগ।" তা ছাড়া এ কথাও তাঁর ভাল করেই জানা ছিল যে, সনেটের জন্ম ইতালীতে, কাজেই আমাদের পয়ারের প্রতি-চরণের চৌদ্দ অক্ষরের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কই নেই। অথচ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিচার-বিবেচনায় সনেট সম্পর্কে এই হাল্‌কা সুরের লেখাটি শুধু উৎকৃষ্টই নয়, একেবারে মৌলিক চিন্তার পরিচায়ক। অর্থাৎ 'চারে তিনে সাত, সাত দুগুণে চৌদ্দ'—এই যাঁর কাছে সনেট সম্পর্কে উৎকৃষ্ট মৌলিক চিন্তা, তিনি 'আনাড়ি পাড়ার মাঠ' পেরিয়ে 'সমজদারের রাজপথে' পৌঁছতে পেরেছেন কিনা সে বিচার পণ্ডিতসমাজ করবেন।

১০। বস্তুতঃ, শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, গ্রন্থের মূল প্রসঙ্গটি কি ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা দাশগুপ্ত মহাশয়ের ধারণায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সনেট-কলাকৃতির তাত্ত্বিক বিচার বলতে আমি কী বুঝেছি সে সম্পর্কেও তাঁর ধারণা এখন পর্যন্ত অস্পষ্ট। পেত্রার্কার Organic Form-টিকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে কতটা সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছেন এবং তা করতে গিয়ে তাঁদের মানস-লোকের প্রতীপধর্মিতা কি ভাবে তাঁদের রচনায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, আলোচনার এই রীতি ও পদ্ধতিটির তাৎপর্য দাশগুপ্ত মহাশয় ভাল করে বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাই 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' সূত্রাকারে এ সব কথা বলে দেওয়া সত্ত্বেও তিনি লিখেছেন—

> "একই গ্রন্থে মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা এই প্রসঙ্গে এবং এই রীতিতে সম্ভব বলিয়া অন্তত সাধারণ পাঠকের মনে হইবে না।"

সনেটের আলোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় এই মন্তব্যের মধ্যেই ধরা পড়েছে। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে বইখানির নামের মধ্যেই তিনি "বিষয় নির্বাচনের বিভ্রাট" খুঁজে পেয়েছিলেন কেন! এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। যে-কথাটি নূতন যোগ করতে হবে সেটি ডক্টর জনসনেরই কথা :

Sir, I have found you an argument, but I am not obliged to find you an understanding.

গল্প

অন্য কাহিনী

শ্রীকানু রায়

সুকোমল বিশ্বাসের মেয়ে অনুরাধা। এক নামটাতেই যা একটু আভিজাত্যের গন্ধ, তা ছাড়া সব বিষয়েই সাধারণ, নিতান্ত সাধারণ এক মেয়ে। আধা-ফরসা আধা-ময়লা গোছের গায়ের রঙ, একেবারে দৃষ্টিকটু নয় তবে মোটামুটি বেশ লম্বা আর একেবারেই মাঝারি ধরনের স্বাস্থ্যের এক মেয়ে মিলের মোটা শাড়ি পরে আর কমদামী একজোড়া চটিজুতো পায়ে গলিয়ে যখন প্রথম বোসপাড়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল সেদিন তার প্রসাধন-হীন মুখটার দিকে অনেকেই তাকিয়েছিল। কিন্তু তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না। আর গোলবাজারে বাবুলাল টকিজের সামনে 'গোবিন্দ কেবিন' নামে সেই যে চায়ের দোকান যেখানে বিকেল পাঁচটা বাজলে কোন কোন দিন ছোট একটা টেবিলের দু পাশে বসে মুখোমুখি গল্প করে অনিল মিত্তির, বলাই দাস, বিকাশ চৌধুরী আর হীরেন হালদার তারাও অনুরাধাকে দেখে অবাক হয় নি।

দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলে বলাই বলেছিল, দেখলি ?

হুঁ।—চায়ের ভাঁড়টা মুখ থেকে নামিয়ে আনতে আনতে জবাব দিয়েছিল বিকাশ। ঘাড় নেড়েছিল হীরেন হালদারও।

অনিল মিত্তির জিজ্ঞেস করে, মেয়েটা কে ? একেবারে নতুন বলে মনে হচ্ছে যে ?

নতুন !—হো-হো করে হেসে উঠল বিকাশ।

চায়ের ভাঁড়ে একটা চুমুক দিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করল অনিল, হাসলি কেন ?

হাসলাম তোর কথা শুনে।—জবাব দেয় বিকাশ। তারপর পকেট থেকে বিড়ি বার করে আগুন ধরাতে ধরাতে নিতান্ত সহজভাবে জানায়, পৃথিবীর সব মেয়েই এক।

খিক খিক করে হাসে বলাই দাস।

মেয়েদের গায়ের রঙ আলাদা হয়, মুখের চেহারাও সব মেয়ের এক থাকে না। কিন্তু একটা বিষয়ে সব মেয়েই—

বিকাশ মাঝ পথেই কথা থামিয়ে দেয়। মনস্তত্ত্ব—বিশেষ করে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিকাশের চেয়ে অভিজ্ঞ কেউ নেই। তাদের মধ্যে এ কথা সবাই জানে। বলাই জানে, অনিল মিত্তির আর হীরেন হালদারও স্বীকার করে এ কথা। মেয়েদের সম্বন্ধে কোন কথায় ইঙ্গিতটাই যথেষ্ট। ইঙ্গিত আর রহস্য। বোসপাড়ার এই রাস্তা দিয়ে এর আগে যারা হেঁটে গেছে সেই সুধা বসু, বিনীতা ঘোষ আর উর্মিলা সরকার—তাদের দিকে তাকিয়েও বিকাশ ঠিক একই কথা বলেছিল। সবচেয়ে পসারওয়ালা উকিল পরেশবাবুর মেয়ে সুধা, বিনীতার দাদা বড় ডাক্তার, থার্ড ইয়ারের ছাত্রী উর্মিলা। সুধা বসুর বাবার অনেক টাকা, বিনীতার গলার মিষ্টি গান শুনে জেলার ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল আর উর্মিলার শুধু রূপ নয়, ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে গোটা শহরের গর্বটাকেই বাড়িয়ে দিয়েছিল।

তখনও এই বিকাশ চৌধুরীই গোবিন্দ কেবিনের বেঞ্চিতে বসে কম পাওয়ারের ফ্যাকাশে হলদে আলোয় মাটির ভাঁড়ে চার পয়সার চা খেতে খেতে বলেছিল—একটু হেসেছিলও বোধ হয়: আসলে পৃথিবীর সব মেয়েই—

কী ?—মোটা থলথলে গলায় জিজ্ঞেস করেছে বলাই।

বিকাশ জবাব দেয় নি সে কথার। একটু থেমে সহজভাবে জিজ্ঞেস করেছে, আলাপ করবি ?

কে ? কে ?—বাকি তিনজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠেছে: সুধা বসু ? না, বিনীতা ঘোষ ? নাকি উর্মিলা সরকার ? সাহস কম নয় তো বিকাশের !—লোকাল ট্রেনের কামরায় চুলের কাঁটা ফেরি করে বেড়ায়

যে বিকাশ, যেখানে বসে সে চা খায় আর গল্প করে যাদের সঙ্গে, তাদের ভেতর কেউ কোনদিন অতি দুঃসাহসিক স্বপ্নেও যে এদের কারুর সঙ্গে কথা বলে আসতে পারে সে ধারণা হয় না। ঠাট্টা করছে না তো সে? বলাই একটু হাসতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিকাশের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না আর সাহস হয় না। খানিক পরে আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করল, তুই কি তা হলে—

হ্যাঁ। চায়ের নেমন্তন্ন করেছে বিনীতা ঘোষ।

অসম্ভব!—একটু জোরেই বলে উঠল হীরেন হালদার।

অনিল মিস্ত্রিরও ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলে, এ হতে পারে না। মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা!—বিকাশ রাগ করে না। বিশ্বাস করাবার চেষ্টাও করে না। শুধু বলে, হ্যাঁ, আমিই চেয়েছিলাম।

কী চেয়েছিলি?—এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করে অনিল মিস্ত্রি আর হীরেন হালদার—বিনোদিনী অপেরায় যে পনের টাকা বেতনে হারমোনিয়াম বাজায় আর রাত্রির অন্ধকারে যে চুরি করে রেলের স্লীপার!

বিনীতা ঘোষের গান শুনতে চেয়েছিলাম।

মিথ্যে কথা!—আবার চেঁচিয়ে উঠল হীরেন।

তোরা যাবি?—হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল বিকাশ।

কেমন যেন খাপছাড়া হয়ে গেল ব্যাপারটা। গোবিন্দ কেবিনের ছোট খুপরিতে বসে মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খেতে তিনটি মানুষ হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বোবা চোখে এ ওর দিকে তাকায়। তারা ভয় পেয়ে গেছে, দারুণ ভয়। আর একটা কথা বুঝতে পেরে গেছে, তারা আসলে সবাই ভয়ানক ভীরু। আট বছর বয়েস থেকে যে কেবল মোটরগাড়ির চাকাই পরিষ্কার করে এসেছে—সেই বলাই দাস কেমন করে যাবে বিনীতা ঘোষের সামনে, যার চোখের দিকে তাকালে অনেক সুন্দর চেহারা আর অর্থবান মানুষের আশ্চর্য এক তৃষ্ণার ছবি অনায়াসে অনুভব করা যায়! সামনে বসে গান শুনবে কি—আসলে কল্পনাটাই যে অসম্ভব, লোভী স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তব।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ এই বিকাশ। পরম নির্বিকার ভাবে বলে, অপদার্থ। তোদের সাহস নেই।

তার পরেও মাঝে মাঝে চা খেতে বসে তারা। আবার মুখোমুখি তাকায় এ ওর দিকে। বিকাশ বলে, মেয়েদের গলার স্বর সবার এক থাকে না, চরিত্রও সবার এক নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে পৃথিবীর সব মেয়েরই এক।

গোবিন্দ কেবিনের ছোট খুপরিটা মাঝে মাঝে ফাঁকাও থাকে। বিনোদিনী অপেরায় কখনও কখনও দুপুর থেকে রাত অবধি রিহার্সাল চলে। মোটর-গ্যারেজে কাজ বাড়ে কখনও বলাই দাসের, হীরেন হালদার আরও বেশী করে সুযোগ খোঁজে স্লীপার চুরি করার। আর বিকাশ—হ্যাঁ, বিকাশও কখনও কখনও আসতে পারে না। লোকাল ট্রেনের কামরায় কামরায় চুলের কাঁটা বিক্রি করতে করতে কখনও এত ক্লান্ত হয়ে যায় যে, বাড়িতে গিয়ে দু মুঠো ভাত মুখে দিতে না দিতেই অজস্র ঘুমে জড়িয়ে আসে তার চোখ। ঘুমোতে যাবার আগেও আশ্চর্য এক দৃশ্যের কথা ভাবতে পারে সে। ফিকে নীল রঙের শাড়ি পরেছে বিনীতা, আর তার সামনে একেবারে মুখোমুখি বসে মিষ্টি সুরে গান গাইছে সে। এত সুন্দর গান বিকাশ কোনদিন শোনে নি। বিনীতা ঘোষের গলার স্বরটাই আশ্চর্য মায়া মাখানো।

আবার কোন এক ধূসর সন্ধ্যায় তারা চারজন এসে জড়ো হয়। হলদে ফ্যাকাশে আলোয় একই টেবিলের দু পাশে মুখোমুখি বসে মাটির ভাঁড়ে চার পয়সার চা খায়। তারপর কড়া নেশার একটা বিড়ি ধরিয়ে গালভর্তি উগ্র গন্ধ ছাড়তে ছাড়তে বিকাশ বলে, মেয়েদের চোখের ভাষা সব সময় এক নয়, হাসির মত কান্নার মানেও সব সময়ে ঠিক থাকে না, কিন্তু একটা বিষয়ে পৃথিবীর সব মেয়েই—

কান খাড়া করে হীরেন হালদার। মাথা চুলকোতে চুলকোতে থেমে যায় অনিল মিস্ত্রি আর মোটরের চাকা পরিষ্কার করে যে বলাই দাস—সে তার মোটা ভারী থলথলে গলায় জিজ্ঞেস করে, কী?

হাসলে,—বিকাশ আস্তে আস্তে বলছে, সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়, কিন্তু সুধা বসু—

মিথ্যে কথা।—চেঁচিয়ে উঠল হীরেন।

অসম্ভব!—অনিলও ঘাড় নাড়ে।

তা হলে এই রুমালটাও মিথ্যে?—পকেট থেকে একটা কাজ-করা সুন্দর রুমাল বার করে বিকাশ জিজ্ঞেস করল।

রুমাল!

তিনজনেই অবাক হয়ে গিয়েছে। তবু—নিশ্চয়ই মিথ্যে

বলছে বিকাশ। কিন্তু রুমালের গায়ে এই অদ্ভুত গন্ধটাই বা কী করে এল? সেন্ট নয়, আতরও নয়—যা শুধু এক আশ্চর্য মিষ্টি হাতের ছোঁয়াতেই হতে পারে। কোথায় পাবে তা বিকাশ।

কোথায় পেলি এ রুমাল?—জিজ্ঞেস করে বলাই।

উপহার দিয়েছে।

উপহার!

আবার তিনজনে চমকে ওঠে: কে? সুধা বসু? না বিনীতা ঘোষ? নাকি—

হ্যাঁ, উর্মিলা সরকারই।—জবাব দিয়েছে বিকাশ।

লোকাল ট্রেনে চুলের কাঁটা ফেরি করে বেড়ায় যে বিকাশ চৌধুরী, গোবিন্দ কেবিনে বসে চার পয়সার চা খাওয়াই যার জীবনে সবচেয়ে বড় বিলাসিতা, সেই বিকাশের মত সাধারণ—নেহাতই সাধারণ একটা মানুষকে রুমাল উপহার দেবে উর্মিলার মত মেয়ে! অসম্ভব। কিন্তু বিকাশের চোখ দুটি কেমন যেন লাগে। মনে হয়—মনে হয় মিথ্যার মতই সুন্দর একটা সত্য বুঝি ভুল করে আর ভালবেসে বিকাশের কাছে ধরা দিয়ে ফেলেছে। আর তা না হলে এত অদ্ভুতই বা দেখাবে কেন তার মুখটা! রুমালের এই মিষ্টি গন্ধটাকেও তো নেহাত এক অলীক গল্পের মত বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে না!

অনিল ভয় পেয়ে গেছে। আর অন্ধকার রাত্রে রেলের স্লীপার চুরি করে যে মানুষ—সেই হীরেন হালদারও। জানে নাকি—সত্যিই কোন জাদু জানে না কি সে? রূপকথার নায়িকার মত মেয়েরা—ভাবতেও অবাক লাগে। এই সাধারণ মানুষটার মধ্যে সত্যিই কি কিছু খুঁজে পেয়েছে? সন্দেহ যায় না, কিন্তু বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে করে। আর বিশ্বাস করে একটা তৃপ্তিরও স্বাদ পায় তারা যে, ঠিক তাদেরই মত তুচ্ছ একজনের দিকে তাকিয়েও কোন মেয়ের মনে ভালবাসা জাগতে পারে।

রূপকথার মত লাগে বিকাশের কথা। নিজের হাতে চা তৈরী করে খাইয়েছে বিনীতা ঘোষ। স্বপ্নেও নাকি সুধা বসু বিকাশের কথাই ভাবে, আর উর্মিলা সরকার—

গল্প শেষ হতে অনেক রাত হয়। গোবিন্দ কেবিনের ঝাঁপ বন্ধ হবার ঠিক আগে উঠে দাঁড়ায় চারজন। চারজন চার দিকে যায়। বিনোদিনী আপনার অফিস-ঘরে

ঘুমোয় অনিল মিস্ত্রির, বিকাশ ফিরে যাবে তার বাড়ির নিঃসঙ্গ একক একটি অন্ধকার ঘরে, ডোমপাড়ায় গিয়ে তাড়ি গিলবে হীরেন হালদার আর ভাঙা মোটরগাড়িতে নারকোলের ছোবড়ার সীটে পড়ে নাক ডাকাবে বলাই।

বোসপাড়া দিয়ে কিছুদূর গিয়ে ডাইনে মোড় ঘোরে বিকাশ। রেললাইনের গা-ঘেঁষা পথটা দিয়ে প্রায় মাইলখানেক হাঁটতে হবে তাকে। এদিকটা লোকালয় কম। ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে দু একটা ছোটবড় গাছ। ওদিকে একটা পরিত্যক্ত লোহার কারখানা। সরু একফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে, তবু অন্ধকার লাগছে পথটা। শীতও বেশ পড়েছে। গরম জামা নেই তার, খদ্দরের মোটা শার্টটা যতটুকু শীত আটকাতে পারে। শরীর গরম রাখবার জন্য সে আবার একটা বিড়ি ধরায়।

হঠাৎ একটা উজ্জ্বল আলো এসে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অতিকায় একটা দৈত্যের মতই রেললাইনের উপরে ধাতব মূর্ছনা জাগিয়ে ছুটে আসছে মধ্যরাত্রির মেল ট্রেনটা। একটু ধারে সরে গেল বিকাশ। কিন্তু ওকি! মানুষের মতই তো মনে হচ্ছে! সারা গায়ে চাদর ঢাকা মানুষটা এত রাত্রে রেললাইনের ওপরে উঁকি দিয়ে কী দেখছে! আর যে দেরি নেই। ক্ষুধিত একটা দানব এখনই ছুটে আসছে। ভয়ে চিৎকার করে উঠতে গেল বিকাশ। কিন্তু গলা দিয়ে তার আওয়াজ বেরোয় না। প্রচণ্ড একটা ভীতি বুঝি তার কণ্ঠনালীটাকেই সজোরে চেপে ধরেছে।

তারপর কী হল বিকাশ জানে না। স্বপ্নের ঘোরের মত তার মনে হল সে যেন পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল। চাদর ঢাকা মানুষটাকে টেনে এনেছিল, জোরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল—যতক্ষণ না ক্রুদ্ধ পশুর গোঙানিটা মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

কিন্তু একি! মানুষটা কাঁদছে কেন? এই মাত্র যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল তার জন্য একটা কৃতজ্ঞতাও তো পাওনা ছিল বিকাশের। তার হাতটা শিথিল হয়ে গেলেও তার বুকের উপরে পড়েই কাঁদে সেই মানুষ: কেন বাঁচালেন? কেন আমায় বাঁচালেন?

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছে বিকাশ। অনিল মিস্ত্রির বিশ্বাস করবে না। হীরেন হালদার এ কথা অনেক লোক

উঠবে, আর বলাই দাসও। তবু, সত্যি সত্যি সুকোমল বিশ্বাসের মেয়ে অনুরাধা মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচেও এক আর্তকান্নায় বারবার ভেঙে পড়ছে তারই বুকের ওপর।

আপনি এ কাজ করতে গেলেন কেন?—বিকাশ বলল।

কান্না থামিয়ে আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ায় অনুরাধা। শাড়িটা ঠিক করে নেয়। না, মৃত্যু হয় নি তার। তার বদলে আধো অন্ধকারে এই স্তব্ধ আকাশের নীচে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক অজানা মুখের মানুষ।

কেন এ কাজ করতে চেয়েছিলেন আপনি?—আবার জিজ্ঞেস করল বিকাশ।

উত্তর দিতে পারে না অনুরাধা। মৃত্যুর অনুভূতিটা কেটে গিয়েছে, সেই ভয়টাও আর নেই কিন্তু দারুণ একটা অস্বস্তি আর সংকোচ তাকে পেয়ে বসেছে। হয়তো একটু লজ্জাও।

তবু একটু পরে জবাব দিল। স্পষ্ট নির্ভুল স্বরে বলল সে, আমি আর বাঁচতে চাই না।

কেন?

বাঁচতে ভাল লাগে না।

শিউরে উঠল বিকাশ। এ যে মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক! এক অতি সাধারণ মেয়ে—সুধা বসু নয়, বিনীতা নয়, উর্মিলা সরকারও নয়—নিতান্তই সাধারণ এক মেয়ের মুখে এমন ভয়ঙ্কর কথাটা বড় সহজে উচ্চারিত হল।

অনুরাধা তখন ভাবছে সেই এক নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের কথা। কাল ভোর না হতেই পাওনাদাররা আবার এসে গালাগালি দিতে আরম্ভ করবে। রোগশয্যায় শুয়ে কেশে কেশে মুখে রক্ত তুলবেন তার বাবা সুকোমলবাবু। খিদের জ্বালায় আকুল হয়ে ছুটে আসবে ছোট ছোট ভাইবোনেরা। আর সে শুধু দিনের পর দিন এক মিথ্যা গল্পের আশ্বাস দিয়ে—কিন্তু কতদিন? একদিন—দু দিন—তিনদিন—তারপর? না না, তার চেয়ে মৃত্যুও যে অনেক ভাল ছিল। সে কথা কী করে বোঝাবে এই আবছা চেহারার পরোপকারী মানুষটাকে!

ভাল লাগে না, কিন্তু ইচ্ছে করে মরবার অধিকারও তো আপনার নেই অনুরাধা বিশ্বাস।

কেন নেই?

বিকাশ বলল, জীবনের দাবি জোর করে অস্বীকার করে কী লাভ?

চুপ করে থাকে অনুরাধা। অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে যেন সেই লজ্জিত ভঙ্গীকেই বড় করুণ করে রাখে।

চলুন।—বিকাশ বলে।

নিরাসক্ততায় শীতল বিষণ্ণ কণ্ঠে অনুরাধা জিজ্ঞেস করল, কোথায়?

আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।

অনুরাধা বিশ্বাসকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মিনিট দশেক পরে সেই একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে এল বিকাশ। যেতে যেতে বড় অদ্ভুত এক গল্প শুনিয়েছে মধ্যরাত্রির এই অপরিচিতা মেয়ে। বিকাশের গল্প শুনে এতকাল সবাই হেসে উঠেছে। গোবিন্দ কেবিনের ছোট খুপরিতে একই টেবিলের দু পাশে বসে মুখোমুখি যারা চা খেয়েছে তারাও না হেসে পারে নি। বলাই দাস কি অনিল মিত্তির। মিথ্যে কথা—প্রায়ই বলে উঠেছে হীরেন হালদার।

মিথ্যে গল্পগুলি মিথ্যেই হয়ে যাক।

আজকের মধ্যরাত্রির এই গল্পটা বড় বিষণ্ণ, বড় নিষ্ঠুর, কিন্তু বিকাশ চৌধুরী তার জীবনের একমাত্র সত্য কাহিনীকে লোকের সামনে হাসির খোরাক হতে দেবে না।

পৃথিবীর কেউ কোনদিন বিকাশের মুখ থেকে এ গল্প শুনতে পাবে না।

'শনিবারের চিঠি' (মাসিক পত্রিকা) ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। উপরোক্ত ঠিকানায় বাসকারী শ্রীসজনীকান্ত দাসই এই পত্রিকার একমাত্র স্বত্বাধিকারী।

আমি, শ্রীসজনীকান্ত দাস, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

কলিকাতা ১ মার্চ, ১৯৫৯ শ্রীসজনীকান্ত দাস—প্রকাশক।

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৬

৩১শ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

চৈত্র
১৩৬৫

সংবাদ-সাহিত্য

১৩৬৫ বঙ্গাব্দের শেষ মাসটায় ভারতের উত্তরস্থিত হিমালয়ের শান্তি বিঘ্নিত হওয়ায় নানা মতলবের ভেলকিবাজিতে সমগ্র পৃথিবী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চ পাহাড়ের ঢেউ নিম্নে ভারতের প্রান্তরে নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য সর্বাধিক এবং স্বাভাবিক। আমরাও বিচলিত হইয়াছি। তাই বর্ষ-অন্তে একটি পুরাতন চিরন্তন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া নববর্ষের বিচিত্র সম্ভাবনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। প্রশ্নটি তুষারমৌলি হিমালয়কে সম্বোধন করিয়া।

অচল পাহাড়, কঠিন পাহাড়, মাটির বুকে
পাষাণ-গর্বে চিরকাল তুমি রবে কি খাড়া?
শূন্য আকাশে একেলা হে বীর, কপাল ঠুকে
বিগলিত হয়ে ছোটাবে না লঘু ঝরণা-ধারা!
পাথর, তোমার জলের উৎস কোথায় থাকে,
পাহাড়, তোমার জমাট শিরে কি দেবতা রয়,
আর কত কাল এড়াবে সহজ প্রশ্নটাকে—
গ'লে গুঁড়ো হতে পারে যেবা তার কিসের ভয়?

—

পঁচাশি বৎসর পার হইয়া দুই মাস গত হইল, ১২৮১ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শনে' কমলাকান্ত শর্মা আক্ষেপ করিয়াছিলেন—

"গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদী-সৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি—আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে—ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?"

ইহারও এগারো বছর পরে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশমাতার ভক্ত সন্তানেরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করিয়া হারানো মাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার তপস্যা শুরু করিলেন। তপস্যার ফল ফলিল আরও কুড়ি বছর পরে ১৯০৫ সনে। হৃদয়বেদীতে মায়ের প্রতিমা পুনঃস্থাপিত করিয়া সমগ্র দেশ ব্যাকুল আর্তকণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে তাঁহার বন্দনা করিল। বিয়াল্লিশ বৎসর পরে শৃঙ্খলমুক্ত প্রতিমা আবার জল্‌জল্‌ করিয়া উঠিল। আমরা ভাবিলাম, মাতৃপূজা সার্থক হইয়াছে, এখন মায়ের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা যাইতে পারে। তাহাই করিলাম।

বিষয় মানেই কলহ। সুভাষচন্দ্র আগেই পলাইয়াছিলেন। বাদশাহী শাসনের উপাসক আবুল কালাম আজাদের সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে এই কলহের একটা কদর্য রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। কৃপালানি সরিয়া পড়িলেন, বল্লভভাই গান্ধীবিরোধী হইলেন, গান্ধীজী মারা গেলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে চালচিত্রের মাথায় স্থাপন করিয়া নেহরু একাই দশপ্রহরণধারিণী মা দুর্গার ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, কাজেই রাজাগোপালাচারি চটিলেন ও বাঁকা কথার গরম ফোয়ারা ছুটাইলেন এবং জয়প্রকাশ নারায়ণ কুঁদানে মাতিলেন। অমন যে নিরেট অভয়াশ্রম তাহাও

বলরামপুর কৃষ্ণপুর আর সুভদ্রাপুরে ভাগ হইয়া গেল। কমলাকান্ত আজ বাঁচিয়া থাকিলে লিখিতেন—

সুজলা সুফলা জননী, তোমার প্রতিমা ডুবিয়ে অগাধ জলে,
স্বদেশী আমলে টানিয়া তুলিয়া স্থাপন করিনু বেদীর 'পরে।
রঙ ও তবক, মাটির প্রলেপ ধুয়ে মুছে গেছে দেখি নি কেহ,
গরু ও ছাগলে খড় টেনে খায়, তারি নাম দিনু স্বদেশ-সেবা॥

০—

বিগত ১০ই এপ্রিল ও ১১ই এপ্রিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের অধিবেশনে ইংরেজী ও মাতৃভাষায় ঘোরতর দ্বন্দ্ব হইয়া গিয়াছে।

পোড়া কপাল বাংলাদেশের। যে কচকচি উনবিংশ শতকের সূত্রপাতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা আজও শেষ হইল না। ওই শতকের শেষার্ধে, বিশেষ করিয়া শেষ দশ বৎসরে মাতৃভাষাকে নিম্ন মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার বাহন করা লইয়া গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে পুরোভাগে রাখিয়া রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল আন্দোলন করিয়াছিলেন গুরুদাস-গ্রন্থাবলীতে ও রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষা' নামক গ্রন্থে (নবতন সংস্করণ) তাহার পরিচয় আছে। এই প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র রায়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র "পত্র-সূচনা"তেই (বৈশাখ, ১২৭৯) লিখিয়াছিলেন :

"আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃতসিংহের চর্ম্মস্বরূপ হইবে মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব।···নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজিবাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

লেখা ও বক্তৃতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথা শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে আরও বেশী প্রযোজ্য। লোকে যাহা কিছু শোনে বা পড়ে মাতৃভাষাতে মন তাহা তর্জমা করিয়া অনুধাবন করিলে তবেই জ্ঞানলাভ হয়। এই জ্ঞানলাভের প্রণালীকে সহজতর এবং সময়কে সংক্ষেপতর করার জন্যই মাতৃভাষায় শিক্ষাদান প্রয়োজন। ইংরেজ শাসনের ফলে ইংরেজী ভাষা প্রাধান্য লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই মাতৃভাষার দাবি সে কালের সহৃদয় ইংরেজরা ও স্বদেশপ্রেমিক বাঙালীরা জানাইয়াছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ, ভূদেব, মধুসূদনেরা শুধু প্রতিবাদ জানান নাই, মাতৃভাষায় স্ব স্ব সাধনার দ্বারা নিঃসংশয়ে মাতৃভাষার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সুদৃঢ় ও নির্মল সিদ্ধান্ত যে আবার বিভ্রান্ত ও আবিল হইয়া উঠিয়াছে ইহা বাঙালীর দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। রামমোহনকে যাঁহারা একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভাবেন তাঁহারা লর্ড আমহার্স্ট'কে লেখা তাঁহার চিঠিখানিকেই এই বিষয়ের একমাত্র দলিল মনে করিয়া ভুল করেন। রামমোহনই সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করিয়া যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা যাঁহাদের নজরে পড়ে না তাঁহারা নিতান্তই একদেশদর্শী।

বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার পক্ষে বাংলা দেশে প্রবল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। সে যুগের মনীষীরা এই মামলার চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। আজ একশত বৎসর পরে পাঠ্যপুস্তকের অভাবের ওজুহাত দেখাইয়া যদি মাতৃভাষার দাবিকে খণ্ডন করা হয় তাহা হইলে দুঃখের সহিতই স্বীকার করিতে হইবে বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। আমরা কালের যবনিকা সরাইয়া উনিশ শতকের গোড়া হইতে সেই বিস্মৃত ইতিহাস আমাদের পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ সেপ্টেম্বর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র এ. বি. টড গবর্নর জেনারাল-পরিচালিত কলেজের 'পাবলিক ডিসপিউটেশনে' সংস্কৃত ও বাংলার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরীর উপস্থিতিতে বাংলা ভাষায় এই বক্তৃতা করেন—"মূল সংস্কৃত গ্রন্থ চলিত ভাষাতে তরজমাতে বিদ্যা প্রচারহয় এবং লোকেরদের নীতজ্ঞআচরণ দ্বারা উপকার হয়।" মনে রাখিতে হইবে বাংলা গদ্যে তখনও পর্যন্ত চিন্তাশীল গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ এইটি লইয়া তিনটির অধিক লিখিত হয় নাই কাজেই গদ্যের ভাষা প্রাঞ্জল রূপ পায় নাই।

ওই বক্তৃতার শিরোনামায় ইংরেজী তর্জমা এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

"The translation of the best works extant in the Shanscrit into the popular languages of India would promote the extension of science and civilization."

এই সভাতেই উইলিয়ম কেরী স্বয়ং সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ভাষার প্রাধান্য সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন। ছাত্র টড বলেন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যত বড়ই হউক বাংলা ভাষায় তাহার প্রচার না হইলে তাহা দেশের কোনও উপকারেই লাগিবে না।

এই ঘটনার এগারো বৎসর পরে ১৮১৫ সনে রামমোহন তাঁহার প্রথম বাংলা রচনা প্রকাশ করেন। তাঁহারও প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় প্রাচীন ঋষি ও মনীষীদের সাধনালব্ধ জ্ঞান মাতৃভাষায় প্রচার করিয়া বাঙালী জাতির মূঢ়তা অজ্ঞতা জড়তা ও কুসংস্কার দূর করা। মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও অচিরাৎ (১৮১৭) মাতৃভাষায় রামমোহনের সহিত গুরুগম্ভীর শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। পরবৎসর অর্থাৎ ১৮১৮ সনের জুলাই মাসের 'দিগদর্শনে' বাংলা ভাষায় প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ "পৃথিবীর আকর্ষণের বিবরণ" প্রকাশিত হয়। সেইদিন হইতেই বাংলাদেশে মাতৃভাষায় সাময়িক পত্র মারফত জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চার দ্রুত অগ্রগতি হয়। 'সমাচার দর্পণ,' 'সম্বাদ কৌমুদী,' 'পশ্বাবলী,' 'সমাচার চন্দ্রিকা' প্রভৃতির দান উল্লেখযোগ্য। ১৮৩১ সনের ১৮ই জুন তারিখে হিন্দু কলেজের (১৮১৭ সনে স্থাপিত) কৃতী ছাত্রবৃন্দ—"ইয়ং বেঙ্গল" দল কর্তৃক 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। বাংলাদেশের লোককে সর্বপ্রকার কুসংস্কারমুক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান পরিবেশন বিশেষ উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে এই "ইয়ং বেঙ্গল" দলই আরম্ভ করেন এবং ইঁহাদেরই আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় 'অনুবাদিকা' (আগস্ট ১৮৩১), 'জ্ঞানোদয়' (ডিসেম্বর ১৮৩১), 'বিজ্ঞান সেবধি' (এপ্রিল ১৮৩২), 'বিজ্ঞানসারসংগ্রহ' (সেপ্টেম্বর ১৮৩৩) জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসারে ব্রতী হয়। ইহারই পরিণতি দেখি উনিশ শতকের পঞ্চম দশকে ও ষষ্ঠ দশকের প্রথম বৎসরে 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' (এপ্রিল ১৮৪২), 'বিদ্যাদর্শন' (জুন ১৮৪২), 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৬ই আগস্ট ১৮৪৩), 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (২৬ জানুয়ারি ১৮৪৬), 'সত্যার্ণব' (জুলাই ১৮৫০) এবং 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে'র (অক্টোবর ১৮৫১) প্রকাশে। 'বেঙ্গাল স্পেক্টেটর' "ইয়ং বেঙ্গল" দলেরই আর এক কীর্তি। 'বিদ্যাদর্শনে' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সুযোগ্য সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্তের হাতেখড়ি হয়। 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে' রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-ইতিহাস-ভূগোল প্রভৃতি প্রবর্তনের অবিনশ্বর ইতিহাস গ্রথিত হইয়াছে। 'সত্যার্ণব' পাদরি লং-এর কীর্তি, ইহাতে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-চর্চা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া আছে। 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ' বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চাকে কোন্ উন্নত পর্যায়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমরা নীচে যে উক্তিগুলি উদ্ধৃত করিতেছি তাহা এই-কালের মধ্যেই করা হইয়াছে অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকটিরই বয়স একশত বৎসরের অধিক হইয়াছে। আজ যে আমাদিগকে আবার কাঁচিয়া গণ্ডুষ করিতে হইতেছে ইহাই সর্বাধিক পরিতাপের বিষয়।

১৮৩৮ সনের গোড়ায় হিন্দুকলেজের প্রাক্তন ছাত্র, কয়েক জন "ইয়ং বেঙ্গল" এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সদস্য 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' স্থাপন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলন, অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার দ্বারা স্বদেশের উন্নতি বিধান প্রভৃতি এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী, তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ দে প্রভৃতির উদ্যোগে এই সভা স্থাপিত হয়। 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে'র সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্য এই সভার ১৮৩৮, ১৩ই জুনের অধিবেশনে "এতদ্দেশী লোকদিগের বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষাকরণে আবশ্যকতা" শীর্ষক প্রস্তাব পাঠ করেন। তাহাতে তিনি বলেন:

"...পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে বা তৎকিঞ্চিৎ পরে মধ্যমকালে বঙ্গীয় ভাষার কিছু আলোচনা থাকিয়া ঐ ভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জনে লোকেরদের যেমত স্পৃহা ছিল তাহা এক্ষণে হ্রাস পাইয়াছে, অর্থাৎ এমত হইয়াছে, যে একেবারে লো

হওনোক্রম বটে ; কারণ পূর্ব্বে পূর্ব্বের যে সকল গ্রন্থকর্তারা ছিলেন, যথা কবিকঙ্কণ চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস, কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত এবং ভারতচন্দ্র রায় ইত্যাদি, এবং ঐ সকল কবিবরেরা যে সকল উত্তম উত্তম ইতিহাস, কাব্য এবং অন্যান্য মত পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল লোকেরা যদ্যপি কদাচিৎ পাঠ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু এমত শুনিতে পাই নাই যে অধুনা ঐ সকল লেখকদিগের লেখার ভাবের মাধুর্য অথবা অভিপ্রায়ের প্রাখর্য, বা ছন্দের মধুরতার প্রাচুর্য প্রভৃতি এক এক গ্রন্থকর্তার গুণের তুল্য এক্ষণের কোন কবিবরের আছে, কিম্বা তদ্রূপ কোন পুস্তক অধুনা কোন গ্রন্থকর্তা প্রকাশ করিয়াছেন ; হায় ! ইহা কি খেদের বিষয় নহে ? ধন্য প্রশংস্য ইংলণ্ড ও তৎসন্নিহিত অন্যান্য দেশ, যথায় যথায় নিত্যই জ্ঞানের প্রাচুর্য হইয়া তাহারি প্রাখর্যে লোকেরা পূর্ব্ব কালাপেক্ষা দিন দিন জ্ঞানবান হইতেছেন, এবং ঐ জ্ঞানের দ্বারা নিত্যই নূতন রচনা করিয়া অন্যান্য দেশস্থ লোকেরদিগের আশ্চর্য জন্মাইতেছেন ; তাঁহাদিগের গুণের অধিক কি প্রশংসা বাহুল্যমতে করিব। যে যে দেশে আপনারদিগের জ্ঞানের নূতন চমৎকার শক্তি দেখাইতেছেন, তত্তদ্দেশের বিত্ত বিলক্ষণ হস্তগত করিতেছেন। ছি, ছি, ছি ! এই সকল দেখিয়াও কি এদেশের লোকেরদের ইচ্ছা হয় না যে ইংগ্রণ্ডীয়েরদের সদৃশ মনুষ্য হইয়া চতুষ্পাদের ন্যায় মূক থাকিয়া অপরের হস্তোত্তলনে প্রদত্ত ঘাস জলই আহার করিতে থাকেন। হে বন্ধুবর্গ, মদুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব শ্রবণে আপনারা মনে করিবেন না যে আমি শ্লেষোক্তি করিলাম, কিন্তু এদেশীয় লোকেরদের স্বজাতীয় ভাষায় অনভিজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া আমার যে রূপ অন্তর্ভেদ হইয়া নয়নে বারি বিগলিত হয় তাহা আর দীর্ঘকাল না থাকে এমত চেষ্টায় ঐ বিষয়ক প্রসঙ্গোত্থাপনে সমুদয় হেতু বিন্যাসকরণ কারণ আমাকে সটীক উক্তি করিতে হইয়াছে।"

এই দশ পৃষ্ঠার নিবন্ধটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলে আঢ্য মহাশয়ের আক্ষেপ যে কতদূর সমীচীন তাহা একালের পাঠক বুঝিতে পারিতেন কিন্তু স্থানাভাববশতঃ উপসংহারটুকু মাত্র দিয়া শেষ করিতেছি :

"এতদ্দেশের লোকেরদিগের এক্ষণে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন তাহার উপযুক্ত প্রমাণ অগ্রেই দেখাইয়াছি এবং তাহা যে দেশীয় ভাষায় হওয়া অত্যুচিত তাহার প্রয়োজন তৎপরেই দর্শাইয়াছি ;

...এক্ষণে অত্যাবশ্যক হইতেছে কি না যে কিরূপে এদেশের বালকদিগের দেশীয় ভাষায় শিক্ষা হয় তাহার উপায় করা......"

১৮৪৯ সনের মার্চ মাসে কলিকাতায় কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি হিসাবে কাউন্সিলের অধীনস্থ বিদ্যালয়সমূহের পুরস্কার-বিতরণী সভায় ড্রিঙ্কওয়াটার বীটন (বেথুন) বলেন, "এইক্ষণে যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় বিবিধপ্রকার বিষয় শিক্ষা করিতেছেন, স্বদেশীয় লোকদিগকে সেই সমস্ত বিদ্যার উপদেশ দেওয়া তাঁহারদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।...তাঁহারা বহু পরিশ্রম করিয়া স্বদেশের ভাষা শিক্ষা না করিলে কখনই এ ভার মোচন করিতে সমর্থ হইবেন না।"

১৮৪৯ সনেই তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ হার্বার্ট মেডাক হিন্দুকলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণকালে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান বিষয়ে "বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ" করেন। এবং "যে ছাত্র আগামী বর্ষে (মাতৃভাষায়) কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সর্ব্বোত্তম রচনা করিতে পারিবেক, তাহাকে এক স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলেন।"

উপরের দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া ১৭৭১ শকের বৈশাখ সংখ্যা (১৮৪৯ এপ্রিল) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত "স্বদেশীয় ভাষায় বিদ্যাভ্যাস" শীর্ষক প্রথম নিবন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"স্বদেশীয় ভাষার অনুশীলন ব্যতিরেকে সাধারণরূপে বিদ্যা প্রচার হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে, ইহা এই পত্রিকায় বারম্বার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সম্প্রতি এ বিষয় যে কোন কোন রাজ-সংক্রান্ত এবং বিশেষতঃ শিক্ষাসমাজ সম্পর্কীয় প্রধান ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, ইহা অতি শুভচিহ্ন। বীটন সাহেব পরম বিদ্যোৎসাহী এবং ব্রিটেনের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া প্রধান প্রধান উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; এতাদৃশ মহাশয়ব্যক্তির কথা সকলকেই প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

তাঁহার ও মেক্তাক সাহেবের দৃষ্টান্ত দ্বারা এপ্রকার অনুভবও হয়, যে ক্রমে ক্রমে অনেকেরই এবিষয়ে মনোযোগ হইতেছে, এবং ইংরাজী যে এদেশীয় লোকের স্বজাতীয় ভাষা হইবেক, এ অভিপ্রায় এইক্ষণে বিজ্ঞলোকদিগের স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অলীক বোধ হইয়া আসিতেছে।"

মধুসূদন দত্তের কাছে উক্ত অভিপ্রায় অলীক বোধ হইয়াছিল বটে কিন্তু মধুসূদন অপেক্ষাও বিজ্ঞতর লোকের কাছে সে অভিপ্রায় যে আজিও অলীক হইয়া যায় নাই বিগত ১০ই এপ্রিল শুক্রবারে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনের সেনেট সভাই তাহার প্রমাণ।

শেষ উদ্ধৃতিটি পাদরি লং সঙ্কলিত 'বঙ্গীয় পাঠাবলী' হইতে। 'পাঠাবলী'র এই খণ্ডটি (চতুর্থ) মূলতঃ 'সত্যার্ণব' পত্রিকার সঙ্কলন। লং সাহেব 'সত্যার্ণবে'র সম্পাদক ছিলেন। নিবন্ধটির নাম "বঙ্গীয় ভাষা এবং হিন্দু জাতির বিবরণ।" আরম্ভটি এইরূপ :

"ভাষা এবং অক্ষর দেশভেদে প্রয়োজনানুসারে নানাবিধ হইয়াছে, অতএব যে দেশে প্রথমাবধি যে ভাষা দ্বারা লৌকিক ব্যবহার এবং তাবৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতেছে সেই ভাষার আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্যজাতীয় ভাষাবলম্বন করিয়া তদ্দেশীয় তাবৎ লোককে বিজ্ঞ করা অতি সুকঠিন। যদ্যপি বিশেষ পরিশ্রমের দ্বারা অল্প সংখ্যক লোক অন্য জাতীয় ভাষাতে বিজ্ঞ হইতে পারে, তথাপি তাহাতে দেশের উপকার দর্শে না, বরঞ্চ যে সকল লোকেরা অন্যজাতীয় ভাষা দ্বারা বিজ্ঞ হয়েন তাঁহাদিগের স্বীয় অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু তাঁহারা স্বদেশীয় বহুতর অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত বাস করত অভিমানী হইতে পারেন, আর অভিমান যেরূপ অনিষ্টের কারণ তাহা কাহার অবিদিত আছে? বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় উক্ত দশ কোটি মনুষ্যের মধ্যে এক শত বা এক সহস্র কিম্বা দশ সহস্র লোক বহু পরিশ্রমে বিস্তর ধন ব্যয় দ্বারা ভাষান্তরে বিজ্ঞ হইলে কি প্রকারে দেশসাধারণের সভ্যতা হইতে পারে?

গৌড়ীয় ভাষার অল্পতা প্রযুক্ত যদ্যপি তাহা ইউরোপীয় কোন বিদ্যাবিশেষের সম্যক তাৎপর্য্য প্রকাশে আপাততঃ অসমর্থ, তথাপি ঐ ভাষা পরিত্যাগ না করিয়া বরং যদ্দ্বারা তাহার বৃদ্ধি হয় এইরূপ উপায় চেষ্টা করা উচিত।"

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেদিন সেনেটের সভায় শতাধিক বর্ষ পরে এই প্রশ্নই পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। বিগত একশত বৎসর ধরিয়া বাংলা দেশের জ্ঞানী বিজ্ঞানীরা বহু শ্রম চিন্তা ও সাধনার দ্বারা যে "উপায় চেষ্টা" করিয়াছেন এ কালের বিজ্ঞেরা তাহা নস্যাৎ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই "উপায় চেষ্টা"র ফল যাহা ফলিয়াছে অন্ততঃ বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরা চেষ্টা করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি। বিজ্ঞজনেরাও ইচ্ছা করিলেই সে পরিচয় পাইবেন। নিবন্ধকারক বাংলা ভাষার দুরূহ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের অভাব বিষয়ক আপত্তি উঠিতে পারে ইহা ধরিয়া লইয়াই এইরূপে তাহা নিরাকরণ করিয়াছেন।

"এতদ্দেশীয় ভাষার অল্পতা বিষয়ে কোন আপত্তি সম্ভবে না কারণ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা উৎপন্ন হয়, এবং যে কোন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় চলিত আছে তাহা গৌড়ীয় ভাষায় অনায়াসে ব্যবহার্য্য হইতে পারে, অতএব ইহার বৃদ্ধি হওনের অধিক সম্ভাবনা, এবং এই রীত্যনুসারে গ্রীক এবং লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে আহরণ করিয়া ইংলণ্ডীয় ভাষার বৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অতিপ্রাচীনতা ও বাহুল্য প্রযুক্ত তৎসহকারে গৌড়ীয় ভাষায় সকল অভিপ্রায় প্রকাশ হইতে পারে। ঐ সংস্কৃত ভাষার বাহুল্য ও প্রাচীনতার প্রমাণ কেবল অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র নহে; কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ইংলণ্ডীয় মহানুভব মহাশয়েরা স্ব স্ব গ্রন্থে গ্রীক লাটিন প্রভৃতি ভাষা হইতে উক্ত ভাষার বাহুল্য এবং উৎকৃষ্টতা লিখিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সংস্কৃত ভাষা হইতে গৌড়ীয় ভাষা সংগ্রহেও যদ্যপি বিদ্যাবিশেষের তাৎপর্য্য প্রকাশ না হয়, তবে দেশান্তরীয় ভাষাদ্বারা প্রয়োজনানুসারে গৌড়ীয় ভাষা বৃদ্ধিকরণে কোন প্রতিবন্ধক নাই, অতএব ভাষার অল্পতার বিষয়ে আপত্তি কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।"

—

জ্ঞানবিজ্ঞান প্রসঙ্গে বাংলার বর্ত্তমান সাহিত্য-নায়ক শ্রীরাজশেখর বসুর গত ৫ই বৈশাখে অনুষ্ঠিত একটি সভায় প্রদত্ত উক্তি বাংলা দেশের প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর অনুধাবনীয় ও অনুসরণীয়। যে কালে প্রথম শ্রেণীর বাংলা সংবাদপত্রগুলিও নিছক সাদামাটা সংবাদ পরিবেশন করিতে গিয়া ভাষায় ও ভঙ্গিতে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'কেও হার

জানাইতেছেন, একটি সামান্য সর্পদংশনের সংবাদ দিতে গিয়া যাঁহারা আদম-ইভ-শয়তান, পরীক্ষিৎ-আস্তিক-তক্ষককে পর্যন্ত টানিয়া আনিয়া চমৎকারিত্ব সম্পাদনে পরস্পরকে পাল্লা দিতেছেন সেকালে সেই সংবাদপত্র-পরিচালকদের নাকের উপরেই যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানচর্চার কথা বলা সৎসাহস বইকি! যখন বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, এমন কি শারীরবিদ্যা ও ব্যবচ্ছেদবিদ্যার প্রবন্ধ ও গ্রন্থরচনায় মুক্তবাদীয় ও গৌরকিশোরী রম্যভাষা ব্যবহারই হইতেছে অর্ডার অব দি ডে তখন বসুমহাশয়ের এ সুচিন্তিত সতর্কবাণী কি কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিবে? তিনি বলিয়াছেন:

"কলাচর্চাই সাহিত্যের শেষ কথা নয়। জ্ঞানাত্মক সাহিত্যেরও (যাহা বাংলা সাহিত্যে বেশী নাই) যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।...বাংলা সাহিত্যে ৮৬ ভাগ রচনাই ভাবাত্মক, কাল্পনিক; জ্ঞানাত্মক রচনার সংখ্যা খুবই নগণ্য। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে ভাবাত্মক রচনা প্রচুর হইলেও জ্ঞানাত্মক রচনা স্বল্প নয়।...বাংলা সাহিত্যের ৭৫ ভাগ রচনাই গল্প; আর কবিতা ৫ ভাগ, ভক্তিরসাত্মক রচনা ৪ ভাগ, ভ্রমণ ২ ভাগ, ইতিহাস ২ ভাগ, রাজনীতি ২ ভাগ, অর্থনীতি কৃষি ১ ভাগ, দর্শন ১ ভাগ, বিজ্ঞান ১ ভাগের কম, জ্যোতিষ ১ ভাগ, অন্যান্য রচনা বাকী অংশ।

বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানাত্মক রচনার অভাব রহিয়াছে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শিক্ষার শেষ নাই। যতকালই মানুষ বাঁচে ততকালই তাহাকে শিখিতে হয়। কাজেই জ্ঞানাত্মক রচনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বাংলাভাষার তুলনায় হিন্দী-সাহিত্যে জ্ঞানাত্মক রচনা বেশ আগাইয়া চলিয়াছে। আজ সরকারী বেসরকারী সাহায্য ও প্রেরণায় অপূর্ণ বাংলা সাহিত্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলার প্রয়োজন হইয়াছে।"

* * *

তবে ইহার পরেও কথা আছে, তাহাও স্মরণীয়। নিছক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আত্যন্তিক দাসত্ব, অবিমিশ্র যুক্তিমার্গের অনুসরণ মানবজীবনের শেষ কথা নয়। দুই জন শ্রেষ্ঠতম বাঙালীর শেষ জীবনে এই অনুভূতি জন্মিয়াছিল। বিদেশী টলস্টয়ের কথা তুলিব না। মনস্বী রামমোহন বিলাত যাত্রা করিবার পূর্বে "ইয়ং বেঙ্গলে"র উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া প্রীত হন নাই। তাঁহার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত (১৮৩৪) 'Biographical Memoir of the late Raja Rammohun Roy' গ্রন্থে দেখিতেছি:

"As he is advanced in age, he became more strongly impressed with the importance of religion to the welfare of society, and the pernicious effects of scepticism. In his younger years his mind had been deeply struck with the evils of beliving too much, and against that he directed all his energies: but, in his later days, he began to feel that there was as much, if not greater danger in the tendency to believe too little. He often deplored the existence of a party which had sprung up in calcutta, composed principally of impudent young men, some of them possessing talent, who had avowed themselves sceptics in the widest sense of the term. He described it as partly composed of East Indians, partly of the Hindu youth who, from education, had learnt to reject their own faith without substituting any other. These he thought more debased than the most bigoted Hindu, and their principles the bane of all morality."

দ্বিতীয় উক্তিটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রদত্ত আর একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর বাঙালীর। তিনি বলিতেছেন:

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশীবিদেশী শাস্ত্র [মায় মার্ক্স-এঞ্জেলস্-কয়েরবাক পর্যন্ত] যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্টভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। 'জীবন লইয়া কি করিব?' এই প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর

অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল; এই একমাত্র সুফল।...সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এতদিনে পাইয়াছি।"

—

গোপালদা লিখিয়াছেন,

"ভায়া হে, চীনের প্রধান-মন্ত্রী সার্থকনামা চৌ-এন-Lie-এর ঘোষণা-মতে তিব্বতের দালাই লামাকে শয়তান-বিদ্রোহীরা তো কব্জা করিয়া ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া বন্দী করিল কিন্তু তোমাদের দুই লাখ-মনসবদারী বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে স্তম্ভে এমন ঠোকাঠুকি লাগিতেছে কেন? লামাকে লইয়া ধামা ধামা গবেষণা হোক, কিন্তু ল্যাঙাতে ল্যাঙাতে ঝগড়া না বাধিয়া যায়। যে পত্রিকার মাথার উপরে লর্ড গৌরাঙ্গ এবং আনাচে-কানাচে মহাত্মারা উঁকিঝুঁকি দিতেছেন "গড্-কিং"-কে লইয়া তাঁহাদের অস্বাভাবিক উষ্মা কৌতুকাবহ নয় কি? একজন মতলববাজ অষ্ট্রিয়ানের (জার্মান নয়) পকেট-বুক সিরিজের রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়িয়া বাংলা দেশের বিবেক যদি বিচলিত হয় তাহা হইলে বাংলা দেশের কি গতি হইবে? রাহুল সাংকৃত্যায়ন যে কত বড় খলিপা তাহা তাঁহার ভল্গা হইতে ভাসিতে ভাসিতে শেষ পর্যন্ত গঙ্গায় চিৎ-সাঁতার দেখিয়াও যদি মালুম না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে প্রাচীন নাম-মাহাত্ম্যে আধুনিকেরাও হতচেতন হইয়া থাকে। যাক্ সে কথা। কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে হেনরিক হারারের রোমাঞ্চ কাহিনীই শেষ কথা নয়, সার চার্লস বেলের চারখানি, এল. এ. ওয়াডেলের দুইখানি, আলেকজাণ্ড্রা ডেভিড্নীলের তিনখানি, ডব্লু. ওয়াই. ইভান্স-ওয়েন্জ সম্পাদিত চারখানি, জি. ট্যাণ্ডবার্গের দুইখানি, রকহিলের তিনখানি, হেনরি স্যাভেজ ল্যাণ্ডরের তিনখানি, এড্মাণ্ড্ ক্যাণ্ড্লারের তিনখানি, হাকের দুইখানি, নাইটের চারখানি, ডেভিড্ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের তিনখানি, স্যার টমাস হোল্‌ডিচের দুইখানি, ম্যাকগভার্ণের দুইখানি, চার্লস্ এ শেরিং, মার্কো পলিস, এফ. গ্রেনার্ড, পাওয়েল মিলিংটন, লিলিয়ান স্টার, লাওয়েল টমাস (পুত্র), পার্সিভাল ল্যাণ্ডন, আন্দ্রে মিগট, ডেভিড্ ফ্রেজার, রোনাল্ড কাউলবেক, এডউইন জি/শারার, গর্ডন এণ্ডার্স, এবং জাপানী শ্রমণ একাই কাওয়াগুচি, ভারতীয় সন্ন্যাসী প্রণবানন্দ ও বাঙালী পর্যটক শরৎচন্দ্র দাসেরও তো বই আছে। কত নাম করিব। এই পুস্তক-সম্ভারের মধ্যে বেল, ওয়াডেল, রকহিল, ইভান্স-ওয়েন্জের বইগুলি প্রামাণিক। তিব্বত এবং লামাধর্ম সম্পর্কে ইঁহারা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধা পোষণ করেন। এই সকল গ্রন্থ নাড়াচাড়া করিলেই যে কোনও সহৃদয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন তিব্বত চীনের যতখানি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভারতবর্ষের। ভারতের উদ্যান প্রদেশের পদ্মসম্ভব এখানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন করেন, অতীশ অর্থাৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, কুমারজীব, কমলশীল, তিলপাদ, নারপাদ প্রভৃতির কথা তো তোমরা জানই। অতিকায় চীন বারবার হামলা করিয়াছে বলিয়াই তিব্বত চীনের নয়। ইতিহাস পড়িলেই এই সত্য বুঝিতে পারিবে। আজ নাইসাল্যাণ্ড আলজিরিয়া, সাইপ্রাস ও আফ্রিকার নানা দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য সমগ্র পৃথিবীতে আন্দোলন চলিতেছে। অপরাধ শুধু তিব্বতের! ভারতবর্ষ বর্বর, ভারতবর্ষ অশিক্ষিত এই ওজুহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর অক্টোপাস-প্রেম যাহারা সেদিন পর্যন্ত ভোগ করিয়াছে চীনের ছলকে তাহারা সমর্থন করে কোন লজ্জায়, বুঝিতে পারি না।

অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতবর্ষের সহিত তিব্বতের যে সম্পর্ক ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে সে সম্পর্কের কথাও বিস্মৃত-হওয়া উচিত নয়। সেই ইতিহাস যদি বিস্তারিত জানিতে চাও এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল ৫৯ ভাগ প্রথম সংখ্যায় মধুসূদন-সুহৃৎ গৌরদাস বসাকের প্রবন্ধ পাঠ কর। কলিকাতার সন্নিকটে হাওড়ার ঘুসুড়িতে দালাই লামা ও ওয়ারেন হেস্টিংসের চেষ্টায় ভারতীয় পরিব্রাজক পূরণগিরি কিভাবে একটা বৌদ্ধমঠ স্থাপন করিয়া তাহার মোহন্ত হইয়াছিলেন এবং ১৮৩৭ সনের ২০এ জানুয়ারি (১২৪৩ ৬ই মাঘ) কিভাবে দস্যুহস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল যে কাহিনী যেমন চমকপ্রদ তেমনই শোচনীয়। এই পূরণগিরিই ভারতে ইংরেজাধিকার-পরবর্তী প্রথম ভারতীয় যিনি তিব্বতের সহিত যোগসূত্র পুনঃ স্থাপন করেন। ১৭৭২ সনে ভুটানরাজ দেপা শিদার কুচবিহার আক্রমণ করেন। ঠিক এই সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা

শাসক হন। তিনি কুচবিহাররাজের প্রার্থনামতে ভুটানরাজকে শাসন করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধে ভুটানরাজ পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া দালাই লামার শরণাপন্ন হন। তখন ভুটান তিব্বতের করদরাজ্য ছিল। দালাই লামাও তখন শিশু। তশি লামা তাঁহার অভিভাবকরূপে তিব্বত শাসন করিতেছিলেন। ১৭৭৩ সনে তশি লামা পত্রযোগে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট ভুটানরাজের পক্ষে আবেদন জানান। এই পত্র লইয়া আসেন ভারতীয় পরিব্রাজক সন্ন্যাসী পুরণগিরি। পুরণগিরিই সুবিখ্যাত বোগ্‌ল-মিশন ও পরবর্তী টার্ণার-মিশনও পরিচালনা করেন। ইনি উর্ধ্ববাহু ছিলেন। ১৮০১ সনে প্রকাশিত 'এসিয়াটিক রিসার্চেস' পত্রের পঞ্চম খণ্ডে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাত (বাংলা হরফে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের লেখক, বইখানি আইনের, ১৭৮৫ সনে ছাপা হয়।) জোনাথান ডানকান এই পুরণগিরির আত্মকথার ইংরেজী অনুবাদ উর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসীর চিত্রসহ প্রকাশ করেন। তিনি সন্ন্যাসীকে পুরণপুরী বা প্রাণপুরী নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আত্মকথার শেষে জোনাথান ডানকান সন্ন্যাসীর শেষ পরিচয় দিয়া লিখিয়াছেন—

"Praun Poory went back from this part of the country [মানস সরোবর] into Nepaul and Thibet, from the capital of which [লাসা] he was charged by the administration there with dispatches to the Governor General Mr. Hastings, which he mentions to have delivered in the presence of Mr. Barwell, and of the late Messers Bogle and Elliotte; some years afterwards Mr. Hastings bestowed on him in *Jaghire*, the village of Assapoor, which he continues to hold as a free tenure......"

১৭৯২ সনের মে মাসে ডানকান পুরণগিরির বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন। এই আশাপুরই হাওড়ার ঘুসুড়ি, এবং দালাই লামার ব্যয়ে পুরণগিরি নির্মিত বৌদ্ধ মঠ বা ভোটমন্দিরের নামে এই গ্রামের বর্তমান নাম ভোটবাগান। মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে তবে নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি এখানে স্থাপিত হইয়াছে। একদিন গিয়া দেখিয়া আসিতে পার। আমি তো দালাই লামাকে নির্বাসনকালে এখানে থাকিবারই পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাহা হইলেই ব্যাপারটা একটা ঐতিহাসিক রূপ লইত। তবে জায়গাটা অরক্ষিত, অসংস্কৃত ও অত্যধিক গরম (লামার পক্ষে) বলিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁহার মুসৌরিতে থাকাই সাব্যস্ত হইয়াছে।"

গোপালদা তিব্বত, লামাধর্ম ও চীন সম্পর্কে আরও এক কাহন লিখিয়াছেন। সে সকল কাহিনী এখন প্রকাশ করা সমীচীন বোধ করিতেছি না। স্থানাভাবও একটি কারণ। তবে এই প্রসঙ্গে অদ্যকার (২১ এপ্রিল) 'যুগান্তরে' একটি পি. টি. আই.-সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। মহাচীনের সুমার্জিত সংস্কার-চেষ্টার স্বরূপটা কি এই সংবাদেই ধরা পড়িয়াছে। সম্পাদক ও বার্তাসম্পাদকের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ না ঘটিলে একই পত্রিকার সম্পাদকীয়ে ও সংবাদে এতখানি গরমিল সম্ভব নয়।

"৫০ হাজার তিব্বতীদের পাহারায় ৬০ হাজার চীনা সৈন্য

শিলিগুড়ি, ২০শে এপ্রিল—আজ এখানে বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, লাসা ও লাসার উপকণ্ঠের ৫০ হাজার তিব্বতীকে পাহারা দিবার জন্য ৬০ হাজার চীনা সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সকল অধিবাসীকে গণনা করা হইয়াছে এবং অশান্তির সময় যাহাতে প্রত্যেককে খুঁজিয়া বাহির করা যায়, তজ্জন্য পুরাদস্তুর হিসাব রাখা হইয়াছে।

এই সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, 'লাসা আজ একটি রুদ্ধদ্বার নগরীতে পরিণত হইয়াছে, চীনের ঘন বসতি অঞ্চল হইতে বহু চীনা পরিবার আনিয়া লাসার উর্বর জমিতে পুনর্বাসন করা হইয়াছে। পশ্চিম তিব্বতে বহু চীনা সমাবেশ করা হইতেছে। সিংকিয়াং-এর মধ্য দিয়া মূল চীন ভূখণ্ডের সহিত ইহার সংযোগ সাধন করা হইয়াছে। তিব্বতে চানাদের বসতি স্থাপন সম্পর্কে যেখানেই প্রতিবাদ হইয়াছে, সেখানেই দৃঢ়হস্তে তাহা দমন করা হইয়াছে। বহুসংখ্যক তিব্বতীকে অজ্ঞাতস্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিছুসংখ্যক তিব্বতীকে হয়ত বন্দীশিবিরে পাঠান হইয়াছে। কিছু তিব্বতীকে হয়ত বলপূর্বক রাস্তা নির্মাণের কাজে লাগান হইয়াছে।'

স্বয়ং দলাই লামা আমদো প্রদেশের অধিবাসী। এই প্রদেশ এখন মূল চীন ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।"

—

ভ্রম-সংশোধন—৪৮৪ পৃ ২য় কলম ২৪ পংক্তি "অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর বাঙালীর" পরে "—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের" কথাটি বসিবে।

॥ দ্বাদশ অধ্যায় ॥

॥ 'কবির অন্তরে তুমি কবি' ॥

৫

'লিপিকা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে। তার ঠিক তিন বৎসর পরে ৩২ সালের শ্রাবণে প্রকাশিত হল 'পূরবী'। 'বলাকা' আর 'পূরবী'র মধ্যে প্রায় এক যুগের ব্যবধান। মাঝখানে 'পলাতকা' আর 'শিশু ভোলানাথ' এই যুগে কবিজীবনের দুটি ক্রোড়পত্রের মতই দেখা দিয়েছে। 'শিশু ভোলানাথ' একেবারেই স্বতন্ত্র গোত্রের কবিতা, আর 'পলাতকা'র গল্প-কবিতায় কবিচিত্তের প্রতিফলন হয়েছে তির্যক্ ভঙ্গিতে। কাজেই 'বলাকা'র পরে সত্যকার গীতিকাব্যের বাঁশি প্রথম বেজে উঠল 'পূরবী'তেই। 'বলাকা'-'পূরবী'র মধ্যবর্তী এই যুগে কাব্যের অনুপস্থিতি সম্পর্কে কবি লিখেছেন, 'বর্তমান বয়সে আমার জীবনের প্রধান সংকট এই যে, যদিচ স্বভাবত আমি আরণ্যক তবু আমার কর্মস্থানের কুগ্রহ সকৌতুকে আমাকে সাধারণ্যক করে দাঁড় করিয়েছেন।...কাব্যসরস্বতীর সেবক হয়ে গোলমালে আজ গণপতির দরবারের তকমা পরে বসেছি; তার ফলে কাব্যসরস্বতী আমাকে প্রায় জবাব দিয়েছেন, আর গণপতির বাহনটি আমার সকল কাজেরই ছিদ্র অন্বেষণ করছেন।'[৫] এ যুগের লেখা একটি গানেও কবি তাঁর চিরসুন্দরের কাছে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, প্রাণের বীণার তারে তারে ধুলো জমে উঠেছে। মালা গাঁথবার মত কুসুম আর নেই। দিনের পরে দিন যায় কেটে, হৃদয় কোন্ পিপাসায় পিপাসিত যেন সে কথাও সে ভুলে গেছে। শূন্য ঘাটে কবি অপেক্ষা করে আছেন রঙীন পালে আবার কবে তরীখানি আসবে; সুধারসের পারাবারে কবে আবার তিনি দেবেন পাড়ি!

এমন দিনে আবার বাজল সানাই। শৈশব-কৈশোরের পরিচিত পরিবেশে কবির চিত্তবংশীর কুহরে কুহরে বেজে উঠল অতীত দিনের হারানো সুরগুলি। ১৩৩০ সালের ফাল্গুন মাস। কবি এসেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সম্পর্কে তিনটি বক্তৃতা করতে। ১৮, ১৯ ও ২০— এই তিনদিন তাঁর বক্তৃতা হল। শেষ দিনের বক্তৃতার মুখবন্ধে কবি বললেন, 'আজ এই বক্তৃতাসভায় আসব বলে যখন প্রস্তুত হচ্ছি তখন শুনতে পেলুম, আমাদের পাড়ার গলিতে সানাই বাজছে। কী জানি কোন্ বাড়িতে বিবাহ। খাম্বাজের করুণ তান শহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।

'উৎসবের দিনে বাঁশি কেন বাজে। সে কেবল সুরের লেপ দিয়ে প্রত্যহের সমস্ত ভাঙাচোরা মলিনতা নিকিয়ে দিতে চায়। যেন আপিসের প্রয়োজনে লৌহপথে কুশ্রীতার রথযাত্রা চলছে না, যেন দরদাম কেনাবেচা ও-সমস্ত কিছুই না। সব ঢেকে দিলে।

'ঢেকে দিলে কথাটা ঠিক হল না; পর্দাটা তুলে দিলে—এই ট্রাম-চলাচলের, কেনা-বেচার, হাঁক-ডাকের পর্দা। বর-বধূকে নিয়ে গেল নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে।'[৬]

বাঁশি শুধু বর-বধূকেই 'নিত্যকালের অন্তঃপুরে, রসলোকে' নিয়ে গেল না; কবিচিত্তেও অকস্মাৎ

অপ্রত্যাশিতভাবে নিত্যকালের অন্তঃপুরে রসলোকের রুদ্ধদ্বার মুক্ত হয়ে গেল। 'পুষ্পাঞ্জলি' 'লিপিকা'র পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, বিবাহবাসর থেকে ভেসে-আসা সানাইয়ের সুর কবিচেতনায় বার বার বিরহ-বিপ্রলম্ভের উদ্দীপন বিভাব-রূপে ক্রিয়াশীল হয়েছে। 'পুষ্পাঞ্জলি'তে কবি লিখেছিলেন, 'কোথায় নহবৎ বসিয়াছে। সকাল হইতে না হইতেই বাঁশি বাজিয়া উঠিয়াছে। আগে বিছানা হইতে নূতন ঘুম ভাঙিয়া যখন এই বাঁশি শুনিতে পাইতাম তখন জগৎকে কি উৎসবময় বলিয়া মনে হইত!... এখন আর তাহা হয় না! আজি ওই বাঁশি শুনিয়া প্রাণের এক জায়গা কোথায় হাহাকার করিতেছে। এখন কেবল মনে হয়, বাঁশি বাজাইয়া যে-সকল উৎসব আরম্ভ হয় সে-সব উৎসবও কখন একদিন শেষ হইয়া যায়।'' 'লিপিকা'র "বাঁশি"তে আরো একটু গভীর সুরে কবি বলছেন, 'পথের ধারে দাঁড়িয়ে বাঁশি শুনি আর মন যে কেমন করে বুঝতে পারিনে। সেই ব্যথাকে চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে মেলাতে যাই, মেলে না। দেখি, চেনা হাসির চেয়ে যা উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে যা গভীর।' ১৩৩০ সালের ফাল্গুনে কবিচিত্তে আবার যে বাঁশির সুর বেজে উঠল তা তাঁর চেতনার উপর থেকে সমস্ত চেনা কথার পর্দা যেন এক টানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে। নির্বারিত মর্মলোকে কবি ফিরে পেলেন তাঁর সেই হৃদয়বেদনাকে—চেনা হাসির চেয়ে যা উজ্জ্বল, চেনা চোখের জলের চেয়ে যা গভীর। সেদিনই তিনি লিখলেন "উৎসবের দিন" কবিতাটি। তাঁর অনুভূতিতে ধরা পড়ল :

অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

বিবাহোৎসবের বংশীধ্বনিতে কবির চেতনা ফিরল নিজের জীবনের কেন্দ্রস্থলে। বেদনাপদ্মের বীণাপাণি 'দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস' মিশিয়ে কবির গীতিকাব্যের বীণায় যে নতুন সুর ফুটিয়ে তুললেন তাতে কবির অন্তরতর আত্মকথাই ধ্বনিত হয়ে উঠল :

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে কতবার বারে বারে
এসেছিল সৌভাগ্য-লগন।
আশার লাবণ্যে-ভরা জেগেছিল বসুন্ধরা,
হেসেছিল প্রভাত-গগন।
* * *
আজ উৎসবের সুরে তারা মরে ঘুরে ঘুরে,
বাতাসেরে করে যে উদাস।
তাদের পরশ পায় কি মায়াতে ভরে যায়
প্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ।

দিগন্তের স্বর্ণদ্বারে যে সৌভাগ্য-লগ্নগুলি কবিজীবনের প্রভাত-গগনে দেখা দিয়েছিল তাদের উদাসকরা স্পর্শে নবপ্রভাতের স্নিগ্ধ অবকাশ অপরূপ মায়াতে ভরে উঠল। ১৩৩০ সালের ফাল্গুনের এই দিনগুলিতে কবি পর পর "উৎসবের দিন", "গানের সাজি", "লীলাসঙ্গিনী", "শেষ অর্ঘ্য", "বেঠিক পথের পথিক" ও "বকুল-বনের পাখি"—এই ছ'টি কবিতায় তাঁর প্রভাত-গগনের সৌভাগ্য-লগ্নগুলিকেই স্মরণ করলেন। কবির মনে হল তাঁর জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্ন সমুপস্থিত। পূরবীর ছন্দে শেষ রাগিণীর বীণা বেজে উঠেছে। বিস্মরণের গোধূলিক্ষণের আলোয় তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল তাঁর মানসলক্ষ্মীর মূর্তি। জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে পূরবী রাগিণীতে তাঁরই উদ্দেশে 'শেষ অর্ঘ্য' সাজিয়ে তিনি লিখলেন :

যে সুন্দরী, যে ক্ষণিকা
নিঃশব্দ চরণে আসি, কম্পিত পরশে
চম্পক-অঙ্গুলি-পাতে তন্দ্রা-যবনিকা
সহাস্যে সরায়ে দিল, স্বপ্নের আলসে
ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা;
অন্তরের কণ্ঠহারে নিবিড় হরষে
প্রথম দুলায়ে দিল রূপের মণিকা;
এ-সন্ধ্যার অন্ধকারে চলিনু খুঁজিতে
সঞ্চিত অশ্রুর অর্ঘ্যে তাহারে পূজিতে।

৬

১৩৩০ সালের ফাল্গুনে লেখা এই কবিতাগুলি 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের প্রথমভাগ 'পূরবী'র শেষ স্তর রচনা করেছে। 'পূরবী'র এই পূর্বভাগে আরও কিছুদিন আগের লেখা কয়েকটি কবিতাও স্থান পেয়েছে। মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার আগে মর্ত্যপ্রেম যে কবিমানসে নূতন আসক্তি রচনা করেছে তারই সুর এই ভাগের বিচিত্রবন্ধে গ্রথিত গীতিকবিতাগুলির মুখ্য উপজীব্য। "তপোভঙ্গ" কবিতায়

কবি কালের অধীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছেন 'যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল' তাঁর দিনগুলি কোথায় গেল ?

শূন্যের অকূলে তারা অযত্নে গেল কি সব ভাসি ?

* * *

গেল বিস্মৃতির ঘাটে স্বেচ্ছাচারী হাওয়ার খেলায়
নির্মম হেলায় ?

এই জিজ্ঞাসারই উত্তর কবি পেলেন 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে।—

নহে নহে, আছে তারা ; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সঙ্গোপনে।

কবি নিজেও এক 'নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে' স্মরণের পটে সেই দিনগুলিকে ফিরে পেলেন। 'পূরবী'র 'পথিক'-অংশের "কিশোর প্রেম" পর্যন্ত কবিতাগুলি সেই স্মৃতি-মন্থন-করা ধন। 'পূরবী'র এই অংশের কবিতাগুলি লেখা ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর-নভেম্বর মাসে দক্ষিণ-আমেরিকা-যাত্রার সমুদ্রপথে। কবিজীবনে এই সমুদ্রযাত্রা যে কী গুরুত্ব অর্জন করেছে আমরা তার আলোচনা করেছি প্রথম অধ্যায়ে। পেরুর স্বাধীনতালাভের শতবার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে সেপ্টেম্বরের পনেরোই কলিকাতা থেকে যাত্রার দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু কবি হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হওয়ায় তিন চার দিন তাঁকে কলিকাতায় অপেক্ষা করতে হল। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পূর্বেই ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি রওনা হয়ে গেলেন। কলিকাতা থেকে মাদ্রাসের পথে কলম্বো গিয়ে য়ুরোপগামী জাপানী জাহাজ 'হারানা মারু'তে উঠলেন ২৪শে সেপ্টেম্বর। অষ্টাদশ দিবসে হারানা মারু পৌঁছল মার্সাই বন্দরে। সেখান থেকে প্যারিসে গিয়ে কাটলো এক সপ্তাহ। কবির সঙ্গী যাঁরা ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ কর, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী—তাঁদের কেউ গেলেন ইংলণ্ডে, কেউ রইলেন প্যারিসে। দক্ষিণ-আমেরিকায় কবির সঙ্গী হলেন শুধু এলমহার্স্ট। ১৮ই অক্টোবর কবি এলমহার্স্টকে সঙ্গে নিয়ে শেরবুর্গ বন্দর থেকে 'আণ্ডেস' জাহাজে উঠলেন আর্জেনটিনার রাজধানী বুয়েনোস এয়ারিসের উদ্দেশে। শেরবুর্গ থেকে বুয়েনোস এয়ারিস তিন সপ্তাহের পথ। কবির শরীর অসুস্থ, মন ক্লান্ত ও অবসন্ন। এ অবস্থায় জাপানী জাহাজ হারানা মারুতে 'আতিথ্যের যে প্রচুর দাক্ষিণ্য' পেয়েছিলেন আণ্ডেসে তারও অভাব ঘটল। শরীরের সেই অবস্থায় আরামের পক্ষে যে-সব সুবিধার প্রয়োজন ছিল তা পাওয়া গেল না। আণ্ডেসের ক্যাবিনে প্রবেশ করেই কবির মনটা প্রসন্নতা হারাল। বিষুবরেখা পার হতে না হতেই হঠাৎ কখন শরীর গেল বিগড়ে; বিছানা ছাড়া আর গতি রইল না। শান্তিহীন দিন আর নিদ্রাহীন রাত কবিকে পিঠমোড়া করে শিকল কষতে লাগল। রোগ-গারদের দারোগা তাঁর বুকের উপর দুর্বলতার বিষম একটা বোঝা চাপিয়ে রেখে দিলে; মাঝে মাঝে মনে হত, এটা স্বয়ং যমরাজের চাপ। কবি লিখছেন, 'কয়দিন সংকীর্ণ শয্যায় পড়ে পড়ে মৃত্যুকে খুব কাছে দেখতে পেয়েছিলাম, মনে হয়েছিল প্রাণকে বহন করবার যোগ্য শক্তি আমার শেষ হয়ে গেছে।'

শরীর-মনের সেই বিশেষ অবস্থাকেই আমরা বলেছি 'নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রি'। "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"তে আর 'পূরবী'র পূর্বোল্লিখিত কবিতাগুলিতে তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ২রা অক্টোবর ডায়ারিতে কবি লিখছেন, 'দিন চলে গেল। ভুলেছিলুম যে, সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে চলেছি। মন চলেছিল আপন রাস্তায়; এক ভাবনা থেকে আর এক ভাবনায়। চলেছিল বললে বেশি বলা হয়। উট যেমন বোঝা পিঠে নিয়ে মরুর মধ্যে পথ আন্দাজ করে চলে, এ তেমন চলা নয়; এ যেন পথের খেয়াল না রেখে ভেসে যাওয়া, কোনো বিশেষ ঘাটের কাছে বায়না না নিয়ে শুধু শুধু বেরিয়ে পড়া, কথাগুলোকে নিজের চেষ্টায় চালনা না করে, দিকের হিসেব না রেখে, তাদের আপনার ঝোঁকে চলতে দেওয়া। তার সুবিধা হচ্ছে এই যে, কথাগুলো নিজেরাই হয় বক্তা, আর মনটা হয় শ্রোতা। মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে না, নিজের কাছ থেকে নিজে পায়।' 'এই নিজের কাছ থেকে নিজে পাওয়া'র অন্তরঙ্গ মুহূর্তে মহাসমুদ্র ও মহাকাশের সংগমস্থলে কবির চোখে ভেসে উঠল একখানি ছবি। কবি লিখছেন :

> এই জনশূন্য সমুদ্র ও আকাশের সংগমস্থলে পশ্চিমদিগন্তে একখানি ছবি দেখলুম। অল্প কয়েকটি রেখা, অল্প কিছু উপকরণ; আকাশ এবং সমুদ্রের

নীলের ভিতর দিয়ে অবসানদিনের শেষ আলো যেন তার শেষ কথাটি কোনো একটা জায়গায় রেখে যাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু উদাস শূন্যের মধ্যে ধরে রাখবার জায়গা কোথাও না পেয়ে ম্লান হয়ে পড়েছে—এই ভাবটিই যেন সেই ছবিটির ভাব।

ডেকের উপর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমি যা দেখলুম তাকে আমি বিশেষ অর্থেই ছবি বলছি, যাকে বলে দৃশ্য এ তা নয়। অর্থাৎ, এর মধ্যে যা-কিছুর সমাবেশ হয়েছে কেউ যেন সেগুলিকে বিশেষভাবে বেছে নিয়ে, পরস্পরকে মিলিয়ে, একটি সম্পূর্ণতার মধ্যে সাজিয়ে ধরেছে। এমন একটি সরল গভীর মহৎ সম্পূর্ণতার ছবি কলকাতার আকাশে একমুহূর্তে এমন সমগ্র হয়ে আমার কাছে হয়তো দেখা দিত না। এখানে চারিদিকের এই বিপুল রিক্ততার মাঝখানে এই ছবিটি এমন একান্ত এক হয়ে উঠে আমার কাছে প্রকাশ পেলে। একে সম্পূর্ণ করে দেখবার জন্যে এতবড়ো আকাশ এবং এত গভীর স্তব্ধতার দরকার ছিল।[৮]

ডায়ারির এই 'ছবি'রই দোসর সেই দিনই লেখা পূরবীর "ছবি" কবিতাটি। 'ছবি'র উপসংহারে আকাশ-পটের চিত্রটি কবির নিজের মানসপটে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কবি লিখছেন :

এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া,
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন-অম্বরতলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা
চিহ্নহীন পদচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তার পরে দিন যায়, অস্ত যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায় লক্ষ লক্ষ রাগরক্ত ছবি।
তুই হেথা কবি,
এ বিশ্বের মৃত্যুর নিশ্বাস
আপন বাঁশিতে ভরি গানে তারে বাঁচাইতে চাস।

চারদিকের বিপুল রিক্ততার মাঝখানে শান্ত একটি গভীরতার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আকাশ-সমুদ্রের মহাসঙ্গমে সমুদ্ঘাটিত হল কবির অন্তরতম মনোবাসনাটি।

প্রত্যাবর্তনের পথেও ক্রাকোভিয়া জাহাজে ১২ই ফেব্রুয়ারির ডায়ারিতে কবি লিখছেন :

দিনের আলো যখন নিবে আসছে, সামনের অন্ধকারে যখন সন্ধ্যার তারা দেখা দিল, যখন জীবন-যাত্রার বোঝা খালাস করে অনেকখানি বাদ দিয়ে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্যে মনকে তৈরি হতে হচ্ছে, তখন কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবার জন্যে মনের ব্যগ্রতা আমি তাই লক্ষ্য করে দেখছি। সমস্ত দিন প্রাণপণ চেষ্টায় যা-কিছু সে জমিয়েছিল, গড়ে তুলেছিল, সংসারের হাটে যদি তার কিছু দাম থাকে তবে তা সেইখানেই থাক্‌, যারা আগলে রাখতে চায় তারাই তার খবরদারি করুক ; রইল টাকা, রইল খ্যাতি, রইল কীর্তি, রইল পড়ে বাইরে ; গোধূলির আঁধার যতই নিবিড় হয়ে আসছে ততই তারা ছায়া হয়ে এল ; তারা মিলিয়ে গেল মেঘের গায়ে সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার সঙ্গে।

অনেকখানি বাদ দিয়ে যে অল্প-কিছু বেছে নেবার জন্যে কবির মন তৈরি হল তার কথা আরও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে তিনি বললেন :

যখন ক্লান্তি আসে, যখন পথ ও পাথেয় দুই-ই যায় কমে অথচ সামনে পথটা দেখতে পাই সুদীর্ঘ, তখন ছেলেবেলা থেকে যে-ঘর বাঁধবার সময় পাইনি সেই ঘরের কথা মন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তখনই আকাশের তারা ছেড়ে দীপের আলোর দিকে চোখ পড়ে। জীবলোকে ছোটো ছোটো মাধুরীর দৃশ্য যা তীরের থেকে দেখা দিয়ে সরে সরে গিয়েছে, চোখের উপরকার আলো ম্লান হয়ে এলে সেই অন্ধকারে তাদের ছবি ফুটে ওঠে ; তখন বুঝতে পারি, সেই সব ক্ষণিকের দেখা প্রত্যেকেই মনের মধ্যে কিছু-না-কিছু ডাক দিয়ে গেছে। তখন মনে হয়, বড়ো বড়ো কীর্তি গড়ে তোলাই যে বড়ো কথা তা নয়, পৃথিবীতে যে-প্রাণের যজ্ঞ সম্পন্ন করবার জন্যে নিমন্ত্রণ পেয়েছি তাতে উৎসবের ছোটো পেয়ালাগুলি রসে ভরে তোলা শুনতে সহজ, আসলে দুঃসাধ্য।

এই অসম্পূর্ণ প্রাণের যজ্ঞে কবির মন তাই প্রাণশক্তি

ভাণ্ডারীর সন্ধানে ফিরছে। জানতে চেয়েছে শুষ্ক তপস্যার পিছনে কোথায় আছে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার।

৭

কবি যখন কলম্বো থেকে জাহাজে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন তখন একটি বাঙালি মেয়ে ["শিলঙের চিঠি"র শ্রীমতী নলিনী দেবী] তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন ডায়ারি লেখেন। ডায়ারি লেখাতে কবির চিরকালের আপত্তির কথা সবারই জানা আছে। তবু শরীর-মনের সেই অবস্থায় তাঁর মনের ভাব স্বগতোক্তির মতই ডায়ারির আকারে প্রকাশিত হতে লাগল। ২৯শে সেপ্টেম্বর কবি লিখছেন, 'বিশেষ-কোনো একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃতছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে-বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে লাগলুম।' এই নিজের কাছেই নিজের কথা বলার ফল হল "পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি।" পূর্বোদ্ধৃত আর এক দিনের ডায়ারি থেকেও জানা যাচ্ছে, কবির মন তখন অন্যকে কিছু দেবার কথা ভাবে নি, নিজের কাছ থেকে নিজেই কিছু পাবার জন্যে আকুল হয়েছে। 'পূরবী'র সমসাময়িক কবিতা-গুলিতেও কবির এই একই মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তাই "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র দোসর হল 'পূরবী'র এই পর্যায়ের লেখাগুলি। দোসরও বটে, আবার পরিপূরকও বটে। তাই "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র সঙ্গে 'পূরবী'র কবিতাগুলি মিলিয়ে পড়লেই এযুগের কবিমানসের পূর্ণ পরিচয়টি পাওয়া যাবে। ডায়ারির প্রথম পর্যায় শুরু হয়েছে ২০শে সেপ্টেম্বর, মাঝখানে ১লা অক্টোবর বাদ দিয়ে [সেদিন কবির কথা "পূর্ণতা" ও "আহ্বান" এই দুটি কবিতার মধ্যে অভিব্যক্ত] ৭ই অক্টোবর পর্যন্ত লেখা চলেছে। "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি"র মূলকথা ওই কদিনের ডায়ারিতেই পাওয়া যাবে। ডায়ারির দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরু চার মাস পরে ৭ই ফেব্রুয়ারি ক্রাকোভিয়া জাহাজে প্রত্যাবর্তনের পথে। প্রথম পর্যায়ের শেষদিনে যেখানে কবি তাঁর নিজের কাছে নিজের কথা বলা শেষ করছেন সেখানে তিনি বলছেন, 'যে-লীলালোকে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলুম, যে-লীলাক্ষেত্রে জীবনের প্রথম অংশ অনেকটা কেটে গেল, সেইখানেই জীবনটার উপসংহার করবার উদ্বেগে কিছুকাল থেকেই মনের মধ্যে একটা মন-কেমন-করার হাওয়া বইছে। * * * বিদায়ের গোধূলিবেলায় সেই আরম্ভের কথাগুলো সাঙ্গ করে যেতে হবে। সেইজন্যেই সকালবেলার মল্লিকা সন্ধ্যাবেলাকার রজনীগন্ধা হয়ে তার গন্ধের দূত পাঠাচ্ছে। বলছে, তোমার খ্যাতি তোমাকে না টানুক, তোমার কীর্তি তোমাকে না বাঁধুক, তোমার গান তোমাকে পথের পথিক করে তোমাকে শেষযাত্রায় রওনা করে দিক। প্রথম বয়সের বাতায়নে বসে তুমি তোমার দূরের বঁধুর উত্তরীয়ের সুগন্ধি হাওয়া পেয়েছিলে। শেষ বয়সের পথে বেরিয়ে গোধূলিরাগের রাঙা আলোতে তোমার সেই দূরের বঁধুর সন্ধানে নির্ভয়ে চলে যাও।'[১]

৮

হারানা মারু জাহাজে ৫ই অক্টোবর কবি ডায়ারিতে যে আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, প্রথম অধ্যায়ে আমরা তা উদ্ধার করেছি। এই আত্মপরিচয়ের শেষদিকে কবি বলেছিলেন, 'মন কাঁদছে, মরবার আগে গাখোলা ছেলের জগতে আর-একবার শেষ ছেলেখেলা খেলে নিতে, দায়িত্বহীন খেলা। আর, কিশোর বয়সে যারা আমাকে কাঁদিয়েছিল, হাসিয়েছিল, আমার কাছ থেকে আমার গান লুঠ করে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলেছিল, আমার মনের কৃতজ্ঞতা তাদের দিকে ছুটল। * * * মধ্যাহ্নে মনে হল তারা তুচ্ছ ; বোধ হল তাদের ভুলেই গেছি। তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন নক্ষত্রলোক সমস্ত আকাশ জুড়ে আমার মুখের দিকে চাইল তখন জানলুম, সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের ; ভোরের স্বপ্নে বা সন্ধ্যাবেলার স্বপ্নাবেশে জানতে না-জানতে তারা যার কপালে একটুখানি আলোর টিপ পরিয়ে দিয়ে যায় তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই।'

ডায়ারির এই কথাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই পরদিন লেখা "ক্ষণিকা" কবিতাটির পূর্ণ তাৎপর্য প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে।

কবিজীবনের প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে যারা এনেছিল নতুন ফোটা বেলফুলের মালা, জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে কবি বুঝলেন 'সেই ক্ষণিকা তো ক্ষণিকা নয়, তারাই চিরকালের।' কবি বলছেন :

ভেবেছিনু গেছি ভুলে ; ভেবেছিনু পদচিহ্নগুলি
পদে পদে মুছে নিল সর্বনাশী অবিশ্বাসী ধূলি।
আজ দেখি সেদিনের সেই ক্ষীণ পদধ্বনি তার
আমার গানের ছন্দ গোপনে করেছে অধিকার ;
দেখি তারি অদৃশ্য অঙ্গুলি
স্বপ্নে অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে দেয় ঢেউ তুলি।

যার অদৃশ্য অঙ্গুলি কবির স্বপ্নে তাঁর অশ্রুসরোবরে ক্ষণে ক্ষণে ঊর্মিলীলা রচনা করছে তার কথা বলতে গিয়ে এখানে ডায়ারির ভাষা আর কবিতার ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার মত। ডায়ারিতে আছে কবির কিশোর-লগ্নে যারা তাঁকে কাঁদিয়েছিল হাসিয়েছিল সেই সব ক্ষণিকাদের কথা। অর্থাৎ সেখানে বহুবচনের অসংকোচ প্রয়োগের মধ্যে আছে বাস্তব অভিজ্ঞতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। কিন্তু কবিতার স্বপ্নাধ্যানে বহু হয়ে গেছে এক। এ এক বহুর সম্মিলিত রূপমাত্রই নয়, অন্তরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে সেই এক এবং অদ্বিতীয় বিগ্রহের মধ্যেই বিচিত্রের লীলারসাস্বাদ। "শেষ অর্ঘ্য" কবিতায়ও কবি যে 'ক্ষণিকা'র কথা বলেছেন, যে 'স্বপ্নের আলসে ছোঁয়াল পরশমণি জ্যোতির কণিকা'— সেই 'ক্ষণিকা'ও তাঁর মুগ্ধ সজল নয়নের একটি স্বপ্ন, তাঁর অসীম চিত্ত-গগনের একটি চন্দ্র। এই প্রসঙ্গে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত "দোসর" [অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য] প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে কবি বলেছেন, 'এ জগৎ মিত্রাক্ষরের কবিতা।' 'প্রেম একটি পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।··· একটি হৃদয়ের জন্য একটি হৃদয় গঠিত হইয়া আছেই। তাহারা পরস্পর পরস্পরের জন্য।··· হৃদয়ে সেই দোসরের একটি অশরীরী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকেই ভালবাস, তাহার সহিত কথোপকথন কর। তাহাকে বল, হে আমার প্রাণের দোসর, আমার হৃদয়ের হৃদয়। আমি সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, কবে তুমি আসিবে?' কবিমানসের সিংহাসনে তাঁর 'যথার্থ দোসরে'র বিগ্রহ চিরপ্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণবের কিশোর-কিশোরী-লীলায় কৃষ্ণবল্লভাগণের রাজ্যে সখী ও মঞ্জরীবৃন্দের মধ্যে মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার যে আসন, কবিমানসে তাঁর 'যথার্থ দোসর' সেই আসনেই অধিষ্ঠিতা। "ক্ষণিকা" এই 'যথার্থ দোসরে'রই স্বপ্নপ্রতিমা। ডায়ারিতে লিপিবদ্ধ ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার রাজ্য পেরিয়ে কবি যখন কাব্যের কল্পনালোকে বিহার করেন তখনই তিনি তাঁর 'চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যেই' প্রবেশ করেন। 'ছিন্নপত্রে' তিনি বলেছেন, 'যেমনি কবিতা লিখতে আরম্ভ করি অমনি আমার চিরকালের যথার্থ আপনার মধ্যে প্রবেশ করি * * *। জীবনে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।'[১০]

"স্বপ্ন" কবিতায় কবি যখন বলেন, 'তোমায় আমি দেখি নাকো, শুধু তোমার স্বপ্ন দেখি' তখন বুঝতে পারা যায় তাঁর অন্তর্বর্তিনী মানসীমূর্তি সম্পর্কে কেন তিনি বলেছেন, 'যে-তুমি মোর দূরের মানুষ সেই-তুমি মোর কাছের কাছে।' কবিমানসীর মধ্যে 'এই জনমের রূপের তলে আর-জনমের ভাবের স্মৃতি' জড়িয়ে আছে বলেই তিনি 'নিত্যকালের বিদেশিনী'। তাঁরই উদ্দেশে কবি বলছেন :

চিত্তে তোমার মূর্তি নিয়ে ভাবসাগরের খেয়ায় চড়ি।
বিধির মনের কল্পনারে আপন মনে নতুন গড়ি।
আমার কাছে সত্য তাই,
মন-ভরানো পাওয়ায় ভরা বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতাই।

এই 'বাইরে-পাওয়ার ব্যর্থতা' দিয়েই যে 'মন-ভরানো পাওয়ায়' কবির মন ভরে আছে, অর্থাৎ তাঁর জীবনের ব্যর্থ লগ্নই যে তাঁর 'পরম লগ্ন' এই সত্য "ক্ষণিকা" কবিতায় কাব্যের ভাষাকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়েছে। কবি তাঁর জীবনের সেই 'ব্যর্থ লগ্নে'র রহস্য উন্মোচন করে বলছেন :

সেদিন ঢেকেছে তারে কী এক ছায়ার সংকোচন,
নিজের অধৈর্য দিয়ে পারে নি তা করিতে মোচন।
তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে

মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।

হে আত্মবিস্মৃত, যদি দ্রুত তুমি না যেতে চমকি
বারেক ফিরায়ে মুখ পথমাঝে দাঁড়াতে থমকি,
তা হলে পড়িত ধরা রোমাঞ্চিত নিঃশব্দ নিশায়
দুজনের জীবনের ছিল যা চরম অভিপ্রায়।
তা হলে পরম লগ্নে, সখী
সে ক্ষণকালের দীপে চিরকাল উঠিত আলোকি।

কিন্তু কবিজীবনে 'গেল না ছায়ার বাধা'। তাই চিরদিন 'না-বোঝার প্রদোষ আলোকে' 'স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি' তাঁর 'দীপ্ত চোখে' 'সংশয়-মোহের নেশা' সৃষ্টি করেছে।

সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।
অচেনার মরীচিকা আকুলিছে ক্ষণিকার শোকে।

৯

'লিপিকা'র "প্রথম শোক" আর "কৃতঘ্ন শোক"-এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেই 'পূরবী'র "কৃতজ্ঞ" কবিতাটি কার উদ্দেশে লেখা সেকথা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। জীবনের চলার পথে 'সেই অনেক কালের—পঁচিশ বছর বয়সের শোকে'র সঙ্গে দেখা হবার পর কবি তাকে চিনেও চিনতে পারেন নি। তাই সে বললে, 'মনে আছে? সেদিন বলেছিলে, তুমি সান্ত্বনা চাও না, তুমি শোককে চাও।' কবি লজ্জিত হয়ে বললেন, 'বলেছিলেম। কিন্তু তার পর অনেক দিন হয়ে গেল, তার পরে কখন ভুলে গেলেম।' "কৃতজ্ঞ" কবিতায় কবি বলছেন:

বলেছিনু "ভুলিব না," যবে তব ছল-ছল আঁখি
নীরবে চাহিল মুখে। ক্ষমা করো যদি ভুলে থাকি।
সে যে বহুদিন হল। সেদিনের চুম্বনের পরে
কত নব বসন্তের মাধবী মঞ্জরী থরে থরে
শুকায়ে পড়িয়া গেছে; * * *
তব কালো নয়নের দিঠি
মোর প্রাণে লিখেছিল প্রথম প্রেমের সেই চিঠি
লজ্জা ভয়ে; * * *
সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে
ভুলে থাকি, বেদনার দীপ হতে কখন নীরবে
অগ্নিশিখা নিবে গিয়ে থাকে যদি, ক্ষমা করো তবে।

'কৃতঘ্ন শোক' রচনায় দোসরহারা বিরহী-চিত্ত যখন সংসারকে বিশ্বাসঘাতক বলে অভিযুক্ত করছে তখন তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে সে শুনতে পেল ভৎ‍্সনার বাণী, 'ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েছে এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?' "কৃতজ্ঞ" কবিতায় এই জিজ্ঞাসারই উত্তর কবি নিজের মধ্যে পেয়েছেন। তাই তিনি বলছেন:

তবু জানি, একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে বলে
গানের ফসল মোর এ জীবনে উঠেছিল ফলে,
আজো নাই শেষ; * * *
তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,—
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে,—অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান। * * *
আমি তাই আমার ভাগ্যেরে ক্ষমা করি—
যত দুঃখে যত শোকে দিন মোর দিয়েছে সে ভরি
সব ভুলে গিয়ে। পিপাসার জলপাত্র নিয়েছে সে
মুখ হতে, কতবার ছলনা করেছে হেসে হেসে,
ভেঙেছে বিশ্বাস, অকস্মাৎ ডুবায়েছে ভরা তরী
তীরের সম্মুখে নিয়ে এসে,—সব তার ক্ষমা করি।
আজ তুমি আর নাই, দূর হতে গেছ তুমি দূরে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে-যাওয়া তোমার সিন্দূরে,
সঙ্গীহীন এ জীবন শূন্যঘরে হয়েছে শ্রীহীন,
সব মানি,—সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।

অর্থাৎ 'আড়াল পড়েছে' এ কথাটা যত সত্য তার চেয়েও বড় সত্য হল 'একদিন তুমি দেখা দিয়েছিলে'।

"কিশোর প্রেম" কবিতায় সেই দিনগুলির কথা কবি যেন স্বপ্নের আবেশে বলে গিয়েছেন।—

আজকে মনে পড়েছে সেই নির্জন অঙ্গন।
সেই প্রদোষের অন্ধকারে
এল আমার অধর-পারে

ক্লান্ত ভীরু পাখির মতো কম্পিত চুম্বন।
সেদিন নির্জন অঙ্গন।

তখন জানা ছিল না তো ভালোবাসার ভাষা;
যেন প্রথম দখিন বায়ে
শিহর লেগেছিল গায়ে;
চাঁপাকুঁড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন্ আশা,
সে যে অজানা কোন্ ভাষা।

সেই সেদিনের আসাযাওয়া, আধেক জানাজানি,
হঠাৎ হাতে হাতে ঠেকা,
বোবা চোখের চেয়ে দেখা,
মনে পড়ে ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী,
সেই আধেক জানাজানি।

এই জীবনে সেই তো আমার প্রথম ফাগুন মাস।
ফুটল না তার মুকুলগুলি,
শুধু তারা হাওয়ায় দুলি
অবেলাতে ফেলে গেছে চরম দীর্ঘশ্বাস,
আমার প্রথম ফাগুন মাস।

ভীরু হিয়ার না-বলা সেই বাণী, রাগরঞ্জিত চিত্তের অস্ফুট চেতনার সেই আধেক জানাজানি, কবিজীবনের সেই প্রথম ফাগুনমাসের মুকুলগুলি অবেলাতেই চরম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝরে গেল! কিন্তু ঝরে-পড়া সেই মুকুলের শেষ-না-করা কথাই কবির চৌষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর সুরে গানে তার গোপন মানে পেল খুঁজে। কবি বলছেন:

পারে যাওয়ার উধাও পাখি সেই কিশোরের ভাষা,
প্রাণের পারের কুলায় ছাড়ি
শূন্য আকাশ দিল পাড়ি,
আজ এসে মোর স্বপন মাঝে পেয়েছে তার বাসা,
আমার সেই কিশোরের ভাষা।

'পূরবী'র যুগে কবিমানসে "কিশোর প্রেমে"র এই পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই কবি-কিশোরের নবজন্ম হল। এই দ্বিতীয় জন্মের পরবর্তী ষোলো বৎসর, অর্থাৎ রবীন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায় তাঁর প্রাণের দোসরের সঙ্গে যে লীলারস আস্বাদিত হবে তারই আভাস বহন করে এনেছে 'পূরবী'র "খেলা" ও "দোসর" কবিতা দুটি। "খেলা" কবিতায় কবি তাঁর 'খেলার সাথি'কে জিজ্ঞাসা করছেন, 'সন্ধ্যাবেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ, ওগো খেলার সাথি।' সাঁঝের বাতি জ্বালিয়ে অস্ত-সোনায় এঁকে উদয়-ছবি কি শেষ হবে? তাঁর হারিয়ে-ফেলা বাঁশি লুকোচুরির ছলে পালিয়েছিল। তাঁর 'খেলার গুরু' বনের পারে শুকনো পাতার তলে আবার তাকে খুঁজে পেয়েছেন। সকালবেলায় বটের তলায় শিশির-ভেজা ঘাসে পাশে বসে তিনি যে-সুর শিখিয়েছিলেন সেই সুরই আজ বুকের দীর্ঘশ্বাসে, উছল চোখের জলে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে। তাই কবির জিজ্ঞাসা:

আমার কাছে কি চাও তুমি, ওগো খেলার গুরু,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে সারা।

* * *

বাঁধা পথের বাঁধন মেনে চলতি কাজের স্রোতে
চলতে দেবে নাকো?
সন্ধ্যাবেলায় জোনাক-জ্বালা বনের আঁধার হতে
তাই কি আমায় ডাক?

এই 'খেলার গুরু'ই কবির যৌবনলগ্নে [illegible] কৌতুকময়ী অন্তর্যামী রূপে পদে পদে দিক্ ভুলিয়ে তাঁকে নূতন দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরই পরশ-রস-তরঙ্গে কবির নিখিল গগন আনন্দে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। জীবনদেবতার সেই নিবিড় গভীর প্রেমের আনন্দই আবার ফিরে এল কবির জীবনে। কিন্তু এ তো পূজামন্দিরে আরতির প্রদীপ জ্বালানো নয়! নির্জন অঙ্গনে গন্ধপ্রদীপ জ্বালিয়ে শেষ অভিসারের জন্যে বাসক-সজ্জা রচনা! তাই কবি বলছেন:

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথি।
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,

তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥

১০

অন্তরে কিশোর-প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে জীবনের এই অন্তিমলীলার প্রতীক্ষার কথা "দোসর" কবিতায় আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারিতে" কবি নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'জন্মকাল থেকে আমাকে একখানা নির্জন নিঃসঙ্গতার ভেলার মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।' এই নিঃসঙ্গতাবোধই দোসর-জনের প্রতীক্ষার অভিলাষকে আরও মধুর করে তুলেছে। কবি বলছেন :

দোসর আমার, দোসর ওগো, কোথা থেকে
কোন্ শিশুকাল হতে আমায় গেলে ডেকে।
তাই তো আমি চিরজনম একলা থাকি,
সকল বাঁধন টুটল আমার, একটি কেবল রইল বাকি—
সেই তো তোমার ডাকার বাঁধন, অলখ ডোরে
দিনে দিনে বাঁধল মোরে।

জীবনের সকল বাঁধন যখন টুটল তখনও কবির মনে হচ্ছে কেবল একটি বাঁধন এখনও বাকি; সেটি তাঁর দোসরের 'ডাকার বাঁধন'। তাঁরই সঙ্গে চিরপ্রত্যাশিত মিলনের আনন্দে সারা জীবনব্যাপী নিঃসঙ্গতার বেদনার অবসান হবে সেই আশাতেই কবি বলছেন :

দোসর ওগো, দোসর আমার, দাও না দেখা,
সময় হল একার সাথে মিলুক একা।
নিবিড় নীরব অন্ধকারে রাতের বেলায়
অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।
তোমায় আমায় নতুন পালা হোক না এবার
হাতে হাতে দেবার নেবার।

'অনেক দিনের দূরের ডাকা পূর্ণ করো কাছের খেলায়।' এই হল কবিকিশোরের দ্বিতীয় জন্মের ঐকান্তিক প্রার্থনা। 'পূরবী'র "লীলাসঙ্গিনী"ও "আহ্বান" কবিতায় কবিজীবনের অপরাহ্নলগ্নের এই মর্মবাণীই অমর কাব্যছন্দে উদ্গীত হয়েছে। 'জীবনদেবতা' প্রসঙ্গে কবিমানসীর কাব্যভাষ্য খণ্ডে এই অন্তিম আহ্বায়িকা লীলাসঙ্গিনীর সম্যক্ পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে। "খেলা" ও "দোসর" কবিতাযুগলে কবির কণ্ঠ 'নিজের কাছে নিজের কথা বলা'র মতই অন্তরঙ্গ। "য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি"তে ৩০শে সেপ্টেম্বর যে প্রেমতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কবি করেছেন, তারই আলোকে কবির এই দ্বিতীয় জন্মের লীলা আস্বাদনীয়। অস্তাচলের পারে দাঁড়িয়ে উদয়াচলের সংগীতে প্রাণের নিঃশ্বাস পূর্ণ করে নবকৈশোরের এই লীলারস 'পূরবী'র কাব্যমালঞ্চকে চিরমধুর করে রেখেছে।

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

৫। পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, যাত্রী, পৃ. ১৬-১৮।
৬। সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে ; রচনাবলী-২৩, পৃ. ৩৯২।
৭। রচনাবলী-১৭, পৃ. ৪৯০-৯১।
৮। যাত্রী, পৃ. ৬৫-৬৬।
৯। তদেব, পৃ. ৯০।
১০। ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮০। পৃ. ১৫৭।

প্রসঙ্গ কথা

ভ্রমণ-সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী

আজকাল বাংলা ভাষায় ভ্রমণ-সাহিত্যের খুবই প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এটি সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। ভ্রমণ-সাহিত্য পাঠে যেমন অনেক নূতন নূতন দেশের ও জায়গার বিবরণ জানা যায় তেমনই মনেরও তাতে যথেষ্ট প্রসার ঘটে। মানুষের মধ্যে ভ্রমণ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত জানবার স্পৃহা সহজাত বললেও চলে। বিশেষ, যাঁরা ঘরকুনো স্বভাবের লোক, উদ্ভিদের মত এক জায়গায় স্থাণু হয়ে বাস করতে স্বস্তি অনুভব করেন, তাঁদের ভ্রমণ-কাহিনী পড়বার বাতিক আরও প্রবল। ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে অদেখা দেশ ও অদেখা মানুষ সম্বন্ধে যে অপরিচয়ের চমক থাকে তা-ই পাঠককে সবলে আকর্ষণ করে ভ্রমণ-সাহিত্যের অভিমুখে। এমন অনেক পাঠককে জানি, যাঁরা গল্প-উপন্যাসের চেয়েও আগ্রহভরে ভ্রমণকাহিনী পড়েন এবং এই দুই শ্রেণীর রচনার মধ্যে নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দিলে তাঁদের পক্ষপাত অবধারিত ভাবে ভ্রমণ-সাহিত্যের উপর গিয়ে পড়ে। পক্ষপাতিত্বটুকু অযৌক্তিক বলা যায় না। সুলিখিত ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে আশ্চর্য এক সরসতা আছে, যা অন্যত্র দুর্লভ। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ওই সরসতার মূলে আছে নতুন দেশ ও নতুন মানুষ সম্পর্কিত অপরিচয়ের আকর্ষণ, যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

সকলেরই জীবনে কিছু ভ্রমণের সুযোগ আসে না। যাঁদের আসে তাঁরা ভাগ্যবান; এঁদের মধ্যে আরও বেশী ভাগ্যবান সেইসব মানুষ, যাঁরা তাঁদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে সুগ্রথিত রচনার আকারে লিপিবদ্ধ করবার কৌশল জানেন এবং ওই প্রক্রিয়ার দ্বারা পাঠকচিত্ত জয় করেন। শেষোক্ত জনদের ভ্রমণের সুখ এবং পাঠকচিত্ত জয়ের সুখ দুইই অধিগত হয়—সে বড় কম কথা নয়। এঁদের বিশেষ ভাগ্যবান বলবার আরও কারণ এই যে, এঁদের সংখ্যা ভ্রমণকারীদের মধ্যে কোটিতে গোটিক বললেই হয়। ভ্রমণ তো করেন অনেকেই কিন্তু লেখেন আর কজন? যাঁরাও লেখেন তাঁদের সকলেরই রচনা কিছু জনমনোগ্রাহ্য হয় না। বেশীর ভাগ লেখাই স্থূল আহার-বিহারের বর্ণনা, নীরস তথ্যের স্তূপীকরণ আর দৈনন্দিন রোজনামচার আকার পরিগ্রহ করে এবং ওই সীমাতেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কোথায় ভাল খাবার পাওয়া যায়, কোথায় হোটেল-পান্থশালা-ধর্মশালার সুবন্দোবস্ত আছে, কোথায় কাকে ধরলে শহরভ্রমণ স্বল্পব্যয় ও সহজ হয়—এসব তুচ্ছ খুঁটিনাটির বৃত্তান্তই এক শ্রেণীর ভ্রমণকাহিনীর প্রধান উপকরণ। অন্য এক শ্রেণীর ভ্রমণকাহিনীতে পথের ক্লেশ ও আনন্দকে সম্পূর্ণ উহ্য রেখে শুধুমাত্র গন্তব্যস্থলের উপর সবটুকু মনোযোগ আরোপ করা হয় এবং তারই সতথ্য সবিস্তার বর্ণনায় পাতার পর পাতা ভরিয়ে তোলা হয়। এই দ্বিবিধ ভ্রমণকাহিনীই লক্ষ্যভ্রষ্ট, পাঠকের প্রত্যাশার নিম্নবর্তী রচনা। ভ্রমণের সুখ পাঠকের মনে ভ্রমণ-সাহিত্য পাঠের ক্লেশে পর্যবসিত হতে প্রায়শঃই দেখা যায়।

আমাদের দেশে একসময় তীর্থভ্রমণের সবিশেষ রেওয়াজ ছিল। তীর্থমাহাত্ম্য ধনীনির্ধন উচ্চনীচ সকল স্তরের মানুষকেই তীর্থপথে সমান ভাবে আকর্ষণ করত। যে তীর্থ যত দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত, প্রচণ্ড পথক্লেশের দ্বারা প্রায়-অনধিগম্য, সেই তীর্থের মাহাত্ম্য ছিল তত বেশী এবং তার পুণ্যফলও ছিল তাদনুপাতিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য তীর্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এক সতীদেহেরই নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুণ্যস্পর্শে একান্নটি পীঠ রচিত হয়েছে। ওই একান্ন পীঠের মধ্যে ভারতের পূর্বপ্রত্যন্তস্থিত কামাখ্যা পীঠ যেমন আছে তেমনই আবার সুদূর পশ্চিমে বালুচিস্থানের মরুভূমি অঞ্চলের মধ্যে মরুতীর্থ হিংলাজও আছে। এই-যে ভগবান বিষ্ণু

সুদর্শনচক্রের দ্বারা কৌশলে সতীদেহ কর্তিত করে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তার পৌরাণিক কাহিনীগত তাৎপর্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভৌগোলিক তাৎপর্যও মিশ্রিত আছে। ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলিকে না জানলে ভারতবর্ষের সত্যিকার পরিচয় জানা যায় না। ধর্ম ভারতবর্ষীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে গ্রথিত হয়ে আছে। ধর্মকে জানার সূত্রে ভারতের পরিচয় যতটা জানা যায় এমন আর কোন সূত্রে নয়। হতে পারে তীর্থধর্মের মধ্যে অন্ধ বিশ্বাস আর বোধহীন ভক্তি অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে, কিন্তু ওই প্রক্রিয়ার একটা বিরাট মহিমা আর ব্যাপ্তির দিকও আছে। অগণিতসংখ্যক মানুষ সর্ববিধ পথক্লেশ আর দেহযন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে দিনের পর দিন সারিবদ্ধভাবে চলেছে দুরারোহ পর্বতচূড়ায় অবস্থিত প্রায়-দুষ্প্রবেশ্য কোন তীর্থস্থলের অভিমুখে কিংবা অগম সমুদ্র অঞ্চলে—এর সৌন্দর্য পবিত্রতা বিস্তার মনকে অভিভূত না করে পারে না। ভারতবর্ষীয় জীবনের সঙ্গে তীর্থমাহাত্ম্যের সুতরাং ধর্মীয় মাহাত্ম্যের এই নিবিড় সংযোগ নিতান্ত জড়বাদীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর মত একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আপোসহীন বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিও তাঁর 'The Discovery of India' গ্রন্থে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উৎস হল তার ধর্ম। নানাবিধ ঐতিহাসিক বিপর্যয় রাষ্ট্রিক ভাঙা-গড়া আর রাজবংশের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ভারতের সংস্কৃতি আজও যে তার সঞ্জীবতা ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে এসেছে তার মূলে রয়েছে ভারতের ধর্মীয় ঐক্যচেতনা। তীর্থ এই ঐক্যচেতনার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। ভারত-আবিষ্কার মানেই হল তার ধর্মকে আবিষ্কার। অন্যদিকে আলডুস হাক্সলীর মত এককালীন অবিশ্বাসী অধুনাবিশ্বাসী বিশিষ্ট পাশ্চাত্ত্য মনীষী কাশীর গঙ্গায় কোন এক পুণ্য যোগ উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্নানপর্ব লক্ষ্য করে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে গিয়ে ভারতের ধর্মীয় চেতনার প্রতি নতি জানিয়েছেন তাঁর Jesting Pilate' নামক ভ্রমণগ্রন্থে। ভারতবর্ষের তীর্থ-পর্যটন অর্থ হল ভারতের আত্মার মুখোমুখি হওয়া।

বাংলার ভ্রমণ-সাহিত্যে তীর্থভ্রমণকাহিনী বিশেষ একটি জায়গা জুড়ে আছে। এটি অহেতুক বা অস্বাভাবিক নয়। বরং এর দ্বারা বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের প্রাণবন্ততা বোঝাচ্ছে, ধর্মীয় আর সাংস্কৃতিক সজীবতা বোঝাচ্ছে। ভারত-আত্মার বাণীরূপ বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যে কিয়ৎ পরিমাণে হলেও সার্থক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। আজকাল অবশ্য তীর্থভ্রমণের অভিজ্ঞতার মধ্যেই বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের পুঁজি সীমাবদ্ধ বা নিঃশেষিত নয়—আরও নানা মুখে ভ্রমণপ্রবণতা ছড়িয়ে পড়েছে—; তা বলে নিরবচ্ছিন্ন তীর্থভ্রমণকাহিনী আজও বড় কম লেখা হচ্ছে না। আমরা আমাদের বাল্যকালে জলধর সেন মহাশয়ের উপাদেয় ভ্রমণবৃত্তান্ত 'হিমালয়' গ্রন্থখানি পাঠ করে প্রভূত আনন্দ লাভ করেছিলুম, তারপর এক হিমালয়ের তীর্থস্থলগুলির উপরেই কত বই নাড়াচাড়া করে দেখা গেল। বস্তুতঃ বাংলা ভাষায় 'হিমালয়-সাহিত্য' নামক একটি স্বতন্ত্র শাখার সাহিত্যই সৃষ্টি হয়েছে বলতে গেলে। জলধর সেনের হিমালয়ের পরে সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'হিমালয় ভ্রমণ কাহিনী', প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ' এবং 'কৈলাস ও মানস-সরোবর', প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' ও 'দেবতাত্মা হিমালয়', উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাবতরণ', রাণী চন্দের 'পূর্ণ কুম্ভ', সিদ্ধার্থের 'দ্বিতীয় দিগন্ত', সুকুমার রায়ের 'হিমতীর্থ', জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাহ্নবী যমুনার উৎস-সন্ধানে', চিত্তরঞ্জন মাইতির 'শৈলপুরী কুমায়ুন' প্রভৃতি বই এবং এ ছাড়া বিভিন্ন লেখকের লেখা হিমালয়-অভিযানের কাহিনী তো আছেই। হিমালয়-তীর্থ-পরিক্রমার বিবরণ বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের একটি আকর্ষণীয় সম্পদ।

তা বলে অন্যান্য তীর্থের ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থের সঞ্চয়ও নিতান্ত অল্প নয় বা তাদের আকর্ষণ কিছু কম নয়। অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ', কালকূটের 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য' (দক্ষিণ-ভারত পর্ব) তীর্থভ্রমণবিষয়ক তিনটি চমৎকার গ্রন্থ। 'রম্যাণি বীক্ষ্য' গ্রন্থে অন্যান্য বিবরণও অনেক আছে, তবে দক্ষিণ ভারতের ধর্মস্থানগুলির বিবরণ সেখানে সব ছাড়িয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে। এ তিনটি বইয়েরই লিপিভঙ্গী অতি উত্তম। তা ছাড়া আছে অপূর্বরতন ভাদুড়ীর 'মন্দিরময় ভারত।' এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের

উপর সাধারণ ভ্রমণকাহিনীও বড় কম লেখা হয় নি। কোন্ বইকে বাদ দিয়ে কোন্ বইয়ের নাম করব! তালিকা যথাসাধ্য নিঃশেষকর করবার চেষ্টা করলেও কিছু-না-কিছু বইয়ের নাম বাদ পড়বার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তবু, বিশিষ্ট অথচ অজ্ঞতা ভ্রম অনবধানতাবশতঃ অনুল্লেখিত বইয়ের রচয়িতাদের প্রতি অবিচার হওয়া সত্ত্বে এ রকম একটি তালিকা বোধ হয় পাঠকসাধারণ্যে ধরে দেবার সার্থকতা আছে। তা থেকে আর কিছু বোঝাক আর না বোঝাক আমাদের ভ্রমণ-সাহিত্যের ব্যাপ্তি আর বিপুলতা বোঝা যাবে। সঞ্জীবচন্দ্রের পুরাতন বহুলপঠিত গ্রন্থ 'পালামৌ', বিমলা দাশগুপ্তের 'কাশ্মীর', দিলীপকুমার রায়ের 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকা' ও 'ভূস্বর্গ চঞ্চল', চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'দক্ষিণ ভারত', দেবেশ দাসের 'রাজোয়ারা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অভিযাত্রী', প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেশ-দেশান্তর' ও 'অরণ্যপথ', বুদ্ধদেব বসুর 'সমুদ্রতীর', সুবোধকুমার চক্রবর্তীর 'রম্যাণি বীক্ষ্য' (রাজস্থান পর্ব) ও 'মধুবাংশ' (ভ্রমণ-বিমিশ্র উপন্যাস), চিত্তরঞ্জন মাইতির 'দেবভূমি কলিঙ্গ', নির্মলকুমার বসুর 'পরিব্রাজকের ডায়েরী', বিমলচন্দ্র সিংহের 'কাশ্মীর ভ্রমণ', অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'নদীপথে', সুরেন্দ্রনাথ রায়ের 'যাত্রী সুহৃদ', শশিপদ সেনগুপ্তের 'ভারত-পরিক্রমা', নলিনীকুমার ভদ্রের 'বিচিত্র মণিপুর', নরেন্দ্রনাথ রায়ের 'মুসাফিরের ডায়ারি' প্রভৃতি বিচিত্র স্থল ও পথ-পরিক্রমার বিবরণ ভারত-ভ্রমণ-সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এ ছাড়া বিদেশী ভ্রমণ-কাহিনী যে কত আছে তার লেখাজোখা নেই। কয়েকটি সুপরিচিত গ্রন্থের নামোল্লেখ করছি—রমেশচন্দ্র দত্তের 'ইউরোপে তিন বৎসর', চন্দ্রশেখর সেনের 'ভূ-প্রদক্ষিণ', রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি', ২ খণ্ড, 'যাত্রী', 'জাপান যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি', 'জাপানে পারস্যে', 'পথে ও পথের প্রান্তে', 'পথের সঞ্চয়', ইন্দুমাধব মল্লিক ও কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চীন ভ্রমণ, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপান', গিরিশচন্দ্র বসুর ইউরোপ ভ্রমণের কাহিনী, শান্তা দেবীর পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণ কথা, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে' ও 'জাপানে', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'দ্বীপময় ভারত' 'পশ্চিম যাত্রী' ও 'ইউরোপ : ১৯৩৮', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'দেশে-বিদেশে', দেবেশ দাসের 'ইউরোপা', দিলীপকুমার রায়ের 'দেশে দেশে চলি উড়ে', দুর্গাবতী ঘোষের 'পশ্চিম যাত্রী', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'আমার দেখা রাশিয়া', লক্ষ্মীশ্বর সিংহের সুইডেন, ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'আজকের পশ্চিম', সুষমা মিত্রের 'নিশীথ সূর্যের দেশে', মনোজ বসুর 'চীন দেখে এলাম' ও 'সোভিয়েটের দেশে দেশে', দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'বিদেশ-বিভূঁই', জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের 'এলেম নতুন দেশে', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মস্কোতে নয় দিন', গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মস্কো থেকে চীন', ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'চীন থেকে ভারত', শেফালী নন্দীর 'সন্ধানীর চোখে পশ্চিম', মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাফা যাত্রা', নিখিলরঞ্জন রায়ের 'অন্ত-দেশ', মন্মথনাথ রায়ের ডেনমার্ক ভ্রমণের কাহিনী, বিমলচন্দ্র ঘোষের 'পূর্ব-ইউরোপের অগ্নিকোণে', রঞ্জনের সোভিয়েট দেশে স্বল্পকালীন অবস্থিতির ভ্রমণবৃত্তান্ত, অজিতকুমার তারণের 'ইন্দোচীনের কথা' ক্ষিতীশচন্দ্র বসুর চীন-ভ্রমণ, কুমারেশ ঘোষের 'ইংরেজের দেশে', এছাড়া ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভ্রমণের অভিজ্ঞতার বৃত্তান্তসমূহ তো আছেই।

এই তালিকা থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আমাদের সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ভ্রমণের বিবরণ সম্বলিত রচনার পরিমাণ বিপুল। পশ্চিমের প্রতি আমাদের আপাত-ঔদাসীন্য থাকলেও ভিতরে ভিতরে যে আগ্রহ কত প্রবল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ইউরোপ সম্বন্ধীয় গ্রন্থসংখ্যার বিপুলত্বে। এখানে শুধু রবীন্দ্রোত্তর যুগের হিসাবটাই মোটামুটি দাখিল করা হল, প্রাক্-রবীন্দ্র যুগেও এই খাতে বই কম লেখা হয় নি। সুপরিচিত লেখকদের মধ্যে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, কৃষ্ণানন্দ স্বামী, ধর্মানন্দ মহাভারতী, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের নাম পাচ্ছি। তবে এঁদের কারও কারও লেখা ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ হওয়ায় বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের তালিকায় সেগুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অসুবিধা আছে, যদিও ওই অসুবিধা আজ দূর হয়ে যাচ্ছে অনুবাদের সাহায্যে। ভারতের অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় এত অধিকসংখ্যক বিদেশ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ আছে কিনা সন্দেহ।

বাংলা ভ্রমণ-সাহিত্যের কলেবর আরও বিপুল আরও সৌন্দর্যসমন্বিত হতে পারত যদি উপযুক্ত সংখ্যায় লেখক পাওয়া যেত। মুশকিল হয়েছে এই যে, যাঁরা ভ্রমণে বহির্গত হন তাঁদের বেশীরভাগ ভ্রমণের পথেই ভ্রমণ করেন, ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যসম্মত ভাবে প্রকাশ করবার কৌশল তাঁদের আয়ত্তের মধ্যে নেই বা এই নিয়ে তাঁরা মাথাও ঘামান না। দেশ দেখে বেড়ানো যাঁদের নেশা এবং সেই নেশা মেটাবার মত অঢেল পয়সা যাঁদের হাতে আছে তাঁরাই সাধারণতঃ ভ্রমণের আনন্দে গা ঢেলে দেন। এই শ্রেণীর লোকেরাই ভ্রমণে বেরিয়ে সেরা হোটেল খোঁজেন সেরা খাবারের সন্ধান করেন এবং গাইডের হস্তে তাঁদের কৌতূহলস্পৃহাকে নিশ্চিন্ত মনে সমর্পণ করে একদিন কি দেড়দিনে একটা গোটা জায়গা দেখার গর্বসুখ অনুভব করেন। তাঁরা চলেন গাইড-বইয়ের নির্দেশে, দেখেন গাইডের চোখে; তাঁদের চলা বা দেখায় তাঁদের নিজেদের ভূমিকা সামান্য বা নামমাত্র জেনে তাঁরা আরও বেশী নির্ভাবনা হন। আরামের পান থেকে চুন খসলে এঁদের স্বস্তি বিপর্যস্ত হয়, গৃহের সুখ এঁরা ভ্রমণেও পদে পদে আশা করতে থাকেন এবং যেহেতু এঁরা অনেক কাঁচা পয়সা নিয়ে ভ্রমণে বের হন সে-কারণ এঁদের সেই প্রত্যাশাকে প্রশ্নের দ্বারা বিদ্ধ করবার কথা কারও মনে হয় না। ভ্রমণপথেও সর্বপ্রকার আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য এঁরা ভগবদ্দত্ত অধিকারবলেই যেন দাবি করেন।

আজকাল রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের দৌলতে সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনে ভ্রমণের সুযোগ ও সুবিধা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী সহজায়ত্ত হয়েছে। ভারতের অভ্যন্তর ভাগে যেখানে যেখানে দ্রষ্টব্য স্থান আছে, রেলওয়েপ্রদত্ত সুবিধা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেখানে সেখানে যাত্রীদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসছে। সাধারণ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এতে ভ্রমণের অভ্যাস যে বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রেলওয়ে বোর্ড সাধারণভাবে যাত্রীদের এবং বিশেষভাবে তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের ভ্রমণের সুবিধা করে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন নি, তাদের ভ্রমণকে সুসহ উপভোগ্য আর জ্ঞানময় করে তোলবার জন্যে সুসম্পাদিত কতকগুলি পুস্তক প্রচারেরও সুবন্দোবস্ত করেছেন। ওই-সব প্রচারগ্রন্থ থেকে ভ্রমণের সুন্দর নির্দেশ লাভ করা যায়; কোন-কোন ভ্রমণকাহিনীতে পরিবেশিত তথ্যের মূল উৎসই হল ওই সব গ্রন্থ। এসব সংকলন এতটাই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যাই হোক, রেলওয়ের কল্যাণে, অধুনা প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ক্ষমতাসাপেক্ষে এরোপ্লেনেরও কল্যাণে, ভারতবাসীর জীবনে ভ্রমণের অভাবিত সুযোগ এসে গিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বলাই বাহুল্য, উপরে যে যাত্রীশ্রেণীর উল্লেখ করা হল তাঁদের মধ্যে ভ্রমণ-সাহিত্যের লেখকের দেখা পাওয়ার আশা করলে ভুল করা হবে। এঁরা সৌখীন ভ্রমণকারী কিংবা অপ্রত্যাশিত রূপে ভ্রমণের সুযোগ করতলগত হয়েছে বলে ভ্রমণপ্রয়াসী—ভ্রমণের দেখা ও অনুভবকে লেখায় ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা এঁদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। বোধ হয় কোন দেশেই এই-জাতীয় ভ্রমণ-অভিলাষী আর ভ্রমণ-বিলাসীদের মধ্য থেকে লেখক ফুঁড়ে বেরন না। লেখকের চোখ নিয়ে যাঁরা ভ্রমণ করেন তাঁদের জাতই আলাদা। তাঁরা ভ্রমণ করতে গিয়ে আরাম খোঁজেন না বিরাম খোঁজেন না, সৌখীন উচ্চচিত্ত পরিবারের ফাঁপা মানুষের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আত্মীয়তার আধিক্যেতা করেন না, নিমন্ত্রণ নেন না কাউকে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করেনও না—স্বীয় দৃশ্য-বস্তুর উপর চক্ষু সততনিবদ্ধ আর স্বভাবজিজ্ঞাসা ও কৌতূহলকে সদাজাগ্রত রেখে সর্ববিধ জ্ঞাতব্য আহরণ করবার দিকে মনোযোগী হন এবং তারপর রস আর তথ্যের সমাহারে পাঠকসাধারণকে আশ্চর্য এক ভ্রমণকাহিনী উপহার দেবার জন্য মনে মনে তৈরী হতে থাকেন। আজকাল উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণের যুগ অপগত হয়ে গিয়েছে। শোনা যায় গোল্ডস্মিথ একটিমাত্র বাঁশী সম্বল করে সারা কন্টিনেন্ট ঘুরে এসেছিলেন। রবার্ট লুই স্টিভেন্সন পিঠে একটি বোঁচকা বেঁধে অভিপ্রায়হীন ভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোয় আনন্দ পেতেন। এখন আর সেদিন নেই। এখন একটা বিশেষ লক্ষ্য মনে রেখে ভ্রমণে বহির্গত হতে হয়। নইলে অবান্তর অভিপ্রায়ের হস্তাবলেপে আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। 'আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ'। পথ-চাওয়া আর পথ-চলার আনন্দই যাঁদের

একমাত্র অভিলষিত বস্তু, আনন্দকে তাঁরা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেই সচরাচর তৃপ্ত, অপরের মনে সঞ্চারিত করবার ক্লেশ স্বীকারে খুব কম জনাই রাজী হয়ে থাকেন।

এই কারণে দেখতে পাওয়া যায়, ইউরোপ এবং আমেরিকার পত্রিকা-সম্পাদক আর পুস্তক-প্রকাশকেরা ভ্রমণকাহিনী লেখবার জন্য লেখকদের আগাম নিযুক্ত করে থাকেন এবং সেইজন্য দাদন দিয়ে থাকেন। অধুনাতন পাশ্চাত্ত্যের অধিকাংশ সুপরিচিত ভ্রমণকাহিনী এই প্রক্রিয়ায় লেখা। আমাদের দেশে এখনও এই রেওয়াজের চল হয় নি, তবে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের হাবভাব ধরনধারণ দেখে মনে হচ্ছে রেওয়াজটির চল হতে আর বেশী বিলম্ব নেই। ইতোমধ্যে কোন কোন প্রকাশক-সম্পাদক দুর্গম বা দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষদের জীবন অবলম্বনে উপন্যাস লেখবার জন্য লেখকদের তত্তৎ অঞ্চলে ভ্রমণের সুবিধার্থে অর্থ বায়না দিতে শুরু করেছেন। এই অভ্যাস উপন্যাসের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন মনে করবার হেতু নেই, শীঘ্রই সেটি বিশুদ্ধ ভ্রমণ-সাহিত্যের এলাকাতেও অনুপ্রবিষ্ট হবে। সম্ভাবনাটি বাস্তবায়িত হলে লেখকদেরই সুদিন আসবে তা নয়, ভ্রমণ-সাহিত্যেরও সুদিন সূচিত হবে বলে আশা করা যায়।

কিন্তু ভ্রমণ-সাহিত্যের পোষকতা করার মানে এ নয় যে লঘুচপল সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূলে সমর্থন জ্ঞাপন করতে হবে। তেমন চিন্তা আমাদের মন থেকে সদাদূরবর্তী হয়ে থাক্। আমি আলোচনার গোড়ার দিকে আহার-বিহারের বিবরণসর্বস্ব কিংবা ডায়েরী ধরনের ভ্রমণ-কাহিনীর কথা বলেছি। এক শ্রেণীর পাঠক এই-জাতীয় ভ্রমণবৃত্তান্তই সমধিক পছন্দ করে থাকেন। এঁদের একটি বিশেষ শ্রেণীরূপও আছে। এঁরা সচ্ছল বিত্তের আবহাওয়ায় মানুষ, এবং যে পরিমাণে সচ্ছলতার অধিকারী সেই পরিমাণে তরল মানসিকতার অনুশীলনকারী। এঁরা সিনেমা দেখেন, খবরের কাগজ খুঁটে খুঁটে ফুটবল খেলার বৃত্তান্ত পড়েন এবং আজকাল দৈনিক পত্রের রিপোর্টারদের কল্যাণে ওই যে কী বলে গল্পচ্ছলে রাহাজানি আর নারী-অপহরণ আর দৌরাত্ম্যের সংবাদ বিতরণের এক কিম্ভূত নতুন রেওয়াজ হয়েছে সে-সব 'বেড়ে গপ্পো' গোগ্রাসে গেলেন, এবং অবসর সময়ে ডিটেকটিভ কাহিনী কিংবা হালকা ভ্রমণ-সাহিত্য পড়েন। আধুনিক সাহিত্য বলতে এ-সব প্রকরণকেই আজকাল বোঝানো হয়ে থাকে এবং এ-সবেরই ব্যাপক চর্চা আজ চুটিয়ে বাংলা দেশে হচ্ছে। তরল ভ্রমণের বইকে তরল পানীয়ের মতই আজ অবসরবিনোদনের একটি মোক্ষম উপায় জ্ঞান করা হয় এবং শ্রীকৃষ্ণবিরহতাপিতা রাধিকা যেমন মনে মনে মথুরায় ভ্রমণ করে দয়িতের সান্নিধ্যসুখ অনুভব করবার চেষ্টা করতেন, এখনকার অধিকাংশ ভ্রমণবিলাসী পাঠক-পাঠিকার ধাত হয়েছে অনেকটা সেই রকমের। এঁরা নিজেরা উদ্ভিজ্জ প্রকৃতির মানুষ হয়েও ভিতরে ভিতরে ভ্রমণসুখের সুড়সুড়ি অনুভব করেন মনে-মনে লেখকের সঙ্গে হালকা ছাঁদে অপরিচিত জায়গায় বেড়িয়ে আর হালকা ভঙ্গিতে অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে কথা কয়ে। কোন্ স্টেশনে চায়ের বদলে ভাল কোকো পাওয়া যায়, কোথায় ফার্স্ট-ক্লাস ওয়েটিং-রুমের চমৎকার ব্যবস্থা, কোথায় সস্তায় টাঙ্গা ভাড়া পাওয়া যায়, কোথায় পাঁচ সিকা সের দরে উত্তম মুরগীর মাংস লভ্য, কোথায় গাইডেরা সহযোগী কোথায় নয়—এ সব বৃত্তান্তের উপর চোখ বুলিয়ে এঁরা এক ধরনের শ্রেণীস্বার্থচেতনা অনুভব করেন, যা সুবিধাভোগী সমাজের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ। মনে মনে ভ্রমণসুখ অনুভবে পরোক্ষ এবং সূক্ষ্মভাবে এঁদের শ্রেণীচেতনাও কতকটা তৃপ্ত হয়।

কিন্তু ভ্রমণ তো শুধুই ভ্রমণ নয়, তা তো মননও বটে। পথে চলতে চলতে আমরা শুধু দেখিই না, অনুভবও করি। যা বাইরে দেখি তা আবার ভিতরে ভিতরে মননের দ্বারা আলোড়িত করে অন্তরস্থ করি। এই বাইরের দেখা আর ভিতরের অনুভব একত্র যুক্ত হলে তবেই সার্থক ভ্রমণ-সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে—একটির বিহনে অন্যটির আতিশয্যে পাল্লা একদিকে ঝুঁকে পড়বেই। বহির্মুখীনতা ও আত্মমুখীনতা, পর্যবেক্ষণ ও মনন—সাহিত্যকর্মের এই দ্বিমুখী গতি শুধু যে ভ্রমণ-সাহিত্যের বেলায়ই অনুসৃতব্য তা-ই নয়, সকল প্রকার সাহিত্যসৃষ্টিরই এটি একটি অপরিহার্য প্রাথমিক শর্ত। অথচ এই মূল শর্তটি প্রায়শঃ লঙ্ঘিত হতে দেখা যায়। ভ্রমণ-সাহিত্যের বেলায় তো আরও। যে লেখক ভ্রমণ-পর্যবেক্ষণের সুফল অনুভূতির রসে রসান্বিত করে উপযুক্ত ভাষার আধারে পরিবেশন

করেন তাঁর সাহিত্যের আর মার নেই। আক্ষেপ এই যে এ রকম লেখকের দেখা খুব বেশী মেলে না।

লঘুমনস্ক ভ্রমণ-সাহিত্যের মত অতিমাত্রায় ঘরোয়া ভঙ্গিতে রচিত ভ্রমণ-সাহিত্যের বিপত্তি সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। আজকাল একশ্রেণীর বিদেশ ভ্রমণের কাহিনীতে আদুরে ভঙ্গি সবিশেষ বলবৎ হয়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। এই ভঙ্গি সর্বথা পরিত্যাজ্য। ভ্রমণোদ্দেশ্যে যে দেশে যাওয়া হল সে দেশ ভাল করে দেখা হল না জানা হল না, তার আর্থিক সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিস্থিতির কিছুমাত্র বিবরণ পাঠকের হিতার্থে বিজ্ঞাপিত হল না, অথচ একপ্রকার আত্মাদরের স্ফীত অভিমানে পাঠকের কাঁধে হাত দিয়ে নিতান্ত ঘরোয়া ছাঁদে কথা বলবার একটা অশ্রদ্ধেয় প্রবণতা দেখা দিয়েছে কারও কারও লেখায়। এ-জাতীয় স্বয়ংপ্রবৃত্ত আত্মীয়তার চর্চা সম্পূর্ণভাবে অনাহূত অতএব অবাঞ্ছিত। শিশুর আহ্লাদে ভঙ্গিতে আধ-আধ আর মিঠে-মিঠে বুলিতে পাঠককে আত্মীয় সম্বোধন করে তার সঙ্গে নানা অবান্তর কথার ফষ্টিনষ্টি চালিয়ে তারপর আসল পাঠ্যবস্তুর ঘর শূন্য রাখা ভ্রমণ-সাহিত্যের ফাঁকি আর মেকীকেই শুধু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

আমি কী বলতে চাইছি তা হয়তো সকলের নিকট সমান স্পষ্ট হয় নি। যাঁদের মনে ধাঁধা আছে তাঁদের অস্পষ্টতার নিরসনার্থে হালের প্রকাশিত নামকরা কয়েকজন সাহিত্যিকের লেখা ভ্রমণকাহিনীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এঁরা সাহিত্যিক, সুতরাং যে দেশে বেড়াতে গিয়েছেন সে দেশের রাষ্ট্রিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয় দেওয়ার দায় তাঁদের নয়—সে ধন্যবাদবিবর্জিত কাজ করার লোক সমাজবিজ্ঞানী অর্থনীতিবিদ্‌ ঐতিহাসিক শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে ঢের খুঁজে পাওয়া যাবে। এঁরা যেহেতু দেববিনিন্দিত সাহিত্যিক শ্রেণীর অন্তর্গত এক একজন ভাগ্যবান লেখক, সে-কারণ পাঠকদের সঙ্গে এটা-সেটা অবান্তর বিষয় নিয়ে অসার গল্প জমাতে পারলেই তাঁদের কাজ হয়ে গেল। সাহিত্যিক হলে যেন তাঁর সাত খুন মাপ—তাঁকে কিছু জানতে হবে না বুঝতে হবে না অনুধাবন করতে হবে না। ভ্রমণ-সাহিত্য লিখতে গিয়ে ভিনদেশের ভাসা-ভাসা আর আড্ডাধর্মী আমুদে পরিচয় লিপিবদ্ধ করলেই সাহিত্যিকের স্বধর্ম রক্ষিত হয়ে গেল! সাহিত্যকর্ম আর সাহিত্যিকের করণীয় সম্বন্ধে এরকম উদ্ভট ধারণা আর কোন দেশে প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহ।

কুশণ্ডিকা

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কেউ যেন তুমি ছিল, কেউ যেন আমি ছিল। একটি নিঃশ্বাস
পৃথক ব্যঞ্জনা পেয়ে, পৃথকধ্বনিতে ফুটে, এক অনুপ্রাস
এক অর্থবহ শব্দ হয়ে গেলে, পৃথকেরা এখন কোথায় ?
এক অর্থে তারা বাজে, এক অভিজ্ঞানে জাগে, অনুভাবনায়
নিরর্থক ধ্বনি নেই। অক্ষরের ব্যাকরণ এই অভিধানে
এখন কোথায় পাবে? কুশণ্ডিকা গোত্রে বেঁধে একমানে আনে।

প্রতি অঙ্গ প্রতি অঙ্গে গলে গিয়ে যে সমুদ্র অকূল অতল
সেখানে তরঙ্গ নেই, শান্ত এক সরোবর। তীরেই চঞ্চল
ঢেউদের ওঠা-নামা। সেখানে সমুদ্র-স্নানে সতর্ক হৃদয়
সমুদ্র হয় না। পায়ে নোঙরের মাটি ভাঙা মাঠে বুড়ি ছোঁয়।
এস, এই তীর থেকে ছুটি নিয়ে এক স্রোতে সমুদ্রে হারাই—
কপালকুণ্ডলা আর নবকুমারের ঢেউ মিলাই মিশাই।

দুই সুর

জগদীশ মোদক

গতরাত্রের মনের সেই অদ্ভুত অবস্থাটার পর নীহারকণা ভেবেছিল, দুলালের সঙ্গে তার সম্পর্কের সুরটা বুঝি পালটে গেছে। অথচ কি আশ্চর্য, সকালে দুলালকে দেখে সে-সব কথা চিন্তাও করতে পারল না। শুধু তাই নয়, কিশোর দুলালের কচি লাবণ্যে ভরা মুখখানি দেখে সে এই ভেবে অবাক হল, একটা সরল মনের কিশোর সম্পর্কে গতরাত্রে সে ওই সব বিশ্রী চিন্তাগুলোকে মনের মধ্যে ঠাঁই দিয়েছিল কী করে! গতরাত্রে নীহারকণা সত্যিই ভেবেছিল—শুধু ভাবে নি—ভাবনাগুলো যেন মনের মধ্যে কেমন একটা নেশাও ছড়িয়ে দিয়েছিল। একটা অদ্ভুত ভাল লাগার নেশা।

ব্যাপারটা নীহারকণার জীবনে বড় অদ্ভুত।

গতরাত্রে বাইরের বারান্দায় রেলিঙে বুক চেপে নীহার চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দায় বাতি নেই। ঘরের আলোটাও সে নিবিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে কেমন একটা থমথমে অন্ধকার। মাঝে মাঝে এই রকম অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে তার খুব ভাল লাগে। অন্ধকারে মনটাকে কেন্দ্রীভূত করে মনের ভাবনাগুলোকে সে যেন সুদূরপ্রসারী করতে পারে, গভীরে নিয়ে যেতে পারে। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকারে কাটিয়ে দেয়।

কাল রাতেও এমনই দাঁড়িয়ে ছিল। কী যেন ভাবছিল। সেই সময় কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে দুলাল এসে কাছে দাঁড়িয়েছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

দুলাল যখন কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তখন সেই অন্ধকারে দুলালের দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারাটার কাছে নিজের আকৃতিটা যেন খুব ছোট বলে মনে হচ্ছিল।

হ্যাঁ, নীহার অন্ধকারে দুলালের দেহটার দিকে তাকিয়ে শুধু এই কথাটাই বার বার ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে এক সময় তার মনে হল, দুলালটা শুধু মাথায় বড় নয়—সে বড়। সত্যিই বড়। একটি পরিণত বয়সের যুবক। আর তার পাশে নিজের ছোটখাটো দেহটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল সে, শুধু মাথায় দুলালের চেয়ে ছোট নয়—সে যেন সত্যিই ছোট। দুলালের চেয়ে অনেক ছোট। অনেক অসহায়।

দুলালের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটার পাশে দাঁড়িয়ে অন্ধকার রাত্রে তার মনটাও যেন কেমন এক কিশোরী বয়সের ভারু অথচ মধুর এক ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। নীহারকণা নিজের বত্রিশ বছর বয়সটাকে ভুলে গিয়ে ভুলে গিয়েছিল দুলালের ষোল বছর বয়সটাকে।

শুধু মনে হচ্ছিল, দুলাল একটি পুরুষ আর সে একটি নারী। আদিমকালের একটি পুরুষ ও একটি নারী। আর মনে হচ্ছিল, আদিমকালের মতই এই মুহূর্তে পুরুষটির কাছে নারীটা নির্যাতিত হতে পারে।

এই ভেবে নীহারকণা কেমন যেন একটু ভয়ও পেয়েছিল। অথচ এই ভয়ের কথাটাকে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতেও তার অদ্ভুত ভাল লাগছিল।

কিন্তু এই ভাল লাগাটুকু রাত্রের অন্ধকারের সঙ্গেই কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। পরের দিন মনের মধ্যে তার লেশমাত্রও খুঁজে পেল না। নীহারকণা আশ্বস্ত হল।

অথচ আজ ভোররাত্রে ঘুম থেকে উঠে তার কী অস্বস্তিই না লাগছিল। ভাবছিল, দুলালের সঙ্গে এই ছ মাসে যে একটা সুন্দর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কের সুরটা বুঝি গতরাত্রের মনের বিপর্যয়ে পালটে গেছে। কিন্তু পরে নীহারকণা বুঝতে পারে, না, তা এতটুকু পালটায় নি। ঠিকই আছে।

সকালে যখন দুলাল চা দিতে আসে তখন নীহারকণা ঠিক তেমনই স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে দুলালের দিকে তাকায়। কিশোর বয়সের সরল লাবণ্যে ভরা মুখখানি দেখে এই ভেবে অবাক হয়, এই কচি মুখের ছেলেটি সম্পর্কে ওই রকম একটা বিশ্রী চিন্তা গতরাত্রে মনের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছিল কী করে!

দুলাল টিপয়টা নীহারকণার সামনে টেনে এনে তার উপর চায়ের কাপটা রাখে। কী একটা বলবার জন্যে সে যেন ইতস্ততঃ করে।

নীহার হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা নেয়। চায়ের কাপটা নিয়ে নিত্যদিনের মত আজও দুলালকে একটু বকাঝকা করার ইচ্ছে জাগে। এ যেন তার মনের একটা খেলা। আর এ খেলায় একটা অদ্ভুত আনন্দও পায়। কিন্তু কী সূত্র ধরে আজকের খেলাটা শুরু করবে?

বেশীক্ষণ ভাবতে হয় না নীহারকে। চায়ে প্রথম চুমুক দিয়েই বিস্বাদে মুখটা বিকৃত করে। দুলালের দিকে তাকিয়ে একটু ঝাঁজালো গলায় বলে, মূর্তিমান, এই কি তোর চা হয়েছে!

কেন?—দুলাল না-ভয় না-লজ্জা মেশানো গলায় বলে।

আবার বলছিস কেন! আমার পয়সাটা খুব সস্তা দেখেছিস, না!—নীহারের চোখে কৌতুকের হাসি অথচ কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য।

কেন, কী হয়েছে বলবেন তো! সকালবেলায় উঠেই অমনই বকাবকি শুরু করে দিলেন।—দুলালের গলায় ভয়ের লেশমাত্র নেই, বরঞ্চ একটু বিরক্তির আভাস।

তার এই ভাবটা দেখে নীহার মুখ টিপে হাসে, অথচ কণ্ঠস্বরকে যতটা সম্ভব গম্ভীর করে বলে, কি রে, আমি তোর মনিব, না, তুই আমার মনিব? খুব যে কথা শোনাচ্ছিস!

বা রে, কী আবার বললুম। আপনি শুধু শুধু—

চুপ কর্।—নীহার এবার রীতিমত ধমকের সুরে বলে ওঠে।

দুলাল খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, যে কথাটা পাড়বে বলে সে মনে করেছিল, তা বুঝি এখন আর বলা হল না। থাক্, পরেই বলবে। এই ভেবে দুলাল আবার রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়।

এই শোন্।—নীহার আবার তাকে ডাকে।

দুলাল ফিরে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, কেন?

নীহার একখানা খবরের কাগজের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তারপর যেন একটা আলস্যে আড়মোড়া ভাঙে। কোন কথা খুঁজে পায় না।

দুলাল জবাবের আশায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আবার যেতে উদ্যত হয়।

কি রে, তোকে ডাকলুম আর চলে যাচ্ছিস যে বড়।

ধেত্তেরি! সকালবেলায় কাজের সময় শুধু—

দুলাল বিরক্তি প্রকাশ করে ফিরে দাঁড়ায়। কিন্তু নীহারের সঙ্গে চোখোচোখি হতে তার সেই চোখের বিরক্তিটা হাসিতে রূপান্তরিত হয়।

দুলালের মুখ-চোখের এই আকস্মিক রঙ পালটানো দেখে নীহারও গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারে না। হেসে ফেলে।

দুলাল কিছু হাসি কিছু বিরক্তি মেশানো গলায় বলে, বলুন না কি বলবেন? এখনও আমার কত কাজ বাকী। আপনার আর কি, কাজের মধ্যে তো শুধু হাসপাতালে যাওয়া, আর বাড়িতে শুধু গল্পের বই নিয়ে পড়ে থাকা।

তা নবাব পুত্তুর, আমি কি তোর কাজগুলো করব? তবে তোকে রেখেছি কি জন্যে? বসে বসে আমার ওপর খবরদারি আর আমাকে আদেশ করার জন্যে?

হ্যাঁ, তাই তো।—দুলাল হাসতে হাসতে বলে।

টেনে এক থাপ্পড় মারব। বড় তোর মুখ হয়েছে।—নীহার এবার রীতিমত ক্রোধের ভান করে উঠে দাঁড়ায়।

আর উঠে দাঁড়াতেই দুলাল পালাবার চেষ্টা করে। তার ভয় পাওয়া দেখে নীহার হেসে ফেলে। ডেকে বলে, এই দুষ্টু, বাজারের টাকা নিয়ে যা।

ভরসা পেয়ে দুলাল দরজার কাছে ফিরে দাঁড়ায়। নীহার টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা টাকা বার করে তার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

টাকা কুড়িয়ে নিয়ে দুলাল বলে, আর একটা টাকা দিন, আমার দরকার আছে।

কি দরকার?—দুলালের দিকে তাকিয়ে নীহার জিগ্যেস করে।

দুলাল একটু ইতস্ততঃ করে। ভাবে, কথাটা এখন বলবে কিনা। অবশেষে বলেই ফেলে, সিনেমা দেখব।

আবার সিনেমা! এই তো সেদিন সিনেমা দেখার পয়সা দিলুম।

দুলাল কোন কথা বলে না। কিন্তু না গিয়েও যে থাকা যায় না। প্রত্যেকের কাছে শুনেছে, ছবিটা নাকি খুবই ভাল।

দুলালকে চুপ করে থাকতে দেখে নীহার বলে, না, অত ঘন ঘন সিনেমা দেখা তোর চলবে না। পয়সাগুলোকে কি খোলামকুচি পেয়েছিস!

আমার টাকা থেকে দিন না। আপনার কাছে কে টাকা চাইছে।—দুলাল এতক্ষণে কথা বলে।

নীহার ধমক দিয়ে বলে, টাকা যারই হোক, তবু এভাবে পয়সা খরচ করতে আমি দেব না। যা, বাজার যা তাড়াতাড়ি।

কী একটা কথা বলতে বলতে দুলাল চলে যায়।

নীহার তার এই রাগের ভান দেখে মুখ টিপে হাসে। মনে মনে ভাবে, না, ছেলেটা একেবারেই ছেলেমানুষ।

ছেলেমানুষি শুধু তার স্বভাবে নয়, মুখটাতেও মাখানো। সারা মুখখানিতে যেন একটা শিশুসুলভ সারল্য আর অসহায়তা।

বোধ হয় এই মুখটা দেখেই নীহারের প্রথম থেকে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। অথচ প্রথম দিন একে দেখে সে কী ভয়টাই না পেয়েছিল।

ছ মাস আগের সেই ঝড়বৃষ্টির রাতটার কথা আজও ভোলে নি নীহার। সেদিন রাতের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিল নীহার। ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপিতে তার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে যায়। খোলা জানলাগুলো বন্ধ করার জন্যে সে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে আসে। জানলাগুলো বন্ধ করে যখন রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ করতে আসে তখনই বাইরের অন্ধকার বারান্দায় সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠ ছায়াশরীরটা দেখতে পায়। আর দেখেই শিউরে ওঠে।

ভয়ে নীহারের সারা দেহ যেন নিস্পন্দ হয়ে যায়। কোন কথা বলতে পারে না। জানলাটাও বন্ধ করতে পারে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ পরে মনে একটু সাহস সঞ্চয় করে। তবু কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, কে—কে ওখানে ?

দীর্ঘ ছায়ামূর্তিটা একটু নড়ে ওঠে। তারপর কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা গলায় জবাব দেয়, আমি। এই বৃষ্টির জন্যে দাঁড়িয়েছি।

কথাটা শুনে নীহার এবার যেন একটু ভরসা পায়। জানলাগুলো বন্ধ করে সে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

শোয় বটে, তবে সহজে ঘুমোতে পারে না। আশঙ্কাটা পুরোপুরি দূর হয় না। শুয়ে শুয়ে ভাবে, লোকটার মনে কোন বদ মতলব নেই তো! দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত লম্বাচওড়া দেহটা দেখে তো কেমন সন্দেহ হচ্ছে !

নীহার আবার বিছানা ছেড়ে ওঠে। পা টিপে টিপে সেই জানলাটার কাছে আসে। প্রথমে কান পাতে। তারপর কপাটের একটা ছিদ্রের উপর চোখ রাখে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমকে সেই দীর্ঘ ছায়াদেহটা দেখতে পায়। দেখে, ঝড়ের তীব্রতায় বৃষ্টির ছাট এসে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। বারান্দার এক কোণে কুঁকড়ে-সুঁকড়ে দাঁড়িয়েও বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

ব্যাপারটা দেখে নীহার আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। ততক্ষণে তার মন থেকে ভয়টা দূর হয়ে গেছে।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে নীহার প্রথমে রাস্তার দিকের বারান্দার সেই জানলাটা খোলে। খুলে আশ্চর্য হয়ে যায়। দেখে, গতরাত্রের সেই ছায়াশরীর বারান্দার এক কোণে শুয়ে আছে। একটা ময়লা শতচ্ছিন্ন ভিজে কাপড়ে তার আপাদমস্তক ঢাকা। বোধ হয় কাল সারারাত ঠায় ভিজেছে। নীহার আরও লক্ষ্য করে, কাপড়ের ভেতর দেহটা যেন থরথর করে কাঁপছে।

নীহার এবার দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ সেই মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর একটু ইতস্তত: করে ডাকে, এই, কে শুয়ে আছ ?

লোকটা নড়েচড়ে উঠে বসে। আর উঠে বসামাত্রই নীহার অবাক হয়ে অপলকে তাকিয়ে থাকে। রাতের অন্ধকারে যে দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটা দেখে সে ভয় পেয়েছিল, দিনের আলোয় তাকে দেখে, সে নেহাৎই একটা কিশোর—কচিমুখ কিশোর।

কিন্তু অদ্ভুত বলিষ্ঠ আর দীর্ঘ চেহারা ছেলেটার। নীহার এত অল্প বয়সের ছেলের এমন চেহারা বড় একটা দেখে নি। তার দিকে তাকিয়ে নীহার ভাবে, ছেলেটার কি সত্যিই বয়স কম, না, মুখটাই অমন কচি কচি দেখতে !

মুখ-চোখের অবস্থা দেখে মনে হয়, ছেলেটা অসুস্থ। তবু নীহার জিজ্ঞেস করে, তোমার জ্বর হয়েছে নাকি ?

হ্যাঁ, দুদিন থেকে জ্বর, কাল রাত্তিরে বৃষ্টিতে ভিজে এখন আবার বেড়েছে।

ছেলেটার কাতর কণ্ঠস্বর যেন নীহারের মন স্পর্শ করে। জিজ্ঞেস করে, তোমার বাড়ি কোথায় ? জ্বর শরীর তো এমন বৃষ্টিতে ভিজলে কেন ?

বাড়ি ঘর নেই।—ছেলেটা ক্ষীণকণ্ঠে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়।

নীহার ছেলেটার বেশবাসের উপর একবার দৃষ্টি বুলোয়। তারপর আবার নিজের কাজে চলে আসে।

সেদিন হাসপাতালে যাওয়ার সময় নীহার দেখে, ছেলেটা তেমনই বারান্দায় পড়ে আছে। বিকেলে ফিরেও তাকে দেখতে পায়। সেই একই জায়গায় ছেলেটা গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে। দেখে কেমন যেন মায়া হয়।

সেদিনও বিকেলে ঝড়বৃষ্টি শুরু হতে নীহার তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে বাইরে আসে। এসে দেখে, বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগায় ছেলেটা উঠে বসেছে। গুটিসুটি মেরে এককোণে বসে অসহায় চোখে বুঝি আকাশ-বাতাসের নির্মমতা দেখছে। ছেলেটার সেই অসহায় করুণ মুখখানির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীহারের মনটা যেন করুণায় ভরে ওঠে।

খোকা, তুমি ভেতরে উঠে এস।—একসময় নীহার বলে।

অনেক কষ্টে ছেলেটা উঠে দাঁড়ায়। তারপর দেওয়াল ধরে আস্তে আস্তে ভেতরে ঢোকে।

নীহার কোথায় জায়গা দেবে তাই খানিকক্ষণ ভাবে। তারপর রান্নাঘরের পাশে ছোট কুঠরিটা দেখিয়ে দেয়।

নীহার সেদিন ভেবেছিল, ঝড়বৃষ্টি থামলেই ছেলেটাকে আবার বার করে দেবে। কিন্তু তা আর হয় নি। হয় নি তার প্রথম কারণ, সেদিন ঝড়বৃষ্টি অনেক রাত্রে থেমেছিল। দ্বিতীয় কারণ, সে রাত্রে ছেলেটার জ্বর আর যন্ত্রণা যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। জ্বরের ঘোরে সারারাত সে যেন হাঁসফাঁস করছিল। মধ্যরাতে নীহার যেন শোবার ঘর থেকে তার কান্নাও শুনতে পেয়েছিল। শুনে দরজা খুলে বাইরে আসে। ছোট কুঠরির বন্ধ

দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কান পেতে থাকে। তারপর ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে দেখে, ছেলেটা উপুড় হয়ে শুয়ে হাতে মুখ গুঁজে সত্যিই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার উচ্ছ্বাসে তার দেহটা কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এই দৃশ্য দেখে নীহার প্রথমটায় বিস্মিত হয়। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করে, কি হল তোমার?

ছেলেটা কোন উত্তর দেয় না। একইভাবে কাঁদতে থাকে।

নীহার সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার নিজের ঘরে আসে। বিছানায় শুয়ে আবার সাতপাঁচ ভাবে।

ছেলেটার যে জ্বর আর যন্ত্রণা বেড়েছে তাতে তার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ভাবে, এই অবস্থায় ছেলেটার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সে তো যন্ত্রণাটা একটু লাঘব করতে পারে। এমন বিচলিত হওয়ার তো কোন কারণ নেই। হাসপাতালে যাদের সেবাযত্ন করতে হয় তারাও তো সবাই তার অপরিচিত। তবে নীহার এর বেলাতেই বা এমন বিচলিত বোধ করছে কেন!

বিচলিত বোধ করে, অথচ একটা সহানুভূতিও জাগে।

এই সহানুভূতি পরের দিন সকালে আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয়। ঘুম থেকে উঠে ছেলেটিকে দেখে তার মন একটা অদ্ভুত মমতায় ভরে ওঠে। দেখে, সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করে এখন ছেলেটা শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। একেবারে নির্জীবের মত পড়ে আছে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ঘুমের ঘোরে বিশীর্ণ ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়ে আছে। মাথার রুক্ষ চুলগুলো কপালের উপর এসে পড়েছে। পাণ্ডুর ছায়ায় মুখটা বড় শুকনো দেখাচ্ছে। অনেকদিন অভুক্ত অস্নাত অবস্থায় দিন কেটেছে। দেখে কেমন যেন মায়া জাগে।

তারপর মুহূর্তের মধ্যে কী যে হয়ে যায় তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। মনের উপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে যায়।

নীহার ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসে। ছেলেটার শিয়রে হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর কপালের উপর এসে-পড়া রুক্ষ চুলগুলো সযত্নে তুলে দিতে দিতে গভীর স্নেহে ছেলেটাকে ডাকে।

তারপর কিছুদিন কেটে যায়। অসুস্থ অবস্থায় ছেলেটিকে ছেড়ে দিতে পারে নি নীহার। অসুখের কদিন সে ছেলেটার জন্মে পথ্য তৈরি করে দিয়েছে। হাসপাতাল থেকে ওষুধ এনে দিয়েছে। আর এক আশ্চর্য মমতায় ছেলেটির শিয়রে বসে সেবাযত্ন করেছে।

এই কদিনে জিজ্ঞাসাবাদ করে নীহার ছেলেটির সম্পর্কে অনেক কিছু জানতেও পেরেছে।

ছেলেটির নাম দুলাল। নৈহাটিতে বাড়ি। তার বাবা চটকলে কাজ করে। মা নেই। বারো বছর বয়সে দুলাল মাকে হারিয়েছে। দুলালই মায়ের একমাত্র সন্তান। তা মা যতদিন বেঁচেছিল ততদিন বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালবাসা সে পুরোমাত্রাতেই পেয়েছে। সেই স্নেহ-ভালবাসা মা মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দুলালের জীবন থেকে চলে গেছে। মা মারা যাওয়ার তিন মাস পরেই বাবা যখন ঘরে আর একজনকে এনে তুলল তখন থেকেই দুলালের জীবনে বিপর্যয় শুরু হয়েছে। সৎমায়ের সংসারে সে কিছুতেই মানিয়ে চলতে পারছিল না। এই তিনটে বছর সে সংসারে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সয়ে পড়ে থেকেছে। শেষে কি একটা ব্যাপার নিয়ে সৎমায়ের সঙ্গে একদিন দারুণ ঝগড়া হয়। তাতে বাবা সৎমায়ের পক্ষ নিয়ে তাকে খুব মার-ধোর করে। সেই রাতেই দুলাল বাড়ি ছাড়ে। তারপরে দুটো মাস ছন্নছাড়ার মত এখানে ওখানে ঘুরেছে, কোথাও যদি একটা চাকরি জোটে। কিন্তু কোথাও চাকরি জোটাতে পারে নি। আসার সময় বাড়ি থেকে কয়েকটা টাকা এনেছিল, সে সম্বলটুকু শেষ হয়ে গেছে। শেষের কটা দিন অভুক্ত অবস্থায় কেটেছে।

দুলালের জীবনের সব কথা শুনে তার উপর কেমন যেন এক মায়া জন্মে যায় নীহারের। তাই জ্বর ছেড়ে যাওয়ার পর দুলাল যেদিন চলে যাবে সেদিন সে-ই কথাটা পাড়ে। একটা চাকরি যোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুলালকে তার বাড়িতে রেখে দেয়।

সেই থেকে দুলাল এখানে আছে।

নীহার তার এক দাদাকে চিঠিতে সব কথা জানিয়ে দুলালের জন্মে একটা চাকরি করে দেওয়ার অনুরোধ করেছিল। দাদা কথাও দিয়েছেন করে দেবেন বলে।

কিন্তু তারপর প্রায় ছটি মাস হয়ে গেল। দাদার কোন উত্তর নেই। অবশ্য নীহারেরও এখন আর তেমন চেষ্টা নেই—যেমন প্রথম দিকে ছিল।

এই ছ মাসে দিনে দিনে দুলালের সঙ্গে তার যে একটা সুন্দর স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা ছিন্ন হওয়ার কথা সে যেন ভাবতেই পারে না।

অথচ কে এই দুলাল! ছ মাস আগে তার সঙ্গে তো কোন সম্পর্কই ছিল না। আজ এত টান কিসের।

নীহার এক এক সময় মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মন বোঝে না। তার বত্রিশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনে দুলাল যেন একটা নতুন স্বাদ এনে দিয়েছে।

হয়তো দুলালের স্বভাবটার জন্মেই এই স্বাদটুকু পেয়েছে নীহার। দুলাল যদি শান্ত নিরীহ আর অনুগত চাকরের মত তার সঙ্গে ব্যবহার করত তা হলে হয়তো এমন হত না।

কিন্তু দুলাল তা নয়। সে রাগ করে, আবদার করে,

অভিমানে কাঁদে, আবার নীহারের জন্তে তার সমবেদনাও আছে পুরোমাত্রায়। ঠিক যেন ঘরের ছেলেটির মত।

হ্যাঁ, নীহারের এক এক সময় তাই মনে হয়। ঘরের ছেলেটির মতই মনে হয় দুলালকে।

সন্তান কি তা নীহার জানে না। অথচ দুলালকে দেখে তার মনে হয়, সে যদি সময়মত বিয়ে করে সংসারী হত তা হলে তার এই বত্রিশ বছরের জীবনে তো দুলালের মতই একটি সন্তান আসতে পারত। এবং সে-ও হয়তো দুলালের মত এমনই রাগ করত, আবদার করত, অভিমানে কাঁদত, সমবেদনা জানাত। আর তার সেই রাগ-আবদার-অভিমান-সমবেদনা হয়তো ঠিক এমনই ভাল লাগত নীহারের। এমনই উপভোগ্য মনে হত।

সত্যি, দুলালের সঙ্গে তার কি অদ্ভুত সম্পর্কই না গড়ে উঠেছে!

এই সুন্দর সম্পর্কটার উপর গতরাত্রে অমন কলুষ ছায়া পড়েছিল বলে নীহারের মন গ্লানিতে ভরে উঠেছিল। আজ দিনের আলোয় দুলালের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা বলতে পেরে, তার দিকে স্বাভাবিক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পেরে, আর নিজের মনের মধ্যে গত রাত্রের সেই বিশ্রী ভাবনাগুলোর লেশমাত্র খুঁজে না পেয়ে নীহারের মন থেকে সব গ্লানি দূর হয়ে যায়।

গতরাত্রের ব্যাপারটা আজ দিনের আলোয় একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

হ্যাঁ, নীহার ব্যাপারটাকে একটা দুঃস্বপ্ন বলেই উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পারে নি। পরের দিন রাত্রে আবার সেই একই ব্যাপার ঘটে।

বারান্দার অন্ধকারে রেলিঙে বুক চেপে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্প করতে করতে নীহারের মনে গতরাত্রের সেই নেশা ধরানো ভাবনাগুলো আস্তে আস্তে কেমন যেন মোহ বিস্তার করে। নীহার তখন আর নিজেকে বত্রিশ বছরের মহিলা বলে মনে করতে পারে না। আর পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটাকেও একটা ষোল বছরের কিশোর বলে ভাবতে পারে না।

অন্ধকারে একটা দীর্ঘ বলিষ্ঠ পুরুষ-দেহের সান্নিধ্য তার মনে কেমন একটা যেন শিহরণ জাগায়। তার সান্নিধ্য তার শ্বাসপ্রশ্বাস নীহার যেন দেহের প্রতিটি রোমকূপ দিয়ে উপলব্ধি করে। আবেশে মনের অনুভূতি-গুলো যেন কোন স্বপ্নলোকে বিচরণ করে। যেন পনেরো বছর আগের সেই স্বপ্ন, সেই আবেশ।

কিশোরী বয়সে যেমন কল্পনায় একটা দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে বা চওড়া বুকে মাথা গুঁজে সারা দেহ শিহরিত হত, চোখ দুটো আবেশে বুজে আসত, মনটা ছোট ভীরু পাখির মত হয়ে যেত—ঠিক আজও মনটা তেমন হয়ে যায়। তেমনই আবেশে চোখ দুটো বুজে আসে। শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে।

সমস্ত ভাবনা সমস্ত অনুভূতি নীহারের চেতনাকে ধীরে ধীরে নেশাগ্রস্ত করে তোলে। সে আর একটু সন্নিহিত হয়ে আসে। দুলালের বুকের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে দুলালের জামার বোতামগুলো নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত নাড়াচাড়া করে।

আর রাত্রির অন্ধকারে দেহটার সঙ্গে সঙ্গে নীহারের মনটাও যেন কেমন ছোট হয়ে গেছে। অনেক ছোট। যেন আদুরে একটি মেয়ে।

আবার সকালে উঠে স্বাভাবিক দিনযাপন। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গেই সেই ভাবনাগুলো কোথায় মিলিয়ে গেছে। নীহারের মনের মধ্যে তার লেশমাত্র নেই। দুলালের সঙ্গে তার যে সুন্দর সম্পর্কের সুর—দিনের আলোয় সেই সুরটাই আবার বেজে ওঠে।

বাজারের টাকা চাইতে এসে দুলাল হাসতে হাসতে বলে, আজ কিন্তু টাকা দিতে হবে। আজ আমি সিনেমায় যাবই।

আবার সেই সিনেমা দেখার কথা তুলছিস।—নীহার ধমকের সুরে বলে, তোকে না বারণ করেছি, এত ঘনঘন সিনেমা দেখতে।

বা রে, কি হবে সিনেমা দেখলে?

যাই হোক। বারণ যখন করেছি তখন যাবি না।

ন্‌-না যাব।—আবদারে গলায় দুলাল বলে।

তা হলে আমার কথা না শুনেই যাবি?

বা রে, তাই বলেছি নাকি!

বেশ তো, তবে আর আমায় জ্বালাচ্ছিস কেন। চুপচাপ থাক্‌।—নীহার এবার রীতিমত বিরক্তির ভান করে।

নীহারের বিরক্তিতে দুলাল চুপ করে। টাকাটা নিয়ে চুপচাপ বাজারে চলে যায়।

কিন্তু সারা সকাল তার মুখটা রাগে থমথমে হয়ে থাকে। নীহারের সঙ্গে কোন কথা বলে না। ভাতের থালাটা সামনে বেড়ে দিয়ে চুপচাপ চলে যায়। নীহার সব কিছু লক্ষ্য করে। লক্ষ্য করে আর মুখ টিপে হাসে। দুলালের এই ছেলেমানুষি অভিমানটুকু বড় উপভোগ্য লাগে তার কাছে।

নীহারের ডিউটিতে বেরুবার সময়ও দুলাল সামনে আসে না। আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ডিউটিতে বেরুবার আগে নীহার একবার দুলালের ছোট কুঠরিটায় ঢোকে। ঢুকে দেখে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দুলাল মেঝেতে বসে আছে। তার এই ভাবখানা দেখে নীহারের হাসি পায়। ব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে সে দুলালের মাথায় ঝাঁকানি দিয়ে ডাকে, এই, টাকা নে।

দুলাল মুখ না তুলেই এক ঝটকায় মাথা থেকে নীহারের হাতটা সরিয়ে দেয়। কোন কথা বলে না।

নীহার মুখ টিপে হাসে। হাসতে হাসতে দুলালের মাথায় আরও বার দুই ঝাঁকানি দেয়।

হাঁটুতে তেমনই মুখ গুঁজে দুলাল এবার ঝাঁঝালো গলায় বলে, চাই নে টাকা।

নীহার হাসতে হাসতে বলে, কেন, সিনেমা দেখতে যাবি না?

না।—দুলাল অভিমানী গলায় জবাব দেয়।

নীহার এবার জোর করে দুলালের মুখটা তুলে ধরে। আর তুলে ধরতেই সে অবাক হয়ে যায়। দেখে, দুলালের চোখে জল।

নীহার বড় অদ্ভুত দৃষ্টিতে দুলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার বুকের মধ্যে যেন এক স্নেহসুখের ছলছলানি বয়ে যায়। এ সুখ যেন কত শত বিনিদ্র রাতের সেই স্বপ্ন দেখার সুখ। বত্রিশ বছরের শূন্য জীবনে অনেক অতন্দ্র প্রহরে যেন এই রকমই একটা অশ্রুমুখ বুকে চেপে গভীর বেদনায় সে আপ্লুত হয়েছে।

দুলালের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীহার তার মাথার চুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে স্নেহভরা গলায় বলে, দুষ্টু ছেলে, অমনই কান্না শুরু হয়ে গেছে।

বিগলিত হৃদয়ে নীহার আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, আমি চলি। দরজাটা বন্ধ করে দে।

সেদিন বাসা থেকে হাসপাতালের পথটুকু যেতে যেতে মনটা যেন কেমন বিভোর হয়ে থাকে।

* * *

এমনই বিভোরতায় দিনগুলি কেটে যায়।

ইদানীং নীহারের মনের উচ্ছলতা যেন একটু বেড়েছে। আগে এতটা ছিল না। আর তার এই উচ্ছলতা বেড়েছে কটা দিন বিছানায় পড়ে থাকার পর থেকে।

মাঝে কদিনের জন্যে তার অসুখ করেছিল। কটি দিন দুলালের সেবায় যত্নে বিছানায় পড়ে থেকেছে।

অসুখের মাঝে বিছানায় শুয়ে একদিন গল্প করতে করতে নীহার বলে, আচ্ছা দুলাল, তুই নদীর ধারের ওদিকটায় কোনদিন গিয়েছিস?

হ্যাঁ।—শিয়রে বসে দুলাল জবাব দেয়।

দুলালের হাতের আঙুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে নীহার বলে, ওদিকটা বড় সুন্দর জায়গা না রে? আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখন ওদিকটায় প্রায় বিকেলে বেড়াতে যেতাম। এক-একদিন বেশ রাত করে বাড়ি ফিরতাম। জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর ধারে বসে থাকতাম। জায়গাটা বড় ভাল লাগত। এখনও মাঝে মাঝে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু যাওয়া আর হয়ে ওঠে না।

কেন?—দুলাল জিজ্ঞেস করে।

ওদিকটা এখন বড় ভয়ের জায়গা হয়ে গেছে, তাই যাই না।

তারপর নীহার নিজেই বলে, অসুখ থেকে উঠে একদিন কিন্তু তোকে নিয়ে ওদিকটায় যাব। আজকাল তো কোথাও বেড়াতেই বেরুই না।

অসুখ থেকে উঠে একদিন বিকেলে নীহার কিন্তু সত্যিই দুলালকে নিয়ে বেড়াতে যেতে চায়।

দুলাল বলে, এই কাহিল শরীর নিয়ে হাঁটতে পারবেন অতদূর?

খু-উ-ব পারব।—দুলালের চোখে চোখ রেখে নীহারের বিশীর্ণ মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

দুলালকে নিয়ে সেইদিনই বেড়াতে যায় নীহার।

অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে সেই বিকেলটা বড় মনোরম লাগে নীহারের কাছে।

শহর থেকে বেরিয়ে একটা চড়াই-উতরাই মাঠ পেরিয়ে শাল-তমালের জটলাটার ভিতর দিয়ে পথটা নদীর প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এই পথটুকু আসতে নীহারের কী ভালই না লাগে। তার রোগপাণ্ডুর মনে হেমন্ত-গোধূলির মতই একটা বিষণ্ণ অথচ মধুর সুর ছড়িয়ে আছে। আর মনের এই বিলম্বিত সুরের সঙ্গেই যেন তাল রেখে পা দুটি চলে—আস্তে আস্তে।

নদীর ধারে এসে নীহার সেই পরিচিত টিলাটার উপর বসে। দুলালও তার কাছে বসে।

ছোট্ট পাহাড়ী নদী। যত না জল তার থেকে বেশী বালি। গোধূলির রঙে বেলাভূমিটা বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। বালির উপর এক ঝাঁক শালিক কিচিরমিচির শুরু করেছে। শহর-ফেরতা একদল সাঁওতাল হাঁটুজল পেরিয়ে ওপারে চলে যায়। ওপার থেকে এক ঝাঁক টিয়া কলরব করতে করতে কাছের শিশুগাছটায় এসে আশ্রয় নেয়।

নির্জনে এইসব খুঁটিনাটি দৃশ্য দেখতে দেখতে নীহারের মনটা যেন কেমন অভিভূত হয়ে যায়।

টিলার উপর বসে অনেকক্ষণ কেটে যায়। আকাশের কমলা রঙটা ধূসর হয়, ধূসর থেকে রূপোলী। সারা আকাশ আর পৃথিবী এখন রূপোলী আলোর ধারায় স্নান করছে। চাঁদের আলোয় বেলাভূমিটাকে আরও শুভ্র, আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। একটা রাতপাখি নদীর চাঁদভাঙা জল বার বার ছুঁতে চাইছে।

টিলার উপর বসে এই জ্যোৎস্না রাত্রিটাকে বড় অপূর্ব মনে হয় নীহারের। কেমন যেন তন্ময় হয়ে যায়।

এক সময় দুলালের কণ্ঠস্বরে তার তন্ময়তা ভাঙে।

দুলাল বলে, অনেক রাত হল যে!

হুঁ, এবার ওঠা যাক।—নীহার কেমন যেন ঘুম-জড়ানো গলায় বলে।

দুর্বল দেহে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আবার তারা হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে তারা সেই শাল-তমালের জটলাটার কাছে চলে আসে। বিকেলে যাওয়ার সময় এক রূপ দেখে গিয়েছিল, এখন ফেরার পথে শালবনের আর এক রূপ দেখে। এখন জ্যোৎস্নায় শালবনের পথে কী অপূর্ব মায়া ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো বনের ভিতর ঢুকে বনের পথটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। আলোছায়ার আলপনা এঁকে রেখেছে।

এই ইন্দ্রজাল বিছানো পথে চলতে চলতে নীহারের গতি আরও মন্থর হয়ে আসে। জ্যোৎস্না রাত্রে এই বন থেকে বেরুতে ইচ্ছে হয় না।

কুহক ছড়ানো পথে মন্থর পায়ে চলতে চলতে নীহারের মনেও যেন একটা কুহক বিস্তার করে। রাত্রির সেই আবেশে সেই নেশায় মনটা হঠাৎ মেতে ওঠে। ঠিক এই আবেশই যেন নীহারের কিশোরী বয়সের মনে ছড়িয়ে থাকত। কিশোরী বয়সের মনটা পুরুষের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে জ্যোৎস্না রাত্রির নির্জন পথে মন্থর পায়ে বিচরণ করার স্বপ্ন দেখে ঠিক এমনই শিহরিত হত।

নীহারের মনটাও যেন আজ সেই রকম হয়ে যায়। দীর্ঘ একটি পুরুষ-দেহের পাশে চলতে চলতে তার মনেও অবিকল সেই খুশী—সেই আবেশ ছড়িয়ে পড়ে। আর মনের এই অবস্থার জন্যেই বুঝি তার পদক্ষেপ মন্থর হয়ে যায়। নিবিড় অন্তরঙ্গতায় দুলালের হাতটা জড়িয়ে ধরে। আর খুশীতে রাস্তায় পড়ে-থাকা ঝরাপাতাগুলোর উপর হালকা পায়ের সোহাগ ছিটোয়। মনের সুরের সঙ্গে ঝরাপাতার সঙ্গতটা নীহারের চেতনায় যেন আরও আবেশ সঞ্চার করে।

* * *

এই আবেশ এই অনুভূতি নীহারের বত্রিশ বছরের জীবনে বড় অদ্ভুত। বড় আকস্মিক। কিছুদিন আগে নীহার এ সুখের কথা কল্পনাও করতে পারে নি। দুলাল তার বত্রিশ বছরের জীবনে কী বিচিত্র স্বাদই না এনে দিয়েছে!

কিন্তু নীহার এক এক সময় এই ভেবে অবাক হয়, এই বৈচিত্র্যের মাঝেও তো তার মনের দুটো সত্তা অদ্ভুত-ভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে! রাত্রির সুরটা তো দিনের সুরের তাল কেটে দেয় না! আর দিনের সুরটাও রাত্রির মনকে কুণ্ঠিত করে না! দিন আর রাত্রি যেন সম্পূর্ণ আলাদা হয়েই তার কাছে আসে। দিনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তার মন থেকে বাৎসল্যের সুরটা মিলিয়ে [illegible] একটা নেশা ধরিয়ে দেয়। আজকাল রাত হলেই তার মন যেন অভিসারে মেতে ওঠে। এ তার অদ্ভুত নেশা। অদ্ভুত মনোবিলাস।

মনোবিলাস ছাড়া নীহার আর একে কি আখ্যা দেবে! শুধু মনের মধ্যে কৈশোর-যৌবনের চিন্তা-ভাবনা আবেশ-অনুভূতিগুলো ধরে রাখার নেশাতেই তো প্রতি রাত্রে তার এই অভিসার। শুধু একটি পুরুষ-দেহের সান্নিধ্য কামনা। প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে পাশাপাশি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা।

নীহার ভাবে, কেন এমন হয়!

দিনের আলোয় যাকে দেখে গভীর বাৎসল্যে মন ভরে ওঠে, কিশোর মুখটাকে গভীর স্নেহে বুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হয়, রাতের অন্ধকারে সেই কিশোরেরই বুকে মুখ গুঁজে মনটা যেন উল্লসিত হয়ে উঠতে চায়। দিনের সেই অসহায় কিশোরটিকেই তখন যেন অনেক বড় অনেক নির্ভরশীল মনে হয়।

* * *

যদিও মনের এই দুটো সত্তা অদ্ভুতভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলছিল—রাত্রির সুরটা দিনের সুরের তাল কেটে দিচ্ছিল না, আর দিনেরটাও রাত্রির মনকে কুণ্ঠিত করছিল না—তবু প্রথমটায় নীহারের মনে কেমন যেন একটা গ্লানি ছিল। এই গ্লানি এখন সে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। কারণ সে বুঝেছে, আর যাই করা যাক, জোর করে মনের রাশ টেনে রাখা যায় না।

আর টানবেই বা কেন। এক এক সময় নীহার ভাবে, এ তো তার জীবনে কোন ক্ষতি টেনে আনছে না! বরঞ্চ নীহার যেন ইদানীং বুঝতে পারছে, যদিও মনের দুটি সত্তা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেছে, তবু এই পরস্পর-বিরোধী সত্তা দুটির বুঝি একটা অদৃশ্য যোগফল আছে। আর এই যোগফলটাই যেন ইদানীং নীহারের হৃদয়টাকে এক পরিপূর্ণতার তৃপ্তিতে ভরিয়ে রেখেছে। আর বুঝি এই তৃপ্তিতেই দুলালের সঙ্গে তার সম্পর্কটা আরও নিবিড় করে গড়ে উঠেছে।

এমনই নিবিড় মাধুর্যে দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল—কেটে যেতও—কিন্তু একদিন হঠাৎ একটা চিঠি এসে নীহারের মনের সব আনন্দ সব সুর ছিন্নভিন্ন করে দিল।

দুলালের চাকরির জন্যে দাদাকে যে একদিন চিঠি দিয়েছিল সেকথা নীহার একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। আজ দীর্ঘদিন পরে দাদার চিঠি পেয়ে যেন কথাটা আবার মনে পড়ে গেল।

দাদা চিঠিতে জানিয়েছেন, তিনি ওখানকার এক ফ্যাক্টরিতে দুলালের চাকরির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। দুলালকে দু-একদিনের ভেতরেই তাঁর ওখানে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন।

চিঠিটা হাতে নিয়ে নীহার চুপ করে বসে থাকে।

মনে হয় যেন তার মনের সবকটা আলো বুঝি একসঙ্গে নিভে গেছে। কি যে করবে ভেবে স্থির করতে পারে না। দুলালকে চিঠিটার কথা জানাবে কিনা তাও ঠিক করতে পারে না।

অবশেষে একসময় তাকে চিঠিটার কথা বলে।

নীহার ভেবেছিল, এ সংবাদে সে বিচলিত হলেও দুলাল অন্ততঃ খুশী হবে। কিন্তু দুলালের মুখ-চোখ তেমন খুশীতে ভরে উঠতে দেখে না। কথাটা শুনে কাজ করতে করতে সে কেমন যেন একটু থমকে যায়। কোন কথা বলতে পারে না।

দুজনেই চুপচাপ থাকে। একটা থমথমে নীরবতা ঘরের বাতাসটাকে কেমন যেন ভারী করে রাখে। সে বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাসও ভারী হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যায়। এই নীরবতা ভেঙে নীহারই একসময় বলে, কবে যাবি তা হলে?

দুলাল কোন কথা বলে না। বলতে পারে না। নীহারই আবার বলে, কালকেই তা হলে রওনা হয়ে যা। চাকরির ব্যাপার যখন, দেরি করাটা ঠিক হবে না।

দুলাল কোন জবাব দেয় না। মাথা নীচু করে বসে মেঝের উপর জলের আঁকিবুকি কাটে।

•

পরের দিনই বিকেলের ট্রেনে দুলালের যাওয়া ঠিক হয়।

আজই এ বাসার সঙ্গে দুলালের সম্পর্ক শেষ। কাল থেকে এ বাড়ির বাতাসে আর এই অন্তরঙ্গতার সুর ভেসে বেড়াবে না। না দিনে, না রাত্রে। দিন আর রাত্রি আগের মত সেই ক্লান্ত সুরে একাকার হয়ে যাবে। তাই আজকের দিন এবং রাত্রিটাকে আরও অন্তরঙ্গভাবে পেতে চায় নীহার। কিন্তু শত চেষ্টা করেও পারে না। বিচ্ছেদ-বেদনার সুরটাই যেন আজ তার মনকে বড় বেশী পীড়িত করে তুলেছে।

দুলালের যাবার দিনে ডিউটিতে যেতে ইচ্ছে হয় না নীহারের। সকাল থেকে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম সে নিজের হাতেই করে। আজ যাবার দিনে দুলালকে কোন কাজকর্ম করতে দেয় না। দুলালকে কাছে বসিয়ে সে নিজেই রান্নাবাড়া করে। রাঁধতে রাঁধতে দুলালের সঙ্গে নানারকম কথা বলে। বিদেশে ভাল হয়ে থাকার উপদেশ দেয়। মাঝে মাঝে ছুটি পেলে এখানে আসার কথা বলে। কখনও বা বলে, এখনও তো তেমন শীত পড়ে নি, এই জামাকাপড়েই কটা দিন চলে যাবে। তারপর কদিনের ভেতরেই একটা সোয়েটার তৈরি করে পাঠিয়ে দেব।

এমনই সব কথাবার্তা বলতে বলতে নীহার সারা সকালটা রান্না করে কাটায়। আর আজকে রাঁধেও অনেক কিছু।

আজ নিজেই সে দুলালের সামনে ভাতের থালাটা বেড়ে দেয়। দুলালকে খেতে দিয়ে সে কাছে বসে। কাছে বসে সস্নেহদৃষ্টিতে দুলালের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুলালের প্রতিটি গ্রাস, খাওয়ার প্রতিটি ভঙ্গী সে যেন এক অদ্ভুত স্নেহের দৃষ্টি নিয়ে দেখে।

একসময় সস্নেহ গলায় বলে, দুষ্টু ছেলে, অত তাড়াতাড়ি খায় না, আস্তে আস্তে খা।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে দুলালকে নিয়ে নীহার বাজারে যায়। দোকান থেকে দুলালের জন্যে কিছু জামাকাপড় কিনে আনে। তারপর নীহার সারাদুপুর ধরে দুলালের বাক্স বিছানা গুছিয়ে দেয়।

বিচ্ছেদের বেদনাতেই যেন আজ তার বুকখানা আরও স্নেহসিক্ত হয়ে উঠেছে।

এই স্নেহের ধারা বিকেলের বিদায়মুহূর্তে নীহার আর বেঁধে রাখতে পারে না। অশ্রু হয়ে গড়িয়ে পড়ে।

যাওয়ার আগে দুলাল যখন পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে তখন তার চোখ দিয়ে সত্যিই জল গড়িয়ে পড়ে। জল গড়িয়ে পড়ে দুলালের চোখ দিয়েও। দুজনেই দুজনের মুখের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকে।

নীহার কি যেন বলতে গিয়েও পারে না। স্নেহ আর কান্না মিলে তার গলার স্বরটা অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে যায়।

দুলাল আস্তে আস্তে রিক্‌শায় গিয়ে ওঠে।

বারান্দার থামটায় হেলান দিয়ে নীহার একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বাড়িটা এখন যেন শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে। এই শূন্যতায় নীহারের মনটাও হা হা করে ওঠে। জীবনের এই শূন্যতা নিয়ে সে বাঁচবে কী করে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই ভাবে।

তার বত্রিশ বছরের নিঃসঙ্গ জীবনে কিছুদিনের জন্যে যে নতুন স্বাদ পেয়েছিল, সেই স্বাদ আর পাবে না। নীহারের জীবন থেকে তা নিঃশেষে মুছে গেছে।

এখন আবার সেই নিঃসঙ্গ জীবন।

আবার সেই পশ্চিমের বারান্দায় প্রতিদিন শেষ-বিকেলের ম্লান ছায়ায় বেতের চেয়ার পেতে বসবে। বিকেলের কমলা রঙ আকাশটা আস্তে আস্তে ধূসর হবে। গাছ-গাছালির গায়ে লেগে-থাকা আলোর রেণু ধীরে ধীরে মুছে যাবে। পাখিদের বিদায়ী সঙ্গীতও থেমে যাবে। সমস্ত প্রকৃতিতে যেন একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে আসবে।

এই বিষণ্ণতা নীহারের মনেও নেমে আসবে। ক্লান্ত চোখে দূর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনটা উন্মনা হয়ে যাবে। নীড়ে ফেরা বিকেলে নিজের বিকেল বয়সটা শুধু মনে পড়বে, আর একটা গভীর শূন্যতায় মনের ভেতর কান্না গুমরে উঠবে। জীবনের কোন মানে খুঁজে পাবে না সে।

তারপর একসময় ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসবে।

[পূর্বানুবৃত্তি]

শুধু খোকনকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অবধি রইল না। সারাটি দিন ওই দলের লোকদের পিছনে ঘুরবে, আর যা ভাল করে বোঝে না সেই সব পাকা পাকা কথা মুখে লেগেই আছে—ব্যালট বক্স, লেজিসলেশন, ডেমোক্র্যাসী। ওকে বকুনি দিয়ে পড়াতে বসাতে বসাতে হয়রান হয়ে গেল বনলতা। দিবারাত্র চিন্তা করে, কী করে ওর মাথায় এসব ঢোকা সে বন্ধ করে।

তাদের অঞ্চলটায় প্রচুর শিক্ষিত লোক থাকেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হিসাবে সুপ্রিয় সম্মান ও আস্থা তাঁদের পেয়েই থাকে। সুপ্রিয় জিতল।

ফলাফল বেরুবার পরের দিন বনলতা নতুন রিসার্চ অ্যাসিস্টান্টদের কাজের ডেটাগুলো পরীক্ষা করছিল, সুপ্রিয় একগাদা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল। হাসতে হাসতে বলল, পড়ে দেখ।

বনলতা দেখল, সুপ্রিয়র জীবনী বেরিয়েছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। তাঁর জীবকোষের কেন্দ্রক নিয়ে কাজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। এখনও সমানে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় জীববিদ্যা সমীক্ষার ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন গত জুন মাসে। এই কয় মাসেই প্রতিষ্ঠানটির কর্মতৎপরতা

বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান, জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপদেষ্টা। গত দশ বছরে চারবার বিশ্বপরিক্রমা করেছেন বিভিন্ন সরকারী মিশনের সদস্য হিসেবে। কলকাতার বিশিষ্ট সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবের উপর্যুপরি তিনবার সভাপতি। অনেক সামাজিক ও সংবাদসেবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত। বিশিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিলিমোরিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিজের অন্যতম ডিরেক্টর। ব্যক্তিগত জীবনে দৃঢ়চেতা উদার অমায়িক। মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়স। দেশ ও জাতি এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তির নিকট আরও অনেক কিছু আশা করে। তারুণ্যের প্রতীক।

অনন্যসাধারণ! কয়েকবছর আগের সেই এলাহাবাদের স্যুভেনিরের কথা মনে পড়ল। সেদিন আরও অনেক কম গৌরব ছিল, কিন্তু তাই দেখে বনলতার বুক ভরে উঠেছিল। আর আজ বনলতাকে চেষ্টা করে বলতে হল, কী আশ্চর্য, এই এত বড় লোকের সঙ্গে আমি ঘর করছি?

সুপ্রিয় বলল, আমি তোমার কাছে সেই ছোট মানুষটিই আছি।

বনলতার মনে হল, কথাটা একদিক থেকে কী সত্যি। কাগজে যে সব কথা লেখা আছে, সেগুলো তার মনে পড়ে না কেন কোনদিন? তার খালি মনে হয়, পরশু রাতে সারারাত সুপ্রিয় দুটো চোখের পাতা এক করে নি, তাকে

পা টিপে দিতে হয়েছে। সুপ্রিয়র ইদানীং ভাল সহ্য হচ্ছে না, কী ভাবে তার সাবষ্টিটিউট করা যায়। সুব্রহ্মনিয়ম গোড়া থেকেই পিছনে লেগেছে, তাকে সামলাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে সুপ্রিয়কে। অর্ধেক দিন মারাত্মক চটে যায় অল্পেই, যেটা কোনদিন তার স্বভাবে ছিল না। শেয়ার-মার্কেটে একটু গণ্ডগোল হলে ছোটছেলের মত কাঁদে সে! আর যখন-তখন বদ্রীদাশ শীলকে অশ্লীল গালাগাল দেয়। ইদানীং কিছু কিছু চুলে পাক ধরেছে, শত চেষ্টাতেও তা কাঁচাতে পারছে না বলে সুপ্রিয় ক্ষুব্ধ।

বনলতা অভিমানের ভঙ্গীতে বলল, না, তুমি ছোট মানুষটি নেই। তুমি আমাকে ভুলে যাচ্ছ।

সুপ্রিয় বলল, কেন? তোমাকে আজও আমি খুব ভালবাসি।

বনলতা বলল, তুমি আমার কথা শোন না। কতদিন থেকে বলছি, তোমার হাঁটুর ব্যথাটা কিছুতেই সারছে না, একদিন ডাক্তারের কাছে চল। তুমি এত কাজে ব্যস্ত যে আমার জন্যে এতটুকু সময় তুমি দিচ্ছ না।

তুমি সামান্য ব্যাপারকে বড় ভয় পাও।—সুপ্রিয় খুব হাসল: ছোটখাট ব্যাপারে বেশী মাথা ঘামালে বড় বড় কাজ হয় না।

বনলতা কাগজটায় আবার চোখ বোলাল। প্রায় আটটা আইটেম আছে, যেগুলোকে রীতিমত বিরাট বলা চলে। বনলতা কিন্তু আজকাল কেমন পেসিমিষ্টিক হয়ে যাচ্ছে। দুটো আইটেম বাদ দিয়ে যদি ইনসমনিয়াটা তাড়ান যেত, তা হলে কি জীবনটার মূল্য কমে যেত?

এর আগে সুপ্রিয়কে সে অনুরূপ কথা বলেছিল। সুপ্রিয় বলেছিল, বল কী, দেশগৌরব যতীন্দ্র মল্লিকের চরিত্রের চোদ্দটা দিক আছে। আমার তো তার চেয়ে অনেক কম। আরও বড় না হলে লোকের মনে স্থায়ী আসন পাওয়া যাবে না।

আজকে বনলতার কিছু বলা খারাপ দেখায়। তবু সে ভয়ে ভয়ে বলল, ছোটখাট ব্যাপারগুলো নেগলেক্ট করলে তো মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

আমাকে দাবাতে পারে এমন কোন ব্যাপার সংসারে তৈরি হয় নি।—সুপ্রিয় বলল।

ইদানীং সে অসাধারণ আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। বিরাট ব্যক্তিদের হতে হয়। কাগজের 'তারুণ্যের প্রতীক' কথাটার ওপর আঙুল চালিয়ে সুপ্রিয় হাসল।

তাই দেখে বনলতা চুপ করে গেল। খবরের কাগজে লেখা—তার মানে দেশের অনেক লোক তাই বিশ্বাস করে। আর এত লোক যখন বলছে সুপ্রিয়ও তাই বিশ্বাস করে। বনলতা একলাই কি ঠিক? না বোধ হয়, তারই মনটা ইদানীং বেয়াক্কেলে হয়ে উঠছে।

মাসখানেকের মধ্যে সেরে গেল আপনিই। সুপ্রিয় বলল, কী, বলেছিলুম না?

তার সন্দেহ মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে দেখে বনলতা মনের ভেতর থেকে সুখী হল। আর ইদানীং একটা নতুন আশ্চর্য মনোভাব তৈরি হচ্ছে। কাগজে প্রায়ই সুপ্রিয়র বক্তৃতা বেরোয়, রাস্তায় ঘাটে সেই সব ব্যাপার নিয়ে কত আলোচনা করে, দেখে দেখে শুনে শুনে বনলতার মনে হয়, সত্যি সুপ্রিয় চৌধুরী লোকটি কী বড়! মানুষের মধ্যে কী করে এত গুণ ধরে!

একদিন বনলতা অদ্ভুত ছেলেমানুষীর কথা বলে ফেলল সুপ্রিয়র কাছে। কাগজের সম্পাদকীয় থেকে মুখ তুলে বলল, আচ্ছা, তোমার চেয়েও বড় হওয়া যায়?

সুপ্রিয় প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল: দেখ, শিক্ষিতা কৃতী মহিলা বলে দেশে তোমারও কম নাম নেই। তোমার মুখে এ কথা শুনলে লোকে বলবে কী? আমার চেয়ে বড় লোক দেশে আছেন বইকি—হীরেন সান্যাল, অরবিন্দ ঘোষাল, মোহন সেহ্‌গল, কৃষ্ণস্বামী মুদালিয়র, শ্যামদাস গোয়েঙ্কা। আর যতীন্দ্র মল্লিকের তো কথাই নেই, অমন লোক একযুগে একজনই জন্মায়।

মাসখানেক পরে সুপ্রিয়র পায়ের চেটোয় একটা প্রবল ব্যথা হল। তারপর দুদিন সেটা অসাড় হয়ে রইল। সুপ্রিয় বাড়িতে বসেই সব কাজ করল। কিছুদিন পর সেরে গেল।

ইনষ্টিটিউশনের নতুন ব্লক তৈরি হচ্ছে। সুপ্রিয় নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কাজ করাল। আমাদের দেশের লোকগুলো এত ফাঁকিবাজ। ওদিকে ব্রিটেন আমেরিকা রাশিয়া হুহু করে এগিয়ে চলেছে।

কিছুদিন পরে কোমরে একটা ব্যথা হল, শয্যা নিতে হল সুপ্রিয়কে। কোমরটা অসাড় হয়ে রইল বারোদিন। বাড়িতে অফিস বসল, ফোনে সমস্ত কাজ হতে লাগল।

সুপ্রিয় সেরে উঠল। নতুন শ্রমিক-সমস্যা নিয়ে অ্যাসেম্ব্লিতে তর্ক করতে হবে। বিকেলে একবারটির জন্য যে বাড়ি ফিরত, সেটা বন্ধ করে দিল সুপ্রিয়। ল্যাবরেটরি থেকে সোজা ন্যাশনাল লাইব্রেরি।

একদিন ডিবেট করতে করতেই শিরদাঁড়া অসহ্য টনটন করতে লাগল সুপ্রিয়র। কোনরকমে শেষ করে বাড়িতে এসেই একেবারে শয্যাগত। ডাক্তার বললেন, নার্ভে অতিরিক্ত চাপ পড়েছে, বিশ্রাম নিতে হবে সম্পূর্ণভাবে কিছুদিন। সুপ্রিয় বলল, অসম্ভব। এই তর্ক না শেষ করলে শ্রমিকরা ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে। ডাক্তার সঙ্গে করে সুপ্রিয় বক্তৃতা দিল। পরদিন কাগজে হুলস্থুল—যে দরদী মানব নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে মেহনতী জনতার মঙ্গলের জন্যে সংগ্রাম করেছেন, তিনি সমস্ত সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র।

এবার কিন্তু সহজে ছাড়ল না। শিরদাঁড়াটায় সাড় নেই, বসাও অসম্ভব। দিবারাত্র শুয়ে থাকতে হল। আর দিন দুই পরে বাঁ হাতটা অসাড় হয়ে পড়ল।

এক দিকে ডাক্তার অন্য দিকে সুপ্রিয়। বনলতার যন্ত্রণার শেষ নেই। ডাক্তার বলে, কাজ তো দূরের কথা, কথা বলা পর্যন্ত বন্ধ করতে হবে। সুপ্রিয় আবার বাড়িতে অফিস বসাবে। বনলতা ডাক্তারের পক্ষেই। বনলতা বলল, বাড়িতে অফিস বসানোটা ভারী খারাপ। তাতে উত্তেজনাটা লেগেই থাকবে। তার চেয়ে আমাকে আর তোমার সেক্রেটারিকে রোজ সকালে মোটা মোটা কাজ-গুলো বলে দিও—আমরা যথাসাধ্য করব।

সুপ্রিয় রাজী নয়: তোমরা ঠিক গণ্ডগোল করে বসবে। সে কিছুতেই হতে পারে না।

বনলতা অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে সেক্রেটারিকে বলল, বাড়িতেই অফিস রাখুন।

বারোদিন যখন শুয়ে শুয়ে কেটে গেল, সুপ্রিয় অস্থির হয়ে উঠল। ডাক্তারকে যা-তা করে গালাগালি দিল।

ডাক্তার বনলতাকে আলাদা বললেন, দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, আমি রোগ ধরতে পারছি না। নিউরোলজির স্পেশালিস্ট ডা: বাগচীকে ডাকা হোক।

ডাক্তার বাগচী সমস্ত হিষ্ট্রি শুনলেন, তারপর বললেন, [illegible]

হ্যাঁ, এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

কার্ডিওগ্রাফ?

সেও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়।

এনসেফালোগ্রাফির দিন ডা: বাগচীর খেয়াল হল, বাড়িতে অফিস আছে। তিনি বনলতাকে ডেকে সোজা বললেন, দেখুন, এসব ওঠাতেই হবে।

কিন্তু উনি উত্তেজিত হবেন।

সে ধরনের নার্ভাস ডিসঅর্ডার নয়। সামথিং মোর ডিপরুটেড। ইউ ডোণ্ট বি ফ্র্যাঙ্কেড এণ্ড ডোণ্ট টেল হিম, ইট উইল টেক লং টাইম এণ্ড আটমোস্ট পেসেন্স।

আজ কতদিন হল? প্রায় এগারো মাস। লং টাইম। আর আটমোস্ট পেসেন্স! বনলতার মনে হয়, রোগ যেন তারই হয়েছে, দেহে মনে তাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। মনে হয়, সেও আর বাঁচবে না। লং টাইম আর আটমোস্ট পেসেন্স—ডা: বাগচী এই দুটো কথাই সত্যি বলেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন রোগ খুঁজে বের করতে পারেন নি। অনেক কষ্টে ইদানীং বলছেন—স্পাইনাল টিউমার। অথচ সব সিমটম মিলছে না। পিকিউলিয়ার। ওষুধ পালটাতে পালটাতে হন্যে হয়ে গেছেন। এখন একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে গেছে বনলতার কাছে। যেদিন ডা: বাগচী কলকাতার আরও চারজন শ্রেষ্ঠ ডাক্তারকে আনলেন আর কয়েকদিন পর থেকে তাঁরা এলেন না, তখনই বনলতার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবু তার সেবার বিরাম নেই।

সুপ্রিয় অস্থির হয়ে বিছানায় রগড়েছে। ইনস্টিটিউশনের নতুন ব্লকটার যন্ত্রপাতি এসে গিয়েছে, ইনস্টল করা হচ্ছে না।

বনলতা বলল, মি: সুব্রহ্মনিয়ম এগুলোর দিকে খুবই মনোযোগ দিচ্ছেন।

সুপ্রিয় অস্থির হয়ে বলল, ও কি জানে? সমস্ত ভুল করবে ও। আজ দশ বছর ওকে আমি দেখছি।

আচ্ছা, যা করার ও করুক না।

সুপ্রিয় এপাশ ওপাশ করে: আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ইনস্টিটিউশনটা তছনছ হয়ে যাচ্ছে। গোটা দেশটায় একটা লোক নেই, যত সব আনাড়ি অপদার্থের দল।

ক্লান্ত চোখে হাই তুলতে তুলতে বনলতা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। তলায় পার্কে বিকেলবেলায় খুব ভীড় হয়েছে। ছেলেরা ফুটবল খেলছে, মেয়েরা সেজেগুজে বেড়াচ্ছে, বুড়োরা বসে আড্ডা জমিয়েছে। এত লোক—বনলতার মনে হল, এরা একটা ইনষ্টিটিউশন চালাতে পারে না, এত আনাড়ি এত অগামারা! তারপর পেছন ফিরে বাৎসল্য-ছলছল চোখে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, না, সুব্রহ্মনিয়ম খুব পাজি লোক হতে পারে, কিন্তু ইনষ্টিটিউশনটা ভালভাবেই চালাচ্ছে।

সুপ্রিয় হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে: এই তুমি—তুমি তো যত নষ্টের গোড়া। বাড়িতে পর্যন্ত যতদিন অফিস ছিল আমি কাজের এতটুকু এদিক ওদিক হতে দিই নি। সেটি তুলে তুমি ইনষ্টিটিউশনটাকে পথে বসালে।

বনলতা তাড়াতাড়ি এসে ওর মাথায় মুখে হাত বুলোয়: তুমি অত অস্থির হচ্ছ কেন? সেরে ওঠ, তারপর যেটুকু গণ্ডগোল হচ্ছে তা তুমি দশদিনেই সামলে নেবে।

সুপ্রিয় প্ল্যান বলতে থাকে। সেরে উঠলে কী ভাবে ইনষ্টিটিউশনটা অ্যামেরিকান মডেলে নতুন করে সাজাবে। বনলতা মায়ের মত সমস্ত কিছুতে হেসে হেসে সম্মতি দিয়ে যায়।

রাত্রিটা বনলতার কাটতে চায় না। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, রাত্রে ও যদি ঘুম ভেঙে কাউকে দেখতে না পায়, হঠাৎ ভয়ানক ভয় পেয়ে যাবে আর তা মারাত্মক হয়ে উঠবে। সুপ্রিয়র রিসার্চ অ্যাসিস্টাণ্ট অসীম গোড়ার রাতটা জাগে, বনলতা শেষ রাত। ইজিচেয়ারে বসে বসে বনলতা শুনতে পায় দু-চার মিনিটের মধ্যে কাছে-পিঠে অনেকগুলো ঘড়িতে দুটো বেজে গেল। তারপর তিনটে। তারপর চারটে পাঁচটা ছটা। মা উঠে এলে সে বাথরুমে চলে যায়। কিন্তু এই চার ঘণ্টা কিছুতেই কাটতে চায় না।

সুপ্রিয় খাটের ওপর নিঃসাড়ে জড়ের মত পড়ে আছে, এদিক ওদিক এতটুকু নড়ে না। বনলতা সামনের ইজিচেয়ারটায় শুয়ে একটা দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ে। এ সময়ে নভেল বীভৎস লাগে, বিজ্ঞানে বিরক্তি লাগে। টেবিল-ল্যাম্পের আলোটা পাশ থেকে শুধু বই আর বনলতার বুকে পিঠে পড়ে। মাঝে মাঝে বইটা পাশে রেখে বনলতা দেখে, সুপ্রিয় ঠিক ঘুমোচ্ছে কি না। সুপ্রিয়র মুখে একরাশ দাড়ি জন্মেছে। অস্পষ্ট আলোয় বড় কালো দেখাচ্ছে ওকে, চোখের কাছটা বসা, মুখটা ফাঁক হয়ে গিয়েছে অল্প। বনলতা একবার চমকে ওঠে, তারপর আবার বইটা তুলে নেয়।

প্রথম প্রথম আতঙ্কে ধড়ফড় করে উঠত বনলতা, কাঠ হয়ে পড়ে আছে আর মুখ অল্প ফাঁক—এই দৃশ্যটা এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের ছায়া ফেলত মনে। কিছুতেই স্থির হতে পারত না বনলতা। রাশি রাশি অমঙ্গলের দুঃস্বপ্ন ডানা ঝাপটাতো মাথায়, ঘরের এদিক ওদিক করত, বাথরুমে বারে বারে গিয়ে মুখে চোখে জল দিত। সুপ্রিয় ছাড়া সে থাকবে কী করে! পনের বছর সুখে দুঃখে তার সঙ্গে ছায়ার মত ফিরেছে সে। বনলতা বুকের ভেতর জানে, সুপ্রিয়কে সে কী ভালবাসত! তাদের দুজনেরই প্রবল ব্যক্তিত্ব—প্রতি মুহূর্তে ঠোকাঠুকি লাগবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু মতদ্বৈধতাও কোনদিন তাদের মধ্যেকার মধুরতাকে ভাঙতে পারে নি। সে মানুষ কোনদিন তার কাছে থাকবে না, এ কথা ভাবা যায় না। বুক-ঠেলা কান্নাকে কোনরকমে সামলিয়ে নিত বনলতা—না না তাদের ভালবাসা যদি সত্যি হয়, কেউ সুপ্রিয়কে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

দুপুরবেলার দিকে মাঝে মাঝে সুপ্রিয় ভাল থাকত। তখন সেও বলত, আমি সারবই, তুমি দেখো। জীবনে মধ্যে মধ্যে কঠিনতম পরীক্ষায় পড়তে হয়, সেগুলো পেরিয়ে যেতে পারাই বীরত্ব। আমি পেরোবই।

কিন্তু রাত্রিবেলা একটা নিঃস্পন্দ দেহ দেখে বনলতা কিছুতেই সাহস পেত না। জোর করে ভাবত, আমার ভালবাসা যদি সত্যি হয়—

তারপর তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে যেত! চোখের জল ধরে রাখা যাচ্ছে না, কলের জলের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে ভাবত, না না অমঙ্গল কই, এ তো কলের জল।

রোজ রোজ—রোজ রাত্রি। আস্তে আস্তে কান্না কমে এল। তারপর ভয় কমে এল। এখন মাঝে মাঝে চমকে চমকে ওঠে। বই পড়তে মন লাগে না। তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। রাত্রির অখণ্ড নীরবতা—শুধু ঘড়ির টকটক শব্দ। হঠাৎ আশে-পাশের বাড়িতে

কারো কান্নির শব্দ কিংবা রাস্তায় কুকুরের ডাক। দূরের গ্যাসপোস্টের আলো আলমারির মাথার ওপর দেওয়ালে পড়েছে, তার মধ্যে চাঁপাগাছের একটা ডালের ছায়া। ওপাশের জানলা দিয়ে পার্কের দিকে আকাশ দেখা যায়, অন্ধকারে তারারা দপদপ করছে। বনলতা জানলায় এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়—মাথাটা বুঁদ হয়ে ধরে আছে, হাওয়া লাগুক একটু। পার্কটায় গাছগুলো জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আলোগুলো নিষ্প্রভ, আর রাস্তায় একজনও লোক নেই। সেই নির্জন রাস্তা ধরে—মন যে রাস্তা ধরে—সে রাস্তায় যারা গেছে তারা রক্তমাংসে আর ফিরে আসে না। কিন্তু চিন্তায় কি স্পষ্ট আসে! ছেলেবেলার বাচ্চা বোন, বাবা, মামাতো ভাই ইন্দ্র, তাদের বাড়ির চাকর রামেশ্বর, স্কুলের তার প্রিয় টিচার, মায়াদি, শাশুড়ি, আর রঞ্জন। সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে রঞ্জনের কথা। যখন সমস্ত মানুষ ঘুমোয়, তখন যদি এ সব কথা মনে আসে—সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে রঞ্জনের কথা। রঞ্জন বলেছিল, দেখ, ঘুমটা আমাদের সত্য জানবার পক্ষে মারাত্মক বাধা। নিশ্চেতনার তিমিরে দীর্ঘ সময় ডুবে আবার যখন আমরা জাগি, তখন আমরা একেবারে নতুন মানুষ। নতুন জন্মাবার একটা বিস্ময় থাকে, তাই পৃথিবীটাকে আবার ভাল লাগতে শুরু করে। নেচার এই বিচিত্র ম্যাজিকের মধ্যে রেখে একই জিনিস আমাদের নতুন বলে মনে করায় আর নাচায়। একবার উপর্যুপরি দশদিন দশ রাত ঘুমিয়ো না, দেখবে সমস্ত জিনিসটা কী দারুণ মেকানিক্যাল—খপ খপ করে দিন হচ্ছে আর রাত হচ্ছে, লোকগুলো কলের মত শুচ্ছে আর উঠছে। তখনই স্পষ্ট বোঝা যায়, লোক-গুলো পুতুল মাত্র। তারা যে বলে আমরা নিজেদের খুশিতে বাঁচছি, জীবনকে ভোগ করছি—সব বাজে।

জীবনকে ভোগ করছি! বনলতা সুপ্রিয়র দিকে ফিরে দাঁড়াল। ও কি জীবনকে ভোগ করছে?

সুপ্রিয়র বাঁ হাতটা একটি প্রস্তর খণ্ড। বাঁ পা, কোমর, বুক—প্রস্তর খণ্ড। ডান হাতটাও বোধ হয় শীগগির প্রস্তর খণ্ড হয়ে যাবে। কোটরগত চক্ষুতে, উঁচু চোয়ালে, কালো রঙে একটি ভগ্ন শিলাস্তূপের মত দেখাচ্ছে।

পাশের ঘরে এল। খবরের কাগজের স্তূপের মধ্যে থেকে যেদিন সুপ্রিয়র জীবনী বেরিয়েছিল সেদিনকার কাগজটা বের করল। তারপর পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করার মত রীতিমত চেঁচিয়ে পড়তে লাগল—আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। তাঁর জীবকোষের কেন্দ্রক নিয়ে কাজ আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। ভারতীয় জীববিদ্যা-সমীক্ষার ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন গত জুন মাসে। ভারত-সরকারের পরিসংখ্যান বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, জনসংখ্যা-নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবের সভাপতি। বিলিমোরিয়া ইণ্ডাস্ট্রীজের অন্যতম ডিরেক্টর।

পরদিন সকালে সুলতা ঘরে ঢুকে দেখেন বনলতা উচ্চারণ করে করে খবরের কাগজ পড়ছে। সুলতা বললেন, আজ খুব ভোরে কাগজ দিয়ে গেছে তো!

বনলতা চমকে উঠল! অন্যমনস্কভাবে বলল, সকাল হয়ে গিয়েছে! উঃ বাঁচাল।

সুলতা ওষুধের জায়গায় যেতে যেতে বললেন, কী বলছিস?

বনলতা কিছু না বলে বাথরুমে চলে গেল।

আবার রাত্রিকে ভয় করতে শুরু করল। শেষে বনলতা খবরের কাগজের পাতাটা ছিঁড়ে ব্লাউজের মধ্যে পুরে রাখল। রঞ্জনের গলা জেগে উঠবেই—বাজে বাজে। বাঁচাটা বাজে। মনের মধ্যে উঠলেই পাশের ঘরে গিয়ে মুখস্থ করতে শুরু করত।

সেদিন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এসেছিলেন। যাবার সময় একজন বলে গেলেন, উনি নিশ্চয়ই সেরে যাবেন। আমাদের এত জনের কামনা। ওঁর ভবিষ্যৎ-কর্মের জন্যে দেশ অপেক্ষা করে আছে।

বনলতা অতি কষ্টে সামলেছে, প্রায় হাত জড়িয়ে বলতে গিয়েছিল, আপনাদের কাগজে কথাগুলো ছাপিয়ে দিন না শীগগির করে।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে কাপড় ছাড়ছে বনলতা, শুনল, কমলা মাসী মাকে বলছে, তোমার মেয়ে তো আর বিশ্বাস করবে না, না হলে গৌর স্মৃতিভূষণকে ডেকে

বনলতা আর এক মুহূর্ত ভাবল না, গিয়ে বলল, আমি বিশ্বাস করি। তুমি বন্দোবস্ত কর।

খোকন আর পারুকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিল। পারুর মুখের দিকে তাকাতে পারে না বনলতা। সেই হাসিখুশি মেয়েটা কী জবুথবু মেরে গেছে! বাবার ঘরে ঢুকবেও না, শুধু দরজা থেকে উঁকি মেরে দেখবে আর ধরা পড়ে গেলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবে। কয়েকদিন ছটফট করে শেষে ওদের মামার বাড়িই পাঠিয়ে দিল বনলতা। এ দৃশ্য ওদের দেখার দরকার নেই, এখন ভাল করে বাঁচুক ওরা। তারপর বড় হয়ে নিজেরা যা বোঝে করুক।

যেদিন স্বস্ত্যয়ন শেষ হল, সেদিন রাত্রে সুপ্রিয়র ডান হাতটা সম্পূর্ণ পড়ে গেল।

কিন্তু আশ্চর্য, আর ভয় করল না, ভয় কমে এল বনলতার। জেদ চেপে গেল বনলতার—সারাবেই সে। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্সের বই পড়তে শুরু করল। শরীরের ভেতরটা আগুন গরম হয়ে গিয়েছে, কান ভোঁ ভোঁ করছে, চোখে আবছা দেখছে, কিন্তু বনলতার বাহ্যজ্ঞান নেই—সুপ্রিয়কে সারতেই হবে। সে মরুক ক্ষতি নেই, একটি প্রয়োজনীয় জীবন বাঁচুক—যে জীবনটা সবাইকার পক্ষে মূল্যবান।

বিকেলের দিকে শ্রমিকেরা দেখা করতে এল। প্রায় আধ ঘণ্টা রইল। সুপ্রিয় খুব খুশি হয়েছে। ওরা চলে যাবার পর হাসি হাসি মুখে বলল, দেখলে, ওরা কী দারুণ কামনা করে আমাকে। সেরে উঠতেই হবে।

নিশ্চয়ই: বনলতা তীব্র গলায় বলল, তুমি এত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি—সব্বাই যখন চাইছে, তোমাকে সারতেই হবে। নেচারের ওপর জিততেই হবে তোমাকে। —বলে বনলতা জানলার কাছে গেল থার্মোমিটার ঝাড়তে। আর বাইরের দিকে চেয়ে তার মুখ পাংশু হয়ে গেল। যে শ্রমিকেরা দেখা করতে এসেছিল, সেই লোকগুলোই—পার্কের কোণে বাঁদর নাচ হচ্ছে আর সেই লোকগুলো খুব হৈচৈ করে হাততালি দিচ্ছে। একটা লোক শীস দিয়ে উঠল। সব লোক হা হা হা করে হেসে উঠল।

সুপ্রিয় তখনও বলে চলেছে, আগে ইনস্টিটিউশনটা সামলে নেব। তারপরই ওই লেবারদের দিকটা।

বনলতা একবার শীতল চোখে সুপ্রিয়র দিকে চাইল। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে বুকের ভেতর থেকে খবরের কাগজটা বের করে ছিঁড়ে ফেলল।

তারপর বনলতা কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারল না। বলতে পারল না, তোমাকে সারতেই হবে।

এখন বনলতা বিষণ্ণ হাসে। ভয়ানক রাগ হয়েছিল শ্রমিকগুলোর ওপর। কিন্তু ওদের দোষ কি। ওরা সুখে বাঁচতে চায়, যার কাছে সেইজন্যে সাহায্য পায় তার কাছে এসেছিল। আধ ঘণ্টা ওই দম বন্ধ করা পরিবেশে তারা ছিল তাই যথেষ্ট। হতে পারে লোকটা সুপ্রিয় চৌধুরী, তার জন্যে বাঁদর নাচ ছাড়া যায় না।

ওরা তো ভাল। ওদের রাখা-ঢাকা নেই, সেই বাড়ির সামনেই বাঁদর নাচ দেখতে শুরু করল। যারা ঢাকতে চেষ্টা করে, তাদের যে কী মুশকিল।

মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম তাকে রোজ জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন ডাঃ চৌধুরী? আর সেই নিঃশ্বাসেই বনলতা 'সেইরকমটাই'টা শেষ করল কি না করল, সেক্রেটারিকে বলেন, দিল্লীতে ইমপোর্ট লাইসেন্সের ফর্মগুলো পাঠিয়ে দাও।

সেদিন 'সেইরকমই' না বলে বনলতা বলল, ডান হাতটাও বোধ হয় প্যারালাইজড হয়ে গেল।—দিল্লীতে ইম্পোর্ট—বলেই সুব্রহ্মনিয়ম থমকে দাঁড়ালেন। বনলতা স্পষ্ট দেখল, গোটা চোখটায় লোভ ঝকঝক করে উঠল। প্রায় মিনিট দেড়েক সময় নিলেন তিনি, সেই খুশিকে দুঃখে পরিণত করতে। সো স্যাড, সো স্যাড।

আজকাল বনলতা বুঝতে পারে। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ক্লাবের লোকেরা যখন নেমন্তন্ন করতে অর্থাৎ চাঁদা আদায় করতে এসে বাধ্য হয়ে ঘরের মধ্যে আধঘণ্টা বসে থাকে, বনলতা স্পষ্টই বলে, আপনাদের অন্য কাজ আছে। এখানে আপনাদের বেশীক্ষণ ডিটেণ্ড থাকা উচিত নয়।

লোকগুলো না না করে, কিন্তু বার দুই বললেই বলে, আচ্ছা, আজ আমরা উঠি, আবার শীগগির আসব একদিন।

বনলতা জানে, লোকগুলির কেউ কেউ বাইরে গিয়েই বলবে, সিগারেট খেতে না পেয়ে পেটটা ঢোল হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ বলবে, আচ্ছা আমরা যদি আর না যাই, তা হলে কি খুব খারাপ দেখাবে? তার উত্তরে অপর

একজন বলবে, আরে প্রত্যেক বছরই একজন করে প্রেসিডেন্ট হবে, তা বলে তাদের বাড়ি গিয়ে আমাদের মুখ গোঁজ করে বসে থাকতে হবে নাকি? অত কিসের। বলে বিকেলবেলাটা কোথায় সিনেমা যাব কি খেলা দেখতে যাব, তা নয় এক জোড়া বুড়োবুড়ির সঙ্গে হাঁ করে বসে থাক।

পরদিন সকালে সুলতা যখন বললেন, আজ সাত মাস ধরে ডক্টর বাগচী তো কিছু করতে পারলেন না, তোর কাকা বলছিল জ্যোতির্ময় সেন নতুন পাস করে এসেছেন, তাঁকে একবার দেখালে হয় না?

বনলতা শান্ত স্বরে বলল, না মা, দরকার নেই।

তারপর নিজেরই কী মনে হল, ডাঃ বাগচীকে বলল, ডাক্তারবাবু, আজ সাত মাস হয়ে গেল, কিন্তু ক্রমশ বেড়েই চলেছে।

ডাঃ বাগচী চিবুকটা কঠিন ভাবে গলায় চাপলেন, মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি খুব ভাল লোক। কিছুক্ষণ পর কোমল গলায় বললেন,ঠিক আছে মা, আমি আজকালকার নতুন ডাক্তারদের সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখি।

পরের দিন তিনি আরও চারজন ডাক্তারকে সঙ্গে আনলেন। অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা হল। তারপর বসবার ঘরে গিয়ে বহুক্ষণ আলোচনা করলেন।

বনলতা চা নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে শুনল ডাঃ ঘোষ বলছেন, যদিও সব সিম্পটম মিলছে না, তবুও আমার দৃঢ় ধারণা—ইট ইজ এ কেস অফ স্পাইনাল টিউমার।

ডাঃ বাগচী বললেন, তা হলে?

ডাঃ ঘোষ বললেন, তা হলে আর কি।—বনলতা ঘরে ঢুকে দেখে ডাঃ ঘোষ ডান হাতের চেটোটা চিৎ করে বৈরাগ্যের ভঙ্গী করে আছেন।

ডাক্তারেরা বললেন, দেখুন, আপনি শিক্ষিতা দৃঢ়চেতা মহিলা। আপনাকে বলে রাখাই ভাল ইট ইজ এ ভেরি সিরিয়াস কেস। বাট ইফ উই ট্রাই উই মে সাকসিড অ্যাটলাস্ট। সো, ইউ মাষ্ট নট গেট নার্ভাস এণ্ড ইউ মাস্ট হেলপ আস।

বনলতা আস্তে আস্তে বলল, কী করতে হবে বলুন।

নতুন কিছুই বললেন না, সেই রেগুলারিটির কথা, সেই সজাগ প্রহরার কথা। বনলতা স্পষ্টই বুঝল, এটা অকারণ পুনশ্চ, ডাঃ ঘোষের চিৎকরা হাতটাই শেষ কথা। সকালের কথা মনে হল, ঠিকই বলেছিল সে, দরকার নেই।

দরকার নেই, দরকার নেই—বনলতা স্পষ্ট বুঝতে পারে আজকাল, কিন্তু মনটা অদ্ভুতভাবে কাঁদে কেন? বনলতার ইচ্ছে করে, রাস্তার প্রত্যেকটি লোককে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের কারুর কি দরকার নেই আমাদের?

উত্তর বনলতা জানে। হ্যাঁ, তুমি এস না কেন? সুব্রহ্মনিয়ম নিজে বনলতার একটা লিফ্‌টের বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করেছেন। কেন বনলতা জানে—সেই পোস্টটার চেয়ার সুব্রহ্মনিয়মের ঘরে। সুব্রহ্মনিয়ম সভ্য মানুষ, খারাপ কোন উদ্দেশ্য নেই, তবু কাজ করতে করতে চোখের ক্লান্তি লাগে তো। কিন্তু বনলতারও মাথার ভেতরের বেশ কিছু চুল পাকা, আর বছর দশেক পরে তার লিফট বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং 'তুমি এস'তে বনলতার খুশী হবার কিছু নেই।

কিন্তু তাদের কারুর কি দরকার নেই? রোজ বিকেলের পাতায় তার উত্তর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। প্রথম প্রথম গোটা বিকেল ধরে লোক আসত, মাস দুয়েকের মধ্যে তারা অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল, মাস ছয়েকের মধ্যে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল শুধু সেই কটিতে যারা তাদের সঙ্গে বিশেষভাবে কর্মসূত্রে জড়িত। আর এখন দু-একজন ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় ছাড়া কেউ আসে না।

বিকেলটা রোগী নিয়ে একলা একলা তবু কাটে
কিন্তু রাত্রিগুলো ভীতির। রাত্রে বনলতার রোগী ছা
আর একজনকে সামলাতে হয়—সে নিজের মন। সেই
আবিষ্কার করে, তারা দুজনে আবর্জনাকুণ্ডে ভেঙেচুরে প
আছে আর দূরে প্রবল জয়োদ্ধত আনন্দে এক বির
মিছিল চলেছে। বনলতা যেন একবার চেঁচিয়ে ডাক
একজন লোক পেছন ফিরল—বনলতা দেখে টোয়েন্টি
সেঞ্চুরির সেক্রেটারি। সে প্রচণ্ড অট্টহাসিতে ফেটে পড়
হাসতে হাসতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। এক
গাড়ি—বনলতা বুঝতে পারল না, একবার মনে হল
একবার মনে হল সাঁজোয়া গাড়ি। সুপ্রিম সেটাতে উঠ
গেল কিন্তু তার চাকার তলায় রগড়াতে লাগল। বনল

তাড়াতাড়ি টেনে বের করল সুপ্রিয়কে, কিন্তু কেউ তাদের দেখতে পেল না। হৈ হৈ করে নিশান ওড়াতে ওড়াতে সবাই এগিয়ে গেল।

তন্দ্রা ভেঙে বনলতা এদিক ওদিক চায়। নিস্তব্ধ রজনী, ঘড়িটা টিকটিক করে বেজেই চলেছে, আর সামনের খাটে সুপ্রিয় পাথর হয়ে যাওয়া কাঠের মত পড়ে আছে।

তখন রঞ্জনের কথা মনে পড়ল।

রঞ্জন বলেছিল, যতদিন না তোমাদের দিয়ে তার সেই পুরনো বাক্সে স্কীমের কাজগুলো করিয়ে নেয় ততদিন সে তোমাদের তার ঐশ্বর্যের ম্যাজিকে ভুলিয়ে রাখবে। তারপর সে কঠিন রূঢ় পরুষ হস্তে তোমাদের ফেলে দেবে তার পশ্চাতের আবর্জনাকুণ্ডে।

বনলতার আর অহঙ্কার নেই। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স পড়তে গিয়ে চেষ্টা করেও যেদিন মনঃসংযোগ আসে নি সেদিনই তার অহঙ্কার ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আজ যদি রঞ্জন থাকত তাকে সবিনয়ে বনলতা জিজ্ঞেস করত, এখনও কি আমাদের কিছু করবার নেই যাতে জীবনের কাছে আমাদের আত্মসম্মান বজায় থাকে?

সারারাত বনলতা ভাবতে থাকে, কী করে জীবনের কাছে, কী করে রঞ্জনের কাছে আত্মসম্মান বজায় থাকে।

দিনের বেলা ঠিক এতখানি কষ্ট হয় না, বাইরে থাকলে বরং অন্যরকম। ল্যাবরেটরিতে যখন কম্পিউটার মেসিনের হাতল ঘোরাতে ঘোরাতে অ্যাসিস্টাণ্টদের ডিরেকশন দেয়, তখন এয়ার-কণ্ডিশনিং মেসিনের আওয়াজে টাইপ-রাইটারের খটাখট আর লোকের ব্যস্তসমস্ত চলাফেরার পটভূমিকায় মনে হয়, কী আশ্চর্য, এই তো বেশ বেঁচে আছি। বাড়িতে পৌঁছেও সেই মনের রেশ থাকে। মনে মনে ভাবে, অন্ততঃ রঞ্জন সত্যি নয়, জীবন তাদের ইচ্ছে করে ছুঁড়ে ফেলে নি। সেই ভয় সে অনেকদিন আগে করেছিল। তাই সুপ্রিয় যখন তাদের ব্যালান্স সুখী জীবন থেকে ক্রমশঃই অতিরিক্ত পরিশ্রম করে খ্যাতির রাস্তায় ঝুঁকে পড়েছিল, সে যথাসাধ্য বাধা দিয়েছে। যখন ও রাজনীতিতে নামল, তখন তো সোজাসুজি সে তার বিরুদ্ধতা করেছে। তার ভয় ছিল, মানুষ লোভে যখন সমতা ছাড়িয়ে যায়, তখনই প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়। তাই সে সাবধান থেকেছে তা থেকে। অবশ্য সুপ্রিয় তা থাকে নি, নার্ভের ওপর অতিরিক্ত পীড়ন করেছে, কিন্তু তার জন্যে তাকে তো আজকের যন্ত্রণায় পড়তে হয় নি, তার হার্ট আজও যথেষ্ট সবল। তার যে রোগ সেটা কোন প্রতিক্রিয়ায় আসে নি। জীবন কোন প্রতিশোধ নেয় নি। এটা একটা অর্গ্যানিক ডিজেনারেশন। শক্তির রূপ-পরিবর্তন মাত্র।

রাত্রে মনের ভেতরকার রঞ্জন বলল, বেশ, তাই যদি হয়, তা হলে দুঃখ করো না। পরের প্রজন্মের হাতে তুলে দিয়ে শান্তভাবে চলে যাও।

বনলতা বলল, তা হলে কি আমি খুশী হতে পারব? আমি ভুল করি নি বেঁচে থেকে?

রঞ্জন বলল, রিলে রেসের কাঠি এক জায়গায় নিলে আর এক জায়গায় পৌঁছে দিলে। সেই রিলে রেসের আদিও তুমি জান না—অন্তও তুমি জান না, কেন যে রেস তাও জানলে না। তার উদ্দেশ্য বা কি, বিধেয় বা কি, তাও জানলে না। এতে তুমি খুশী হবে না বনলতা। তবে তোমার আত্মসম্মান বাঁচবে। তুমি জীবনকে বলবে, তোমার পাল্লায় পড়েছিলুম, তোমার কাজ করে দিলুম।

বনলতা বলল, সেটা মন্দ নয়।

কয়েকদিন থেকে এক নতুন জ্বালা জুটেছে—সে খোকন। সেদিন বাপের বাড়ি গিয়ে ওদের পড়াশুনো কতদূর এগোচ্ছে দেখছিল বনলতা। অশোক পড়া হচ্ছিল। বনলতা বলে যাচ্ছিল—ধর্মাশোক কত যে হাসপাতাল গড়লেন, কত শিলাস্তূপ, চৈত্য, রাস্তাঘাট। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে এক গৌরবময় যুগ।

হঠাৎ খোকন প্রশ্ন করে বসল, অশোক যখন এইসব করছিলেন তখন আমি কি করছিলুম মা?

বনলতা বলল, তুমি তখন ছিলে না।

খোকন বুঝল না। গভীর চিন্তান্বিত মুখে আবার বলল, আমি তখন কি করছিলুম মা?

সোজা করে গাছের জন্মমৃত্যুর উপমা দিয়ে বনলতা বোঝাতে চেষ্টা করল খোকন কী করে এসেছে। কিন্তু খোকনের এক কথা: সে না হয় বুঝলুম, কিন্তু জন্মাবার আগে আমি কি করছিলুম?

শেষে বনলতা বলেছে, তুমি বড় হয়ে বুঝবে।

কিন্তু একটা নতুন যন্ত্রণা জেগেছে বনলতার নিজের। এত বছর তো সে বেঁচেছে, কিন্তু সে নিজে কি বুঝেছে? এতদিন ছেলেমেয়েদের নিজের রক্তমাংস বলে মনে হত। কিন্তু সেদিন খোকন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সে আলাদা, তার জন্মাবার আগে বনলতা ছিল সেটা জেনেই সে খুশি নয়, সে নিজে কী করছিল সেটা সে জানতে চায়। ছেলেমেয়ের জন্মের অনেকদিন পরে মায়ের মনে হয়েছিল, কি বিরাট ভুল, নিজের প্রাণেরই যথার্থ পরিচয় সে যখন পায় নি, তখন অপর দুটো প্রাণ আনবার সাহস কী করে হল তার?

সেই অপরাধ-সচেতন মনটি আজ রঞ্জনের কথা শুনে যেন একটা সম্মান বাঁচানো উত্তর পেল।

সেটা মন্দ নয়।

পরদিন সকালবেলা অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল বনলতা। সুলতা শুনলেন ঝরঝর জলের শব্দের সঙ্গে বনলতার গলার গানের দু-একটা কলি ভেসে আসছে। সুলতার মনে হল, কতদিন পর—বাড়িটা যেন কারাগার হয়েছিল—কতদিন পর বাড়িতে হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এল।

স্নান করে রান্নাঘরে এসে বনলতা জিজ্ঞেস করল, ওষুধ খাওয়ানো হয়ে গেছে?

সুলতা বললেন, হ্যাঁ। হ্যাঁরে, আজ অত গম্ভীরমুখে ওষুধ খেয়ে নিল কেন? একটা কথা কইল না।

বনলতা বলল, কাল বিকেলে আমি খুব বকেছি। আমি বললুম, তোমারই তো দোষ। গোড়ায় গোড়ায় যা তা করে নেগলেক্ট করবে, ওষুধ খাবে না, তাইতেই তো বেড়ে গেল। আমি হলে শান্তভাবে ওষুধ খেতুম, ডাক্তার যেভাবে থাকতে বলতেন সেইভাবে থাকতুম।

সুলতা বললেন, তা তুই সত্যিকারের করতিস বাপু। সেই ছেলেবেলায় তোর টাইফয়েড হয়েছিল, ওইটুকু মেয়ে ডাক্তার যা বলেছিল, তাই করেছিলি। এতটুকু গোঁয়াতুর্মি নেই, বায়নাক্কা নেই। রোগশোক আর মরণকে তুই চিরকালই ভয় করিস আর এমন কপাল—তোর ওপরই সব এসে পড়ে।

বনলতা এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর বলল, রোগ আর শোককে—মানে অপরের মরণকে—আমি চিরকালই ভয় করি। কিন্তু মরণকে নয়। কোনদিন যদি দেখি ডাক্তার রেগুলার ওষুধ ছেড়ে এটা-ওটা করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকে আর একবিন্দু ওষুধ স্পর্শ করতুম না। শান্তচিত্তে অপেক্ষা করতুম।

বনলতা জানে এটা তার মুখের কথা নয়, এটা সে করতই, এই তার স্বভাব। কিন্তু যাক গে সে সব কথা, সেদিন আসতে দেরি আছে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বনলতা বলল, যাক গে, কাল তো তুমি বাড়ি গিয়েছিলে?

সুলতা বললেন, হ্যাঁ।

খোকন আর পারু কেমন আছে?

ভাল আছে।

খোকনের পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

ওর মামা তো প্রশংসায় পাগল। বলে, হবে না! মা বাপ দুই পণ্ডিত।

পারু মার কথা বলে?

তোমার মেয়ে তুমি ফিরিয়ে নিয়ে এস। মামীকে মা বলতে শুরু করেছে।

বনলতা হেসে বলল, আজ বিকেলে দেখতে যাব। খোকনের পরীক্ষাটা শেষ হোক, তারপর ওদের বাড়ি আনব। এখানের দম-বন্ধ-করা আবহাওয়ায় বড় কষ্ট হয় ওর।

সুপ্রিয়র ঘরে ঢুকে দেখে ও শূন্যভাবে এদিক ওদিক চাইছে। বনলতা ওর মাথার কাছে বসল, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, কিছু বলবে?

সুপ্রিয় অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর জড়িয়ে বলল, পারু কোথা?

মামার বাড়ি গেছে। আজ বিকেলে আনব 'খন।

সুপ্রিয় কি বলতে গেল, কিন্তু কথাটা কেমন জড়িয়ে গেল। বনলতা ঝুঁকে পড়ে বলল, তোমার কি ক[illegible] বলতে কষ্ট হচ্ছে?

সুপ্রিয় বলল, না না: তারপর থেমে থেমে বলল, ও[illegible] কে দেখবে?—তার সমস্ত মুখ বিকৃত হয়ে গেল, [illegible] জলে ভরে গেল, অস্পষ্টজড়িত গলায় গোঙাতে লাগল: ভগবান রক্ষা কর।

রোগীর সঙ্গে থেকে থেকে বনলতাও কি রোগী

গেছে? মাসের পর মাস জোর করে ধৈর্য রেখে রেখে তার মনে কোথাও ফাটল ধরেছে কি? দুঃখের অনুভূতি কি সমস্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে? একটি ক্লান্ত রুগ্ন ব্যথিত মানুষের কাতর মুখের থেকে একটি মেয়ে-মন তার মুখ তুলে নিল, জানলার দিকে চেয়ে মনে মনে একটা রিলে রেসের ছবি দেখতে লাগল। একটা ডিস্‌কোয়ালিফায়েড লোক আবার দৌড়তে চাইছে।

ঝাঁকানি দিয়ে বনলতা মুখ নামাল। সুপ্রিয়র চোখ আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়ে বলল, ছি, তুমি ওরকম দুর্বল হয়ে পড়েছ কেন? ডাক্তার বলছিলেন, তোমার মেরুদণ্ডের ওপর দিকটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে তলাটাও সেরে আসবে। তুমি সেরে উঠবে। আর আমি তো রয়েইছি।—বনলতার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

আমি তো রয়েইছি! গাড়ি চালাতে চালাতে বনলতার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। বারে বারে চোখ মুছছে আর মনে মনে বলছে, হ্যাঁ, আমি রয়েইছি, হ্যাঁ, আমি নিশ্চয়ই রয়েছি।

আর, আর একটা মন যার নাম রঞ্জন—সে বলছে, ওগো তুমি একবার বল আমি চিন্তা ছেড়ে দিয়েছি, জীবনের বোঝা জীবন বোক। তা হলে সত্যি করে আমি থাকব। যত বছর বাঁচতে হয় বাঁচব। ওদের বড় করে তোলার জন্যে যা করার দরকার সমস্ত আমি করব। ওগো, আজ এগারো মাস ধরে আমি যা করেছি, মানুষের মা-বউ মিলেও এতখানি করে না। তুমি সারবার জন্যে আমাকে যদি কেউ বলে আমাকে মরতে হবে, আমি এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে সত্যি করেই পরমতম সুখের সঙ্গে মরব। কিন্তু তুমি শুধু বল, আমি সারি কি না সারি, তার জন্যে আমি ব্যস্ত নই, তুমি শুধু বল আমি সুখী ও শান্ত।

ল্যাবরেটরিতে এসেই নোটিশটা পেল। মিঃ সুব্রহ্মনিয়ম স্থায়ীভাবেই ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন। আজ বেলা দুটোয় তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে অডিটোরিয়ামে। এখনও ঘণ্টা দুই দেরি আছে। বনলতা নিজের টেবিলে গিয়ে বসল। কাজ করছে আর খালি মনে হচ্ছে ঘরে কী একটা নেই। অনেকক্ষণ ধরে এদিক-ওদিক দেখল, অনেকক্ষণ ধরে ভাবল, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছে না কী নেই। তারপর ভাবল, তার মনটা আজ ভাল নেই বলে হয়তো এরকম মনে হচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হল, জানলাটার মাথায় সুপ্রিয়র যে ছবিটা ছিল, নতুন যন্ত্রটা তৈরি করবার অবস্থায় সেটা নেই। কয়েক মুহূর্ত থতমত খেয়ে বসে রইল বনলতা, তারপর হঠাৎ একটা আতঙ্ক শীতের মত গোটা মনটায় কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি সে উঠে পড়ল, একতলা দোতলা তেতলা চারতলা পাঁচতলা—সমস্ত ইনস্টিটিউশনটা হন্‌হন্‌ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এই ইনস্টিটিউশনের প্রায় গোড়া থেকে সুপ্রিয় এখানে আছে। এখানকার অধিকাংশ যন্ত্র তৈরির সময় সে নিজের হাতে খেটেছে, আর প্রত্যেকটি যন্ত্র তৈরি হওয়া অবস্থার ছবিতে সুপ্রিয়র ছবি আছে। এই ইনস্টিটিউশনের সর্বত্র সুপ্রিয়র ছবি ছড়ানো। কিন্তু সমস্ত ছবি অপসারণ করা হয়েছে। শুধু সেইগুলো রয়েছে, যাতে শুধু যন্ত্রের ছবি নেওয়া হয়েছে।

বনলতা ডাঃ চ্যাটার্জীকে বললেন, কি ব্যাপার? সমস্ত ছবি সরানো হয়েছে কেন?

ডাঃ চ্যাটার্জী শুকনো মুখে বললেন, বড়-কর্তার অর্ডার ইনস্টিটিউশনে শুধু যন্ত্র ছাড়া আর কোন ছবি রাখা হবে না। সায়েন্স ইজ্‌ ইমপারসোনাল। বনলতা ইমপারসোনালভাবে বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু মানুষই সায়েন্স করে।

কপালের অনেক কুঞ্চিত রেখার তলায় ডাঃ চ্যাটার্জীর চোখটা ছলছল করে উঠল। ডক্টর চ্যাটার্জী সুব্রহ্মনিয়মের বক্তৃতার ছাপা কপিগুলো গুনছিলেন। তার ওপরে সুব্রহ্মনিয়মের ছবির দিকে চাইলেন তিনি। তিনি বললেন, আবার মানুষের ওপর সায়েন্স। এই মুহূর্তে এখানে যে লাইফ ফ্লাস্ক আছে, পরের মুহূর্তে এখানে সে ফ্লাস্ক নেই।

বনলতা নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে কাজ করতে শুরু করল। রিলে রেসের খেলোয়াড় কাঁদে না।

মীটিঙে সুব্রহ্মনিয়ম বললেন, আজ চোদ্দ বছর ধরে আমি এই ইনস্টিটিউশনে আছি। কিন্তু একদিনের জন্যও ভাবি নি আমি কোন্‌ পদে কাজ করছি। এই ইনস্টিটিউশনকে সেবা করবার দুর্লভ সুযোগ আমি পেয়েছি, তাতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

চারিদিকে হাততালি উঠল। হাতে হাত ঠেকাতে গিয়ে বনলতার মনে ভেসে উঠল লোভ-চকচকে দুটো চোখ—সো স্যাড সো স্যাড।

ডাঃ সুব্রহ্মনিয়ম বললেন, যখন আমাকে যে কাজ করতে বলা হয়েছে আমি বিনা দ্বিরুক্তিতে তা করেছি। কারণ আমি জানি, এ রকম একটা প্রতিষ্ঠানে কোন একজন ব্যক্তির কোন মূল্য নেই, সহযোগিতাটাই আসল। আমি আশা করি, আমার বন্ধুদের সহযোগিতা থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না। হাততালি পড়ল। বনলতার মনে পড়ল, মাঝখানে সুব্রহ্মনিয়ম দল পাকিয়ে গোটা ইনষ্টিটিউশনটাকে বন্ধ করবার অবস্থায় এনে ফেলেছিলেন।

ডাঃ সুব্রহ্মনিয়ম বললেন, আমরা অতীতে এই ইনষ্টিটিউশনকে দ্রুত উন্নতির পথে চালিত করেছি। পাছে গতি শ্লথ হয়, সেইজন্য বহু দিন আমার মনে পড়ে, আমাকে সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে।

নির্লজ্জ মিথ্যে কথা। বনলতা এদিক-ওদিক চাইল, কেউ প্রতিবাদ করে কি না দেখতে। সে কাজ একজনই করেছে যার নাম সুপ্রিয় চৌধুরী। তার নাম আজ উচ্চারিত হবে না, তা বনলতা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু এই মিথ্যার প্রতিবাদ হোক, না হাততালি পড়ল। বনলতার মনে ছিল না, লোকগুলোর বউ ছেলে আছে, আর আজকাল একটা চাকরি জোগাড় করা দুরূহ ব্যাপার।

সুব্রহ্মনিয়ম বললেন, কিন্তু কাজকে আমি কোন দিন ভয় করি নি। কারণ কাজ আমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করে, আমাদের সমৃদ্ধিশালী করে। সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর জীবন—এই তো আমাদের আকাঙ্ক্ষা। কাজ আমাদের গতি দেয়, আর গতিই জীবন। সমস্ত জীবন প্রবল গতিতে এগিয়ে চলেছে নতুন যুগের দিকে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরও এগিয়ে চলতে হবে। এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

শেষাংশটুকু বেশ দার্শনিক। বেশ উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে চারিদিকে। কিন্তু বনলতার মনে হল, এত পুরনো কথাগুলো। পনের বছর আগে ডাঃ মৌলিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন, গত বছর সুপ্রিয়ও এই দার্শনিকতাটুকু রেখেছিল—এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।

চারধারে ছাতার তলায় তলায় চায়ের আসর বসেছে। তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বনলতার মনে হল, কেন এগিয়ে যাব? বনলতা চারদিকে চাইল, কেউ কি এর উত্তর দিতে পারবে? সে দেখল, সবাই খেতে গল্পগুজব করতে ব্যস্ত। দু-এক জায়গায় খাবার নিয়ে কাড়াকাড়িও হচ্ছে। একদল নতুন রিসার্চস্কলারের মধ্যে হৈ-হৈ করে হাসাহাসি হচ্ছে।

বনলতার মনে হল, ঐটাই আসল। এরা বাঁচতে চায়, খেতে চায়, হাসতে চায়। কিন্তু ঐ ছেলেগুলো কি চেষ্টা করেও অনুভব করতে পারবে, পনের বছর আগে ঐখানেই আরও একদল ছেলেমেয়ে ঠিক ঐ রকমই হৈ-চৈ করছিল? ওরা তো ভাবতেই পারবে না, উল্টে হৈ-হৈ করে হেসে উঠবে—কি সব ওল্ড ফসিলদের কথা বলতে এসেছে!

বনলতার ভয়ানক ইচ্ছে হল, ওদের জিজ্ঞাসা করে সুপ্রিয় চৌধুরীকে ওরা চেনে কিনা। তার উত্তর সে জানে, অনেকেই বলবে—কই না তো। দু-একজন হয়তো বলবে, তিনি তো গত বছর মারা গেছেন!

পাশ দিয়ে যেতে যেতে বনলতা শুনল, একটি ছেলে বলছে, ব্যাটা সুব্রহ্মনিয়ম বুড়ো, বেশীদিন বাঁচবে না, আই শ্যাল বি দ্য ইয়ঙ্গেস্ট ডিরেক্টর অফ দ্য ইনষ্টিটিউট।

বনলতার বুকটা ধড়াস করে উঠল। কোন রকমে একটা চেয়ারে ঠেস দিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোথায় মীটিং! বনলতা দেখলে, একটা বাজিকর সোনার আপেল নিয়ে ম্যাজিক দেখাচ্ছে। আর হাজার হাজার লোক সেই দিকে দৌড়ে যাচ্ছে—আমার চাই, আমার চাই, আমি আমি আমি—

সুব্রহ্মনিয়ম এসে বললেন, কি হল ডঃ চৌধুরী, আপনি এখানে একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন?

সম্বিৎ ফিরিয়ে নিয়ে বনলতা বলল, না, এইসব দেখছি

তারপর: সুব্রহ্মনিয়ম হেসে বললেন, আমার বক্তৃতা কেমন হল?

সুব্রহ্মনিয়ম বনলতার সঙ্গে এক বিচিত্র ব্যবহার করেন এদিকে বনলতার 'বস' কিন্তু বনলতার নিজের জন্যে কি

করতে পারলে খুশী হন, বনলতার প্রশংসা শুনলে বিগলিত হন।

বনলতা বলল, ভালই হয়েছে।

সুব্রহ্মনিয়ম বললেন, যত বয়স হচ্ছে তত মনটা দার্শনিক হয়ে যাচ্ছে। কাজের মধ্যে জীবনের একটা মূল্য আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি। এখন মনে হচ্ছে চিরন্তন গতিটাই জীবনের সৌন্দর্য। যতই আমরা এগোই, ততই সেই সৌন্দর্যকে জয় করি।

বনলতার কাছে কথাগুলো শুধু বিরক্তিকর নয়, ক্লান্তিকর। ভদ্রতা রাখবার জন্যে সে কোনরকমে বলল, তা তো বটেই।

আর যতই জয় করি, ততই বুঝি, জীবনটা মূলত সুন্দর।

বনলতার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল। তাঁর কথার স্বীকৃতি ভেবে সুব্রহ্মনিয়ম খুশি হয়ে চলে গেলেন। খুশি হতে এসেছিলেন ,খুশি হয়ে চলে গেলেন। কেউ বুঝবে,না, সবাই নিজের নিজের অর্থ করবে সে হাসি থেকে। শুধু রঞ্জন থাকলে বলত, কি আশ্চর্য, বনলতা, তোমার স্ফটিকের মত হাসি এসে গেছে—যে হাসির রঙ নেই।

কিন্তু কোন একটা চেয়ারে বসে খেতে হবে। বনলতার চেয়ার হোমরাচোমরাদের মধ্যে। কিন্তু সেদিকে যেতে একেবারেই ইচ্ছে হচ্ছে না। অনেক পুরনো চেনাশোনা লোক রয়েছেন। তাঁরা বনলতাকে দেখে বড়ই অস্বস্তিতে পড়ছেন। ঠিক কী কথা বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না, সুপ্রিয়র প্রসঙ্গ উত্থাপন বড়ই অস্বস্তিকর। কেমন অপ্রতিভ হাসছেন সবাই সহানুভূতি জানাবার জন্যে। বনলতা সইতে পারে না—অস্বীকৃতি তবু সহ্য হয়, সহানুভূতি একেবারে নয়।

একদিকে মেয়ের দল গল্পে মশগুল। বনলতা তার একটি কোণে একটি চেয়ারে বসে চায়ের কাপটা তুলে নিল। মেয়েরা গল্পে মশগুল, বনলতার দিকে কারুর নজর পড়ল না। অনেক রকম আড্ডার জটলা—কার শাড়ির পাড়টা নতুন ডিজাইনের থেকে বীণা নতুন প্রেমে পড়েছে পর্যন্ত। চা শেষ করে উঠতে যাবে, বনলতা শুনল, কে যেন বলল, ভালবাসলে তবে বোঝা যায় জীবনের কী গভীর মানে।

ভালবাসা! মানে! বনলতা আপন মনে হাসল। সব সেপাই শাস্ত্রী। সব বলছে, বল, জীবন ভাল। রঞ্জনের সেই গল্প। রাজা উলঙ্গ হয়ে শোভাযাত্রায় বেরিয়েছেন। সেপাই শাস্ত্রী মন্ত্রী সব বলছে, কি অপূর্ব পোশাক। আর একটা লোক তার প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছে না। সবাই ভাবছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আর সবাই নিশ্চয়ই দেখছে। বোকা বনবার ভয়ে সবাই বলছে, জয় রাজার জয়।

বনলতার মনে হল, এই সাজানো মণ্ডপে, এই বিলিতী বাজনার সুরে, সুব্রহ্মনিয়মের বক্তৃতায়, ওই ছেলেটির উচ্চাশায়, এই মেয়েটির ভালবাসার স্বপ্নে সেই একই ধ্বনি উঠছে—জয় রাজার জয়। বনলতা উঠে পড়ল, ওপাশের মাঠে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলল।

সুব্রহ্মনিয়ম কোন হোমরাচোমরা ব্যক্তিকে এগিয়ে দিয়ে ফিরছিলেন। বনলতাকে দেখে এদিকে এগিয়ে এলেন।

অন্যদিন ভারী রাগ ধরত, আজ হাসি পেল। লোকটার সঙ্গে আজ দশ বছর সুপ্রিয়র খটাখটি, কিন্তু তার প্রতি এক বিচিত্র দুর্বলতা আছে ওর। আজ নয়, বহুদিন থেকে। মারাত্মক কিছু নয়, এ সব ব্যাপারে ও সিরিয়াসলি গোঁড়া। শুধু বনলতার সঙ্গে একটু কথা কইতে চায়, বনলতা ওর খাতির করলে খুশী হয়, বনলতার একটু উন্নতি করিয়ে দিতে পারলে বর্তে যায়। ভারী বিচিত্র—সুপ্রিয়র ওপর ওর অত রাগ, আর বনলতা কি রকম মেয়ে তাও সে ভালভাবেই জানে, তবু—

সুব্রহ্মনিয়ম বললেন, আপনাকে একটা কথা বলবার ছিল ডক্টর চৌধুরী।

বনলতা বলল, বলুন।

আমাদের গত মীটিঙে ঠিক হয়েছে, দুজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর নিযুক্ত হবেন। সিং সিলেক্টেড। আমি ভাবছিলুম, আপনি তো ওল্ডগ্রুপের একজন, আপনি অ্যাপ্লাই করলেই হয়ে যাবে।

'হয়ে যাবে'টা এমন ভাবে বললেন যারা এ লাইনে আছে, তারা জানে এর মানে হয়ে গেছে।

বনলতা হেসে ফেলল, শান্ত নরম মিষ্টি গলায় বলল, ধন্যবাদ ডাঃ সুব্রহ্মনিয়ম, আমার আর দরকার নেই।

মানে ?—বলে কি বোঝাবার জন্যে সুব্রহ্মনিয়ম মুখ খুললেন কিন্তু চুপ করে গেলেন। একটি শীতল হাসির সামনে তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না।

বনলতা কি নিজের চোখে রাজাকে দেখেছে !

রাস্তায় আসতে আসতে বনলতা ভীষণ ভয় পেল, মনটা চেঁচাতে লাগল—না আমি রাজাকে দেখি নি, আমি রাজাকে দেখতে চাই না। গাড়ি চালাতে বনলতা বারবার মনকে ঝাঁকানি দিচ্ছে, স্বাভাবিক হও, এখুনি অ্যাকসিডেণ্ট হবে যে ! কিন্তু কোথায় কি, শুধু মনে হচ্ছে কতকগুলো ছবি সাজানো রয়েছে আর পুতুল নাচ হচ্ছে। কিসের অ্যাকসিডেণ্ট ! ছবি সাজানো আর পুতুল নাচ। ছবি সাজানো আর পুতুল নাচ। আর তার পেছনে একজন আছে—সে উলঙ্গ। বনলতার মন বারে বারে চোখ বুজছে, না না, কই আমি দেখতে পাচ্ছি না, কোন রাজাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না।

বনলতার ডঃ চৌধুরী বলছে, স্বাভাবিক হও, রাজাকে দেখ না, দেখলেই মরতে হবে। ছি ছি, লোকে কি বলবে। স্বাভাবিক হও, বনলতা। না হলে সারাজীবন আর কিছু করবার থাকবে না, মরা ছাড়া আর উপায় থাকবে না। ইস, সে ভারী কুৎসিত, বনলতা চৌধুরী নিজেই নিজেকে মেরে ফেলেছে। ছি ছি, কি কুৎসিত !

দেশবন্ধু পার্কের কাছে একটি ভিখিরী তার ময়লা কাপড় আর ভাঙা টিন নিয়ে বসেছিল একটি গাছের তলায়। বনলতা তার পাশে গিয়ে গাড়ি থামাল। ভিখিরিটি অভ্যাসবশে হাত বাড়াল। বনলতা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে মুঠোর মধ্যে যতগুলো নোট উঠল তাকে দিয়ে দিল। তারপর বলল, এই শোন। লোকটি হতবাক হয়ে যন্ত্র-চালিতের মত উঠে দাঁড়াল।

বনলতা বলল, একটা উত্তর দিতে হবে। তোমার বাঁচতে ভাল লাগে ?

লোকটি কিছুই না বুঝে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, কি বললেন মা ঠাকরুণ ?

বনলতা মিনিটখানেক অস্থির হয়ে হাতটা ঘোরাতে লাগল। কিভাবে বোঝান যায় ওকে ?

তারপর বলল, তোমার তো খেতে-পরতে খুব কষ্ট ?

হ্যাঁ, ওঃ কি কষ্টে যে থাকি মাঠাকরুণ !

বনলতা বলল, আমার পিস্তল দিয়ে যদি তোমাকে মেরে ফেলি ?

উঃ বাপ রে, মরব ক্যানে গো।—বলে লোকটা ছিটকে পড়ল।

বনলতা আর দাঁড়াল না। উত্তর পেয়ে গিয়েছে। ও-লোকটা কিছু পায় নি, তবু বাঁচছে। আর সে তো একদিন সব পেয়েছে, কেন সে জীবনকে খারাপ বলবে। কেন পুরনো দিনের স্মৃতি মন্থন করে বলবে না, যখন বেঁচেছিলুম, ভাল করে বেঁচেছিলুম। জীবন ভাল, জীবন ভাল। আজকের দিনের কথা বনলতা তো আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, উত্তর ঠিক ছিল তার। ডায়মণ্ডহারবারের কাছে সুপ্রিয়দের বাড়িতে গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে বনলতা বলেছিল, মন, তুমি দয়া করে মনে রেখ, যদি কোনদিন পৃথিবী সম্বন্ধে হতাশা জাগে ব্যর্থতা আসে, আজকের এই গঙ্গার কথা মনে পড়লে ভাবব, একদিন অন্ততঃ পৃথিবী আমার চোখকে আমার মনকে রাঙা করে দিয়েছিল।

বনলতা সারা রাস্তা জপতে জপতে গেল—জীবন ভাল, পৃথিবী ভাল, আমাকে একদিন রাঙা করেছিল। জীবন ভাল, পৃথিবী ভাল।

বাড়ি ফিরে বনলতা আর একবার স্নান করল। মনে আনন্দ আনা দরকার। জীবন একদিন দিয়েছিল, জীবনকে ভালবাসি। আমি ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করব বাঁচবার জন্যে।

খুশি খুশি মুখ নিয়ে সে ঢুকল সুপ্রিয়র ঘরে সুপ্রিয়কে একবার বলে এসে পারুকে আনতে যেতে হবে।

ঘরে ঢুকেই বনলতার মাথা টনটন করে উঠল, যে যেন সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় তুলে দিয়েছে ! সুপ্রি কাঁদছে, চোখের জলে সমস্ত বালিশ ভিজে গেছে আ কান্নার আওয়াজটা অদ্ভুত—মোটা সরু মিশিয়ে একা অমানুষিক আওয়াজ—যা শুনলে বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ কা ওঠে।

কাছে গিয়ে দেখে, সারা দুপুর বোধ হয় কেউ দে নি। সমস্ত বিছানায় ময়লা মাখামাখি, দুর্গন্ধ, আর ত মধ্যে সুপ্রিয় অসহায়ভাবে পড়ে আছে।

বনলতা কাছে যেতে সুপ্রিয় ওকে কি বলতে গে আর বনলতা রুদ্ধশ্বাসে দেখল, ওর কথা একেবারে জড়ি গেছে। অনেক কষ্টে বনলতা আবিষ্কার করল, ও বলা

কেন আমি অত খেটে মরতে গেলুম, তাই তো এত অল্পবয়সে আমাকে এই কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে।

বনলতা ওর মাথায় হাত দিয়ে বলল, ছি, তুমি কেঁদ না। তোমার খাটুনির জন্যে কিছু হয় নি। মানুষের রোগ কখন হয় তা কি কেউ বলতে পারে!

সুপ্রিয়র এক কাঁদুনি: আমি বড় বেশী লোভ করতে গিয়েছিলুম, তাই আমার এই সাজা।

বনলতা পাগল হয়ে যাবে নাকি? বুকের মধ্যে কান্নায় দম বন্ধ হয়ে আসছে, আর মাথায় রঞ্জনের কঠিন কণ্ঠ—সুপ্রিয় আজও লোভী। লোভীরই অনুশোচনা হয়। লোভীরাই পুতুলনাচের পুতুল।

একজন বনলতা সুপ্রিয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, ছি কাঁদতে নেই। আর একজন বনলতা চেঁচিয়ে রঞ্জনকে বলল, ও রোগী, এটা ওর সাময়িক বিকার। আমি অনুশোচনা করি না, আমি বলি, আমরা গঙ্গার ধারে ভাল করে—

ভাল করে? ভাল করে? ভাল করে কি? বনলতা আর কিছুতেই মনে করতে পারল না।

এই লোকটা কে? সুপ্রিয় না? সেই ছেলেবেলায় তার বন্ধু ছিল। তার যেন দুজন বন্ধু ছিল—রঞ্জন আর সুপ্রিয়। রঞ্জন হেসে বলেছিল, আমি বাঁচতে চাই না। আর সুপ্রিয় কি যেন বলেছিল? বনলতা দাঁতে দাঁত চেপে ভাবতে চেষ্টা করল, কি রকম যেন ধোঁয়া ধোঁয়া। চেতনা ফিরতে দেখে সুপ্রিয় কথা বলতে পারছে না। একটা বিশ্রী আওয়াজ বেরুচ্ছে। আর অসহ্য দুর্গন্ধ।

বনলতা ঘুমের মধ্যে যেন বালতি খুঁজতে গেল, সমস্ত পরিষ্কার করতে হবে। বালতি খুঁজতে ঘরের বাইরে গেল। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করতে লাগল: মা, বালতি কোথায়?

রান্নাঘরের দরজায় এসে তীব্রস্বরে বলল, মা, তোমার আক্কেল বলিহারি যাই। গোটা দুপুরটা রোগীটাকে একলা রেখেছ!

মা কমলা মাসীর সঙ্গে গল্প করছিলেন। অলসকণ্ঠে বললেন, দুপুরে একবার দেখেছি শুয়ে আছে। আবার কি দেখব। বারো মাস যদি একটা মানুষ পড়ে থাকে, তাকে কি দিবারাত্র দেখা সম্ভব?

কমলা মাসী মাথা নেড়ে বললেন, সত্যিই তো।

তোমাদের একটুকু দরদ নেই।—বলে বনলতা দড়াম করে দরজাটা ঠেলে বাইরে গেল। বাথরুম থেকে বালতি নিয়ে ফিরছে, শুনল, কমলা মাসী মাকে বলছেন, নিজেদের ভালবাসার জিনিস, বলতে বুক ভেঙে যায়, কিন্তু এরকম ভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণ অনেক ভাল।

বালতিটা দরজার ধারে রেখে কোমরে হাত দিয়ে বনলতা রান্নাঘরে ঢুকল, কর্কশ কণ্ঠে বলল, মাসী, তোমার ছিয়াত্তর বছর বয়স হল। অনেক তো বাঁচলে। তোমার তিনকুলে কেউ নেইও। তুমি এবার মরে যাও না কেন?

মাসী ভয়ানক চটে উঠলেন, থরথর করে বলে উঠলেন, আমি মরতে যাব কেন লা? আমার তো ওরকম ভাঙা গতর নয়? নিজে করে খাই।

বনলতা প্রচণ্ড জোরে হাসতে শুরু করল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। হাসি আর শেষ হয় না। হাসতে হাসতে দেওয়ালে মাথা ঠুকে ফুলে গেল, হাসির তার বিরাম নেই। মত্ত-কণ্ঠে বলল, আমি জানি মাসী, আমি জানি। মরতে তো চাওই না, একটা লোকের যন্ত্রণা চোখের সামনে নিজের ভবিষ্যতের ছবি তুলে ধরছে বলে লোকটাকেও সইতে পারছ না। লোকটা মরুক, বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। চোখের সামনে থেকে আমার নিজের মৃত্যুর ছবিটাকে সরিয়ে নিক।

হাসতে হাসতে বনলতা টলতে লাগল। তারপর টলতে টলতে বালতি নিয়ে সুপ্রিয়র ঘরে ঢুকল।

সুপ্রিয়র গোটা মুখটা গনগনে লাল হয়ে উঠেছে। অন্ধভাবে চেষ্টা করছে হাতটা নাড়াতে মুখটা নাড়াতে।

রঞ্জন শীতল কণ্ঠে বলল—বাঁচতে চাইছে, বাঁচতে চাইছে।

বনলতার মনে হল, এত নোংরা চেষ্টা, এত অশ্লীল চেষ্টা কোথাও কোন দিন হয় নি, হবেও না।

বালতি রেখে বনলতা ওষুধের শিশিগুলো ঘাঁটল, তারপর 'বিষ' লেখা একটা ওষুধ নিয়ে এগিয়ে গেল জানলার দিকে। মেজার গ্লাসে ঢালতে লাগল। হাতটা কাঁপছে।

হঠাৎ জানলার বাইরে চোখ গেল। বিকেলের পার্কে যেন মেলা বসেছে। ওধারে প্রচণ্ড কোলাহল, ফুটবল খেলা হচ্ছে। সেদিকে সাঁতার কাটা হচ্ছে।

বুড়োরা বেঞ্চে বসে গল্প করছে। বাচ্চারা গোল হয়ে বসে খেলছে। ছেলেরা সাইকেল চড়ে চক্কর দিচ্ছে। মেয়েরা সেজেগুজে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা হাসির শব্দে বনলতা চেয়ে দেখে সামনের গাছটার তলায় একটি মেয়ে বসে আছে। বিকেলের কনে-দেখা-আলো পড়েছে তার ওপর। আর একটি লোক তার মাথায় ফুল গুঁজে দিচ্ছে।

একটা ধুপ করে শব্দ শুনে ঘরের ভেতর চেয়ে দেখে, সুপ্রিয় একটুখানি উঠেছিল, ধড়াস করে পড়ে গেল।

বাইরের দিকে চেয়ে বনলতা বিড়বিড় করে বলল, রাজা কি বিশ্রী উলঙ্গ। এখানে বাঁচা অশ্লীল।

আর হাত কাঁপল না, মেজার গ্লাসে সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে ওষুধ জমা হল।

খানিক খেয়েই সুপ্রিয় বুঝতে পারল যেন অনেক দিন পরে সমস্ত শরীরটা মুচড়ে উঠল। বাধা দিতে গেল বনলতাকে, কিন্তু পারল না, তখন যথেষ্ট চলে গিয়েছে।

অনেকখানি পাথর-হওয়া দেহটা একেবারে পাথর হয়ে গেল।

আর অসহ্যতম ক্লান্তিতে বনলতা সেই বিছানাতেই ভেঙে পড়ল। তারপর মা। চেঁচামেচি। অন্ধকার। জানলা। ছায়া। রোদ। গাছের ডাল। মা। ছায়া। রোদ। রুটি। লোক। যন্ত্র। মা। অন্ধকার। রোদ। রুটি। লোক। জানলা।

একদিন বনলতা দেখল বারান্দায় বেরুবার দরজায় বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। সে প্রাণপণে দরজা টানতে লাগল, খোল খোল।

বাইরে থেকে কার উত্তেজিত গলা শোনা গেল, ইস, আপনি একবার ওঁকে কোন রকমে এই ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিতে পারেন না?

মার কান্না-জড়ানো গলা শোনা গেল, দরজা খুললেই ও বাইরে বেরিয়ে আসবে।

মুশকিল, ইনস্যানিটিতে ভারী গায়ের জোর বাড়ে।

সেদিন থেকে ওর মুখে ওই এক কথাই লেগে আছে আমি বাইরে যাব, আমি বাইরে যাব।

কিন্তু এ রকম করলে তো কিছুতেই বাঁচা সম্ভব নয়।— সেই উত্তেজিত গলাটি বলল।

বনলতা হঠাৎ দরজা নাড়া ছেড়ে দিল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে জানলার কাছে গেল। মা আর একটি কোট-প্যান্ট-পরা লোক হন্তদন্ত হয়ে জানলার কাছে এগিয়ে এলেন।

বনলতা শীতল গলায় বলল, তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না, আমি এমনই বাঁচব না। আমি রাজাকে উলঙ্গ দেখেছি যে। যে রাজাকে উলঙ্গ দেখে সে বেশীদিন বাঁচে না।

ওঁরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বনলতা হাসল: তোমরা এখনও জান না, না? কিন্তু একদিন তোমাদেরও জানতে হবে—রাজা উলঙ্গ। যেদিন রাজাকে একলা দেখবে, সেদিন দেখবে সে উলঙ্গ। বনলতা আবার হাসল। হ্যাঁ, সে উলঙ্গ। তারপর বলল, তখন তোমরাও বাইরে যেতে চাইবে। দরজা খোল।

মা একবার কি ভেবে দরজা খুলে দিলেন।

বনলতা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। নির্লিপ্তভাবে আকাশের দিকে চাইল একবার। তারপর ওদিকের কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে, তারপর রাস্তার দিকে। তারপর নিজের ঘরের দিকে আস্তে আস্তে এগোল। বিড়বিড় করতে করতে বলল, রঞ্জন বলেছিল, প্রশান্তি—জীবনকে ছাড়িয়ে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে। আমি তার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

[সমাপ্ত]

লঘুবর্ষণ

অসিতকুমার

ক। কথোপকথন

কথন — হাজার বছর হয়ে গেল ভোর
এই কটি মেওয়া পাকতে
চাই নি কিছুই, চেষ্টা করেছি
বড় জোর বেঁচে থাকতে।
আজকে যদিও বাজছে ঢক্কা
ছুটছে লোটন উড়ছে লক্কা
তবু দেখ সেই সমান অক্কা
পাই বোষ্টমে শাক্তে—
হাজার বছর কেটে গেল জোর
এই কটি মেওয়া পাকতে।

উপকথন — বিশ্বাস কর, অতি অবশ্য
সেই শুভদিন আসবে
বিজ্ঞাপনের হাসির মতন
প্রত্যেক লোক হাসবে।
পূর্ণ পকেটে শূন্য মগজে
মোটরে এবং সিনেমা কাগজে
প্রত্যেক লোক ভীষণ খুশীর
অ্যাটলান্টিকে ভাসবে।

ধুয়ো — বিশ্বাস কর……ইত্যাদি।

খ। ভাষ্য — (যে কোন সামরিক চুক্তির পর)
আমরা কখনও করি না আক্রমণ।
অপর পক্ষে বিদ্বেষ হলে জমা
বোমারু পাঠিয়ে ফেলি গুটিকয় বোমা।
নগর গ্রামের হয় যদি কোনও ক্ষতি—
আমরা তো তাতে দুঃখিত হই অতি।
দু চোখে বাষ্প। বেদনায় ভরে মন
প্রার্থনা-সভা করে থাকি আয়োজন
ভাবি শত্রুর কী দারুণ দুর্মতি!

আমরা কখনও করি না আক্রমণ।
অপর পক্ষ করে যদি সাজ্‌ সাজ্‌
পাড়ার মোড়েতে লাগায় কুচকাওয়াজ,
চলনে বলনে হয় বেশী তৎপর
আমরা কেবল পাঠাই নৌবহর
সামান্য কটা গোলা দাগে গুলি ছোঁড়ে
শুধু গুটিকয় শহর বাজার পোড়ে
জনতার পথ করে দেয় নির্জন।
উত্তেজনার উত্তাল বেগ থামে
দিগন্ত জুড়ে শান্তির ছায়া নামে
মনে মনে বলি: প্রয়োজন, প্রয়োজন!

যদি মরে কেউ খেয়ে আমাদের গুলি
রক্তে ভেজায় ম্লানো ধরণীর ধূলি
আর্ত হৃদয়। বেদনায় বুক ভরে।
প্রার্থনা করি ব্যথাহত অন্তরে
করুণা-কাতর কেঁপে ওঠে ধরা গলা
আমরা তো চির শান্তির ফেরিঅলা
কখনও কারুকে করি নি আক্রমণ॥

আইনস্টাইন ও গান্ধী

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আইনস্টাইন ও গান্ধী! এ যুগের দুই মহান্ সত্যসন্ধ মহাপুরুষ। নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের অধিকারী হবার জন্য উভয়েই নিজ কালের কাছ থেকে অতুলনীয় স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তবু মনে হবে উভয়ের মধ্যে কী দুস্তর পার্থক্য। একজন পশ্চিমের সন্তান এবং অপরজন প্রাচ্যের মানস-পুত্র। একজন ঐহিক সম্পদের চাকচিক্যে ও আড়ম্বরের বিমূর্ত প্রতীক ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির মাঝে মানুষ, অপরজন যন্ত্র-উদ্ভাবনের দৌড়ে একেবারে পরাজিত না হলেও অনগ্রসর এশিয়ার এক পরাধীন, দীর্ণজীর্ণ ও হৃতমান দেশের জীবনরসে পুষ্ট। বাহ্যতঃ যেন মনে হয় যে কিপলিংয়ের ভবিষ্যদ্বাণীই যথার্থ—Oh, East is East and West is West, and never the twain shall meet। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নবীন বিজ্ঞানের যে বিজয়াভিযানের সূত্রপাত হয়, একজন তার সর্বজনমান্য সেনাপতি। অপর জন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানহীন বলে আখ্যাত, semi-mystic রূপে পরিচিত এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম ও নৈতিকতা আমদানিরূপ মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির জন্য স্বদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা ধিক্কৃত। একজন উচ্চ কোটির বুদ্ধিজীবী, চিন্তন মননই তাঁর জ্ঞানোপলব্ধির উপায়। অপরজনকে কোনক্রমেই বুদ্ধিজীবী বলা চলে না। মৌলিক সত্য সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান তাঁর হয়েছিল, তা অর্জনের মাধ্যম ছিল প্রত্যক্ষ কর্ম। একজন কর্মের থিয়োরি উদ্ভাবন করেছেন এবং অপরজন কর্মের দ্বারা থিয়োরি আবিষ্কারের প্রয়াস করেছেন। অথচ বাইরের আপাতদৃশ্যমান পার্থক্যের মায়াজাল অপসারিত করলে দেখা যায় যে উভয়ের মধ্যে কী গভীর ঐক্য। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধীয় উভয়ের দৃষ্টিকোণে কী অদ্ভুত সামঞ্জস্য। অবশ্য এই ঐক্য বা সামঞ্জস্যকে জ্যামিতিক সাদৃশ্যরূপে কল্পনা করা উচিত নয়। দেশ ও ঐতিহ্যের বিভিন্নতার কারণে আইনস্টাইন ও গান্ধীর মধ্যে খুঁটিনাটির ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু তাঁদের ভিতর যে মূলগত ঐক্য ছিল তারই কারণে আইনস্টাইনকে গান্ধী সম্বন্ধে বলতে হয়: "রাজনীতির ইতিহাসে গান্ধী অদ্বিতীয়। নিগৃহীত এবং নিপীড়িত জাতির মুক্তি-সংগ্রাম পরিচালনার জন্য তিনি এক সম্পূর্ণ অভিনব ও মানবীয় পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন এবং অসীম উদ্যম ও অপরিসীম নিষ্ঠা সহকারে এই নবীন পদ্ধতি বিমূর্তকরণের কার্য করছেন। পশুশক্তির উপাসক আমাদের এই যুগে সভ্য সমাজের তাবৎ চিন্তাশীল মানবের উপর তাঁর নৈতিক প্রভাবের স্থায়িত্ব যতটা হওয়া সম্ভব বলে মনে হয়, প্রকৃত-পক্ষে গান্ধীর প্রভাব তার চেয়ে বহুগুণ অধিক।...এরূপ একজন দেদীপ্যমান মহাপুরুষ ও অনাগত বহু যুগের পথনির্দেশক আলোকবর্তিকারূপী মহামানবকে ভবিতব্য যে আমাদের মাঝে আমাদের সমসাময়িক সাথীরূপে প্রেরণ করেছে, এর জন্য আমরা অতীব কৃতজ্ঞ এবং নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি।" বাইরের শতবিধ বিভিন্নতা সত্ত্বেও উভয়ের মনোবীণা একই সুরে বাঁধা ছিল এবং যে মৌলিক প্রবর্তনা এই দুই মহা মনীষীর যাবতীয় চিন্তা ও কর্মের প্রেরণাস্বরূপ ছিল, তার নাম হচ্ছে মানবতাবোধ বা মানবপ্রেম। আইনস্টাইন গান্ধীর ভিতর হিউম্যানিজমের চূড়ান্ত সক্রিয় রূপের পরিচয় পেয়ে তাঁর সম্বন্ধে বলেন: "জনগণের নেতা অথচ কোন বাহ্য কর্তৃত্বের উপর অবলম্বিত নন। এমন একজন রাজনীতিবিদ্, যাঁর সাফল্য কোন রকম কারিগরী বা কলাকৌশলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে কেবল নি[illegible] ব্যক্তিত্বের যুক্তিশক্তির উপর আধারিত। চির-বিজ[illegible] যোদ্ধা; কিন্তু বলপ্রয়োগের নীতির উপর চিরদিন বীতশ্রদ্ধ। প্রজ্ঞা এবং বিনয়ের অবতার; অথচ অনমনী[illegible] দৃঢ়তা ও চারিত্রিক সামঞ্জস্যের আকর। স্বদেশবাসী[illegible] অভ্যুত্থান এবং উন্নতি বিধানের জন্য তিনি জীবনোৎ[illegible] করেছেন। তিনি ইউরোপের পশুশক্তির সম্মুখী[illegible] হয়েছেন সাধারণ মানবের মর্যাদাবোধ নিয়ে। এই তা[illegible]

ঊর্ধ্বগামী হয়ে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠতার আসন অলঙ্কৃত করেছেন। আজ থেকে বহু যুগ পরে লোকে হয়তো এ কথা বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে এই রকম রক্ত-মাংসের শরীরধারী কেউ কোন কালে এই ধরাতলে বিচরণ করতেন।" সর্ব যুগে সর্ব দেশের মহাপুরুষেরা যে একই ধারায় চিন্তা করেন এবং ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ব্যবধানের কাল্পনিক পার্থক্য সত্ত্বেও মানবসংস্কৃতি যে এক এবং অবিভাজ্য, আইনস্টাইন ও গান্ধীর বিচারধারার ঐক্য তার জলন্ত প্রমাণ।

"জড়বাদী পশ্চিম এবং আধ্যাত্মিক প্রাচ্য দেশ" বলাটা আমাদের এক মুদ্রাদোষের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। অথচ কথাটা যে কত ভুল তা আইনস্টাইনের সম্পদ সম্বন্ধীয় উক্তি থেকে নূতন করে একবার বোঝা যাবে। তাঁর মতে: "আমার দৃঢ় প্রতীতি যে অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল কর্মীর হাতে থাকলেও কোন জাগতিক ধন-সম্পদ মানবতার প্রগতি সাধন করতে পারে না। মহৎ ও পবিত্র চরিত্রের উদাহরণই একমাত্র জিনিস যা সৎ ভাবনা ও মহান্ কর্মের জন্ম দিতে পারে। অর্থ শুধু স্বার্থপরতা বৃদ্ধি করে এবং সর্বদা এর মালিককে এর অসদুপযোগ করার জন্য দুর্নিবার ভাবে প্ররোচিত করে। মোজেস যীশু ও গান্ধীর হাতে কর্নেগীর টাকার থলি—এমন ব্যাপার কি কেউ কখনও কল্পনা করতে পারে?" আইনস্টাইনের এই কথাই গান্ধীর অর্ধশতাব্দীর অধিক কালের জন-জীবনের প্রতিটি কার্য-কলাপে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। অথচ এই "আধ্যাত্মিক প্রাচ্য দেশে"র অন্যতম আমরা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির দোহাই দিয়ে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সমর্থিত গান্ধীর এই দৃষ্টিকোণকে প্রগতি-বিরোধী আখ্যা দানকরতঃ বর্জন করেছি।

এ যুগের আর একটি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গান্ধীকে আজীবন সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং এই কুসংস্কার বিজ্ঞানের মুখোশ পরে আবির্ভূত হবার জন্য এর সঙ্গে যুদ্ধ করা গান্ধীর পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার হয় নি। গান্ধীর মতে প্রেমও মানুষের এক অন্যতম সহজ প্রবৃত্তি (natural instinct)। এই প্রেমবৃত্তির বলেই একদা নরমাংসভোজী ও একক ভাবে বিচরণকারী মানুষ পরিবার গড়ে এবং তারপর ক্রমশঃ এরই তাগিদে সমাজ সভ্যতা ও রাষ্ট্রের পত্তন ও বিকাশ সংশোধিত হয়। গান্ধী তাই চাইতেন যে প্রেমবৃত্তির বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি—শোষণ ও হিংসা-রহিত এক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে চেষ্টা করা মানবের অবশ্য আচরণীয় কর্তব্য এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা হচ্ছে আমাদের নিত্যকার জীবনে ও পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে অধিকতম মাত্রায় অহিংসা ও প্রেমের প্রয়োগ। কিন্তু একদল বৈজ্ঞানিক প্রচার করতে থাকেন যে একমাত্র যৌন ক্ষুধা ও বুভুক্ষাই মানবের মৌলিক সহজ বৃত্তি। এই কুযুক্তির বলে তাই এক-দল সমাজ-বিজ্ঞানী সহযোগিতার পরিবর্তে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণীয় নিয়ম বলে প্রমাণ করার প্রয়াস করতে থাকেন। সেইজন্য বিজ্ঞানের এই সব অপব্যাখ্যাকারীদের আইনস্টাইনের অভিমত স্মরণ রাখা উচিত। গান্ধীর মত তিনিও স্বীকার করেন যে প্রেম মানবজীবনের নিয়ামক অন্যতম সহজ প্রবৃত্তি। তিনি বলেন: "আত্মসংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মানবের ব্যক্তিগত সহজ প্রবৃত্তিকে চালনাকারী আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের কয়েকটির নাম হচ্ছে ক্ষুধা, প্রেম, বেদনা এবং ভীতি। এর সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক জীব হিসাবে আমরা আমাদের সমধর্মী মানবের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহানুভূতি, গর্ব, ঘৃণা, ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা, দয়া ইত্যাদি অনুভূতির দ্বারা চালিত হই।" তিনি আরও বলেন: "অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বৃত্তিকে প্রোৎসাহিত করার জন্য ডারুইন কথিত 'অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম' ও তৎসংশ্লিষ্ট উদ্বর্তনের মতবাদকে নজির হিসাবে পেশ করেন। অনেকে এই জাতীয় মেকী বৈজ্ঞানিকতার ভিত্তিতে ব্যক্তি-ব্যক্তির ভিতর ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এটা ভুল; কারণ সমাজবদ্ধ জীব বলেই মানুষ অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম করার শক্তি পেয়েছে। উদ্বর্তনের জন্য একটি পিপীলিকার সঙ্গে সমগ্র পিপীলিকাযূথের সংগ্রাম যতটুকু প্রয়োজনীয়, মানবসম্প্রদায়ের কোন এক সদস্যের বেলায়ও সংগ্রাম ঠিক ততটুকু দরকারী।"

মধ্যযুগে ধর্মের বিকৃত বিগ্রহের বেদীমূলে মানুষের বিচার-বুদ্ধিকে বলি দেওয়া হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপাদে বিজ্ঞানকে সেই আসন দিয়ে ঠিক তেমনই ভাবে

অন্ধ-বিশ্বাস চালিত হয়ে বিচার-বুদ্ধির অপমান করা হচ্ছে। মানবের বিচারশক্তির এইরূপ দৈন্যদশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিমূর্ত প্রতীক হচ্ছেন গান্ধী। বিশ্ব-প্রকৃতির ভিতর নিত্য ক্রিয়ারত নিয়ম আবিষ্কারের প্রক্রিয়ারূপী বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান তাঁর কাছে শ্রদ্ধেয় হলেও তিনি একে দেবতার আসনে বসাতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিজ্ঞানকে আত্মজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করাই ছিল তাঁর সাধনা। উপনিষদের ঋষির মত তিনি চাইতেন: "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।" এই কল্যাণবুদ্ধি আসে আত্মজ্ঞানের অববাহিকা বেয়ে। কিন্তু বিজ্ঞানের (বিশেষতঃ যন্ত্র-কৌশল বা technology-র) এই জয়যাত্রার দিনে যখন অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী তাকেই মানবের সর্ব ব্যাপারের শেষ কথা বলে স্বতঃসিদ্ধ রূপে মেনে নিয়েছেন, তখন এই বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার আখ্যা দেবার মত স্পর্ধা প্রকাশ করার জন্য গান্ধী যে প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দিত হবেন, এতে আর বিস্ময়ের কি আছে! কিন্তু বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকপ্রবর আইনস্টাইনেরও এই মত। তিনি বলেন: "...বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ ফল মানুষের উত্থান ও তার স্বভাবের সমৃদ্ধি ঘটায় না; সর্জনাত্মক এবং গ্রহণধর্মী বুদ্ধিবৃত্তির অবদান হৃদয়ঙ্গম করার আকাঙ্ক্ষা তাকে আগে নিয়ে যায়।...অস্মদ ভাব থেকে মানুষ কতখানি মুক্ত হয়েছে সেই অর্থে এবং সেই মানদণ্ডেই মূলতঃ মানুষের সত্যকার মূল্যাঙ্কন হয়।" এই বিচার-ধারা আরও একটু পরিণত হল। তখন তিনি বললেন: "বিজ্ঞান অবশ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে অপারগ, আর মানুষের মনে আদর্শবাদের প্রেরণা সৃষ্টি তো আরও বহু দূরের ব্যাপার। বিজ্ঞান খুব বেশী হলে কোন আদর্শে উপনীত হবার সাধন সরবরাহ করতে পারে।...এই সব কারণে মানবীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আমাদের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যে আমরা যেন বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে অহেতুক উচ্চ মূল্য না দিই এবং আমরা যেন ধরে না নিই যে সমাজ-সংগঠন সম্পর্কিত বিষয়াবলী সম্বন্ধে একমাত্র বিশেষজ্ঞদেরই অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার আছে।" আর এক স্থানে তিনি বলছেন: "...বিজ্ঞান শুধু 'কি' তার উত্তর দিতে পারে, 'কি হওয়া উচিত'—এ প্রশ্নের মীমাংসা করার সাধ্য বিজ্ঞানের নেই। এবং তাই বিজ্ঞানের পরিধির বাইরেও সর্ববিধ প্রকারের মূল্যাঙ্কন বিচারের অবকাশ রয়েছে।" স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে যে 'কি হওয়া উচিত' তার উত্তর ফিজিক্সের এলাকায় পাওয়া যাবে না, এ প্রশ্ন সমাধানের চাবিকাঠি রয়েছে মেটাফিজিক্সের কাছে।

বাইবেলের শিক্ষার প্রতিধ্বনি তুলে গান্ধী বলতেন যে কোন মানুষ যদি বিশ্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে তার আত্মা খোয়ায়, তা হলে তার এই বিপুল প্রাপ্তির মূল্য কতটুকু? বৈজ্ঞানিক প্রগতির দোহাই দিয়ে অনেকে এ যুগের বহুবিধ মানবতার শ্বাসরোধকারী বিধিব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। গান্ধীর মতে, বিজ্ঞান মানুষের জন্য, মানুষ বিজ্ঞানের জন্য নয়। তাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের আবিষ্কার হলে গান্ধী তাকে অবাধে সমাজে বিচরণ করতে দিতে প্রস্তুত নন। গান্ধীর এই অভিমতের সঙ্গে বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ আইনস্টাইনের দৃষ্টিকোণের অদ্ভুত সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তিনি বলছেন: "অত্যন্ত কটু অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে আমাদের সমাজ-জীবনের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য বিচারবুদ্ধিযুক্ত চিন্তাই যথেষ্ট নয়। গভীর গবেষণা এবং উচ্চকোটির বৈজ্ঞানিক কৃতির পরিণাম অনেক সময় মানবজাতির পক্ষে মারাত্মক প্রতিপাদিত হয়েছে। এর ফলে এক দিকে যেমন মানুষকে প্রাণান্তকর দৈহিক পরিশ্রম থেকে মুক্তিপ্রদায়ক পন্থা আবিষ্কৃত হয়ে তার জীবনযাত্রাকে সহজতর ও সমৃদ্ধতর করেছে, তেমনই অন্য দিকে আবার এর পরিণামে তার জীবনে প্রচণ্ড অশান্তির ঝটিকাপ্রবাহ নেমেছে ও মানুষ তার যন্ত্রকৌশল-ময় পরিবেশের ক্রীতদাসে পর্যবসিত হয়েছে। আর সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে মানুষ যূথবদ্ধ ভাবে আত্মধ্বংসের সাধন উৎপাদন করছে। এই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মর্মন্তুদ বিয়োগান্তক অধ্যায়!"

গান্ধীর কাছে সাধ্য ও সাধন (ends and means) সম অর্থদ্যোতক। কারণ তিনি বলতেন যে, যেমন ইউক্লিডের সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী কোন রেখা অঙ্কন করা যায় না, সূক্ষ্মতম অগ্রভাগযুক্ত পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটলেও যেমন প্রস্থ বিহীন দৈর্ঘ্য অঙ্কন করা অসম্ভব, তেমনই মানুষ কোন দিনই তার শুদ্ধ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। আদর্শের

পথে চলাই তার সাধনা এবং তাই মানবপ্রগতির লক্ষ্যাভিমুখী যাত্রায় সাধন (means) বা উপায় লক্ষ্যেরই মত শুদ্ধ হওয়া চাই। তথাকথিত প্রগতিবাদীদের এ কথায় তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না যে, লক্ষ্য যদি মহান্ হয়, তা হলে যে কোন (সদসৎ) পন্থায় সে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া চলে। প্রত্যুত সমগ্র মানবেতিহাস এই অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে জলন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ, আমাদের সম্মুখে থাকলেও এই "বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার" এখনও আমাদের ভিতর প্রবল। গান্ধী এইজন্য দুষ্কৃতিকারীকে দমন করার জন্যও অনুচিত পন্থার শরণ নেওয়া অন্যায় বিবেচনা করতেন। এই কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্বকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন যে, উচ্চগ্রামের হিটলারবাদ গ্রহণ না করলে হিটলারের পন্থায় হিটলারকে পরাভূত করা সম্ভব নয়। এ পদ্ধতিতে এডলফ্ হিটলার নামক ব্যক্তির দৈহিক বিলুপ্তি ঘটলেও বস্তুতঃ বিজেতার মধ্যে দিয়ে সুপার হিটলারের বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়। আইনস্টাইনও তাই বলেন: "আমরা এমন একটা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে উদ্গাত হয়ে এসেছি, যখন আমাদের শত্রু-পক্ষের অত্যন্ত হীন নৈতিক মানদণ্ড স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই মানদণ্ডের শ্বাসরোধকর পরিবেশ থেকে মুক্ত বোধ করার পরিবর্তে, মানবজীবনের শুচিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং অসামরিক জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান করার বদলে আমরা বস্তুতঃ বিগত যুদ্ধের শত্রুপক্ষীয় নিম্নশ্রেণীর মানদণ্ডকে আমাদের বর্তমান নিরিখের মর্যাদা দিতে চলেছি। এই ভাবে নিজেদের কুরুচির জন্য আমরা আর একটি যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।" মানুষের ভৌতিক বা আর্থিক উন্নতির জন্যও কি অমানবীয় পন্থার আশ্রয় নেওয়া চলে? সাময়িক ভাবে lesser evil হিসাবে এটুকু মেনে নিতে অনেকের আপত্তি নেই। এই সব সমাজ-সংস্কারকদের কাছে এর নাম ন্যূনতম হিংসা এবং নেহাৎ উপায় না থাকলে তাঁরা একে স্বীকার করে নেবেন। কারণ তাঁদের মতে সমাজ-সংস্কারের শেষ পর্যায়ে, প্রগতিশীল শক্তিসমূহের অন্তিম বিজয়ক্ষণে সাধনশুদ্ধির এত চুলচেরা বিচার প্রগতি আন্দোলনের ক্ষতি করতে পারে। এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে গান্ধীর কাছে কোন অবস্থাতেই কোন অজুহাতেই অশুদ্ধ পন্থা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ সম্বন্ধে আইনস্টাইন কি বলেন? তাঁর মতে: "আর্থিক প্রগতির খাতিরে ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শকে কি সাময়িক ভাবেও বর্জন করা উচিত? জোর জবরদস্তি ও আতঙ্কবাদের রাজত্বের সাফল্যের তুলনামূলক আলোচনা করার সময় জনৈক সংস্কৃতিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী রুশ পণ্ডিত অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে আমার কাছে এর সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে অন্ততঃ প্রথমাবস্থায় এটা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ তিনি (প্রথম) যুদ্ধ-পরবর্তী রাশিয়ার সাম্যবাদের সাফল্য ও জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেসীর ব্যর্থতার কথা বলেন। তাঁর যুক্তি আমাকে প্রভাবিত করতে পারে নি। আমার কাছে কোন আদর্শই এমন মহান্ নয়, যার রূপায়ণের জন্য অযোগ্য পন্থার শরণ নেওয়া সমর্থন করা চলতে পারে। হিংসা হয়তো কোন কোন সময়ে ত্বরিৎ গতিতে পথের বাধা দূর করেছে; কিন্তু কদাপি এ সৃজনশীল বলে প্রতিপন্ন হয় নি।"

উগ্র অধিকার-চেতনা আমাদের এ যুগে সামাজিক সংহতির পক্ষে মারাত্মক প্রমাণিত হচ্ছে। সকল শ্রেণী নিজ দাবি ষোলআনা আদায় করতে সমুৎসুক। এর কারণ, সামাজিক সংঘর্ষ তীব্র হওয়া ছাড়াও মানুষের মনে কর্তব্য ভাবনা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। অথচ এই কর্তব্য ভাবনা ও দায়িত্ব পালন বৃত্তিই মানবসমাজের আধারশিলা। এ যুগের এই সঙ্কটের হাত থেকে ত্রাণ পাবার জন্য গান্ধী তাই পুনঃ পুনঃ অধিকারের বদলে কর্তব্যের উপর জোর দিতেন। তাঁকে ভুল বোঝার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তিনি বলতেন যে, একমাত্র সুচারু রূপে সম্পাদিত কর্তব্যের দ্বারাই অধিকার জন্মে থাকে। গান্ধীর এইরূপ উক্তির জন্য তাঁকে কেউ কেউ কায়েমী স্বার্থের সংরক্ষক আখ্যা দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। কিন্তু আইনস্টাইনের কণ্ঠেও এই একই বাণী মুখর হয়ে ওঠে। মানবের সাফল্যের মূল্যাঙ্কন প্রসঙ্গে তিনি তাই ঘোষণা করেন: "মানুষ সমাজের কাছ থেকে কতটা আদায় করে নিল তার ভিত্তিতে নয়, সমাজকে সে কতটা দিল তার আধারেই তার মূল্যায়ন করতে হবে।"

আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে ব্যক্তির উপর

সমাজের কতখানি নিয়ন্ত্রণ থাকবে? এবং ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিধিই বা কতটুকু? মানুষ সমাজবদ্ধ হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এ প্রশ্ন মানব-কল্যাণকামী চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে আসছে। এ সম্বন্ধে আইনস্টাইন ও গান্ধীর চিন্তাধারা একই খাতে প্রবাহিত। মানবতাবাদী এই দুই মনীষী কোন কিছুর বিনিময়ে ব্যক্তি-মানবের স্বাধীনতাকে বিলিয়ে দিতে সম্মত নন। কারণ তাঁদের মতে সৃজনশীল-বৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির সমবায়ই হচ্ছে সমাজের আধার, ব্যক্তি-মানবকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন নৈর্ব্যক্তিক রূপ বা অস্তিত্ব তাঁদের কাছে নেই। আইনস্টাইন বলছেন: "আমার মতে মানবের জীবন-নাট্য-প্রবাহে সত্যকার মূল্যবান জিনিস রাষ্ট্র নয়, এ হচ্ছে সৃজনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব। যা কিছু মহৎ তার স্রষ্টা ব্যক্তি, অন্তর্বৃত্তির বন্ধন মোচন করার ক্ষমতা রাখে ব্যক্তি। পক্ষান্তরে গোষ্ঠী ভাবনাচিন্তা এবং সংবেদনাশীলতা—উভয় ক্ষেত্রেই রস স্পর্শহীন থেকে যায়।" অন্যত্র তিনি বলছেন: "এ কথা স্পষ্ট যে আধিভৌতিক আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক ক্ষেত্রে সমাজের কাছ থেকে আমরা যে অবদান পেয়ে আসছি, তার উৎস হচ্ছে অগণিত যুগের সৃজনশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টার সমষ্টি। আগুনের ব্যবহার, খাদ্যোপযোগী বৃক্ষলতার চাষ, বাষ্পীয় ইঞ্জিন ইত্যাদি প্রত্যেকটিই এক একজন মানুষের আবিষ্কার।···ব্যক্তিই কেবল চিন্তা করতে সক্ষম ও এই ভাবে সমাজের পক্ষে নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টিকরণক্ষম। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি এমন নূতন নৈতিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করতে পারে, গোষ্ঠীজীবন যাকে গ্রহণ করে সার্থক হয়। জীবনরসের আকর গোষ্ঠীর বনিয়াদ ছাড়া যেমন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা চিন্তা করা যায় না, তেমনই সৃজনশীল স্বাধীন চিন্তা ও বিচারক ব্যক্তি ছাড়া সমাজের ঊর্ধ্বগতি অকল্পনীয়।" সমাজের উন্নতির জন্য ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কাম্য মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আইনস্টাইন ও গান্ধী মানবসমাজের ভিতর বিরাজিত বৈচিত্র্যকে প্রকৃতির এক আশীর্বাদ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আইডিয়ার মত ব্যক্তিসত্তার বিকাশের ক্ষেত্রেও তাঁরা Regimentation-এর প্রবল বিরোধী ছিলেন। গান্ধীর অহিংসা নিষ্ঠার এক অন্যতম কারণ এই বৈচিত্র্য-প্রেম। আইনস্টাইন এ সম্বন্ধে বলছেন: "···নিজেদের ভিতর সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশের জন্য প্রতিটি ব্যক্তির অবাধ সুযোগ থাকা চাই। একমাত্র এই ভাবেই ব্যক্তি-মানবের যথার্থ পরিতৃপ্তি বিধান সম্ভব। এবং শুধু এই পথেই সমাজ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হতে পারে। কারণ যা কিছু সত্যকার মহান্ ও প্রেরণাদায়ী, তার জনক হচ্ছে স্বাধীন পরিবেশের মধ্যে কর্মরত ব্যক্তি-মানব। একমাত্র জৈবিক অস্তিত্বের নিরাপত্তার খাতিরেই এর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ মেনে নেওয়া যেতে পারে।···পূর্বোক্ত ধারণা থেকে আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। ব্যক্তি-ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী-গোষ্ঠীর ভিতর বিরাজিত পারস্পরিক পার্থক্য আমরা কেবল সহ্য করেই ক্ষান্ত হব না। এ পার্থক্য আমরা কাম্য বলে মনে করব। এর ফলে আমাদের অস্তিত্ব সমৃদ্ধ হয়। এই হচ্ছে যথার্থ সহনশীলতার মূল কথা। এইরকম ব্যাপক অর্থযুক্ত সহনশীলতা ব্যতিরেকে সত্যকার নৈতিকতার কথাই উঠতে পারে না।" মানব-স্বাধীনতার সংকোচন ও মানবতাবাদের উপর যে কোন আক্রমণ আইনস্টাইনকে গান্ধীর মতই পীড়িত করত। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের উপর অনুষ্ঠিত অমানুষিক আচরণ এম. কে. গান্ধী, বার-অ্যাট-লকে ভবিষ্যৎ মহাত্মায় রূপান্তরিত করে। আইনস্টাইনও শতবিধ অত্যাচার ও অপমান সহ্য করেও হিটলারের জার্মানিতে ইহুদি দলনের প্রতিবাদ করেন। এইজন্য অবশেষে তাঁকে বৃদ্ধ বয়সে দেশত্যাগী হতে হয়। আর্ত-মানবতার আহ্বান তাঁকে শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার গজদন্ত গোপুরমে শান্তিতে থাকতে দেয় নি। তাই ইটালীতে মানব-স্বাধীনতার অপহ্নব দেখে তিনি তার প্রতিকারের জন্য অগ্রণী হন এবং জীবন-সায়াহ্নে শেষ আশ্রয়স্থলচ্যুত হবার ভয় না করেও আমেরিকার নিগ্রোদের হয়ে আন্দোলন করেন এবং ম্যাকার্থীবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মানবমর্যাদা ধূল্যবলুণ্ঠনকারী কোন একক ঘটনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ নয়। গান্ধীর মত তাঁর বিদ্রোহ এ যুগের গোষ্ঠীমনোবৃত্তির বিরুদ্ধে তাই তিনি সখেদে মন্তব্য করেন: "রাজনীতিতে শু নেতারই অভাব নয়, নাগরিকদের ভিতরও স্বাতন্ত্র্যবো

এবং ন্যায়বিচারের প্রতি আগ্রহ যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষীণ হয়েছে। স্বাধীনতার উপরিউক্ত ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা বহু স্থলে তছনছ হয়ে গেছে এবং তার পরিবর্তে একনায়কত্ব মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে ও তাকে এই কারণে বরদাস্ত করা হচ্ছে যে ব্যক্তির অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধীয় ভাবনা আরও মানুষের মনে প্রবল হয়। সংবাদপত্রগুলি পক্ককালের ভিতর মেষপালের মত জনসাধারণকে এমন ভাবে তাতিয়ে আগুন করতে পারে যে, জনকয়েক লোকের তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা উর্দি গায়ে চড়িয়ে মরতে ও মারতে প্রস্তুত হয়।"

বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের আখ্যায় বিভূষিত কমিউনিস্টরা বলে থাকেন যে ব্যক্তি-মানব সমাজদেহের একটি কোষ (cell) ছাড়া আর কিছুই নয়। দেহের অস্তিত্ব বা শ্রীবৃদ্ধির জন্য এ রকম দু-দশ লক্ষ কোষ নষ্ট হলে কীই বা ক্ষতি আছে? কারণ দেহ ছাড়া তো এইসব কোষের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই এবং কোষ স্থানচ্যুত বা পরিবর্তিত হলেও মূল দেহ অপরিবর্তিত থাকে। এই যুক্তির দোহাই দিয়ে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে কোন রকম অপহ্নবকে কেবল স্বীকারই নয়, তার জয়গান ঘোষণা করা হয়ে থাকে এবং সাম্যবাদী সমাজে প্রাচীন দেবতাদের নির্বাসন দিয়ে রাষ্ট্রকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করে তার অন্ধ বন্দনা চলে। মানবতার পূজারী গান্ধী এই মতবাদের জীবন্ত প্রতিবাদস্বরূপ ছিলেন। আর আইনস্টাইনের ভিতরও গান্ধীর এই প্রতিবাদের অনুরণন শোনা যায়। তাঁর কথায় বলতে গেলে: "রাষ্ট্র মানুষের জন্য, মানুষ রাষ্ট্রের জন্য নয়। এই দিক থেকে বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র সমপর্যায়ভুক্ত। অতীতে মানুষ এমন অনেক প্রবাদ রচনা করেছে, যার অর্থ হচ্ছে এই যে মানুষের ব্যক্তিত্বই তার চরম প্রেয়। বিশেষতঃ এ কালের এই কঠোর প্রতিষ্ঠানধর্মী ও যান্ত্রিক প্রভাবের কারণে ব্যক্তিসত্তার মর্যাদাকে চিরকালের জন্য বিস্মৃত হবার এক আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে না করলে আমি এ কথার পুনরুক্তি করতাম না। আমার মতে রাষ্ট্রের মুখ্য কর্তব্য হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার রক্ষণাবেক্ষণ করা ও তাকে সৃজনশীল ব্যক্তিরূপে বিকশিত হবার সুযোগ দেওয়া। অর্থাৎ রাষ্ট্র আমাদের দাস হবে, আমরা রাষ্ট্রের ভিত্তি হব না। রাষ্ট্র যখন বলপ্রয়োগে আমাদের সামরিক কার্যে যোগ দিতে বাধ্য করে ও যুদ্ধ পরিচালনায় নিযুক্ত করে, তখন রাষ্ট্র এই বিধান ভঙ্গ করছে বলতে হবে। বিশেষতঃ এই জাতীয় দাসত্বমূলক কার্যের উদ্দেশ্য ও পরিণাম হচ্ছে অপরাপর দেশের অধিবাসীদের হত্যা করা অথবা তাদের বিকাশের স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করা। রাষ্ট্রের বেদীমূলে মাত্র ততটুকু আত্মোৎসর্গ করা চলতে পারে, যা ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের স্বাধীন বিকাশের জন্য প্রয়োজন।" এ কথা নিশ্চয় উল্লেখ করাই বাহুল্য যে, এ রকম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-পূজারী ও মানবতাবাদী চিন্তানায়ক স্বৈরতন্ত্রের প্রবল বিরোধী হবেন। স্বৈরতন্ত্র হিটলার মুসোলিনীর হোক অথবা তার নখদন্তের রূপ গোপন করার জন্য তাকে একটু ভদ্র ও নিরীহ পোশাক পরিয়ে সর্বহারার একনায়কত্ব (Dictatorship of the proletariet) আখ্যাই দেওয়া হোক, গান্ধী ও আইনস্টাইনের মত মানবতন্ত্রপ্রেমীরা কিছুতেই একে সমর্থন করতে পারেন না। গান্ধীর এতদ্‌সম্বন্ধীয় দৃষ্টিকোণ সর্বজনবিদিত। আইনস্টাইন ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দেই ঘোষণা করেন: "রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, ব্যক্তি হিসাবে যেন প্রত্যেকের সম্মান করা হয় এবং কাউকে যেন দেবতা বানানো না হয়।... যারা পরিচালিত হবে, তাদের এর জন্য বাধ্য করা চলবে না। নায়ক নির্বাচনের সুযোগ তাদের থাকা চাই! আমার বিশ্বাস আনুগত্য আদায় করার স্বৈরতন্ত্রী প্রথা শীঘ্রই কলুষিত হয়। কারণ হিংসাশক্তি সর্বদাই নিম্নস্তরের নীতিজ্ঞানবিশিষ্ট লোকেদের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করে এবং এ কথা আমি এক অনিবার্য বিধান বলে বিশ্বাস করি যে, প্রতিভাশালী স্বৈরতন্ত্রীদের উত্তরসাধকেরা অপদার্থ হয়ে থাকে। এই কারণে আজকের ইটালী ও রাশিয়ায় যে ব্যবস্থা চলেছে, আমি তার চিরকালের বিরোধী।"

গান্ধীর "অযান্ত্রিকতা" তাঁকে প্রগতিবিরোধী আখ্যা দেবার আর একটি কারণ। মানবদরদী গান্ধীর এক প্রচণ্ড অপরাধ এই যে, যন্ত্রের এই অন্ধ উপাসনার দিনে তিনি মানুষকে যন্ত্রদেবতার পদতলে নির্বিচারে বলি দেবার প্রথার বিরোধিতা করার মত স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যন্ত্র মানুষের জন্য, মানুষ যন্ত্রের জন্য নয়। এই কারণে "বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি"-গর্বে মত্ত হয়ে আমরা গান্ধীকে বাতিল করেছি। কিন্তু অতীব বিস্ময়ের কথা এই যে, সর্বকালের বৈজ্ঞানিকদের ভিতর প্রথম পঙক্তিতে যাঁর স্থান—সেই আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানীর চোখেও যন্ত্রের এই অমানুষিক রূপ ধরা পড়েছিল। গান্ধীর মত তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে যন্ত্রের বিবেকহীন আরাধনার ফলে সমাজে মানবীয় মূল্যবোধের ক্রমাপহ্নব হচ্ছে। তিনি তাই স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন: "আমার মতে বর্তমানে অবনতির যে লক্ষণ পরিদৃষ্ট হচ্ছে, তার মূলে আছে শ্রমশিল্প ও যন্ত্রের বিকাশজনিত জীবন-সংগ্রামের অভূতপূর্ব তীব্র রূপ। এর ফলে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হচ্ছে।" যন্ত্র মানুষের সেবক হবে—এই মৌলিক বিশ্বাসচালিত হয়েই গান্ধী বলতেন যে তিনি সর্বপ্রকারের যন্ত্রের বিরোধী নন। কারণ তাঁর চরখা বা ঘানি ইত্যাদি যা কিছু মানুষের হাত দুটির পরিপূরক তাও তো যন্ত্র। যন্ত্র গান্ধীও চাইতেন, তবে শর্ত এই যে তা যেন মানুষের প্রভু

না হয়ে বসে। অর্থাৎ যান্ত্রিক কুশলতার দোহাই দিয়ে মানুষের মৌল স্বাধীনতাকে গুটিকয়েক বিশেষজ্ঞের কাছে বলি দেওয়া চলবে না। এই সব যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হলেও এবং সে রাষ্ট্র পূর্ণমাত্রায় সমাজতন্ত্রী হলেও মুষ্টিমেয় পরিচালক ও বিশেষজ্ঞদের এই অমিত ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় না। তাই মানবজীবনের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৃত্য—উৎপাদন ক্রিয়াকে অহেতুক জটিল ও কেন্দ্রিত করে মানবকে যন্ত্রে পরিণত করা চলে না। আইনস্টাইনের এতদ্‌সম্বন্ধীয় বিচারধারাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে: "কেন্দ্রিত উৎপাদন ব্যবস্থা আজ এদেশের অল্প কয়েকজন নাগরিকের হাতে অমিত উৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্ট পুঁজি পুঞ্জীভূত করেছে। এই ক্ষুদ্রায়তন ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী দেশের যুবশক্তিকে শিক্ষাদানরত প্রতিষ্ঠানাবলী এবং বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রগুলির উপর অত্যধিক কর্তৃত্ব করতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে সরকারের উপরও এদের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। কেবল এইটুকুই জাতির বৌদ্ধিক স্বাধীনতার বিকাশের পথে গুরুতর বাধাস্বরূপ।......অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ওই মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ইতিপূর্বে একরকম স্বৈরতন্ত্রী ছিল ও তারা তাদের কার্যকলাপের জন্য কারও কাছে দায়ী ছিল না। তারা এখন জনগণের কল্যাণার্থ তাদের উপর প্রযুক্ত বিধিনিষেধের তীব্র বিরোধিতা করছেন। এই ক্ষুদ্রকায় গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের আয়ত্তাধীন যাবতীয় বৈধানিক প্রক্রিয়ার শরণ নিচ্ছে। এদেশে জন-জীবনের সুষ্ঠু ও শান্তিময় বিকাশের জন্য এই সমস্যা সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান আহরণ করা তরুণ সম্প্রদায়ের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা যে বিদ্যানিকেতনসমূহ ও সংবাদপত্রের উপর তাঁদের অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে তরুণ সম্প্রদায়কে এ সম্বন্ধে অচেতন রাখবেন—এতে আর বিস্ময়ের কি আছে?" গান্ধীর কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল প্রয়োজন বিধায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করারও স্বাধীনতা। এর কমে সত্যকার স্বাধীনতা বোঝায় না। কিন্তু জনগণের নিত্যব্যবহার্য সকল উপকরণ যদি কেন্দ্রিত ব্যবস্থায় উৎপাদিত ও বণ্টিত হয় তা হলে কেন্দ্রিত ব্যবস্থার সঞ্চালকদের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই টুঁ শব্দ করা যাবে না। গান্ধীর সুরে সুর মিলিয়ে আইনস্টাইনও তাই বলছেন: "...যান্ত্রিক প্রগতি ও তজ্জনিত ক্রমবর্ধমান শ্রমবিভাজন প্রক্রিয়া ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন-এককে বিনষ্ট করে তৎস্থলে বৃহত্তর একক্ সৃষ্টিকে প্রোৎসাহিত করে। এবম্বিধ বিকাশের পরিণাম হচ্ছে ব্যক্তিগত পুঁজির স্বৈরতন্ত্র এবং এর প্রচণ্ড শক্তিকে এমন কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুসংগঠিত রাজনৈতিক সমাজের পক্ষেও কার্যকারী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এর কারণ হচ্ছে এই যে, বিধান-পরিষদের সদস্যগণ মূলতঃ পুঁজিপতিদের অর্থানুকূল্যে পুষ্ট বা তাঁদের দ্বারা অন্যভাবে প্রভাবিত রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত হন এবং এই সব পুঁজিপতি কার্যতঃ নির্বাচন-ক্ষেত্রকে বিধান-পরিষদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। এর পরিণামে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা জনসাধারণের অনগ্রসর অংশের স্বার্থ বাস্তবক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে রক্ষা করেন না। উপরন্তু বর্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংবাদ প্রাপ্তির প্রধান সূত্র সমূহ (সংবাদপত্র, বেতার ও শিক্ষা-ব্যবস্থা) নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং ব্যক্তিগত ভাবে কোন নাগরিকের পক্ষে কোন বিষয়ে বিষয়মুখ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে নিজ রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগ করা দুষ্কর এবং এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।" আর যন্ত্রের প্রবর্তন করার ফলে বেকার সমস্যার সমাধান হবে—এই যে অপর এক আধুনিক অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে গান্ধী সমগ্র জীবন সংগ্রাম করে গেলেন, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকপ্রবরের অভিমত কি? দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করেছেন: "অসংগঠিত অর্থব্যবস্থার আওতায় যদি যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার শরণ নেওয়া যায়, তা হলে তার পরিণামে উৎপাদন ক্রিয়ায় মানবসমাজের এক অংশের প্রয়োজন আর থাকবে না এবং এই ভাবে তারা আর্থিক সঞ্চালন-চক্রের (circulation) সম্বন্ধবিবর্জিত হয়ে পড়ে। অত্যধিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ, ক্রয়-ক্ষমতার অপহ্নব এবং শ্রমের মূল্য হ্রাস—এই হচ্ছে এর তাৎকালিক পরিণতি।" অন্যত্র তিনি বলেছেন: "অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের এই প্রক্রিয়ার পরিণামে এক অভিনব সমস্যা দেখা দিয়েছে। দেশের কর্মক্ষম শ্রমশক্তির একাংশ স্থায়ী বেকারত্বের করালগ্রাসে পতিত হয়েছে। যন্ত্রকৌশলের প্রগতি সকলের জন্য কর্ম-সংস্থানের সমাধান করার পরিবর্তে প্রায়ই অধিকতর মাত্রায় বেকার সৃষ্টি করে।"

বিজ্ঞান ও যন্ত্রকৌশলের অমিত প্রগতির ফলে আজ অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্রযন্ত্র প্রচণ্ডভাবে কেন্দ্রীকরণের অভিমুখে চলেছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই চারিত্রধর্ম প্রকাশ্য স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রব্যবস্থারই মত সাম্যবাদী রাষ্ট্র এবং এমন কি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও লোককল্যাণকারী রাষ্ট্রেও পরিদৃশ্যমান। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা আজ বহুলাংশে খর্ব এবং পূর্বোক্ত কারণে বিশ্বশান্তিও আজ বিঘ্নিত। মানুষকে ক্রমশ: অধিকাধিকমাত্রায় কেন্দ্রিত শাসনের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হচ্ছে এবং এই দাসত্বকে এক-একটি গালভরা আদর্শের নাম দিয়ে গৌরবমণ্ডিত করার প্রচেষ্টা চলেছে। মানবীয় বিবেক এবং ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ আজ হয় সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ আর নচেৎ সর্বহারার একনায়কত্ব-রূপী আন্তর্জাতিক ক্ষমতাদম্ভের বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত।

যখন যে অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী শাসনযন্ত্রের পরিচালকের আসনে আসীন থাকেন, তাঁরা নিজেদের ক্ষমতালোলুপ অভিসন্ধিকে জনসাধারণের ইচ্ছারূপে প্রচার করে নিজেদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ করার জন্য সর্বসাধারণের আনুগত্য আদায় করেন। আইনস্টাইন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে এ যুগের সমস্যা আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছেন: "বিগত কয়েক শতাব্দীতে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রে জন-জীবনের উপর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের পরিমাণ প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রে ক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক প্রযুক্ত হোক অথবা পশুচিত অত্যাচারসহকারে এর প্রয়োগ হোক—উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব সমভাবে অমিত বলশালী হয়ে উঠেছে। মুখ্যতঃ আধুনিক শ্রমশিল্প ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ও একত্র সন্নিবিষ্ট হওয়ায় রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভিতর পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ ও বিধিবদ্ধ সম্বন্ধ বজায় রাখার কার্য ক্রমশঃ অধিকাধিকমাত্রায় জটিল ও বহু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। নাগরিকদের বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে ত্রাণ করার জন্য আধুনিক রাষ্ট্রের এক ভীষণভাবে সজ্জিত নিত্য সম্প্রসারণশীল সৈন্য-বিভাগ প্রয়োজন। এতদ্‌ব্যতিরেকে দেশবাসীদের যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া রাষ্ট্র তাঁর অবশ্য কর্তব্যরূপে বিবেচনা করে। এই 'শিক্ষা' কেবল যুব-সমাজের আত্মা ও চৈতন্যকেই কলুষিত করে না, এর ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের মনোবৃত্তিও ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। কোন দেশ এই বিকারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। এমন কি যেসব দেশের অধিবাসীদের ভিতর কোন রকম সুস্পষ্ট আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তি নেই, তাদের মনেও এর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্র আজ দেব-বিগ্রহের স্থান নিয়েছে এবং অত্যন্ত স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি এর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতময় শক্তির হাত এড়াতে পারে।" আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনসাধারণের পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে কর্তব্য নির্ধারণের উপায় নেই বললেই চলে। সমাজবাদ এবং পরিকল্পনা-চালিত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে যাঁরা প্রচার করেন, আইনস্টাইন তাঁদের সঙ্গে সহমত ছিলেন না। গান্ধীরই মত পশ্চিমের সমাজবাদের মৌলিক ত্রুটি আইনস্টাইনের চোখে ধরা পড়েছিল বলে তিনি বলেছিলেন: "অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, পরিকল্পনা-চালিত অর্থব্যবস্থামাত্রেই সমাজবাদ নয়। পরিকল্পনা-চালিত অর্থব্যবস্থা হয়তো ব্যক্তি-মানবকে সম্পূর্ণভাবে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কতিপয় অত্যন্ত দুরূহ সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের উপর সমাজবাদের সাফল্য নির্ভর করছে। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার সুদূর-প্রসারী কেন্দ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে আমলাতন্ত্রকে সর্বশক্তিমান ও আত্মম্ভরি হওয়া থেকে নিবৃত্ত রাখা যায়? ব্যক্তি-মানবের অধিকার কিভাবে রক্ষা করা যায় ও কিভাবে আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার ভারসাম্য রচনাকল্পে পাল্লার অপর দিকে ব্যক্তির অধিকাররূপী গণতান্ত্রিক বাটখারা চাপান যায়?" গান্ধীর সর্বোদয় পরিকল্পনা আইনস্টাইনের এই যুগোপযোগী মহা-জিজ্ঞাসার একমাত্র উত্তর। বিকেন্দ্রিত অর্থব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিকেন্দ্রিত রাজ্য-ব্যবস্থা (অথবা সমাজ-ব্যবস্থা বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত) রচনা করার প্রস্তাব করে গান্ধী এই বিপজ্জনক পরিস্থিতির মূলে কুঠারাঘাত করার আয়োজন করেছিলেন। এবং এতদ্‌সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের হাতে যেটুকু ক্ষমতা থেকে যাবে, তার দুরুপযোগ থেকে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অসহযোগ বা সত্যাগ্রহ ছিল গান্ধীর আয়ুধ। বস্তুতঃ আধুনিক যুগের সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের হাত থেকে জনসাধারণের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করার এবং কর্তৃপক্ষকে দুর্নীতিপরায়ণ হতে না দেবার শ্রেষ্ঠতম উপায়ের প্রবর্তক হিসাবে সর্বকালের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারীদের শিরোমণি হিসাবে গান্ধীজীর নাম এইজন্য মানব-স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। গান্ধীরই মত আইনস্টাইন এ সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলে তাঁর মতে: "অস্ত্রসজ্জাকরণের এবং আমাদের শাসকবর্গের যুদ্ধবাজ মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম পরিহার করার পিছনে যে বিন্দুমাত্র যৌক্তিকতা নেই, তা বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনাপ্রবাহ আর একবার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।...আমার মতে এ অবস্থায় সজ্ঞানে যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আয়ুধ। এই জাতীয় বীর অসহযোগীদের নৈতিক ও ভৌতিক সহায়তা দানের জন্য প্রত্যেক দেশে সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এ সংগ্রাম বে-আইনী হবে নিশ্চয়; কিন্তু এ হবে শাসকশক্তির বিরুদ্ধে যথার্থ গণ-অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। সরকার তার নাগরিকদের দিয়ে ঘৃণ্য এবং অপরাধমূলক কাজ করিয়ে নিতে চাইলে এইভাবে তার প্রতিরোধ করতে হবে।" আরও এক স্থলে এই অভিমতের প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেছেন: "মানবীয় অধিকার বলতে আজ আমরা মুখ্যতঃ নিম্নলিখিত দাবি-গুলির প্রতি ইঙ্গিত করছি: মানুষের অধিকার হরণের জন্য ব্যক্তিবিশেষ বা সরকারের স্বেচ্ছাচারমূলক ক্রিয়া-কলাপের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা,...আলোচনা এবং মত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা, রাষ্ট্র-পরিচালন ব্যাপারে ব্যক্তির যথোচিত অধিকার। এই সকল মানবীয় অধিকার আজ কাগজে-কলমে স্বীকৃত। তবে মাত্র এক-পুরুষ কাল পূর্বের তুলনায় আজ এ সব অধিকার বহুবিধ নিয়মতান্ত্রিক ও বৈধানিক বিধিনিষেধের বেড়াজালে ভীষণ-ভাবে বিড়ম্বিত। আর একটি মানবীয় অধিকার রয়েছে,

যার কথা খুব বেশী উল্লিখিত না হলেও ভবিষ্যতে এই অধিকারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে অনুমিত হয়। এর নাম হচ্ছে অসহযোগ করার অধিকার বা কর্তব্য। সৈনিক হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করাকে এই তালিকার শীর্ষে স্থান দিতে হবে।" আইনস্টাইনের অসহযোগ সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ পরিণত হতে থাকে এবং অবশেষে জীবন-সায়াহ্নে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন: "সত্য কথা বলতে কি, আমি গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগের বৈপ্লবিক পন্থা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখি না। যে কোন বুদ্ধিজীবীকে এই সব সাক্ষ্য-কমিটির (আমেরিকার তদানীন্তন ম্যাকার্থীবাদী কমিটিসমূহ) কাছে হাজির হতে বলা হোক না কেন, তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করবেন। অর্থাৎ তাঁকে কারাবরণ করতে এবং বৈষয়িকক্ষেত্রে উৎসন্নে যাবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সংক্ষেপে তাঁকে নিজ দেশের সাংস্কৃতিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত মঙ্গল বলি দিতে হবে।"

এ কথা উল্লেখ করাই বোধ হয় বাহুল্য যে গান্ধীরই মত আইনস্টাইন নৈতিক যুদ্ধবিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে: "যুদ্ধ আমার কাছে এক হীন ও নক্কারজনক ব্যাপার বলে মনে হয়। এ রকম ঘৃণ্য ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার চেয়ে আমি বরং ধরাপৃষ্ঠ থেকে আত্মবিলোপ করা কাম্য মনে করি।" কিন্তু মানবজাতি এই সব উচ্চকোটির নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রের পথিকৃৎদের নিষেধবাণী অগ্রাহ্য করে পুনঃ পুনঃ আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এজন্য তিনি কি নৈরাশ্য বোধ করতেন? গান্ধীর মত তিনিও ছিলেন এক্ষেত্রে চরম আশাবাদী। শত বিরূপ পরিস্থিতিও যেমন কর্মযোগী গান্ধীর মনে নৈরাশ্যের ছায়াপাত করতে পারে নি এবং হিংসা ও স্বার্থের মহা সংবর্তের মধ্যেও গান্ধী যেমন মানুষের উপর আস্থা হারান নি, আইনস্টাইনও তেমনই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিলমাত্র সংশয় প্রকাশ না করেই ঘোষণা করেছিলেন: "এ সব সত্ত্বেও মানবজাতি সম্বন্ধে আমার অভিমত এত উচ্চ যে, আমি বিশ্বাস করি যে বিভিন্ন জাতির সুবুদ্ধি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংবাদপত্র দ্বারা ধারাবাহিকভাবে বণিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের ধারক ও বাহক দল কর্তৃক দূষিত না হলে বহু পূর্বেই এ দানব অদৃশ্য হত।" কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় কি? "War to end War"-এর শোচনীয় ব্যর্থতা আমরা বার বার দেখেছি। গান্ধী তাই বলতেন যে ফাঁকি দিয়ে যুদ্ধবন্ধরূপী মহৎ লক্ষ্যের পরিপূর্তি সম্ভব নয়। যুদ্ধ বন্ধের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। অস্ত্রসজ্জা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে, নচেৎ বিশ্বশান্তির আশা পোষণ করা আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান বিশ্বে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র এই আত্মবঞ্চনার খেলায় মত্ত, একে অপরকে ... এই কথা বলছে যে অপর পক্ষ যদি প্রথমে অস্ত্রসজ্জা সংবরণ করে তবে তারাও পরে অনুরূপ করবে। গান্ধী এ পদ্ধতির অন্তঃসারশূন্যতার কথা প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন বলে শান্তিকামীকে এক পক্ষীয় (unilateral) অহিংসার নীতি গ্রহণ করে অপরে কি করল বা না করল, তার কথা চিন্তা না করে প্রথমে নিজেকে অস্ত্রসজ্জা মুক্ত হবার পথ নির্দেশ করেছিলেন। গান্ধীর অভিমতকে আমরা অবাস্তব আখ্যা দিয়ে নস্যাৎ করার চেষ্টা করলেও আইনস্টাইনও ঠিক একই রকম অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন। তাঁর কথায় বলতে গেলে: "মারণাস্ত্রের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধ পরিচালনায় কিছু বিধিনিষেধ রচনা দ্বারা মানুষ যুদ্ধের ভয়াবহতা হ্রাস করতে চায়। কিন্তু যুদ্ধ তো আর ক্রিকেট খেলা নয় যে এর খেলোয়াড়রা মনেপ্রাণে খেলার নিয়ম মেনে চলবে। যেখানে জীবনমরণ নিয়ে প্রশ্ন, সেখানে নিয়ম বা প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব কোথায় ভেসে যায়। কোনরকম ফল পেতে হলে যাবতীয় যুদ্ধবিগ্রহকে সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করতে হবে।" প্রত্যেক রাষ্ট্র-পরিচালকই বলে থাকেন যে, তাঁদের সৈন্যবাহিনী নিছক আত্মরক্ষার জন্য, কারণ তাঁদের মনে কোনরকম আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি নেই। জনসাধারণের সামনে এই ভাবে কথার জাল বুনে জাতীয় সামরিক ব্যবস্থা ও সমরায়োজনকে গৌরবমণ্ডিত করা হয়ে থাকে। গান্ধী কোনদিনই এ জাতীয় "সোনার পাথরবাটি"-তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না এবং গান্ধীর মত আইনস্টাইনও চাইতেন যে এক ধাক্কায় নিরস্ত্রীকরণ করতে হবে। তিনি সেইজন্য প্রথম মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখার পর ঘোষণা করেছিলেন: "যতদিন যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকবে, বিভিন্ন জাতিগুলি ততদিন পরবর্তী যুদ্ধে বিজয়ী হবার মানসে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে প্রস্তুত থাকার উপর জোর দেবে। সুতরাং দেশের যুবকদের যুদ্ধসম ঐতিহ্যে দীক্ষিত করা এবং তাদের ভিতর সঙ্কীর্ণ জাতীয় অহমিকা ও তৎসহ রণলিপ্সু মনোবৃত্তির গুণগানের স্বভাব সৃষ্টি করার প্রয়াস এড়ান অসম্ভব হবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় বিধায়ে ওই রকম অবস্থার জন্য দেশবাসীর ভিতর এই জাতীয় মনোবৃত্তি গড়ে তোলা হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ছাড়া গতি নেই। অস্ত্রে সজ্জিত হবার অর্থই হচ্ছে শান্তির জন্য নয়, যুদ্ধের প্রস্তুতি করা ও তার সপক্ষে রায় দেওয়া। সুতরাং জনসাধারণ কখনই ধাপে ধাপে নিরস্ত্রীকরণের আদর্শে উপনীত হবে না। হয় তারা এক ধাক্কায় নিরস্ত্র হবে, আর নচেৎ মোটেই হবে না।" জীবনের প্রায় সায়াহ্নে উপনীত হয়ে (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি যুদ্ধরূপী মানবসমাজের চূড়ান্ত মূঢ়তার স্বরূপ উপলব্ধি করে তার সমাধানের জন্য এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শান্তিকামী গান্ধীর মহত্ত্ব ও তাঁর পন্থার শ্রেষ্ঠত্ব পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি

বুঝতে পেরেছিলেম যে, বিশ্বকে কেবল যুদ্ধের অকার্যকারিতার কথা বললেই হবে না, মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও স্বার্থসংঘাত নিরসনের জন্য তাদের হাতে যুদ্ধের বিকল্প কোন আয়ুধ তুলে দিতে হবে এবং এক্ষেত্রে গান্ধী সর্বযুগে অদ্বিতীয়। কেবল অহিংসার তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেই গান্ধী ক্ষান্ত হন নি। যাবতীয় মানবীয় বিবাদ ও সংঘর্ষের সমাধানকল্পে তিনি মানবসমাজের কাছে তাঁর আত্মশক্তিমূলক সত্যাগ্রহ মন্ত্রের চমৎকারিত্ব প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দ্বারা দেখিয়ে দিয়েছেন। গান্ধী-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের মার্গ সর্বযুগে সর্বাবস্থায় মানবসমাজের আভ্যন্তরীণ এবং গোষ্ঠীগত হিংসার অবসানক্ষম এক বিধায়ক (positive) আবিষ্কার। সেইজন্য বিশ্বকে সম্বোধন করে আইনস্টাইন কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন: "যুদ্ধের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং যুদ্ধরূপী বিপদসম্ভাবনার নিরাকরণ করতে পারলে তবে স্বস্তিলাভ হতে পারে। যুদ্ধ নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিত। কেউ যেন এরূপ অবস্থা স্বীকার না করেন, যাতে এই উদ্দেশ্যের বিপরীতমুখী কোন কর্ম-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে বাধ্য হতে হয়।......আমাদের যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক প্রতিভাযুক্ত মনীষী গান্ধী আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন। সত্য পথ পেয়েছি বুঝলে মানুষ কতখানি ত্যাগের অর্ঘ্য নিয়ে উপস্থিত হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দেখিয়েছেন। অটুট বিশ্বাসকে আশ্রয় করে মানুষের ইচ্ছা বাস্তবতঃ অজেয় এবং বাস্তব ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে জয়ী হতে পারে—ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টায় তাঁর কার্য এরই জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে।"

নব সমাজ রচনার জন্য নবীন মানুষ গান্ধীর কাছে অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা বলে বিবেচিত হত। আর নূতন মানুষ সৃষ্টির জন্য প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি যে অকার্যকারী—এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। কারণ নবীন সমাজের নাগরিকদের মানসিক গঠন নির্মাণোপযোগী নব মূল্যবোধ সৃষ্টি করার ক্ষমতা প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নেই। গান্ধী তাই বনিয়াদ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়ার জন্য তাঁর বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা দেশবাসীর কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী শিক্ষাবিশেষজ্ঞ নন বলে আমরা তাঁর পাঠ্যপুস্তকস্তূপ পরিহারকারী উৎপাদনমূলক শ্রমভিত্তিক শিক্ষা-ব্যবস্থাকে অবৈজ্ঞানিক অভিধায় ভূষিত করে বাতিল করে দিয়েছি। কিন্তু আইনস্টাইনকে নিশ্চয় শিক্ষাশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বলা চলে না। তাঁর সমগ্র জীবন শিক্ষাদানের জন্যই উৎসর্গীকৃত ছিল এবং শিক্ষাদান কার্যের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিক্ষার মৌলিক আদর্শ ও তার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তার সঙ্গে গান্ধীর আদর্শের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাঁর মতে: "কখনও কখনও দেখা যায় যে বিদ্যালয় তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতর সর্বোচ্চ পরিমাণ জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়ার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা ঠিক নয়। জ্ঞান প্রাণের অস্তিত্ববিহীন; অথচ বিদ্যালয় জীবিতদের সেবা করে। সর্বসাধারণের মঙ্গলকর গুণাবলী এবং কর্মক্ষমতা নবীনবয়স্ক ব্যক্তি-মানবের ভিতর সৃষ্টি করাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য হবে। তবে আমার বক্তব্যের লক্ষ্য এই নয় যে প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্যের বিলোপসাধন করে ব্যক্তিকে শুধু মধুমক্ষিকা বা পিপীলিকার মত সমাজের হস্তধৃত আয়ুধে রূপান্তরিত করতে হবে। কারণ ব্যক্তিগত অভিনবত্ব ও ব্যক্তিগত লক্ষ্যবিবর্জিত ছাঁচে ঢালা ব্যক্তিগোষ্ঠীর সমবায়ে রচিত সমাজ নিঃসন্দেহে দুর্বল হবে এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও তিরোহিত হবে। পক্ষান্তরে আমাদের আদর্শ হবে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কার্যকরণক্ষম ব্যক্তি-মানবের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এরা অবশ্য সমাজ-সেবাতেই জীবনের চরমোৎকর্ষের ইঙ্গিত পাবে।" কিন্তু তরুণ-সমাজকে এই শিক্ষা দেবার উপায় কি? গান্ধীরই মত এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে: "শিক্ষকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দ্বারাই তরুণ সম্প্রদায়ের ভিতর মূল্যবান সব কিছু সংক্রামিত করা হয়। পাঠ্যপুস্তকের স্থান এখানে নেই বললেও চলে, থাকলেও অতীব গৌণ। মূলতঃ এই হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান এবং এর ফলেই সংস্কৃতি সংরক্ষিত হয়। আমি যখন বলি যে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র নীরস এবং বিশিষ্ট জ্ঞানের পরিবর্তে 'মানবতা'-বোধের উৎকর্ষ সাধন করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তখন আমার মনে পূর্বোক্ত ভাবধারা ক্রিয়া করে।" শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আর এক স্থানে তিনি বলছেন: "শিক্ষাদানের এক মাত্র যুক্তিযুক্ত পন্থা হচ্ছে স্বয়ং উদাহরণ হওয়া। তবে কেউ যদি নেহাৎ সামলাতে না পারেন, তবে তিনি যেন অন্ততঃ এমন উদাহরণ হন, যাঁকে দেখে অপর সকলে সতর্ক হবে।" বিজ্ঞানগুরুর পরিহাসটুকু নিশ্চয় উপভোগ্য। গান্ধী শিক্ষাক্ষেত্রে স্বতন্ত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী কোন ছাঁচে ঢালা শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল না বলে তিনি তাঁর বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনায় শিক্ষককে অসীম স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। গান্ধীর এই অভিমতের প্রতিধ্বনি শোনা যায় আইনস্টাইনের নিম্নোক্ত উক্তিতে। তাঁর মতে: "এই রকম বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজ পদে নিযুক্ত একপ্রকার শিল্পী হতে হবে। এই মনোভাব বিদ্যালয়ে পরিব্যাপ্ত করার জন্য কি করা উচিত? মানুষকে সুস্থ রাখার যেমন কোন সর্বমান্য পদ্ধতি নেই, তেমনই এই কার্য-সাধনের উপযোগী কোন বিশ্বজনীন নিয়ম নেই। তবে কয়েকটি শর্ত আছে এবং সেগুলিকে পালন করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, শিক্ষকদের এই জাতীয় বিদ্যালয়ের স্বচ্ছ-ছায়ায় গড়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষণীয় বিষয় এবং

শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষককে অবাধ স্বাতন্ত্র্য দিতে হবে। কারণ বাইরের চাপ ও দণ্ডশক্তি যে তার কার্যের আনন্দ নষ্ট করে দেয়—এ কথা শিক্ষকদের বেলায়ও সমধিক সত্য।" গান্ধীর কাছে স্বাধীনতা অবিভাজ্য বস্তু ছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে, কিন্তু সামাজিক বা আর্থিক স্বাধীনতা থাকবে না; অথবা শাসকদের স্বাধীনতা থাকবে অথচ জনগণের স্বাধীনতা কোন গালভরা আদর্শের অজুহাতে খর্ব করা হবে—এ অবস্থা গান্ধীর কাছে অকল্পনীয়। সুতরাং গান্ধী শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসী ছিলেন। গান্ধী-পরিকল্পিত বনিয়াদী বিদ্যালয় তাই ছাত্রদল ও শিক্ষকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতায় পরিচালিত এক সমবায়-মূলক জীবনক্রম। আইনস্টাইনের কাছে আদর্শ শিক্ষা-নিকেতনও অনুরূপ স্বাধীনতার পীঠভূমি। তাঁর কথায় বলতে গেলে: "নীতিগত ভাবে, আমার কাছে কোন বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা জঘন্য বস্তু হচ্ছে ভয়, বলপ্রয়োগ এবং কৃত্রিম কর্তৃত্বের চাপে কাজ করা। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে ছাত্রদের সুস্থ ভাবাবেগ সততা এবং আত্মপ্রত্যয় বিনষ্ট হয়। এর পরিণামে আজ্ঞাতন্ত্রের বশম্বদ প্রজা সৃষ্টি হয়। জার্মানি ও রাশিয়াতে যে এই জাতীয় শিক্ষায়তন প্রচলিত, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।" উৎপাদনমূলক শরীর-শ্রমকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করার জন্য গান্ধীকে গোঁড়া শিক্ষাশাস্ত্রীদের বহু বিদ্রূপবাণ সহ্য করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানাচার্য এবং সর্বজনমান্য শিক্ষাবিদ্ আইনস্টাইনের সঙ্গে গান্ধীর অভিমতের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। কর্ম-কেন্দ্রিক শিক্ষা সম্বন্ধে আইনস্টাইন বলছেন: "এইজন্য যে শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রকে প্রত্যক্ষ ভাবে কাজ করতে হয়, তা-ই সর্বকালে সর্বাপেক্ষা মহত্বপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি বলে স্বীকৃত হয়েছে। শিশুর হাতে-খড়ি থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হবার জন্য থিসিস দাখিল করা পর্যন্ত বা কোন কবিতা মুখস্থ করা থেকে আরম্ভ করে সঙ্গীত রচনা, ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ অথবা গণিতের কোন সমস্যা সমাধান করা বা শরীর চর্চা করা—সর্বত্রই এই নীতি প্রযোজ্য।" উভয়ের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় বিচারধারায় এত বেশী ঐক্য ছিল যে, আইনস্টাইনের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিকে অক্লেশে গান্ধীর অভিমত বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। আইনস্টাইন বলছেন: "আদর্শ শিক্ষার জন্য তরুণ সমাজের ভিতর স্বাধীন ও তথ্যনির্দেশ নিপুণ চিন্তাশক্তির বিকাশ হওয়া অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন ও বহুমুখী বিষয়ের গুরুভারে পূর্বোক্ত শক্তির বিকাশ ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়ে থাকে। গুরুভারের ফলে স্বভাবতঃই পল্লবগ্রাহীতার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাদান কার্য এমন হওয়া উচিত, যাতে ছাত্রকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হয়, তা যেন সে বহুমূল্য উপহার বলে মনে করে। এ যেন কঠোর কর্তব্য বলে প্রতীত না হয়।" গান্ধী তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী জন-জীবনে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য পুনঃ পুনঃ এই কথাই কি বলেন নি?

বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ রয়েছে কি? গান্ধীরই মত আইনস্টাইন এ কথা বিশ্বাস করতেন না। কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন: "যদিচ দেখা যাচ্ছে যে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পরস্পর থেকে পৃথক করে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তথাপি এতদুভয়ের মধ্যে গভীর অন্যোন্য সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা বিদ্যমান। ধর্ম হয়তো মানবজীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করে, কিন্তু তা হলে বিজ্ঞানের (এখানে এর উদারতম অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হল) কাছ থেকে ধর্মকে তৎনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার পন্থা সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান শুধু তাদের পক্ষেই সৃষ্টি করা সম্ভব, যারা সত্য এবং ধী লাভের আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ ভাবে জড়িত। অবশ্য অনুভূতির এই উৎসের গোমুখী রয়েছে ধর্মের এলাকায়। এর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে এই সম্ভাবনার প্রতি আস্থা যে, এই জীবনময় জগৎকারণ যুক্তিসম্মত—অর্থাৎ যুক্তিদ্বারা বোধগম্য। পূর্বোক্ত বিশ্বাসে ওতপ্রোত না হলে কেউ যথার্থ বৈজ্ঞানিক হতে পারেন বলে আমি ধারণা করতে পারি না।" আইনস্টাইনের মতে বিজ্ঞানের অহেতুক অহঙ্কার ও সর্বজ্ঞ ভাব এবং ধর্মের অনাবশ্যক গোঁড়ামী ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশের অভ্যাস যদি বর্জন করা যায়, তবে শুদ্ধরূপে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরের পরিপূরক। আইনস্টাইন কোন মানব-প্রকল্প ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলেও নাস্তিক ছিলেন না। এক শুভ ও কল্যাণশক্তিকে তিনি জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করতেন। তাঁর মতে: "আমাদের বোধাতীত এক সত্তার অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং এই বিশ্বে যুক্তির সূক্ষ্মতম বিকশিত রূপ ও সুন্দরতমের যে চির নিত্য অভিপ্রকাশ চলেছে, তার ধারণার পরিমাপ চলে শুধু আমাদের যুক্তি-পদ্ধতির প্রাথমিক পর্যায়ে। এই অনুভূতি এবং এই আবেগই খাঁটি ধর্মীয় আচরণের ভিত্তিমূল। এই অর্থে, মাত্র এই অর্থেই আমি গভীর ধর্মবিশ্বাসী।" গান্ধীকেও প্রচলিত অর্থে আস্তিক বলা চলে না। তাঁর আস্তিক্য ভাবনা আরও উচ্চস্তরের। সেইজন্যই তিনি এ কথা বলার মত দুঃসাহস প্রকাশ করতে পেরেছিলেন যে সত্যই ভগবান। গান্ধী কোন বিশেষ আচার প্রথা বা মতবাদের দাস ছিলেন না। হিন্দুসমাজে জন্মগ্রহণ করলেও এবং নিজে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব হলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মেরই ছিলেন। কারণ তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে সকল ধর্মের মূল—নৈতিকতার ঐক্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আইনস্টাইনও ছিলেন এই নীতিধর্মের উপাসক। এই নৈতিক ধর্মের অভাবে মানব জাতি কি ভাবে আত্মধ্বংসী বিনষ্টির পথে এগিয়ে যাচ্ছে

এ ব্যাপার আইনস্টাইন ও গান্ধী উভয়েরই নজরে পড়েছিল। গান্ধী তাই জীবনকে পরস্পর সম্বন্ধবিবর্জিত কতকগুলি কুঠরিতে ভাগ করার নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসকে মূল নিরিখ বলে গ্রহণ করানোর জন্য তিনি আয়ুষ্কালের শেষ দিন পর্যন্ত চেষ্টা করে গেছেন। গান্ধীর ধর্ম-ভাবনা এত প্রবল ছিল যে তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে এ কথা ঘোষণা করতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পরমারাধ্য—স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য যদি ধর্মের পথ ছাড়তে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় তাঁর প্রয়োজন নেই। আইনস্টাইনের কাছে গান্ধীরই মত জাতীয়তাবাদ বা স্বদেশপ্রেমের স্থান ধর্মের নীচে। তাই তিনিও বলেছিলেন: "যথার্থ গণতন্ত্রপ্রেমী তার নিজ জাতিকে ততটুকু মাত্র পূজা করতে পারে, যতটুকু একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব।" সত্যকার ধর্মের মূল এই নীতিবোধ মানবসমাজের ভিতর প্রতিষ্ঠা করার জন্য গান্ধীরই মত আইনস্টাইন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতর ধর্মীয় শিক্ষা-প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাতে বিশ্বাস করতেন। সেকুলারইজমের যুগে ধর্মকে অবজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ আমরা ভুলে যাই যে সেকুলার মানে ধর্মবিহীন রাষ্ট্রব্যবস্থা নয়। এর অর্থ হচ্ছে, কোন্ এক বিশেষ ধর্মমতকে অনুচিত সরকারী আনুকূল্য না দেওয়া। নচেৎ কেবল গান্ধীর মত ধর্মভীরু জননায়কই নয়, আইনস্টাইনের মত বৈজ্ঞানিকও কেন বলতেন যে, "নৈতিক এবং কান্তি-বিস্তার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করা লক্ষ্য হিসাবে বিজ্ঞান অপেক্ষা কলার অধিকতর সন্নিকটবর্তী। অবশ্য অপরাপর মনুষ্যের প্রতি সংবেদনা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তবে এই সংবেদনা তখনই সার্থক হয়, যখন অন্যের সুখেদুঃখে সহানুভূতিসূচক আচরণ দ্বারা তা বিধৃত হয়। কুসংস্কার থেকে বিশোধন করলে ধর্মের যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তা হচ্ছে এই অতীব মহত্বপূর্ণ নৈতিক আচরণের অনুশীলন। এই অর্থে ধর্ম শিক্ষা-ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম অতি অল্পমাত্রায় স্বীকৃতি পায় এবং যেটুকু পায় তাও বিধিবদ্ধ নয়।·· ···আমাদের সভ্যতা ধর্মের প্রতি এই রকম উপেক্ষা প্রকাশ করে যে পাপ করেছে, তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থার আতঙ্কজনক উভয়সঙ্কটের ভিতর। 'নীতিশাস্ত্রের অনুশীলন' ব্যতিরেকে মানুষের মুক্তির নান্য পন্থা।"

মানব-সভ্যতা আজ এক বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন। যে বিজ্ঞানের অনুশীলন করার ফলে আদিম বর্বরতা থেকে আমরা বর্তমান সভ্যতার রাজপুরীতে উপনীত হয়েছি, আজ সেই বিজ্ঞানই এক সর্বগ্রাসী দানব রূপে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি তো বটেই, এমন কি তার দৈহিক অস্তিত্বকেও ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত করে দেবার উদ্যোগ করছে। মনুষ্য প্রজাতি এবং মানব-সভ্যতাকে এই ভয়াবহ সঙ্কট থেকে ত্রাণ করার উপায় কি? বিজ্ঞান এবং হিংসার কাল-পরিণয়বন্ধন ছিন্ন না করলে বিপন্ন মানবতার যে মুক্তি নেই, এ কথা এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহামানব তাঁর আর্ষদৃষ্টির প্রসাদে দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাঁর ধ্যানলব্ধ বাণী তিনি নিঃসঙ্কোচে বিশ্বকে শুনিয়ে গিয়েছিলেন। গান্ধীকে বিজ্ঞানবিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁর মত ও পথকে নস্যাৎ করে মানবতার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন করার কাজে বর্তমান যুগ পটুতা দেখালেও গান্ধী কিন্তু কখনও বিজ্ঞানকে হিংসার হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টায় ক্ষান্ত দেন নি। বিংশ শতাব্দীতে যে স্বল্প কয়েকজন মনীষী মানব-সভ্যতার প্রতি গান্ধীর এই অমূল্য অবদানের চিরকালীন মহত্বের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নিজকালের কাছ থেকে সক্রেটিসরা চিরকালই হ্যামলক পেয়ে থাকেন এবং যীশুরা পান ক্রুশ। তবু মুষ্টিমেয় কয়েকজন জ্ঞানী নবযুগ-প্রবর্তক মহামানবদের চিনতে পারেন এবং প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধিতা করেও তাঁরা নবযুগ-স্রষ্টাদের দ্বারা উপলব্ধ সত্যের জয়গান বিষাণ রবে করে যান। কারণ এই সব মহাজ্ঞানীদের হৃদয়তন্ত্রী মহামানবদের চিত্তবীণার সঙ্গে একই সুরে বাঁধা থাকে। বর্তমান বিশ্বের সঙ্কট আইনস্টাইনের কাছেও মনোবেদনার কারণ হয়েছিল। মানবতাবাদী এই জ্ঞানবৃদ্ধ বিজ্ঞানী দেখেছিলেন যে প্রেম ও অহিংসা ব্যতিরেকে এই প্রবল হিংসাপ্রবাহ থেকে মানব-সভ্যতাকে রক্ষা করা যাবে না। বর্তমান বিশ্বের বিপদ ও তার কবল থেকে মুক্তির পথ সম্বন্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রতিনিধি তাঁর অভিমত জানতে এসেছিলেন এবং তাঁর শেষ প্রশ্ন ও আইনস্টাইন কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরের ভিতর এ যুগের এই অভাবনীয় বিপদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথের সুস্পষ্ট নিশানা রয়েছে:

"প্রশ্ন: সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বেতার এখন সাতাশটি ভাষায় বিশ্বের কোণে কোণে এই প্রশ্নোত্তরিকা প্রচার করছে। এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে বিশ্ববাসীর কাছে আমরা আপনার কোন্ বাণী প্রচার করব?"

"উত্তর: সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার বিশ্বাস, আমাদের যুগের তাবৎ রাজনীতিজ্ঞের ভিতর গান্ধীর দৃষ্টিকোণই সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের কাজ করা উচিত। স্বীয় আদর্শ রক্ষা করার জন্য আমরা হিংসা প্রয়োগ করব না। আমরা যা অন্যায় বিবেচনা করি, তার সঙ্গে অসহযোগ করব।"

মধু ও হুল*

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

১

এই চৌরঙ্গী—
জীবনপ্রবাহ ছোটে
বিচিত্র ভঙ্গী—
কেউ নেই সঙ্গী।

২

রাস্তায় রাস্তায়
এটা ওটা সেটা কিনি
যেটা পাই সস্তায়—
তবু মন পস্তায়।

৩

ঢুকে পড়ি রেস্তোরাঁ—
তন্বী তরুণী পাশে
বুলি ছাড়ে ডেঁপো ছোঁড়া—
কেয়ারও করে না থোড়া;

৪

বলিলেই থাপ্পা—
শিস দিয়ে গান গায়,
লারে লারে লাপ্পা—
বোলচাল ধাপ্পা।

৫

কেউ বলে, পথে চল্—
দেখা যাবে বিস্তর
কাঁচামিঠে পাকা ফল,
চোখে চোখে কত ছল।

৬

দশটায়-পাঁচটায়
আফিসের যাওয়া-আসা
ট্রাম-বাস—দোল্‌নায়
প্রাণ রাখা হল দায়।

৭

আওতায় বাচ্চায়
ভরে গেছে ঘর-দোর,—
ছটাকে ও কাঁচ্চায়—
ভরাডুবি খরচায়।

৮

কঙ্কাল অস্থি—
ছোট ঘরে দশজন
এই হল বস্তি—
নেই কোনো স্বস্তি।

৯

মহামারী যক্ষ্মা—
ঝাঁঝরা যে পাঁজরায়
প্রাণ পায় অক্কা—
সবই দেখে ফক্কা!

১০

কেন আর ডাক্তার?
প্যালারাম বাবু কয়,
আসিলে যে ডাক তাঁর
কারো নাই নিস্তার!

১১

শুন্ শুন্ বনমালী,—
ভিন্‌দেশী বলে আজ,
তুম্ সব বাংগালী
বিলকুল কাংগালী।

১২

মেরে দিয়ে এক থোক্,
গণেশ উল্টে যারা
রাতারাতি বড়লোক,
তারা নয় ছিনে জোঁক!

১৩

বানাও আপনা মাল—
চতুর কানাই বলে,
ঝুটমুট হরতাল—
ছোড়ো সব জঞ্জাল।

১৪

গলা টিপে ধরে আজ
ফন্দি-ফিকিরে কারা
দলে ভারি গুলরাজ
রকমারী রঙ-সাজ?

১৫

টাকার যে আণ্ডিল,
ফুলে ফুলে মধু খায়,
কেউ যদি মারে ঢিল—
ঝাড়ে নোট-বাণ্ডিল!

১৬

বুড়ো ব্যাটা দামড়া—
ছোকরা সাজিয়া খোঁজে
হোটেলের কামরা—
গণ্ডার-চামড়া!

১৭

বুক হল খান্ খান্
চাকরি-বাজারে যত
বাঙালীরা নবেজান—
তবু কষে ঘানি টান্।

১৮

কাজ যদি নাহি পাও,
হয়েক বিজ্ঞাপন-
ভেল্কিতে ভুলে যাও—
তুমি তো পাবে না দাও।

১৯

যত কারখানা-কল,
আফিস, রেডিও, হৌস,
কারা পড়ে থাকে তল?
নেই যার দলবল।

২০

ক'টা লোক পায় ভাও?
কদর কজন বোঝে?
তুমি কি নমুনা চাও?
গুণে গুণে দেব তাও।

২১

হতে চাও পার্টনার?
তবেই খতম্ তুমি,
হিম্‌সিম্ জেরবার—
খুব ভাই হুঁশিয়ার।

২২

ভাই ভাই এক ঠাঁই
বহুদিন থেকে মোরা
শুনি বটে ভেদ নাই,
ভেদ চাই, ভেদ চাই।

২৩

বিভেদের অলিগলি
ক্লাবে ও সাহিত্যে—
কেউকেটা হবে বলি'
করে যাও দলাদলি।

২৪

তোয়াজের চরকায়
প্রচার কি হল বড়
রচনার তুলনায়?
এই হাল দুনিয়ায়?

* "মধু ও হুল" নামটি চুরি করা, মার্জনা চাই

২৫

কে যে হল ওস্তাদ,
কেই বা খয়ের খাঁ—
কত খাঁটি কত খাদ,
এই তো বিসম্বাদ!

২৬

অস্থি ও মজ্জায়
বিদ্বেষ হিংসা
থাকে কোন্ লজ্জায়
অন্তিম শয্যায়?

২৭

চীফ গেস্ট জাঁদরেল—
যা খুশী তা বলে যায়—
যার কিছু নাই মেল
অদ্ভুত বিটকেল!

২৮

সভাপতি বলে যায়
ফর্মুলা অনুযায়ী—
বাক্যের ফোয়ারায়
সভাজন খাবি খায়।

২৯

হল কি অ্যাক্সিডেন্ট?
পথ-চলা হল ভার—
মোড় নিতে ওই 'বেণ্ড'
মারা গেল এক 'ফ্রেণ্ড'।

৩০

কতবার হল ফেল—
বাপ-মা তো কেঁদে সারা—
ছেলে চড়ে সাইকেল,
আর করে মাইকেল!

৩১

দলের যে পাণ্ডা—
কথায় কথায় তিনি
মেরে দেন ডাণ্ডা—
বাস্, সব ঠাণ্ডা!

৩২

হল যে কিস্তিমাৎ—
বিয়ের বাজারে নেই
সজ্জাত বজ্জাত—
পিতামাতা কুপোকাৎ!

৩৩

আনো দান-যৌতুক—
পাত্রের বাপে কয়,
চলবে না তাকতুক
বকলমে কৌতুক!

৩৪

এদিকে মেয়ের বাপ
ভাবে দিয়ে গালে হাত—
আমোদকরের চাপ,
ভ্রান্তির অভিশাপ!

৩৫

শোন পরামর্শ,
বার্থ-ট্যাক্স হয় যদি
দেশের আদর্শ,
হয়ো না বিমর্ষ।

৩৬

কর সব অর্পণ—
ডেথ্-ট্যাক্স দিয়ে কর
কৃতান্ত-তর্পণ—
দেখ মন-দর্পণ।

৩৭

সমস্যা খাদ্যের—
কথায় ফসল ফলে
আর গাল-বাদ্যের,
বাকি থাকে শ্রাদ্ধের।

৩৮

বলেছেন চার্বাক
ঋণ করে ঘৃত খাও,
দালদার পরিপাক,
গ্যাঁড়াকলে তাও ফাঁক।

৩৯

চাও মাটি, আরও চাও?
চুক্তির বাইরেও?
যুক্তি না থাকে, তাও,
যত পার নিয়ে যাও।

৪০

কার কি ঠেকেছে দায়—
ঠাঁই নেই ডুবে মর
গঙ্গায়, পদ্মায়—
কার কী বা আসে যায়।

৪১

ভয়াবহ অপরাধ,
বাঙালী হয়েছ কেন?
মরেও বাঁচার সাধ—
তাই এত পরমাদ!

৪২

বুড়ো ধৃতরাষ্ট্রের
ছেলে ছিল একশটা—
কী বললে? পাব টের,
টানি যদি সেই জের?

৪৩

বার্থের কন্ট্রোল?
আরে ছি ছি, বাজে কথা!
ওসব যে ফাঁকা বোল—
বদলাব কেন ভোল?

৪৪

আমাদের শিক্ষায়
হও নাকো পণ্ডিত—
দিন যাবে ভিক্ষায়—
অতীত-সমীক্ষায়!

৪৫

তাজ্জব মুশকিল—
বই ছাপা হল দায়—
প্রকাশক হালদিল
দুয়োরে যে দেয় খিল।

৪৬

দেখি যারে রোজ রোজ
সকাল বিকাল বেলা—
হাত-পাতা কী বা 'Pose'!
ধার দিলে নাই খোঁজ!

৪৭

বাবু টানে সট্‌কা—
ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ,
তবু খেলে ফাটকা—
টাকাতেই আটকা।

৪৮

তিল যে হয়েছে তাল—
এলো যে পাওনাদার—
গায়ে দিয়ে দামী শাল,
বাবু বলে, এস কাল।

৪৯

এস্‌পার ওস্‌পার
বিস্তার কর যদি
ভোজবাজি ধাপ্পার—
কেন হবে বাটপাড়?

৫০

আর যদি রেসে যাও,
কাঁড়ি কাঁড়ি ঢালো টাকা—
পাও আর নাই পাও,
সোনা-দানা বাঁধা দাও।

৫১

গিয়ে দেখি সিনেমায়
ছোঁড়াছুঁড়ি বুড়োবুড়ী
কোন্ লোভে খাবখায়
হাসে কাঁদে চলে যায়!

৫২

এ-তালে ও-তালে টান
আর্ট হল সিনেমার
মিছে-কাবড়ালো গান—
লম্ফঝম্ফ তান।

৫৩

বকাবুম্ বকাবুম্—
ফিল্মের স্টার চলে
নাম তার কুমুম—
পাশে তার 'ধো-হুমুম'

৫৪

পথের পথিক ধায়
উঁকিঝুঁকি দর্শনে,
ডিগবাজি কত খায়—
প্রাণ বুঝি যায় যায়।

৫৫

ওগো তুমি কোথা যাও,
কোন্ পথে বাড়ি, তার
নম্বর বলে দাও—
একবার ফিরে চাও।

৫৬

মাথা ঘোরে বন্ বন্—
মাইরি, কী রোশ্‌নাই—
কলিজায় চন্‌মন—
পড়ায় বসে না মন।

৫৭

চাও যদি ডাইভোর্স—
একঘেয়ে ভাল নয়,
পাও যদি কোন 'সোর্স'
লুফে নাও 'অব্‌কোর্স'!

৫৮

দেখ যদি থিয়েটার,
স্বর্গের চাবিকাঠি—
অ্যাক্ট্রেস্ অ্যাক্টার
দিল হবে ফিন্টার।

৫৯

নর্তন কুর্দন—
জলসা-লড়াই চলে
সুরাসুরে মর্দন—
নাচানাচি গর্দন।

৬০

সুর ফাঁক তালে গাও,
সুর নেই, তাল নেই,
আছে ফাঁক ভিড়ে যাও
যেটা খুশী বেছে নাও।

৬১

তবলায় ওঠে বোল—
তেরে কেটে ধেরে কেটে,
মেরে কেটে দেয় দোল—
চড়া সুরে যত গোল!

৬২

সঙ্গীত ক্লাসিকাল—
'ক্লাস্' নেই 'গ্লাস' আছে;
আরো আছে ভুষিমাল—
জোড়াতালি ফাঁকা চাল।

৬৩

দূরে ওই কালীঘাট,
সেথাও চালাকি চলে,
আগু-পিছু মারে চাঁট
অধর্ম-ঝঞ্ঝাট;

৬৪

নিয়ে লোটা-কম্বল
বসে আছে সাধুবাবা
ঝাল ঝোল অম্বল—
সব যার সম্বল;

৬৫

ফোঁটা-কাটা হরবোলা
হাত দেখে করে দেয়
দিল-খোস মন-ভোলা—
সামনেই পুঁথি খোলা।

৬৬

ক্রিকেটের মরসুম—
ভোরে উঠে মাঠে যাও,
আকেল হবে গুম্
ঘরে এসে নাহি ঘুম।

৬৭

দেখ যদি ফুটবল,
ইষ্টবেঙ্গল আর
মোহনবাগান দল—
মারপিট রসাতল।

৬৮

রেফ্রি করেছে প্যাঁচ—
নইলে—হ্যাঃ দেখাতাম
খেলোয়াড় কোন্ 'ব্যাচ্'—
ঝাঁটা মার—এই ম্যাচ্!

৬৯

হোক্ চোথা, বাড়ি চাই
দালালী সেলামী দিয়ে
তারপর কথা—ভাই
এটাও জান না ছাই?

৭০

কারে কয় ব্যাঙ্ক-ফেল?
অন্তের পয়সায়
মেখে যাও খুব তেল,
পিয়ে যাও 'ককটেল'।

৭১

ভোটাভুটি সংখ্যা—
হবে কি কেল্লা ফতে?
শুধু এই শঙ্কা—
টঙ্কার ডঙ্কা!

৭২

বাড়ে উৎকণ্ঠা—
মাতামাতি হাতাহাতি—
ব্যস্ত যে মনটা—
তারপর?—ঘণ্টা!

৭৩

ঝরিছে হরেক বোল—
বিধান-সভায় ওঠে
কত যে হট্টগোল—
সভা হল উত্তরোল;

৭৪

ওরে ভাই, ধর হাল,
তাল ঠুকে এসে যায়।
পার হয়ে খিল-খাল,
আজ আছো, নেই কাল।

৭৫

'হোথা নারী গুণ্ডা
কোন্ দেশী চেনা দায়
যেন সে চামুণ্ডা—
নাম নাকি চুণ্ডা;

৭৬

ফুসলানো কাজে পাকা—
কত না গবেট মেয়ে
পাচার বোরখা-ঢাকা
পেয়ে কিছু থোক্ টাকা।'

৭৭

নির্জন কার্জন
পার্ক সেটা নেই আর—
আছে শুধু অর্জন
গর্জন তর্জন।

৭৮

মার কাট খুব জোর
পকেট কেটেছে কার
গাঁটকাটা, গুলিখোর
সেই ব্যাটা জোচ্চোর।

৭৯

দেখি নারী জানলায়,
যায় নাকি বিয়েটাও,
হল মাকো খুলনায়,
শাড়ি রাখে আলনায়;

৮০

সে যে আজ এন্তার
আশেপাশে হানে ছুরি।
ফিরিঙ্গী বুলি তার
হল কোটা বোলতার;

৮১

আলো আছে কত ঢঙ,
হাঁপিয়ে যে কথা বলা—
এনামেল-করা রঙ
নয়তো জবড়জঙ ;

৮২

কবরীতে 'হর্সটেল'
চোখে টানা সুর্মা—
Blonde অথবা Belle—
জানি না কী মরা খেল !

৮৩

হেলে দুলে চলে যায়—
দেখে যারে পোড়া মন
ঠুংরি গজলে গায়—
হোঁচট যে লাগে পায় ।

৮৪

স্বকীয়া কি পরকীয়া ?
শেষটিতে জমে ভাল,
প্রেম দিও বাখানিয়া—
খুশীতে নাচিবে হিয়া ।

৮৫

ধর যদি চায় কেউ
জালাতে তোমার ঘর,
বুক-ভাঙা আসে ঢেউ,
কেন কর ভেউ ভেউ ।

৮৬

বিভ্রাট মামলায়—
যার আছে যত বেশী,
সেই তত হামলায়—
ঠ্যালাটা কে সামলায় ?

৮৭

কিস্তি ফি-দরজায়,
দেখ চোরপোরেশন-
খিস্তির দরিয়ায়
ভিস্তিও ডুবে যায় ।

৮৮

'ধর এই নোটটা'
পানওয়ালীরে কয়
ইয়া গাঁটগোঁট্টা
ভুঁড়িয়াল খোট্টা ;

৮৯

বান-ডাকা জানটায়
সরম লেগেছে বুঝি ;—
মুখ ঢাকে ঘোমটায়,
চোখ নাচে খেমটায় ।

৯০

তোকা হক্-কর্ণার—
দরে যত কথাকথি,
তত হাসি ঝর্ণার
সাদা কালো বর্ণার ।

৯১

ওই নিউ মার্কেট—
আবরণ হল কি এ
নাইলন এক সেট্
'বেস'-করা মিহি 'নেট' ?

৯২

এদিকে রক্-অ্যাণ্ড-রোল,
শ্যাম্পেন ব্রাণ্ডি—
ও-পাড়ায় বাজে খোল,
দেয় গোলে হরিবোল ।

৯৩

ঘরবাড়ি জম্‌জম্
হরদম হাসি গান—
এ পাড়ায় নেই দম,
চারিদিকে থম্‌থম্ ।

৯৪

দেখি মার্কিনী নাচ
বরফের ওপরেও—
পোশাকের কি যে ধাঁচ !
সব কুছ্ বোলা সাচ ।

৯৫

খেতাবের কিস্মৎ
সবই তো বজায় আছে,
আরও যত কুদরত
পালটিয়ে মহরত ।

৯৬

পড়িলে 'অ্যাটম্ বম্,'
কী হবে তা' ভেবে খুন-
ঘরে ঘরে কিসে কম ?
বোমা ফাটে দমাদম ।

৯৭

বোটানিকে পিক্‌নিক্
ঠগচাচা নিয়ে আসে
ঘুরে-ফিরে চারদিক
জালে মাল ঠিক ঠিক ;

৯৮

করে ওরা কসরত
'পারমিট'-লোভে দেয়
খানাপিনা আওরত—
হাতে লাল সরবত ;

৯৯

ঘেরাটোপ কুঞ্জে
মৃদু মৃদু গুঞ্জন—
অলিকুল পুঞ্জে
ফুলমধু-ভুঞ্জে !

১০০

ঘুরে-ফিরে ঘরে যাই—
অনেক অনেক কথা
বলার তো শেষ নাই—
খুঁচিয়ে কি লাভ ভাই !

[পূর্বানুবৃত্তি]
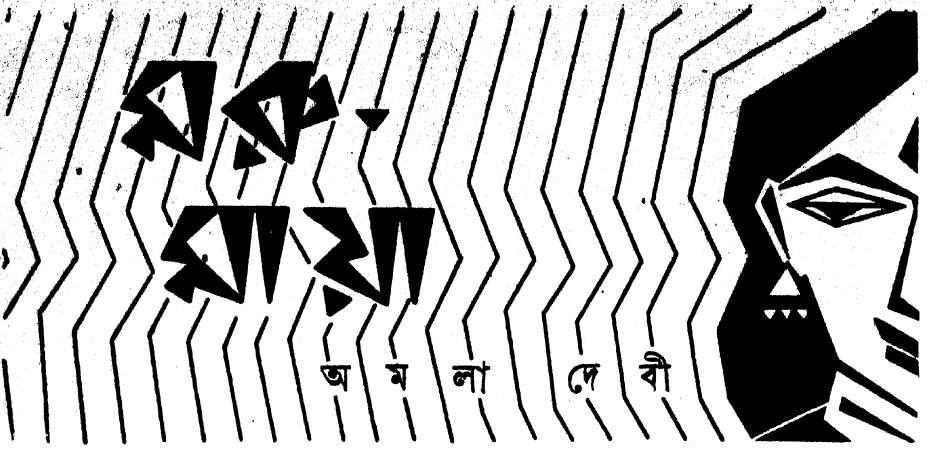
সে রাত্রে সারারাত ঘুম হয় নি রাধার। মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের মধ্যে বীরেনদার চোখ দুটি তখনও তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—যেন তার দৃষ্টি তার অন্তরের মধ্যে ঢুকে দুরন্ত শিশুর মত তার সুবিন্যস্ত কামনা-বাসনাগুলিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। সাপের চোখ যেমন পাখিকে তার কবলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, তেমনই সেই চোখ দুটি তার মনকে তার দিকে টানতে লাগল। তার বিবেক ও সংস্কারের সতর্কবাণী তাকে বার বার সামলাতে লাগল। কিন্তু রাত্রি যতই গভীর হতে লাগল, নিদ্রাকুহেলীতে বহিশ্চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল, ততই বহুদিন পূর্বের সেই আলিঙ্গনের স্মৃতি তার অন্তশ্চেতনায় স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নদীর বন্যা-বিধ্বস্ত তীরভূমি যেমন পূর্বের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা বিস্মৃত হয়ে বন্যার দুঃসহ সঙ্গের জন্য পুনরায় কামনা করে, তারও অন্তর তেমনই বীরেনের সঙ্গের জন্য পিপাসু হয়ে উঠল।

রতন বারবার বলতে লাগল, বাবুর সঙ্গে যে তোমার আলাপ থাকতে পারে কখনও ভাবি নি। আগে জানতে পারলে কত কাজ হত। এত বড় লোকের ছেলের সঙ্গে আলাপ! অত বড় বড় লোকের ছেলেরা তোমার বাবার ছাত্র! তিনি বেঁচে থাকলে শহরের কোন ভাল লোকের হাতে তুমি পড়তে! তা না হয়ে অজ পাড়াগাঁয়ে গৌরদাসের হাতে পড়লে!

চন্দ্রা কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, ঝাঁজালো স্বরে বলল, গৌরদা খারাপ লোক কিসে? টাকা থাকলে আর শহরে থাকলেই বুঝি ভাল লোক হয়!

দিন কয়েক পরে বিকেলবেলায় রতন বাড়ি এসে বলল, দিদি, সিনেমা দেখতে যাবে?

সিনেমার নাম শুনেছিল। দেখে নি কখনও। চুপ করে রইল।

রতন বলল, দেখ নি তো? চল, দেখে আসবে। খুব আনন্দ পাবে। মনটাও ভাল হবে।

চন্দ্রা এক পাশে কী একটা কাজ করছিল। রতনের কথা শুনে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, সিনেমা কি?—রতন চন্দ্রাকে বোঝাতে লাগল, পর্দার উপরে ছবি। চলা-ফেরা করে, কথা কয়। দেখেছি আমি। আমাদের শহরে আছে। বাবুর সঙ্গে কলকাতায় গিয়েও দেখেছি কতবার।—তার দিকে তাকিয়ে বলল, গৌরদাসের পাল্লায় পড়ে কিছুই তো দেখলে না, অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে রইলে।

চন্দ্রা শ্লেষের স্বরে বলল, তোমার পাল্লায় যে পড়েছে সেই বা কোন্ শহরে পড়েছে! সেই বা কবার থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখেছে।

রতন বলল, আমাদের কালী গাইও তো কিছু দেখে নি। তা কি আমার দোষ?

চন্দ্রা ঝাঁজিয়ে উঠল: মানে! কালী গাই আর আমি এক নাকি?

রতন বলল, হুবহু এক। একই রকম চেহারা। একই রকম বুদ্ধিশুদ্ধি। তোমাকে কোথাও নিয়ে গেলে ওরই মত ভিড় দেখে লাফালাফি করবে, কিছুই শুনবে না, বুঝবেও না।

অভিমান-গাঢ় কণ্ঠে চন্দ্রা বলল, বেশ তো। দেখে-শুনে মনের মত আর কাউকে আন না—আমাকে নিয়ে সংসার করবার দরকার কি?

রেগে চলে গেল চন্দ্রা।

বিকেলে গাড়ি এল তাদের নিতে। চন্দ্রা যেতে রাজী হল না। সে বলল, আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, বুঝব না কিছুই, আমার গিয়ে কী হবে?

যাধা গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। বীরেনদা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল, যাবার জন্য সাহুনয় অনুরোধ জানিয়ে। লিখেছিল, ছোটবোন দাদার দাবি নিশ্চয় মানবে। এই বিশ্বাসেই সে তাকে তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করতে সাহসী হয়েছে।

যাবার সময় গাড়ির পিছনে বসল সে ও রতন। সামনে বীরেনদা ও ড্রাইভার। বীরেনদা গাড়ি চালাতে লাগল।

শহরে পৌঁছুল সন্ধ্যার আগেই।

ছবিঘরের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। বেশ বড় বাড়ি। সামনেটা আলোর মালা ঝলমল করছিল। অনেক লোকের ভিড়। ড্রাইভার টিকিট করে নিয়ে এল।

প্রথম শ্রেণীতে বসেছিল তারা। অনেক লোক ছবি দেখতে এসেছিল। মেয়ে-পুরুষ দুই-ই। কত রকমের চেহারা, কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ। তাদের সামনেই জনকয়েক মেয়ে বসেছিল। তাদের চেহারা, তাদের রূপ, ভাব-ভঙ্গী, শাড়ির বাহার ও গায়ে গয়নার প্রাচুর্য দেখে মনে হল, বড়লোকের বাড়ির মেয়ে তারা। তাদের কাছে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল। মনে হল সে যেন এদের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে। সত্যি, তখন অনাহারে অযত্নে তার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত হয়ে উঠেছিল। প্যাকাটির মত দেহ, দারিদ্র্যের আঁচে ঝলসে যাওয়া গায়ের রঙ। চুল উঠে গিয়েছিল। পোশাকও তেমনই। রতনের দেওয়া শাড়িটাই পরে গিয়েছিল। অনেক বার পরার জন্য ময়লা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে ঘরে-কাচা সেমিজ, ব্লাউজের বালাই ছিল না। শীত তখনও ছিল বলে একটা পুরনো পশমী চাদর গায়ে জড়িয়েছিল। বাবা কিনে দিয়েছিলেন। রঙ চটে গিয়েছিল।

ছবি দেখবার সময়ে এ সব কথা তার মন থেকে সরে গিয়েছিল। ছবি দেখাতেই মন ডুবে গিয়েছিল তখন। চমৎকার ছবি। মনে হচ্ছিল যেন একটি সত্যিকার ঘটনা চোখের সামনে ঘটছে। যেন কতকগুলি সত্যিকার মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা মিলন-বিরহ-মণ্ডিত জীবন তাদের চোখের সামনে অপূর্ব শোভায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠে শুকিয়ে ঝরে গেল। ছবিটা ঠিক মনে পড়ছে না। খুব সম্ভব ভালবাসার ছবি। দুটি ছেলে-মেয়ে—ভালবাসা হল দুজনের মধ্যে—বিয়ে হল না, মেয়েটির বিয়ে হল একজন বুড়োর সঙ্গে, ছেলেটি বিয়ে করল না—মদ খেতে খেতে মারা গেল।

বীরেনদা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছিল, কেমন লাগছে?

গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হচ্ছিল দুজনের। একবার তার হাতটা আলগা ভাবে ধরে ছিল বীরেনদা। সেই স্পর্শে তার সর্বদেহে তড়িৎপ্রবাহ বয়ে গিয়েছিল।

ফেরবার সময়ে বীরেনদা পিছনে বসল—তার পাশে। রতন বসল সামনে।

বীরেনদা নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। স্বামীর কথা, তাদের সাংসারিক অবস্থার কথা। সেও নানা কথা জিজ্ঞাসা করল। বীরেনদাও সব জানাল। বাবা মারা গেছেন, মা কলকাতায় থাকেন তাঁর বাবার কাছে। শহরের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তার কাকারা নানা কাজে নানা জায়গায় আছেন। যে কাকীমা তাঁকে মানুষ করেছিলেন, কলকাতায় থাকেন। তাঁর স্বামী কলকাতায় বাড়ি করেছেন। সেই বাড়িতেই থাকেন তাঁরা। ছোটভাই ধীরেন কলেজের অধ্যাপক। অচিন্ত্য, অপূর্ব, অনাদিদাদের কথা কিছু জানে না বলল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ ঝাঁকানিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোরে তার মাথাটা কখন বীরেনের বুকের পাশে এসে গিয়েছিল। ধড়মড় করে

সোজা হয়ে বসে দেখল বীরেন রতন দুজনেই ঘুমচ্ছে।

গাড়িটা থামল কিছুক্ষণ পরে। রতনের বাড়ির সামনে। বীরেনদার ঘুম ভাঙল। বলল, এসে গেল। সে ইতিমধ্যে নামবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। গাড়ি থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। রতন নামতেই গাড়ি চলে গেল।

সে রাত্রেও তার ঘুম হয় নি। বীরেনদার স্পর্শ, কথা, চাউনি তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। নিজেকে সে ধিক্কার দিতে লাগল। ছি ছি, এ কী করছে সে! স্বামী রয়েছে তার! একমাত্র সন্তানকে সেদিন বিদায় দিয়েছে কোল থেকে! তার কি এসব সাজে! জোর করে মনকে স্বামী ও সংসারের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। রাধামাধবের মূর্তি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। তবু তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে, সেই স্মৃতি বার বার তার মন জুড়ে বসতে লাগল।

গৌরদাসের খবর আনল রতন। বলল, ভিক্ষে করছে।

সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, জমিদারবাবু কিছু করলেন না!

বলল, জমিদারবাবুকে কী কাজে কলকাতায় যেতে হয়েছে। ফিরলে যাবে ওরা।

চন্দ্রা বলল, ছি ছি, আজ থেকে আমার মুখে ভাত রুচবে না যে! দিদি, তুই ভাত মুখে তুলতে পারবি?

সে বলল, কি করব বল্? যদি সাধ করে কেউ কষ্ট পায় তো কে কী করবে? এখানে চাকরি হয়ে যাবে—খবর পেয়েছে তো?

চন্দ্রা বলল, ঘর-সংসার ঠাকুর-দেবতা ফেলে আসবে কী করে? তোরা সাহেব-মেম হয়েছিস। সে তো হয় নি। বৈষ্ণবের বাড়িতে এ সব সাজে না।

রতন বলল, শুনছ দিদি, কথা! গৌরদার দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে ওর।—বেশ তো, যাও না, রসকলি কেটে, ওর সঙ্গে খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে বেড়াবে।

সাপিনীর মত ফোঁস করে উঠল চন্দ্রা: বলতে লজ্জা করে না ওসব কথা।

রতন রোজ সন্ধ্যার পর এসে খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে পঞ্চমুখে বীরেনদার নাম-কীর্তন করত। কত দয়া! গরীবদের দু হাতে দান করে! বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে কত খাতির! ইংরেজী বলে সাহেবদের মত! এমনই হাসি-খুশী—কিন্তু কাজের সময় কী গম্ভীর! কী কড়া মেজাজ! কথা বলতে ভয় করে।

একদিন বলল, দিল্লীর কাছাকাছি একটা বড় কাজ হবে। বাবু আমাদের কাজটার জন্য চেষ্টা করছেন। আমাকে বললেন, যদি কাজটা হয়, যাবে নাকি? বললাম, কখনও তো ওসব দেশ দেখি নি; আপনার দয়া হয় তো যাব।

সে সভয়ে বলল, এখানকার কাজ কি শেষ হয়ে গেল? সব চলে যাবে এখান থেকে?

রতন অভয় দিল: না, বড় কাজটা শেষ হবে শীগগির। ছোটখাটো কাজ চলতেই থাকবে। আফিসও থাকবে, লোকজনও থাকবে।

সে জিজ্ঞাসা করল, ওর চাকরির কি হবে?

এলেই হবে। বড়বাবুকে বাবু বলে দিয়েছেন।

চন্দ্রা সব শুনে বলল, আমরা থাকব কোথায়?

রতন বলল, তোমরা দুজনে থাকবে এখানে। গৌরদা আসছে তো শীগগির। আর সেখানে স্থায়ী কাজ যদি চলে, থাকবার জায়গা যদি পাওয়া যায়, আর ডাল-রুটি খেয়ে যদি থাকতে পার তো নিয়ে যাব তোমাকে।

সে বলল, ওকেও ওখানে নিয়ে যেয়ো। একসঙ্গে থাকা যাবে সবাই মিলে।

রতন একদিন এসে বলল, বাবু তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। বলছিলেন, খুব স্নেহ করতাম ওকে। পাড়াগাঁয়ে এত কষ্টে পড়ে আছে। কোনদিন ভাবি নি। এখন জানতে পেরেও বা কী করতে পারছি! বললাম, গৌরদাসের চাকরি হলে অনেকটা সুবিধে হবে। জিজ্ঞাসা করলেন, সে আসছে কই? বললাম, আসবে। একা মানুষ। সব ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো। তাই দেরি হচ্ছে।

আর একদিন বলল, বাবু আজ তোমার কথা

বলছিলেন। তোমার হাতের রান্নার প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, চমৎকার রান্নার হাত! অনেকদিন ওর হাতের রান্না খাই নি।

একদিন রাত্রে খাবার জন্য বীরেনদাকে নিমন্ত্রণ করল রতন। সে নিজে হাতে সব অতি যত্নে রান্না করল। চন্দ্রা সাহায্য করল।

রান্নার সময়ে চন্দ্রা বলল, কোথাকার কে, তার জন্যে আমরা ষোড়শোপচারে রান্না করছি। গৌরদার রোজ খাওয়া জুটছে কি না কে জানে। তোর যে কী করে এ সব করতে ইচ্ছে করছে, দিদি!

সে বলল, কী করব বল্। আমারই কি ভাল লাগছে। রতনের মুখ রাখবার জন্য করা। বড়মুখ করে নেমন্তন্ন করেছে ওর বাবুকে। তা ছাড়া বাবু খুশী থাকলে ওর সুবিধে হবে।

সত্যি সেদিন গৌরদাসের জন্যে মন কেমন করছিল তার। কী করে তার দিন কাটছে কে জানে!

বীরেনদা খেতে এল রাত নটায়। মোটরে করে এল। খেতে দেওয়া হল। সে সামনে বসে খাওয়াতে লাগল। রতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল।

খাওয়ার পর রতনের সঙ্গে গল্প করল কিছুক্ষণ। সে আর চন্দ্রা রান্নাঘরে গিয়ে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। রতন এসে বলল, বাবু যাচ্ছেন। চন্দ্রা বলল, বেশ তো! করতে হবে কী? রতন বলল, কি আর করতে হবে—ভদ্রতা; তুমি ওসব বুঝবে না।

রাধা রতনের সঙ্গে গেল। বীরেনদা বাইরে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। জ্যোৎস্নার আলোতে ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওর মুখের স্বাভাবিক রুক্ষ ভাব, চোখের স্বাভাবিক উগ্র দৃষ্টি—যা দিনের আলোতে চোখে এসে লাগে—জ্যোৎস্নার কোমল প্রলেপে তা ঢাকা পড়েছিল। দূর থেকে তাকে দেখে মনে হল যেন অচিন্ত্যদা দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক তেমনই মুখ, তেমনই চোখ।

কাছে যেতেই বলল, আর একজনকেও ডাক। আমার কাছে আসতে লজ্জা কি? রাধার দাদা আমি, ওঁরও তো দাদা।

রতন গলে লুটিয়ে পড়বার উপক্রম হল। একগা[ল] হেসে বলল, আপনার মত দাদা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

চন্দ্রা বোধ হয় আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। রত[ন] যেতেই ওর সঙ্গে এল।

বীরেনদা বলল, আজ চমৎকার খেলাম। অনে[ক] দিন এমন খাই নি। মনে হল যেন মাসীমার হাতের রান্[না] খাচ্ছি। তবে তার জন্য ছোটবোনদের ধন্যবাদ দিতে পারব না। আশীর্বাদ করব।—বলে গাড়ির ভিতর থেকে দুখানা শাড়ি বার করে রতনের হাতে দিয়ে বলল, বোনদের জন্যে যৎসামান্য আশীর্বাদী দিয়ে গেলাম।

বীরেনদা চলে গেল। বাড়িতে ফিরে এসে রত[ন] বলে উঠল, খুব দামী শাড়ি দিয়েছেন! কি রকম দি[ল] দেখেছ বাবুর। অনেক ভাগ্যে এমন মনিব পেয়েছি।

[ক্রমশ]

আত্ম-সম্পর্কে ঃ উত্তরতিরিশ

অসিতকুমার

কতকাল আমি ছেড়েছি আড্ডা ইয়ার্কি ইত্যাদি,
বুশশার্ট ছেড়ে ধরেছি অঙ্গে অধ্যাপকীয় খাদি।
মাঠের মাটিঙে খাই নে বাদাম, পুড়ে পুড়ে ঠাঠা রোদে।
মাঝে মাঝে শুধু সিনেমায় যাই গুনচ'র অনুরোধে।
সন্ধ্যেবেলাটা বাড়িতেই কাটে। রাস্তায় ধূলো-কাদা।
ছেলেপুলেদের উপদেশ দিই। বিপদে পড়লে চাঁদা॥

বিমল আর বিনয় বসেছিল। উত্তেজিত হয়ে ঢুকলেন ভুতোদা।

ভুতোদা: ছ্যাঃ ছ্যাঃ! কালে কালে কি হোল।

বিমল: আবার কি হোল ?

ভুতোদা: জানিস আমাদের ছোটবেলায় বড়লোকের বাড়ীর বৌ মেয়েদের পাল্কী শুদ্ধু নদীতে ডুবিয়ে আনা হোত যাতে মুখ কেউ না দেখতে পায়। আর এখন বুড়োধাড়ী মেয়েরা সব আপিসে কাজ করে বেড়াচ্ছে ?

বিনয়: তাতে আপনার হোল কি ?

ভুতোদা: আমাদের মধুপুরের কেলো এখানে এক সদাগরী আপিসে কাজ করে। কাল গিয়েছিলাম দেখা করতে। ঢোকার মুখেই এক রংচং মাখা আধুনিকা পথ আটকালো। ইংরাজীতে চটাং চটাং করে কি বলল।

আমি বললাম "মা লক্ষ্মী আমাদের কেলোর সঙ্গে একটু দেখা করব।" অনেক বোঝানোর পরে বলল "ও, মিষ্টার রে—আপনার স্লিপ পাঠান।" চেয়ারে ঠ্যাং তুলে একটু আরাম করে বসেছি বলে—"ঠিক করে বসুন। আপিসটা কি বাড়ীঘর পেয়েছেন?"

বিমল: ঠিকই তো বলেছে!

ভুতোদা: কাজকরা মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনা। ওদের বাড়ীঘরে মন থাকেনা। শুধু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো আর চটাং চটাং ইংরিজী বুলি।

বিমল আর বিনয়ের একবার চোখ চাওয়া চাওয়ি হয়ে গেল। ভুতোদাকে আর একবার জব্দ করা যাবে।

বিনয়: ভুতোদা, আজ তো রবিবার। চলুনমা আমার পিসে মশায়ের বাড়ী। গড়পায়ের ওদিকটা আপনার দেখা হয়ে যাবে আর আলাপ পরিচয়ও হবে।

ভুতোদা: তা যাব এখন।

বিকেলে গড়পারে বিনয়ের পিসের বাড়ীতে ভুতোদা বিমল আর বিনয়।

বিনয়: এই যে ভুতোদা, আমার পিসতুতো বোন মিলি। ও একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে।

ভুতোদা (অপ্রসন্ন): চাকরী করে? তা বেশ, তা বেশ

মিলি: কেন চাকরী করা আপনি পছন্দ করেননা?

ভুতোদা: (ভয়পেয়ে): না, না, কেন করবনা। তবে মা আমরা বুড়ো মানুষ। মেয়েদের ঘরের কাজকর্ম করাই পছন্দ করি।

মিলি: (মুখ টিপে হেসে) ও এই কথা।

বিমল: মিলি আমাদের খাওয়াবিনা?

মিলি: নিশ্চয়ই।

মিলি সযত্নে মেঝে পরিষ্কার করে সবাইকার আসন পেতে খাবার পরিবেশন করল। ভুতোদা অবাক হয়ে দেখছিলেন। হাবভাব দেখে তো ঘরের লক্ষ্মীই মনে হচ্ছে!

বিমল: (আড়চোখে তাকিয়ে) ভুতোদা, চাকরী করা মেয়ে। কাছে যাবেন না। কামড়ে দিতে পারে।

ভুতোদা: থাম্।

খেতে বসে

ভুতোদা: খাবার তো অনেক করেছো মা। মাছের ঝাল, মাংস, আলুপটলের ডালনা।

ঠাকুর রেঁধেছে নিশ্চয়ই।

মিলি: না, বাড়ীর রান্নাবান্না আমিই করি।

ভুতোদা: তা বেশ। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। এতো খেতে পারবনা। কিছুটা তুলে রাখো।

মিলি: খানই না আপনি। না খেতে পারলে পাতেই রেখে দেবেন।

ভুতোদা: বাঃ বাঃ খাসা স্বাদ হয়েছে তো। নাঃ পড়ে আর কিছু থাকলনা। আর একটু ডালনা দাওতো। কি দিয়ে রেঁধেছ মা? তেল তো মনে হচ্ছেনা!

বিমল: কি দিয়ে আবার। 'ডালডা' দিয়ে।

ভুতোদা: (চটে)—আবার রসিকতা করছিস?

মিলি: না সত্যিই খাবার দাবার সব 'ডালডায়' রাঁধা।

ভুতোদা: আমি তো জানতাম ভাজাভুজি মিষ্টি ফিষ্টিই 'ডালডায়' হয়!

মিলি: না সব রান্নাই 'ডালডায়' ভাল হয়।

বিনয়: শেষ শেষ ভুতোদা। শেষে চাকরী করা মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হোল।

ভুতোদা: আহা, আমাদের মিলিমা তো একজন। আরো যে হাজার হাজার মেয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে এমনটি—

মিলি: না ভুতোদা, মেয়েরা চাকরি করে জীবনযাত্রা স্বচ্ছল করার জন্তেই। বাড়ীর কাজেও তারা কোন অংশে খারাপ নয়।

বিমল: ভুতোদা, এবার কি সব চাকুরে মেয়ের বাড়ীতেই খেয়ে দেখবেন নাকি।

সত্যজিতের জ্ঞানোদয়

ভূপেন্দ্রমোহন সরকার

অধ্যাপক সত্যজিৎ শ্বশুরবাড়ি আসিতেছেন। স্ত্রী সুলতাকে নিতে।

সত্যজিৎ দর্শনের অধ্যাপক। একটা গভীর দার্শনিক সমস্যায় ডুবিয়া গিয়াছিলেন, প্রায়। ট্রেন থামিলে ধাক্কা খাইয়া চকিত দৃষ্টি বাহিরে ফেলিতেই চমৎকৃত হইয়া গেলেন। প্ল্যাটফর্ম লোকে লোকারণ্য!

কয়েকটি মৌলিক দার্শনিক প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন সত্য। কিন্তু এত শীঘ্র জীবিতকালে বাংলাদেশের লোকে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাইয়া ফেলিবে ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বোকার মত একটু হাসিয়া উঠিয়া পড়িলেন। স্যুটকেসটা টানিয়া লইয়া ভীড়ের মধ্যে নামিবার মুখেই কয়েকটা প্রশ্নোত্তরের মধ্যে ব্যাপারটা শুনিলেন।

কে? কে এসেছে?

রাজকুমার আর ফটিক দাস।

কোঁথাকার রাজকুমার?

সিনেমার।

ফটিক দাসটা কে?

তাও জানেন না মশায়? লম্ফশ্রী ফটিক দাস!

প্রশ্নকর্তা জব্দ বোধ করিয়া চুপ করিয়া গেল।

নামটা পরিচিত বোধ হইল সত্যজিতের। ভীড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দেখিলেন—দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

একজন হোমরাচোমরা অফিসার-জাতীয় ব্যক্তি দুইখানি প্রকাণ্ড ফুলের মালা যে দুইজনের গলায় পরাইয়া দিলেন তাহারা সত্যজিতের বাল্যবন্ধু। হারাণ আর ফটকে।

পাঠশালায় পণ্ডিত মহাশয়ের নির্দেশে হারাণ আর ফটকে উভয়েই সত্যজিতের হাতে কানমলা খাইয়াছে অনেক দিন। স্কুলে পড়িবার সময় ফটকে লম্ফ-প্রতিযোগিতায় বরাবর প্রথম হইত আর হারাণ সরস্বতী পূজার সময় অভিনয়ে মাঝে মাঝে মেডেল পাইত। ম্যাট্রিক ফেল করিয়া ফটকে কোথায় চলিয়া যায়, আর হারাণ নবম শ্রেণী পর্যন্ত উঠিয়া যাত্রার দলে ঢুকিয়া পড়ে।

সত্যজিৎ অস্ফুটকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, হারাণ তা হলে রাজকুমার, আর ফটকে লম্ফশ্রী ফটিক দাস!

ভীড় নড়িতে শুরু করিল। গলায় মালার স্তূপ লইয়া রাজকুমার আর ফটিক দাস অগ্রসর হইলেন।

আর একবার বিস্ময়ের ধাক্কায় বিমূঢ় হইয়া গেলেন দার্শনিক সত্যজিৎ। একপাশে স্ত্রীলোকের ভীড়ের মধ্যে সুলতা পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়া উঁচু হইয়া রাজকুমারের মুখ দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

মাথা নীচু করিয়া সরিয়া গেলেন সত্যজিৎ।

কিন্তু বাড়ি গেলেন না। চায়ের দোকানে বসিয়া রাজকুমার আর ফটিকের প্রোগ্রাম সংগ্রহ করিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন সভায় উহাদের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন।

মোক্তারপাড়া পাঠাগারের উদ্বোধনী সভাতেই দার্শনিক সত্যজিতের জ্ঞান-নেত্র খুলিয়া গেল।

মহাজ্ঞানী মহাজনের মত রাজকুমার সস্মিত আননে প্রশ্নাদির উত্তরে বাণী দিতেছেন।

বর্তমান সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

হতাশ হবার মত নয়। সিনেমা পত্রিকার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার হিসেবে একথা আজ নিঃসংশয়ে বলা যায় যে সাহিত্যের অগ্রগতি প্রগতির দিকেই চলছে।

হাততালি।

বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আপনার মত কি?

এ বিষয়ে আমি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মত সমর্থন করি।

হাততালি।

ভারতীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের মধ্যে—

হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরিয়া গেল সত্যজিতের। আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। শুধু স্পষ্ট দেখিলেন, হারাণ এখন দেবতা হইয়া গিয়াছে। লম্ফশ্রী ফটিক দাসের বাণীর জন্য অপেক্ষা না করিয়া দূর হইতে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চায়ের দোকান হইতে স্যুটকেসটা লইয়া রুদ্ধশ্বাসে চলিয়া গেলেন স্টেশনে। গাড়ি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। বিনা টিকিটেই উঠিয়া পড়িলেন।

বাসায় এক ফালি খালি জায়গা কোপাইয়া নরম করিয়া ফেলিলেন। আর ঘরের মধ্যে দেওয়ালে বড় বড় আয়না টাঙাইয়া লইলেন।

সত্যজিৎ এখন সকালে নরম মাটিতে লম্ফ এবং বৈকালে ঘরের মধ্যে অভিনয় অভ্যাস করিতেছেন।

দর্শনের পুস্তকগুলি পুরাতন পুস্তকের দোকানে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন।

মনের কথা ঃ সংস্কার ও বিকার

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

নিখিল বিশ্বে চলিয়াছে এক অবিশ্রাম প্রাণের লীলা। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ ধ্যান-দৃষ্টিতে এই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আবার আচার্য জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলে ঋষির ধ্যানলব্ধ এই তত্ত্ব আজ বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন—জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের পার্থক্য শুধু প্রকাশের তারতম্যে। কিন্তু মানুষ তো শুধু প্রাণের রাজ্যেই জীবিত নয়, সে মনন করে, বিচার-বিশ্লেষণ করে, তর্ক ও মীমাংসা করে, আর এই মানস ব্যাপারের দ্বারাই সে ইতর প্রাণিসমূহ হইতে পৃথক। আমরা জানি, মানুষের দেহ ও মনে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে অথচ মন কি পদার্থ বা কোথায় অবস্থিতি করে, তাহা তো জানি না। আমরা নিজেদের মানস ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, আর অপরের মানস ব্যাপার অনুমান করি, মনের স্বরূপ এবং দেহ ও মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতেও আমাদের প্রচেষ্টার অন্ত নাই, কিন্তু আজ পর্যন্ত মানব-মনের রহস্য কেহ সম্যক্ উদ্ঘাটন করিতে পারেন নাই। জার্মান দার্শনিক ক্যাণ্ট বলিয়াছেন, ঊর্ধ্বে তারকা-খচিত আকাশ ও পৃথিবী-তলে মানুষের মন—এই দুইটিই আমার চোখে সীমাহীন বিস্ময়।

মানুষের দেহের মত মনেরও নানা প্রকার বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। দেহের রোগের ন্যায় মনের রোগেরও চিকিৎসার দ্বারা উপশম হইতে পারে, তবে দৈহিক ব্যাধির মধ্যে যেমন কোনটি সুখসাধ্য, কোনটি কষ্টসাধ্য আর কোনটি অসাধ্য, মানসিক ব্যাধির মধ্যেও তেমনই কোনটি প্রতিকারের যোগ্য, আর কোনটি বা প্রতিকারের অযোগ্য। সম্পূর্ণ সুস্থদেহ মানুষ যেমন জগতে দুর্লভ, তেমনই সম্পূর্ণ সুস্থমনা বা প্রকৃতিস্থ মানুষও বিরল। এক হিসাবে এই পৃথিবীটাই একটা প্রকাণ্ড পাগলা-গারদ, কেন না, প্রত্যেক মানুষই কম-বেশী পাগল বা বায়ু-রোগগ্রস্ত। ফ্রয়েডের মতে 'the healthy man is virtually a neurotic।' তবে, যে পাগল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না, যে নিজের কল্পনা-সৃষ্ট জগতে বাস করিয়া হাসি-কান্না, ভয়-ক্রোধ প্রভৃতির অভিনয় করে, তাহাকেই পাগলেরা 'পাগল' বলিয়া থাকে।

মহর্ষি চরকের মতে মানসিক ব্যাধির মূল রজোগুণ আর তমোগুণের আধিক্য। আমাদের শাস্ত্রকারেরা গুণ অনুসারে মানুষের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। কোন মানুষ স্বভাবত শান্ত ও স্থির প্রকৃতি, তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান, কেহ বা উদ্যোগী পুরুষসিংহ, তাহার মধ্যে রজোগুণ প্রধান, আবার কেহ বা অলস ও দীর্ঘসূত্রী, তাহার মধ্যে তমোগুণ প্রধান। কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে আর ভয় শোক অবসাদ প্রভৃতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন। গুণ অনুসারে যেমন মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, দোষ অনুসারেও তেমনই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৭৭) চারিটি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—রক্ত, শ্লেষ্মা, পীতবর্ণ পিত্ত ও কৃষ্ণবর্ণ পিত্ত। হিপোক্রেটিসের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পর গ্যালেন মানুষকে প্রকৃতি অনুসারে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই সব শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে মানসিক বিকারের সম্পর্ক আছে। মহামতি চরক বলেন, কোন উন্মাদ বাত হইতে, কোন উন্মাদ পিত্ত হইতে আর কোন উন্মাদ বা শ্লেষ্মা হইতে জন্মে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই তিনটি দোষ মিলিত হইয়া উন্মাদ জন্মায় আবার কখনও বা আগন্তুক কারণেও উন্মাদ জন্মে। আবার কাম ক্রোধ লোভ হর্ষ ভয় শোক প্রভৃতিও মানসিক বিকারের হেতু হইয়া থাকে। ফ্রয়েডের মতে আমাদের স্নায়ুরোগের কারণে থাকে নিগৃহীত বা অবদমিত যৌন লালসার মধ্যে। সভ্য মানুষ সমাজ-বিরুদ্ধ বাসনাকে দমন করেন কিন্তু সে বাসনা মরিয়া যায় না, মনের তলদেশে আশ্রয় করে, আর স্বপ্নাবস্থায় সেই বাসনাগুলিই ছদ্মবেশে আবির্ভূত হয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে। এ 'বাসনাগুলিই' নানাপ্রকার স্নায়বিক বিকার জন্মায়

ফ্রয়েডের মত মানিয়া লইলেও এ কথা বলা চলে যে, রজোগুণ আর তমোগুণই মানসিক ব্যাধির কারণ।

পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে মানসিক ব্যাধিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়—উন্মাদ বা psychosis এবং অপস্মার প্রভৃতি বা psycho-neurosis। প্রতীচ্যের মনোবিজ্ঞানীরা প্রধানতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাধির চিকিৎসাতেই অনেকটা সফলকাম হইয়াছেন। আজকাল শুধু স্নায়ু-রোগীর সংখ্যা নয়, উন্মাদ রোগীর সংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে। রোগীর তুলনায় আমাদের দেশে উন্মাদাশ্রমের সংখ্যা খুবই কম। এ বিষয়ে চিকিৎসকদের একটা মহান্ দায়িত্ব রহিয়াছে। চিকিৎসকগণ এ বিষয়ে আমাদের দেশীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিরও অনুসরণ করিয়া দেখিতে পারেন। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে উন্মাদ রোগের চিকিৎসার জন্য নানাবিধ ঔষধ তৈল প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। তবে যিনি উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করিবেন, তাঁহার মধ্যে প্রচণ্ড মনঃ-শক্তি বা ইচ্ছা-শক্তি থাকা দরকার। নতুবা তাঁহার নিজেরই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে।

ডাঃ Kretschmer মানসিক রোগীকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। এক শ্রেণীর মানুষ সামাজিক কিন্তু ইহারা কখনও অতিমাত্রায় উল্লসিত, কখনও বা অতিমাত্রায় অবসন্ন হয়। ইহাদের উন্মাদের নাম manic-depressive insanity। আর এক শ্রেণীর মানুষ স্বল্পভাষী ও অসামাজিক, ইহাদের অন্তরে প্রবল হৃদয়াবেগ থাকিলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই। ইহারা যখন সম্পূর্ণরূপে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বপ্ন-জগতে বাস করে, তখন ইহাদের উন্মাদকে বলা হয় 'সিজোফ্রেণিয়া' (Schizophrenia)।

এক শ্রেণীর চিকিৎসক আছেন, তাঁহারা বলেন, আমাদের দেহ ও মনের সকল বিকৃতির মূলে রহিয়াছে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরসের (endocrine glands) প্রাচুর্য বা অল্পতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, থাইরয়েড গ্রন্থিরসের অল্পতা হইলে মানুষ জড়বুদ্ধি হয় আর আধিক্য ঘটিলে মানুষ ক্ষিপ্রকারী ও চঞ্চল-প্রকৃতি হয়। এই চিকিৎসকগণ জড়বাদী, ইহারা মনের অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। ইহারা শারীর রসায়নের সাহায্যে মানুষের আকৃতিভেদ, রুচিভেদ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী। এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠক লুই বার্ম্যান প্রণীত 'Personal Equation' ও 'Glands regulating Personality' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। যাঁহারা যোগশাস্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাঁহারাও যে গ্রন্থিরস-তত্ত্ব জানিতেন, সে কথা একরূপ নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে নানাপ্রকার উন্মাদের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। যাঁহারা এই সব লক্ষণের বর্ণনা করিয়াছেন, উন্মাদ রোগ সম্পর্কে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, সন্দেহ নাই। তবে তাঁহারা উন্মাদের লৌকিক কারণের কথা যেমন বলিয়াছেন, তেমনই অতিলৌকিক কারণের কথাও বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা দেবতাগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের কোপদৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। এ যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাসী নহেন কিন্তু প্রাচীনেরা বিভিন্ন প্রকার উন্মাদের যে সব লক্ষণের বর্ণনা করিয়াছেন, উহা যে ভূয়োদর্শনের ফল, সে কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকও অস্বীকার করিতে পারেন না।

মহামতি চরক উন্মাদের নানাপ্রকার চিকিৎসার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন, স্নেহ (তৈলমর্দন প্রভৃতি), স্বেদ, বমন, বিরেচন, নস্য, প্রহার, বন্ধন, অবরোধ, ভয়-প্রদর্শন, বিস্ময়োৎপাদন, বিস্মৃতি-জন্মান, শিরাব্যধন প্রভৃতির দ্বারা মানসিক রোগের চিকিৎসা করিবে। মহামতি চরক মনোবিকারের মানসিক চিকিৎসার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তবে, অনেক স্থলে তিনি তাঁহার কথা সংক্ষেপে সূত্রাকারে বলিয়াছেন। আধুনিক কালেও সংবেশন (Hypnotism), মনঃসমীক্ষা (Psycho-Analysis) প্রভৃতির সাহায্যে মানসিক বিকারের চিকিৎসা করা হয়। অনেক সময় চিকিৎসক মানস ব্যাধিতে 'ব্রোমাইড' প্রভৃতি নিদ্রাকারক ঔষধের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এরূপ ঔষধ কিন্তু অনেক সময়ে হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্য ও স্নায়ুমণ্ডলের অবসাদ আনয়ন করে। বায়ুনাশক ও সুপ্তিকারক এমন বহু ঔষধ ও তৈলাদির ব্যবস্থা ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে আছে যাহা পরিণামেও অহিতকর নয়।

আমরা বলিয়াছি, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক

ধরনের মনোবিকারের নাম Manic-depressive Insanity। 'ম্যানিয়া' কথাটি আমরা সাধারণত: একটা দুর্দমনীয় বাতিক অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু বিজ্ঞানে ইহার অর্থ আলাদা। 'Religion and Morbid Mental States' নামক গ্রন্থে ডা: স্কু (Schou) বলেন—

'Mania is the exact reverse of melancholia, its opposite in every respect. Patients suffering from melancholia are sad; those suffering from mania are glad and boisterous; in melancholia they are hampered in speech and can hardly utter a word whereas in mania they talk extravagantly, and their association of ideas takes place with abnormal liveliness.' [পৃ: ৪৫]

অর্থাৎ 'ম্যানিয়া' ব্যাধিটি সর্বাংশে 'বিষাদ'-বায়ুরূপ ব্যাধির বিপরীত। যাহারা 'অবসাদ'রূপ বায়ুরূপ, তাহারা সবদা বিষণ্ণ, যাহারা 'ম্যানিয়া-গ্রস্ত' তাহারা প্রসন্ন ও বহুভাষী। যাহারা বিষাদবায়ু-গ্রস্ত, তাহাদের কথাবার্তা বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহারা একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু 'ম্যানিয়া' নামক মানসিক বিকারে রোগী প্রগল্‌ভ-ভাষী হয় এবং তাহাদের মনে একটি ভাব উদ্বুদ্ধ হইলেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আনুষঙ্গিক ভাবসমূহ ভিড় জমায়।

আমরা বলিয়াছি, আধুনিক মনস্তত্ত্বে মানসিক বিকারকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়,- উন্মাদ বা psychosis এবং স্নায়বিক বিকার বা psychoneurosis. অবশ্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিকারের কারণও মানসিক, তবে ইহা চিকিৎসা-সাধ্য। ফরাসী দেশের অধ্যাপক জেনেট প্রথমত: এই শ্রেণীর বিকৃতির কারণ সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি প্রধানত: অপস্মার (Hysteria) রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর বিকৃতির কারণ দ্বিধা-খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব। অনেক সময়ে একই মানুষের মধ্যে ডা: জেকিল ও মিস্টার হাইডের মত দুইজন বিরুদ্ধ-প্রকৃতি মানুষ বাস করে, অনেক সময়ে আবার একজন ব্যক্তির মধ্যে বহু বিরুদ্ধধর্মা ব্যক্তি অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে সংযোগ-সূত্রটি যখন ছিন্ন হইয়া যায়, তখন স্নায়বিক বিকৃতি দেখা দেয়। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে, চিকিৎসক হিস্টিরিয়ার রোগী বা রোগিনীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি রোগীর দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির মধ্যে একটি পেন্সিল প্রবেশ করাইলেন। কোন তৃতীয় ব্যক্তি রোগীর কানে কানে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দিতে বলিলেন। দেখা গিয়াছে, রোগীর হাত উত্তর লিখিতেছে, অথচ সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবেই চিকিৎসকের সঙ্গে আলাপ করিতেছে। তাহার হাত কি লিখিতেছে, তাহা সে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছে না। হয়তো সে অতীত জীবনের বিস্মৃত কোন কাহিনীকে নিজের অজ্ঞাতসারেই লিখিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ লিখন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের লিখনের ন্যায়, ইহাকে automatic writing বলে।

ইহা মানুষের দ্বিধাখণ্ডিত ব্যক্তিত্বের একটি দৃষ্টান্ত।

সকলেই জানেন, ডা: ফ্রয়েডের মতে মানসিক বিকারের কারণ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়-সংযম নয়)। আমাদের মধ্যে যে সকল সমাজ-বিরোধী বাসনা থাকে, আমরা সেগুলিকে দমন বা নিগ্রহ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সেই সকল বাসনা মরিয়া যায় না, আমাদের মনের গভীর তলদেশে চলিয়া যায় মাত্র অর্থাৎ অচেতন মনে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফ্রয়েডের মতে অবদমিত কাম বা যৌন লালসাই প্রায় সকল ক্ষেত্রে মানসিক বিকার জন্মাইয়া থাকে। অসংবিদের এই বাসনাগুলিকে আমাদের দার্শনিক পরিভাষায় বলা হয় সংস্কার। ফ্রয়েড মানসিক বিকারের যে চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার নাম 'অবাধ ভাবানুষঙ্গ' বা Free Association Method.

এডলারের (ডা: আলফ্রেড এডলার, ১৮৭০-১৯৩৭) মতে প্রত্যেকটি মানুষ একটি স্বতন্ত্র বিশ্ব। এই ব্যষ্টি-বিশ্বে যাহা কিছু ঘটনা ঘটিতেছে, উহারা এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র হইলেও প্রত্যেকের কর্মধারার একটিমাত্র উৎস—সেটি হইতেছে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা (the will to power)।

নানা কারণে মানুষের এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেহ হয়তো রুগ্ন বা দুর্বল

হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কাহারও বা ছেলেবেলা হইতেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়, কাহারও বা পারিবারিক প্রতিবেশ প্রতিকূল হয়। - এই সকল কারণে মানুষের মনে নিজের প্রতি একটা হীনতাবোধ (feeling of inferiority) জন্মে। কিন্তু মানুষ এই হীনতাবোধকে জয় করিতে চেষ্টা করে। ধরুন, কোন ছেলে বা মেয়ে তাহার সহাধ্যায়ীদের চেয়ে দুর্বল, অপরে তাহাকে 'মারধর' করিলেও সে তাহার প্রতিকার করিতে পারে না। সে শুধু নিজেকে ধিক্কার দেয়। কিন্তু সে তো নিজের কাছে নিজে 'হীন' হইতে পারে না। তাই একদিন সে ভাবে, 'আমি দৈহিক শক্তিতে অপরের চেয়ে হীন বটে কিন্তু পড়াশুনায় আমি নিশ্চয়ই অপর সকলকে অতিক্রম করিব।' সে তখন দৃঢ় প্রযত্নের ফলে লেখাপড়ায় এমন কৃতিত্বের পরিচয় দেয় যে সকলে বিস্মিত হইয়া যায়। তাহার হীনতাবোধ অচেতন মনের তলদেশে নিমজ্জিত হয়, নিজের কৃতিত্বেই সে গর্ব অনুভব করে। এই গর্বই inferiority complex,—inferiority complex অর্থে হীনতাবোধ বা হীনম্মন্যতা নয়। তবে অনেক বিদেশীয় পণ্ডিতও কথাটির অপপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমরা যে বালকের দৃষ্টান্ত দিলাম, তাহার মনের রাজ্যে একেত্রে 'ক্ষতিপূরণ' বা compensation ঘটিয়াছে। এই ক্ষতিপূরণ-প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হইলেই নানাপ্রকার মানসিক বিকার দেখা দেয়। সমস্ত মনোবিকারের মূলে রহিয়াছে হীনতাবোধ ও নৈরাশ্য। অর্থনৈতিক কারণে কিংবা দাম্পত্যজীবনে সংঘর্ষ বা বিরোধের ফলেও এই নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। মানুষ স্বপ্নের মধ্যেও তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকেই পূরণ করে। দম্পতির জীবনেও এই প্রভুত্বপ্রিয়তা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

মানুষের জীবনের ব্যর্থতা বা সার্থকতা অনেকটা পরিমাণে পারিবারিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। মাতাপিতার একমাত্র সন্তান বা আদুরে সন্তান প্রায়ই জীবন-সংগ্রামে অপটু হয়, সে অপরের কাছে শুধু পাইতে চায়, অপরকে কিছু দিতে চায় না। পক্ষান্তরে, যে ছোট শিশুটির অনেকগুলি ভাই-বোন থাকে, সে মাতাপিতার স্নেহ-ভালবাসার সামান্য অংশই প্রাপ্ত হয়। এরূপ শিশুর মনে ভাইবোনদের সকল বিষয়ে অতিক্রম করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইতে পারে এবং সে কালে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে।

জীবনের হীনম্মন্যতা বা ব্যর্থতাবোধ হইতে শুধু যে মানসিক বিকার দেখা দিতে পারে, তাহা নহে, অবস্থা-বিশেষে ইহা মানুষকে অপরাধ-প্রবণও (criminal) করিয়া তুলিতে পারে। দেখা যাইতেছে, এডলারের মতে হীনতা-বোধই মানসিক রোগের কারণ। আমাদের মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, উহা যখন ব্যর্থ হয়, তখনই আমাদের মনের ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়।

ফ্রয়েডের অন্যতম শিষ্য ইউঙ (Jung) তাঁহার গুরুর মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলেন, আমাদের মানসিক বিকারের মূলে কখনও থাকে কাম, কখনও বা থাকে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। তিনি মানুষকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—বহির্মুখ মানুষ ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। বহির্মুখ মানুষেরা সামাজিক, বহির্জগতের ব্যাপারে ইহাদের আগ্রহ বা কৌতূহলের অন্ত নাই, আর আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা অসামাজিক, ইহারা প্রত্যেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত বিচ্ছিন্ন। এই শ্রেণীর মানুষ বিশাল বহির্জগতের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করিতে পারে না। সাধারণতঃ, ইহাদের মধ্যেই মানসিক বিকৃতি দেখা দিয়া থাকে।

ফ্রয়েডের মতে কাম বা আদিম জৈব প্রবৃত্তিই মানসিক বিকারের কারণ। সভ্য মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনার সহিত জীবধর্মের সংঘর্ষ দেখা দেয়, তাই মানুষ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিতে বাধ্য হয়। এই নিগ্রহের ফলেই মানুষের জীবনে নানারূপ বিকৃতি দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মতে আতিশয্য আছে, একথা অবশ্য স্বীকার্য, কিন্তু তিনি যে মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশে আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি কয়েক প্রকার মানসিক বিকারের অভিনব চিকিৎসা-প্রণালীও আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি মানসিক বিকারের কারণ-সম্পর্কে একটি কথা বলিয়াছেন যাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আমাদের মনোবিকারের মূল কারণটি অনেক সময়ে শৈশবেই উৎপন্ন হয়। আমরা কোন শিশুকে অতিমাত্রায় আদর দিয়া বা তাহার মনে ভয় জন্মাইয়া অথবা তাহার দেহে কোনরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া তাহার অকল্যাণ সাধনই করিয়া থাকি। শিশুকে 'মানুষ করিয়া তোলার' যে সুমহান দায়িত্ব মাতাপিতার উপর ন্যস্ত, তাঁহারা অনেক সময়েই তাহা পালন করেন না।

স্বাস্থ্যের বিধি পালন করিলে যেমন আমরা অনেক সময়ে দৈহিক রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি, তেমনই মনঃসংযম অভ্যাস করিলে ও সদাচার পালন করিলে আমরা অনেক সময়ে মনোবিকারের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি। আমরা বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের অধীন, উহাদের উপর আমাদের কোন প্রভুত্ব নাই কিন্তু আমার মনকে আমি শাসন করিতে ও ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারি। মহর্ষি চরক বলেন, রজোগুণ তমোগুণই মানসিক রোগের কারণ। আমরা যে পরিমাণে চিত্তের প্রশান্তি রক্ষা করিতে পারিব, যে পরিমাণে কাম ক্রোধ লোভ ঈর্ষা দ্বেষ প্রভৃতিকে জয় করিতে পারিব, যে পরিমাণে মিতাহারী ও মিতাচারী হইব, সেই পরিমাণে

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP

আমাদের মন স্বচ্ছ বা প্রকৃতিস্থ হইবে। যাহা কঠিন বলিয়া মনে হয়, অভ্যাসের দ্বারা তাহা সুগম হইতে পারে।

মনীষী ফ্রয়েড যাহাকে অচেতন মন বলেন, আমাদের পরিভাষায় তাহা কতকগুলি সংস্কারের সমষ্টি। অশুভ সংস্কারসমূহ আমাদের চিত্তকে মলিন করে, ইহারাই আবার সময় সময় আমাদের স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে। মহর্ষি পতঞ্জলি স্মৃতির সংজ্ঞা দিয়াছেন—

'অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ'।'

যে বিষয় পূর্বে অনুভব করা হইয়াছে, তাহা ভিন্ন অন্য বিষয় গ্রহণ না করার নাম স্মৃতি।

আমাদের সংস্কারগুলি কখনও বা জাগ্রদবস্থায়, কখনও বা স্বপ্নাবস্থায় মনের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে। স্বপ্নে অনেক সময়ে সংস্কারসমূহ ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া আমাদের মনের সম্মুখে উপস্থিত হয়—ফ্রয়েডের এই সিদ্ধান্ত মোটামুটি মানিয়া লওয়া যায়। এই সংস্কারই আমাদের সকল কর্মের নিয়ন্তা, মানবীয় কর্মধারার উৎস-সন্ধানে যাত্রা করিলে আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি বাসনা বা সংস্কারই আমাদের জীবনের সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সেইজন্যই মানুষ যুক্তির আশ্রয়ে যাহা 'ধর্ম' বা 'কর্তব্য' বলিয়া বুঝিতে পারে, জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিতে পারে না। এই জন্যই মানুষের পক্ষে কোন কদর্য অভ্যাস ত্যাগ করা এমন কষ্টসাধ্য। অসহায় মানুষ তাই বলিয়া থাকে 'জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।' যোগীরা কঠোর সাধনার দ্বারা এই সংস্কারসমূহকে নির্মূল করিতে চেষ্টা করেন, কারণ তাঁহাদের লক্ষ্য আত্মজয়। যিনি আত্মজয়ী, তিনিই তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। কিন্তু আত্মজয়ের কৌশল মানুষকে ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতে হয়। আমরা বলিয়াছি, বলপূর্বক ইন্দ্রিয়-নিরোধ করাটাই সকল সময়ে কল্যাণের পথ নহে। আমাদের শাস্ত্রে ইহাকে বলা হইয়াছে 'হঠনিরোধ', ফ্রয়েড ইহাকে বলেন Repression. ফ্রয়েড অবশ্য কামের ঊর্ধ্বগতি বা Sublimation-এর কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু কোন্ বিশিষ্ট সাধনার মধ্য দিয়া আমাদের নিম্নগামিনী প্রবৃত্তিকে ঊর্ধ্বগামিনী করা যায়, একমাত্র ভারতবর্ষ তাহা আবিষ্কার করিয়াছে।

ভারতের বিচিত্র ধর্মসাধনা এই প্রবৃত্তিকে ঊর্ধ্বগামিনী করিবারই সাধনা। এই সাধনার দ্বারাই মানুষ নবজন্ম লাভ করে, তাহার দেহে ও মনে ঘটে রূপান্তর।

যে কোন সাধনাই মানুষ অবলম্বন করুক না কেন, তাহাকে মিতাহারী মিতাচারী হইতে হইবে। বাক্‌সংযম অভ্যাস করিতে হইবে। পরনিন্দা পরচর্চা পরিহার করিতে হইবে। প্রতিদিন আত্ম-বিশ্লেষণ ও আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে। আত্মজয়ের আর কোন উপায় নাই।

শুধু ভাবনার দ্বারাই যে মানুষ দেবজন্ম লাভ করিতে পারে, সে কথাও ভারতের ঋষিগণ বলিয়াছেন। ভাবনা একরূপ auto-suggestion. শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ। শাস্ত্রে আছে যাহার যেমন ভাবনা, তাহার তেমন সিদ্ধি। 'আমার রোগ নাই' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মানুষ রোগমুক্ত হইতে পারে। যাহার স্মৃতিশক্তি অল্প, সে শুধু ভাবনার দ্বারা স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। যে মনে করে আমাকে ভূতে পাইয়াছে, তাহাকে সত্যই ভূতে পায়, আবার যে মুহূর্তে সে বিশ্বাস করে যে ভূত আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্তেই ভূত তাহাকে ছাড়িয়া যায়। এই জন্যই ভূতের ওঝা নানা রকমের তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় লইয়া থাকেন। তিনিই উত্তম চিকিৎসক যিনি রোগীর মনে আশা ও বিশ্বাস জাগাইয়া তুলিতে পারেন, রোগীকে অভয় দান করিতে পারেন। বৈদান্তিক বলেন, যে নিজেকে বদ্ধ মনে করে, সে বদ্ধই হইয়া যায়, আর যে নিজেকে মুক্ত বলিয়া ভাবনা করে, সেই মুক্ত হয়। তাই প্রতিদিন প্রাতঃকালে এইরূপ চিন্তা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্'॥

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছিলেন— 'আমি বীর্যবান্,' 'আমি প্রজ্ঞাবান', 'আমি মেধাবান্', 'আমি শক্তিমান' প্রতিদিন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে। 'আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অভয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। বাস্তবিক, মানুষ মহাশক্তির আধার কিন্তু ভাবনার দ্বারাই সেই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হয়। এই মহাশক্তির জাগরণে আমাদের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, উহা ধীরে ধীরে আমাদের সকল অশুভ সংস্কারকে দগ্ধ করিয়া ফেলে। এইভাবে আমরা ধীরে ধীরে আত্মজয়ের পথে অগ্রসর হই। যিনি যে পরিমাণে আত্মজয়ী হইবেন, তিনি সেই পরিমাণে অপরের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। বাস্তবিক যিনি আত্মজয়ী, তিনিই যথার্থ বীর, সেকেন্দার বা সিজার, হ্যানিবল বা নেপোলিয়ান যথার্থ বীর নহেন। আচার্য শঙ্কর যথার্থ ই বলিয়াছেন—

'জিতং জগৎ কেন? মনো হি যেন'।

'জগৎটাকে জয় করিয়াছেন কে? নিজের মনকে জয় করিয়াছেন যিনি। বিবেকানন্দের ভাষায়—'He conquers all who conquers self.'

শঙ্খিনী

সুনীল ভট্টাচার্য

ছুটির দিন। বস্তিটার সামনে বেদের ছেলে সনাতন তার সাপের ঝাঁপিগুলো নিয়ে বসেছে। ওর সামনে বস্তির লোকগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সনাতন গাল ফুলিয়ে সাপুড়ে বাঁশিটা বাজিয়ে চলেছে। সাপের ঝাঁপিগুলো সামনে সাজানো। সবকটারই ডালা বন্ধ। সনাতন সাপুড়ে বাঁশিটা হেলিয়ে-দুলিয়ে ঝাঁপিগুলোর উপরে চারপাশে নাচিয়ে নাচিয়ে বাজিয়ে চলেছে। সাপ-খেলানো বাঁশির সুরে একটানা মোহ, মহুয়ার মাদকতা—নাগিনীকন্যার বুকের 'জহর' উথলে উঠছে। ঝাঁপির মধ্যে সাপগুলো থেকে থেকে কী গভীর ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস টানছে, ছাড়ছে। বন্দী ভুজঙ্গের বুকে ঝিম খাওয়া জ্বালাটা আবার আগুনপারা হয়ে জ্বলে উঠছে। নাগিনীকন্যার বুকের 'জহর' উথলে উঠছে।

ভিড়ের মধ্যে কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটা যেন হেলেদুলে উঠছে। চোখেমুখে মাদকতা, বেদেনী রক্তে দোলা লাগছে। মেয়েটা উছল হয়ে উঠছে।

সনাতন এক হাতে বাঁশি বাজাতে বাজাতে অন্য হাতে একটা ঝাঁপি খুলে একটা কালো কুচকুচে কেউটের গায়ে খোঁচা দিয়ে বাঁশিটা আবার দু হাতে বাজিয়ে চলেছে। কেউটেটা বিষম ফুঁসিয়ে উঠে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, ছোবল মেরেছে। সনাতন ছোবল বাঁচিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে বাঁশিটা বাজিয়ে চলেছে। বাঁশির সুরে সুরে নাচের তালে তালে কেউটেটাও হেলেদুলে নেচে চলেছে। ফোঁস করে কেউটেটা আবার একটা ছোবল মারে। ছোবলটা বাঁশির লাউয়ে এসে ঠক্ করে বাজে। সাপটা বাঁশির সুরে সুরে আবার নেচে চলেছে। ফোঁস করে আবার একটা ছোবল। সনাতন বাঁশি থামিয়ে কেউটেটার মুখের কাছে ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে মুঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গান ধরে—

ওরে ও কালনাগ কালকেউটে—
কালনাগিনীর মনচোরা—

কেউটেটা দুলতে দুলতে সনাতনের মুঠি লক্ষ্য করে ছোবল মারে। সনাতন ছোবল বাঁচিয়ে হাত নাচিয়ে মুঠি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গেয়ে চলে—

ওরে ও তোর নয়ন কালো বিষভরা
ওরে ও কালনাগিনীর মনচোরা—

সাপটা দুলতে দুলতে আবার একটা ছোবল মারে। সনাতন কেউটেটাকে হাতে করে তুলে ধরে, মুখের কাছে মুখ এনে মুখে একটা চুমকুড়ি দিয়ে ফের গেয়ে চলে—

ওরে ও কালনাগরে
তোর রূপে ভোর কালনাগিনীর মন জর
উদাস সাঁঝে কন্যা কান্দে মন-থর
ওরে ও কালনাগ—কালকেউটে…

কেউটেটা ছোবল মারতে পারে না। সনাতন ফণার নীচে শক্ত মুঠিতে ধরে রয়েছে। সাপটা বাকি শরীরটা দিয়ে সনাতনের হাত পা পেঁচিয়ে ধরছে। জিবটা বিদ্যুতের মত হিলহিল করে বারে বারে বেরিয়ে আসছে। রসিক বেদে, বেদের ছেলে সনাতন কেউটেটার মুখের কাছে আর একটা চুমকুড়ি দিয়ে তাল ফেরতায় গান ধরে—

ওহে নাগর
আহা, তুমি রাগ কর মিছে,
কন্যা তোমায় এন্তে দিবো পিছে
ওহে ও নাগর
আহা, রাগ কর মিছে।

সনাতন গান থামিয়ে কেউটেটার প্যাঁচ ছাড়িয়ে, সাপটার লেজটা একটু মাড়িয়ে কেউটেটাকে ভুমিতে ছুঁড়ে মারে। কেউটেটা সাঁ করে মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়ায়, সনাতনের দিকে একটা ছোবল মারে। সনাতন ছোবল বাঁচিয়ে সকলের দিকে চেয়ে বলে, উ কী রাগ। রাগ দেখগো, সাপের আমার রাগ দেখগো। সনাতন সাপটাকে আবার একটা খোঁচা মারে। কেউটেটা এবার সাঁ করে মুখ ফিরিয়ে লোকগুলোর দিকে তেড়ে যেতে চায়। সনাতন

কেউটেটাকে লেজ ধরে টেনে আনে। মুখে আর একটা চুমকুড়ি দিয়ে গেয়ে ওঠে—

আহা—মান করে চলে যেও না
আহা—মুখ ফিরিয়ে চলে যেও না
কন্যা তোমায় এনে দেব—ও কালকেউটে।

সাপটা আবার একবার ছোবল মারে। সনাতন বলে, ওগো তোমরা দেখ গো, সাপের আমার অনুরাগ দেখ গো। আহা এন্তে দেব। এন্তে দেব, কন্যা তোমায় এন্তে দেব।—সনাতন কেউটেটাকে ঝাঁপির মধ্যে পুরে রাখে।

কেউটেটাকে ঝাঁপি বন্ধ করে সনাতন আর একটা ঝাঁপির ডালা খুলে মস্ত একটা পদ্মগোখরো বার করে এনে মাটিতে রাখে। পদ্মগোখরোটা কুলোপানা চক্কর তুলে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে দোলে। ফণাটা সিঁদুর ঢালা। ভিড়ের মধ্যে কালো মেয়েটা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠছে। চোখে-মুখে অস্থিরতা। বাঁশী আবার বেজে ওঠে। বাঁশীর সুরে মেয়েটা আবার মদিরঘন হয়ে ওঠে। মেয়েটা দুলে দুলে ওঠে। সনাতন এক হাতে বাঁশীটা বাজাতে বাজাতে আরও দুটো-তিনটে ঝাঁপির ডালা খুলে দুটো খয়ে, একটা বঙ্করাজ আর একটা শাঁখামুঠি বার করে এনে মাটিতে রাখে। শাঁখামুঠিটা মাটিতে নির্জীবের মত পড়ে থাকে, বঙ্করাজও তেমনি, খয়ে দুটো একটুখানির জন্যে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল, এখন আবার ঝাঁপির মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে। সনাতন ও-দুটোকে টেনে আনে, খোঁচা মারে। খয়ে দুটো ফোঁস করে উঠে ফণা তুলে দাঁড়ায়। আবার ঝাঁপির দিকে এগিয়ে চলে।

মেয়েটা আবার কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠছে। নিঃশ্বাস ঘন হয়ে বুকটা দ্রুত ওঠা-পড়া করছে। মেয়েটা উত্তেজনা চাপবার ভঙ্গীতে অপরূপ করে নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে। মেয়েটা ভিড়ের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, তুর্ সব সাপ কটা মরা, সব কটা মরা তুর্!—সনাতনের চমক লাগে। মুখ তুলে চায়। মেয়েটাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে, দৃষ্টিটা কিন্তু ঝকঝকে নাগিনীকন্যার দৃষ্টি।

সনাতন মেয়েটার দিকে একটা তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বাঁশিটা আবার ধরে।

পদ্মগোখরোটা ঠায় সেই ভাবে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু খয়ে দুটো ঝাঁপির মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। সনাতনের গাটা রি রি করে জ্বলে ওঠে। একটা চাপা আক্রোশে সনাতন সাপ দুটোর গায়ে কঠিন আঙুলে খোঁচা মারে। বাঁশিটা বাজিয়ে চলে। খয়ে দুটো খোঁচা খেয়ে ফোঁস করে ওঠে। ফণা তুলে দাঁড়ায়, আবার ঝিম খেয়ে নেতিয়ে পড়ে। মেয়েটার চোখ দুটো ধারালো হয়ে উঠেছে, নীচের আধখানা পুরু ঠোঁট দাঁতে কামড়াচ্ছে। মেয়েটা শানিত হয়ে উঠেছে। মেয়েটা ভিড় ছেড়ে সনাতনের দিকে কয়েক পা এগিয়ে আসে। ফের চেঁচিয়ে বলে ওঠে, তুর সব সাপগুলো মরা, সবগুলো বুড়া, তুর—সনাতনের চোখ দুটো ঝকমক্ করে জ্বলে ওঠে। মেয়েটার সামনাসামনি উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটার দিকে চায়। মেয়েটা অপরূপ ভঙ্গিতে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে রয়েছে। মেয়েটার সব কিছুই মোহিনী। সনাতনের চোখের আগুনটা মিলিয়ে আসে। তার বদলে চোখে ফুটে ওঠে ধূর্ত কেউটের কুটিল চাউনি। মুখে ভেসে ওঠে কুটিলতর হাসি—সারা শরীরটা বুনো 'খরিসের' মত ধারালো হয়ে ওঠে।

সনাতন মেয়েটাকে বলে, আছে আছে, একটা জীয়ন্ত সাপ আছে—খেলাবি, তুই খেলাবি?

মেয়েটা যেন নেচে ওঠে। বলে, খেলাব, নিশ্চয় খেলাব, বার কর্। কুন ঝুঁপিটায় বুলে দে—খেলাব নিশ্চয় খেলাব।—সনাতন চারধারে চেয়ে লোকগুলোকে শুনিয়ে বলে, তোমরা দেখগো, আমার কিন্তু দোষ নাই, কামান ইস্তেক হয় নাই তা কিন্তু বলে দিচ্ছি। একেবারে সন্ত সন্ত ধরা বুনো আল কেউটে, তা কিন্তুক বলে দিচ্ছি।

ওরা ভাবে, দেখাই যাক না বেদেনী নাগিনী মেয়েটা কেমন করে বুনো সাপটাকে খেলায়। মেয়েটা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে, বলে, কই, বার কর্ তোর জীয়ন্ত সাপটারে, বার কর্।

সাপটা নাড়া খেয়ে বিষম গর্জে উঠছে, ফুঁসিয়ে উঠছে। সনাতন বড় ঝোলাটা থেকে মস্ত একটা মাটির হাঁড়ি বার করে এনে মেয়েটার সামনে নামিয়ে রাখে। মেয়েটাকে ফের বলে, ভেবে দেখ্ কিন্তুক, একেবারে সন্ত সন্ত ধরেছি।—মেয়েটার চোখমুখ ঘনিয়ে আসে, চোখ দুটিতে কিন্তু

মোহিনী বাঘিনী তুমি। মেয়েটা সনাতনের হাত থেকে বাঁশীটা নিয়ে, আঁচল দিয়ে বাঁশীটার মুখটা মুছে, হাড়িটার কাছে গিয়ে বসে। সনাতন আবার বলে, কামান ইস্তেক হয় নাই, আবার বলে দিচ্ছি, কামান ইস্তেক হয় নাই কিন্তু—

মেয়েটা ততক্ষণ বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে, কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটা বাঁশীটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে হাঁড়িটার উপরে নাচিয়ে নাচিয়ে বাজিয়ে চলেছে। সনাতন তাই দেখে সকলের দিকে চেয়ে বলে ওঠে, তোমরা একটু সরে সরে দাঁড়াওগো। কিছু বলা যায় না। একেবারে সত্ত সত্ত ধরা বুনো আলকেউটে। মেয়েটা গাল ফুলিয়ে বাঁশীটা বাজিয়ে চলেছে। মেয়েটা ঘনিয়ে উঠেছে। মেয়েটার সারা চোখ মুখে আবেশ ঘনিয়ে উঠেছে। মেয়েটা গাল ফুলিয়ে বাঁশীটাকে হাঁড়ির উপরে চারপাশে নাচিয়ে, দুলিয়ে দুলিয়ে বাজিয়ে চলেছে। সনাতনের চোখে মুখে বিস্ময়। মেয়েটা নিশ্চয় সাপুড়ে মেয়ে, বেদেনী কন্যে, তা না হলে এত সাহস! কিন্তু, মেয়েটা ভারী সুন্দর সুরে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে। কন্যার সুরে বিষ-ছলছল সাপটা গজরাচ্ছে। বন্দী, আহা বন্দী ভুজঙ্গের পরাণের জ্বালাটা আবার আগুনপারা হয়ে জ্বলছে। নীল রাত—বিষ রাত, চৈতালী জোছনা। উন্মুক্ত প্রান্তরে তাপিনী নাগিনী কন্যা কাঁদছে, থেকে থেকে শিস দিয়ে ডেকে উঠছে। আহা আছড়ে আছড়ে পড়ছে। কন্যা কাঁদছে। সাপটা হাঁড়ির মধ্যে ছোবল মারছে, হাঁড়িটা তোলপাড় খেয়ে দুলে উঠছে। দোলা লাগছে মেয়েটার বুকে, সর্বাঙ্গে মেয়েটার যৌবন যেন উথলে উঠছে। বাঁশী বাজাতে বাজাতে মেয়েটা হাঁড়ির গায়ে একটা চাঁটি মারে, সাপটা বিষম ফুঁসিয়ে ওঠে, ঠকাঠক হাঁড়ির গায়ে ছোবল মারে। মেয়েটার বুকে দোলা লাগছে, মেয়েটার যৌবন ঢল-ঢলিয়ে উঠছে, নেচে উঠছে। মেয়েটা বাঁশী থামিয়ে এবার ললিত কণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে—

ওরে ও কালনাগ
তোরে নাগ-কেশরের মালা দিব
ফুলের বসন ভূষণ দিব
মাগমতী কন্যা দিব
ফুলের শয়ন হে।
তোরে [illegible] দিব
সোহাগ ভরা রাত দিব
মিঠে ফুলের বাণ দিব
ও নাগ ধৈর্য ধরহে।

গান থামিয়ে, মেয়েটা হাঁড়ির বাঁধনটা খুলে ফেলে। হাঁড়িটার গায়ে আর একটা চাঁটি মারে। সাপটা গর্জে ওঠে। সনাতনের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। মেয়েটা নিশ্চয়ই নাগিনীকন্যা, সাপুড়েকন্যা—তা না হলে এত সাহস!

সনাতন দেখে মেয়েটা কেমন অপরূপ হয়ে উঠেছে। মেয়েটাও ঢুলু ঢুলু নাগিনী চোখে সনাতনের দিকে একবার ফিরে চায়, তারপর হাঁড়িটার দিকে ফিরে হাঁড়িটার ঢাকনা খুলে দেয়। ফোঁস।—বুনো সদ্যধরা কেউটেটা নিমেষমাত্র হাত দেড়েক সিধে হয়ে উঠে দাঁড়ায়; পিছন দিকে একটু হেলে দাঁড়িয়ে, ফণাটা একদিকে একটু কাত করে মেয়েটার মুখের দিকে জিব হিলমিল করে চায়, বুকটা থলথলিয়ে ওঠে। মেয়েটার বুক লক্ষ্য করে তীব্র গতিতে ছোবল মারে, ঝাঁপিয়ে পড়ে। সকলে হায় হায় করে ওঠে, সনাতনের তীক্ষ্ণ চেহারাটা কেমন মিইয়ে আসে। মুখটা শুকিয়ে ওঠে। গেল, মেয়েটা বুঝি সত্য-সত্যই গেল।

মেয়েটা কিন্তু খিলখিল করে হেসে ওঠে। ভূমিতে লুটোপুটি খায়। মেয়েটা অদ্ভুত কৌশলে সাপটার ঠিক ফণার তলাটা শক্ত মুঠিতে ধরে ফেলেছে। সাপটার ঝাপটায় মেয়েটা ভূমিতে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু হাসছে, ধূলায় লুটোপুটি খাচ্ছে আর হাসছে, কন্যার অঙ্গে যৌবন যেন উছলে উঠছে। মেতে উঠছে। মেয়েটা হাসছে, লুটোপুটি খাচ্ছে, বার বার বলে উঠছে, নাগর, উঃ তুর সরম নাই, পাজি তুর লজ্জা নাই, পেরথম দিষ্টিতেই তুমার বুকের পরে নজর, উঃ নাগর, ছিঃ ছিঃ তুর সরম নাই। মেয়েটা খিলখিলিয়ে উঠছে, লুটোপুটি খাচ্ছে। সাপটা তার চিকন দেহটা দিয়ে মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরছে। পেঁচিয়ে ধরছে। মেয়েটার লাগছে। মেয়েটা সাপের প্যাঁচগুলো খুলতে খুলতে বলে, লাগছে। বড্ড লাগছে, ও জাদু বড্ড লাগছে। পেরথম প্রণয়েই কী এত্তো জোরে চিপতে আছে।

সাপটার কালো লালচে জিবটা বিদ্যুতের মত হিলমিল

সাপের ঝাঁপিটা হাতে নিয়ে হাফিজখানের দিকে হনহনিয়ে হেঁটে চলে।

সঙ্গী-সাথীরা তাঁবু গুটিয়ে চলে গেলে সনাতন এই প'ড়ো ভগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ প্রাসাদটায় উঠে এসেছে। প'ড়ো প্রাসাদটার নাম হাফিজখান। কবেকার কোথাকার নবাবের তা কে জানে। অগুনতি অলিন্দ গলিপথ, ভাঙা মহল, একটা গোলোকধাঁধাবিশেষ। এরই একটা ঘরে সনাতন থাকে।

দূর থেকে সাঁওতালী বাঁশি-মাদলের সুর ভেসেআসছে। হাওয়ায় ফুলের গন্ধ। মহুয়ায় বাতাস ভারী হয়ে বইছে। এই সময়টা চৈতালী জোছনা মাতাল করে। নাগ-নাগিনীরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। নাগিনীরা উন্মন হয়ে শিস দেয়—উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিপূর্ণ জোছনায় নাগিনীরা শিস দিয়ে ডাকে। ঘাসের বন দিয়ে ওরা শন্‌শন্ করে ছুটে আসে—খরিস্, গোখরো, কেউটে—তারপর লতায় লতায় জড়াজড়ি, হাওয়ায় দোল্ দোল্; শঙ্খ দোলা খায়।

ওধারে তাপিনী নাগিনী উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ছোটাছুটি করে। পথ চেয়ে ঘাসের বনে মাথা তুলে দাঁড়ায়। কেঁদে কেঁদে মরে। গান গায়। কাঁদে, ফুঁপিয়ে ওঠে, ডাক দেয়।

বন্দী নাগ সাপুড়ের ঝাঁপিতে ফুঁসিয়ে ওঠে। বুকের ভিতরটা আগুনপারা হয়ে জ্বলে ওঠে। কন্যা কাঁদছে। একা একা বালুর চরে কাঁদছে। নিজের অঙ্গে ছোবল মেরে মেরে কাঁদছে। নাগিনী-বিরহিণীর প্রাণ যায়, বালুর চরে প্রাণ কাঁদে।

হাফিজখানের দিকে যেতে যেতে সনাতনের বুকটা বিষম মুচড়ে ওঠে। আহা, কন্যা তার কাঁদছে, ফুলে ফুলে টলে টলে কাঁদছে।

সাহেবিনী মদ খায়, হল্লোড় করে। বুকের ভেতরটায় ছোবল মারে। সাহেব চাবুক মারে, ফুর্তির শেষে লাথিয়ে লাথিয়ে বেদেনী মেয়েটাকে ঘর থেকে বার করে দেয়। কন্যার দুঃখে মনটা কেঁদে ওঠে। বুকের নাগটা মাথা তুলে দাঁড়ায়। কিন্তু কন্যা ছোবল মারে, বিষ ঢেলে দেয়, কাছে আসে না। চুমায় চুমায় বিষ তুলে নেয় না। আছড়ে পাছড়ে পড়ে না, দোল খায় না। বুকটা জ্বলে যায়, কন্যা সাহেবিনী হয়ে কুঠির-ঘরে যায়, সাহেবের কোমর ধরে নাচে।

সনাতনের বুকটা হুহু করে ওঠে। হাফিজখানের দিকে আর যাওয়া হয় না।

কন্যা কাঁদছে। নীল জ্যোৎস্না জরজর, বিষকন্যা কেঁদে কেঁদে ডাকছে। ঝাঁপির সাপটা গর্জে ওঠে। সনাতন ঝাঁপিশুদ্ধ সাপটাকে দূরে ছুঁড়ে দেয়। তারপর হন্‌হনিয়ে কয়লাকুঠির দিকে এগিয়ে চলে। চৈতালী রাত—এখানে ওখানে হাস্নুহানার-গাছ, গন্ধে বাতাস বইছে। শালের বনের মধ্যে দিয়ে সনাতন হনহন করে এগিয়ে চলেছে। কন্যা কাঁদছে।

শঙ্খিনী কাঁদছে। কুঠির দোরগোড়ায় মুখ গুঁজে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। নাচ মদ তার সব মিটেছে, সাহেব শঙ্খিনীকে লাথিয়ে ঘর থেকে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করেছে। বেদেনী মেয়ে কাঁদছে। সাহেবিনীর খোলস পুড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে। খোঁপায় ফুল, ফিনফিনে শাড়ি, ঢলঢল অঙ্গের লাবণি, সাঁঝ গড়িয়ে গেলে সাহেবিনী, মাঝরাতে বেদেনী কাঁদে। গান গায়—

> ওরে লক্ষীন্দররে।
> নাগিনী বেদেনী
> সতী নই, অসতী কন্যা আমি রে।
> ও নাগ লক্ষীন্দরে বাঁচাও
> অসতীরে দংশাও
> বুকে বিষ ঢেল্যে দাও
> লক্ষীন্দরে বাঁচাও
> ও আমার প্রাণের লক্ষীন্দর রে।

সনাতন শিয়রের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ধীরে গভীর গলায় ডাকে, শঙ্খিনী।—শঙ্খিনী ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। সনাতন আবার ডাকে, শঙ্খিনী।—শঙ্খিনী মুখ তুলে চায়। নয়নজলে চাঁদের আলো ঢেউ খেলিয়ে যায়। সনাতন শঙ্খিনীর দেহটা পালকের মত গভীর মমতায় বুকে তুলে নেয়। হাঁটতে আরম্ভ করে। চাঁদের আলোয় বুক ভরে যায়। শালের বনে লতায় লতায় দোল্ দোল্। শালের গন্ধে নাগমতী জেগে ওঠে। শঙ্খিনী কাঁদে না, দংশায় না। মিঠে হাওয়ায় বেদেনীর কালো চুল রাত্রিতে উড়ে যায়।

তবুও মোহ কাটে না। ফুলেল তেল, বেলোয়ারী চুড়ি, রেশমী শাড়ি, আর সারা বস্তির সাহেবিনী নামের

মোহ। দিনের বেলায় সাহেবিবী বেদের ছেলেকে তাচ্ছিল্য করে, আমল দেয় না, চলে যায়। শুধু জীয়ন্ত সাপের কথায় ফিরে চায়, মদির হয়ে আসে। বাঁশী বাজায় আর রাত্রিতে যখন সাহেবের কুঠির দ্বারে সাহেবিনীর আহত দেহটায় অসহায় বেদের মেয়ে শঙ্খিনী পড়ে থাকে, তখন ও কাঁদে। ওর নয়নজলে চাঁদ দোলা দেয়। বেদের মেয়ের মনে পড়ে শিলাবতীর চরে ছোট্ট ছাউনির কথা—বেদে বেদেনী। মুক্ত জীবন। মেয়েটা কয়লাকুঠিতে সাপ খেলাতে এসেছিল। ফিরে আর যায় নি। বেলোয়ারী চুড়ি, রেশমী শাড়ি, সৌখীন সাজসজ্জা ওকে বন্দী করে ফেলেছে। বন্দী পোষমানা ভুজঙ্গী তবু জীয়ন্ত সাপের কথায় আর কান্না-জাগর প্রতি রাত্রে ওর মনে পড়ে, এই ক্লেদাক্ত জীবন আর সেই মুক্ত জীবনটার কথা। বুকের ঝিম-খাওয়া নাগিনীটা ব্যথায় গুমরে ওঠে। বাঁশী আর বাজে না। সৌখীন বাঁশীর সুরে ও নাচে, মদ খায়, হুল্লোড় করে। দেহ দেয়, তারপর মার খেয়ে কাঁদে। সনাতনের ডাকে ও চোখ তুলে চায়, চাঁদের আলো ওর চোখের জলে ঢেউ খেলিয়ে যায়।

হাফিজখাসের ঝাঁপিবন্দী সাপগুলো আর গরজায় না। শঙ্খিনীর জন্যে—শুধু শঙ্খিনীর জন্যে সনাতন ওগুলোকে ধরেছে। সাপগুলো নির্বিষ হয়ে ঝাঁপির মধ্যে নিঃশ্বাস টানছে। গর্জায় না। সনাতন ব্যাঙ ধরে দিলে খায়, গিলে ফেলে—তারপর আবার মুখ নামিয়ে, কুণ্ডলি পাকিয়ে মুখ লুকিয়ে শুয়ে থাকে। হয়তো মনেও পড়ে না, অরণ্য ঘাসের মধ্য দিয়ে ওরা শন্‌শন্ করে ছুটে চলত—শিলাবতীর চরে। কালো খয়েরি মেটে সুচিক্কণ দেহ। মুক্ত জীবন। অসাড় হয়ে গেছে। বাইরে বিষরাত নীল জ্যোছনা কাঁদে, ওরা শুনেও হয়তো শোনে না। কিংবা গুমরে ওঠে, শুধু ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে।

হাফিজখাসের ঘরে শুয়ে শুয়ে সনাতনও মাঝে মাঝে ভাবে—মুক্ত জীবন। মনটা হু-হু করে ওঠে। ছুটে বেরিয়ে যেতে প্রাণ চায়। সনাতনও বন্দী হয়েছে, ঝাঁপিগুলোর দিকে চেয়ে সনাতনের মনটা কেঁদে ওঠে। সাপগুলো নির্বিষ। মেয়েটা বিষদাঁত ভেঙে বিষ টলটলে ঝিনুক সনাতনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে সাপগুলোকে বশ করে ফেলেছে। জীবনটা পঙ্গু হয়ে আসছে। হাফিজখাসের ঘরটা গুমট হয়ে ওঠে। সনাতন হাঁপিয়ে ওঠে। বুকে আবার সহস্র নাগ দংশাতে থাকে। সনাতন উন্মত্ত হয়ে ওঠে। ঝাঁপিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যায়। সাপগুলো হঠাৎ একসঙ্গে গভীর নিঃশ্বাস টানে। সনাতন থমকে দাঁড়ায়, তারপর ঘর থেকে উন্মত্তের মত ছুটে বেরিয়ে চলে।

মেয়েটা মদের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমোচ্ছে। সনাতন বসে বসে ভাবে, সাহেবিনী জাগলে কী করবে। হাফিজখাসের ভাঙা ছাদটার মাঝ দিয়ে আকাশটা দেখা যাচ্ছে। তারা-ঝিকমিক রাত। আকাশটা ফিকে নীল। হাফিজখাসের গুমটটা কেটে গেছে। হাওয়া বইছে। ঘুম আসছে। নাগিনী দংশাচ্ছে না। কাঁদছে না।

ভোরবেলা সনাতনের ঘুম ভেঙে যায়। দোর খুলে ঘরে ঢোকে। ঘরের ছাদটা আছে কিন্তু তার মাঝখানে মস্ত একটা ফোকর। ফোকরটার ভেতর দিয়ে ঘরের মধ্যে আলো এসে পড়েছে। মেয়েটা শুয়ে আছে, ঘুমোচ্ছে। মদের নেশায় প্রচুর ঘুমোচ্ছে। সনাতন শঙ্খিনীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। শঙ্খিনীকে দেখে। সাহেবিনীকে কোথাও খুঁজে পায় না। রাতের সাজসজ্জা, রেশমী পোশাকটা একান্ত প্রাণহীন। মেয়েটা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। বেঁচে আছে। সনাতন শঙ্খিনীর পাশে বসে পড়ে। শঙ্খিনীর মাথায় মুখে ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দেয়। শঙ্খিনী একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শোয়। শঙ্খিনী চোখ খুলে চায়, বন্ধ করে আবার চায়। চারধারে চেয়ে কী যেন স্মরণ করবার চেষ্টা করে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসতে যায়। সনাতন শঙ্খিনীকে চেপে ধরে বলে, ঘুমো আর একটু ঘুমো।—শঙ্খিনী সনাতনের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, আর একবার চারধারটায় চায়। মনে পড়ে।…সাহেবিনী ফুঁসিয়ে ওঠে। সনাতন—বেদের ছেলেটা তাকে বস্তির ঘরে পৌছে দেয় নি, অন্য কোথাও নিয়ে এসেছে। চোখের দৃষ্টি ঝলসে ওঠে। সাহেবিনী ঝটকা মেরে উঠে বসে। নাগিনীর মত ফুঁসিয়ে উঠে বলে, কোথায় এনেছিস?

সনাতন সাহেবিনীর হাত ধরে বলে, কোথায় আবার, আমার কাছে—মোর ঘরে। শুয়ে পড়্। সাহেবিনী ফুঁসিয়ে ওঠে। উঠে দাঁড়াতে যায়। সনাতন সাহেবিনীর হাতটা ধরে টানে। সাহেবিনী রাগে ফুঁসিয়ে উঠে নাগিনীর মত তীক্ষ্ণ দাঁতে সনাতনের হাতটা কামড়ে ধরে। সনাতন আর্তস্বরে সাহেবিনীর হাতটা ছেড়ে দেয়। সাহেবিনী ওই ফাঁকে ঘর ছেড়ে বাইরে পালিয়ে যেতে চায়। সনাতন হাতের জ্বালাটা ভুলে গিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটার লুটিয়ে পড়া আঁচলটা ধরে ফেলে সাহেবিনীকে টেনে আনে। বুকে চেপে ধরে। হাতটা জ্বলছে। মেয়েটার দাঁতে বিষ আছে। দুজনের দৃষ্টিতেই আগুন। কন্যা ছাড়া পাবার জন্যে চেষ্টা করে। পারে না। সনাতন সাহেবিনীকে শক্ত করে বুকে চেপে ধরেছে। মেয়েটার চোখে আগুন। সনাতনের চোখের আগুনটা নিভে গিয়ে ও হাসছে। মেয়েটার হৃদস্পন্দন ও নিজের বুকে শুনছে। কবোষ্ণ মেয়েটা, তুলতুলে মেয়েটা। সনাতন হাতের জ্বালাটা ভুলে মৃদু মৃদু হাসছে। মেয়েটা ছাড়া পাবার জন্যে চেষ্টা করছে।

সনাতন হাসছে। সাহেবিনী শেষটায় সনাতনের বুকে মোক্ষম কামড় বসায়। মেয়েটার তীক্ষ্ণ দাঁত সনাতনের বুকে বসে মজ্জায় গিয়ে বসে যায়। সনাতন কাত্রে ওঠে। মেয়েটা নির্মমভাবে কামড়াচ্ছে, চিবুচ্ছে, ছাড়ছে না। যন্ত্রণায় সনাতনের চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। সনাতন কিছুতেই ছাড়িয়ে নিতে পারছে না। অসহ্য যন্ত্রণায় সনাতন শেষটায় মেয়েটার গলা টিপে ধরে। নির্মমভাবে মেয়েটার গলা টিপে ধরে নাড়া দিতে থাকে। তবুও মেয়েটা ছাড়ে না। সনাতন সাঁড়াশির মত শক্ত দু হাতে মেয়েটার গলা নিষ্পেষণ করে পাগলের মত মেয়েটার গলায় ঝাঁকুনি দিতে থাকে। মেয়েটার দম বন্ধ হয়ে আসে। মুখটা নীল হয়ে চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। কামড় আলগা হয়ে আসছে। সনাতন মেয়েটার গলা আরও জোরে টিপে ধরে নাড়া দেয়। মুখটা আলগা হয়ে আসে। সনাতন সাহেবিনীকে এক ধাক্কায় কঠিন মেঝেতে ফেলে দিয়ে হাঁফাতে থাকে। সনাতনের বুকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মেয়েটা ফুঁসিয়ে ওঠে। ঝট্‌তি উঠে বসতে চায়। পারে না, কাত্রে ওঠে। মেয়েটা আবার উঠে বসতে চায়, ফুঁসিয়ে উঠে ঘাড় বেঁকিয়ে ঝাঁকড়া চুল ঝাঁপিয়ে সনাতনের দিকে চায়। নাগিনীচক্ষে কোমরভাঙা কালনাগিনীর মত মেয়েটা ফোঁসাতে থাকে। সনাতনের বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। ও বলে, গজরা গজরা, যত্তো পারিস গজরা। থাক্ তুই ওখানেই থাক্, ঘরে বন্ধ হয়ে থাক্। সনাতন ঘরের বাইরে এসে দরজার শিকলি তুলে দেয়। বাইরে থেকে বলে ওঠে, থাক্ থাক্, তুই এই ঘরেই থাক্, গজরা যত্তো পারিস্ গজরা। মেয়েটা ঘরের মধ্যে থেকে কাতরে ওঠে, ফুঁসিয়ে ওঠে। সনাতন বাইরে থেকে ফের বলে, গজরা গজরা আরো গজরা। সনাতনের বুকটা জ্বলে যাচ্ছে, মেয়েটা চিবিয়ে দিয়েছে। অসহ্য জ্বালা ধরেছে। সনাতন বুকের ক্ষতটা এক হাতে চেপে হাফিজ-খাস থেকে বেরিয়ে পড়ে।

সাহেবিনীর অর্ধনগ্ন দেহটা পড়ে আছে ঠিক যেন শঙ্খনাগিনী।

সাহেবিনী ঘরের মধ্যে ছটফটিয়ে ছুটে বেড়ায়। গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঘরের ফাটলে ফাটলে শিস দিয়ে ডাকে—আয় আয় বেরিয়ে আয়। সনাতনের বুকে ছুঁড়ে দিতে হবে। আছে আছে নিশ্চয়ই আছে—ওরে ও কালনাগ তুই বেরিয়ে আয়। নাগিনীকন্যারে মুক্তি দে। নাগিনীকন্যার মনের ব্যথা দূর কর।

গন্ধ শুঁকে শুঁকে মেয়েটা ঘরের ফাটলে ফাটলে তীব্র শিস্ দিয়ে ডাকছে। মেয়েটা উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে। বুকে জ্বালা—মেয়েটা নিজের বুক খামচে ধরছে। যেন নাগিনীকন্যার চরে বুনোঘাসের বন উঁচিয়ে কালনাগিনী মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, গজরাচ্ছে। শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। শৌখিন বাঁশিটা বাজছে, নাগিনীকন্যার চরের বাঁশিটাও বাজছে। মেয়েটা শিস দিয়ে দিয়ে ডাকছে—আয় আয়, ওরে ও কালনাগ আয়।

সাহেবিনী উন্মত্ত হয়ে সনাতনের ঝাঁপিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ডালা খুলে খুলে সাপগুলোকে আছড়ে-পাছড়ে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে। সাপগুলো ভয় পেয়ে ঘরের এধারে ওধারে একটুখানি মাথা তুলে ফণা তুলে দাঁড়ায়, দোলে।

সাহেবিনী নিষ্পলক মেয়ে চেয়ে থাকে। সবকটা চেনা। বিষ কামান করে সনাতনের হাতে বিষ টলটলে ঝিনুক

তুলে দিয়েছে সে। গোখরো, কেউটে, শঙ্খচূড় সব—সবকটা চেনা—সব নির্বিষ। সনাতন একটাকেও ছেড়ে দেয় নি। সবকটাকে নির্বিষ করে ঝাঁপিতে পুরে রেখেছে।

মেয়েটা ঘনিয়ে উঠত। খিল খিল করে হেসে উঠত, বলত, ও নাগর, তুরু সরম নাই, বুকের পরে তুমার বড্ড নজর। ও নাগ তুর সরম নাই। আবার বলত, ও জাদু লাগছে, পেরথম প্রণয়েই কী এত্তো জোরে চিপতে আছে! ও জাদু বড্ডো লাগছে।—নাগটা ছোবল মারে না। মেয়েটার কাছে বুকে হেঁটে এগিয়ে আসত। মুখের কাছে দুলত, কন্যার অঙ্গের বাস নিত।

মেয়েটা করুণ হয়ে আসত। সনাতনের দিকে চেয়ে ছল ছল চোখে বলত, দে না, ছেড়ে দে না।

সনাতন একটাকেও ছেড়ে দেয় নি, সব নির্বিষ। সাপগুলোকে দেখতে দেখতে কন্যা ফুঁপিয়ে ওঠে। কেঁদে ওঠে। মেয়েটা মেঝের উপর ভেঙে পড়ে। মেঝের উপর বসে পড়ে সাহেবিনী হাতের তালুতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সাপগুলো এঁকেবেঁকে আবার যে যার ঝাঁপির মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে, এতটুকু এতটুকু মাথা উঁচিয়ে মেয়েটাকে দেখছে। সিঁদুর ঢালা পদ্মগোখ্‌রোটা দুলছে।

অসহায় বেদেনীর রক্ত গুমরে উঠছে। মেয়েটা থরথর করে কেঁপে উঠছে। কাঁদছে, কেঁপে উঠছে। মেয়েটা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ঘরে অসংখ্য ফাটল, গর্ত। একটাও কি নেই? সনাতনের বুকে ছুঁড়ে দেবে—সনাতনের বুক খুবলিয়ে খাবে, মেয়েটার বুকের আগুন নিবিয়ে দেবে! কন্যার মনে ঝড় উঠেছে। বেদেনী আবার ফুঁসিয়ে উঠছে। কন্যার মুখচোখ উপচিয়ে রক্ত ছুটে আসছে। কন্যার শরীরে কালনাগিনী, কন্যার চুলে বিষরাত লকলক করে উঠছে। কন্যা ডাকছে, ওরে আয়, কালনাগ তুই আয়, তুকে বুকের রক্ত ঝিনুক ভরে দেব, তুকে বুকের রক্ত দিবো, ওরে আয়। কন্যা তীব্রস্বরে শিস দিয়ে উঠছে। ফাটলে ফাটলে শিস দিয়ে কন্যা ডেকে উঠছে।

মেয়েটা গন্ধ শুঁকে শুঁকে শিস দিয়ে ওঠে, আছে, এই গর্তটায় আছে। আয় আয়, ও দেবতা আয়, নাগকুলকে রক্ষা করে কন্যার ব্যথা দূর কর।

ফোঁস্!—ফাটলের গর্তে সাপটা গর্জন করে ওঠে। মেয়েটার চোখমুখ রাঙা হয়ে আসে। দেহটা ঝকমকিয়ে ওঠে। কন্যা আবার শিস দিয়ে ওঠে। গর্ত থেকে সাপটা বিষম ফুঁসিয়ে উঠছে, বেরিয়ে আসছে।

দেবতা আসছে—নাগকুলকে রক্ষা করতে আসছে। কন্যার কষ্ট দূর করতে আসছে—দেবতা আসছে। ফোঁস!—নাগরাজ গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক ফনা তুলে চায়। মেয়েটা বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে দেখছে। ধপধপে দুধবরণ, গা থেকে লালচে আভা বেরিয়ে আসছে, দুধগোখরো মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। মাথায় সোনালী খড়ম চিকচিক করছে।

মেয়েটা চেয়ে চেয়ে দেখছে আর ধীরে ধীরে ঘনিয়ে উঠছে, এত সুন্দর! গড়ের মালার মতন বরণ, গড়ের মালার মতন গড়ন, কন্যার মালা করে পরতে ইচ্ছে করছে। মেয়েটা চুমু দিয়ে ওঠে। সাপটা ফোঁস করে ওঠে। ফণাটা এধারে ওধারে দুলিয়ে তাকায়। মেয়েটাকে দেখে দুধরাজ ফণা নামিয়ে দেয়াল বেয়ে মেঝের উপর নেমে আসে। নিটোল গড়ন, দুধবরণ দুধরাজ বুকভোর ফণা তুলে দাঁড়িয়ে দুলছে। মেয়েটাও দুলে দুলে উঠছে।

কানের কাছে বাজছে, আছে আছে একটা জীয়ন্ত সাপ আছে—খেলাবি, তুই খেলাবি। ফোঁস—দুধরাজ হাওয়ায় একটা ছোবল মেরে উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটা দুলে ওঠে, মেয়েটা গুনগুনিয়ে গান গেয়ে ওঠে—

ও দুধরাজ নাগ আমার
তুমি যদি মালা হইতে
তোমায় গলায় পরতাম।

নাগিনীকন্যার চরে হাওয়া বইছে। লতায় লতায় জড়াজড়ি। বুকের মধ্যে বাঁশি বাজছে। বলছে, তুকে আর ছাড়ব না। সনাতন বলছে, তুকে আর ছাড়ব না রে কন্যা। ফোঁস! দুধরাজ হাওয়ায় আবার একটা ছোবল মারে। মেয়েটা দুলে দুলে গেয়ে ওঠে—

ও দুধরাজ তুমি যদি মালা হইতে
তবে গলায় পরতাম বাস শুঁকতাম
পিরিতমের গলায় দোলাতাম।

দুধরাজ কন্যার দিকে এগিয়ে আসছে। নিটোল গড়ন দুধবরণ দুধরাজ এগিয়ে আসছে। কন্যা অবাক হয়ে

চেয়ে দেখছে। কন্যার মনে মালা করে পরবার সাধ জাগছে। কন্যার মন দুলে উঠছে। কন্যার বুকে লিলাবতীর বাঁশী বাজছে, দুধরাজ দুলছে। দেখছে নাগিনীকন্যা গুনগুন করে গেয়ে উঠছে—

ও দুধরাজ নয়নে আমার ঘোর লাগে
বুকে আমার দোলা লাগে
মন আমার কেম্যন করে
বল সে কোথায়। •

দুধরাজ বুকে হেঁটে কন্যার কাছে এগিয়ে আসছে, দুধরাজ স্ফটিক বরণ। দুধরাজ কন্যার রূপে মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। মেয়েটা গুনগুনিয়ে গাইছে—

ও দুধরাজ মন আমার কেমন করে
মন আমার একা ঘরে
ও দুধরাজ মন আমার কেমন করে
বল সে কোথ্যায়।

ফোঁস। দুধরাজ কন্যার বুক লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কন্যা নেচে ওঠে। দুধরাজ আবার উঠে দাঁড়ায়, দোল খায়। মেয়েটার ঘোর লেগেছে, দুধরাজের নিঃশ্বাস কন্যার মুখে চোখে লাগে। কন্যার নিঃশ্বাস দুধরাজের অঙ্গে লাগে। দুধরাজ মস্ত ফণা দুলিয়ে কন্যার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কন্যা অপূর্ব বিভ্রায় দুধরাজের ফণাটা ধরে ফেলে। দুধরাজের ঝাপটায় কন্যা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে, দুধরাজ কন্যার অঙ্গ জড়িয়ে ধরে। কন্যা দুধরাজের মুখটা মুখের কাছে এনে চুমু খায়। মদির ঢুলুঢুলু কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—

ও দুধরাজ তুমি যদি মালা হইতে
গলায় পরতাম
ও দুধরাজ তুমি যদি শাঁখা হইতে
হাতে পরতাম।

দুধরাজ ধীরে ধীরে কুঁকড়ে আসছে। পেঁচিয়ে ধরছে। কন্যা দুধরাজের ফণাটা হাতে করে উঁচিয়ে ধরে ঢুলুঢুলু কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—

ও দুধরাজ কন্যারে আর কান্দাও না
ও দুধরাজ কন্যারে আর কান্দাও না
তুমি ফুলের মালা হও
তুমি হাতের শাঁখা হও
ও দুধরাজ তুমি তারে এন্যে দাও।

কন্যা দুধরাজের অঙ্গে চুমু খেয়ে ফের গেয়ে চলে—

আঁখিতে মোর ঘোর লাগছে
প্রতি অঙ্গ মোর কান্দছে,
ও নাগ বল্ সে কুথ্যায়।

কন্যার মুঠি আলগা হয়ে আসে। দুধরাজ ফণা তুলে কন্যার বুকে দোলে, কন্যার মাথার উপরে দোলে, কন্যার মুখের কাছে দোলে। কন্যা চুমু দিয়ে ওঠে। দুধরাজ কন্যার বুকে আছড়ে পড়ে ছোবল মারে। উঠে দাঁড়ায়, দোলে, আবার ছোবল মারে। কন্যা ঝিম ঝিম করে ওঠে, গান গেয়ে ওঠে—

চুমা খাও, আঁধার করে চুমা খাও
সর্ব অঙ্গে চুমা খাও—
ও আমার লক্ষীন্দর রে।

কন্যা ঢুলে পড়ে। কন্যার ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ ফুটে ওঠে। দুধ-বরণ দুধরাজ ফুলের মালা হয়ে কন্যার অঙ্গে জড়িয়ে আছে।

বিহানবেলা সনাতন হাফিজখাসের দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে যায়, দুধরাজ গর্জিয়ে ওঠে।

দুধরাজ কন্যার সঙ্গে বাসর জাগছে—কন্যাকে জড়িয়ে আছে। সনাতন ফিরে চলেছে। দুধরাজ ফুঁসিয়ে উঠেছে। কন্যার সঙ্গে রাত জাগবে।

কন্যা মুক্তি পেয়েছে। কন্যার চোখমুখ গাইছে—

ওরে ও কালনাগ—
তোরে নাগকেশরের মালা দেব···
* * *
আহা নাগ কেন্দ না রে, কেন্দ না—

দে না, ছেড়ে দে না। মেয়েটার চোখের জলে চাঁদ দোলা দিয়ে যাচ্ছে। মিঠে মহুয়ার বাসে বাতাস ভারী হয়ে বইছে। সনাতন চলে যাচ্ছে। কন্যা সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে, গুনগুনিয়ে গাইছে—

লক্ষীন্দর, ও আমার লক্ষীন্দর রে—

কন্যা মুক্তি পেয়েছে।

শোক

শ্রীহিরণ্ময়ী বসু

সমস্ত বাড়িটা শোকাচ্ছন্ন।

একটা নিষ্ঠুর হিমেল ঝঞ্ঝায় যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়েছে মিত্রদের সাজানো বাগানটা। দেওয়ালের গায়ে গোলাপ লতাগুলো নেতিয়ে পড়েছে, কস্‌মস্‌ আর ক্রিসেনথিমামের প্রাণ মাতানো সৌন্দর্য পাণ্ডুর হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে যেন নিভে গেছে গোটা বাড়িটার সবগুলো আলো।

সতীনাথ আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন, গড়গড়ার নলটা কখন যে হাত থেকে স্খলিত হয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে টের পান নি। রূপোলী তারে মোড়া নলটা একটা নির্মোকের মত পড়ে আছে তাঁর ডান পাশে। কল্কের আগুনটা নিভে গেছে তবু বালাপুরী তামাকের মিঠে সুবাসটা অনর্থক ছড়িয়ে পড়েছে।

সতীনাথ ভাবছিলেন মৃত্যুর আলিঙ্গন বড় অনিশ্চিত, বড় অসহনীয়। বিজ্ঞান কি পারে না এই বিচ্ছেদের আস্তরণকে সরিয়ে ফেলতে? যে অগ্নিবাষ্প থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজকের পৃথিবীর এত গৌরব, এত স্পর্ধা—পারে না কি সেই অগ্নিকণাগুলো মৃত্যুকে গ্রাস করতে?

কোথায় গেল সোমেশ্বর? বৈজ্ঞানিক সোমেশ্বর তার নিজের গৌরব ক্ষুণ্ণ করে নতুন সৃষ্টির অবমাননা করে নির্লিপ্ত অভিনন্দন জানাল মৃত্যুকে। কোথায় রইল তার সৃষ্টির সার্থকতা? মৃত্যুই সত্য, তার ব্যাপ্তি চিরন্তন।

জীবনের যে কটা দিন আর বাকি আছে সে কটা দিন তাঁকে চালাতে হবে মৃত্যুর প্রস্তুতি। প্রশস্ত রাজপথে কর্মচঞ্চল অবস্থানের পর মানুষের শ্রান্ত দেহ চায় শান্তির নীড়—সে নীড় নিপুণ হাতে রচনা করে মৃত্যু।

সতীনাথ অতলায়িত হলেন তাঁর আধ্যাত্মিক আরাধনায়।

পাশের ঘরে পালঙ্কের ওপর কোমল আর শুভ্র শয্যায় পাশ ফিরে শুয়ে ছিলেন অহল্যা। জীবনের বাস্তববোধে ঘা লেগেছে তাঁর। কল্পনা-বিলাসী মনও নয় তাঁর। সুষ্ঠু গৃহিণীপনায় দীর্ঘ তিরিশটি বছর ধরে তিলে তিলে জমা করেছেন অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি আর সুনাম। সেই কংক্রিটের থামগুলি তাঁর নড়ে উঠেছে, আজ পতনের ভয়ে তিনি অস্থির।

সোমেশ্বরের মত রোজগারী ছেলে অনায়াসে ছুটি নিল? এ ছুটি তার মঞ্জুর করলে কে? শত কোটি দেবতা মিথ্যে, মানুষের অহঙ্কার ঐশ্বর্য সব কি মিথ্যে? শুধু যাওয়া আর আসা—খেলাঘর সাজিয়ে বসা? সোরগোল তুলে হাটে পসরা সাজিয়ে বসে পণ্যের বেচাকেনা শেষ হওয়ার আগেই কখন যে ভেঙে যাবে হাট, হিসেবে থেকে যাবে গরমিল তা কি কেউ বলতে পারে? নাই পারুক, তাতে অহল্যার ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। কিন্তু সোমেশ্বর তাঁর বড় আদরের—পূর্ণ আটাশটি বছরের সোম একবারও ভাবল না বৃদ্ধ মা বাবার কথা? একটিবারও মনে করল না সংসার চালানোর দায়িত্বটা নেবে কে? আর একটি অন্ততঃ সন্তান যদি থাকত অহল্যার তা হলে হয়তো এতখানি ভেঙে পড়তেন না। আজ তিনি কিসের জোরে দাঁড়াবেন? কার মুখ চেয়ে গর্বের জোয়ার লাগবে তাঁর রোগজীর্ণ মনে?

কত কষ্টে কত যত্নে সোমকে তিনি মানুষ করেছিলেন। শুধু মানুষ নয়, কৃতী ও প্রতিষ্ঠাবান করে তুলেছিলেন। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে পশ্চিমের শিক্ষায় ছেলেকে তিনি পাণ্ডিত্যের মুকুট পরিয়েছিলেন, আর সেই সোমেশ্বর একবারও পেছন ফিরে তাকাল না। মা বাপের ওপর কর্তব্য না থাক কিন্তু যার জীবন-মরণের ভার স্ব-ইচ্ছায় গ্রহণ করেছিল তার দায়িত্ব সে অস্বীকার করল কী করে?

মাসের শেষে অহল্যা সেই হাজার টাকা আয়ের বন্ধ দরজায় মাথা কুটে মরে গেলেও যে একটি পয়সা তার রন্ধ্র পথে গলে পড়বে না। একটা মস্তবড় মৃত্যু-শীতল পাথর দিয়ে গুহার মুখটা যেন রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে অথচ ভেতরে তার থেকে গেল অজস্র মণি মুক্তো হীরে জহরত। না না, তার চেয়েও বেশী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে সোমেশ্বর যে আলোর শিখা জ্বালিয়ে গেছে সে আলো নিভবে না। যত ভারী পাথরই সেখানে চাপানো থাক না কেন তার গা থেকে বিচ্ছুরিত হবে জ্যোতির শিখা।

অহল্যা আর ভাবতে পারেন না। চোখে জল আর নেই, শুধু পাতাটা ভারী আর ভিজে। একটা অসহ্য

জ্বালায় চোখ দুটো জ্বলে যাচ্ছে। জীবনের বাকি কটা দিন ধরেই জ্বলবে। আরও বেশী করে—মাসের শেষ দিকে যখন অনটন আর পীড়নের গ্লানিতে চুঁয়ে চুঁয়ে গড়িয়ে আসবে অপরিতৃপ্তি। চোখে হাতটা সজোরে চেপে ধরে অহল্যা আবার কেঁদে উঠলেন : সোম আমার সোম।

আর একটা ঘর আছে। ছাদের পাশে তিনতলার সাজানো ঘর একটা। তারই সংলগ্ন ল্যাবরেটরী।

সেই ঘরের পুরু গালিচা-মোড়া মেঝেতে নিশ্চুপ বসে আছে লীনা। পায়ের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে মাঝে মাঝে লাল কার্পেটের রেশমগুলি খুঁটছে আর টেবিলের ওপর রাখা সোমেশ্বরের ফটোটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

তুমি নেই ?—এ কথা একবারও মনে আনতে পারছে না লীনা। ঐ তো ব্রাকেটের গায়ে ঝোলানো রয়েছে সোমেশ্বরের ল্যাবরেটরীতে যাওয়ার গলা-বন্ধ সাদা চায়না সিল্কের কোটটা। চশমাটা সবে নাক থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় রেখে বসেছে। হাসছে সোমেশ্বর। আজ ফিরতে বড় দেরী হল। অভিমান হয়েছে লীনুর। হবারই তো কথা। শুধু কাজ আর কাজ।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের সঙ্গে অর্থকরী প্রচেষ্টাকে যোগ করেছিল সোমেশ্বর, কাজেই তার নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাজে ভরা। সেখানে স্বপ্ন ছিল না, আরাম ছিল না—ছিল নিষ্ঠা আর সততা।

লীনা অবাক হয়ে চেয়ে আছে ফটোটার দিকে। এক্ষুনি সোমেশ্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে আসবে। দুহাত বাড়িয়ে লীনুকে তার বুকে তুলে নেবে। শাল গাছটার গায়ে জড়ানো লতাটার মত লীনা মিশে যাবে সোমের বুকে। সারাদিনের অসহ্য বিরহ তার নিমেষে ধুয়ে মুছে যাবে। সোমের অজস্র চুম্বনে এতটুকু অভিমানের ধুলো আর জমতে পাবে না। অজস্র স্নেহ আর ভালবাসায়, প্রেমে আর প্রীতিতে লীনাকে অভিষিক্ত করবে সোমেশ্বর।

সন্ধ্যের পরে সোমেশ্বর চলে যাবে ওর কাজের ঘরে। সেখানেও লীনার অবাধ গতি। দুজনে মিলে টিউবে ভরবে তরলীয় পদার্থগুলো—খুলে দেবে গ্যাস টিউবের মুখটা, তারপর হলুদ, নীল, পীতাভ ধোঁয়ায় পরীক্ষা চলবে কত অবাস্তব পরিকল্পনার।

সেই অসমাপ্ত পরীক্ষা ফেলে রেখে সোমেশ্বর কেন চলে গেল ?—প্রশ্ন করল লীনা। কার ওপর দিয়ে গেলে তোমার কাজের দায়িত্ব ? সে যে আসে নি এখনও। এখনও তার দৃষ্টিতে পৃথিবীর আলো পৌছতে ঢের ঢের দেরী। পারবে কি সে তোমার মত কর্মী হতে ?

দুহাতে এবার মুখটা ঢেকে ফেলল লীনা। বুকের ভেতর জ্বালা আর জননকোষের অভ্যন্তরে একটা চেতনার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। একটা গোলাকার চক্রে যেন গতি সঞ্চার হয়েছে, অদ্ভুত শিহরণ জাগছে লীনার দেহে—রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে ওর নিঃসঙ্গ মন।

অবসন্নের মত লীনা এবার লুটিয়ে পড়ল কার্পেটের ওপর। সোমেশ্বরের পায়ের ধুলো যেখানে জমাট বেঁধে আছে সেখানে লীনা তার একমাত্র আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। বারে বারে নিজেকে প্রশ্ন করছে লীনা, দীপ আছে শিখা নেই কেন ? কবে জ্বালবে তোমার শিখা ? কবে আবার আলোময় হবে তোমার ঐ কক্ষের জমাট-বাঁধা অন্ধকার ? কবে আত্মপ্রকাশ করবে তোমার বীজ-কণিকায় গড়া সত্তা ?

শান্তি আর সান্ত্বনার আশায় পরিশ্রান্ত লীনা আর একবার নিজেকে সঁপে দিল সোমেশ্বরের নিবিড় আলিঙ্গনে।

আর একজন আছে এ বাড়িতে। তার ঠাঁই একতলার সিঁড়ির নীচে ছোট্ট ঘরখানায়।

সেও আজ বিচলিত। ভজনও ভাবছে সোমেশ্বরের কথা। শুধু কথা নয়, অনেক দুঃখ সুখের কথা।

সোমেশ্বর কি মানুষ ছিল ? ভজনের সে ছিল দেবতা। মানুষ সর্বদা হিসেবের পয়সা গুণে নেয় কিন্তু সোমেশ্বর সর্বদা ফেরত পয়সা হাসি মুখে পকেটে ফেলত।

বেহিসেবী ছিল না সোমেশ্বর, কিন্তু বিশ্বাস ছিল তার অগাধ। মানুষকে সে বিশ্বাস করত, সে-বিশ্বাসের সুযোগ দিয়ে তৈরী অনেক লাভের ইতিহাস আছে ভজনের।

ওর বউয়ের রূপোর বিছে, হাতের বালা, কোমরের গোটের যে আবার ইতিহাস থাকতে পারে মাত্র দুটো দিন আগেও সে কথা বুঝতে পারে নি ভজন। ইতিহাস কখনও মিথ্যে হয় না, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাই গাঁথা রয়েছে ভজনের কলঙ্ক।

জিনিস কিনে একটা টাকা ভাঙানোর বাকি পয়সা যখনই ফেরত দিয়েছে ভজন তখনই তারও অর্ধেকটা নিজের ফতুয়ার পকেটে সে চেপে গেছে।

নোংরা তেলচিটে বালিশটায় মুখ ঘষে ঘষে কাঁদছে ভজন : দাদাবাবু তুমি দেবতা ছিলে।

পাপ স্বীকারের তীব্র ব্যাকুলতায় আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত অবস্থা ভজনের। রুদ্ধ আত্মগ্লানি আর পাপ স্বীকারের প্ররোচনা ওকে পাগল করে তুলেছে।

সে ভালবাসত সোমেশ্বরকে। প্রাণ পর্যন্ত বুঝি দিতে পারত ওর দাদাবাবুর জন্যে। অথচ ঐ একটু হাতটানের মারপ্যাঁচে সব পণ্ড হয়ে গেছে। বউয়ের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে ভজন বিবেক হারিয়েছে।

সবচেয়ে বেশী কেঁদেছে ভজন আর এখনও কাঁদছে—দাদাবাবুগো একটিবার তোমার ভজুর দুটি কথা শুনে যাও, প্রায়শ্চিত্তির করবার সুযোগ দিয়ে যাও।—এই একই কথা বলছে আর বালিশে মুখটা রগড়ে কাঁদছে ভজন। ওর কান্না বুঝি আর শেষ হবে না।

গ্রন্থ-পরিচয়

স্মরণীয়ঃ শ্রীসুনীল রায়। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। আট টাকা।

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীমান সুনীল রায় বাংলা দেশের আধুনিক 'মনীষীদের জীবন-কথা' দুই খণ্ডে প্রকাশ করিয়া বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। কারণ, স্মৃতি-কথা ছাড়া প্রত্যক্ষ দর্শনলব্ধ জীবন-কাহিনী লেখার রেওয়াজ বাংলায় ছিল না। তখন দুই খণ্ডে একত্রিশজন নামকরা বাঙালীর জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। 'স্মরণীয়'-গ্রন্থে অধিকন্তু আরও দুইজন কৃতী বাঙালীর জীবনকথা সংযোজিত হইয়া তেত্রিশজন বাঙালীর পরিচয় ও চিত্র-সম্বলিত ইহা একখানি অপূর্ব আকর-গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ইহার সব চাইতে বড় আকর্ষণ—ইহা সন-তারিখ-সম্বলিত নীরস জীবনীর কাঠামো মাত্র নয়, ইহাতে রক্তমাংস-রূপরঙের স্পর্শ আছে। পাঠক ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেক মনীষীর সঙ্গে পরিচয়লাভের সুযোগ পাইবেন।

হিমতীর্থঃ শ্রীসুকুমার রায়। ৫৩এ, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট হইতে শ্রীঅনাদিনাথ নান কর্তৃক প্রকাশিত। সাড়ে তিন টাকা।

শ্রীমান সুকুমার রায় তরুণ বয়সেই হিমালয়ের আহ্বান শুনিয়াছেন এবং অকপটে স্বীকার করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে "সে ডাকে জাদু আছে।...ওর ডাকে মানুষ ঘর ছাড়ে, দুঃখ পায়, কষ্ট পায়, পরিশেষে পায় অমৃত, আনন্দ আর শান্তি।"

ডাকে সাড়া দিয়া তিনি শুধু কেদার-বদরি নয়, কৈলাস-মানস-সরোবর ও পূর্বাঞ্চল হিমালয়ের চুম্বি-উপত্যকা-নাথুলা ঘুরিয়া আসিয়াছেন। বর্তমান গ্রন্থখানি কেদার-বদরি তীর্থদর্শন কাহিনী। পথের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়া তিনি শেষ পর্যন্ত যে "অমৃত, আনন্দ আর শান্তি" পাইয়াছেন অতি সুন্দর সহজ ভাষায় তাহাই পরিবেশন করিয়াছেন। 'হিমতীর্থ' একখানি সার্থক ভ্রমণ-কাহিনী।

পূর্বগামী বহু পর্যটক কেদার-বদরি তীর্থযাত্রার বহু বিচিত্র সুন্দর কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। 'হিমতীর্থ' সেই তালিকায় একটি নূতন সংযোজন—আধুনিক মনের উপযোগী করিয়া লেখা। পথের সঙ্গীদের টুকরা টুকরা পরিচয়, তাহাদের দেব-দর্শনে আগ্রহ, তাহাদের নিষ্ঠা আবার নীচতা দীনতা কলহ তুলির এক এক টানে তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন কিন্তু তীর্থমাহাত্ম্যই বড় হইয়া ফুটিয়াছে। এইখানেই তরুণ লেখকের কৃতিত্ব। বইখানি বহু চমৎকার চিত্রশোভিত।

পার্কঃ শ্রীসরিৎশেখর মজুমদার। প্রাচী পাবলিকেশনস, কলিকাতা-২৯। সাড়ে চার টাকা।

শ্রীমান সরিৎশেখরের এইটিই প্রথম উপন্যাস এবং আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিতেছি প্রথম উপন্যাসেই তিনি ভাষায়, বর্ণনা-কৌশলে ও ঘটনা-বিন্যাসে শিল্পীমনের পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প "ঘাটের কথা", "রাজ-পথের কথা"-র আদর্শ ধরিয়া তিনি যে উপন্যাসের আকারে "পার্কের কথা" লিখিয়াছেন এবং সেই বৃহৎ কথা যে উতরাইয়াছে, নবীন লেখকের পক্ষে ইহা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। উপন্যাসের গল্প ডিটেকটিভ উপন্যাসের মত চমকপ্রদ হইয়াও মানবজীবনের উদার ও মহৎ আদর্শকেই জয়যুক্ত করিয়াছে। সূক্ষ্ম অনুভূতি ও মননশীলতায় ইহা নিছক রোমাঞ্চ কাহিনী হয় নাই, শিল্পসৃষ্টি হইয়াছে।

ঝরাঃ বাগবুল ইসলাম। জাগরণ প্রকাশনী। এক টাকা পঁচাত্তর ন. প.।

'ঝরা' শ্রীমান বাগবুল ইসলামের মানস-লতিকা হইতে কয়েকটি ঝরা কবিতা-ফুলের সমষ্টি। সবগুলি পূর্ণ পরিণত ফুলের শোভা লইয়া ঝরে নাই, কোরক অবস্থায় ঝড়ের ঘায়েই বেশীর ভাগ ঝরিয়া পড়িয়াছে। তাই আধ-আধ অস্পষ্টতা মাঝে মাঝে ধরা পড়ে। তবে শ্রীমান বাগবুল স্বভাব-কবি, একটু সংযত ও সংস্কৃত হইলে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবেন। তাঁহার গ্রন্থের সর্বাঙ্গে প্রশংসা-পত্রের যে স্তবক আঁটিয়াছেন তখন সেগুলি তাঁহাকে লজ্জা দিবে।

রণজিৎকুমার সেনের শ্রেষ্ঠগল্প : স্বপ্না প্রেস লিঃ, কলিকাতা-১। পাঁচ টাকা।

বাংলা দেশে ডাইনে বাঁয়ে লেখেন, গল্প উপন্যাস কবিতা গান ও দার্শনিক-সাহিত্যিক প্রবন্ধ লেখেন এমন সব্যসাচী লেখক আঙুলে গোণা যায়। শ্রীমান রণজিৎ সেন তাঁহাদের একজন। তিনি প্রধানতঃ গভীর চিন্তাধর্মী মানুষ। কথা ও কল্পনা-বিলাসেও যে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে, সুনির্বাচিত এই গল্পসঙ্কলনটি তাহার প্রমাণ দিবে।

ভারতের সাধক, ৪র্থ খণ্ড : শ্রীশঙ্করনাথ রায়। প্রাচী পাবলিকেশনস্, কলিকাতা-২৯। সাড়ে ছয় টাকা।

'হিমাদ্রি' সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় একদা যে কাজ সম্ভবতঃ শুধু পাতা ভরানোর খেয়ালেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহা যে ধীরে ধীরে জনহিতকর বিপুলায়তন একটি কল্যাণকর্মে পরিণত হইতে পারে 'ভারতের সাধকে'র এই চতুর্থ খণ্ড দেখিয়া তাহাই আমাদের মনে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, "সাহিত্য ধর্ম ছাড়া নহে।" যাহা মানুষকে মহত্ত্বে উদ্বুদ্ধ করে তাহাই সৎসাহিত্য। শঙ্করনাথ পূর্বের তিন খণ্ডে বহু সাধক, সন্ন্যাসী ও মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্বের সহিত পরিচয় ঘটাইয়া আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। বর্তমান খণ্ডে বুদ্ধ, কবীর, শ্যামানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, চরণদাস বাবাজী, চৈতন্যদাস বাবাজী ও সাইবাবার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শঙ্করনাথের জয় হউক।

বনের ডাক : স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

'বনের ডাক' একখানি অপূর্ব বই। বাংলা-সাহিত্যে এই জাতীয় অরণ্য পশুপক্ষীর কাহিনী বড় বেশী নাই। লেখকের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, তিনি একজন আদর্শবাদী সন্ন্যাসী, দেশের কল্যাণে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন। এই বইখানিও দেশের ছেলেমেয়েদের গাছপালা পশুপক্ষী পৃথিবী জলমাটি সম্পর্কে প্রভূত বিজ্ঞান-সম্মত জ্ঞান দিবে। এমন সরসভাবে বইখানি লেখা যে নীরস বিজ্ঞান বলিয়া বইখানিকে তাহারা ঠেলিতে পারিবে না। স.

অপরূপা : দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সাড়ে পাঁচ টাকা।

'অপরূপা' দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্যের দ্বিতীয় উপন্যাস। এঁর প্রথম উপন্যাস 'ভৃগুজাতক' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকসমাজ কর্তৃক সমাদৃত হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কথা-সাহিত্যের চর্চা শুরু করলেও দ্বারেশবাবু যথেষ্ট তৈরী হয়েই যে এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তার প্রমাণ দুটি উপন্যাসেই মিলবে। কথা-সাহিত্যোচিত ভাষার উপর তাঁর সহজ অধিকার আছে, ঘটনা আর চরিত্র সৃষ্টিও তিনি করতে জানেন। উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে বেশ একটা স্বচ্ছন্দ গতিবেগ আছে। কথাসাহিত্যের অনুশীলনে নিবিষ্ট হয়ে থাকলে দ্বারেশবাবু গ্রহ-বিজ্ঞানের ন্যায় এই বিভাগেও তাঁর কৃতিত্ব সবিশেষ পরিস্ফুট করে তুলতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

'অপরূপা'র কাহিনীতে দেশাত্মবোধ আর জাতীয়তা-বাদী আন্দোলনের প্রাণবস্তু ছোঁয়া লেগেছে। ১৯২০ সনের অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৩০-এর মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে উপন্যাসের ঘটনার বিস্তার। দেশ-সেবা আর আসামের চা-বাগানের অনুন্নত পাহাড়ী আর সাঁওতালদের ঘিরে সমাজসেবার ফাঁকে ফাঁকে সন্ত্রাসবাদী কর্মপ্রয়াসও উপন্যাসটিতে চিত্রিত হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র সর্বেশ্বর একসময় বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারপর কোন এক মহাপ্রাণ ইংরেজের সংস্পর্শ ও দৃষ্টান্ত প্রভাবে তাঁর জীবনের ধারা বদলে যায়। তিনি আসামের চা-বাগান এলাকায় আশ্রম খুলে অনুন্নতদের মধ্যে গঠনমূলক সেবাকার্যে ব্রতী হন। এই কার্যে তাঁর সহায় হয় তাঁর পালিতা কন্যা সুজাতা ও আদর্শবাদী যুবক মণীশ। সুজাতা আসলে ইংরেজদুহিতা, লুসাই বিদ্রোহের সময় শিশুকন্যাকে সর্বেশ্বরের হাতে সঁপে দিয়ে তার আক্রান্ত পিতামাতা সংসার থেকে বিদায় নেন। সুজাতার পিতৃপরিচয় জনসমাজে অজ্ঞাত ছিল, সর্বেশ্বর মাস্টারের কন্যা বলেই সকলে তাকে জানত। মণীশ আর সুজাতার মধ্যে দেশসেবা আর কর্মের মধ্য দিয়ে বেশ একটা স্নিগ্ধ ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, ইতোমধ্যে বিলেত থেকে এল ডেভিড নামক এক ভারতপ্রেমী ইংরেজ যুবক। এক দুর্নিরীক্ষ্য আকর্ষণসূত্রে সুজাতার জীবনের সঙ্গে ডেভিডের জীবন জড়িয়ে গেল। তারপর নানা ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে সুজাতার প্রকৃত পরিচয় উন্মোচিত

হতে মণীশ সুজাতার জগৎ থেকে নিজেকে সবলে ছিন্ন করে নিল। ইউরোপের কর্মশক্তির সঙ্গে ভারতের ভাব-শক্তির গাঁটছড়া বাঁধা পড়ল।

সংক্ষেপে এই হল 'অপরূপা'র কাহিনী। কাহিনীর বিন্যাসে লেখক যথেষ্ট মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসটিতে সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্রের চিত্রও বড় সুন্দর ফুটেছে। ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের চরিত্ররূপায়ণে লেখকের যে ঔদার্য ও সংস্কারমুক্ত মনন প্রকটিত হয়েছে তা এই লেখকের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে মনে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আজকের এই সর্বব্যাপী অবিশ্বাস অশ্রদ্ধা আর বিদ্বেষকলুষিত আবহাওয়ায় বাস করে এমন মনোভাব-যুক্ত লেখককেই বুঝি আমরা মনে মনে খুঁজে বেড়াই। প্রধান চরিত্রগুলি বাদে রবার্টসন সাহেব, রহমান দারোগা, সুলেমান রাজা, সুনন্দা, নন্দা, পিসীমা প্রভৃতি চরিত্র চমৎকার আঁকা হয়েছে। মোট কথা, 'অপরূপা' একটি সুস্থ আদর্শযুক্ত সুলিখিত উপন্যাস : বইটি সকলেরই ভাল লাগবে।

দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতাঃ দিনেশ দাস। লেখক সমবায়। ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ভিক্টোরিয়াঃ রুট হামসুন। অনুবাদ: শীলভদ্র। লেখক সমবায়। ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

নূতন প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান লেখক সমবায়ের প্রকাশিত উপরের দুইটি বই তাঁদের রুচির পারিপাট্যে, মুদ্রণবৈভবে, প্রচ্ছদসজ্জার শিল্প-সৌন্দর্যে গোড়াতেই পাঠকের মন মুগ্ধ করে ফেলে। এমন সুরুচিসম্পন্ন প্রকাশন বাংলা বইয়ের জগতে সাম্প্রতিক কালে খুব বেশী হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পুস্তকের এই শোভন বহিরঙ্গ পুস্তকের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধে স্বতঃই মনে প্রত্যাশা জাগিয়ে তোলে। বইয়ের ভিতর প্রবেশ করলেই বুঝতে পারা যায় সে প্রত্যাশা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি, যথাযথ ক্ষেত্রেই অর্পিত হয়েছে।

দিনেশ দাসের কবিখ্যাতি সম্বন্ধে নতুন করে পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী, দীর্ঘকাল যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্য-সাহিত্যের অনুশীলন করে আসছেন। তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, ভাবে ভাষায় ছন্দে তিনি পুরাপুরি আধুনিক কবি, অথচ মোটেই তিনি ভঙ্গিসর্বস্ব কিংবা দুর্বোধ্য নন। অনুভূতির সৌকুমার্য ও মৃদুভাষিতা তাঁর কাব্যের দুটি প্রধাণ গুণ। তাঁর কাব্যের পরিমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হওয়া মাত্র মনে হয়, একটি শান্তবাক্ নরম মনের মানুষের জগতে প্রবেশ করা গেল—যাঁর অনুভব সুতীক্ষ্ণ এবং কতকগুলি স্থির প্রত্যয়ে অবিচল। আধুনিক কালের অস্থিরতা আর ভাববিপর্যয়ের আবহের মধ্যে বাস করেও কবি দিনেশ দাস সনাতন মহান্ মূল্যবোধগুলিকে তাঁর মন থেকে হারিয়ে যেতে দেন নি। কবির ভিতর প্রকৃতিচেতনা ও সমাজচেতনা দুই-ই প্রবল ভাবে বিদ্যমান, তাই বলে আজকালকার আত্মমুখী কবিদের মত প্রকৃতি কিংবা সমাজচৈতন্যকে তিনি নিজের মনে একান্ত ভাবে তলিয়ে যাওয়ার অছিলায় পরিণত করেন নি, পারিপার্শ্বিক বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে তাঁর চোখ-কান বেশ খোলাই আছে। তাঁর কবিতায় অন্তর ও বাহিরের সামঞ্জস্যের দুই-একটি নমুনা দিই :

সন্ধ্যায়
স্বচ্ছ মেঘ ডুবে যায়,
চোখের পাতার মত নামে অন্ধকার,
অন্ধকার-ডুবজলে
একা আমি ডুবে যাই নিবিড় অতলে।
হঠাৎ নিযুতি-রাতে শুনি যেন কার হাহাকার ?
মুখ আছে জিভ নেই, চোখ আছে পাতা নেই তার।

("সাদা অন্ধকার")

কিংবা ছিন্নমূলদের ওপর লেখা চমৎকার একটি কবিতাংশ—

মিশকালো ঝড়ে
একটি সোনার গাছ ভাঙল দু'খান হয়ে :
লক্ষ লক্ষ ঝরা পাতা উড়ে এসে পড়ে
মূক সমারোহে :
স্মৃতির করুণ ঢেউ ছোট বড় ভাঙে শত শত ;
তবু দেখি, হৃদয়ের মানদণ্ড অখণ্ড অক্ষত।

… … …

তবু এই শাখার উপরে কোন অদৃশ্য শাখায়
আশার শিশির জাগে,

নতুন সবুজ জল টুপটাপ ঝ'রে পড়ে রক্তরাঙা ভাঙা
দাগে-দাগে :
এখনো কোথায় যেন সাদা মোম গলে
বাতি জ্বলে ! ("ভাঙা গাছ")

আর একটি কবিতাংশ তুলে দিচ্ছি—

অনেক দুঃখের ঝড়ে নম্র তুমি
প্রথম-শিশির-ভেজা সকালের শাখা,
ভোরের হাওয়ার মত রেখে যাও ঘাসে ঘাসে
কালের স্বাক্ষর আঁকাবাঁকা,
সমতার মমতার। ("আচার্য বিনোবা ভাবে")

এ রকম বহু সুন্দর সুন্দর লাইন ছড়িয়ে আছে কবির এই প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন গ্রন্থটিতে ; কিন্তু স্থানাভাবের দরুন উদ্ধৃতির অবকাশ স্বতঃই সংকুচিত।

সংকলনশেষে কবির একটি বিস্তৃত পরিচায়িকা দেওয়া হয়েছে। পরিচায়িকাটি সুলিখিত। ওই থেকে কবির মনোজীবনের বিবর্তনের সন্ধান পাওয়া যায়। কবির জীবনে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আলোড়ন ঘটেছে। তাতে তাঁর ভাবজীবন পুষ্ট হয়েছে, গভীরতাপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু সৃষ্টিপ্রাচুর্য ব্যাহত হয়েছে। উৎকর্ষের আদর্শের হানি না ঘটিয়েও বোধ করি অধিকতর প্রাচুর্যে বিস্ফারিত হওয়া যায়, আমরা ভবিষ্যতে কবির কাছ থেকে সেই সম্ভাব্যতাই বিশেষ করে আশা করব।

'ভিক্টোরিয়া' প্রসিদ্ধ নরওয়েজীয় লেখক ক্নুট হামসুনের একটি বহুলপঠিত উপন্যাস। উপন্যাসটিতে জোহানিস ও ভিক্টোরিয়া নামক একজোড়া তরুণ-তরুণীর অনবদ্য প্রেমকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীটি অনুভূতির কোমলতায় স্নিগ্ধ, হৃদয়ে হৃদয় সংলগ্ন হওয়ার উত্তাপে কবোষ্ণ। দুটি নবীন প্রাণ, তাদের নবীন প্রেম—এর সজীবতা অপ্রতিরোধ্য, সংক্রামক। 'ভিক্টোরিয়া'র ছত্রে ছত্রে সজীবতা বিকিরিত।

অনুবাদ করেছেন শীলভদ্র। চমৎকার প্রাঞ্জল অনুবাদ। পরিচ্ছন্ন ভাষায় পরিচ্ছন্ন প্রকাশ।

নারায়ণ চৌধুরী

কাঠের ঘোড়া : কুমারেশ ঘোষ। শতাব্দী, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

সরস ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত যষ্টি-মধু সম্পাদক কুমারেশ ঘোষ লেখকরূপে সুপরিচিত। তাঁর উপন্যাস, রস-রচনা নাটক, ভ্রমণকাহিনী জনপ্রিয় হয়েছে। 'কাঠের ঘোড়া'য় তাঁর ছোটগল্প লেখার পরিচয় পাওয়া যায়।

১৪টি ছোট গল্প নিয়েই এই সংকলন ; প্রথম গল্পের নাম অনুসারে বইটির নামকরণ হয়েছে। গল্পগুলির কাহিনী নির্বাচনেই লেখকের সর্বাধিক কৃতিত্ব। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে-সব ঘটনা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘটে, তাদেরই তিনি অবলম্বন করেছেন। বাস্তব ঘটনাকে রসমণ্ডিত করে তুলতে যে আন্তরিক দরদ ও সহানুভূতির প্রয়োজন, তা যেন কুমারেশ বাবুর মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বেরিয়ে কাহিনীগুলির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। নীতিশাস্ত্রে বলে, পাপকে ঘৃণা করবে, পাপীকে নয় ; কুমারেশবাবু এই নীতিকে বিস্ময়কর ভাবেই আত্মস্থ করেছেন। তাই 'কাঠের ঘোড়া' গল্পের নায়ক হরিপদ অথবা বিন্দু ঝি গল্পের বিন্দু আমাদেরও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় না। 'সজনে ডাঁটা' গল্পে সামান্যের আঘাতে অপরাধী বিবেক কী ভাবে আহত হয়, তা চমৎকার রূপেই ফুটে উঠেছে। 'কড়িকাঠ' গল্পে বাস্তবের সঙ্গে রোমান্সের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি 'কবিগুরুর প্রশংসায় ধন্য হয়েছে' ; আমাদের প্রশংসা তার বেশী মূল্য দিতে পারবে না।

গল্পগুলির প্রধান গুণ তাদের ছোট আকার, অথচ তার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। এখানে অনাবশ্যক বিস্তারের প্রগল্‌ভতার লোভ লেখক যে সম্বরণ করেছেন, তা বাংলা ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মোট কথা, কুমারেশবাবুর শক্তি আছে ; ছোটগল্প লেখায় সে শক্তির আবার পরিচয় পাওয়া গেল।

ছাপা ও বাঁধাই ভাল, অভিনব প্রচ্ছদপটটি বইখানিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

শ্রীতারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৬